সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র

সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র

সম্পাদনা

উত্তম ঘোষ
সমীরকুমার নাথ

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

SUBODH GHOSH
RACHANA SAMAGRA
PART V

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৯৯

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
চারু খান

অক্ষরবিন্যাস
ওয়ার্ডওয়ার্কস
৭২/৩এফ/১, আর কে চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা-৭০০০৪২

মুদ্রক
অন্নপূর্ণা এজেন্সী
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র আরো আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে সুবোধবাবু (মার্চ, ১৯৮০) আমাদের ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন। যাবার আগের দিনও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি তাঁর শেষ সম্পাদকীয় লেখা লিখে রেখে গেলেন ঃ 'ওমর খৈয়াম স্মরণে'।

সুবোধবাবু সম্পর্কে আমি আমার বই 'সম্পাদকের বৈঠকে'—বেশ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি, যা শুধু লেখক সুবোধ ঘোষকে নয়, ব্যক্তি সুবোধবাবুকেও হয়তো অনেকটা তুলে ধরতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম ঃ 'একসঙ্গে যোগ দিই, সেই যোগ'।

এ রচনাবলীতে প্রথম খণ্ডে সুবোধবাবুর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। এটা কেন জানি না বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে—এর কভার এঁকেছিলেন, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। সুবোধবাবু যে সময় 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন তখনই পাঠকেরা বুঝে গিয়েছিল, শুধু 'ফসিল' বা 'অযান্ত্রিকে'র মতো অসাধারণ ছোট গল্প নয়, একটি নতুন স্বাদের উপন্যাস রচয়িতা এক বলিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব ঘটলো। সেই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র—যা তিনি এই উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন—তা পরবর্তীকালের পুস্তকাকারে বের হবার সময় একটা সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকাশককে কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছিলেন—এই বই প্রকাশ করলে তাকে জেলে যেতে হবে।

সুবোধবাবু তখন অসুস্থ, হাসপাতালে। তিনি প্রকাশককে আমার কাছে পাঠালেন। আমি বললাম—আপনি অনায়াসে প্রকাশক হিসেবে আমার নাম দিতে পারেন। আমি জেলখাটা লোক, জেলে যেতে আপত্তি নেই।

তাই হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসেবে আমার নামই ছেপে বের হয়েছিল। অবশ্য আমাকে শেষ পর্যন্ত তার জন্য জেল খাটতে হয়নি।

১৯৪০ সালের পয়লা জানুয়ারি আমি আর সুবোধবাবু একই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই।...তার আগে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরিডারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, আর আমি ছিলাম যুগান্তর পত্রিকার একজন জুনিয়র সাব-এডিটর। আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে মন্মথনাথ সান্যালের তিনি ছিলেন সহকারী আর আমাকে যোগ দিতে হল দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সেই সময় বর্মন স্ট্রীটের পূর্ব দিকে দোতলায় একটি ঘরেই ছিল দেশ ও আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় দফতর।

আমরা একই ঘরে বসে এই দুই পত্রিকার সাহিত্য সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিলাম। সুবোধবাবুকে সে সময় যেভাবে দেখেছিলাম, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিরিশের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দেখে মনে হয় এখনও যেন যৌবনে পা দেননি। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তিনি, যাকে বলা যায় রোমান্টিক পুরুষ। কথা তিনি খুবই কম বলতেন। সব সময় দেখতাম, ডাকে আসা পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে পড়ায় মগ্ন হয়ে আছেন। কখনও বিভাগীয় সম্পাদকের নির্দেশে তিনি সেই পাণ্ডুলিপি সংশোধনে নিমগ্ন থাকতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হত, এ মানুষটি বোধহয় খুবই অভিমানী ও গম্ভীর। কিন্তু দিনের পর দিন একঘরে বসে কাজ করতে করতে যখন মধুরভাষী মানুষটির হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার সুযোগ ঘটল, তখন দেখলাম যে, মানুষটি আসলে নীরব, নিরহঙ্কার, মধুরভাষী। যাকে বলা যায় অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এক আড্ডাবাজ মানুষ।

আমাদের চাকুরী জীবন শুরু একই সঙ্গে। মারকাস স্কোয়ারের সংলগ্ন মারকাস বোর্ডিং-এ একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটি ঘরে আমাদের প্রাকবিবাহ যুগের বেশ কয়েকটি বছর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশে কেটেছে। সেই সময় সুবোধবাবুকে নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানবার নানা সুযোগ আমার ঘটেছিল।

ওঁর চরিত্রের একটি গুণ যা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে, তা হলো বাঙালী হয়েও 'বাঙালীয়ানা'র কোন ছাপ তাঁর মধ্যে সচরাচর দেখা যেত না। তার একটা কারণ তিনি বাংলাদেশের বাইরে মানুষ হয়েছিলেন। হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃঢ়তার প্রভাব তাঁর চরিত্রেও ছিল।...

সুবোধবাবু বাংলা সাহিত্যকে যে একটি উজ্জ্বলরত্ন দিয়েছেন, সেই 'ভারত প্রেমকথা' 'দেশ'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'শতকিয়া'। অন্য স্বাদের উপন্যাস। তাছাড়া ওঁর বহু গল্প—যা এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে—তার মধ্যে অনেকগুলোই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছে। তাঁর অন্যত্র প্রকাশিত রচনাগুলিও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন মর্যাদা পাবে।

সুবোধবাবুর একটি গল্পসংকলন 'গল্প মণিঘর' শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল ও আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ 'ভ্রাতৃপ্রতিম দুই বন্ধু—করকমলেষু...।'

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা একই প্রতিষ্ঠানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এসেছি। আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল অটুট বন্ধুত্বের, প্রগাঢ় সহমর্মিতার। আমাদের দুজনের ভাগ্য ছিল এক সুতোতেই গাঁথা। তাঁর মৃত্যুতে সেই সুতো ছিঁড়ে গেল। গেল কি? সত্যি?

সম্পাদকের কথা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শংকর লিখেছেন ঃ

'পঞ্চাশ দশকে যখন আমার সাহিত্য ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত প্রবেশ তখন সুবোধ ঘোষ খ্যাতির মধ্যগগনে। চল্লিশ দশকের যে বিস্ময় সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্য গগনে তার উদয় তার রেশ কিছুটা কেটেছে, কিন্তু বিপুল পাঠক সমাজের কৌতূহলের অভাব নেই। সকলের মুখে তখন এক প্রশ্ন, তিনি আরও বেশি লেখেন না কেন? সুবোধ ঘোষ তার উত্তর দিতেন না, কিন্তু সাহিত্য কর্মের সঙ্গে যাঁরা কিছুটা যুক্ত তাঁরা সহজেই বুঝতে পারতেন, সুবোধ ঘোষ যে ধরনের গল্প লেখেন, তা বেশি লেখা যায় না, প্রতিটা গল্পের পেছনে থাকে গভীর চিন্তার অদৃশ্য ভিত্তিভূমি।'

সুবোধ ঘোষের রচনা সমগ্র সম্পাদনার সময় আমরা এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। সত্যি, বেশি লেখেন নি তিনি। তিরিশ-বত্রিশটি উপন্যাস, তার মধ্যে আয়তনে বৃহৎ মাত্র তিন-চারটি (ত্রিযামা, শতকিয়া ও জিয়াভরলি), আর বাকীগুলি মাঝারি, কতগুলি তো ছোট উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে—যেমন সুজাতা, বর্ণালী, মুক্তিপ্রিয়া, কান্তিধারা, ছায়াবৃতা প্রভৃতি।

গল্পের সংখ্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) সেই অযান্ত্রিক, ফসিল থেকে শুরু করে সিরিয়াস আলোড়নকারী গল্প থেকে জীবন বিচিত্রার বহু দিক, ব্যক্তি ও মানসিকতা নিয়ে কাহিনীর মধ্য দিয়ে হাল্কা মিষ্টি প্রেমের গল্প—যার সংখ্যা প্রায় ১৬০।

(খ) ভারত প্রেমকথা—২০

(গ) কিংবদন্তীর দেশে—৩১

(ঘ) পুতুলের চিঠি—৮

(ঙ) ক্যাকটাস (জীবজগৎ পশু-পাখি-অরণ্য)—১৪

তাই যার মাত্র তিরিশটা উপন্যাস ও আড়াইশোর কম গল্প (পেশাগত সাহিত্যিক জীবন মধ্য চল্লিশ দশক থেকে সত্তর দশকে শেষ, অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছর। তাও একটানা নয়—হঠাৎ হঠাৎ কলম থেমে গেছে—বিশেষ করে জীবনের শেষ অধ্যায়ে) তিনি অবশ্যই পরিমাণের দিক দিয়ে বেশি লেখেননি (তাঁকে ঠিক prolific writer বলা যায় না সেই অর্থে)—যার জন্য গণিতের দিক থেকে বিচার করে তাঁর সমগ্র রচনা বর্তমান বিজ্ঞানের মুদ্রণ যন্ত্রে ৬০০০ পাতার মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধ করা সম্ভব। এবং এর মধ্যে অবশ্যই তাঁর বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ, রম্যরচনা এবং একটি গীতিনাট্যকেও ধরা হয়েছে।

তাই আমরা হয়তো দশটি খণ্ডের মধ্যে তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক ফসলকে গোলায় ভরে ফেলতে পারব, যা অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় অনেক কম—পূর্বসূরী তারাশংকর-বিভূতিভূষণ—সমসাময়িক বিমল মিত্র বা উত্তরসূরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—যেই হোক না কেন। শংকর সুবোধ ঘোষকে মহৎ স্রষ্টাদের পূর্ণকুম্ভ মেলায় 'নিজস্ব মহিমা' নিয়ে বিরাজ করার কথা বলেছেন। তাঁর জীবনসংগ্রামও বড় বিস্ময় জাগানো জীবন কথা, কিছু লিখিত, কিছু লোকমুখে শোনা যায়। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নানা বিষয়ে গবেষণামূলক রচনা লিখেছেন তিনি, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। প্রধানত ছোটগল্প লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তাঁর কলম দিয়েই বেরিয়েছে বিভিন্ন বই যার বিষয় মনস্তত্ত্ব (ফ্রয়েড), কারুশিল্প (শিল্পভাবনা/রঙ্গবল্লী),

আদিবাসী সমাজ, সামরিক বিজ্ঞান, গান্ধীজীবনী, নৃতত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানের কথা। বিচিত্রপথে যাওয়া তাঁর রচনার এই 'সর্বত্রগামী' দিকটা বহুলাংশে অজানা বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই বোধ হয় চিন্তামণি কর মন্তব্য করেছেন ঃ 'গল্প উপন্যাস পুরাকাহিনী প্রভৃতি লেখার জন্য এই লেখকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুবিদিত থাকলেও নাট্য, সংগীত, পুরাতত্ত্ব, রূপকথা সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক ও গভীর পরিজ্ঞানসম্ভূত প্রবন্ধগুলি বহুজনের প্রায় অজানা ছিল।'

পঞ্চম খণ্ডে তিনটি উপন্যাস স্থান পেয়েছে–শুন বরনারী, ভিতর দুয়ার ও রূপসাগর। এর মধ্যে শুন বরনারী একটি চলচিত্র সফল উপন্যাস, যাতে নায়ক চরিত্রে উত্তমকুমার অভিনয় করেছিলেন। সম্প্রতি এটি ওড়িয়া ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বলে রাখা ভাল, নানা কারণেই আমরা প্রথাগত সন-তারিখ বা কালক্রম অনুযায়ী খণ্ডগুলোকে সাজাইনি। আমাদের উদ্দেশ্য প্রতিটি খণ্ড যেন একেকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহুবিচিত্রা হয়ে ওঠে। তাই পঞ্চম খণ্ডে আছে তিনটি উপন্যাস, তেরোটি সামাজিক গল্প এবং 'ভারত প্রেমকথা' থেকে দুটি, 'কিম্বদন্তীর দেশে' থেকে চারটি গল্প। এর সঙ্গে রয়েছে পাঁচটি রম্যরচনা ('সাত পাঁচ' থেকে) এবং পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ।

অল্পকথায়, এই রচনা সমগ্র সম্পাদনায় আমরা চেয়েছি প্রতিটি খণ্ডে সুবোধ-প্রতিভার 'কামিনী-কাঞ্চন' যোগ হোক (বলা বাহুল্য—বিশেষণটি এখানে রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্যের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে বলা হয়েছে)। কালপঞ্জি বা অ্যাকাডেমিক পাঠক্রম হিসাবে সাজালে পরিবেশন রসলাভের দিক থেকে ততটা সার্থক হতো না বলে আমাদের মনে হয়েছে। পাঠকরা এটাই বিচার করবেন।

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়নটা আমাদের কাছে সম্পাদনার মানদণ্ড স্থির করতে সাহায্য করেছে ঃ 'তিনি (সুবোধ ঘোষ) সাহিত্য করেছেন। শতকরা একশোভাগ সাহিত্য।...আছে সচেতন বিদ্রোহ, সেই কারণে তিনি এক ভিন্ন নামের নদী। স্রোত কম, অবগাহনে তৃপ্তি।...সব্যসাচী, অজাতশত্রু!'

মহাশ্বেতা দেবী বলেন, 'যে লেখক পরুষ, রুক্ষ ঋজুতা থেকে সহজ সাবলীল মিষ্টিলেখা —তা থেকে সংস্কৃত কাব্যের মতো অলংকার ঝংকৃত বাংলায় এমন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন, তিনিই সুবোধ ঘোষ'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন—'ছাত্র বয়সে 'দেশ' পত্রিকা পেলেই দুজনের গল্প আগে পড়ে ফেলতাম—পরশুরাম ও সুবোধ ঘোষ। বাংলার ছোট গল্পের সেই স্বর্ণযুগে কারুর সঙ্গে কারুর তুলনা চলে না। তবু এক একজন লেখক সম্পর্কে কিছু কিছু পাঠকের পক্ষপাতিত্ব থাকেই। আমার পক্ষপাতিত্ব ছিল সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে'—যাকে ব্যক্তিজীবনে তাঁর 'দূর থেকে দেখা'।

সন্তোষকুমার ঘোষ একটি রচনার শীর্ষনাম দিয়েছিলেন—'যে বনস্পতির নাম সুবোধ ঘোষ।'

সমরেশ মজুমদার প্রশ্ন করেছেন নিজেকেই—'এখনও নিজের লেখার পাশে ওঁর লেখা রেখে দেখতে গেলেই লজ্জা পাই.....ইনি অবশ্যই আমার পূর্বসূরী, কিন্তু আমি, আমরা কতটা উত্তরসূরী?'

আশাপূর্ণা দেবী মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন ঃ 'তিনি এলেন, দিলেন, জয় করলেন', এই 'দিলেন' শব্দটা লেখিকার তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন—শেক্সপীয়ারের নাটকের বিখ্যাত উক্তি 'vidi'-র (দেখলাম-এর) পরিবর্তে।

সম্পাদনা করতে করতে সম্পাদক হিসেবেই কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন মনে জাগে। বোধ হয় এই ধরনের প্রশ্ন পাঠকদের হয়েই আমরা উপস্থাপনা করতে পারি। সবচেয়ে ভাল, একটি জিজ্ঞাসা আমাদের ভাষায় না বলে, এক প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থার জ্যাকেটে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচিতির উল্লেখ করলেই পরিষ্কার হতে পারে। তাঁরা লিখেছেন ঃ

'...প্রথম গল্প অযান্ত্রিক। বন্ধুদের অনুরোধে লেখা, এরপর ফসিল। বাংলা সাহিত্যে বিস্ফোরণ জাগিয়ে আবির্ভাব। বহু গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত। আনন্দ পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক। এছাড়া অন্য পুরস্কার পাননি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের মতোই বিস্ময়কর এই ঘটনা।'...

সম্পাদনার কাজ করতে করতে যখন মহাশ্বেতা দেবীর কথা স্মরণ বিশেষ ভাবে করছি ('আবার হব মুগ্ধ'), তখন এই 'বিস্ময়কর ঘটনাটা' পাঠকের দৃষ্টিতে একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন থেকে গেছে বলে মনে হয়েছে। রচনা সমগ্রের "সম্পাদকের কথা"য় তাই তার উল্লেখ বা পুনঃ-উল্লেখ। উত্তরের জন্য নয়, আক্ষেপ হিসেবে নয়,—শুধু সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রশ্নটিকে স্থায়ী স্থানদানের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মকে এই বিষয়ে সতর্ক করার দায় অনুভব করেছি আমরা।

তাই বোধ হয় শংকরের দুঃসাহসী মন্তব্য ঃ 'অনেকের কীর্তন গাইবার দল থাকে, সুবোধ ঘোষের (সেসব) কিছুই নেই।'

উত্তম ঘোষ
সমীরকুমার নাথ

উপন্যাস

শুন বরনারী

ছোটো এক টুকরো কাঠের উপর বাংলা হরফে লেখা একটা নাম—ডাক্তার হিমাদ্রিশেখর দত্ত (হোমিও)। গিরিডির লোহাপুলের পূবদিকের সরু রাস্তাটার ধারে কোনো বাড়ির দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে ঐ নামটা আজও আঁটা আছে কিনা জানি না। থাকলেও, এতদিনে নামটা নিশ্চয় পচা কাঠের ছাতা লেগে পচে গিয়েছে, কিংবা পুরানো কাঠের ঘুণের কামড়ে ঝিরঝিরে হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, আজ থেকে দশ বছর আগে ঐ নামের ফলক স্মরণ করিয়ে দিত যে, ঐ নামের আড়ালে একটা মানুষ আছে। কে না চেনে তাকে?

নামটা শব্দের ভারে বেশ ভারিক্কি বটে, কিন্তু মানুষটা একেবারে হাল্‌কা। লোকেও এত বড়ো একটা নাম উচ্চারণ করবার কষ্ট স্বীকার করে না। লোকের মুখে নামটাও কাটছাঁট হয়ে বেশ হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে। লোকে বলে, হিমু দত্ত হোমিও। কেউ কেউ আরও সংক্ষেপে সেরে দেয়, হোমিও হিমু। প্রবীণেরা অবশ্য শুধু হিমু বলেই ডাকেন। কারণ, হোমিও হিমুর বয়সটাও হাল্‌কা। প্রবীণদের কলেজে-পড়া ছেলেদের চেয়ে বয়সে বড়ো জোর পাঁচ বছর বেশী হতে পারে হিমু। তার বেশি কখনই নয়। কম বয়সের ছেলেরা আর মেয়েরা নিজেদের মধ্যে আলাপের সময় হোমিও হিমু বললেও হিমাদ্রিশেখর দত্তকে কোনো কথা বলবার সময় হিমুদা বলেই ডাক দেয়।

সব শহরের মতো এই গিরিডিতেও লোকের ঘরে বিশেষ এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অমুকের অমুক জায়গা যাবার দরকার হয়েছে। তাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, কারণ তার পক্ষে একা যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পৌঁছে দেবে কে? সঙ্গে যাবে কে?

এ ধরনের সমস্যার সমাধানে সহায় হতে হিমু দত্তের মনে কোনো আপত্তি নেই! আপত্তি দূরে থাকুক, বরং অদ্ভুত একটা আগ্রহের বাড়াবাড়ি আছে বলতে হবে। যে কোনো পরিবারের এ ধরনের কাজের দরকারে হিমুকে একবার ডাক দিলেই হয়, আর অনুরোধটা একবার করে ফেললেই হয়। তখনি রাজি হয়ে যায় হিমু দত্ত।

গত বছরে পৌষ-সংক্রান্তির সময় সমস্যায় পড়েছিলেন পরেশবাবু। পিসিমা গঙ্গাসাগর যাবার জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছেন। থুড়থুড়ে বুড়ো মানুষ, এই পিসিমাকে নিরাপদে গঙ্গাসাগর নিয়ে যাওয়া আর নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কি সহজ কাজ? যে-সে মানুষের পক্ষে একাজ সাধ্যই নয়। চারটিখানি দায়িত্বের কথাও নয়। পরেশবাবুর নিজেরই সাহস হয় না, এমন কি অমন হট্টাকট্টা ভাগ্নে বাবাজী বড়ো-খোকনের উপরেও এমন কাজে নির্ভর করবার সাহস হয় না। খায় দায় ও কসরৎ করে, আর যখন তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় ; এরকম আয়েসী কুঁড়ে আর ঘুমকাতুরে ছেলে বড়ো-খোকন কি পিসিমাকে গঙ্গাসাগর দেখিয়ে আনবার ঝুঁকি নিতে পারে না, না ওকে ঝুঁকি নিতে দেওয়া যায়?

তবে পিসিমাকে নিয়ে যাবে কে? এ-পাড়া আর ও-পাড়ার অনেক ছেলের কথাই মনে পড়ে, যাদের জীবনে কোনো কাজের তাড়াই নেই। তাস খেলে, থিয়েটার করে আর খবরের কাগজের খেলার রিপোর্ট পড়ে সকাল-সন্ধ্যা তর্ক করে। এহেন কোনো ছেলের হাতে পিসিমাকে গঙ্গাসাগর দেখিয়ে আনবার দায় সঁপে দিতে সাহস হয় না। প্রথম কারণ, ওদের কেউ রাজিই হবে না। দ্বিতীয় কারণ, ওদের বুদ্ধিসুদ্ধিকে ভরসা করাও যায় না। কে জানে, হয়তো পিসিমাকে কলকাতার কোনো হোটেলে ফেলে রেখে দিয়ে ময়দানের দিকে কিংবা সিনেমা হাউসের দিকে দৌড় দেবে। অভয়, ভুলু, নীহার বা রমেশ, কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। অগত্যা হিমু দত্তকেই ডাকতে হয়েছিল। এবং হিমু দত্তও পিসিমাকে নিরাপদে গঙ্গাসাগরে নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে ধরে স্নান করিয়ে, এমনকি পিসিমাকে নিয়ে কপিলমুনির পূজো পর্যন্ত

করিয়ে, গিরিডিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। পিসিমার থুড়থুড়ে শরীরটা একটুও হাঁপায়নি, একটুও ক্লান্ত হয়নি। পিসিমা নিজেই একগাল হেসে বলে ফেললেন, আহা! হিমুর মতো এমন ভাল ছেলে আমি জীবনে দেখিনি পরেশ। আমাকে কোলে ক'রে গাড়িতে তুলেছে, গাড়ি থেকে নামিয়েছে। আমার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি পরেশ।

শুধু তাই নয়। গঙ্গাসাগর যাওয়া আর আসার খরচের যে হিসাব দিল হিমু দত্ত, সে হিসাব দেখে পরেশবাবুও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ছি—ছি, তুমি একি কাণ্ড করেছ হিমু? তোমাকে এতটা কষ্ট সহ্য করতে আমি বলিনি।

অনুযোগ করলেন পরেশবাবু। কারণ পাই-পয়সা পর্যন্ত মিল ক'রে পথের খরচের যে হিসাব দিল হিমু দত্ত, তাতে দেখা গেল যে, সাতদিনের মধ্যে হিমু দত্তের নিজের খাওয়া বাবদ মাত্র তিন টাকা খরচ হয়েছে।

হিমু দত্ত নিজেও এক গাল হেসে বলতে থাকে।—আমি হেলথ্ সম্পর্কে খুব সাবধান থাকি বড়দা। কলকাতা থেকে দু'সের চিনি আর তিন সের চিঁড়ে কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাস, তাতেই আমার খোরাক হয়ে গিয়েছে। আমি মেলার কোনো খাবারই ছুঁইনি। পিসিমা বরং দই-টই খেয়েছেন। আমার বেশ ভয়ই হয়েছিল বড়দা, দই-এর লোভে পিসিমা শেষে একটা কাণ্ড না করে বসেন। ভাগ্যি ভাল, দইটা ভাল ছিল, পিসিমার শরীরে সয়ে গিয়েছিল।

পরেশবাবুর পিসিমাকে গঙ্গাসাগর দেখিয়ে আনবার পর হিমু দত্তকে যেন নতুন ক'রে চিনতে পারলেন পরেশবাবু। শুধু পরেশবাবু কেন, অনেকেই ; তারপর প্রায় সবাই।

একেবারে মাটির মানুষ, অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির ছেলে হিমু দত্ত। পরেশবাবু একদিন ক্লাবে বসে ননীবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে বলেই ফেললেন—হিমুর মতো গুড-নেচার্ড ছেলের হাতে যে-কোনো দায়িত্ব অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারা যায়। ওর হাতে ক্যাশবাক্সের চাবিও ছেড়ে দেওয়া যায়। পাই-পয়সার এদিক-ওদিক হবে না।

ননীবাবু বলেন—তাহ'লে হিমুকেই ডেকে কাজের ভারটা চাপিয়ে দিই, কি বলেন, না?

—নিশ্চয় নিশ্চয়! মাথা নেড়ে প্রস্তাবটা সমর্থন করেন পরেশবাবু। এবং আর দুদিন পরেই দেখা গেল, ননীবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্য জিনিস কিনতে কলকাতায় চলে গেল হিমু দত্ত। বাসনপত্র, অলঙ্কার, কাপড়-চোপড় আর শয্যাদ্রব্য, সবশুদ্ধ প্রায় তিন হাজার টাকার বাজার করবার দায়িত্ব অনায়াসে হিমু দত্তের উপর ছেড়ে দিলেন ননীবাবু। সব সামগ্রী নিয়ে দুদিন পরে যখন ফিরে এল হিমু দত্ত, তখন সবচেয়ে আগে খুশি হয়ে আর আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ননীবাবুর স্ত্রী—হিমুর পছন্দ আছে বলতে হবে! কী সুন্দর ডিজাইনের গয়না! তোমার চোখ আছে, রুচি আছে হিমু! আমি নিজে কলকাতা গেলেও এরকম পছন্দ করে সুন্দর জিনিস কিনতে পারতাম না।

পাই পয়সা মিলিয়ে হিসাবও দিয়ে দিল হিমু। ননীবাবু আশ্চর্য হয়ে বলেন—একি হিমু, তোমার খাওয়া দাওয়ার কোনো খরচ নেই কেন?

হিমু হাসে—খরচ হয়নি। আমার ছেলেবেলার বন্ধু কানাই-এর সঙ্গে ট্রেনে দেখা হয়ে গেল। কলকাতাতে কানাইদের বাড়িতেই ছিলাম। কাজেই...

ননীবাবু বলেন—যাই হোক, তোমার হাতখরচ বাবদ যদি দশটা টাকা তুমি রাখতে, তাহলে ভালই হতো হিমু।

হিমু আরও লজ্জিত হয়ে হাসে—কি যে বলেন মেশোমশাই!

ননীবাবুর স্ত্রী এবার ননীবাবুরই মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—ছি, ছি। তুমি হিমুকে কি পেয়েছ ; কি বলছ তুমি?

ননীবাবু—কেন? অন্যায় কিছু বলছি কি?

ননীবাবুর স্ত্রী বলেন—হিমু কি তোমার মতো ইনসপেক্টর যে টুরে বের হয়ে ব্রাঞ্চ

অফিসের বাবুদের বাড়িতেই দুবেলা চব্য-চোষ্য গিলবে, আর কোম্পানির কাছে খোরাকী বাবদ বিশ টাকা বিল দাখিল করবে?

ননীবাবু ভ্রূকুটি করেন—তুমি আবার হঠাৎ এসব আবোল তাবোল কথা তুলে...

হিমু দত্তই এইবার ননীবাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে অনুযোগ করে—ছিঃ, আপনি এসব কি বলছেন মাসিমা।

শহর থেকে দূরে যাবার কাজ পড়লেই, একদিন বা দুদিনের জন্য বাইরে যাবার দরকার পড়লেই হিমু দত্তের কথা সবারই মনে পড়ে।

ননীবাবুর এই মেয়ের বিয়েতে জামালপুরে গিয়ে বরের বাড়িতে অধিবাসের তত্ত্ব পৌঁছে দেবার দায়িত্ব হিমু দত্তকেই বহন করতে হয়েছিল। অধিবাসের জিনিস দেখে বরের বাড়িতে মেয়েরা নাক কুঁচকেছিল, অনেক কটু কথাও শুনিয়েছিল। সব শুনেছিল হিমু দত্ত, কিন্তু এই সামান্য কথাটাও বলতে পারেনি যে, আমাকে এসব কথা শুনিয়ে লাভ কি? আমি মেয়ের বাড়ির কেউ নই।

এই অপমান সহ্য করবার দায়িত্বটাও অনায়াসে পালন করতে পেরেছিল হিমু দত্ত। বরের বাড়ির মন্তব্যগুলিকে তুচ্ছ করতে পারেনি হিমু দত্ত। ননীবাবুর অপমানকে পরের অপমান বলেও মনে করতে পারেনি। অদ্ভুত এই হিমু দত্তের মন ; বরং সেই অপমানকে যেন ভালো করে গায়ে মেখে, যেন ননীবাবুর মেয়ের দাদাটির মতো ভীরু হয়ে কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে বরের মায়ের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়েছিল হিমু দত্ত—ত্রুটি হয়েছে স্বীকার করছি, নিজগুণে মার্জনা করুন।

ননীবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর, অনেকদিন পরে এই ঘটনার কথা জানতে পেরেছিলেন ননীবাবু ও তাঁর স্ত্রী। হিমু দত্ত বলেনি। বরং বরের বাড়ির চাল-চলন আচার-ব্যবহারের অনেক প্রশংসা করে ছিল হিমু—চমৎকার ভদ্রলোক ওঁরা।

ননীবাবুর মেয়ে নিজেই যেদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রথম বাপের বাড়ি এল, সেদিন মেয়ের মুখ থেকেই ঘটনার কথা জানতে পেরেছিলেন ননীবাবু ও তাঁর স্ত্রী। খুব বেশি আশ্চর্য হয়েছিলেন দুজনেই, হিমু দত্তের মনটা কি মানুষের মন? মানুষ এত ভালও হয়? পরের জন্য মানুষ এতটা সহ্যও করে!

হিমুকে ডেকে ননীবাবু হিমুর উপর বেশ রাগ করে বলেছিলেন—ওসব কথা সহ্য করা তোমার খুবই ভুল হয়েছে হিমু, ওদের মুখের উপর শক্ত করে দু'চারটে কথা, তোমারও বলে দেওয়া উচিত ছিল। তাতে যদি বিয়ে ভেঙে যেত, তবে যেত, আমি কোনো পরোয়া করতাম না।

চোখের ছানি অপারেশন করবার জন্য পাটনা যাবার কথা ভেবে যেদিন দুশ্চিন্তা করেছিলেন অনাথবাবু, সেদিন অনাথবাবুর ছেলে মণ্টুই অনাথবাবুকে মনে পড়িয়ে দিল—ভাবছো কেন বাবা?

অনাথবাবু—ভাবতে হচ্ছে রে মণ্টু। আসানসোলে হারুকে লিখেছিলাম ; কিন্তু হারু জানিয়েছে, এখন ছুটি পাবে না। আসতেই পারবে না। হারুর এখন ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা।

মণ্টু বলে—হিমুদাকে একবার বললেই তো...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! মণ্টুর মা'ও খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।—হিমু থাকতে ভাবনা করছো কেন?

অনাথবাবুরও মনে পড়ে যায়, ঐ হিমুই যে গত মাসে নিত্যানন্দবাবুর ছেলেটার কার্বঙ্কল অপারেশন করাবার জন্য ছেলেটাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। নিত্যানন্দবাবু নিজে বাতের ব্যথায় অনড় হয়ে ঘরে পড়ে আছেন। বাড়িতে দ্বিতীয় একটা মানুষ নেই যে ছেলেটাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারে। একটা কার্বঙ্কল রুগীকে ভালভাবে নিয়ে যাওয়াও তো যা-তা কাজ নয়। তা ছাড়া অনেক কারণ আছে, যে-জন্য নিত্যানন্দবাবুর মেজ শ্যালক মশাই এত

কাছে, ঐ জগদীশপুরে থাকতেও এই দায়িত্বটা নিতে রাজি হলেন না। নিজের শরীরের অসুখের ছুতো ক'রে কাজের দায় এড়িয়ে গেলেন। কে জানে, অপারেশনের পর কি হবে পরিণাম? ছেলেটা যদি মরে যায়? যদি নিয়ে যাবার পথেই ছেলেটার মরণ-টরণ হয়ে যায়, তবে? তবে ছেলের বাপ-মা'র সন্দেহ অভিশাপ আর খোঁটা যে সারা জীবন ধরে সহ্য করতে হবে। এ ধরনের ভয়ানক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।

নিত্যানন্দবাবুর কাছেই শুনেছিলেন অনাথবাবু—হিমু না থাকলে আমার ছেলেটা মরেই যেত অনাথবাবু। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, হিমু এই ভয়ানক দায়িত্ব নিতে রাজি হবে। কিন্তু, কি আশ্চর্য, একবার অনুরোধ করা মাত্র হিমু রাজি হয়ে গেল। আরও কি কাণ্ড করেছিল হিমু, জানেন?

—কি কাণ্ড?

—অদ্ভুত রেসপন্‌সিবিলিটি বোধ! হাসপাতালের ডাক্তারদের ধরাধরি করে স্পেশ্যাল পারমিশন নিয়ে দশটা দিন হাসপাতালেরই ওয়ার্ডের বারান্দায় কম্বল পেতে একটা ঠাঁই করে নিয়েছিল হিমু। ছেলেটার কাছ থেকে একঘণ্টার জন্যেও দূরে সরে থাকতে পারেনি।

অনাথবাবুর আহ্বান, একটা অন্ধ মানুষকে পাটনা পর্যন্ত নিয়ে যাবার আহ্বান! তার মানে সব সময় অনাথবাবুকে হাত ধরে ওঠাতে বসাতে আর চলাতে হবে। মণ্টুর মা কেঁদেই ফেলেছিলেন।—তুমি পারবে তো হিমু?

হিমু বলে—পারি কিনা দেখতেই পাবেন।

মণ্টুর মা-ও সঙ্গে ছিলেন, এবং গিরিডি থেকে পাটনা পর্যন্ত সারাটা পথ যেতে যেতে স্বচক্ষেই দেখতে পেয়েছিলেন, হিমু নামে এই ছেলেটা পরের জন্য, অকারণ এবং কোনো উপকার আশা না করে, একটা পয়সা না ছুঁয়েও কি করতে পারে।

ঘন ঘন সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে অনাথবাবুর। মণ্টুর মা নিজেই দেখলেন, যতবার সিগারেট খেলেন অনাথবাবু, ততবার হিমুই দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাতে সাহায্য করলো। হিমুই অনাথবাবুকে সাবধান করে দেয়—খবরদার জেঠামশাই, নিজে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করবেন না। মুখে ছেঁকা লেগে যাবে। যখনই দরকার হবে, আমাকে বলবেন।

হিমু দত্তেরই-বা এত সময় হয় কি করে? ওর জীবনটা কি একটা অফুরান অবসরের, কিংবা খাওয়া-পরার ভাবনা থেকে মুক্ত একটা নিরুদ্বিগ্ন কর্মহীন জীবন? দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে ছোটো কাঠের ফলকে ওর একটা কাজের পরিচয়ও যে লেখা আছে। ডাক্তার, ডাক্তার হিমাদ্রিশেখর দত্ত। কিন্তু ডাক্তারি করে কখন? কেউ কি আজ পর্যন্ত হিমু দত্তকে কোনোদিন ডাক্তারী করতে দেখেছে? হিমু দত্তের ঘরের ভিতর একটা তক্তাপোষের উপর হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটা বাক্স অবশ্য আছে, চিকিৎসার একটা বইও আছে। এই দুই জিনিস অনেকেরই চোখে পড়েছে। কিন্তু রোগী দেখছে হিমু দত্ত কিংবা রোগীকে ওষুধ দিচ্ছে হিমু দত্ত, এমন দৃশ্য আজ পর্যন্ত কারও চোখে পড়েনি।

কে না জানে, চার বাড়িতে ছেলে পড়ায় হিমু দত্ত। সকাল বেলা দু'বাড়ি, সন্ধ্যেবেলা দু'বাড়ি। হিমু দত্তের বিদ্যের জোর কত আর কেমন, এ প্রশ্নও কেউ করেনি। হিমু দত্ত যাদের পড়ায়, তাদের বয়স চার-পাঁচ বছরের বেশি নয়, বিদ্যে নামে কোনো বস্তুই যাদের মনে মাথায় বা চোখের চাহনিতে নেই। ছেলে-মেয়েদের বয়স যখন সাত-আট হয়, এবং ছেলে-মেয়েদের বিদ্যে শেখাবার জন্য বাপ-মায়েরা যখন সত্যিই সিরিয়াস হন, তখন শুধু হিমু দত্তকে ছাড়িয়ে দিয়ে একটু ভাল শিক্ষিত মাস্টার রাখবার কথা মনে পড়ে। হিমু দত্তকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেজন্য হিমু দত্তের মনে কোনো দুঃখ নেই। কারণ, সেইদিনই অন্য এক বাড়িতে একেবারে বিদ্যাশূন্য এবং শুধু হাতে খড়িতে অভিজ্ঞ চার-পাঁচ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েকে পড়াবার নতুন একটা কাজ পেয়ে যায় হিমু দত্ত।

তাছাড়া, হিমু দত্ত সত্যিই পড়ায় কিনা, সেটুকু খোঁজ রাখার দরকার যেন কোনো বাপ-মা অনুভব করেন না। ছেলে-মেয়ে কটা নতুন বানান শিখলো, এবং দু-এর ঘর নামতাটুকু আয়ত্ত করলো কিনা, মাস্টার হিমু দত্তের কাছে এই সামান্যতম দাবীর প্রশ্নও যে কারও নেই। ছেলে-মেয়েগুলো দুটো ঘণ্টা হিমু দত্ত নামে মাস্টারের কাছে চুপ করে বসে থাকে, তাই যথেষ্ট। পড়ার অভ্যাসটা গড়ে উঠছে, এখন এর চেয়ে বেশি আর দরকারই বা কি?

কাঠের ফলকে ডাক্তার কথাটা এত স্পষ্ট করে লেখা থাকলেও হিমুকে কোনোদিন ডাক্তার বলে ভাবতেই পারেনি শহরের মানুষ, বিশেষ করে ভদ্রলোকেরা। বরং হিমু মাস্টার বললে সকলেই বুঝতে পারে, ঐ সেই ছেলেটি, দেখতে মন্দ নয়, স্বভাবটি বড়ো শান্ত, বড়ো কর্মঠ, আর কেমন একটু, অর্থাৎ ঠিক বোকা নয়, একটু বোকা-বোকা। অর্থাৎ খুব বেশি ভালমানুষ হলে যা হয়, তাই।

হিমু দত্তের ডাক্তারীটা কি সত্যিই একেবারে অস্তিত্বহীন একটা কথা মাত্র? ভদ্রলোকেরা জানেন না, কিন্তু বস্তির কেউ-কেউ মুচি পাড়ার অনেকেই এবং শহর থেকে বেশ দূরে কয়েকটা গাঁয়ের তুরী আর দোসাদদের মধ্যে কেউ কেউ জানে, একটা টাকা হাতে তুলে দিলে কোনো আপত্তি না করে হিমাদারি বাবু ডাগদারি করে চলে যাবে। হেঁটেই চলে আসবে ; টাঙ্গা ভাড়া চাইবে না। ওষুধ দিলে বড়ো জোর ছয় আনা দাম চাইবে, তার বেশি নয়।

কিন্তু হোমিও হিমু কোনো রোগীকে সত্যিই ওষুধ খাওয়াবার সুযোগ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। যারা ডাগদারির নামে ভয় পায়, ডাগদারিকে ভয়ানক সন্দেহ করে, যাদের ডাগদারিতে কোনো বিশ্বাস নেই, তারাই শুধু হোমিও হিমুকে ডাক দেয়। ভুগে ভুগে মরণদশার শেষ অধ্যায় পৌঁছে রোগী যখন থেমে থেমে শ্বাস টানে, তখন ডাক পড়ে হোমিও হিমুর। আর, হিমু দত্ত একেবারে তৈরি হয়েই রওনা হয়। পকেটে ওষুধের শিশি থাক বা না থাক, একটি লুঙ্গি আর একটি গামছা সঙ্গে নিয়ে যেতে কখনও ভুলে যায় না হিমু দত্ত। জানে হিমু দত্ত, রোগীর মরা মুখ দেখতে হবে, মৃতের শ্মশানযাত্রা এবং দাহকার্যে একটু আধটু সাহায্য করে এবং একেবারে স্নান সেরে আসতে হবে।

এক বছর আগেও এই গিরিডির কোনো পাড়াতে হিমু দত্তকে ঘুরে বেড়াতে কেউ দেখেনি! কবে হিমু দত্ত এখানে এল, আর লোহার পুলের পুবদিকের ঐ সরু রাস্তার ধারে একটা ঠাঁই করে নিল, তাও কেউ মনে করতে পারে না। কোথা থেকে এসেছে হিমু দত্ত তাও কেউ জানে না।

হিমু দত্ত-একটা হঠাৎ আবির্ভাব। দরজার পাশে ঐ প্রকাণ্ড নামের ফলক দেখে প্রথম প্রথম যারা আশ্চর্য হয়ে খোঁজ নিয়েছিল, তারাও আজকাল আর আশ্চর্য হয় না। মানুষটা নামেই প্রকাণ্ড, কিন্তু জীবনে একেবারে সামান্য। ডাকপিয়নও আশ্চর্য হয়ে যায়। পাড়ার সব মানুষের নামে মাসে অন্তত একটা না একটা চিঠি আসে, কিন্তু হোমিও হিমুর নামে একটাও না। আপনজন বলতে পৃথিবীতে ওর কি কেউ নেই?

আরও আশ্চর্যের কথা, এক বছরের মধ্যে শহরের এতগুলি মানুষের ঘরোয়া জীবনের সঙ্গে এত পরিচিত হয়ে উঠলেও হিমু যেন একটা একঘরে প্রাণীর মতো পড়ে আছে। কেউ একবার জানতেও চেষ্টা করেনি, একটা প্রশ্নও করেনি, তুমি এর আগে কোথায় ছিলে হে হিমু? তোমার দেশ কোথায়? বাপ-মা কোথায় আছেন? সত্যিই আছেন কি? না, বিগত হয়েছেন? ছোটো ভাই-বোন আছে কি? বিয়ে-টিয়ে করে ফেলেছ কি?

কেউ না ; এই এক বছরের মধ্যে হিমু দত্ত কোনো মানুষের কাছ থেকে এতটুকু কৌতূহলও আকর্ষণ করতে পারেনি। হিমু দত্ত শুধু হিমু দত্ত। ভাড়া ঘরে থাকে, আপন ঘর নেই। কিন্তু এ-পাড়া আর ও-পাড়ার সব ঘরই যেন ওর ঘর। কেউ একবার ডেকে একটা

কথা বললেই হিমুর মুখের ভাষার সেই ব্যক্তি সেই মুহূর্তে একটা না একটা আপনজন গোছের মানুষ হয়ে যায়। হয় কাকাবাবু, মেশোমশাই, জেঠামশাই আর পিসেমশাই, কিংবা মামাবাবু। নয় বড়দা মেজদা সেজদা ও ছোড়দা। ঠাকুমা ও দিদিমা পাতিয়ে ফেলতেও একটুও দেরি হয় না হিমু দত্তের।

ওভার্সিয়ার বাবুর মা হিমু দত্তকে চিনতেন না। পথে দেখা হতে তিনিই একদিন ভুল করে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—তুমি তো আমাদের টুনকির ভাসুরপো?

সেই মুহূর্তে উত্তর দিয়েছিল হিমু দত্ত—না পিসিমা, আমি হিমাদ্রি।

—তুমি বারগণ্ডায় থাক?

—না। আমি ওদিকের ঐ লোহারপুলের দিকে থাকি।

—বলি, তুমি কি গিরিডির ছেলে?

—হ্যাঁ, এখন তো তাই।

—কি আশ্চর্য, হিমাদ্রি টিমাদ্রি নাম তো কখনো শুনিনি।

হিমু দত্ত হাসে—আমি হিমু।

চোখ বড়ো ক'রে হেসে ওঠেন দিদিমা—তাই বল। তুমিই হিমু?

—হ্যাঁ দিদিমা।

—তা হলে আমার একটু কাজ করে দে না ভাই।

—বলুন।

আজ সন্ধ্যায় একবারটি এসে আমাকে মকতপুরে সান্যালদের বাড়িতে কীর্ত্তন শুনিয়ে নিয়ে আসবি? রাত্রিবেলা আমি চোখে বড়ো ঝাপ্সা দেখি রে ভাই, একা পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারি না।

—বেশ, কিন্তু আপনি কোথায় থাকেন দিদিমা?

—ওরে আমি যে হাবুল ওভার্সিয়ারের মা।

—ঠিক আছে।

হ্যাঁ, ঠিক যেমন স্পষ্ট করে কথা দিয়েছিল হিমু, তেমন একেবারে ঠিক সময়ে এসে প্রতিশ্রুতি পালন করে চলে গিয়েছিল।

মকতপুরে সান্যালদের বাড়ি থেকে কীর্ত্তন শুনে বাড়ি ফেরবার পথে দিদিমা অনেক গল্প করলেন।—হাবুলের বাবা বেঁচে থাকলে আজ আর আমাকে হেঁটে চলতে হতো না ভাই। তিনি ছিলেন ঝুমরা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার। কত টাকা রোজগার করলেন, আর দান ক'রে ক'রে ফতুর হলেন। মোটর গাড়িটাকে পর্যন্ত বেচে দিয়ে বাংলাদেশের বন্যার চাঁদা পাঠিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, তবে, এমন কিছু দুঃখের মধ্যে রেখে যাননি। মেয়েদের বড়ো বড়ো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। মেয়েরা আমাকে সাহায্য করে। সুষমা আছে কলকাতায়, ধীরা কানপুরে আর অনিলা এখন পোয়াতি; এদিকে জামাই-এর বদলির অর্ডার হয়েছে। বল দেখি কি বিপত্তি!

দিদিমা তাঁর ঘরোয়া জীবনের কাহিনী শেষ করলেন, যখন ঘরের দরজার কাছে পৌঁছালেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভুলেই গেলেন, হিমু নামে এই মানুষটার ঘরোয়া সুখ দুঃখের কোনো সংবাদ, কোনো পরিচয়। মনেই পড়ে না কারও, হিমু দত্তেরও কোনো দুঃখ থাকতে পারে কিংবা হিমু দত্তেরও জীবনের হয়তো একটা সুখের ইতিহাস আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, হিমু দত্তকে কি সত্যিই একেবারে সুখ-দুঃখের অতীত একটা স্বয়ম্ভু সত্তা বলে মনে করে সবাই?

শহরের জীবনে সারা বছরের মধ্যে অনেক উৎসবও দেখা দেয়। পারিবারিক উৎসব। অমুকের মেয়ের বিয়ে। অমুকের ছেলের বৌ-ভাত কিংবা অমুকের বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভোজের নিমন্ত্রণ। কিন্তু হিমু দত্ত সবারই এত পরিচিত হয়েও কি সব উৎসবে

নিমন্ত্রণ পায়? না। ননীবাবুর মেয়ের বিয়েতে অবশ্যই নিমন্ত্রিত হয়েছিল হিমু দত্ত। এবং মণ্টুর পৈতের সময় অনাথবাবু নিজে হিমু দত্তের ঘরে এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। যাদের কাজের দরকারে হিমু দত্ত খেটেছে, তাদের কোনো উৎসবের দিনে তারা হিমু দত্তকে স্মরণ করতে ভুলে যায় না। কিন্তু তা ছাড়া আর কেউ না। এই তো গত ফাল্গুন মাসে মাইকা মার্চেন্ট রামসদয়বাবু তাঁর মা-এর শ্রাদ্ধের ঘটা দেখাতে গিয়ে গর্ব করেই বলেছিলেন, গিরিডির একটি বাঙ্গালীও নিমন্ত্রণে বাদ পড়বে না। আর এক প্রকাণ্ড লিস্ট ক'রে রামসদয়বাবুর চার ছেলে গিরিডির সব পাড়া ঘুরে প্রত্যেক বাঙ্গালীকে, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিল। এমন কি ডাক বাংলোতে, ধর্মশালাতে আর হোটেলগুলিতেও খোঁজ নেওয়া হয়েছিল, কোনো বাঙ্গালী সেখানে আছে কিনা। যারা ছিল, তারা সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছিল। পোস্টমাস্টার নাগেশ্বরবাবু, যিনি বিহারী কায়স্থ, কিন্তু গৃহিণী হলেন বাঙ্গালী মহিলা, তিনিও নিমন্ত্রিত হলেন। অথচ লোহাপুলের পূর্বদিকে সরু সড়কের ধারে একটি ক্ষুদ্র ঘরের দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে কাঠের ফলকের উপর লেখা এত বড়ো একটা বাঙ্গালী নাম কারও চোখেই পড়লো না। বাদ পড়লো শুধু হোমিও হিমু।

রাগ করেনি হিমু দত্ত। এর জন্য কোনো ক্ষোভ আর কোনো অভিমানে বিচলিত হয়নি হিমু দত্তর মন। সন্দেহ হতে পারে, হিমু দত্ত নিজেকে বাঙ্গালী বলে মনে করে কিনা।

যাই মনে করুক হিমু, কিন্তু হিমু দত্তের স্বভাব আর আচরণ যে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী প্রভেদটুকুর ধার ধারে না, তার প্রমাণও একদিন পাওয়া গেল।

নবলকিশোরবাবু ওকালতি করেন। গোঁড়া সনাতনী মানুষ। অনেকদিন আগে সরদা আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করবেন বলে তৈরি হয়েছিলেন। এ হেন মানুষও এমন এক সমস্যায় পড়লেন, যে সমস্যার সমাধানে তিনি শেষ পর্যন্ত হিমু দত্তকেই স্মরণ করতে বাধ্য হলেন।

নবলকিশোরবাবুর মেয়ে কৃষ্ণা। কৃষ্ণাকে বার বছর বয়সেই বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন নবলকিশোরবাবু, কিন্তু কৃষ্ণার মার কঠোর আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত উৎসাহ হারিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণার লেখাপড়া শেখার চেষ্টাকেও বাধা দিতে পারেননি কৃষ্ণার মার জেদের জন্যই। কৃষ্ণার মার এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শেষে শান্ত হয়ে গেলেন নবলকিশোরবাবু।

কৃষ্ণার বয়স সতর-আঠার, দেখতে বেশ বড়ো-সড়ো, এবং সেটা ভাল স্বাস্থ্যের জন্যই। এই মেয়েকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু দিয়ে আসবে কে?

নবলকিশোরবাবু নিজে যেতে পারবেন না। ট্রেনে চড়লেই তিনি বমি করে ফেলেন। শরীর ভয়ানক অসুস্থ হয়ে যায়। কৃষ্ণার কাকা বা দাদা কেউ গিরিডিতে নেই, নিকটেও নেই। দু'জনেই আর্মড ফোর্সের সার্ভিসে পুনাতে আছে। অতএব?

এক্ষেত্রে কৃষ্ণার মার উদারতাটাও ভয়ানক সাবধান। জুনিয়র উকিল আউধবিহারী নিজেই যেচে নবলকিশোরবাবুর কাছে প্রস্তাব করেছিল, যদি দরকার মনে হয়, তবে আমিই কৃষ্ণাকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। কৃষ্ণার মা বললেন—না।

সম্পর্কে আত্মীয় হয়, ব্রিজমোহনবাবুর ছেলে দেবকীদুলালের কথাও মনে পড়েছিল। না, কৃষ্ণার মা বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আপত্তি করলেন। এবং কৃষ্ণার মা নিজেই একদিন মন্দির থেকে ফিরে এসে নবলকিশোরবাবুর কাছে বললেন—মণ্টুকা মা কহতি হ্যায় কি...

—কি? কেয়া কহতি হ্যায়? প্রশ্ন করেন নবলকিশোরবাবু।

কৃষ্ণার মা বলেন—কহতি হ্যায় কি হিমুকো বোলো। বস্, অউর কুছ সোচনে কা বাত নেহি।

কৃষ্ণাকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আসুক হিমু। হিমুকে ডাকা হোক। হিমু নামে

ছেলেটির মতিগতি সম্বন্ধে কৃষ্ণার মার এই অদ্ভুত নির্ভয় নির্ভরতা আর বিশ্বাসের রকম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন নবলকিশোরবাবু। কিন্তু রাজি হলেন।

কৃষ্ণাকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে হিমু যেদিন ফিরে এসে নবলকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করলো আর যাওয়া আসার খরচের হিসাব দাখিল করলো, সেদিন একেবারে অবাক হয়ে হিমুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নবলকিশোরবাবু। তারপর বলেন—এ বেটা, তু নে কেয়া কিয়া?

হিমু বলে—কি করেছি চাচাজী?

হিসাব দেখে আশ্চর্য হয়েছেন নবলকিশোরবাবু। কৃষ্ণা ট্রেনের ডাইনিংকারে গিয়ে দু'বার খেয়েছে। খরচ পড়েছে ছ'টাকা দশ আনা। আর হিমু যেতে আসতে শুধু চারবার পুরি-তরকারি খেয়েছে, খরচ হয়েছে দেড় টাকা।

নবলকিশোরবাবু—তু বেটা এক পিয়ালি চা ভি নেহি পিয়া?

—আমি চা খাই না চাচাজী।

শান্তিনিকেতন থেকে কৃষ্ণার প্রথম চিঠি পাওয়ার পর নবলকিশোরবাবুর সনাতনী চোখের শেষ সন্দেহের লেসটুকুও যেন প্রচণ্ড খুশির চমক লেগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কৃষ্ণার মা বললেন—অব্ বোলো, অ্যাসা লেড়কা দেখা কভি?

কৃষ্ণা লিখেছে, হিমু ভাইজীকে আমার বহুৎ বহুৎ নমস্কার জানাবে। পথে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। হিমু ভাইজী আমাকে একটুও কষ্ট পেতে দেয়নি। যতবার আমার জল তেষ্টা পেয়েছে, ততবার নিজে ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে গার্ডের কামরা থেকে ভালো জল নিয়ে এসেছে, আমাকে পানিপাঁড়ের হাতের ময়লা জল খেতে দেয়নি।

হিমু দত্ত নামে মানুষটার আত্মা আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা বোধহয় একটা আত্মা মাত্র। না বাঙ্গালী, না বিহারী, না অন্য কিছু। নবলকিশোরবাবু না, কৃষ্ণার মাও না, দু'জনের কেউ মনে করতেই পারেন না যে, হিমু দত্ত বিহারী নয়, বাঙ্গালী।—হিমু তো বিলকুল হিমুহি হ্যায়। নবলকিশোরবাবু আশ্চর্য হয়ে যে অর্থহীন কথাটা বলেন, সেটাই বোধহয় হিমুর সবচেয়ে সার্থক পরিচয়।

কৃষ্ণার মা'র কাছে থেকে গল্পটা, অর্থাৎ কৃষ্ণার চিঠির কথাগুলি শুনতে পেলেন মণ্টুর মা। তারপর আরও অনেকে শুনলেন। হিমুর কাছে বিশ্বাস করে কি না ছেড়ে দেওয়া যায়? নইলে নবলকিশোরবাবুর মতো গোঁড়া মানুষ তাঁর মেয়েকে, কৃষ্ণার মতো একটি সুন্দর আঠার বছর বয়সের মেয়েকে নিশ্চিন্ত মনে হিমুর কাছে ছেড়ে দিতে পারতেন না।

হিমু দত্তের একটা নতুন সুখ্যাতি অনেকেরই মুখের কথায় গুন-গুন করে। বড়ো ভালো ছেলে। একেবারে নির্দোষ স্বভাব। এবং পূজোর ছুটির পরে হিমুর এই সুখ্যাতির গল্পটা অনেকেই স্মরণ করতে বাধ্য হয়। কারণ, সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক বাড়ির সমস্যা নয়, এপাড়া আর ওপাড়া নিয়ে পাঁচ বাড়ির সমস্যা। নিভার বাবা ভাবেন, প্রমীলার মা ভাবেন, সরযূর দাদা ভাবেন, কল্যাণীর মা ভাবেন, এবং অতসীর কাকিমা ভাবেন। মেয়েগুলিকে কলকাতায় পৌঁছে দেবার সেই সমস্যাটা আবার কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে।

কলেজের ছুটির আগে এবং পরে, এই সমস্যাটা দেখা দেয়। এবং উপায় চিন্তা করতে করতে হয়রান হতে হয়। কোনো বাড়ির বাপ-মা বা অভিভাবক, কেউ পছন্দ করেন না যে, মেয়েটা একা-একা যাওয়া-আসা করুক। মেয়েরাও চায় না। ট্রেন যাত্রার হয়রানিকে ওরা ভয় করে এবং একা একা যাওয়া-আসা করতেও ভয় করে। কে পৌঁছে দিয়ে আসবে? কে নিয়ে আসবে? কার এত সময় আছে? প্রত্যেকবার এই অসুবিধার প্রকোপে পড়ে মেয়েগুলির

যাওয়া-আসার তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়। ছুটি শেষ হয়, তবু নিভা কলকাতা রওনা হতে পারে না। কখনো বা ছুটি আরম্ভ হয়ে যায়, ছুটির চারটে দিন পার হয়ে যায়, কলকাতার ছাত্রী হোস্টেল থেকে প্রমীলার দুটো রাগন্ত চিঠি এসেও যায়, তবুও প্রমীলার মা মেয়েকে কলকাতা থেকে আনবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন না।

কিন্তু এবছর পূজার ছুটি ফুরিয়ে যাবার দিনটাকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখেও চিন্তা করতে ভুলে গেলেন সবাই। কারণ, সবারই মনে পড়েছে হিমু আছে। হিমু থাকতে চিন্তা করবার কি আছে?

সব মেয়ে এক কলেজে পড়ে না, এবং সবারই কলেজের ছুটি একই দিনে ফুরোয় না। কাউকে দুদিন আগে রওনা হতে হয়, কাউকে দুদিন পরে। সরযূ যায় সবার শেষে।

এটাও একটা সমস্যা। হিমু কি দফায় দফায় কলকাতা দৌড়বে আর আসবে? পাঁচটি ছাত্রীই কি একত্র হয়ে হিমুর সঙ্গে যেতে পারে না।

ব্যবস্থা হয়, সবাই একই দিনে একই সঙ্গে যাবে। নিভাকে আর প্রমীলাকে সোজা হোস্টেলে তুলে দিয়ে হিমু অতসীকে মির্জাপুর স্ট্রীটের মাসিমার বাড়িতে, কল্যাণীকে বালিগঞ্জে বড়দির বাড়িতে, আর সরযূকে আলিপুবে ছোটমামার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তা তো হলো। কিন্তু হিমু কি সেদিনই কলকাতা থেকে গিরিডি ফিরে আসবে?

না। কল্যাণীর মামা বলেন—না! অতসীর কাকিমা বলেন—না। সরযূর দাদা বলেন—না। তোমাকে আরও কয়েকটা দিন কলকাতায় থাকতে হবে হিমু। তুমি নিজে মেয়েটাকে একেবারে হোস্টেলে তুলে দিয়ে তারপর গিরিডি রওনা হবে।

মেয়ে পৌঁছবার এই বিচিত্র জটিল দায় এক কথায় স্বীকার করে নিতে একটু আপত্তি করে না হিমু।

হিমুদা! হিমুদা! হিমুদা! শহরের পাঁচ মেয়ে কলকাতা রওনা হবার দিন স্টেশনে বিচিত্র কলরবে মুখর, একটা দৃশ্যও দেখা দিল।—হিমুদা আমার ব্যাগটা কোথায়? হিমুদা আমার ছাতাটা কোথায়? এক প্যাকেট লজেন্স নিতে ভুলবেন না হিমুদা।

ডাকটা হিমুদা বটে, এবং একটা আপনত্বের ডাকও বটে ; কিন্তু সত্যিই দাদা বলে কেউ কি হিমুকে সম্ভ্রম করছে? হিমুর গায়ে ঠেলা দিয়ে কথা বলতেও প্রমীলার হাতে একটুও বাধে না। পাঁচটি ছাত্রীর কলকাতা যাত্রার উল্লাসের মধ্যে একমনে অবাধ নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু ফাই-ফরমাস খাটতে থাকে হিমু। কেউ কারও জিনিস-পত্রের দিকে ভুলেও একটা পাহারার দৃষ্টি তুলে তাকায় না। এমন কি বাপ-মা কাকা যাঁরা স্টেশনে এসেছেন তাঁরাও না! তাঁরা মেয়ের কানের কাছে উপদেশ বর্ষণ করতেই ব্যস্ত।—পৌঁছেই চিঠি দিবি। সাবধান, শীতটা পড়লেই গরম জলে স্নান করতে যেন ভুল না হয়।

বাক্স গোনে হিমু। খাবারের ঝুড়িগুলিকে গুনে একদিকে সরিয়ে রাখে হিমু। সরযূর ওভারকোট আর কল্যাণীর মাফলার হিমু দত্তের হাতে ঝুলছে। অতসী তার হাতের ছোটো ব্যাগটাকেও হিমু দত্তের হাতের দিকে এগিয়ে দেয়। ব্যাগ হাতে তুলে নেয় হিমু। অতসীও এইভাবে হাত খালি করে নিয়ে খোঁপাটাকে নাড়াচাড়া ক'রে একটু গুছিয়ে নেয়।

স্টেশনেই, এবং ট্রেন ছাড়বার আগেই পাঁচ মেয়ের দাবীর এই ব্যাপার! বাকি পথে তাহলে কি কাণ্ডই যে হবে অনুমান করতে পারেন বাপ মা আর কাকা মামারা। ভাবতে গিয়ে হেসেও ফেলেন। আলোচনাও করেন, সত্যিই এরা হিমুকে পেয়েছে কি! ভালো মানুষ বলে একেবারে ওকে দিয়ে পান পর্যন্ত সাজিয়ে নেবে?

হিমু দত্ত যে একটা পুরুষ মানুষ, হিমু দত্তের জীবনের এই সহজ ও সামান্য সত্যটুকুও কি ওরা মনে রাখতে পারে না? কোনো হিমিদির প্রতি ওদের মনে যেটুকু সমীহ আর ভয়

থাকে, তার দশভাগের এক ভাগও যদি হিমুদা নামে এই পুরুষ মানুষটার প্রতি থাকতো! কিন্তু হিমু দত্তের সম্পর্কে কারও চিন্তায় এরকম কোনো প্রশ্নেরই বালাই যেন নেই।

হিমু দত্তের বয়সটাও যে পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়, এই সত্যও যে এতগুলি মেয়ের মধ্যে কোনো মেয়ে মনে রাখতে পারে না। প্রমীলার ওভারকোটের পকেটের মধ্যে একটা রুমাল রয়েছে, সেন্ট মাখানো রুমাল। একটি মুহূর্তের মতোই সাবধান হয়ে ভাবতে পারেনি প্রমীলা, ঐ রুমালের সৌরভ হিমু দত্তের নিশ্বাসের বাতাস স্পর্শ করতে পারে। সরযূ তার হাতের যে ছোটো ব্যাগটা হিমু দত্তের হাতে তুলে দিয়েছে, সেই ব্যাগের গায়ে, উপরের খাঁজকাটা খাপের মধ্যে সরযূর মুখের ছোটো একটা সুশ্রী ফটো বসানো আছে। ভুলেও এক বার ভেবে দেখতে পেরেছে কি সরযূ, হিমু দত্তের চোখের উপর ঐ ফটোর ছায়া হঠাৎ ঝিক করে ফুটে উঠতে পারে? কি মনে করে ওরা? হিমু দত্তও একটা মেয়ে? কিংবা হিমু দত্ত একটা ব্যক্তি মাত্র, এবং ঐ ব্যক্তিত্বের কোনো পৌরুষেয়তা নেই?

গিরিডি থেকে কলকাতা পর্যন্ত থেকে ট্রেনের সারাটা পথ হিমুদাকে দিয়ে ওরা কি সব কাণ্ড করিয়েছিল, সে গল্প আর তিন মাস পরেই বাড়ির সকলে শুনতে পেল ; বড়দিনের ছুটিতে হিমু আবার কলকাতায় গিয়ে ওদের যখন নিয়ে এলো।

হিমুদা কলমালেবু ছুলে দিয়েছে, ওরা খেয়েছে। হিমুদা চীনবাদামের খোসা ভেঙে দিয়েছে, ওরা খেয়েছে। কাণ্ডগুলি করতে ওদের একটুও বাধেনি এবং হিমুরও একটুও আপত্তি হয়নি।

—হিমুদা বেচারা সত্যিই মাটির মানুষ। কি ভয়ানক উপদ্রবই না আমরা করলাম, কিন্তু হিমুদা শুধু হেসেই সারা হয়ে গেল!

বড়দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসে যে-ভাষায় যে-ভাবে হেসে হিমুদার নামে গল্প করে প্রমীলা, প্রায় সেই ভাষাতেই সে-ভাবে হেসে নিজের নিজের বাড়িতে গল্প করে সরযূ, অতসী, নিভা আর কল্যাণী।

এ হেন হোমিও হিমুই একদিন চমকে উঠলো ; যে নামে তাকে কেউ ডাকে না, সেই নামেই একজন তাকে ডেকে ফেলেছে। হিমাদ্রিবাবু! কি আশ্চর্য, হোমিও হিমু নিজেই যে নিজেকে হিমাদ্রিবাবু বলে মনে করতে ভুলে গিয়েছিল। কল্পনাও করতে পারেনি যে, এরকম একটা সম্ভ্রম মিশিয়ে তার নামটাকে ডাকা যায়, এবং কেউ ডাকতে পারে। তা ছাড়া, হিমাদ্রিবাবু বলে ডাকলো যে তার বয়সও যে হোমিও হিমুর বয়সটার তুলনায় খুব কম নয়। হোমিও হিমুর বয়স বড়ো জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। হিমাদ্রিবাবু বলে ডাকলো যে, তার বয়স বড়ো জোর একুশ-বাইশ। হিমুদা নয় ; এমন কি হিমুবাবুও নয়, একেবারে হিমাদ্রিবাবু। একটু বেশি আশ্চর্য হবারই কথা। কারণ, গিরিডিতে এই এক বছরের জীবনে, সব মানুষের সঙ্গে এত মেলামেশা জানাজানি ও চেনাচেনির ইতিহাসে, নিজেকে যে-নামে কোনোদিন শুনতে পায়নি হোমিও হিমু, সেই নাম ধরে ডেকে ফেললো যে, সে একটি মেয়ে। বেশ বড়লোকের মেয়ে ; বেশ সুন্দরী মেয়ে। বেশ শিক্ষিতা মেয়েও বলতে পারা যায়, কারণ সে এখন কলেজে সায়েন্স পড়ছে ; সেকেণ্ড ইয়ারে পৌঁছেছে।

সেই মেয়ের বাবা একটা সমস্যায় পড়েছেন বলেই হোমিও হিমুর জীবনে এই নতুন নামে ডাক শোনবার ঘটনাটা দেখা দিয়েছে, নইলে এরকম একটা ডাক বোধহয় জীবনে না-শোনাই থেকে যেত।

উশ্রী নদীর কিনারায় একটা ফাঁকা শালবনের কাছাকাছি সুশ্রী একটি বাড়ি। চারু ঘোষের বাড়ি—উদাসীন।

বেশ টাকা-পয়সা আছে উকীল চারু ঘোষের, এবং বাড়িটার চেহারাও বেশ রং-চঙে। বাড়িতে যখন তখন গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজে, এবং বারান্দার উপর মক্কেলের ভিড়ও লেগে আছে। তাই একটু ভাবতে হয়, এমন বাড়ির নাম উদাসীন রাখা হলো কেন?

চারু ঘোষের জীবনটা মোটেই উদাসীন নয়। অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ও চিন্তারত জীবন। চারু ঘোষের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের চেহারাও উদাসীন নয়। সব সময়েই হাসছে আর খেলছে, বেশ দুরন্ত খুশির জীবন। তারপর, বড়ো মেয়ে যূথিকা ঘোষের জীবন। ঝকঝক করে চোখ, ঝিকঝিক করে মুখের হাসি আর ঝলমল করে সাজ, যূথিকা ঘোষের জীবনটাকে একটা উচ্ছল আশার জীবন বলেই মনে করতে হয়। উদাসীনতার সামান্য ছায়াও নেই যূথিকা ঘোষের মুখের ভাষায় ও চোখের চাহনিতে।

পৃথিবীতে কারও কাছ থেকে এক পয়সার উপকার নেব না, এবং কাউকে এক পয়সার উপকার দেবও না। এ রকম একটা আদর্শ বাস্তবতার সংসারে সত্যিই সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন আর যারই মনে যত গোলমাল বাধাক না কেন, চারু ঘোষের মনে কোনো গোলমাল বাধাতে পারে না। এ বিষয়ে চারু ঘোষের মনটা একেবারে পরিষ্কার। বিশ্বাস করেন চারু ঘোষ, এই রকম জীবনই হলো আদর্শ জীবন। কারও উপকার নেব না। কারও উপকার করবো না, কারও কাছ থেকে অপকার নিতেও পারবো না। অর্থাৎ সরে থাকবো, যেন কেউ অপকার করবার সুযোগ না পায়। চারু ঘোষকে যারা ভালোমতো জানে, তারা বিশ্বাসও করে। হাঁ, বাস্তবিক, চারু ঘোষ সত্যিই মানুষের উপকার-অপকারের নাগাল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা দার্শনিক অস্তিত্ব সত্য করে তুলতে পেরেছেন।

চারু ঘোষের বাড়িতে কোনো ক্রিয়া-কর্মে, কোনো উৎসবে কারো নিমন্ত্রণ হয় না। চারু ঘোষও কোনো বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান না। ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনে যে উৎসবটা হয়, সে উৎসব নিতান্ত একটা পারিবারিক উৎসব। চিঁড়ের পোলাও রান্না করা হয় এবং বাড়িতেই দুধ ফাটিয়ে ছানা করে আম সন্দেশ তৈরি করেন যূথিকার মা। স্বয়ং চারু ঘোষ, দুই ছেলে বীরু নীরু, মেয়ে যূথিকা এবং যূথিকার মা ; এই পাঁচটি মানুষ ছাড়া বাড়ির আর কোনো মানুষ চিঁড়ের পোলাও ও আম-সন্দেশের স্বাদ গ্রহণ করে না। নিয়মই নেই।

বাড়ির আর মানুষ বলতে শুধু ঠাকুর চাকর ঝি মালী আর ড্রাইভার। উদাসীনের উৎসবের দিনেও তারা তাই খায়, যা রোজই খেয়ে আসছে। ডাল ভাত আর একটা তরকারি। চিঁড়ের পোলাও আর আম-সন্দেশ একেবারে স্ট্রিক্টলি শুধু উদাসীনের বাপ-মা আর ছেলে মেয়েদের খাবার টেবিলে পরিবেশন করা হয়।

হ্যাঁ, পরের দাবীর দিকটাও দেখতে ভুল করেন না চারু ঘোষ। সেদিকে তাঁর চোখ অন্ধ নয়, বরং খুবই সজাগ। ড্রাইভারকে যদি একবার ডাকঘরে পাঠাতে হয়, তবে চারু ঘোষ তাঁর পাল্টা কর্তব্যও স্মরণ করেন। একটা এক্সট্রা কাজ করেছে ড্রাইভার, এটা ড্রাইভারের নিয়মিত কাজের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং সেই ড্রাইভারের এই সামান্য এক্সট্রা কাজের জন্য ড্রাইভারকে এক পেয়ালা চা ও একটা বিস্কুট খেতে দেন যূথিকার মা। চারু ঘোষ বলেন—পয়সা দিয়ে কাজ নেব ; কারও উপকার চাই না। ঠকবো না, কাউকে ঠকাবোও না।

মালী মাসে একদিন বাড়ি যাবার ছুটি পায়। এদিকেও নজর আছে চারু ঘোষের, যেন সত্যিই ছুটিটা অস্বীকার না করে মালী। মাসে একটা দিন ছুটি দেওয়া হবে বলে যখন নিয়ম করা হয়েছে, তখন সে নিয়মের এক চুল এদিক-ওদিক করা চলবে না, ছুটির দিনে মালীকে বাড়ি যেতেই হবে। যদি না যায়, তবে কাজ করতে দেওয়া হবে না। এবং সারাটা দিন মালীটা উদাসীনের বাগানের এক কোণেই সেই ছোটো টিনের ঘরটার মধ্যে পড়ে থাকলেই বা কি? সেদিন উদাসীনের ভাত ডাল তরকারি খাবার অধিকার থাকবে না মালীর। খায়ও না মালীটা। মালী নিজেই বাজার থেকে নিজের পয়সায় ছাতু কিনে এনে খায়।

যূথিকার মা পাটনা থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন, তাইতেই সমস্যাটা দেখা দিয়েছে। যূথিকার পাটনা যাওয়া চাই। আর একটি দিনও দেরি করা চলে না। কিন্তু কে নিয়ে যাবে?

পাটনা থেকে চিঠি দিয়েছেন যূথিকার মামী ; জানিয়েছেন, নরেন এখন পাটনায় আছে। আর তিন-চার দিন মাত্র থাকবে। তারপরেই বোম্বাই চলে যাবে নরেন। সুতরাং...বুঝতেই পারছো, এই চিঠি পাওয়া মাত্র যূথিকা যেন পাটনা চলে আসে। তা ছাড়া, যূথিকার কলেজ খুলতেই বা আর কটা দিন বাকি আছে? বোধহয় আর পাঁচ-ছয় দিন হবে। পাটনা তো আসতেই হবে। না হয় পাঁচ-ছয় দিন আগেই এলো।

যূথিকাও এরকম একটা সংবাদ শুনতে পাবে বলে তৈরি ছিল না। পাটনার কলেজ খুলতে আর সাতটা দিন বাকি আছে। যূথিকা জানে, আর ছ'দিন পরে ঠিক সময় মতো মধুপুর থেকে বলাইবাবু চলে আসবেন, এবং যূথিকাকে পাটনা পৌঁছে দিয়ে আসবেন ; প্রত্যেকবার কলেজ ছুটির সময় পাটনা থেকে যূথিকাকে নিয়ে আসেন, ছুটি ফুরিয়ে যাবার পর পাটনাতে পৌঁছে দিয়ে আসেন বলাইবাবু। চারুবাবুর মধুপুরের যত বাড়ির ভাড়া আদায়ের সরকার মশাই, সেই বলাইবাবু, যিনি চারুবাবুর বাবার বয়সী, এবং আগে চারুবাবুর বাবার অফিসেই চাকরি করতেন।

এবারও বলাইবাবু সময়মত আসবেন এবং তাঁরই সঙ্গে পাটনা চলে যাবে যূথিকা, এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ওলট-পালট ঘটাবার দরকার হবে, এমন সম্ভাবনা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। চারুবাবু না, যূথিকার মা না, যূথিকাও না। কিন্তু পাটনার মামীর চিঠিটা হঠাৎ চলে আসতেই ফাঁপরে পড়লেন সবাই। সরকার মশাই, অর্থাৎ বলাইবাবু তো এখন মধুপুরে নেই। তিনি ধর্মকর্ম করতে পুরী গিয়েছেন, এবং পুরী থেকে ফিরবেন ঠিক সেই দিনের আগের দিনটিতে, যেদিন যূথিকার কলেজ খোলবার কথা। বলাইবাবুর পুরীর ঠিকানাও জানা নেই যে, একটা টেলিগ্রাম করে বলাইবাবুকে অবিলম্বে চলে আসতে বলা যেতে পারে। কিন্তু জানা থাকলে আর টেলিগ্রাম করলেই বা কি? বলাইবাবুর আসতেও তো দুটো দিন সময় লাগবে। তারপর যূথিকাকে নিয়ে পাটনায় পৌঁছতে আর একটা দিন লাগবে। ততদিন নরেন আর পাটনায় থাকবে না। তাহলে...নরেন যদি যূথিকাকে চোখে না দেখেই চলে যায়, তবে কেমন করে জানতে পারা যাবে যে, যূথিকাকে বিয়ে করবার জন্য এতদিনে সত্যিই তৈরি হয়েছে নরেন? যূথিকার মামী জানেন, যূথিকা আজও নরেনের কাছ থেকে স্পষ্ট করে ওকথাটা শুনতে পায়নি।

নরেনের সঙ্গে যূথিকার বিয়ে হবে বলেই আশা করেন চারুবাবু, যূথিকার মা এবং যূথিকার পাটনার মামী। কিন্তু বিয়ে নাও হতে পারে, এমন আশঙ্কাও আছে। তিন বছর ধরে প্রত্যেক ছুটিতে বোম্বাই থেকে যখন পাটনাতে আসে নরেন, গর্দানিবাগে যূথিকার মামার বাড়িতে নরেনের নিমন্ত্রণ হয়, এবং নরেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে যাকে দেখতে পাবে বলে আশা করে, সেই যূথিকাকে দেখতেও পায়। কোনো সন্দেহ নেই, যূথিকাকে ভালোবাসে নরেন। কিন্তু ভালোবেসেও আর কতকাল অপেক্ষা করতে চায় নরেন?

করুক না অপেক্ষা, চারুবাবুর কোনো আপত্তি নেই। যূথিকার এই তো সেকেণ্ড ইয়ার চলেছে। যূথিকা ছাত্রী ভালো। যতদিন নরেন অপেক্ষা করবে, ততদিন যূথিকার কলেজের পড়ার জীবনও চলতে থাকবে। সেটাও এক রকমের ভালোই বলতে হবে। বরং এই সময় বিয়ে হয়ে গেলেই যূথিকার পড়া বন্ধ হয়ে যাবার ভয় আছে। যূথিকাকে কি বোম্বাই নিয়ে না গিয়ে আরও কটা বছর পাটনা কলেজের ছাত্রী হয়ে থাকতে দিতে রাজি হবে নরেন!

ঠিক ওসব প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, নরেন আবার অর্থাৎ নরেনের মনটা আবার যদি উদাস হয়ে যায়? সত্যিই মাঝে একবার উদাস হয়ে গিয়েছিল। বছরের মধ্যে বার তিনেক পাটনাতে আসে নরেন ; যূথিকার সঙ্গে প্রত্যেকবারই দেখা হয়। এবং ওদের দু'জনের মেলামেশার

আনন্দও বছরে তিনবার উৎসবের মতো উতলা হয়ে ওঠে। এই দেখা-শোনা ও মেলামেশার মধ্যে যদি হঠাৎ কোনো ছেদ পড়ে ; যদি একবার, কিংবা পর পর কয়েক বার দুজনের মেলামেশার উৎসব বাদ পড়ে যায়, তবে যে নরেনের মনে অপেক্ষার আগ্রহও উদাসীন হয়ে যেতে পারে। এমন অনর্থ অনেক ভালোবাসার জীবনে ঘটতে দেখা গিয়েছে। শুধু একটানা এক বছরের অদেখাতেই ভালোবাসা ভেঙে গেল। এবং কেউ কারও খোঁজও নিল না, এমন ঘটনা চারুবাবু তাঁর নিজের শ্যালিকা সুমতির জীবনে দেখেছিলেন। তাই একটা ভয় আছে তাঁর মনে। যূথিকার মা এবং মামীর মনেও ভয় আছে। যেন হাতছাড়া না হয় নরেনের মতো ছেলে। ভারত সরকারের টেক্সটাইল উন্নয়নের কাজে এক হাজার টাকা মাইনের একটা পদ এই ত্রিশ বছর বয়সেই দখল করেছে যে ছেলে, সেই যূথিকার মতো একটা সায়েন্স পড়া সেকেণ্ড ইয়ারের মেয়েকে ভালবেসেছে যূথিকার ভাগ্যের জোর আছে। যূথিকা দেখতে সুন্দর বটে কিন্তু ওরকম সুন্দর মেয়ে কতই তো আছে।

যূথিকারও জানতে বাকি নেই, পাটনার মামী চিঠিতে কি লিখেছেন। নরেন এসেছে। যূথিকা ঘোষের পক্ষে মনের চঞ্চলতা নিরোধ করে রেখে উদাস হয়ে থাকা অসম্ভব। নরেন পাটনায় থাকবে, আর যূথিকাকে দেখতে পাবে না, নরেনের চোখের বেদনাকে যেন চোখে দেখতে পায় যূথিকা। ইস, মাত্র আর তিনটি দিন পাটনায় থাকবে নরেন! তার পরেই পাটনার ছেলে হতাশ হয়ে তার বোম্বাই-এর কাজের জীবনে চলে যাবে। এসময় গিরিডিতে পড়ে থাকা যে যূথিকার জীবনের একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ। ভুল করবে না নরেন, যদি অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে যূথিকাকে বিশ্বাসঘাতিকা বলে সন্দেহ করে ফেলে।

একাই পাটনা চলে যেতে পারা যায় না কি? পারা যায়, কিন্তু চারুবাবুই যেতে দিতে রাজি হবেন না। তা ছাড়া, যূথিকাও মনে মনে স্বীকার করে, যূথিকার নিঃশ্বাসের আড়ালেও একটা ভয় আছে। একা যেতে আর সাহস হয় না। মনে পড়ে, সেবার বড়োদিনের ছুটির সময় পাটনা থেকে একাই গিরিডি রওনা হয়েছিল যূথিকা। এবং ট্রেন বদল করবার জন্য গয়াতে নেমেই দেখতে পেয়েছিল, চামড়ার বড়ো বাক্সটা নেই আর গলার হারটাও নেই।

মেয়ে কামরার ভিতরেই ছিল যূথিকা, এবং ভুলের মধ্যে এই যে, মাত্র পনর-বিশ মিনিট, বড়ো জোর আধ ঘণ্টা হবে, জানালার কাঠের উপর মাথা হেলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে একটু ঘুমিয়েছিল। তাইতেই এই কাণ্ড! না, একা একা ট্রেনে যাওয়া-আসা করবার ইচ্ছাটাও আর সাহস পায় না।

আদালত থেকে বাড়ি ফিরে এসে চারুবাবু বললেন—নবলকিশোরবাবু বললেন, হিমু নামে একটা লোক আছে, যার ওপর এরকম একটা কাজের দায় অনায়াসে ছেড়ে দেওয়া যায়। বেশ ডিপেণ্ডেবল্। আর, একটা ডাক দিলেই ছুটে চলে আসে।

বীরু আর নীরু এক সঙ্গে হেসে চেঁচিয়ে ওঠে—হোমিও হিমু, হোমিও হিমু।

চারুবাবু আশ্চর্য হন—তার মানে?

যূথিকাও হাসে—লোকটার পুরো নাম হিমাদ্রিশেখর দত্ত। লোকটা নাকি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করে।

চারুবাবু—কই, এ শহরে এরকমের কোনো ডাক্তারের নাম তো কখনও শুনিনি।

যূথিকা—লোকটা সত্যিই ডাক্তারী করে না। মাস্টারী করে। গণেশবাবুর ছেলে-মেয়েদের পড়ায়।

চারুবাবু—লোকটাকে তুই চিনিস নাকি?

যূথিকা—দেখেছি। ওর নামে মজার মজার অনেক গল্পও শোনা যায়।

চারুবাবু—দেখে কি রকম মনে হয়? ছ্যাঁচোর-ট্যাচোর নয় তো?

যূথিকা—না। তবে একটু ইডিয়টিক মনে হয়।

চারুবাবু—তা হলে মন্দ নয়। তাহলে লোকটাকে ডাকতে হয়।

যূথিকার মা ব্যস্ত হয়ে বলেন—ডাকতে হয় আবার কি? ডেকে ফেল। আর একটুও দেরি করা উচিত নয়!

ডাকতে দেরি হয়নি। হিমু দত্তকে ডেকে আনবার জন্য ব্যস্তভাবে চলে গেল ড্রাইভার, এবং মাত্র আধঘণ্টা পরে ড্রাইভারের সঙ্গে ব্যস্তভাবে চলে এলো হিমু দত্ত।

চারুবাবু বলেন—তুমি ড্রাইভারের কাছ থেকেই সব শুনেছ বোধহয়।

হিমু—হ্যাঁ।

চারুবাবু—আজই, এই সন্ধ্যার ট্রেনেই রওনা হতে হবে।

হিমু—যে আজ্ঞে।

চারুবাবু—শুনেছি তুমি খুব ডিপেণ্ডেবল্ আর ডিউটি সম্বন্ধে খুব সজাগ।

হিমু বিনীতভাবে হাসে—আপনাদের সামান্য একটু উপকার করবো, এর জন্য মিছামিছি কেন এত প্রশংসা করছেন।

চমকে ওঠেন চারুবাবু—উপকার? উপকার করতে বলছে কে তোমাকে?

হিমু দত্তও অপ্রস্তুত হয় ; আর চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে। চারুবাবু বলেন—আমার ধারণা, তোমার দৈনিক রোজগার দু'টাকার বেশি হয় না। কি বলো?

হিমু বলে—তা বটে। মাসে ষাট টাকার মতো হলে দিন দু'টাকায় তো দাঁড়ায়।

চারুবাবু—পাটনা যেতে আর ফিরে আসতে তোমার তিনটি দিন লাগবে।

হিমু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চারুবাবু—সুতরাং, তোমার তিন দিনের কাজের কামাই হিসাব করে ধরলে, তোমার রোজগারের ছ'টা টাকার ক্ষতি হয়।

হিমু হাসে—হিসাব করলে তাই হয়, কিন্তু সত্যি ক্ষতি হয় না।

চারুবাবু—তার মানে?

হিমু—ছেলে পড়াবার কাজে দু'তিন দিন কামাই করলে—কেউ আমার মাইনে কাটে না।

চারুবাবু—ওসব কথা বলে আমাকে লাভ নেই। পরে কি করে বা না করে, সে-সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার কথা হলো...

দেয়ালের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চারুবাবু বলেন—এই ছ'টাকা তুমি পাবে। তা ছাড়া তোমার খোরাকী বাবদ দিন আরও দু'টাকা। অর্থাৎ ছ'টাকা ছ'টাকা বার টাকা।

হিমু বলে—না।

যূথিকার মা বলেন—বেশ তো, না হয় আরও দুটো টাকা পাবে।

হিমু—না।

চারুবাবু তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে কঠোরভাবে হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—আমার কাজের দরকারটাকে তুমি ব্ল্যাক-মার্কেট মনে করলে না কি হে?

এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল হিমু। এইবার মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকায়। এবং তাকিয়ে দেখতে পায়, এই মুহূর্তে পাটনা রওনা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে মেয়ের জীবন, সেই মেয়েই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরাদরির ভাষাগুলি শুনছে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে যূথিকা ঘোষ। হিমু দত্তের চতুর অবাধ্যতার উপর বিরক্তি আর ঘৃণার আক্রোশ যেন কোনো মতে চেপে রেখেছে যূথিকা। লোকটা একটুও ইডিয়ট নয়, মানুষের বিপদের উপর দর হেঁকে টাকা আদায়ের কায়দা খুব ভাল করেই রপ্ত করেছে

লোকটা।

কিন্তু সত্যিই কি চলে যেতে চাইছে লোকটা? দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে কেন?

যূথিকা ডাক দেয়—বাবা?

ডাকটা আর্তনাদের মতো শোনায়। যূথিকা ঘোষের জীবনের আশার অভিসারকে ব্যর্থ ক'রে দেবার ক্ষমতা পেয়ে গিয়েছে হিমু দত্ত নামে চতুর পয়সালোভী এই লোকটা। ওকে এই মুহূর্তে সন্তুষ্ট না করতে পারলে, ওকে রাজি করাতে না পারলে, যূথিকা ঘোষের জীবনও যে আশার পথে এগিয়ে যেতে পারবে না।

যূথিকা ঘোষের ডাকের অর্থ বুঝতে দেরি করেন না চারুবাবু। হিমু দত্তের দিকে তাকিয়ে ডাক দেন। শোন তবে।

ডাক শুনে মুখ ফেরায় হিমু। এবং শোনবার জন্যই প্রস্তুত হয়।

চারুবাবু বলেন—তোমাকে মোট ত্রিশটা টাকা পারিশ্রমিক দিচ্ছি।

হাঁপ ছেড়ে এবং নিশ্চিন্ত হয়ে হিমু দত্তের দিকে তাকান চারুবাবু। এবং সেই মুহূর্তেই চমকে ওঠেন। কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে হেঁটে দরজার দিকে চলে যাচ্ছে হিমু দত্ত।

চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবাবু—এ কি? তুমি একটা কথাও না বলে...এ কি রকমের অভদ্রতা!

হিমু দত্ত থমকে দাঁড়ায় ; এবং শান্তভাবে হাসে—আমি টাকা নিই না স্যার।

চারুবাবু—তার মানে...এমনি শুধু...একটা বাতিকের জন্য...

হিমু—লোকের দরকারে আমি এমনিতেই একটু আধটু খেটে উপকার করি স্যার।

চারুবাবুর জীবনের একটা অহঙ্কারের স্তম্ভকেই যেন একটা ভয়ানক ঠাট্টার আঘাতে কাঁপিয়ে আর নাড়িয়ে দিয়েছে হিমু দত্ত।—ছটফট ক'রে বার-বার এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন চারুবাবু। কোথা থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে একটা লোক এসে চারুবাবুর মতো শুদ্ধ অহঙ্কারের গৌরবে গরীয়ান এক মানুষের একটা দরকারের সুযোগ পেয়ে যেন তাঁর চুল ধরে মাথাটাকে টেনে নিচু ক'রে দিচ্ছে। কারও উপকারের পরোয়া করেন না, কারও ধার ধারেন না যে মানুষ, সে মানুষকে আজ হিমু দত্তের মতো একটা ইডিয়টের অহঙ্কারের বাতিকের কাছে হাত পেতে ঋণ চাইতে হবে?

গলার ভিতর যেন ধুলো ঢুকেছে ; জোরে একবার কেশে নিয়ে এবং মাথাটাকে একটু হেঁট ক'রে বিড়বিড় করেন চারুবাবু।—বেশ, তবে তাই হোক, টাকা নিও না।

হোমিও হিমুর জীবনের একটা মূর্খ বাতিকের কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছেন চারুবাবু। কিন্তু চারুবাবুর এই আহ্বানের মধ্যে হৃদয়ের অভিনন্দন নেই। যেন একটা আক্রোশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, শুধু দায়ে পড়ে বাধ্য হয়ে হিমু দত্তের উপকার সহ্য করতে রাজি হয়েছে। মানুষকে অপমান করবার আগে অহঙ্কারে মানুষ নিজে পায়ের জুতোর দিকে তাকাতে গিয়ে ঠিক এইরকম মাথা হেঁট করে।

হিমু দত্ত বলে—যা হোক, আমার আর কিছু বলবার নেই।

চারুবাবু—তাহলে তৈরি হও, এই সন্ধ্যার ট্রেনেই...

হিমু হাসে—না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জীবনে এই প্রথম, অন্তত হিমু দত্তের গিরিডির জীবনে এই প্রথম স্পষ্ট স্বরে 'না' করতে পেরেছে হিমু, 'না' বলবার ইচ্ছে হয়েছে হিমুর। হিমু দত্তের জীবনের মূর্খ বাতিকটা হঠাৎ চালাক হয়ে গিয়েছে কিংবা হিমু দত্তের জীবনের গোবেচারা সম্মানটাই হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

যূথিকা ঘোষের ছায়ার পাশ দিয়েই ব্যস্তভাবে হেঁটে চলে গেল হিমু দত্ত। মস্ত বড়ো বারান্দা, তাড়াতাড়ি হেঁটে পার হতেও এক মিনিট লাগে। হন হন করে হেঁটে চলে যেতে থাকে হিমু, এবং ফুলের টবের সারি পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই পিছনের ডাক

শুনে থমকে দাঁড়ায়।

—হিমাদ্রিবাবু! পিছন থেকে ডাক দিয়েছে যূথিকা ঘোষ। ডাকতে ডাকতে একেবারে কাছে এসেছে।

—হিমাদ্রিবাবু? ডাকটা যে একটা কপট স্তুতি। এই ডাকের পিছনে চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষের জীবনের একটা দরকারের তাগিদ মুখ টিপে হাসছে। সত্যিই তাই কি?

যূথিকা ঘোষের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝা যায় না। বুঝতে পারে না হিমু। শুধু বোঝা যায়, হিমু দত্তের এই বিদ্রোহকে যেন কোনো মতে শান্ত করবার জন্য যূথিকার উদ্বিগ্ন চোখের মধ্যে একটা চেষ্টা ছটফট করছে।

যূথিকা বলে—আপনি রাজি না হলে আমার আজ পাটনা রওনা হবার কোনো উপায় নেই। আর, আজই রওনা না হতে পারলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে হিমাদ্রিবাবু।

—বেশ তো। বেশ তো। ঠিক আছে, কিছু ভাববেন না। আপনি তৈরি হয়ে নিন।

বলতে বলতে, এবং বোধহয় মনের মধ্যে একটু নতুন বাতিকের তাড়নায় বিচলিত হয়ে ফুলের টবের কাছে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াতে থাকে হিমু দত্ত। যূথিকা ঘোষের মুখে করুণ অনুরোধ, একটা নকল করুণতা নিশ্চয়। কিন্তু তবু তো হিমাদ্রিবাবু বলে ডেকেছে। ইচ্ছে নেই, তবু তো সম্মান দেখিয়েছে।

যূথিকা ঘোষের তৈরি হতে পাঁচ মিনিট লাগে। ড্রাইভারের গাড়ি বের করতে এক মিনিট লাগে। এবং সন্ধ্যার ট্রেন ধরবার জন্য স্টেশনে পৌঁছে যেতে পাঁচ মিনিট।

জগদীশপুর পার হয়ে গেল ট্রেন। মাঝে মাঝে ফুলের নার্সারি আর রাঙামাটির মাঠের এদিকে-ওদিকে ছোটো ছোটো শালের কুঞ্জ। ট্রেনে বসে ফুলের নার্সারি আর শালকুঞ্জের দিকে চোখ পড়লেও যূথিকা ঘোষের মনের মধ্যে পাটনার ছবি ফুর-ফুর করে। ট্রেনটা ছুটতে ছুটতে দু'পাশের ফুলের নার্সারির বাতাসকে বুকের ভিতরে টানছে। গোলাপের গন্ধে মাঝে মাঝে ভরে যাচ্ছে ট্রেনের কামরা। কিন্তু যূথিকা ঘোষের কল্পনাকে নিকটের ঐ গোলাপের গন্ধ বোধহয় স্পর্শ করতে পারে না। হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকায়নি যূথিকা ঘোষ, শালকুঞ্জগুলিকে দেখেও দেখতে পায়নি।

মধুপুরে পৌঁছতে ট্রেনটার বেশ দেরি হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। পথের মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়েছে ট্রেনটা। একজন যাত্রী নেমে গিয়ে খবর নিয়ে ফিরেও আসে এক ভদ্রলোক অ্যালার্ম শিকল টেনেছেন। দুটো চোর তাঁর সুটকেস নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—এই জন্যই একা একা আর ট্রেনে ঘুরতে সাহস পাই না হিমাদ্রিবাবু।

এতক্ষণে এই প্রথম যূথিকা ঘোষ পাটনার ভাবনা ছেড়ে দিয়ে যেন কাছের জগতের একটা সমস্যার সঙ্গে আলাপ করলো। এতক্ষণ কামরার ভিতরে হিমু দত্ত নামে মানুষটা যূথিকার চোখের খুব কাছে বসে থাকলেও তাকে দেখতেই পায়নি যূথিকা, এবং কোনো কথা বলবার দরকারও বোধ করেনি।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করতেই যূথিকা বলে—আমি একাই পাটনা চলে যেতে পারতাম। কিন্তু শুধু ঐ একটি কারণে আপনাকে সঙ্গে নিতে হলো। চোরেরা মেয়েছেলেকে একটুও ভয় করে না। তাই, অন্তত, নামে-মাত্র একটা পুরুষ মানুষ সঙ্গে থাকলেও চোরের উপদ্রব থেকে একটু নিরাপদ থাকা যায়।

হিমাদ্রিবাবু নামে ডাক শুনে যে মেয়ের মুখের দিকে একবার খুবই আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল হিমু দত্ত, সেই মেয়েরই মুখের দিকে আর একবার আশ্চর্য হয়ে তাকায়। এটা প্রথম আশ্চর্য ভেঙে যাবার আশ্চর্য। হিমাদ্রিবাবু কথাটার মধ্যে সম্ভ্রম আছে, কিন্তু যূথিকা ঘোষ যাকে হিমাদ্রিবাবু বলে ডেকেছে, তার মধ্যে কোনো সম্ভ্রমের বস্তু দেখতে পেয়েছে কি?

হিমু দত্তকেও কি শুধু নামে-মাত্র একটা পুরুষ বলে মনে করেছে যূথিকা ঘোষ?

বেশিক্ষণ নয়, কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, আর বেশি সময় লাগেনি, এই প্রশ্নেরও একটি পরিষ্কার উত্তর পেয়ে যায় হিমু দত্ত।

যূথিকা তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে।—তাই আপনাকে সঙ্গে নিতে হলো।

চারু ঘোষের মেয়ের জীবনে একটা কাজের দরকারে, শুধু পাটনা পৌঁছে দেবার জন্য তার পিছনে একটা নাম মাত্র পুরুষ হয়ে একটি বা দুটি দিনের জন্য একটা অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে যাকে, তাকেই হিমাদ্রিবাবু বলে ডেকেছে যূথিকা। কিন্তু এমন ডাক ডাকবার কি প্রয়োজন ছিল? নিভা আর সরযূদের মতো হিমুদা বলে ডাকাই তো উচিত ছিল। না, হিমুদা ডাকটা যূথিকা ঘোষের মুখে ভাল শোনাবে না। হিমুর চেয়ে যে বয়সে এমন কিছু ছোটো নয় যূথিকা, সেটা যূথিকার চেহারা আর হিমুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যায়। প্রায় সমবয়সী কোনো অনাত্মীয় পুরুষকে দাদা বলে ডাকতে কোনো মেয়ের ইচ্ছে হয় না বোধহয় এবং ডাকটা মুখেও বেধে যায়। কিন্তু নামেমাত্র পুরুষকে একটা নামে-মাত্র দাদা বলে মনে করে ফেললেই তো হয়। তা যদি না পারে, তবে সোজা হিমু বলে ডেকে ফেললেই বা দোষ কি? একটা নামে-মাত্র পুরুষকে অনায়াসে শুধু নাম ধরে ডাকতে পারবে না কেন কোনো মেয়ে? তা ছাড়া, যূথিকা ঘোষের জীবন ও হিমু দত্তের জীবনের পার্থক্যটাও দেখতে হয়! কোথায় আভিজাত্যে সম্পদে শিক্ষায় কালচারে রুচিতে আর আকাঙ্ক্ষায় এত বড়ো হয়ে গড়ে ওঠা যূথিকা ঘোষ নামে এই মেয়ের জীবন, আর কোথায় হোমিও হিমুর জীবন, যে-জীবন বলতে গেলে কাঠের উপর লেখা একটা নাম মাত্র!

মস্ত বড়ো বাড়ি ঐ উদাসীনের মেয়ে অনায়াসে হিমু দত্তকে হিমু বলেই ডাকতে পারতো। ডাকলে অন্যায় বা অমানান কিছু হতো না। এবং তাহলে হিমু দত্তের মনটাও অকারণে কয়েক ঘণ্টা ধরে একটা মিথ্যা প্রশ্ন দিয়ে মনের ভিতরে কোনো ভাবনার দ্বন্দ্ব বাধাতো না।

হিমু দত্ত কি ভাবছে, যূথিকার কথাগুলি হিমু দত্তের মনের ভিতরে গিয়ে কোনো আঘাত দিল কি না দিল সেটুকু চিন্তা করবার কথাও যূথিকা ঘোষের মনে দেখা দিতে পারে না। হিমু দত্তের মুখের উপর কোনো নতুন ছায়া পড়েছে কি না পড়েছে, সেটা হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকালেও বুঝতে পারে না যূথিকা। হিমু দত্তের মুখ তেমনিই শান্ত, তেমনই একটি জড়পদার্থ। বই-এর রঙিন ছবিকেও একটু নাড়া-চাড়া করলে ছবিটা যেন রং বদলায়। কিন্তু হিমু দত্তের ঐ নিরেট ও নির্বিকার মুখের উপর রং ছিটিয়ে দিলেও বোধহয় মুখটা রঙীন হয়ে উঠবে না।

এবং কালি ছিটিয়ে দিলেও বোধহয় কালো হয়ে যাবে না হিমু দত্তের শান্ত মুখ। হিমু দত্তের মনের ভিতর থেকে কয়েক ঘণ্টার ছোটো একটা বিস্ময় হঠাৎ ভেঙে গেল, বেশ হলো। কিন্তু সেজন্য হিমু দত্তের মুখের উপর কোনো ভাঙনের বেদনা কালো হয়ে ওঠে না।

ছোটো হাত ব্যাগটাকে আস্তে আস্তে খোলে যূথিকা। ব্যাগের ভিতরে ছোটো একটি আয়না। সেই আয়নার বুকে নিজেরই মুখের ছবিকে প্রায় আধ-মিনিট ধরে অপলক চোখে দেখতে থাকে। হাত তুলে কপালের দু'পাশের চুলের ফুরফুরে দুটি ছোটো স্তবক নেড়ে-চেড়ে একটু ভেঙে দিয়ে এবং আরও ফুরফুরে ক'রে দিয়ে ব্যাগ বন্ধ করে যূথিকা। যূথিকার চোখের কাছে, সামনের বেঞ্চিতেই প্রায় মুখোমুখি বসে আছে যে নামেমাত্র একটা অস্তিত্ব, সেটা আছে বলেও যেন মনে করতে পারে না যূথিকা।

উঠে দাঁড়ায় যূথিকা। উপরে রাখা ছোটো বাক্সটাকে খুলে একটা বই বের করে। ঝকঝকে ও রঙীন মলাটের একটি উপন্যাস। মধুপুর পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই। উপন্যাসের পাতার উপরে চোখ রেখে মনের সব আগ্রহ জমাট করে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে যূথিকা।

মধুপুর পৌঁছবার পর একটু বিরক্ত হয়ে এবং বাধ্য হয়ে হিমু দত্তের সঙ্গে যূথিকাকে

কয়েকটা কথা বলতে হলো। কারণ ট্রেনটা মাত্র থেমেছে, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো হিমু দত্ত—কুলি! কুলি!

গিরিডি টু মধুপুর, ট্রেন প্রায় ফাঁকা, নামবার যাত্রীর সংখ্যাও খুব কম। তা ছাড়া, প্ল্যাটফর্মের উপর গিজগিজ করছে কুলি। লাগেজ নামাবার জন্য হুড়োহুড়ি ক'রে কুলিগুলো তো এখুনি ছুটে আসবে। অনর্থক অকারণ কুলি কুলি বলে চেঁচিয়ে একটা কাজ দেখাবার দরকার কি?

যূথিকা বলে—আঃ, কেন মিছিমিছি হাঁক ডাক করছেন? কোনো দরকার নেই! আপনাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না।

হিমু দত্ত একটু অপ্রস্তুত হয়ে তার পরেই হঠাৎ একমুখ হাসি হেসে প্রশ্ন করে—আপনি বোধহয় হাঁকডাক চেঁচামেচি পছন্দ করেন না?

যূথিকা শুধু বলে—অবাস্তব প্রশ্ন।

মধুপুরে ট্রেন থামবার পর বেশ কিছুক্ষণ থেকে কামরার ভিতরেই বসে থাকতে হয়, কারণ কুলিগুলো ছুটে আসে না। আসতে দেরি করছে। সেই ফাঁকে কিছুক্ষণের জন্য গণেশবাবুর স্ত্রীর কথা, সেই সঙ্গে গণেশবাবুর বাড়ির আরও অনেক কথা ভাবতে হয়। কারণ হিমু দত্তেরই ঐ গায়ে পড়ে প্রশ্ন করবার রকম দেখে যূথিকার মনে পড়ে যায়, ঠিক এই রকমই গায়ে পড়ে কথা বলবার আর প্রশ্ন করবার একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে গণেশবাবুর স্ত্রীর, অর্থাৎ রমা মাসিমার।

উদাসীনের মেয়ে কারও উপকার নেয় না, নিতে চায় না। চারুবাবুর জীবনের সেই দার্শনিক আদর্শটা তাঁর মেয়ের জীবনেও কম সত্য হয়ে ওঠেনি। গায়ে-পড়ে কারও সঙ্গে কথা বলে না যূথিকা ; কেউ গায়ে-পড়ে কথা বলতে এলে বিরক্ত হয়। গণেশবাবুর স্ত্রী একদিন একরকম গায়ে পড়েই, অর্থাৎ নিজের ম্যালেরিয়ার গল্প বলতে বলতে হঠাৎ যূথিকাকে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার বয়স কত হলো যূথি?

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে যূথিকা প্রশ্ন করেছিল—রোজ দশ গ্রেণ ক'রে কুইনিন খাবার পর কি হলো তাই বলুন। সারলো কি আপনার ম্যালেরিয়া।

উদাসীনের কোনো মানুষ ভুলেও গণেশবাবুর বাড়িতে যায় না। কিন্তু ওরা আসে উদাসীনে ; গণেশবাবু, রমা মাসিমা ও লতিকা। এবং এসেই গায়ে পড়ে যত গল্প আর প্রশ্ন ক'রে চলে যাওয়া ওঁদের একটা ধর্ম যেন।

রমা মাসিমার উপর রাগ করতে যূথিকা ঘোষের মনটা আরও একজনের উপর রাগান্বিত হয়ে ওঠে। রমা মাসিমার মেয়ে লতিকার উপর। সত্যিই, কেমন যেন ওরা! যেমন গণেশবাবু, তেমনি রমা মাসিমা, আর তেমনি লতিকা—বাপ মা আর মেয়ে।

গণেশবাবুর বাড়িটা উদাসীন থেকে বেশি দূরে নয়। উশ্রী থেকে বেরিয়ে উদাসীনে ফিরতে হলে পথের উপরেই পড়ে গণেশবাবুর বাড়ি। বাড়িটার ফটকের কাছে প্রকাণ্ড একটা কাঁঠাল গাছ। একটুও রুচি নেই বাড়িটার। শিউলি নয়, করবী নয়, হাঁসনুহানা নয়—কাঁঠাল। তাছাড়া বাড়িটাও যেন কাঁঠালের কড়া গন্ধে মাখানো। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসছেই আর আসছেই, আর ভনভন ক'রে চলে যাচ্ছে। ফটকটা কখনও বন্ধ থাকে না। একটা গায়ে-পড়া বাড়ি ; পথের লোককে যেন ঘরের ভিতরে ঢোকাতে পারলেই ধন্য হয়ে যায়।

বারান্দার উপর চেয়ার পেতে আর খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা সব সময় বসে থাকেন গণেশবাবু। পথ দিয়ে কাউকে যেতে দেখলেই হাঁক দিয়ে একটা কথা না বলে ছাড়েন না।

—কোথায় চললে হে চিন্তাহরণ? ছেলের পরীক্ষার ফল কি হলো? পাশ করেছে?

—এই মালতী! তোর জেঠিমাকে আজ সন্ধ্যায় একবার আসতে বলবি তো। বলবি, কটক

থেকে চিঠি এসেছে।

—কেয়া সর্দারজী, কাহাঁ চলেঁ? মামলা ডিসমিস হো গিয়া কেয়া?

—এই ঝুরিভাজা? খবরদার যদি এদিকে আবার এসেছ। কলেরা ছড়াবার জায়গা পাওনি?

—কত দাম পড়লো ক্ষিতীশবাবু? পেঁপেগুলি পরেশনাথের নাকি?

গণেশবাবুর এইসব প্রশ্ন তবু একরকম পদে আছে। তাঁর গায়েপড়া প্রশ্নগুলির মধ্যে কোনো মতলব নেই। কিন্তু রমা মাসিমার গায়েপড়া প্রশ্নগুলি যে ভয়ানক একটা মতলবের ব্যাপার ; একটা তদন্ত বলা যায়। নইলে যূথিকার বয়সের খোঁজ নেবার দরকার কি? লতিকার চেয়ে যূথিকার বয়স একটু বেশি কি না, এই তো জানতে চান রমা মাসিমা। কেন জানতে চান, তা'ও জানে যূথিকা। এবং জানে বলেই মনটা মাঝে মাঝে বড়ো বিশ্রী অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। তখন রাগ হয় আর একজনের উপর, যার চোখের সামনে দাঁড়াবার জন্য গিরিডি থেকে পাটনা ছুটে চলেছে যূথিকা। নরেনও যে লতিকাকে চেনে, এবং লতিকার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে, আলাপও হয়েছে নরেনের।

পাটনাতে থাকবার কোনো দরকার হয় না লতিকার। কারণ পড়া ছেড়েই দিয়েছে লতিকা। তবু বছরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস পাটনাতেই থাকে লতিকা। বছরে প্রায় আট-দশবার পাটনা থেকে গিরিডি আর গিরিডি থেকে পাটনা করছে। লতিকার বড়দা পাটনাতেই থাকে আর ডাক্তারী করে।

কোনো দরকার নেই তবু বারবার গিরিডি থেকে পাটনা যাওয়া আর পাটনাতে থাকা কেন দরকার হয়েছে লতিকার জীবনে, সন্দেহ করতে আর বুঝতে কি কোনো অসুবিধা আছে যূথিকার? একটুও না। যূথিকার মা বুঝেছেন, চারুবাবুও বুঝেছেন এবং পাটনার মামীও বুঝেছেন।

পাটনার মামীই অনেকবার স্পষ্ট করে যূথিকার মাকে লিখেছেন কোনো সন্দেহ নেই কুসুমদি, আপনাদের পড়শী গণেশবাবু আপনাদের শত্রু হয়ে উঠেছে। গণেশবাবুর স্ত্রীটি আরও সাংঘাতিক বলে মনে হচ্ছে। সে বস্তুটি নিজে পাটনাতে এসে গর্দানিবাগে নরেনের বাড়ি গিয়ে নরেনের সঙ্গে আলাপ করে এসেছে। লতিকার সঙ্গে নরেনের বিয়ে দেবার জন্য ওরা কি ভয়ানক উঠে পড়ে লেগেছে, আপনি ধারণা করতে পারবেন না।

সাধ্যি কি লতিকার? সব খবর জেনেও মনে মনে হাসে যূথিকা। যেমন নরেনকে, তেমনি নরেনের মনের ইচ্ছাকেও চেনে যূথিকা। সেখানে ঘেঁষবার সাধ্যি কারও নেই। লতিকার ডাক্তার দাদা নরেনকে তোষামোদ করে যত নিমন্ত্রণই করুক না কেন, আর লতিকা যতই স্টাইল করে সেজে নরেনের চোখের সামনে এসে হেসে-হেসে কথা বলুক না কেন।

তবু একটা অস্বস্তি। লতিকা যে এখন পাটনাতেই আছে। নরেনও পাটনাতে আছে। ভাবতে গিয়ে যূথিকা ঘোষের মনের সঙ্গে শরীরটাও যেন ছটফট ক'রে ওঠে।

অ্যাঁ, কি ব্যাপার? সামনের পৃথিবীটাকে এতক্ষণে চোখে পড়েছে, তাই প্রশ্ন করতে পেরেছে যূথিকা।

—কি বলছেন? প্রশ্ন করে হিমু।

—কুলি আসেনি এখনো?

—না।

—কেন?

—কুলিরা আজ স্ট্রাইক করেছে।

চমকে ওঠে যূথিকা—তাহলে কি উপায় হবে?

—আজ্ঞে?

—জিনিসপত্র নামাবে কে, আর পাটনার গাড়িতে তুলে দেবেই বা কে? এ তো আচ্ছা

বিপদ দেখছি!

স্টেশনের বাতাস একটা আগন্তুক ট্রেনের ইঞ্জিনের তীব্র চিৎকারের শব্দে চমকে ওঠে। যাত্রীর হুড়োহুড়ি শুরু হয়, পাটনা যাবার ট্রেন ইন করেছে।

চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা।—কি উপায় হবে হিমাদ্রিবাবু? এই ট্রেনে যদি উঠতে না পারি, তবে পাটনা গিয়ে আর লাভই বা কি।

যূথিকা ঘোষের হতাশার বেদনা ওর উদ্বিগ্ন চোখ দুটোকে বোধহয় এখনি জলে ভরিয়ে দেবে। বড়ো বেশি ছলছল করে চোখ দুটো।

ব্যাঙ্কের উপর থেকে যূথিকার বেডিং আর বাক্সটাকে হিড়হিড় করে টেনে কাঁধের উপর তুলে হিমু দত্ত বলে—চলুন।

রাতও হয়েছে, ট্রেনে ভিড়ও খুব। ফার্স্ট ক্লাসের কামরাও যাত্রীর ভিড়ে ঠাসা।

ভিড় একটু কম, এমন কামরা খুঁজতে খুঁজতে সময়ও পার হয়ে গেল। গার্ডের আলোর সঙ্কেত জ্বলে উঠতেই তাড়াতাড়ি একটা ভিড়ে ঠাসা কামরার ভিতরেই উঠবার চেষ্টা করতে হলো।

দুলে উঠেছে ট্রেন। জানালা দিয়ে বাক্স আর বেডিং কামরার ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিল হিমু ; যাত্রীর ধমক খেলো হিমু। দরজার হাতল ধরে কামরার ভিতরে পা এগিয়ে দিয়ে উঠে পড়লো যূথিকা। তারপর পিছন থেকে হিমু দত্ত। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে যূথিকা ঘোষ—সর্বনাশ!

—কি হলো? শান্ত হিমু দত্তও যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করে।

নিজের একটা পা-এর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে যূথিকা ঘোষ—একটা স্যাণ্ডেল নিচে পড়ে গেল।

যূথিকা ঘোষের এক পায়ের এক পাটি স্যাণ্ডেলের দিকে তাকায় হিমু দত্ত। সোনালী জরির কাজ করা লাল মখমলের স্যাণ্ডেল। তার পরেই মুখ ফিরিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে হিমু—ঐ যে!

তারপর হিমু দত্তকে আর দেখতে পায় না যূথিকা। বুক দুরদুর করে যূথিকার। লোকটা সত্যিই যে জুতোটাকে আনবার জন্যে নেমে পড়েছে, আর ট্রেন যে এখন বেশ গড়গড়িয়ে চলতে শুরু করেছে।

কামরার ভিতরে বসবার জায়গা ছিল না। স্তব্ধ হয়ে, এক ঠায় দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে কাঁপতে থাকে যূথিকা। লোকটা সত্যিই আবার গাড়িতে উঠতে পারবে তো? জুতোটাকে কুড়িয়ে আনবার জন্য লোকটাকে কোনো হুকুম, কোনো অনুরোধ করেনি, এমন কি চোখের ইঙ্গিতেও কোনো নির্দেশ দেয়নি যূথিকা। আশ্চর্য, একটু ভয়-ডরের বোধও নেই লোকটার। যূথিকার একটা খালি পায়ের দিকে তাকালো, তারপরেই একটা লাফ দিয়ে নিচে নেমে গেল।

যূথিকা ঘোষের আতঙ্কিত শরীরের কাঁপুনি, আর বুকের দুরুদুরু হঠাৎ থেমে যায়। কামরার দরজার বাইরে পা-দানির উপর একটা মূর্তি। আবার লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠতে পেরেছে লোকটা। দরজা ঠেলে কামরার ভিতরে ঢুকেই যূথিকা ঘোষের পা-এর কাছে জুতোটাকে ফেলে দিয়ে কামরার চারদিকে তাকায় হিমু দত্ত।

সত্যিই ন স্থানং তিলধারণং। হিমু চিন্তিতভাবে কামরার এদিকে আর সেদিকে তাকাতে থাকে। তাই দেখতে পায় না, চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষ একটা হাঁপ ছেড়ে কি রকম ক'রে হাসছে, আর হিমু দত্তকেই কি একটা কথা বলতে চেষ্টা করছে।

ধন্যবাদ জানাবার চেষ্টা করছিল যূথিকা। কিন্তু লোকটা যে একবারও মুখের দিকে তাকাচ্ছেই না। ধন্যবাদ জানাবার সুযোগই পায় না যূথিকা, এবং আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে

ট্রেনের দোলানির সঙ্গে দুলতে থাকে।

ফার্স্ট ক্লাসের কামরার ভিতরে জীবনে কোনোদিন ঢোকেনি হিমু দত্ত। ফার্স্ট ক্লাসের মানুষগুলিকে দেখতেও বোধহয় একটু ভয়-ভয় করে।

গাড়ির মধ্যে মহিলা ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। সশিশু মহিলারা টান হয়ে শুয়ে আছেন, ওদের কাছে গিয়ে কোনো অনুরোধ করবার সাহস পায় না হিমু দত্ত। পুরুষেরা সবাই কামরার মেজের উপর রাখা বাক্স আর বেডিং-এর উপর বসে আছেন। এঁদের অনুরোধ করবার কোনো অর্থ হয় না। শুধু ঐ ট্রাউজার পরা ভদ্রলোক যদি...

অনুরোধ করলে শুনবে কি? একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, এই অবস্থাটা চোখে দেখিয়ে দিয়ে যদি ঐ ভদ্রলোককে একটু ছোটো হয়ে বসতে অনুরোধ করা হয়, তবে ভদ্রলোক একটু ছোট হয়ে বসতে এবং একটু জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হবে কি? ভদ্রলোকের পরনে ট্রাউজার, তাই আরও হতাশ হয়ে যায় হিমু দত্ত।

দেখতে পায় যূথিকা, ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে কি যেন বলছে হিমু দত্ত। বুঝতে পারে যূথিকা, একটু আরাম করে বসবার জন্যে জায়গা খুজছে হিমু দত্ত।

—নো নো, সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে ওঠেন ট্রাউজার পরা ভদ্রলোক।

হিমু বলে—আমি না, আমার জন্য বলছি না।

যূথিকার দিকে চোখ পড়ে ভদ্রলোকের, এবং সেই মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে আধশোয়ানো শরীরটাকে গুটিয়ে আর পা নামিয়ে পাশে আধ-হাত পরিমাণের একটা জায়গা তৈরি করেন। তারপর সাগ্রহ স্বরে হিমুকে বলেন—আসতে বলুন ওঁকে। যথেষ্ট জায়গা আছে।

যূথিকাকে এগিয়ে আসবার জন্য, এবং ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের পাশে খালি জায়গাটিতে বসবার জন্য হাত তুলে ইঙ্গিত করে হিমু দত্ত। যূথিকা ঘোষ একটু আশ্চর্য হয়। তারপরেই ছোটো একটা ভ্রূকুটি করে যূথিকা মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে আবার সেই রকমই দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে দুলতে থাকে।

মাথা নেড়ে আপত্তি করতে গিয়ে যূথিকা ঘোষের মনের ভিতরে অদ্ভুত রকমের একটা রাগের ঝাঁজও যেন তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভুরু কুঁচকে চোখ দুটো ছোটো ক'রে হিমু দত্তের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার মুখ ফেরায় যূথিকা। মুখটাও লালচে হয়ে ওঠে।

ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের এই বেহায়া উদারতার রকম দেখে রাগ করেছে কি যূথিকা? কত ব্যস্ত হয়ে, যূথিকাকে পাশে বসাবার আশায় কত খুশি হয়ে সরে বসেছেন আর জায়গা ক'রে দিয়েছেন ভদ্রলোক। কিন্তু পরের উপকার নেওয়া পছন্দ করে না যে মেয়ে, তার পক্ষে রাগ হবারই কথা। কিন্তু রাগ করে হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকায় কেন যূথিকা? চারু ঘোষের মেয়ের মনে এ আবার কোন্ রকমের ভুল? একজন অচেনা ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে বসবার জন্য যূথিকা ঘোষকে ইশারা করেছে হিমু দত্ত ; এমন ইশারা করতে পারলো হিমু দত্ত? একটুও বাধলো না। তাই কি রাগ করেছে যূথিকা?

যূথিকা ঘোষের ধারণা আর জল্পনাগুলিকে যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকে দিয়ে যূথিকার মনে আরও অস্বস্তি ভরে দিচ্ছে হিমু দত্ত। ধারণা করেছিল যূথিকা, ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের পাশে নিজের জন্য জায়গা করেছে হিমু দত্ত। সে ধারণা মিথ্যে হয়ে গেল। ধারণা করেছিল যূথিকা, ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের পাশে ঐ জায়গাতে যূথিকা যখন বসলই না, তখন হিমু দত্ত নিজেই বসে পড়বে আর মনের সুখে হাঁপ ছাড়বে। যূথিকার এই ধারণাকেও মিথ্যে করে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হিমু দত্ত।

কিন্তু কতক্ষণই বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে হিমু দত্ত? হিমু দত্তের হাত-পা আর চোখ দুটো যেন একটু সুস্থির হতে আর শান্ত হতে জানে না। কামরার এদিকে ওদিকে চোখ ঘুরিয়ে আবার কি যেন দেখতে থাকে, এবং এক একজনের নীরব ও গম্ভীর ভদ্রলোকের

কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কত রকমের ভঙ্গীতে মিনতি ক'রে কি-যেন বলতে থাকে। বোধহয় হিমু দত্তের মিনতি ব্যর্থ হয়, সাড়া না পেয়ে আবার এগিয়ে এসে যূথিকা ঘোষের বাক্সটাকেই একটা টান দেয়।

যেন কামরার ভিতরের এই মানুষ ও মালপত্রের ভিড়টাকে একটু এলোমেলো ক'রে দিয়ে বাক্সটারই জন্য জায়গা করতে চায় হিমু দত্ত। যাত্রী ভদ্রলোকেরা বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করেন ; কেউ কেউ সতর্ক করে দেন—একটু ভদ্রভাবে ধাক্কাধাক্কি করুন মশাই।

হিমু বলে—কিচ্ছু না, কাউকে একটু ছোঁবও না মশাই। শুধু এই বাক্সটাকে একটু সোজা করে রাখতে দিন।

বাক্সটাকে সোজা করে পেতে বেডিংটাকে তার পাশে কাত ক'রে দাঁড় করিয়ে দেয় হিমু দত্ত। এবং তারপরেই হেসে হেসে যেন এতক্ষণের চেষ্টায় একটা সাফল্যের গৌরবে ধন্য হয়ে যূথিকার দিকে তাকিয়ে বলে—এইবার বসুন।

—কি? ভ্রূকুটি করে যূথিকা।

—বসুন।

—আমার জন্য জায়গা করলেন নাকি?

—তবে কার জন্যে?

আনমনার মতো কি যেন ভাবে যূথিকা ; পরের কাছ থেকে এরকমের অদ্ভুত উপকার স্বীকার করে নিতে একটা লজ্জা আছে। তা ছাড়া, সত্যি কথা. যূথিকা ঘোষের মনটাও বিশ্বাস করতে পারে না, হিমু দত্তের এই চেষ্টাগুলি কি সত্যিই বিশুদ্ধ উপকার? এর পিছনে অন্য কোনো ইচ্ছা নেই? হিমু দত্তকে প্রথমে দেখে যতটা বোকা-বোকা মনে হয়েছিল, এবং এখনও দেখে যতটা সরল মনের মানুষ বলে মনে হচ্ছে, ততোটা বোকা-বোকা আর ততোটা সরল মনের মানুষ নয় বোধহয় হিমু দত্ত। ট্রাউজার-পরা ঐ ভদ্রলোকের মতো স্পর্শলোভী না হলেও হিমু দত্তের মনটা একটু ছায়ালোভীও কি নয়? ধারণা করতে পারে যূথিকা, হিমু দত্তের অনুরোধে বিশ্বাস করে এই বাক্সের উপরে বসে পড়লে ভুল হবে। সন্দেহ হয়, হিমু দত্তও বাক্সের একদিকে একটুখানি জায়গা নিয়ে যূথিকা ঘোষের ছায়া ঘেঁষে বসে পড়বে! তখন কি আর হিমু দত্তের অভদ্রতাকে ধমকে শাসন করতে পারা যাবে? কিন্তু সহ্যই বা করা যাবে কি করে?

যূথিকা ঘোষের সতর্ক মন, হিসেবী মন, আর উদাসীনের আভিজাত্যে তৈরি কঠিন অহঙ্কারে মনও যেন একটা চতুর কৌশল খুঁজে পায়। বাক্সটার সারা পিঠটা জুড়ে একেবারে পা ছড়িয়ে বসে, আর বেডিং-এর গায়ে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ে যূথিকা। যূথিকার গায়ের ছায়া ঘেঁষে বসবার আর একটুও জায়গা নেই। জব্দ হোক হিমু দত্তের গোপন ইচ্ছাটা।

অনেকক্ষণ ধরে একমনে উপন্যাস পড়ে যূথিকা। কতক্ষণ পার হয়ে গেল, সেই হুঁসও বোধহয় নেই যূথিকার। কারণ সত্যিই তো উপন্যাস পড়ছে না যূথিকা। উপন্যাসের পাতার দিকে তাকিয়ে নিজেরই জীবনের এক আশার অভিসারের আনন্দ তৃপ্তি আর উল্লাসগুলিকে মনে মনে পড়ছে। এই রাত্রিটা পার হয়ে যাবার পর আর মাত্র পাঁচ-ছয় ঘণ্টা, কিংবা একটু বেশি, তার পরেই নরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। স্টেশনে আসবে কি নরেন? মামী তো আসবেনই, কারণ বাবা নিশ্চয় একটা জরুরী টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছে। কিন্তু মামী কি বুদ্ধি ক'রে নরেনকে খবর না দিয়ে ছাড়বেন? কাল সকালেই পাটনা পৌঁছে যাবে যূথিকা, খবর নিয়ে টেলিগ্রামটা কি এখনো পাটনায় পৌঁছে যায়নি?

জব্দ হয়েছে হিমু দত্ত। হঠাৎ দু'চোখ তুলে একেবারে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায় যূথিকা,

বাঙ্কের একটা শেলফ ধরে এক ধারে দাঁড়িয়ে আছে হিমু দত্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে ; আর ঘুমন্ত মাথাটা বারবার ঝুঁকে বাঙ্কের ফ্রেমের উপর পড়ে ঠুক ক'রে বেজে উঠছে।

খোলা উপন্যাস, মিথ্যা উপন্যাসটাকে বন্ধ ক'রে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় যূথিকা ঘোষ। রাত মন্দ হয়নি। আর ঘুম-হারানো চোখ দুটোর মধ্যেও বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি যেন ছটফট করছে।

হিমু দত্তকে একটা ধমক দিতে ইচ্ছে করে। কেন? ইচ্ছেটারই উপর যেন রাগ করে যূথিকা। লোকটার একটা ডিসেন্সি বোধও নেই? কি-রকম অভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত মাথাটাকে বাঙ্কের কাঠের উপর ঠুকছে। লোকটার শরীরে কি একটু অস্বস্তিরও বোধ নেই?

তবু ভাল ; এই কামরার এতগুলি ভদ্রলোক আর মহিলা তবু বুঝতে পারবে যে, যূথিকা ঘোষের সঙ্গে একটা বাজে লোক শুধু সঙ্গী হয়ে চলেছে। কোনো আপনজন নয়। কোনো নিকট আত্মীয়তারও সম্পর্ক নেই। হিমু দত্ত যদি যূথিকা ঘোষের পাশে বসে পড়তো, তবে এই কামরার সব মানুষের চোখ কে-জানে কেমন করে তাকাতো, আর কি বুঝতো? ঐ যে শিখ মহিলা বার বার কেমন সন্দেহভরা চোখ নিয়ে একবার যূথিকার মুখের দিকে আর একবার হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, উনিই বোধহয় কোনো সন্দেহ না ক'রে একেবারে বিশ্বাস করে ফেলতেন যে, এক বাঙালী ছোকরা তার...ছি, যা নয়, তাই বিশ্বাস করে ফেলতেন ঐ শিখ মহিলা।

ট্রেন থেমেছে। এটা জসিডি। বেশ কিছুক্ষণ ট্রেনটা থেমে থাকবে। মা বলে দিয়েছেন, রাত বেশি করিস না, জসিডি পৌঁছেই খাবার খেয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিবি।

খাবারের বাক্সটাকে পাশেই দেখতে পায় যূথিকা, এবং হাত বাড়িয়ে খাবারের বাক্সটাকে কাছেও টেনে নেয়। কতগুলি লুচি আর সন্দেশ, এই তো খাবার। কিন্তু এতগুলি লুচি আর এতগুলি সন্দেশ কি জীবনে কোনোদিন একসঙ্গে খেয়েছে যূথিকা। জিনিসগুলি নষ্ট হবে। অনর্থক, আদরের বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে এত বেশি খাবার সঙ্গে দিয়েছেন মা। আশ্চর্য, মা যেন যূথিকাকে একটা ক্ষিদের রাক্ষুসী বলে মনে করেন!

না, পাটনা পৌঁছতে পৌঁছতে খাবারগুলি নিশ্চয় নষ্ট হবে না। মামীর ছেলে অরুণ আছে, মামীর মেয়ে ধীরা আছে ; বাসি লুচি-সন্দেশ খুশি হয়ে খাওয়ার মানুষ মামীর বাড়িতে আরও আছে!

খাবারের বাক্সের ভিতর থেকে অয়েল পেপারের একটা ছোটো টুকরো বের করে নিয়ে তার উপর গুনে গুনে চারটে সন্দেশ আর চারটে লুচি রাখে যূথিকা। খাবারেব বাক্স বন্ধ করে আবার পাশে রেখে দেয়।

ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ। একটা সন্দেশ মুখের ভিতর ফেলতেই চমকে ওঠে যূথিকা।

—চা চাই নিশ্চয়? চেঁচিয়ে উঠেছে হিমু দত্ত।

যূথিকা ঘোষের খাওয়ার আনন্দটাকেও যেন চমকে দিয়ে যূথিকার মনের ভিতর আবার কতগুলি বিরক্তি আর অস্বস্তি ভরে দিল হিমু দত্ত। চা চাই নিশ্চয়, কিন্তু এত চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করবার কি আছে?

কথা বলবার জন্য মুখ তুলেই দেখতে পায় যূথিকা, হিমু দত্ত নেই, প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছে এবং শোনাও যায়, চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে হিমু দত্ত--এই চা-ওয়ালা ইধার আও।

চা-এর পেয়ালা নিজেই হাতে নিয়ে দরজা ঠেলে কামরার ভিতরে ঢুকলো হিমু দত্ত এবং যূথিকা ঘোষের হাতের কাছে চা-এর পেয়ালা এগিয়ে দিলো।

কোনো কথা না বলে, আর হিমু দত্তের মুখের দিকেও না তাকিয়ে চা-এর পেয়ালা হাতে তুলে নেয় যূথিকা ঘোষ। চা-এর পেয়ালায় চুমুক দেয় এবং তারপরেই কেমন যেন সন্দেহ হয়। হ্যাঁ, চোখ তুলতেই খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পায় যূথিকা, দরজার কাছেই প্ল্যাটফর্মের

উপর দাঁড়িয়ে আছে হিমু দত্ত, আর, এক হাতে একটা শাল পাতার ঠোঙ্গা ধরে পুরি-তরকারি খাচ্ছে।

তিন চুমুকে চা শেষ ক'রে দিয়ে পেয়ালাটাকে পাশে রেখে দেয় যূথিকা, অয়েল পেপারের উপর এখনও চারটে লুচি আর তিনটে সন্দেশ পড়ে আছে, কিন্তু খাওয়া আর হলো না। যূথিকা ঘোষের হাতটা যেন রাগ ক'রে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে খাবার সুদ্ধ অয়েল পেপারের টুকরোটাকে দলা পাকিয়ে একটা আবর্জনার মতো একপাশে ফেলে রেখে দেয়। তার পরেই উপন্যাসের পাতা খুলে মনে মনে বুঝতে চেষ্টা করে, অনেক রাত হয়েছে, খাবার না খাওয়াই ভাল কিন্তু মিছিমিছি কিসের জন্য আর কার ওপর এত রাগ হলো?

চা-ওয়ালা আসে। পেয়ালা তুলে নিয়ে চলে যায়। চা-এর দামটা দিয়ে দেয় যূথিকা।

হিমু দত্ত আবার কামরার ভিতরে ঢোকে। যূথিকা ঘোষ প্রশ্ন করে—আপনার পুরি-তরকারির দাম কত? ক' আনা দিতে হয়েছে?

হিমু বলে—ছ'আনা।

ছ'আনা পয়সা হিমুর হাতের দিকে এগিয়ে দেয় যূথিকা ঘোষ। হাত এগিয়ে দিয়ে হিমু দত্তও বেশ আগ্রহের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে ছ'আনা পয়সা নিয়ে পকেটের ভিতর রাখে।

যূথিকা বলে—পয়সা গুনে নিন।

পকেট থেকে পয়সা বের করে আর গুনে নিয়ে হিমু বলে—ঠিক আছে।

সামান্য কয়েকটা কথা, এবং খুব অল্প কয়েকটা কথা কিন্তু এটুকু কথা বলতেই যেন হাঁপিয়ে পড়েছে যূথিকা ঘোষ, আর চোখ দুটোও জ্বলছে। এখন মনে হয়, এত অস্বস্তি ভোগ করে পাটনা যাবার কোনো দরকারই ছিল না। না হয়, নরেন রাগ করে বোম্বাই চলে যেত। কিন্তু হিমু দত্ত নামে এধরনের অদ্ভুত লোকের সঙ্গে একটা ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকাও যে একটা শাস্তি। বড়ো নিচ মনের লোক। এর কাছে কোনো সৌজন্য আর কোনো লজ্জা আশা করা বৃথা। লোকটা প্রশ্ন করতেও জানে না। লোকটা যে যূথিকা ঘোষকেই নামে-মাত্র একটা মেয়ে বলে মনে করেছে।

জসিডিতেই যাত্রীদের অনেকে নেমে গিয়েছে। এদিকের সীট একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারেনি যূথিকা, এরই মধ্যে কখন বেডিংটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সীটের উপর পেতে ফেলেছে হিমু দত্ত।

হিমু হাসে—আঃ, এবার আর কোনো অসুবিধা নেই। অনেক জায়গা। আপনি এবার টান হয়ে শুয়ে পড়ুন।

কি বিশ্রী ভাষা। যূথিকা ঘোষের মতো বয়সের মেয়েকে অনায়াসে টান হয়ে শুয়ে পড়তে বলে, বলতে মুখে একটু সঙ্কোচও নেই ; হিমু দত্তের ভাষা সহ্য করতে আর ইচ্ছা হয় না।

কিন্তু খোলা বেডিং-এর দিকে এগিয়ে না গিয়েও পারে না যূথিকা। সত্যিই যে টান হয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। এতক্ষণ কামরার ভিতরে ভিড়ের চাপের মধ্যে বাক্সটার উপর বসে ধুঁকতে ধুঁকতে শরীরে ব্যথাও ধরে গিয়েছে।

যূথিকা বলে—আমার ব্যাপার নিয়ে বেশি ব্যস্ত হবেন না। আপনি একটু নিজের সুবিধা ক'রে নিন।

হিমু বলে—আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি মিথ্যে ব্যস্ত হবেন না। আমার সুবিধা তো আমি ক'রে নিচ্ছিই।

বাস্তবিক, লোকটা একেবারে নিরেট। একটা ভাল কথারও সম্মান দিতে জানে না।

হিমু দত্তের কথা শুনলে রাগ হয়, এটাও যে যূথিকা ঘোষের মনের একটা দুর্বলতা। হিমুর মুখের একটা কথার অর্থ নিয়ে এত চিন্তা করাই ভুল। হিমুর কথার মধ্যে এক ফোঁটাও ঘষা-মাজা ভদ্রতা থাকবে, এটা আশা করাও ভুল। হিমুর চোখের সামনে টান হয়ে শুয়ে

পড়লেই বা কি আসে যায়? যূথিকা ঘোষ রাগ করে ওর নিজেরই মনের রাগটার উপর।

কিন্তু হিমু দত্ত বসবে কোথায়? লোকটা কি এখনও দাঁড়িয়ে থাকবে বলে মনে করেছে? সন্দেহ হয় যূথিকার, আর বোধহয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে দুলতে দুলতে বাঙ্কের কাঠের উপর ঘুমন্ত মাথাটাকে ঠুকে ঠুকে কষ্ট পাওয়ার ইচ্ছা নেই হিমু দত্তের ; হিমু দত্তও ক্লান্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে সন্দেহ করতে হয়, এই সীটেরই একদিকে বসে পড়বে না তো হিমু দত্ত?

কী বিপদ! বিছানার উপর টান হয়ে শুয়ে পড়তে গিয়েও চুপ করে বসে থাকে যূথিকা। হিমু দত্তের কাণ্ডজ্ঞানের উপর ভরসা করা যায় না। হয়তো যূথিকা ঘোষের পা-এর কাছেই বসে পড়বে। মাথার কাছে বসে পড়লেই বা কি? অস্বস্তির জ্বালায় যূথিকা ঘোষের শরীরটা জ্বলবে, আর ঘুমের দফা রফা হয়ে যাবে।

যূথিকা ঘোষের মন যেন শক্ত হয়ে এই সন্দেহগুলিকে একেবারে তুচ্ছ ক'রে আর মিথ্যে ক'রে দিতে চায়। বসুক না হিমু দত্ত, মাথার কাছে কিংবা পা-এর কাছে ; চোরা চাউনি তুলে কিংবা হাঁ ক'রে যূথিকা ঘোষের ঘুমন্ত চেহারাটার দিকে যত খুশি তাকিয়ে যা ইচ্ছা হয় ভাবুক না কেন লোকটা। রাত জেগে কাহিল হতে পারবে না যূথিকা। শুয়ে পড়তেই হবে। হিমু দত্ত এমন মানুষ নয় যে, ওর চোখের দু-একটা চোরা চাহনিকে ভয় করতে হবে। টান হয়ে শুয়ে পড়ে যূথিকা ঘোষ। হাত তুলে চোখ দুটোকে ঢাকে, যেন উপরের কড়া আলোটার ঝলক চোখে না লাগে।

এইবার যেন মনে-প্রাণে একটা ঘুম প্রার্থনা করে যূথিকা। রাতটা স্বপ্নের মধ্যে দুলতে দুলতে পার হয়ে যাক।

নরেনের সঙ্গে লতিকার কি সত্যিই দেখা হয়েছে এবার? অসম্ভব নয়। লতিকা কি নরেনকে কোনোদিন চিঠি লিখেছে? অসম্ভব নয়। নরেন কি লতিকার চিঠির কোনো উত্তর দিয়েছে? অসম্ভব! কিন্তু উত্তর দিলেই বা কি? লতিকাকে কি লিখতে পারে নরেন, সেটা কল্পনা করতে পারে যূথিকা! এবং নরেনের চিঠির সেই ভাষা আর সেই কথা পড়ে লতিকা ঘোষের মনে আর যে-কোনো ভাবনা দেখা দিক না কেন, কোনো আশা দেখা দেবে না।

শেষ যে-দিন নরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যূথিকার, কি কথা বলেছিল নরেন? হাতের ছায়ায় ঢাকা-পড়া যূথিকা ঘোষের চোখ-বোঁজা মুখটাই হেসে ওঠে।—আর বড়ো জোর একটা বছর দেখবে যূথিকা, দেখি কলকাতায় বদলি হতে পারি কিনা। যদি দেখি যে, কলকাতায় বদলি হবার কোনো আশা নেই, তবে অগত্যা তোমাকে বোম্বাই প্রবাসিনী হতে হবে যূথিকা।

প্রশ্ন করেছিল যূথিকা—লতিকার ডাক্তার দাদা তোমাদের বাড়ি গিয়ে কিসের গল্প করে এলেন?

কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু একটু মৃদু হেসে যূথিকা ঘোষের প্রশ্নের সূক্ষ্ম সন্দেহটাকে একেবারে মিথ্যে ক'রে দিয়েছিল নরেন। সেদিনের পাটনার যতো আশ্বাস যতো হাসি, যতো আলো আর শব্দগুলি যেন এখানেই এসে ঝিমঝিম ক'রে বেজে বেজে যূথিকার মনটাকেই ঘুম পাড়াতে থাকে।

একটা ছোটো স্টেশনে, কে জানে কেন, হঠাৎ থেমে গেল ট্রেনটা, এবং থামতে গিয়ে জোরে একটা ঝাঁকানি খেয়ে যাত্রীদের ক্লান্ত শরীরগুলিকে চমকেও দিলো। ঘুম ভেঙে যায় যূথিকার ; ভয় পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসে, চোখ দুটো চমকে ওঠে।—অ্যাঁ? একি? কোথায় গেলেন আপনি?

কিন্তু কই হিমু দত্ত? যূথিকা ঘোষের পা-এর কাছেও না মাথার কাছেও না। দেখতে পায় যূথিকা, কামরার দরজার পাশে সেই কোণটি ঘেঁষে, কাত হয়ে দাঁড়িয়ে, কামরার কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে অঘোর ঘুমের সুখে মজে আছে হিমু দত্ত।

এমন লোককে সঙ্গে রাখা আর না রাখা সমান। যদি কোনো চোর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে যূথিকাব গলার হার ছিঁড়ে নিয়ে চলে যেত, তবে? হিমু দত্তের দায়িত্ববোধ তো এই, যূথিকা ঘোষকে অসহায় ক'রে কামরার একদিকে ফেলে রেখে দিয়ে, নিজে আর একদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু এসব আবার কি কাণ্ড? উপরের আলোটাকে কালো কাগজের ঠোঙা দিয়ে ঢেকে দিল কে? যূথিকার গা-এর উপরের আলোয়ানটা মেলে দিল কে? তাহলে অনেকবার কাছে এসেছে, দেখেছে আর চলে গিয়েছে হিমু দত্ত। যূথিকার ঘুমের আরামটাকে বেশ ভাল ক'রে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তবু...ইচ্ছে ক'রে, বোধহয় জোর ক'রে দূরে সরে গিয়ে একটা জেদের ভান করেছে। কি মনে করে হিমু দত্ত, যূথিকা ঘোষ একেবারে খাঁটি ভদ্রতার কায়দা অনুযায়ী ওকে কাছে বসে থাকতে অনুরোধ করবে? এবং সে অনুরোধ না করলেই একেবারে ওদিকে গিয়ে, যেন কোনো সম্পর্কই নেই এই-রকম একটা পোজ নিয়ে, আর শুধু নিজেকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে একটা কাণ্ড...হিমু দত্তের কাণ্ডগুলি সত্যিই অদ্ভুত। বেশ সূক্ষ্ম একটা একরোখা জেদ আছে মানুষটার।

চোখ মেলে তাকায় হিমু। ব্যস্তভাবে যূথিকার কাছে এগিয়ে আসে। আর, পকেট থেকে সোনার একটা হার বের ক'রে যূথিকার হাতের কাছে এগিয়ে দেয়—আপনার হারটা গলা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছিল। আপনি ঘুমের ঘোরে টের পাননি।

খালি গলাটার উপর হাত বুলিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আর হাত কাঁপিয়ে হারটাকে হিমুর হাত থেকে তুলে নিয়েই গম্ভীর হয়ে যায় যূথিকা।

ছোটো একটা ধন্যবাদ জানিয়ে হিমু দত্তকে এইবার সরে যেতে বললেই তো হয়। কিন্তু ধন্যবাদের ভাষা যেন যূথিকার গলার ভিতরে আটকে গিয়েছে। তার কারণও মনের একটা অস্বস্তি, এবং অস্বস্তির মধ্যে একটা রাগের উত্তাপও আছে। ধন্যবাদ শুনতে চায় না, ধন্যবাদের জন্য কোনো লোভই নেই, পুরস্কার দাবি করে না, শুধু উপকার করবার জন্য একটা বাতিকের ঘোরে লোকের উপকার করে,. এহেন লোকের সঙ্গে কথা বলাও যে একটা সমস্যা। কি বলবে বুঝতে পারে না যূথিকা ঘোষ।

সত্যিই হারটা নিজের থেকেই গলা থেকে খুলে নিচে পড়ে গিয়েছিল তো? চারু ঘোষের মেয়ের মন মানুষকে সহজে বিশ্বাস করবার মতো মনই নয়। বিনা স্বার্থে মানুষের উপকার করবার বাতিকটাও নিঃস্বার্থ বাতিক নয়। পৃথিবীর ভয়ানক চালাকরা ভয়ানক বোকা সেজে থাকে, এ সত্যও জানা আছে যূথিকা ঘোষের। উদাসীনের খুব বিশ্বস্ত একটা চাকর ছিল, রামটহল। মনে পড়ে, রামটহলের সেই অতিসূক্ষ্ম ভালোমানুষী ছলনার ঘটনাটা। হঠাৎ একদিন একটা দশ টাকার নোট হাতে নিয়ে চারুবাবুর কাছে গিয়ে বলেছিল রামটহল—এটা কিসের কাগজ, দেখুন তো বাবা, আপনার দরকারী কোনো কাগজ নয় তো?

চারুবাবু আশ্চর্য হলেন, এবং ছোঁ মেরে নোটটাকে রামটহলের হাত থেকে তুলে নিয়ে বললেন—না, না, এটা একটা বাজে কাগজ ; কোথায় ছিল এটা?

রামটহল—খাটের নিচে ঝাড় দিতে গিয়ে পেয়েছি।

হিসাবে দশটা টাকার গরমিল কোনোদিন হয়নি ; কোনোদিন দশ টাকার একটা নোট হারিয়েছে বলে মনেও পড়ে না চারুবাবুর। তবু বুঝলেন, সত্যিই ভুল হয়েছিল নিশ্চয় ; ভুলক্রমে দশ টাকার একটা নোট নিশ্চয় ক'দিন আগে পকেটের ভিতর থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে। যাই হোক কিন্তু চাকরটা কী চমৎকার বেকুব। একেবারে প্রস্তর যুগের বুনো মানুষের মতো নিরেট একটা মুখ ; দশ টাকার নোট পর্যন্ত চেনে না।

তার পর থেকে চারুবাবু আদালত থেকে ফিরে এসে রোজই গায়ের কালো কোটটা খুলে রামটহলের হাতে দিতেন। রামটহলই কোটটাকে আলনার হুকে টানিয়ে রাখতো। কোটের

পকেটে তাড়া তাড়া নোট থাকতো ; কিন্তু কোনো আশঙ্কা নেই ; নিশ্চিন্ত ছিলেন চারুবাবু। ঐ নোট রামটহলের কাছে অর্থহীন কতকগুলি কাগজ মাত্র।

সেই রামটহল একদিন উধাও হয়ে গেল। এবং দেখা গেল, চারুবাবুর কালো কোটটা ঠিক আছে ; কিন্তু কোটের পকেটের ভিতর দু'হাজার টাকার নোটের দুটি বাণ্ডিল নেই।

যূথিকা ঘোষের গলার সোনার হার ফিরিয়ে দেওয়া রামটহলী কৌশলের মতো একটা মতলবের ব্যাপার নয় তো? ঘুমন্ত যূথিকার গলা থেকে হারটাকে নিজেই খুলে নিয়ে, তারপর এইভাবে ফিরিয়ে দিয়ে চমৎকার সাধুতার একটা কীর্তি দেখিয়ে হিমু দত্তের এই বোকা-বোকা চোখের মধ্যে ভয়ানক চালাক কিছু লুকিয়ে নেই তো? যূথিকা ঘোষ বলে—কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, হারটা খুলে পড়ে যাবে কেন?

হিমু বলে—জানি না কেন খুলে পড়ে গেল। তবে ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারেন।

হিমু দত্ত সেই শিখ মহিলাকে দেখিয়ে দেয়।

যূথিকা বিরক্ত হয়ে বলে—ঐ মহিলাকে কি জিজ্ঞাসা করতে বলছেন?

হিমু—উনি দেখেছেন, আপনার গলার হারটা খুলে নিচে পড়ে গেল। উনিই আমাকে ডাক দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, হারটা নিচে পড়ে আছে।

কথা শেষ ক'রে এবং যূথিকা ঘোষের কোনো কথা শোনবার আশায় না থেকে সরে যায় হিমু দত্ত। এবং সরে গিয়ে দরজার কাছে সেই কোণটিতে সেই ভঙ্গীতে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোবার জন্য চোখ বন্ধ করে।

অনেকক্ষণ নিথর হয়ে বিছানার উপর বসে থাকে যূথিকা। সোনার হারটাকে আবার গলায় পরানো হয়নি। হাতের মুঠোর মধ্যে কুঁকড়ে পড়ে আছে ঝকঝকে সোনার হার। হারটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সাহস হয় না। মা'র কাছে অনেক মিথ্যে কথা বলে হার হারাবার অপরাধ ঢাকতে হবে, সেই ভয়ে বোধহয় যূথিকা ঘোষের হাতটা স্তব্ধ হয়ে থাকে ; নইলে হিমু দত্তের মতো একটা লোকের সততার ছোঁয়ায় একেবারে নির্লজ্জ হয়েছে যে হারটা, সেটার স্পর্শ এখন যূথিকা ঘোষের শুধু হাতটাকে নয়, মনটাকেও কামড়াচ্ছে ; সে হার ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেই ভালো ছিল।

গিরিডি থেকে রওনা হবার পর কম সময় তো পার হয়ে গেল না। কিন্তু এই ন'ঘণ্টার মধ্যে একটা মিনিটও বোধহয় মনের আরাম নিয়ে জেগে থাকবার সময় হয়নি যূথিকার। বিরক্ত করেছে হিমু দত্ত। বারবার জব্দ করেছে হিমু দত্ত। ভয় পাইয়ে দিয়েছে হিমু দত্ত। বারবার লোকটাকে সন্দেহ করতে হয়েছে, আর সন্দেহ করেই ঠকতে হয়েছে। ইচ্ছে করেনি, তবু ওর উপকার সহ্য করতে হয়েছে।

হিমু দত্তের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল যূথিকা ঘোষ, এবং নিজেরই বোধহয় হুঁস ছিল না যে, হিমু দত্ত হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে ফেলতে পারে, এবং দেখেও ফেলতে পারে যে, চারু ঘোষের মতো মানুষের মেয়ে হিমু দত্তের মতো মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু হিমু দত্তের চেহারাটাকে যে একটা ভয়ানক গর্বের চেহারা বলে মনে হয়। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার ক্ষমতা সংসারের সবচেয়ে সাংঘাতিক নিন্দুকেরও নেই, বোধহয় এই গর্বেই মজে আছে হিমু দত্তের মন। এটাই বোধহয় ওর বাতিকের একমাত্র আনন্দ।

হিমু দত্তের এই গর্ব কি ভেঙে দেওয়া যায় না? ওর কোনো ভুল ধরে দেওয়া যায় না? যূথিকা ঘোষের মনের মধ্যে যে অস্বস্তি ছটফট করে, সেটা হলো একটা জেদ। হিমু দত্তকে

জব্দ করবার জন্য একটা জেদ। হিমু দত্তের ব্যবহারের খুঁত ধরবার একটা প্রতিজ্ঞা।

ট্রেনটা থেমেছে।

কে জানে কোন্ স্টেশন? হিমু দত্তের ঘুমন্ত চোখ সেই মুহূর্তে দপ ক'রে সতর্ক পাহারাদারের চোখের মতো জেগে ওঠে।

—শুনেছেন? ডাক দেয় যূথিকা।

এগিয়ে আসে হিমু দত্ত।

যূথিকা বলে—আপনার তো সব দিকেই নজর আছে, খুব সাবধান আপনি। আমার কোনো অসুবিধাই হতে দিচ্ছেন না। কিন্তু—

হিমু—বলুন।

যূথিকা—কিন্তু...

বলতে গিয়ে একটা শুকনো হাসি হেসে ফেলে যূথিকা—কিন্তু আপনি জানেন না যে, আমার এখনও খাবারটুকু খাওয়ারও সুযোগ হয়নি।

—কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে হিমু।

—*আপনি দেখেননি, দেখতে পাননি, দেখতে ভুলে গিয়েছেন।* যূথিকার অভিযোগের ভঙ্গীটাই হঠাৎ যেন, রুষ্ট হয়ে ওঠে। হেসে হেসে ঠাট্টা করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা আক্রোশ প্রকাশ ক'রে ফেলেছে যূথিকা।

হিমু বলে—দেখেছি।

যূথিকা আশ্চর্য হয়—কি?

হিমু—আমি দেখেছি, আপনি শুধু একটা সন্দেশ খেয়ে বাকি সব খাবার কাগজে মুড়ে ফেলে রেখে দিলেন।

কি আশ্চর্য! চমকে ওঠে যূথিকা ; তারপরেই একেবারে বোবা হয়ে হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

না, হিমু দত্তের তুলনা হয় না। হিমু দত্তের চোখ ভয়ানক সাবধান ও সজাগ চোখ। হিমু দত্তের একটি ত্রুটি ধরে অভিযোগ করবার আনন্দটুকুও যূথিকা ঘোষের কপালে জুটলো না। কিন্তু একটা প্রশ্ন তো করা যায়। বেশ রুক্ষস্বরে এবং প্রায় চেঁচিয়ে উঠে প্রশ্ন করে যূথিকা—*চোখে দেখেও তো কিছু বললেন না।*

হিমু দত্ত হাসে—বলা কি উচিত হতো?

—তার মানে? ভ্রূকুটি করে যূথিকা ঘোষ।

হিমু দত্ত আবার হাসে—বললে আপনি হয়তো ভাবতেন যে, আমি একটা অবান্তর কথা মিছিমিছি বলি আপনাকে...

—বুঝেছি। থাক, আর বলতে হবে না। যূথিকা ঘোষ আস্তে আস্তে ক্লান্ত ও অলস স্বরে কথাগুলি বলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়, আর জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে রাতের অন্ধকার দেখতে থাকে।

—বুঝতে আর অসুবিধা নেই, একেবারে মর্মে মর্মে এইবার বুঝতে পারা গিয়েছে, হিমু দত্তের মন জড়-পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। যা বলা হয় তাই শোনে, যা শোনে তাই বোঝে, যা চোখে পড়ে তাই দেখে হিমু দত্ত। নিজের থেকে কিছু শোনবার বুঝবার আর দেখবার চেষ্টা ওর মনের মধ্যেই নেই। মধুপুর স্টেশনে সেই যে শাসানি দিয়ে অবান্তর কথা বলতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিল যূথিকা, সে শাসানি স্মরণ করে রেখেছে হিমু দত্ত। কেমন যেন চাকর-চাকর মনের একটা লোক মাত্র। এহেন মানুষকে সন্দেহ ক'রে যূথিকা যে নিজেকেই ছোটো ক'রে ফেলেছে। মনে মনে এই লজ্জা স্বীকার করে যূথিকা।

তবে ভাগ্যি ভাল, যূথিকা ঘোষের মনের এই লজ্জা পৃথিবীর কারও চোখে ধরা পড়ে

যাবে না। সেই ভয় নেই। এই হিমু দত্তও কল্পনা করতে পারে না যে, ওর মতো মানুষকেও জব্দ করবার জন্য চারু ঘোষের মেয়ের মনে একটা জেদ চেপে বসেছিল! যূথিকা ঘোষেরও এই লজ্জা ভুলে যেতে কতক্ষণ লাগবে। আর একবার টান হয়ে শুয়ে মনের সুখে একটা ঘুম দিয়ে ভোর করে দিতে পারলেই হলো।

লজ্জাই বা কিসের? একটা লোক পরের উপকার করবার বাতিকে ভুগছে ; সে লোকটার ওপর রাগ হওয়াই তো উচিত। তাকে সন্দেহ করাই উচিত।

আকাশে তারা নেই। তবে কি ভোর হয়ে আসছে? অন্ধকারটা ফিকে হয়েছে? তাই তো!

পাটনা পৌঁছতে এখনও বেশ দেরি আছে। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই ভালো।

কি গভীর ঘুম! আশা করেনি, ভাবতে পারেনি যূথিকা ; ট্রেনের কামরায় একটা সীটের উপরে এলোমেলো একটা বিছানার উপর শুয়ে আর এত দোলানির মধ্যে এত ভালো ঘুম হতে পারে। ভোর হয়ে গিয়েছে কখন, জানতে পারেনি যূথিকা। সূর্য উঠেছে, সকাল হয়েছে, কামরার জানালা দিয়ে ভিতরে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, আর প্রত্যেকটা স্টেশনে এত হাঁকডাক হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারেনি যূথিকা। ঘুম ভাঙলো তখন, যখন হিমু দত্তের ডাক কানের ভিতরে গিয়ে বেজে উঠলো।—শুনছেন, পাটনা এসে পড়েছে।

—পাটনা? চমকে জেগে উঠেই প্রশ্ন করে যূথিকা।

হিমু দত্ত বলে—হ্যাঁ।

যূথিকা ঘোষ তাড়াতাড়ি হাত-ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে। হিমু দত্ত যূথিকা ঘোষের বিছানা গুটিয়ে বাঁধা-ছাঁদা করে।

ট্রেনের গতি মৃদু হয়ে এসেছে! জানালা দিয়ে মুখ বের করেই প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকায় যূথিকা। হেসে ওঠে যূথিকার চোখ। ট্রেনটা থেমে আসছে। কিন্তু এরই মধ্যে দেখে ফেলেছে যূথিকা, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে দু তিনটে চেনা মুখও হাসছে। মামী এসেছেন, মামীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে অরুণ। যূথিকাকে দেখতে পেয়ে হাত দোলাচ্ছে। আর, ফরফর ক'রে উড়ছে নরেনের গলার লালরঙা টাই। নরেনের মুখে হাসি, সেই সঙ্গে নরেনের হাতের রুমালও সুস্মিত অভ্যর্থনার মতো দুলে উঠেছে।

ট্রেন থেকে নেমে, প্রায় ছুটে গিয়ে মামীর কাছে দাঁড়ায় যূথিকা। অরুণের গাল টিপে আদর করে ; এবং তার পরেই নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে।

একটা কুলি যূথিকা ঘোষের বাক্স আর বিছানা মাথায় তুলে নিয়ে হাঁক দেয়—চলিয়ে।

যূথিকা বলে—চলো।

চলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় যূথিকা—ও হ্যাঁ...

মনে পড়েছে, হিমু দত্তকে গিরিডি ফেরবার খরচটা দিতে হবে। হাত-ব্যাগ থেকে টাকা বের ক'রে হিমুর দিকে তাকায় যূথিকা ঘোষ।

এগিয়ে আসে হিমু। হিমুর হাতে টাকা ফেলে দিয়েই যূথিকা মামীর দিকে তাকায়।—চলো এবার।

মামী বলে—ছেলেটি?...

যূথিকা বলে—ও এখন গিরিডি ফিরে যাবে।

মামী—কে ছেলেটি?

যূথিকা ব্যস্তভাবে বলে—ও কেউ নয়, সঙ্গে এসেছে, এইমাত্র।

গর্দানিবাগের মাঠের কিনারায় পলাশের মাথা ফুলে ফুলে লাল হয়ে উঠলো, তখন যূথিকা ঘোষের প্রাণটাও যেন গিরিডি ফিরে যাবার আশায় ফুলেল হয়ে ওঠে। কলেজের ছুটি হয়েছে,

এবং এখন আর পাটনাতে পড়ে থাকবার দরকার নেই। কারণ, নরেন এখন আর ছুটি পাবে না, আর পাটনাতে আসতেই পারবে না। কাজেই, এখন গিরিডিতে চলে যাওয়াই ভাল।

লতিকা অনেকদিন আগেই গিরিডি চলে গিয়েছে। এবারের পাটনা জীবনের ঘটনাগুলির ইতিহাস মনে পড়লে মনে মনে হেসে ফেলে যূথিকা। নরেনকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে অন্তরঙ্গ হবার জন্য কতই না কষ্ট করেছিলেন লতিকার দাদা ডাক্তার শীতাংশু। কিন্তু যূথিকার মামী লতিকার ঐ ডাক্তার দাদার চেয়ে অনেক চালাক। যে দুটো দিন পাটনাতে ছিল নরেন, সে দুটো দিন চারবেলা নিমন্ত্রণ করে রেখেছিলেন মামী। লতিকার ডাক্তার দাদার নিমন্ত্রণ স্বীকার করবার সুযোগ পায়নি নরেন।

কিন্তু নরেনের মনটা একটু উদার, এবং কোমলও বটে। যূথিকার কাছেই কথায় কথায় অভিযোগ করেছিল নরেন, মামী এরকম চারবেলা ধরে একটা জবরদস্ত নেমন্তন্ন না খাওয়ালেই ভাল করতেন। শীতাংশুদা বেচারা নিজে এসে বারবার কত অনুরোধ করলেন ; ওঁদের বাড়িতে গিয়ে এককাপ চা খেয়ে এলেও কত খুশি হতেন শীতাংশুদা।

যূথিকা গম্ভীর হয়ে বলেছিল—লতিকাও নিশ্চয় খুশি হতো।

নরেন—তা, খুশি হতো নিশ্চয়।

যূথিকা—গেলেই পারতে।

নরেন হাসে—যেতে পারলে ভালোই ছিল, কিন্তু পারলাম কোথায়? সব ভালো নরেনের, শুধু ওর এই মনের দুর্বলতাটা ভালো লাগে না যূথিকার। লতিকার ডাক্তার দাদা শীতাংশুবাবুর জন্য নরেনের এত বেশি শ্রদ্ধার আবেগও যূথিকা ঘোষের ভালো লাগে না।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল মামীর চেষ্টা এবং যূথিকার ইচ্ছা। যে দুটি দিন পাটনাতে ছিল নরেন, যূথিকার সঙ্গে চারবেলা দেখা হয়েছে। দু'দিন সন্ধ্যাবেলা দু'জনে বেড়িয়ে এসেছে। এবং দু'জনের মনের কথা দু'জনের কানের কাছে আবার নতুন করে বলে বলে অনেক মুখরতা করেছে দু'জনে। কোনো সন্দেহ নেই যূথিকার, নরেনের মনও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, শুধু এ ভাবে বছরে কয়েকবার চোখের দেখা দেখে, আর যূথিকাকে শুধু দু'দিনের বেড়াবার আর গল্প শোনার সঙ্গিনীরূপে কাছে পেয়ে তারপরেই বোম্বাই চলে যেতে ভালো লাগে না নরেনের। কিন্তু এখনও তৈরি হতে পারছে না নরেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, কলকাতায় বদলি হবার সুযোগ পাওয়ার আগেই যূথিকাকে বিয়ে করে হঠাৎ অত দূরে বোম্বাই-এ নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা।

যূথিকা বলে—বিয়েটা হয়ে যাক না ; বোম্বাই না হয় পরে যাব।

হেসে ফেলে নরেন—অপেক্ষা করতে কি তোমার ভয় হচ্ছে, কোনো সন্দেহ হচ্ছে যূথিকা।

—ছিঃ। কি যে বল! বরং তোমার মুখে এরকমের প্রশ্ন শুনতেই ভয় করে।

—তবে অপেক্ষা করো, মৃদু হেসে যূথিকাকে আশ্বাস দেয় নরেন।

—কিন্তু এভাবে আশ্বস্ত হতে যেন হাঁপিয়ে উঠছে যূথিকার প্রাণ। মনের ভিতরে কোথায় যেন একটা কাঁটার খোঁচা খচখচ করে। ভালোবেসেও শান্ত হয়ে শুধু অপেক্ষা করার একটা ভয়ানক শক্তি যেন নরেনের আছে। লতিকাদের বাড়িতে যাবার জন্য, ডাক্তার শীতাংশুদার অনুরোধ রাখবার জন্য নরেনের মনের দুর্বলতাগুলিও যেন নরেনের একটা শক্তি। তাই যূথিকার মনটা যেন মাঝে মাঝে অবসন্ন হয়ে যায়। ভালোবাসতে গিয়ে কি এভাবে কেউ হাঁপিয়ে পড়ে? এত সাবধান হতে হয় কি? বারবার এত দুর্ভাবনা নিয়ে গিরিডি থেকে ছুটে আসবার দরকার হয় কি? হারাই হারাই সদা ভয় হয়, এই বুঝি ভালোবাসার লক্ষণ?

নরেনের বোম্বাই রওনা হবার দিন স্টেশনে গিয়েছিল যূথিকা। মামীও গিয়েছিলেন। আর, কি আশ্চর্য লতিকার ডাক্তার দাদাও গিয়েছিলেন। লতিকা অবশ্য যায়নি, এবং কেন যাবার

সাহস হয়নি লতিকার, সেটা অনুমান করতে পারে যূথিকা। যূথিকা আছে যে! একেবারে জলজ্যান্ত যূথিকার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নরেনের সঙ্গে কথা বলবে লতিকা, এমন সাহসী প্রাণী নয় লতিকা। যাই হোক, ডাক্তার শীতাংশুদার এসেও কোনো লাভ হয়নি। ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নরেনের সঙ্গে অনর্গল করে বললেন মামা ; শীতাংশুদা নরেনের সঙ্গে একটা কথা বলবারও সুযোগ পেলেন না।

পাটনার এই জীবনের কয়েক মাস আগের এই ইতিহাসের এক একটি ঘটনায় যূথিকা ঘোষের আশা জয়ের গর্বে ভরে উঠেছে। শুধু একবার মনে হয়েছিল, এবং মনটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, নরেনের একটা চিঠির ভাষাতে একটু অবান্তর কৌতূহলের মায়া ছিল। লিখেছিল নরেন, লতিকা বোধহয় এখন পাটনাতে আছে। যূথিকার চিঠি লিখতে গিয়ে লতিকার কথা মনে পড়ে নরেনের, এটা যে নরেনের মনের পক্ষে একটুও উচিত নয় ; সরল মনের নরেন এটুকুও বুঝতে পারে না।

গর্দানিবাগের পলাশের লাল দেখতে আর কি-এমন সুন্দর! মধুপুর পার হলেই দু'পাশের মাঠে পলাশের মাথাগুলি এমন যে রঙীন আগুনের স্তবকের মতো ফুটে রয়েছে। যূথিকাকে গিরিডি নিয়ে যাবার জন্য কবে আসবেন বলাইবাবু?

মামী এসে বললেন--গিরিডি থেকে কুসুমদির চিঠি এসেছে: বলাইবাবু আসবেন না। লিখেছেন--

মামীর হাত থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে যূথিকা পড়ে।--ব্যবস্থা হয়েছে, হিমুই তোমাকে গিরিডি নিয়ে আসবে। পরেশবাবুর পিসিমাকে কাশী রেখে আসতে গিয়েছে হিমু, হিমুকে বলে দেওয়া হয়েছে, টেলিগ্রাম করে তোমাকে আগেই জানিয়ে দেবে, কখন কোন্ ট্রেনে দানাপুর পৌঁছবে হিমু। মামী যেন তোমাকে বাড়ির গাড়িতে দানাপুর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

--হিমু কে? প্রশ্ন করেন মামী।

--হিমাদ্রিবাবু। হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উত্তর দেয় যূথিকা। আর মুখের উপরেও যেন মাঠের পলাশের লাল আভাটা ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ে।

--হিমাদ্রিবাবু কে? আবার প্রশ্ন করেন মামী।

--তুমি তো তাকে দেখেছো। ঐ যে, যে ভদ্রলোক এবার আমাকে গিরিডি থেকে নিয়ে এলো।

--তাই বল। ছেলেটিকে দেখে বড়ো ভালো ছেলে বলে মনে হলো।

--ভালো বৈকি।

--ছেলেটি দেখতেও বেশ।

--তা, খারাপ কেন হবে?

--তেমন শিক্ষিত নয় বোধহয়?

--একটুও শিক্ষিত নয়। কিন্তু...

--অবস্থাও বোধহয় খারাপ?

--ঠিক জানি না, তবে গরীব মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

মামী মুখ টিপে হাসেন--দূর পাগল মেয়ে ; যার তার সম্বন্ধে বলতে নেই।

পাটনা থেকে কতবার গিরিডি যেতে হয়েছে, কিন্তু যূথিকা ঘোষের মুখটা সে যাত্রার জন্য তৈরি হতে গিয়ে এরকম খুশিতে লালচে হয়ে উঠেছে কি কখনও? কোনোদিনও না। এতদিন তো শুধু গিরিডি থেকে পাটনা ছুটে আসার পালাটাই জীবনের একটা ভাবনামধুর আর উদ্বেগসুন্দর পালা ছিল। কিন্তু গিরিডি থেকে ফিরে যাওয়ার হয়রানিটাও যে কল্পনায় মিষ্টি হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছে কি যূথিকা?

হিমুর টেলিগ্রাম এলো, আজই রাত আটটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনে দানাপুর পৌঁছবে হিমু, এবং

যূথিকা ঘোষ যেন টিকিট কিনে সেই ট্রেনেই উঠবার জন্য যথাসময়ে দানাপুরে উপস্থিত থাকে।

এখন দুপুর মাত্র ; অনেক সময় আছে। কিন্তু যূথিকা ঘোষের ব্যস্ততা দেখে হেসে উঠলেন মামী—মামীর বাড়িতে কি খেতে পাচ্ছিলো না যূথি, গিরিডি যাবার নাম শুনেই লাফিয়ে উঠলো কেন?

দানাপুরের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আগন্তুক আটটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনটাকে দেখতে পেয়ে হেসে ওঠে যূথিকা ঘোষের মুখ। এবং ট্রেন থামবার পর, একটি কামরা থেকে হিমুকে নেমে আসতে দেখে সে হাসিটা আর একবার চমক দিয়ে যেন আরও সুন্দর হয়ে গেল।

ট্রেন ছাড়লো যখন, তখন কামরার একই সীটের উপর হিমুর পাশে ধপ করে বসে পড়ে যূথিকা ঘোষ, আর হাঁপ ছেড়ে বলে—আঃ, আমাকে গিরিডি নিয়ে যাবার জন্য আপনিই আবার আসবেন, আমি কোনোদিন ধারণাও করতে পারিনি।

হিমু—হ্যাঁ, আমি কাশী যাচ্ছি শুনতে পেয়ে আপনার মা ডেকে পাঠালেন, আর...

যূথিকা—সব জানি, সব জানি। আজই মা'র চিঠি পেয়েছি...যাই হোক, আমাকে কিন্তু পরের স্টেশনেই চা খাওয়াতে হবে ; সেই বিকালে এক কাপ খেয়েছিলাম, তারপর আর...আমার ব্যাগটা ওপর থেকে একবার নামিয়ে দিন তো হিমাদ্রিবাবু, প্লীজ...আর দেখুন তো একবার, সীটের নিচে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন না, জলের কুঁজোটা উঠেছে, না দানাপুরেই পড়ে রইল?

উঠে দাঁড়ায় হিমু, আর যূথিকা ঘোষের এতগুলি নির্দেশের ইঙ্গিতে খাটতে গিয়ে যেন তাল সামলাতে পারে না। বাঙ্কের উপরে তাকিয়ে হিমু বলে—না, জলের কুঁজো নেই। আর উবু হয়ে বসে মাথা নিচু করে সীটের নিচে তাকিয়ে বলে—কই, আপনার ব্যাগ এখানে নেই।

খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে যূথিকা—আপনারও এরকম ভুল হয়? আপনি না খুব স্মার্ট, কাজের মানুষ!

বিব্রতভাবে তাকায় হিমু—কি হলো?

যূথিকা বলে—ব্যাগটা বাঙ্কের ওপরে, আর কুঁজোটা সীটের নিচে।

লজ্জিত হয় হিমু। আবার বাঙ্কের দিকে আর সীটের নিচে তাকিয়ে নিয়ে বলে—হ্যাঁ, ঠিক সবই আছে।

যূথিকা—তবে দিন।

হিমু—কি?

যূথিকা—এক গেলাস জল।

কুঁজো থেকে গেলাসে জল ঢেলে যূথিকার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় হিমু।

যূথিকা হাসে—আপনি খান। আপনার জন্যেই জল চেয়েছি।

হিমু একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায়। যূথিকা বলে—আমি দেখেছি হিমাদ্রিবাবু দানাপুর স্টেশনে আপনি জলের কলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন...কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিল বলে জল না খেয়েই চলে এলেন।

জল খেয়ে নিয়ে হিমু বলে—ওঃ, এরকম কাণ্ড তো সারা জীবন ক'রে আসছি। ওসব গা-সহা হয়ে গিয়েছে।

যূথিকা ঘোষের চোখ, উদাসীনের কঠোর আভিজাত্যে তৈরি দু'টি চোখ অপলক হয়ে হিমু দত্তের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। বোকা হিমু দত্তের মুখের ভাষাকে যে কবির ভাষার মতো মনে হয়। তেষ্টা পায়, এবং ছুটেও যায় হিমু দত্ত। কিন্তু বেশি দূর এগিয়ে

যাবার সৌভাগ্য হয় না। তেষ্টার বেদনা বুকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে যায়, নইলে ট্রেন ছেড়ে যাবে।

চারু ঘোষের মেয়ে তার নিজের মনটাকে বুঝতে চেষ্টা করে, এবং আশ্চর্যও হয়। হিমু দত্তের উপর আজ আর একটুও রাগ করতে পারছে না কেন মনটা? যার উপকার সহ্য করতে করতে বিরক্ত হয়ে গিরিডি থেকে পাটনা পর্যন্ত সারাটা পথ বিশ্রীভাবে কেটেছিল, তারই কাছে আজ উপকার চাইতে ইচ্ছা করছে। হিমু দত্তকে খাটাতে ইচ্ছে করছে! এক গেলাস জল দিক, ব্যাগটা হাতে তুলে দিক। পরের স্টেশনে ট্রেন থামলেই যেন নিজে নেমে গিয়ে আর নিজের হাতে চা-এর কাপ এনে যূথিকার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় হিমু।

বোধহয় প্রায়শ্চিত্ত করছে যূথিকা ঘোষের সেদিনের অকারণ ক্ষোভে রাগে আর সন্দেহে অভিভূত মনটা। ভদ্রলোক একটু বেশি ভালোমানুষ হয়েই বোধহয় জীবনের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ করেছে।

যূথিকা হঠাৎ বলে—আপনি তো সবারই উপকার করেন হিমাদ্রিবাবু।

হিমু হাসে—যদি কেউ ডাকে এবং যদি আমার সাধ্যি থাকে, তবে তাকে একটু সাহায্য করি, এই মাত্র।

যূথিকা হাসে—এই জন্যেই আপনার উপকারের দাম কেউ দিল না।

হিমু—দামই যদি পেলাম, তবে উপকার করা আর হলো কোথায়?

যূথিকা—আপনার এই বাতিকের কোনো অর্থ হয় না।

হিমু—হ্যাঁ, আপনার বাবা তাই বলেছিলেন বটে।

চমকে ওঠে যূথিকা, যূথিকার চোখে একটা বেদনার ছায়াও দেখা যায়।

—বাবার কথা শুনে আপনি সেদিন বোধহয় খুব দুঃখিত হয়েছিলেন?

হিমু—হয়েছিলাম ; কিন্তু তাতে কি আসে যায়!

যূথিকা উঠে দাঁড়ায়!—না, আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই। মোট কথা...

হিমু—বলুন।

যূথিকা—আমি চা খেয়েই শুয়ে পড়বো। আর, আপনি...সাবধান...

হিমুর চোখের দৃষ্টিও কঠোর হয়ে ওঠে—কিসের সাবধান করছেন?

যূথিকা—আপনি আবার ঐ দরজার পাশের কোণটিতে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে, কাঠের উপর মাথা ঠুকে ঠুকে ঘুমোতে পারবেন না।

হিমুর চোখের কঠোর দৃষ্টিটা কেন হঠাৎ বিস্ময় আর লজ্জার সব উত্তাপ হারিয়ে শান্ত হয়ে যায়। যূথিকা ঘোষের কাছ থেকে সমবেদনার মতো অদ্ভুত একটা কোমল অনুভবের ধমক খেতে হবে, কল্পনা করতে পারেনি হিমু। নিজেরই রুক্ষ মেজাজের উপর রাগ হয় ; এবং হাসতে চেষ্টা করে হিমু—সেদিন গাড়িতে একটুও জায়গা ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে...

যূথিকা—জায়গা থাকলেই বা কি? আপনি আমার কাছে থাকবেন। এখানেই বসে থাকবেন, নইলে—সত্যিই আমার ভয় করবে হিমাদ্রিবাবু।

হিমু—না না, ভয় কিসের? আপনি নিশ্চিত মনে ঘুমিয়ে পড়ুন।

কামরার আর এক প্রান্তের সীটের উপর বসে আছেন যে প্রৌঢ়া বাঙালী মহিলা, তিনি অনেকক্ষণ ধরে যূথিকা ও হিমুর ভাষাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। সুতরাং, তাঁর চোখে একটা সন্দেহের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

যূথিকার চোখ প্রৌঢ় বাঙালী মহিলার চোখের দিকে পড়তেই হিমুর গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে আর মুখের হাসিটা চাপা দিতে চেষ্টা ক'রে যূথিকা চাপা স্বরে ডাকে—হিমাদ্রিবাবু।

—কি?

—দেখছেন তো।

—কি দেখতে বলছেন?

—আস্তে কথা বলুন। সব শুনতে পাচ্ছেন ঐ মহিলা।

—কি শুনতে পেয়েছেন?

—আমাদের কথা।

—তাতে ক্ষতি কি?

—তাতে ভয় আছে।

—কিসের ভয়?

—উনি সন্দেহ করছেন।

—কি সন্দেহ?

—আপনি কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না?

—না।

—উনি সন্দেহ করেছেন, আমরা বোধহয় স্বামী-স্ত্রী নই।

—বাজে সন্দেহ। লজ্জিত হয়ে মাথা হেঁট করে হিমু, আর হাসতে থাকে।

যূথিকা হেসে হেসে ফিসফিস করে—আঃ, আপনি অকারণে বেচারার ওপর রাগ করছেন। আপনার ব্যবহার দেখে আপনাকে আমার দাদা বলেও কেউ মনে করবে না।

হিমু—সে তো সত্যি কথা।

যূথিকা—কোনো আত্মীয় বলেও মনে করবে না।

হিমু—হ্যাঁ, তাই বা মনে করবে কেন?

যূথিকা—স্বামী বলেও মনে করবে না।

হিমু—আপনিও বড়ো বাজে কথা বলতে পারেন।

যূথিকা—আমি বলতে চাই, আমাকে দেখে তো কেউ বিবাহিত মেয়ে বলে মনে করতে পারে না।

হিমু—তা তো নিশ্চয়।

যূথিকা হাসে—তাই উনি বোধহয় ভাবছেন যে, একটা বেহায়া মেয়ে তার ছেলেবন্ধুর সাথে কোথায় যেন সরে পড়েছে।

হিমু হাসে—আপনি মিছিমিছি মহিলাকে সন্দেহ করছেন। উনি এসব কিছুই ভাবছেন না।

যূথিকা—আপনাকে ও আমাকে যদি দুই বন্ধু বলে উনি মনে করেন, তবে কি ভুল হবে?

হিমু—না, সেটা মনে করা ভুল হবে কেন?

একটা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। যূথিকা ব্যস্তভাবে বলে—চা, আমার চা কই হিমাদ্রি, হিমাদ্রিবাবু।

—দেখি, অন্তত চেষ্টা করে তো দেখি। বলতে বলতে কামরা থেকে নেমে যায় হিমু। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে থাকে যূথিকা। এবং মনে মনে একটা বিক্ষোভ আগে থেকেই তৈরি করে রাখে ; যদি শুধু এক পেয়ালা চা নিয়ে আসে হিমু, তবে বেশ অভদ্রভাবে দুটো কড়া কথা হিমুকে শুনিয়ে দিতে হবে। এই তোমার আক্কেল? তোমার চা কই? বন্ধুত্বের সাধারণ একটা নিয়মও জান না?

নিজের মনের এই কল্পনা নিয়ে মনে মনে হেসে রেগে কতক্ষণ নিজেকে মাতিয়ে রেখেছিল বুঝতে পারেনি যূথিকা। ট্রেনের ইঞ্জিনটা তীব্র একটা শিস দিয়ে রাত্রির বাতাস কাঁপিয়ে দিতেই চমকে ওঠে যূথিকা। আঃ, এক কাপ চা নিয়ে আসতে এত দেরি করছে কেন হিমাদ্রি? সত্যিই তো নিজের হাতে চা-এর পেয়ালা বয়ে নিয়ে আসবার জন্য ওকে বলা হয়নি? একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে আনলেই হয়। আর, তারপর হিমাদ্রি যদি এখানে জানালার কাছে, প্ল্যাটফর্মের ঠিক এই জায়গাটিতে আলো ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে চা-ওয়ালার

হাত থেকে পেয়ালাটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে যূথিকার হাতের কাছে তুলে দেয়, এবং তারপর যদি নিজে এক পেয়ালা চা নিয়ে খেতে খেতে যূথিকার সঙ্গে গল্প করে, তা হলেই তো ওকে আর নিছক একটা বাতিকের মানুষ বলে অভিযোগ করতে হয় না। তাহলে মেনে নিতে হবে, বন্ধুত্ব বুঝবার মতো মন ওর আছে। এবং বুঝতেও পারা যাবে যে, খুব বোকাটি নয় হিমাদ্রি, বন্ধুত্ব করবার রীতি-নীতিও বেশ ভালোই জানে।

দুলে উঠলো ট্রেনটা, তারপরেই চলতে শুরু করলো।

কিন্তু হিমাদ্রি? কোথায় হিমাদ্রি? জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সারা স্টেশনের এদিকে আর ওদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে যূথিকা, হিমাদ্রি কোথাও নেই! লাফ ঝাঁপ দিয়ে কত যাত্রীই কত কামরার দরজায় উঠে পড়লো, কিন্তু প্ল্যাটফর্মের কোনো প্রান্ত থেকে হিমাদ্রির মতো দেখতে কোনো ছায়ামূর্তি চলন্ত ট্রেনের এই কামরার দিকে ছুটে আসছে না।

...হিমাদ্রি! চেঁচিয়ে ডাক দেয় যূথিকা। যূথিকার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরের আহ্বান চলন্ত ট্রেনের চাকার শব্দে ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। প্ল্যাটফর্মের ল্যাম্পপোস্টগুলি চকিত ছবির মতো যূথিকার চোখের উপরে একটা আতঙ্কের ধাঁধা রেখে গিয়ে তরতর ক'রে পার হয়ে যাচ্ছে। বেশ জোরে ছুটতে আরম্ভ করেছে ট্রেন।

—হিমাদ্রি! হিমাদ্রি! কামরার জানালা দিয়ে বাতাসে আর্তনাদ ছুঁড়তে ছুঁড়তে যূথিকার গলা ধরে যায়। নেতিয়ে পড়ে মাথাটা। আর চোখের কোণ দুটো তপ্ত হয়েই ভিজে যায়।

একি হলো? একটা তামাসা করতে গিয়ে, কে জানে কোন বিপদের মধ্যে হিমাদ্রিকে ফেলে দিয়ে চলন্ত ট্রেনটার সঙ্গে হুহু ক'রে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে যূথিকা ঘোষের জীবনটা!

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, নিশ্চয় কোনো না কোনো কামরায় উঠে পড়েছে হিমাদ্রি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না যূথিকা। নিশ্চয় মানুষটা স্টেশনেই কোথাও পড়ে আছে, কিন্তু পড়ে রইল কেন?

একসঙ্গে মনের ভিতরে অনেক ভয় আর অনেক সন্দেহ ছটফট করতে থাকে। এবং জানালা দিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে, যেন কামরার আলোর চোখটাকে আড়াল করে নিজের চোখ দুটোকে অন্ধকারের গায়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে যূথিকা ; কি ভয়ানক ঠাট্টা ক'রে মানুষকে জব্দ করতে পারে হিমাদ্রি।

কতক্ষণে আর একটা স্টেশন আসবে, আর ট্রেনটা থামবে? এবং তারপরেও যদি দেখা যায় যে হিমাদ্রি এলো না, তবে? সত্যিই যদি অন্য কোনো কামরাতে না উঠে থাকে হিমাদ্রি, তবে?

তবে আর কি? গিরিডি পর্যন্ত ট্রেনের ভিতরে সঙ্গীহীন কয়েকটা ঘণ্টার জীবন চুপ ক'রে সহ্য করতে হবে, এই মাত্র। ধমক দিয়ে আর রাগ ক'রে নিজেকে বুঝিয়ে দিয়েও বুঝতে পারে যূথিকা, এই কয়েকটা ঘণ্টার জীবনই যে অসহ্য হয়ে উঠবে। পাঁচটা মিনিটও মনের শান্তি নিয়ে বসে থাকা যাবে না, টান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া আর স্বপ্ন দেখা তো দূরের কথা।

বাবা যখন প্রশ্ন করবেন, একলা এসেছিস মনে হচ্ছে, তখন বাবার মুখের উপর দু'কথা ভালো করে শুনিয়ে দেওয়া যাবে। হিমাদ্রিকে তোমাদের বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে। এবং ভবিষ্যতে যেদিন হিমাদ্রিকে ধরতে পারা যাবে, সেদিন কৈফিয়ৎ চাইতেও অসুবিধা হবে না,—এরকম একটা কাণ্ড করল কেন হিমাদ্রি? চা আনতে গিয়ে পালিয়ে গেল কেন?

কিন্তু হিমাদ্রির জন্য কেউ যদি এসে কৈফিয়ৎ দাবি করে, কই আমাদের হিমাদ্রিকে কোথায় ফেলে রেখে তুমি একলা হেসে হেসে গিরিডিতে ফিরে এলে মেয়ে, তবে? তবে কি

উত্তর দেবে যূথিকা? যদি সিঁদুর দিয়ে রাঙানো সিঁথি নিয়ে, মাথার কাপড়টা একটু সরিয়ে নিয়ে, কুড়ি বছর বয়সের ঢলঢলে মুখটি তুলে কোনো মেয়ে এসে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—কি গো চারু ঘোষের মেয়ে, ওকে কোথায় ফেলে রেখে এলে? তুমি কি মনে করেছো ওর কেউ নেই?

সত্যিই হিমাদ্রির এরকম কেউ আছে কি? যদি থেকে থাকে, তবে সে যে তার চোখের দৃষ্টিকে জ্বলন্ত শিখার মতো কাঁপিয়ে আর কেঁদে কেঁদে যূথিকা ঘোষকে অভিশাপ দেবে।—তুমি একটা খেয়ালের তামাশা করে যে সর্বনাশ করলে, সে সর্বনাশ যেন তোমারও হয়।

জানালার উপর মাথা রেখে আর বদ্ধ নিঃশ্বাসের একটা গুমোট বুকের মধ্যে নিয়ে বৃথা ঘুমোবার চেষ্টা করতে গিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনার মধ্যে ছটফট করতে থাকে যূথিকা। না মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে বলেই বোধহয় যত অদ্ভুত কল্পনা আর চিন্তা মাথা জুড়ে লাফালাফি করছে।

সোঁ সোঁ ক'রে হাওয়া কেটে যেন উড়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। ভয়ানক শব্দ। বোধহয় একটা নদীর পুল পার হয়ে চলে যাচ্ছে ট্রেন। যূথিকার মাথার উপর যেন ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফোয়ারা ছুটে এসে পড়ছে। ঘুম আসছে ঠিকই, ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

তারপর আর চেষ্টা করতে বা ইচ্ছে করতে হয় না। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে যূথিকা।

যূথিকার ঘুম কেউ ভাঙায়নি। ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়ায় আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়া যূথিকার কান দুটোর বধিরতার ঘোর তবু হঠাৎ ভেঙে যায়। শুনতে পায় যূথিকা ট্রেনের কামরাটা যেন কথা বলছে।

—তুমি ছিলে কোথায়? মেয়েটি এতক্ষণ কি ভয়ানক ছটফট করেছে। শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারা।

—চা তৈরি করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। তা ছাড়া চা-এর দোকানটাও তো প্ল্যাটফর্মের উপর নয়, বেশ একটু ভেতরের দিকে। হঠাৎ ট্রেনটা ছেড়ে দিতেই দৌড়ে এসে শেষের দিকে একটা কামরায় উঠে পড়লাম।

—কি দরকার ছিল, সামান্য চা-এর জন্য এত দূরে যাবার?

—ভেবেছিলাম, তাড়াতাড়ি চা-টা পেয়ে যাব। কিন্তু...।

—তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

—গিরিডি।

—তোমার বাড়ি গিরিডি?

—না ; ঠিক আমার বাড়ি গিরিডি নয়।

—শ্বশুরবাড়ি?

—না না, সে-সব কিছু নয়।

—তোমাদের বিয়ে বোধহয় বেশিদিন হয়নি।

—না না, সে-সব কিছু নয়, আপনি খুব ভুল বুঝেছেন।

চমকে চোখ মেলে তাকায় যূথিকা, এবং বুঝতে পারে ঐ প্রৌঢ়া বাঙালী মহিলা হিমাদ্রির সঙ্গে এতক্ষণ ধরে যে-কথা বলছিলেন, সেকথাই ঘুমন্ত যূথিকার স্বপ্নে ভাষা হয়ে কানের মধ্যে বেজেছে। যূথিকার পাশেই বসে আছি হিমাদ্রি। ট্রেনটা থেমে রয়েছে।

যূথিকা—ভ্রূকুটি ক'রে গম্ভীর হয়ে বলে—তুমি এরকম একটা কাণ্ড করলে কেন হিমাদ্রি?

হিমু—আপনি বিশ্বাস করুন যে...।

যূথিকা—বেশি আপনি আপনি করবে না। শুনতে বিশ্রী লাগে। তোমার বয়সের চেয়ে আমার বয়স কিছু কমই হবে।

হিমু—বেশ তো। বিশ্বাস করো ; চা-ওয়ালা লোকটা সামান্য এক পেয়ালা চা তৈরি করতে

এত দেরি ক'রে দিল যে ট্রেনটা ছেড়ে দিলো।

যূথিকা—যদি ট্রেনে উঠতে না পারতে, তবে?

হিমু বিব্রতভাবে বলে—হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে খুব বিপদে পড়তে হতো। তোমার বাবার কাছে আমাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হতো।

যূথিকা—তোমার কেউ একজন এসে যদি আমার কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করে বলতো, হিমাদ্রি কোথায়? তবে কি হতো? কি বলে তাকে আমি বোঝাতাম যে, আমার বিশেষ কিছু দোষ নেই?

—আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে আসবে কে? কি বলছো তুমি? হাসালে তুমি।

—কেউ নেই?

—কেউ নেই ; তুমি কি জান না?

—আমি জানবো কেমন করে?

—গিরিডির সকলেই তো জানে।

—তা জানুক, আমি গিরিডির সকলের মতো নই। আমি কারও হাঁড়ির খবর জেনে বেড়াই না।

—যাই হোক ; বলতে গিয়ে হেসে ফেলে হিমু। আমার কৈফিয়ৎ তো শুনলে ; এইবার বিছানাটা পেতে দিই, কেমন?

—না, থাক।

—কতক্ষণ জেগে বসে থাকবে?

—যতক্ষণ পারি।

—না না, রাত জেগে কোনো লাভ নেই।

—লাভ আছে।

—কি?

—গল্প করতে পারা যাবে।

হিমু হাসে—আমার সঙ্গে গল্প করলে তোমার লাভ হবে না যূথিকা।

যূথিকার চোখ আবার গম্ভীর হয়।—তার মানে?

হিমু হাসে—আমি সত্যিই গল্প টল্প জানি না, বলতেও পারি না যূথিকা। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা, যাদের আমি পড়াই, তারাও আমার উপর ভয়ানক রাগ করে, গল্প বলতে পারি না বলে। ভুলু একদিন বলেই ফেললো, মাস্টার মশাইটা কিছু জানে না।

যূথিকা—এই তো বেশ গল্প করতে পারছো।

প্রৌঢ়া বাঙালী মহিলা উপরের আলোটার দিকে একবার তাকিয়ে যেন রাগের সুরে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন—কি যে কাণ্ড, ছিঃ ; ভগবান জানেন কি ব্যাপার!

মাথা হেঁট ক'রে মুখের হাসি লুকিয়ে এবং হাতটাকেও লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে দিয়ে হিমুর কামিজের পকেটটা ধরে টান দেয় যূথিকা। ফিস ফিস ক'রে বলে—শুনলে তো হিমাদ্রি, মহিলা কি বলছেন?

হিমু—না, ঠিক শুনতে পাইনি।

যূথিকা—মহিলা একটা সমস্যায় পড়েছেন।

হিমু—কিসের সমস্যা?

যূথিকা—উনি বুঝতে পারছেন না, কে কার সঙ্গে চলেছে। তোমার সঙ্গে আমি যাচ্ছি, না আমার সঙ্গে তুমি যাচ্ছ।

হিমু হাসে—তোমার কাণ্ড দেখে মনে হতে পারে, তোমার সঙ্গেই আমি যাচ্ছি।

যূথিকা—তার মানে, মহিলা তোমাকে একটা অপদার্থ বলে মনে করেছেন।

হিমু—অনেকেই তো তাই মনে করে, মহিলাও তাই মনে করবেন, তার আর আশ্চর্য কি?

যূথিকা—অনেকে মানে? কে কে?

হিমু—তা কি আর মনে করে রেখেছি? দেখেছি, অনেকেই তাই মনে করে।

যূথিকা—সেই অনেকের মধ্যে আমিও আছি বোধ হয়?

হিমু—থাকলে দোষ কি?

যূথিকা কটমট ক'রে হিমাদ্রির মুখের দিকে তাকায়—ওভাবে বেঁকিয়ে কথা বলো না। ঠিক ক'রে, স্পষ্ট ক'রে বলো তোমার কি ধারণা? আমিও তোমাকে অপদার্থ বলে মনে করি?

হিমু—বললাম তো, তাতে দোষের কি আছে? মনে করলে অন্যায় কিছু হবে না।

কে বলে মাটির মানুষ? বেশ তো ক্ষোভ অভিমান আর অভিযোগের টাটকা রক্তমাংস দিয়ে তৈরি বেশ গভীর বুদ্ধির মানুষ! খুব বুঝতে পারে, খুব দেখতে পায়, আর কিছুই ভুলে যায় না ; কি ভয়ানক নিখুঁত হিমাদ্রির মাটির মানুষের ছদ্মবেশটা! ইচ্ছে করলে, ওর মুখের ঐ বোকা-বোকা হাসিটাকেই ঝিক করে একটা বিদ্যুতের জ্বালায় জ্বালিয়ে দিয়ে মানুষের মুখের দিকে বেশ তো তাকাতে পারে হিমাদ্রি। মানুষের মনের কোমলতার উপর বেশ আঘাত দিয়ে কথা বলতে পারে। যূথিকা ঘোষের মনের সব কৌতূক আর কৌতূহলের দুঃসাহস চমৎকার একটি নিষ্ঠুর বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত ক'রে দিয়ে এখন কেমন নির্বিকার মনে নস্যির ডিবে ঠুকছে হিমাদ্রি।

যূথিকা বলে—আমিও তোমাকে এরকম একটা শক্ত কথা বলতে পারি।

হিমু হাসে—একটা কেন, অনেক বলতে পার।

যূথিকা—মিথ্যে অভিযোগের কথা নয়। সত্যি অভিযোগ।

হিমু হাসে—তোমাকে সময় মতো এক পেয়ালা চা এনে দিতে পারিনি, এছাড়া আমার বিরুদ্ধে বোধহয় আর কোনো অভিযোগ খুঁজে পাবে না।

যূথিকা—খুঁজে পেয়েছি।

হিমু—কি?

যূথিকা—তুমি আমাকে একটা অহঙ্কেরে মেয়ে বলে মনে করো।

হিমু হাসে—তা মনে করি, কিন্তু সেজন্য রাগ করি না নিশ্চয়।

যূথিকা—রাগ করবে কেন? তুমি যে ভয়ানক চালাক। মানুষকে ছোটো ভাবতে তোমার বেশ মজা লাগে। আর।...

আনমনার মতো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে যূথিকা। তারপরে গলার স্বরের একটা রুক্ষ তীব্রতাকে যেন কোনোমতে চেপে রেখে আস্তে আস্তে বলে—তাই পরের উপকার ক'রে বেড়াও। ওটা মোটেই তোমার বাতিক নয়। ওটা তোমার ভয়ানক একটা অহঙ্কার। মানুষ নিজেকে কত ছোটো ক'রে ফেলতে পারে, তাই দেখে মনে মনে মজা করবার জন্য অকারণ পরের উপকার করে বেড়াচ্ছ। গিরিডির কেউ তোমাকে বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমি বুঝেছি।

হিমু—তুমি যে আমাকে আমার চেয়েও বেশি বুঝে ফেলেছো মনে হচ্ছে।

যূথিকা—আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি নিজেই জাননা যে তুমি—

হিমু—বলেই ফেলো।

যূথিকা—তুমি কি ভয়ানক চালাক আর অহঙ্কারী।

এক টিপ নস্যি নিয়ে হিমু আবার হেসে ওঠে—বেশ, অনেক গল্প তো হলো।

যূথিকা হাসে—এবার ভয়ানক খিদে পেয়েছে!

হিমু—তোমার সঙ্গে খাবার আছে নিশ্চয়?

যূথিকা—আছে ; কিন্তু সে খাবার খাব না।

হিমু—কেন?

যূথিকা—কোনো স্টেশনে ট্রেনটা থামুক। খাবারওয়ালার কাছ থেকে পুরি তরকারী কিনে খাবো।

হিমু—না! খবরদার না।

যূথিকা—তুমি বাধা দেবার কে?

হিমু—আমার বাধা না শুনলে কোনো লাভ হবে না।

যূথিকা—তার মানে?

হিমু—আমি তোমার সঙ্গের লুচি সন্দেশ খেতে রাজি হব না।

চমকে ওঠে যূথিকা। এবং মনে মনে সারা গিরিডির একটা অসার ধারণার আনন্দকে ধিক্কার দেয়। হিমু দত্তকে চিনতে বুঝতে আর ধরতে পারেনি কেউ। ওর বুকের প্রত্যেক নিঃশ্বাস ওর উদাস আনমনা ভালোমানুষী চোখের প্রত্যেকটা দৃষ্টি যে চরম চালাকির লীলাখেলা যূথিকা ঘোষের মনের গভীরের এত গোপন ইচ্ছাটাকেও কত সহজে দেখে ফেলেছে হিমাদ্রি।

সত্যি কথা ; হিমাদ্রিকে লুচি-সন্দেশ খাওয়াবার একটা ছুতো খুঁজছিল যূথিকা। কিন্তু সন্দেহ ছিল যূথিকার মনে, বাতিকের মানুষ হিমাদ্রি যূথিকার খাবারের ঝুড়ির লুচি-সন্দেশ স্পর্শ করতে রাজি হবে না। হিমুর সেই অনিচ্ছাকে জয় করবার জন্য কি কথা বলতে হবে, তা'ও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যূথিকা। কিন্তু তুমি না খেলে আমিও লুচি সন্দেশ খাব না, একথা বলবার সুযোগও পেল না যূথিকা। ধূর্ত হিমু দত্ত মানুষের মনের একটা সদিচ্ছাকে, একটা সৌজন্যের আগ্রহকেও কি- ভয়ানক আঘাত দিয়ে ব্যথা দিতে জানে।

কিন্তু হিমাদ্রির বুদ্ধির কাছে কি হার মানবে চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষ?

যূথিকা বলে—তুমি যদি সত্যিই বাধা দিয়ে আমাকে পুরি-তরকারী খেতে না দাও, তবে মনে রেখ, আমার খাওয়াই হবে না।

হিমু—কেন? তোমার সঙ্গেই তো ভাল খাবার আছে।

যূথিকা—হ্যাঁ আছে। তেমনই থাকবে!

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—তার মানে, তুমি যদি সেবারের জার্নির সময় আমার একটা ভুলের কথা ভুলতে না পেরে শুধু একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায়...

হিমু হাসে—তুমিও তো মানুষের ভুলের খুঁটিনাটি ধরতে কম যাও না! যাও আমি তর্ক করতে চাই না।

তর্ক ছেড়ে দিয়ে যূথিকাও হাসে, এবং সে হাসির মধ্যে বোধহয় বিজয়িনীর মনের মতো একটা সুখী মনের গর্বও হাসে—খাবার খাওয়ার পালা একটু পরে শুরু হলেই ভালো হয় ; এখন গল্পের পালা থামিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কি বলো হিমাদ্রি?

হেসে হেসে গল্প করবার আনন্দও অবান্তর কোনো প্রশ্নের আঘাতে এলোমেলো হয়ে যায় না। কথায় কথায় শুধু একটি প্রশ্নকে কয়েকবার টেনে নিয়ে এসে শেষে শান্ত হয়ে যায় যূথিকা।

—তোমার কেউ নেই, এটা কি একটা কথা হলো? এ কথার কোনো মানে হয় না হিমাদ্রি।

হিমু—মানে হোক বা না হোক, কথাটা সত্যি।

যূথিকা—তুমি আমার কথাটাই বুঝতে পারনি।

আশ্চর্য হয় হিমু। না বোঝবার কি আছে? অনেক কথাই তো জিজ্ঞাসা করেছে, যূথিকা, যে কথা হিমুর গিরিডি-জীবনের এক বছরের মধ্যে কোনো মানুষ হিমুকে জিজ্ঞাসা করেনি।

যূথিকার ছোটো ছোটো এক একটা সরল প্রশ্নের উত্তরে হিমুও সরল ভাষায় উত্তর দিয়ে দিতে পেরেছে ; হ্যাঁ, বাবা-মা দুজনের কেউ এখন আর বেঁচে নেই। দেশের বাড়ি অনেকদিন আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ভাই-বোন কেউ নেই ; চাকরির চেষ্টা করতে করতে সেই ডিব্রুগড় থেকে হঠাৎ এই গিরিডিতে এসে পড়া, এই তো ব্যাপার। দেখা যাক, আবার কোন্‌দিকে ভেসে পড়তে হয়।

যূথিকা হেসে ফেলে—সব বলেও একটি কথা বোধহয় বলতে পারলে না হিমাদ্রি। বোধহয় বলতে তোমার লজ্জা করছে।

হিমু—আর কি বলবো বুঝতে পারছি না।

যূথিকা—এমন কেউ একজন তো থাকতে পারে, যে তোমাকে ভেসে পড়তে দিতে চায় না ; ধরে রাখতে চায়?

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—বিয়ে করোনি?

হিমু হো হো করে হেসে ওঠে।—এত কথা শোনার পর তোমার মনে এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন দেখা দিল, কি আশ্চর্য!

যূথিকা—বুঝলাম, বিয়ে করোনি। কিন্তু...কিন্তু তাতেও প্রমাণ হয় না যে, তোমার কেউ নেই।

হিমু বিরক্ত হয়ে বলে—না নেই। আমি পাগল নই, আমার ওসব অদ্ভুত শখ থাকতে পারে না।

যূথিকাও যেন অদ্ভুত এক জেদের আবেগে আরও জোর দিয়ে বলে—তুমি পাগল নাই বা হলে, কিন্তু গিরিডিতে অন্তত একটা পাগল মেয়ে তো থাকতে পারে ; তোমার অদ্ভুত শখ না থাক, অন্য কারো তো থাকতে পারে। সে তোমাকে ভেসে পড়তে দিতে রাজি হবে কেন?

হিমু—না, এরকমও কেউ নেই।

যূথিকা—কেন নেই?

হেসে ফেলে হিমু—ঠাট্টা করবার আর গল্প করবার কিছু না থাকলেও এসব কথা বলতে হয় না।

যূথিকা—তোমাকে যদি ভয় করতাম, তবে নিশ্চয়ই এসব কথা জিজ্ঞাসা করতাম না।

যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যায় হিমু। ভয় করে না যূথিকা, কিন্তু ভয় করে না বলেই কি এত ঠাট্টা করতে হয়? চারু ঘোষের মেয়ের মাথার মধ্যে একরকমের পাগলামির পোকা আছে বোধহয়।

কিন্তু মনটাকে এত গম্ভীর রেখেও বুঝতে পারে হিমু দত্ত, যূথিকার প্রশ্নগুলি যেন হিমু দত্তের জীবনের উপর মানুষের মায়ার প্রথম অভিনন্দন। যেকথা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি, সে-কথা জিজ্ঞাসা করেছে চারু ঘোষেরই অহঙ্কারী মেয়ে ; আপন বলতে কেউ আছে কিনা হিমু দত্তের। আর কটা কথা মনে পড়ে, এই তো সেই যূথিকা ঘোষ ; যে মেয়ে হিমাদ্রিবাবু বলে প্রথম ডেকেছিল। সে ডাকের পিছনে একটা ঠাট্টা ছিল নিশ্চয় ; কিন্তু তবু তো ডেকেছিল। এবং শুনতেও খারাপও লাগেনি।

কি-যেন বলেছে যূথিকা। বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে হিমু—কি বললে?

যূথিকা—তোমাকে বন্ধু বলে ভাবতে সত্যিই আর ভয় করে না।

হিমুর গম্ভীর মুখ যেন হঠাৎ ভয়ের চমক লেগে কেঁপে ওঠে।—বন্ধু?

যূথিকা—হ্যাঁ। তোমাকে কি একটা পূজনীয় গুরুজন বলে মনে করবো ভেবেছো?

হিমু হেসে ফেলে, বলে—কিন্তু ভয় করবার কথা বলছো কেন?

যূথিকা—ভয় করে না বলছি।

হিমু—কেন?

যূথিকা খিল-খিল করে হেসে ওঠে—তোমার মতো একটা একলা অপদার্থ মানুষকে ভয় করবো কেন?

আস্তে একবার চমকে ওঠে হিমু, তারপরেই অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

অনেক রাত হয়েছে। আর বেশি গল্প করলে রাতটা চোখের উপরেই ভোর হয়ে যাবে।

হিমু বলে—তুমি এইবার শুয়ে পড় যূথিকা।

যূথিকা শান্তভাবে বলে—হ্যাঁ।

বাঙ্কের উপর থেকে বেডিংটা টেনে নামিয়ে সীটের উপর পেতে দেয় হিমু।

যূথিকা বলে—তুমি এই সতরঞ্চিটা ঐ সীটের উপর পেতে ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীটি। সেবারের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারাটা পথ কষ্ট ক'রে...

হিমু বলে—না না, কষ্ট করবো কেন? সেবার কামরাতে জায়গাই ছিল না ; তাই বাধ্য হয়ে...

যূথিকা—আর একটা কথা।

হিমু—কি?

যূথিকা আস্তে আস্তে বলে—তুমি আমার গায়ের উপর চাদর-টাদর মেলে দিতে চেষ্টা করো না। কেমন?

হিমু—আচ্ছা।

যূথিকা—কিছু মনে করলে না তো?

হিমু—না।

যূথিকা—মহিলা হয়তো একটা বাজে সন্দেহ করে বসবেন, সেই জন্যেই বলছি।

হিমু—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

এ কি অদ্ভুত কথা বলছে দিদি!—বাবা শুনলে যে রাগ করবে। আর মা নিশ্চয় আরও রাগ করে শেষে ধমক দেবে, না, এরকম বিশ্রীভাবে বেড়াতে যাবার কোনো মানে হয় না।

যূথিকার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে দুই ভাই, বীরু আর নীরু। একবার বাড়ির বাইরে বেড়িয়ে আসতে চায় দিদি ; বীরু আর নীরুকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।

কিন্তু ঠিক কোথায় যে বেড়াতে যেতে চায়, সেটা ঠিক স্পষ্ট করে বলতে পারছে না দিদি। উশ্রীর দিকে নয় ; বরাকরের দিকে নয় ; বেনিয়াডি কোলিয়ারি যাবার সড়কের দিকে, যেখানে মাঠের উপর অনেক পলাশের মাথা লাল ফুলে রঙীন হয়ে রয়েছে, সেদিকেও নয়। তবে কোথায়? কোন্ দিকে।

যূথিকা বলে—ওসবই তো দেখা, তার চেয়ে বরং...

বীরু—মহেশমুণ্ডার দিকে?

যূথিকা—না ; অতদূরে নয়!

নীরু—তবে কি পরেশনাথের দিকে?

যূথিকা—না ; পায়ে হেঁটে কি অতদূরে বেড়াতে যাওয়া যায়?

বীরু আর নীরু একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—পায়ে হেঁটে?

যূথিকা—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? এত বড়ো বড়ো চোখ করে আশ্চর্য হবার কি আছে?

উদাসীন নামে এত বড়ো বাড়ির আত্মাটাও বোধহয় চমকে উঠেছে। বেড়াতে যেতে চায় যূথিকা। কিন্তু এত সুন্দর জায়গা থাকতে ঐ শ্রীহীন শহরের ভিতরে একটু ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে আসতে চায়। তাও আবার গাড়িতে নয়, শুধু পায়ে হেঁটে। তা ছাড়া এমন একটা

অসময়ে।

শহরের দিকে, যে-দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে জগতের যত ধুলো-ময়লার ভিড়, যত বাজে মানুষের ছুটোছুটি আর সোরগোল, যত দীনতা আর হীনতার ছায়াও পথের উপর আর দু'পাশে ছড়িয়ে আছে। শর্মা ব্রাদার্সের অমন সুন্দর ভ্যারাইটি স্টোর্সের কাছে যেতে হলেও অনেক বাজে মানুষের ভিড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে যেতে হয়। গাড়ি ছাড়া কোনোদিনও পায়ে হেঁটে শহরের কোনো দোকানে আসেনি চারু ঘোষের ছেলে-মেয়ে।

কিন্তু যূথিকা যে-কথা বলছে, সেটা দোকানে-টোকানে যাবার পরিকল্পনাও নয়। কোনো পথের জিনিস কেনবার কথাও ওঠেনি। শুধু শহরের ভিতরেই এদিকে-ওদিকে একবার ঘুরে আসতে চায় যূথিকা। বাজারের দিকে, চকের দিকে, স্টেশনের দিকে। বিনা দরকারে শহরের যে-সব পথে ঘুরে বেড়াবার কোনো অর্থ হয় না, সেই সব পথেই বেড়িয়ে আসবার জন্য অদ্ভুত এক ইচ্ছার খেয়ালে যেন দুরন্ত হয়ে উঠেছে যূথিকা ঘোষের মন।

ভয় পায় নীরু।--কিন্তু রাস্তায় যে ভিখারী আছে দিদি ; নোংরা খেঁকি কুকুরও আছে।

যূথিকা হাসে--থাকুক না ; ভয় কিসের?

দিদির সাহসের হাসি দেখে আশ্বস্ত হয় নীরু।

এবং তারপর আর দেরি হয় না। চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষ, সঙ্গে চারু ঘোষেরই দুই ছেলে বীরু আর নীরু, যখন উদাসীনের ফটক পার হয়ে সড়কের ধুলো মাড়িয়ে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন উদাসীনের মালীটাও একটু আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে থাকে।

মাত্র বিকেল হয়েছে। আদালত থেকে চারু ঘোষের বাড়ি ফিরতে এখনও বেশ দেরি আছে ; এবং চারু ঘোষের স্ত্রীও এখন ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী তিন ঘণ্টার রেস্ট নেবার জন্য উপর-তলার একটি ঘরে নীরবতার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে আছেন।

এত রোদ! এখন যে ঠিক বেড়াতে যাবার সময়ও নয় কিন্তু যূথিকা ঘোষের প্রাণটা যেন উদাসীনের জীবনের এতদিনের নিয়মের শাসন ভঙ্গ করবার কৌতুকে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। বীরু আর নীরুকে হেসে হেসে আশ্বাস দেয় যূথিকা--না না ; বাবা কিছু বলবে না বীরু। মাও বলবে না নীরু। দেখো, আমার কথা সত্যি হয় কিনা।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর, যূথিকা ঘোষের প্রাণের এই দুরন্ত অবাধ্যতার আনন্দ যেন মুখর হয়ে হেসে ওঠে। বীরু আর নীরুর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলে--যদি একটু বকুনি খেতে হয় তো খাব।

যূথিকার সাজটাও বেড়াতে যাবার মতো সাজ নয়। বীরু বলে--তোমাকে বড়ো অভদ্র দেখাচ্ছে দিদি।

--কেন? চমকে ওঠে যূথিকা।

নীরু বলে--বিচ্ছিরি ড্রেস করেছো, একেবারে গরীব লোকের মতো।

ঠিক কথাই বলেছে বীরু আর নীরু। যূথিকা ঘোষের পায়ে একজোড়া চটি, আর গায়ে এলোমেলো করে পরা একটি রঙিন ছাপাশাড়ি ও ছিটের ব্লাউজ। খোঁপা নয়, বিনুনিও নয়, সাবান-ঘষা মাথার চুল এতক্ষণে শুকিয়ে আর রুক্ষ হয়ে ফেঁপে উঠেছে। স্নানের পর ঘাড়ে আর গলায় যে সামান্য একটু পাউডার ছড়ানো হয়েছিল, সে পাউডারের কোনো চিহ্নও এখন আর নেই। স্নানের সময় গলার হার আর কানের দুলও খুলে রাখা হয়েছিল। সেগুলিও আর পরা হয়নি। আয়নার দেরাজের মধ্যেই সেগুলি পড়ে আছে।

চেহারাটা অভদ্রের মতো দেখাচ্ছে, গরীবের মতো দেখাচ্ছে, কিন্তু খারাপ দেখাচ্ছে কি? প্রশ্নটা হয়তো মুখ খুলে বলেই ফেলতো যূথিকা ঘোষ, আর বীরু ও নীরুর চোখের বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলতে পারতো যূথিকা, একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না নিশ্চয়।

কিন্তু প্রশ্ন করতে হয় না ; কারণ বীরুই হঠাৎ যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে একটা ছেলেমানুষী আনন্দের কথা বলে ফেলে—তোমার গায়ে অনেক রক্ত আছে দিদি।

--কি করে জানলে?

—তোমার মুখটা কি চমৎকার লাল হয়ে উঠেছে?

হাসতে গিয়ে আরও লাল হয়ে ওঠে যূথিকার মুখ। তবে আর সন্দেহ নেই ; উদাসীনের মেয়ের মুখ পথের রোদের ছোঁয়ায় একটুও অসুন্দর হয়ে যায়নি ; একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না যূথিকাকে। বরং বীরুর চোখের এই বিস্ময় লক্ষ্য করবার পর বিশ্বাস করতে হয়, যূথিকার এই সাজহীন মূর্তিটা নতুন রকমের একটা প্রাণের আভায় রঙীন হয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

যূথিকা জানে না, বীরু আর নীরুও জানতে পারে না, কিসের জন্য আর কি দেখবার জন্য পথের এত ভিড় পার হয়ে, এত সোরগোল শুনতে শুনতে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। কোনো কাজ নেই, দরকার নেই কোথাও থামবার আর জিরোবার কথা নেই, শুধু শহরের ভিতর এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরে বেড়ানো, এই মাত্র।

ঘুরে বেড়াতে একটুও খারাপ লাগে না। লোহার পুলটা পার হবার সময় ট্রেনছাড়া একটা একলা ইঞ্জিন ভয়ানক চিৎকার করে আর ঘন কালো ধোঁয়ার স্তবক ধমকে ধমকে উড়িয়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে উদাসীনের দিদি আর দুই ভাই। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে মোটা মোটা কয়লার গুঁড়ো যূথিকার রুক্ষ চুলের উপর ঝরে পড়ে।

ছুটন্ত ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে বীরু আর নীরু। তারপর যূথিকার চুলের উপর কয়লার গুঁড়োর ছড়াছড়ি দেখে আরও জোরে হাততালি দেয়।

যূথিকা বলে—দুষ্টুমি করো না ; ছিঃ--আচ্ছা, এইবার চলো, একবার চকের কাছে গিয়ে...তারপর একবার স্টেশনের দিকটা ঘুরে এসে, তারপর...

বিচিত্র এক উদ্‌ভ্রান্তির অভিযান! এগিয়ে যেতে থাকে যূথিকা, বীরু আর নীরু। চকের দোকানগুলিতে যেমন ভিড় তেমনই হৈ-হৈ। কত মানুষ আসছে আর যাচ্ছে, কত ব্যস্ততা। কত কথা বলছে, হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করছে, আবার ঝগড়াও করছে মানুষগুলি। গাড়িতে করে এই চক কতবার পার হয়ে গেছে যূথিকা, কিন্তু কোনোদিন ভীড়ের মুখগুলির দিকে তাকাবার কোনো দরকার হয়নি। তাকাতে ইচ্ছেও করেনি।

কিন্তু আজ বারবার তাকাতে ইচ্ছে করে। দরকারের মানুষগুলি আসছে যাচ্ছে আর ভিড় করে থমকে রয়েছে, দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু--কি আশ্চর্য, একটা চেনা মুখ এখন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না। পথের ভিড়গুলি যেন একটা নিরেট অচেনা জগতের কতগুলি হাসাহাসির, মুখরতার আর ব্যস্ততার ভিড়।

মাঝে মাঝে এক-একবার চমকেও ওঠে যূথিকা ঘোষের খেয়ালের চোখ। ঠিক হিমাদ্রির মতো নীলরঙের কামিজ গায়ে, এক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে একটা ফলের দোকানের ভিড়ের সঙ্গে মিশে রয়েছেন। আশ্চর্য, হিমাদ্রি নয় তো? কিন্তু আশ্চর্য হবার কি আছে? চকের এই সব দোকানে এসে যদি এত মানুষের ভিড় করবার দরকার থাকে, তবে হিমাদ্রিই বা আসবে না কেন?

না হিমাদ্রি নয়। নীলরঙের কামিজ বটে, কিন্তু আস্তিন দুটো গোটানো নয়। আর পায়ে এক জোড়া নাগরা, সাদা রবারের জুতো নয়।

স্টেশনের কাছে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে আর পথের ভিড়ের অনেক মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে যায় যূথিকা ঘোষের এই বিচিত্র উদ্‌ভ্রান্তির অভিযান। নীলরঙের কামিজ, আস্তিন দুটো গোটানো, আর পায়ে সাদা রবারের জুতো, এমন কোনো মূর্তি শহরের এত ভিড়ের মধ্যেও দেখা গেল না!

বীরু বলে—এবার কোন্ দিকে যাবে দিদি?
যূথিকা বলে—আর কোনো দিকে না।
নীরু—কেন দিদি?
যূথিকা—সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।
বীরু—তাতে কি হয়েছে?
যূথিকা বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—কারও মুখ স্পষ্ট করে যে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে চিনতে পারা যাবে না।
নীরু ভয়ে ভয়ে বলে—তবে এবার বাড়ি ফিরে চলো দিদি।
যূথিকা বলে—হ্যাঁ, চল।
ফটক পার হয়ে উদাসীনের বারান্দার উপর দাঁড়াতেই বুঝতে পারে যূথিকা, হ্যাঁ, বকুনি খেতে হবে। বীরু আর নীরুও বুঝতে পারে বোধহয়, তা না হলে ওরা দু'জনে ওভাবে যূথিকার এলোমেলো চেহারাটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করে কেন?
অনেকক্ষণ হলো আদালত থেকে ফিরেছেন চারু ঘোষ। অনেকক্ষণ হলো বিশ্রামের ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন চারু ঘোষের স্ত্রী কুসুম ঘোষ। অনেক ডাকাডাকি করেও উদাসীনের ছেলে মেয়ের কোনো সাড়া না পেয়ে অনেক আতংক অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করেছেন। তারপর মালীর কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। কিন্তু মনের রাগটাকে শান্ত করতে পারেননি। বলা নেই, কওয়া নেই, অনুমতি না নিয়ে, একটা জানান না দিয়ে বাচ্চা ভাই দুটোকেও সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে কোথায় গেল বাইশ বছর বয়সের কাণ্ডজ্ঞানহীন ধিঙ্গি? গণেশবাবুর স্ত্রীর মতো নিন্দুকের চোখে পড়লে আর রক্ষা নেই। এক বেলার মধ্যেই বোধহয় সারা গিরিডির সব পাড়া ঘুরে দুর্নাম রটিয়ে দেবে, কিপ্‌টে চারু ঘোষ শুধু নিজে একাই গাড়ি চড়ে ; ছেলেমেয়েগুলো পায়ে হেঁটে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়।
কি আশ্চর্য, ভেবে কোনো কারণই ঠাহর করতে পারেন না চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ ; উদাসীনের সুশ্রী জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েও আর এত বড়ো হয়ে ওঠবার পরেও যূথিকার মতো মেয়ের মনে আবার এ কোন্ রকমের অপরুচির অনাচার? গাড়ি ছাড়া কোনোদিন বেড়াতে বের হয়েছে যূথিকা, এমন ঘটনা স্মরণ করতে পারেন না কুসুম ঘোষ, কারণ এমন ঘটনা কোনোদিনই ঘটেনি। তবে আজ হঠাৎ এমন অধঃপতনের ধুলো পায়ে গায়ে আর মাথায় মাখবার জন্য এ কেমন নোংরা শখের খেলা খেলে এল মেয়েটা? কেন, কিসের জন্য, কোথায় কোথায় গিয়েছিল যূথিকা? কার সঙ্গে কথা বলে এলো?
সন্দেহ করেন কুসুম ঘোষ, নিশ্চয় একটা কাণ্ড করে এসেছে যূথিকা। তা না হলে, না বলে-কয়ে একটা চুপি-চুপি চেষ্টার মতো বাইরে বের হয়ে গেল কেন? বিশ্রী কাণ্ড করতে হলে যে ঠিক এই ধরনের চুপি-চুপি চেষ্টা করতে হয়। কুসুম ঘোষের জেঠতুতো দাদা, আই-সি-এস মোহনদার বউ বর্ণালীর কথা মনে পড়ে। চাল-চলনে প্রায় মেমসাহেব হয়ে গিয়েছে যে বর্ণালী বউদি ; একশো টাকা মাইনের মগ কুকের হাতের রান্না যত রোস্ট গ্রিল আর ফ্রাই ছাড়া যার মুখে কোনো বাংলা রান্না রোচে না ; সেই বর্ণালী বউদি লুকিয়ে লুকিয়ে চাপরাশিকে দিয়ে বাজারের তেলেভাজা বেগুনি আনিয়ে আর ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত।
যূথিকার কাণ্ডটা প্রায় এই রকমের একটা চুপি-চুপি সেরে আসা নোংরা শখের কাণ্ড। যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে ধমক দেন কুসুম ঘোষ—ছিঃ!
যূথিকা হাসে—কি হলো মা?
—হঠাৎ এরকম একটা কাণ্ড করবার মানে কি?
যূথিকা—শহরের ভেতরে একটু এদিক ওদিক বেড়িয়ে এলাম।

—কেন? কারণ কি?

যূথিকা হাসে—এমনি ; কোনো কারণ নেই।

—তার মানে পাগলামিতে পেয়েছিল?

চারুবাবু বলেন—যাক্ গে ; আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কুসুম ঘোষ চুপ করেন ; এবং চারুবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বলেন—মোট কথা, তোমার কাণ্ড দেখে আমি বড়ো দুঃখিত হয়েছি যূথিকা। আমাদের প্রেস্টিজের দিকে চোখ রেখে কাজ করবে। উদাসীনের মেয়ে উদাসীনের কালচার ভুলে যাবে কেন?

উদাসীনের কালচারের উপর আবার একটা উপদ্রব। এই উপদ্রবও উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষের একটা খেয়ালের কাণ্ড। এবং এই খেয়ালটাও একটা নোংরা সখের খেয়াল। খুব দুঃখিত হলেন চারু ঘোষ, এবং খুব রাগ করলেন কুসুম ঘোষ।

দিনটা ছিল যূথিকা ঘোষেরই জন্মদিনের উৎসবের দিন।

সেদিন আদালতে যাননি চারু ঘোষ। সেদিন স্কুলে যায়নি বীরু আর নীরু। সেদিন শহরে গিয়ে শর্মা ব্রাদার্সের ভ্যারাইটি স্টোর থেকে যূথিকার জন্য দু'শো টাকা দিয়ে একগাদা ফরাসী পারফিউমারি সৌরভ সামগ্রী আর প্রসাধনের উপচার কিনে এনেছেন চারু ঘোষ। দশ শিশি সেন্ট, পাস্তুরাইজড় ফেস ক্রীম, অল-টোন শ্যাম্পু, স্কিন টনিক লোশন, ওয়াটারপ্রুফ মাসকারা আর বিউটি গ্রেন।

সকাল আটটা থেকে সুরু করে বেলা বারটা পর্যন্ত অনেক স্নেহময় আগ্রহ উৎসাহ আর যত্ন নিয়ে কুসুম ঘোষ রান্না করেছেন মিষ্টি পোলাও, রুই মাছের ক্রোকে, মাংসের দম্পক্ত, নারকেল-চিংড়ি আর ছানার পায়েস।

তখনো টেবিলে খাবার সাজানো হয়নি ; আর চারু ঘোষের স্নান সারাও বাকি ছিল। কিন্তু উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষ ওর সেই সুরভিত আর প্রসাধিত সুন্দর চেহারাটাকে নিয়ে ঢলমলে শাড়ির আভা ছড়িয়ে দুলিয়ে আর ছুটিয়ে বারবার যেন একটা পেটুকে লোভের আবেগে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে কুসুম ঘোষকে বিরক্ত করতে থাকে।—রান্না শেষ হলো কি মা?

কুসুম ঘোষ হাসেন—হ্যাঁ রে লোভী মেয়ে। শেষ হয়ে এসেছে, শুধু জলপাই-এর চাটনিটা বাকি।

জলপাই-এর চাটনি রাঁধতে এমন কি আর সময় লাগে? পনর মিনিট পার হতে না হতে আবার ছুটে আসে যূথিকা।—হলো চাটনি?

কুসুম ঘোষ হাসেন—হ্যাঁ। এবার ওকে স্নান সেরে নিতে বলো।

যূথিকা—বলছি হ্যাঁ...একটা কথা!

—কি!

যূথিকা—তিনটে থালাতে খাবার সাজিয়ে দাও তো।

কুসুম ঘোষ আশ্চর্য হন—তিনটে থালাতে?

যূথিকা—হ্যাঁ।

—কিসের খাবার।

যূথিকা—এই যে, এইসব পোলাও টোলাও...সবই কিছু কিছু করে তিনটে থালাতে সাজিয়ে দাও।

কুসুম ঘোষের চোখে এইবার একটা ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে—কার জন্যে?

যূথিকা—গিরধারীর জন্যে, জানকীরামের জন্যে আর সোমরার জন্যে।

—কি বললি? কুসুম ঘোষ যেন একটা আর্তনাদ করে তাঁর যন্ত্রণাক্ত বিস্ময়টাকে সামলাতে চেষ্টা করেন।

ড্রাইভার গিরধারী, চাকর জানকীরাম আর মালী সোমরার জন্য তিনটে থালাতে এইসব আভিজাতিক খাবার নিজের হাতে সাজিয়ে দিতে হবে, যূথিকা যেন কুসুম ঘোষের হাত দুটোকে একটা অভিশাপ সহ্য করতে বলছে। বলতে একটুও লজ্জা পেল না যূথিকা? একটুও ভেবে দেখলো না, কি অদ্ভুত কথা বলছে? ভুলে গেল মেয়েটা, এরকম নোংরা কাণ্ড যে এই উদাসীনের পঁচিশ বছরের জীবনে কোনোদিন সম্ভব হয়নি' কুসুম ঘোষ বলেন—না ; তোমার বাজে খেয়াল বন্ধ করো যূথি।

যূথিকাই এইবার আশ্চর্য হয়—আমার জন্মদিনে আমরা সবাই পোলাও টোলাও খাব, আর ও বেচারারা বাড়িতে থেকেও খাবে না?

—না।

যূথিকা নাক সিঁটকে বিড়বিড় করে—কি বিশ্রী ব্যাপার!

—বিশ্রী হয়ে গিয়েছে তোর বুদ্ধিসুদ্ধি।

যাগ্‌গে। আবার নাক সিঁটকে নিয়ে গম্ভীর হয়ে, আর ছটফট করে চলে যায় যূথিকা।

কুসুম ঘোষের সন্দেহ হয় এবং দু'চোখের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকেন, কেমন যেন একটা আধপাগলা রকমের মুখ করে ধেই ধেই ক'রে চলে গেল মেয়েটা। মেয়েটার ব্যবহারের রকম-সকম, কথা বলবার ঢং, চোখের চাউনি, হাঁটা-চলা আর বুদ্ধি আর রুচি ইচ্ছে টিচ্ছে সবই যেন কেমনতর বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটার জন্মদিন, তাই খুব বেশি ধমক-ধামক করতে ইচ্ছে করে না। তাই রাগ সামলাতে চেষ্টা করেন কুসুম ঘোষ।

চারু ঘোষও সব কথা শুনতে পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। মেয়েটাকে যেন উদাসীনের জীবনের রীতি আর অভ্যাসগুলিকে অপমান করবার সখে পেয়েছে। কিংবা কাণ্ডজ্ঞানই হারিয়েছে। তা না হলে বুঝতে পারে না কেন, এরকমের কাণ্ড করলে উদাসীনের প্রেস্টিজ নষ্ট করা হয়।

যাই হোক, খাবার টেবিলের আনন্দটা আর নষ্ট করেনি যূথিকা। কোনো বিশ্রী উপদ্রব করেনি। বরং শেষ পর্যন্ত দেখতে পেয়ে খুশি হলেন, আর একটু নিশ্চিন্ত হলেন চারু ঘোষ এবং কুসুম ঘোষ, বীরু আর নীরুর লোভের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে সব খাবারের সব স্বাদুতা একেবারে চেটেপুটে খেল যূথিকা ; প্রত্যেকবার জন্মদিনের উৎসবের দিনে একটু বেশি উৎফুল্ল হয়ে বীরু নীরুর সঙ্গে যে সব গান গায় আর গল্প করে যূথিকা, এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না।

উদাসীনের পিতা আর মাতার মুখের অপ্রসন্ন ভাবটাও শেষ পর্যন্ত হাসিচাপা পড়ে। মনে মনে বোধহয় একটু আশ্বস্ত হন এবং একটু হাঁপও ছাড়েন চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ ; না যূথিকার মনের এই ছন্নছাড়া খেয়াল বোধহয় একটা বুদ্ধিহীন আমোদের খেলা মাত্র ; ফিটের ব্যারামের মতো কোনো ব্যারাম নয়। গিরধারীকে, জানকীরামকে আর সোমরাকে—একটা ড্রাইভার, একটা চাকর আর একটা মালীকে হঠাৎ সমাদর করে পোলাও-টোলাও খাওয়াতে গেলে ওরাই যে ভয় পেয়ে চমকে উঠবে ; যূথিকা বোধহয় ওদের ঐ ভয়ের চমক দেখে একটু মজা পেতে চায়। তাই কি?

কুসুম ঘোষ বলেন—আমার মনে হয়, যূথিকা শুধু একটু মজা করবার জন্যে এরকমের একটা কাণ্ড করতে চেয়েছিল।

চারু ঘোষ—তা যদি হয়, তবে রাগ করবার কিছু নেই। কিন্তু আমার কেমন একটা সন্দেহ হয় যে...

—কি? কুসুম ঘোষ আতঙ্কিতের মতো তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

চারুবাবু বলেন—আমার সন্দেহ হয়, যূথিকা বোধহয় আজকাল বাজে বই-টই পড়ছে।

কুসুম--হাঁ, গাদা গাদা নভেল পড়ে দেখেছি।

চারুবাবু--না-না, নভেল টভেলের কথা বলছি না। ওতে কিছু হয় না ; আমার সন্দেহ হয়, যূথিকা আজকাল বিবেকানন্দের বই-টই পড়ছে না তো?

কুসুম অবিশ্বাস করেন--বিবেকানন্দের বই যূথিকা পড়বে কোন্ দুঃখে?

চারুবাবু--দুঃখে নয় ; খেয়ালে। বাতিকে। সেই জন্যেই তো বলছি। এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

কুসুম আশ্চর্য হন--তুমি কবে বিবেকানন্দের বই পড়লে?

চারুবাবু--আমি না ; আমি দেখেছি কয়েকজনকে, বিবেকানন্দের বই পড়তে পড়তে শেষে জীবনের সব প্রসপেক্টের কি ভয়ানক সর্বনাশ করে কি হয়ে গেলেন নন্তুকাকা।

কুসুম--নন্তুকাকা কে?

চারুবাবু--আমারই বন্ধু--এক কলেজের বন্ধু ফটিকের আপন কাকা। ভদ্রলোক কেমব্রিজের এম-এ ; দেশে ফিরে এসেই আটশো টাকা মাইনের একটা সরকারী সার্ভিস পেলেন ; ভেবে দেখ, সে সময়ের আটশো টাকা ; তার মানে, আজকের প্রাইস ইনডেক্স অনুসারে বত্রিশ শো টাকা। ভদ্রলোক সে সার্ভিস নিলেন না ; একটা অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে নিজেই একটা স্কুল করলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি, স্কুল বাড়ির কাছে কাউ-শেডের মতো একটা ঘরের ভেতরে বসে নিজের হাতে রান্না করছেন নন্তুকাকা ; ভাত, ডাল আর ঢেঁড়সের চচ্চড়ি ; ব্যস্। কী সাংঘাতিক অবস্থা!

কুসুম--ইচ্ছে করে কেন এরকম অবস্থা করলেন নন্তুকাকা?

চারুবাবু--বললাম তো, বিবেকানন্দের বই পড়বার অভ্যাসে পেয়েছিল। গরীব হয়ে যাবার বাতিকে ধরেছিল।

চারুবাবুর সন্দেহটাকে সন্দেহ করবার মতো মনের জোর আর পান না কুসুম ; এবং একটু ভয়ও পান বোধহয়। এবং একদিন হঠাৎ যূথিকার পড়ার ঘরে ঢুকে ভয়ের কথাটা একটু কৌশল করে বলেই ফেললেন কুসুম।--ভাল বই-টই পড়বি ; বিবেকানন্দের বই-টই পড়ে কোনো লাভ নেই।

যূথিকা হাঁ করে আর চোখ বড়ো করে তাকিয়ে থাকে--বিবেকানন্দ কে?

কুসুম--বিবেকানন্দ, আবার কে।

যূথিকা--আমি জানি না ; কোনোদিন এরকম একটা নামও শুনিনি।

কুসুমের চোখের দৃষ্টিটাই যেন হঠাৎ খুশি হয়ে হেসে ওঠে। তাঁর কৌশলের প্রশ্নটাই সার্থক হয়েছে। বৃথা সন্দেহ, অযথা দুশ্চিন্তা।

এবং চারুবাবুর কাছে গিয়ে হেসে ফেলেন কুসুম।--মেয়েটার সামান্য দুটো-একটা খেয়ালের কাণ্ড দেখে মিছিমিছি বড়ো বেশি ভাবনা করা হচ্ছে, ছিঃ।

চারুবাবুও একটু লজ্জিত হয়ে হাসতে থাকেন।

উদাসীনের বারান্দায় চেয়ারগুলির উপর রোজই সকাল বেলায় যেসব মানুষকে বসে থাকতে দেখা যায় তারা সবাই মক্কেল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলাতেও দু'চারজনের সমাগম দেখা যায়।

কিন্তু আজ সন্ধ্যায় উদাসীনের ফটক পার হয়ে, দু'চোখে কেমন একটা উৎসাহের দৃষ্টি নিয়ে, আর আস্তে আস্তে হেঁটে এসে উদাসীনের বারান্দার উপর দাঁড়ালো যে মানুষটা, তাকে দেখলেই বোঝা যায়, মক্কেল নয়। তবে কে? কিসের জন্যই বা এসেছে?

চারুবাবু বাড়িতে নেই। কুসুম ঘোষও নেই। উদাসীনের বাপ-মা দুজনেই বেড়াতে বের

হয়েছেন। বীরু-নীরুও সঙ্গে গিয়েছে। বাড়িতে আছে শুধু যূথিকা। যূথিকাকে আজ সকাল থেকে বিকালের মধ্যে অনেকবার হাঁচতে আর কাশতে দেখা গিয়েছে ; একটু টেম্পারেচারও হয়েছে। কুসুম বলেছেন, সাবধান যূথি! তুমি আজ জানলার কাছেও দাঁড়াবে না, বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা।

উপর তলার সেই ঘর, যেটা যূথিকা ঘোষের পড়ার ঘর ; তারই ভিতরে একটা চেয়ারের উপর বসে উলের মাফলার গলায় জড়াতে জড়াতে হঠাৎ চোখে পড়ে যূথিকার, ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলো একটা মানুষ, যে মানুষকে মক্কেল বলে মনে হয় না। হিমাদ্রি গোছের একটা মানুষ বলে মনে হয়। বয়সের দিক দিয়েও প্রায় হিমাদ্রিরই মতো। গায়ের জামা-কাপড়ের চেহারাও প্রায় সেই রকমের। খয়েরী রঙের একটা আধা-আস্তিন পাঞ্জাবি, কেজো মানুষের মতো মালকোঁচা দিয়ে পরা ধূতি ; ধূতিটা অবশ্য ময়লা নয়। হিমাদ্রিরও ময়লা ধূতি পরা অভ্যাস নয়। সাদা রবারের জুতো না হলেও আগন্তুকের পায়ে সাদাটে এক জোড়া চামড়ার চটি দেখা যায়। কি আশ্চর্য ভদ্রলোককে দেখলে হিমাদ্রিরই কথা মনে পড়ে যায়।

উদাসীনের যে মেয়েকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে গায়ে ঠাণ্ডা লাগাতে নিষেধ করে গিয়েছেন উদাসীনের মা, সেই মেয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে ; জানালার কাছে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। তার পরেই উপরতলা থেকে তর্‌তর্‌ করে নেমে এসে একেবারে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, যেখানে সারি সারি টবে ফুলগাছগুলিকে দুলিয়ে দিয়ে ফুর্‌ফুর্‌ করছে অফুরান ঠাণ্ডা হাওয়া।

—কাকে চান?

যূথিকার প্রশ্ন শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আগন্তুক যুবক। এবং উত্তর দেয়—আমি চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—বাবা এখন বাড়িতে নেই।

—তাহলে আচ্ছা...তাহ'লে আর একদিন আসবো।

চলে যাবার জন্য তৈরী হয় যুবক ভদ্রলোক।

দেখতে পায় যূথিকা, ভদ্রলোকের হাতে ছোটো একটা খাতা আর রসিদ-বইয়ের মতো দেখতে একটা বই।

—আপনি নিশ্চয় কোনোও দরকারী কাজে এসেছিলেন। প্রশ্ন করে যূথিকা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহ'লে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন না কেন? বাবা বড়ো জোর আর আধঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বেন।

যুবক ভদ্রলোক বেশ খুশি হয়ে এবং যেন একটু কৃতার্থ ভাবে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

—তাহ'লে বসুন।

যুবক ভদ্রলোক আবার চেয়ারে বসে ; কিন্তু যূথিকা ঘোষ চলে যায় না। বরং অদ্ভুত এক কৌতূহলের আবেগে বাচাল হয়ে ওঠে।

—কিছু মনে করবেন না, যদি একটা প্রশ্ন করি।

—বলুন।

—বাবার কাছে আপনার কিসের কাজ?

—চাঁদা চাইতে এসেছি।

—কিসের চাঁদা?

—রিলিফের কাজের জন্য।

যূথিকা বোকার মতো তাকায়।—তার মানে?

যুবক ভদ্রলোক বলে—বাংলা দেশে একটা বন্যা হয়ে গিয়েছে। প্রায় দু' লাখ মানুষের ঘর ভেসে গিয়েছে। ক্ষেতের সব ধান পচে গিয়েছে। খবরের কাগজে দেখেছেন বোধহয়...।

যূথিকা—খবরের কাগজ আমি পড়ি না।

—যাই হোক, দেশের সব বড়ো-বড়ো নেতাই সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন। একটা রিলিফ কমিটিও হয়েছে।

--ঠিক বুঝলাম না।

বন্যার জন্যে যে-সব লোক কষ্টে পড়েছে তাদের সাহায্য করবার জন্য রিলিফ কমিটিকে অনেকেই টাকা পাঠাচ্ছেন। আমরাও ঠিক করেছি, চাঁদা করে আমাদের গিরিডি থেকে অন্তত শ' পাঁচেক টাকা রিলিফ কমিটিকে পাঠাবো।

—আপনারা কারা?

—আমরা এখানেই চাকরি-বাকরি করি।

—তাই বলুন। হাঁপ ছাড়ে যূথিকা ঘোষ। এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোকের কথাগুলিকে একটা রহস্যের মতো মনে হচ্ছিল, এবং কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছিল না।

বারকয়েক এদিকে-ওদিকে পায়চারি করে আর গলার শিথিল মাফলারটাকে ভালো করে জড়িয়ে, আবার আচমকা প্রশ্ন করে ওঠে যূথিকা—কত টাকা পেলে আপনি খুশি হবেন?

যুবক ভদ্রলোক হেসে ফেলে—আপনারা খুশি হয়ে যা দেবেন, তাতেই খুশি হব।

যূথিকা—দশ টাকা?

—হ্যাঁ।

—বেশ ; তাহলে...

যূথিকার কথা শেষ না হতেই উদাসীনের ফটকের কাছে মোটর গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা যায়। বেড়িয়ে ফিরছেন চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ এবং বীরু ও নীরু।

বীরু-নীরু দৌড়তে দৌড়তে ছুটে এসেই বাড়ির ভিতর চলে যায়। এবং চারু ঘোষ ও কুসুম ঘোষ আস্তে আস্তে হেঁটে বারান্দার উপরে উঠেই চমকে ওঠেন।

যুবক ভদ্রলোকও ব্যস্তভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।—আপনারই কাছে এসেছি।

—হেতু? চারু ঘোষের গলার স্বর একটা গম্ভীর বিরক্তির শব্দের মতো বেজে ওঠে।

—আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাংলা দেশে যে বন্যা হয়েছে...

—জানি, কিন্তু সেকথা জানাবার জন্য তোমার এখানে আসবার কি দরকার বুঝতে পারছি না।

—রিলিফ কমিটিতে কিছু টাকা পাঠাতে হবে। সেইজন্য আপনার কাছে কিছু চাঁদা চাই।

—নো চাঁদা। দেয়ার ইউ স্টপ।

—আজ্ঞে?

—আমি চাঁদা দেব না।

—যে আজ্ঞে। আমি চলে যাচ্ছি।

যুবক ভদ্রলোক তখুনি চলে যেত নিশ্চয় ; কিন্তু যূথিকা হঠাৎ বলে ওঠে,—আমি যে ভদ্রলোককে কথা দিয়ে ফেলেছি বাবা।

যূথিকার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চারু ঘোষের চোখ দুটো যেন চমকে ওঠে।—কি কথা?

যূথিকা—দশ টাকা চাঁদা প্রমিস করেছি। সেই জন্য উনি অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে আছেন।

—কতক্ষণ ধরে?

—আধ ঘণ্টা হবে?

চুপ করে কিছুক্ষণ ধরে আনমনার মতো কি যেন ভাবেন চারু ঘোষ। তারপর কুসুম ঘোষের হতভম্ব মুখটার দিকে তাকান। ছোটো একটা ভ্রূকুটির ছায়াও চারু ঘোষের চোখের উপর সিরসির করে কাঁপে। তারপরেই পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে যুবক ভদ্রলোকের হাতের দিকে এগিয়ে দেন চারু ঘোষ।

তাড়াতাড়ি পেন্সিল চালিয়ে খস খস করে একটা রসিদ লিখে চারু ঘোষের হাতের উপর ফেলে দিয়ে আর দশ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে চলে যায় যুবক ভদ্রলোক। দেখলে মনে হয়, হ্যাঁ, লোকটা এই উদাসীনকে প্রকাণ্ড অপমান করবার আনন্দে তৃপ্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে যাচ্ছে।

কুসুম বলেন—এ কী কাণ্ড যূথি? আবার এরকমের একটা নোংরা কাণ্ড কেন করলে তুমি?

যূথিকা হাসে—রাগ করছো কেন?

কুসুম চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমাকে চড় মারা উচিত ছিল। কোথাকার কে না কে, যেমন চেহারা তেমনি আক্কেল, তাকে ইচ্ছে করে তুমি এই বাড়ির চেয়ারে আধ ঘণ্টা ধরে বসিয়ে রেখেছো।

চারু ঘোষের গম্ভীর স্বর আরও তপ্ত হয়ে ওঠে।—আমার প্রশ্ন, তুমি লোকটার সঙ্গে কথা বললে কেন?

কুসুম—তোমার জন্যে যে ওকে আজ একটা বাজে লোকের কাছে অপমানিত হতে হলো, এটুকু বুঝতে পারলে কি মুখ্যু মেয়ে?

যূথিকা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে—অপমানিত?

কুসুম—হ্যাঁ। তুমি লোকটাকে চাঁদা প্রমিস করে বসে আছ বলেই না উনি বাধ্য হয়ে...ছি, ছি, লোকটা এখন বোধহয় মুখ টিপে হাসছে।

চারু ঘোষ—আমাকে জীবনে কোনোদিন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরকম বাজে কাজ করতে হয়নি। দশ টাকা গেল, টাকা কোনো কথা নয়। কথা হলো, আমার প্রিন্সিপ্‌ল্‌ নষ্ট করতে হলো। চ্যারিটি করে পৃথিবীতে ভিখিরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমার নীতি নয়।

কুসুম—সে যাই হোক, কিন্তু তোমার মেয়ের মনের চালচলন ভিখিরী-ভিখিরী হয়ে যাবে কেন? বাজে লোকের সঙ্গে আধ ঘণ্টা ধরে কথা বলতে ওর প্রেস্টিজে বাধে না কেন?

চারুবাবু এইবার একটু শান্তস্বরে উপদেশ দেন—আশা করি, অপরিচিত কোনো লোকের সঙ্গে কোনোদিন বেশি কথা বলবে না যূথিকা। ভদ্রতা করতে হবে না, অভদ্রতাও করতে হবে না। শুধু একটি কথায় হ্যাঁ বা না বলে বিদায় করে দেবে।

যূথিকার মুখটাকে অনুতপ্তের মুখের মতো একটা করুণ মুখ বলে মনে হয়। বোধহয় ভুল বুঝতে পেরেছে যূথিকা, আর উদাসীনের বাপ-মাকে এভাবে বিব্রত ও বিরক্ত ক'রে মনে মনে একটু লজ্জিতও হয়েছে। যূথিকা বলে—আচ্ছা! উদাসীনের বাপ-মার উপদেশ স্বীকার করে নিয়ে কাশতে থাকে যূথিকা।

কুসুমের চোখের দৃষ্টি এইবার একটু মায়াময় হয়ে ওঠে।—ছিঃ, দেখ তো, ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাশিটাকে আবার বাড়িয়ে তুললি।...যা বলি, তোর ভালোর জন্যেই বলি।

এই ঘটনারই মাত্র পাঁচটা দিন পরের একটি ঘটনা। সেদিন যূথিকা ঘোষের গলাতে কাশির খক্‌খক্‌ শব্দের উপদ্রব ছিল না।

ঠিক আজকেরই মতো সেদিনও উদাসীনের বাপ-মা আর বীরু-নীরু বাড়িতে ছিল না। কিন্তু বেলাটা সন্ধ্যা নয়, সকাল। বই হাতে নিয়ে ফিজিক্সের ফরমুলা মুখস্থ করতে করতে যখন নিচের তলাতেই বাড়ির বাইরের বারান্দায় পায়চারি করছিল যূথিকা ঘোষ, তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তি উদাসীনের ফটক পার হয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন।

আরও দেখতে পেয়েছে যূথিকা, ভদ্রলোক মোটর গাড়িতে এসেছেন। ফটকের সামনে রাস্তার উপরেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

মোটর গাড়ির সম্পর্কে যূথিকা ঘোষের মনেও বেশ একটা শখের কৌতূহল আর গবেষণা আছে। এ ব্যাপারে বীরু-নীরুর উৎসাহও যূথিকার উৎসাহের কাছে হার মেনে যায়। বীরু আর নীরু এক নিঃশ্বাসে যতগুলি গাড়ির নাম বলতে পারে, যূথিকা তার তিনগুণ বলে দেয়। ম্যাগাজিনের পাতা উল্টিয়ে নতুন ডিজাইনের গয়নার বিজ্ঞাপনী ছবির তুলনায় নতুন মডেলের গাড়ির বিজ্ঞাপনীর ছবি দেখতে বেশি ভালবাসে যূথিকা। বীরু আর নীরুও মাঝে মাঝে দিদির জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। কলিয়ারির সাহেব মক্কেলদের গাড়ি এসে যখন ফটকের কাছে থামে, তখন উপরতলার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, আগন্তুক গাড়ির দিকে মাত্র একবার তাকিয়ে বলে দিতে পারে যূথিকা—ওটা নিশ্চয়ই নাইনটিন ফিফ্‌টি মডেলের বুইক!

বীরু নীরু ছুটে যায় এবং ফটকের কাছে গিয়ে গাড়িটাকে দেখে নিয়ে আর ফিরে এসেই আশ্চর্য হয়ে বলে—হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছ দিদি!

আগন্তুক ভদ্রলোকের গাড়িটা দেখে যূথিকার চোখে একটা নতুন রহস্যের মতো বোধ হয়। একেবারে অপরিচিত ; কবেকার মডেল কে জানে? চকচকে ঝকঝকে গাড়িটা যে খুব দামী গাড়ি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভদ্রলোকও বেশ চকচকে ও ঝকঝকে চেহারার মানুষ। দেখা মাত্র নরেনের কথা মনে পড়ে যায়। ভদ্রলোককে নরেনেরই সমান বয়সের মানুষ বলে মনে হয়। সিল্কের শার্ট আর ট্রাউজার, গলার টাই-ও সিল্কের। ভদ্রলোক যেন নরেনেরই মতো কিংবা, হতে পারে, নরেনের চেয়েও বেশি ঝকঝকে গৌরবের মানুষ।

বারান্দার উপরে উঠেই যূথিকার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে আর প্রীতিপূর্ণ উৎসাহের দৃষ্টি তুলে আগন্তুক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন—মিস্টার ঘোষ বাড়িতে আছেন?

যূথিকা—না।

—কখন আসবেন?

যূথিকা—বলতে পারি না।

—তাহ'লে—বলতে বলতে একটা চেয়ারের কাঁধে হাত দেন ভদ্রলোক ; আর নিজেরই হাত ঘড়িটার দিকে তাকান।

—আমি তাহ'লে।—বেশ একটু বিড়ম্বিত স্বরে, আর একটু আশ্চর্য হয়ে আবার কথা বলেন আগন্তুক ভদ্রলোক। আর যূথিকা ঘোষ তার হাতের বই এর পাতা উলটিয়ে ফরমুলা খুঁজতে থাকে।

—আমি তাহ'লে চলি।

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বারান্দা থেকে নেমে যাবার আগেই সরে গিয়ে পায়চারি করতে থাকে যূথিকা।

ফটকের কাছে গাড়ির শব্দ বেজে উঠতেই বুঝতে পারে যূথিকা, চলে গেলেন ভদ্রলোক। কিন্তু ফটকের দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারে যূথিকা, না, ভদ্রলোকের ঝকঝকে গাড়িটা স্টার্ট নেয়নি। বাড়ির গাড়িটাই এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ি ফিরেছেন বাবা আর মা আর বীরু-নীরু। এবং আগন্তুক। ভদ্রলোকের সঙ্গে সবারই একেবারে মুখোমুখি দেখাও হয়ে গিয়েছে।

শুধু কি দেখা? যূথিকা ঘোষের চোখ দুটো একটু আশ্চর্য হয়ে, আর বেশ একটু ভয়ে-ভয়ে বোকার মতো তাকিয়ে দেখতে থাকে, বাবা আর মা যেন আগন্তুক ভদ্রলোকের পথ আটক করেছেন। ভদ্রলোককে এখনি চলে যেতে দিতে রাজি নন বাবা আর মা ; তবে কি, সত্যিই কি ভদ্রলোক বাবা আর মা-র পরিচিত কোনো মানুষ?

কোনো সন্দেহ নেই। বারান্দাতে দাঁড়িয়েই শুনতে পায় যূথিকা, ভদ্রলোককে মাত্র পাঁচটি মিনিট বসে যেতে আর অন্তত একটি কাপ চা খেয়ে যেতে কি কাতর অনুরোধ করছেন বাবা আর মা!

কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা।—না, এক্সকিউজ মি!

ভদ্রলোকের গলার স্বর যেন একটা ব্যথিত অহংকারের সৌজন্যপূর্ণ গর্জন।

কুসুম ঘোষ অনুরোধ করেন—মাত্র পাঁচটা মিনিট বসে যাও সুমন্ত।

সুমন্ত? নামটা যেন বাবা আর মা-র মুখেই কয়েকবার শুনেছে যূথিকা ঘোষ। অনেকদিন আগে প্রায়ই এই নামটা বাবা আর মা-র মুখে শোনা যেত ; আজকাল আর শোনা যায় না। ঐ ভদ্রলোক সেই সুমন্ত? বাবার এক ব্যারিস্টার বন্ধুর ভাইপো যে সুমন্ত জার্মানী থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে ফিরেছে আর মধ্যপ্রদেশে একটা মস্ত বড়ো কারখানার জেনারেল ম্যানেজার হয়েছে, যাকে অনেকদিন আগে একবার গিরিডিতে আসবার জন্য আর উদাসীনে এসে অন্তত সাতটি দিন থেকে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন বাবা, ঐ ভদ্রলোক কি সেই সুমন্ত? তাই তো মনে হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুমন্তের জেদই জয়ী হলো। চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষের কাতর অনুনয়গুলি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল।

—আমার পাঁচ মিনিটেরও দাম আছে মিসেস ঘোষ। অকারণে আর অযথাস্থানে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করতে পারি না। বলতে বলতে নিজের গাড়িতে উঠেই গাড়ি স্টার্ট করে সুমন্ত। উদাসীনের বারান্দা, উদাসীনের ফটক, আর উদাসীনের বাপ-মা-র দুটো দুঃখকাতর মুখের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে উধাও হয়ে গেল সুমন্ত।

বিমর্ষভাবে আর ফিসফিস করে আক্ষেপের স্বরে, বোধহয় সুমন্তর এই অদ্ভুত রকমের রূঢ় ব্যবহারের কথা আলোচনা করতে করতে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ান চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ। এবং যূথিকাকে দেখতে পেয়েই যেন একটা ভয়ানক বিস্ময়ের চমক লেগে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে কুসুমের চোখের চাহনি।

—সুমন্ত যে চলে গেল তুই কি দেখতে পাসনি যূথি?

—পেয়েছি বৈকি।

—কোথায় ছিলি তুই?

—এখানেই।

—তবে কি সুমন্তের সঙ্গে তুই কোনো কথাই বলিসনি?

—হ্যাঁ বলেছি ; সামান্য দু'একটা কথা।

—তার মানে? সুমন্তের সঙ্গে সামান্য দু'একটা কথা কেন?

চারুবাবু বলেন—সুমন্তকে একটু বসে চা খেয়ে যাবার জন্য তুমি অনুরোধ করোনি?

যূথিকা—না।

চারুবাবু—কেন?

যূথিকা—কি আশ্চর্য, আমি কি করে জানবো যে উনি সুমন্ত না শ্রীমন্ত? একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে গায়ে পড়ে চা খাওয়াবার জন্য অনুরোধ করতে গিয়ে শেষে কি...।

চারুবাবু—থাক, আর বলতে হবে না। তোমার চমৎকার কাণ্ডজ্ঞানের আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

কুসুম চেঁচিয়ে ওঠেন—ছি ছি ছি! এরকম অভদ্রতা তোর পক্ষে সম্ভব হলো কেমন করে বল শুনি? সুমন্ত যে নরেনের মাইনের চারগুণ মাইনে পায়। সুমন্তের তুলনায় নরেন তো

বলতে গেলে একজন পেটি অফিসার মাত্র।...সুমন্তের সঙ্গে অভদ্রতা করে নিজেরই যে ক্ষতি করলি, তা যদি বুঝতে পারতিস তবে...।

যূথিকা—তোমার যা খুশি বলতে পার, কিন্তু আমি কোনো অভদ্রতা করিনি, ভদ্রতাও করিনি।

—তোমার কপাল করেছ। ধমক দেন কুসুম।

—আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কুসুমের ক্ষোভ শান্ত করতে চেষ্টা করেন চারু ঘোষ।

উদাসীনের বাপ আর মা যখন নীরব হয়ে ঘরের ভিতরে চলে যান, তারও অনেকক্ষণ পরে, অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বই-এর পাতা হাতড়ে ফরমূলা খুঁজতে গিয়ে আনমনা হয়ে যায় যূথিকা।

যূথিকার অভদ্রতায় রাগ করে চলে গিয়েছে সুমন্ত ; কিন্তু নরেন যদি আজ আড়ালে চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষের এই সব কথা শুনতে পেত, তবে কি হতো? নরেনও কি রাগ করে চলে যেতো না?

বেশ হতো! যূথিকা ঘোষের মনটা যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে নীরবে হেসে ওঠে। সব লেঠা চুকে যেত। মামির কাছ থেকে এক একটা উদ্বেগের চিঠি তেড়ে আসতো না · আর যূথিকার পাটনা যাবার সব ব্যস্ততারও ইতি হয়ে যেত। তখন দেখা যেত, যূথিকার কাছে এসে নিজেদের ভুলের কোন্ কৈফিয়ৎ দিতেন চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ?

সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে এলেন গণেশবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ লতিকার মা অর্থাৎ রমা মাসিমা। বসতে না বললেও বসে পড়েন, প্রশ্ন না করলেও কথা বলেন, আর গায়ে পড়ে হাজার কথা বলে মানুষকে জ্বালাতে পারেন যে মহিলা তাঁকে দেখা মাত্র কুসুম ঘোষের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ভুলতে পারবেন কি করে কুসুম, ইনিই তো সেই প্রচণ্ড মতলবের আর কৌশলের মহিলা, যিনি নরেনের কাছে লতিকাকে গছাবার জন্য বছরে পাঁচবার পাটনা দৌড়চ্ছেন। ভাগ্য ভালো, যূথিকার মামী কণিকার মতো শক্ত মানুষ পাটনাতেই থাকে ; তাই নরেনকে টেনে নেবার অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত টেনে নিতে পারেন নি। কণিকা বাধা দেয় বলেই পারেন নি। তা না হলে এতদিনে বোধহয় নরেনের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হয়েই যেত।

কিন্তু লতিকার মা এসেই হেসে হেসে সবার সামনে যে গল্পটা বললেন, সেটা একটা দুঃসহ বিস্ময়ের গল্প। শুনে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না। লতিকার মা যেন উদাসীনের আকাঙ্ক্ষার সব গর্ব মিথ্যে করে দিয়ে বিজয়িনীর মতো ভঙ্গী নিয়ে একটা কৃতার্থতার কাহিনী বলছেন। যূথিকা সামনেই বসে রয়েছে ; তবু বলতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করলেন না লতিকার মা।

লতিকার মা বললেন—আমি আজই পাটনা থেকে এসেছি। খবর নিয়েছি, কণিকা ওর ছেলেপিলে নিয়ে ভালোই আছে। হ্যাঁ বোম্বাই থেকে হঠাৎ একদিনের জন্য পাটনাতে এসেছিল নরেন। ফোন করে শীতাংশুকে জানিয়ে দিল, আমি এসেছি শীতাংশুদা। জানোই তো আমার শীতাংশুর অভ্যাস, মানুষকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে কত ভালোবাসে শীতাংশু।

কোনো প্রশ্ন করবেন না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন যিনি, তিনিই, সেই কুসুম ঘোষই চমকে উঠে প্রশ্ন করে বসলেন।—শীতাংশু শেষ পর্যন্ত গায়ে পড়ে নরেনকে নিমন্ত্রণ করেছিল বোধহয়?

—হ্যাঁ ; দুপুরে এলো নরেন ; সন্ধ্যা হবার পর চলে গেল। লতিকার গান শুনে কত প্রশংসা করলো নরেন।

কুসুম—গায়ে পড়ে গান শোনালে কে না প্রশংসা করবে বলুন?

লতিকার মা—এটা আবার কেমন কথা হলো। গায়ে পড়ে গান শোনাবে কেন লতি? নরেন নিজেই বারবার বললে, অগত্যা বাধ্য হয়ে...। হ্যাঁ, নরেন তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বলেছি, সবাই ভাল আছে।

কুসুম—আবার পাটনাতে কবে আসবে নরেন?

লতিকার মা—তা জানি না। নরেন বললে মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'এক দিনের জন্য চলে আসতে পারে।

লতিকার মা চলে যেতেই যূথিকার মুখের দিকে আতঙ্কিতের মতো তাকিয়ে প্রশ্ন করেন কুসুম—এসব কি শুনলাম?

যূথিকা হাসে—যা শুনতে পেলে তাই শুনলে ; আবার কি?

কুসুম—আমার মনে হয়, সব মিথ্যে কথা।

যূথিকা—সত্যি কথা হলেই বা কি?

কুসুম রাগ করেন—বাজে কথা বলিস না।...কিন্তু আমি ভাবছি, কণিকা বসে বসে করছে কি? এরকম একটা কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ তার কোনো খবরই রাখে না কণিকা? হতেই পারে না।

লতিকার মা-র কথাগুলিকে অবিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে ; কিন্তু অবিশ্বাস করবার মতো মনের জোরটাই যেন বার বার দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবতে গিয়ে এক-একবার সত্যিই শিউরে ওঠেন কুসুম ঘোষ ; ভগবান না করেন, লতিকার মা-র কথাগুলি যদি মিথ্যে কথা না হয়, তবে যূথিকার জীবনে যে একটা ভয়ানক অপমানের জ্বালা লাগবে। মেয়েটার মনের দশাও যে কি হয়ে যাবে, ভগবান জানেন! জানেন কুসুম ঘোষ, কণিকার কাছ থেকে অনেক চিঠিতে যে খবর এতদিন ধরে জেনে এসেছেন তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই যে নরেনকে ভালবাসে যূথিকা। নরেনের ভালবাসার উপরেও মস্ত বড়ো একটা বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে যূথিকা। এর পর লতিকার সঙ্গে সত্যিই যদি নরেনের বিয়ে হয়ে যায়, তবে...।

কুসুম ঘোষের চোখ দুটো করুণ হয়ে যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু এ কি ব্যাপার? যূথিকার মুখে কোনো উদ্বেগের বেদনা ফুটে উঠেছে বলে মনে হয় না। ঘরের ভিতরে কেমন স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে আর গুনগুন করে চাপা গলায় গান গাইছে যূথিকা।

কণিকার অসাবধানতার উপর রাগ হয়, আর যূথিকার এই চাপাগলার গানের গুঞ্জনের উপরেও রাগ করেন কুসুম ঘোষ। এরা ভেবেছে কি! কণিকা কি ক্লান্ত হয়ে সব চেষ্টাই ছেড়ে দিল? আর যূথিকা কি আচমকা একটা শক পেয়ে, একেবারে আশাশূন্য হয়ে, দুর্ভাগ্যের আর অপমানের জ্বালা চাপবার জন্য চাপা-গলায় গান গেয়ে উঠলো?

—যূথি। ডাকতে গিয়ে কুসুম ঘোষের গলার স্বরটা যেন দুশ্চিন্তার প্রতিধ্বনির মতো বেজে ওঠে।

—কি মা? গান থামিয়ে আর একটু আশ্চর্য হয়ে উত্তর দেয় যূথিকা।

—তুই ভাবিস না। লতিকার মা নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলেছে।

হেসে ওঠে যূথিকা। —বললাম যে, সত্যি হলেই বা কি আসে যায়।

—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। বলবার কোনো দরকারও হয় না। লতিকার মা-র মতলব শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না কিন্তু তবু একটু সাবধান হওয়া ভালো।

—বুঝতে পারছি না মা।

—আমার মনে হয়, তোর এখন পাটনাতে থাকাই ভালো।

—এখন পাটনাতে গিয়ে লাভ কি? কলেজ খুলতে এখনও অনেকদিন বাকি আছে।

—তা জানি, কিন্তু নরেনের যে হঠাৎ মাঝে মাঝে পাটনাতে এসে পড়বার সম্ভাবনাও

আছে।

—আসুক না।

—কি ছাই বলছিস? তুই এখানে বোবা হয়ে পড়ে থাকবি, কণিকা ওদিকে হাবা হয়ে পড়ে থাকবে ; আর শীতাংশু ডাক্তার বার বার নরেনকে নেমন্তন্ন করে চা খাইয়ে, লতিকার গান শুনিয়ে...ছিঃ ছিঃ...ওরা যে নরেনের একটা ভয়ানক ক্ষতি করে দেবে।

—কিন্তু আমি কি করতে পারি বলো?

—তুমি কালই পাটনাতে চলে যাও ; তারপর যা করবার কণিকা করবে।

—আমি পাটনা যেতে পারবো না।

যূথিকার কথা শুনে আশ্চর্য হন কুসুম ঘোষ। বরং একটু শঙ্কিতও হয়ে ওঠেন। যূথিকার চোখে-মুখের এই অবিচল প্রশান্তি, পাটনার উপর হঠাৎ এই তুচ্ছতা, এ যে যূথিকার মনের একটা অভিমানের বিদ্রোহ। খুবই ব্যথিত হয়েছে যূথিকা। মেয়েটার সম্মানে লেগেছে।

চলে যান কুসুম ঘোষ ; এবং একটু পরেই ফিরে আসেন ; সঙ্গে চারুবাবুও আছেন। যূথিকা ঘোষ ততক্ষণে একটা নতুন উপন্যাসের কুড়ি পাতা পড়ে ফেলেছে।

চারুবাবু বলেন—তোমার এখন পাটনা যাওয়া খুবই দরকার যূথি।

যূথিকার চোখে ছোটো অথচ শক্ত একটা আপত্তির ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে।

চারুবাবু বলেন—দেরি করবারও দরকার নেই। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, কাল সকালে হিমু নামে সেই লোকটাকে একটা খবর দিয়ে আসবে...।

যূথিকা ঘোষের ভ্রূকুটিই যেন হঠাৎ একটা চমক লেগে গলে যায় আর সুস্মিত বিস্ময়ের মতো উথলে ওঠে। খোলা উপন্যাস বন্ধ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে যেন ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় যূথিকা—কালই রওনা হতে বলছো?

চারুবাবু—হ্যাঁ সকাল দশটার ট্রেনে।

যূথিকা—বেশ।

পাটনা যেতে হবে। আবার জগদীশপুর—মধুপুর—যশিডি—ট্রেনটা যেন দু'পাশের যত ছোটো ছোটো স্বপ্নলোকের কলরব কুড়িয়ে নিয়ে হুহু করে ছুটে চলে যাবে। ট্রেনের কামরার অচেনা ভিড়ের মুখরতা যেন একটা নীরবতা ; চুপ করে বসে শুধু নিজের মনের কথাগুলিকে বুকের ভিতরে শুনতে পাওয়া যায়। অচেনা ভিড়টাও যেন একটা নির্জনতা ; মনের কথা মুখ খুলে বলে ফেলতে একটুও অসুবিধা নেই, কোনো বাধাও নেই ; কেউ শুনতেই পায় না বোধহয়। ট্রেনের ঘুম একটা জাগার স্বপ্ন, জেগে থাকাও একটা ঘুম-ঘুম আবেশ।

উদাসীনের বাগানে সকালবেলার আলো ছড়িয়ে পড়তেই উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষের মনের ভিতরেও যেন আলো ছড়িয়ে পড়ে। যূথিকা ঘোষের জীবনের গন্তব্যটা পাটনা বটে ; সেই পাটনাকে যে বেশ ভালো লাগে কিন্তু পাটনা যাওয়ার ঝঞ্ঝাটও যে একটা উৎসবের আনন্দ হয়ে যূথিকা ঘোষের কল্পনায় দুলতে শুরু করে দিয়েছে। সকাল দশটা হতে আর বেশি দেরি নেই। তৈরি হয় যূথিকা ঘোষ।

তৈরি হওয়াও এমন কিছু ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার নয়। এবং তৈরি হবার ব্যাপারটাও সকাল ন'টা হতে না হতেই চুকে যায়। চামড়ার বড়ো একটা কেস, ছোটো একটা বেডিং, খাবারের বাস্কেট, জলের ফ্লাস্ক আর ছোটো হাত-ব্যাগটা উপরতলার ঘর থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে নিচের তলার বারান্দায় রেখে দেয় চাকর জানকীরাম।

সাজ করবারও বিশেষ কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। নেকলেসটা গলা থেকে খুলে পড়ে যাবার ভয় আছে ; না পরাই ভালো।

নেকলেসটাকে হাত-ব্যাগের ভিতরে রেখে দিয়েছে যূথিকা। আর...হ্যাঁ ভেলভেটের স্যাণ্ডেল পায়ে না দেওয়াই ভাল ; ট্রেনে ওঠা-নামা করবার হুড়োহুড়ির মধ্যে স্যাণ্ডেলটা পা

থেকে খসে পড়ে যায় আর বেচারা হিমাদ্রি সেই স্যাণ্ডেল আনতে গিয়ে...। ছিঃ, এক পাটি জুতো কুড়িয়ে আনবার জন্য মানুষ এমন বিপদের ঝুঁকিও নেয়? চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়ে আর...।

না, লাল ভেলভেটের স্যাণ্ডেল নয়, সবুজ রঙের চামড়ার সেই মেয়েলী শু জোড়া পায়ে দিয়ে তৈরি হয় যূথিকা। ড্রাইভারও গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে।

যাত্রালগ্নের এই ব্যস্ততার মধ্যেই এক ফাঁকে উপরতলার ঘরের ভিতরে গিয়ে একটু একলা হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের ছবিটার দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে যেন নিজেকেই একটু মায়া করে নেয় যূথিকা। তারপরেই তরতর করে হেঁটে নিচে নেমে আসে। বাইরের বারান্দার উপর দাঁড়ায়।

চারুবাবু বলেন—দশটা বাজতে আর পনর মিনিট বাকি।

কুসুম ঘোষ বলেন—চলো, যূথি।

কিন্তু চলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল যূথিকা। উদাসীনের মেয়ের একটা আশার স্বপ্ন যেন হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ো বলাইবাবু। বলাইবাবুর এক হাতে তাঁর সেই লাল কম্বলটি, আর এক হাতে সেই ছোটো ঝোলাটি এবং ঝোলার মুখ ঠেলে সেই ছোটো থেলো হুঁকোটার নলের মুখ উঁকি দিয়ে রয়েছে।

চারুবাবু বলেন—হিমু নামে সেই...ইয়ে—সেই রাফ স্বভাবের লোকটাকে আর ডাকবার দরকার হলো না। মধুপুর থেকে বলাইবাবু হঠাৎ আজ সকালে এসে গিয়েছেন। কাজেই...

যূথিকার মুখের হাসি যেন মরা গোলাপের পাপড়ির মতো একটা শুকনো বাতাসের আঘাত লেগে ঝরে পড়ে গিয়েছে। বিড়-বিড় করে যূথিকা—তাহলে—তাহলে বলাইবাবু আমার সঙ্গে যাচ্ছেন?

কুসুম—হ্যাঁ।

চারুবাবু খুশি হয়ে হাসেন—বলাইবাবুর কোমরের বাত যে এত শিগ্‌গির সেরে যাবে আমিও আশা করতে পারিনি।

হ্যাঁ, দেখতে পায় যূথিকা গাড়ির কাছে বেশ সোজা হয়ে আর কোমর টান করে দাঁড়িয়ে আছেন বলাইবাবু!

আর দেরি করে লাভ কি? দেরি করবার কোনোও অর্থও হয় না। আস্তে আস্তে হেঁটে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায় যূথিকা।

তারপর আর কোনো ঘটনারই কোনো দেরি সইতে হয় না। উদাসীনের গাড়ি একটানা ছুটে এসে স্টেশনের কাছে থামে। টিকিট কিনতে দেরি করেন না বলাইবাবু। মধুপুর যাবার ট্রেনের ইঞ্জিনটাও রওনা হবার উল্লাসের শিস বাজাতে আর গুমরে উঠতে দেরি করে না।

চারুবাবু বলেন—টেলিগ্রাম করে কণিকাকে জানিয়ে দিয়েছি।

কুসুম ঘোষ বলেন—তুমিও পাটনা পৌঁছেই একটা চিঠি দিতে ভুলে যেও না যেন।

মাথা নেড়ে একটা সাড়া দিতেও ভুলে যায় যূথিকা। একজোড়া উদাস চোখ নিয়ে আর নীরব হয়ে ট্রেনের কামরার ভিতর ঢুকে অলস মূর্তির মতো বসে থাকে। ছেড়ে যায় ট্রেন।

জগদীশপুরের নার্সারি পার হয়ে ট্রেনের ইঞ্জিন তীব্র একটা শিস বাজিয়ে দু'পাশের মাঠের বাতাস শিউরে দিতেই যূথিকা ঘোষের এতক্ষণের নীরবতা যেন হঠাৎ একটা চমক লেগে ভেঙে যায়। বলাইবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা।—আপনার কোমরের বাত হঠাৎ সেরে গেল যে?

বলাইবাবুও যেন চমকে ওঠেন, এবং আস্তে আস্তে হাসেন—হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরের কৃপা। ওঃ, এই কটা মাস কি যে কষ্ট পেয়েছি, সে আর বলবার নয় দিদি।

যূথিকা—অসুখ হঠাৎ সেরে গেল ভালোই হলো, কিন্তু আজ হঠাৎ আপনার গিরিডিতে যাবার এত দরকার হয়ে পড়লো কেন?

বলাইবাবু—দরকার বিশেষ কিছুর নয় দিদি। বাবুর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি, তাই।

যূথিকা—তাই, আর সময় পেলেন না? আজই হঠাৎ।

বলাইবাবু—কি বললে দিদি?

যূথিকা—দুদিন পরেও তো আসতে পারতেন?

বলাইবাবু—তা পারতুম কিন্তু আজ হঠাৎ গিরিডিতে এসে পড়ে ছিলুম বলেই না তোমাকে পাটনাতে পৌঁছে দেবার...।

যূথিকা—আমাকে পাটনা পৌঁছে দেবার মানুষ ছিল। আপনি না এলে কোনো অসুবিধেই হতো না।

বলাইবাবু—অসুবিধে কেন হবে দিদি? বাবুর কি চাকর-বাকরের কোনো অভাব আছে? কত মানুষ আছে।

যূথিকার গলার স্বর তপ্ত হয়ে ওঠে—আজ্ঞে না। আপনি না বুঝে-সুঝে এসব কথা বলবেন না।

বলাইবাবু হাসেন—বুড়ো মানুষের কথার এত ভুল ধরতে নেই দিদি।

যূথিকা—সেই জন্যেই তো বলছি।

বলাইবাবু—কি?

যূথিকা—আপনি বুড়ো মানুষ ; ট্রেনে যাওয়া-আসা করবার সামর্থ্যই বা আপনার কতটুকু? মিছিমিছি নিজে কষ্ট পান আর আমাকেও অসুবিধায় ফেলেন।

বলাইবাবু ভীতভাবে বলেন—না না, আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও। তোমার যদি কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়, তবে আমাকে বললেই আমি তখুনি...।

যূথিকা—বলতে হবে কেন?

বলাইবাবু—অ্যাঁ! না বললে কেমন করে...।

যূথিকা—হ্যাঁ, না বললেও মানুষের অসুবিধে মানুষ বুঝতে পারে।

বলাইবাবু—আমিও কি পারি না? এতবার তোমাকে পাটনা নিয়ে গেলাম, বলতে পার দিদি, তোমার কোনো অসুবিধে হতে দিয়েছি?

বুড়ো বলাইবাবুর প্রশ্নের একটা স্পষ্ট উত্তর হয়তো ঝোঁকের মাথায় শুনিয়েই দিত যূথিকা ; কিন্তু বলাইবাবু হঠাৎ ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে একটা প্রশ্ন করে ওঠেন।—তোমার হাত-ঘড়িটা দেখে একটু বলো তো দিদি, ক'টা বাজল? এগারটা বেজে গিয়েছে?

যূথিকা হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ।

ওঃ, বড়ো ভুল হয়ে গেল। বলতে বলতে আরও ব্যস্ত হয়ে ঝোলা থেকে থার্মোমিটার বের করেন বলাইবাবু ; আর বগলে চেপে বসে থাকেন। একটু পরেই প্রশ্ন করেন—দেড় মিনিট হলো কি দিদি?

যূথিকা—হ্যাঁ।

থার্মোমিটারটাকে যূথিকারই হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলাইবাবু বলেন—দেখে একটু বলে দাও তো দিদি, সাতানব্বই না আটানব্বই?

থার্মোমিটার হাতে তুলে নিয়ে যূথিকা বলে—সাতানব্বই।

যূথিকার হাত থেকে আবার থার্মোমিটারটা তুলে নিয়ে ঝোলার ভিতরে ভরতে ভরতে বলাইবাবু বলেন—তা হলে ভালোই আছি বলতে হবে দিদি। নয় কি?

যূথিকা—হ্যাঁ।

নীরব হয় যূথিকা। এবং বোধহয় চুপ করে বসে শুধু নিজের মনের সঙ্গে নীরবে কথা

বলতে চায়। জানালা দিয়ে বাইরের মাঠের শোভা আর সাঁওতালী গাঁ-এর কুটিরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো আনমনা মানুষের চোখের মতো অপলক হয়ে থাকে।

কিন্তু আবার বলাইবাবুর একটা প্রশ্নের শব্দ যূথিকার এই আনমনা নীরবতার শান্তিটাকেও যেন চমক দিয়ে নষ্ট করে দেয়।

—শুনছো দিদি?

যূথিকা বিরক্ত হয়ে বলে—কি?

—সাড়ে এগারটা বেজে গিয়েছে কি?

যূথিকা—হ্যাঁ।

—তা হলে আমার এখন কিছু আহারাদি দরকার দিদি।

যূথিকা আশ্চর্য হয়।—এখুনি খাবেন?

—হ্যাঁ, নিয়মভঙ্গ করতে চাই না দিদি। ডাক্তার বলেছেন, দিবাভাগের আহার সারতে যেন কোনোমতেই বারটার বেশি না হয়ে যায়!

যূথিকা—মধুপুরে পৌঁছে তারপর খেলেই তো পারতেন।

—না দিদি, মধুপুরে পৌঁছতে ট্রেনটা আজ লেট করবে বলে মনে হচ্ছে।

খাবারের বাস্কেট হাতের কাছে। টেনে নিয়ে, অয়েল পেপারের ঠোঙার মধ্যে দশটা লুচি, আলুভাজা, আর পাঁচটা সন্দেশ ভরে দিয়ে বলাইবাবুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় যূথিকা।

বলাইবাবু বলেন—জল?

বাস্কেটের ভিতর থেকে গেলাস বের করে নিয়ে ফ্লাস্কের জল ঢালে যূথিকা।

বলাইবাবু লুচি ও আলুভাজা মুখে চিবোতে চিবোতে বলেন—গিরিডির কুয়োর জল আমার শরীরের পক্ষে একেবারে মেডিসিন। ও জল খেতে পেলে আমি আধ সের মাংসের কারিকেও ডরাই না।

আহারাদি সমাপ্ত হবার পর, ঝোলার হুঁকোর দিকে যখন হাতটাকে মাত্র বাড়িয়ে দিয়েছেন বলাইবাবু, ঠিক তখন ট্রেনের গতি হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যূথিকা বলে—মধুপুর এসে গিয়েছে। এখন আর হুঁকো-টুকো...।

বলাইবাবু বলেন—তাতে কি হয়েছে? স্টেশন আসতে আসতে আমি টিকে ধরিয়ে ফেলবো।

ঝোলা থেকে হুঁকো, কলকে, তামাক আর টিকে বের করেন বলাইবাবু। এবং দেশলাই জ্বেলে টিকে তাতাতে শুরু করে দেন।

বলাইবাবুর ফুঁ খেয়ে খেয়ে টিকের জ্বলন্ত কোণা থেকে যখন ছোটো ছোটো স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকে তখন ট্রেনটা থেমেই যায়। আর প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের কলরব ট্রেনের কামরার ভিতরে এসে লুটিয়ে পড়ে। হুড়োহুড়ি করে কুলির দলও ছুটে আসে।

একটা কুলি কামরার ভিতরে ঢুকে যূথিকা ঘোষের বাক্স বিছানা বাস্কেট আর ফ্লাস্ক নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ে। শুধু ছোটো হাত ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় যূথিকা।

হুঁকোর নলের মুখে কলকেটা চেপে নিয়ে বলাইবাবু বলেন—আমার কম্বলটা আর ঝোলাটাকে ভুলে যেও না দিদি।

একহাতে হুকো নিয়ে, আর এক হাতে দরজার রড ধরে আস্তে আস্তে নেমে যান বলাইবাবু। বলাইবাবুর প্রকাণ্ড কম্বল আর ঝোলাটাকে এক হাতে কোনোমতে জড়িয়ে ধরে যূথিকাও প্ল্যাটফর্মে নামে।

বলাইবাবু হাঁফ ছাড়েন—আঃ, পাটনা এক্সপ্রেস আসতে এখন অনেক দেরি আছে দিদি।

হ্যাঁ, অনেক দেরি আছে। এখনও আধ ঘণ্টার বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে, তারপর পাটনা যাবার ট্রেন ছুটে এসে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়াবে। হৈ-হৈ করে বেজে উঠবে সংসারের

একটা ছুটন্ত ভিড়ের কর্কশ মুখরতা। এবং সেই মুখরতার একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে ঢুকে চুপ করে বসে থাকতে হবে। বিকেল পার হয়ে যাবে, সন্ধ্যাটা আস্তে আস্তে মরে যাবে, আর গভীর হয়ে যাবে। তারপর, মাঝরাতেরও পরে একটি মুহূর্তে পাটনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে শুধু দেখতে হবে মামীর ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে।

পাটনা যাবার ট্রেন একটা ট্রেন মাত্র। এমন ট্রেনযাত্রা একটা যন্ত্রণার অভিযান মাত্র ভাবতে একটুও ভালো লাগে না। যূথিকার কল্পনার ছবিটাকে মিথ্যে করে দিয়ে এ কি অদ্ভুত একটা অমধুর আর অকরুণ ট্রেনযাত্রা দেখা দিল।

হঠাৎ ছটফট করে শঙ্কিতের মতো চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা—বলাইবাবু!

—কি দিদি?

যূথিকা—আমার বড়ো অসুবিধে হচ্ছে। আমি পাটনা যেতে পারবো না।

চমকে ওঠেন বলাইবাবু—অসুবিধে? কিসের অসুবিধে? আমি তো সর্বক্ষণ তোমার সুবিধের জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছি দিদি।

যূথিকা—তবু আমার অসুবিধে হচ্ছে।

বলাইবাবু—কিন্তু, আমি তো...।

যূথিকা—আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। মোট কথা, আমার এখন পাটনা যেতে খুবই খারাপ লাগছে।

চোখ বড়ো করে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকেন বলাইবাবু—তাহলে সত্যিই কি গিরিডি ফিরে যেতে চাও?

যূথিকা—হ্যাঁ।

বলাইবাবু—কিন্তু বাবু যে আমার উপর ভয়ানক রাগ করবেন দিদি।

যূথিকা—আপনার ওপর রাগ করবেন কেন? আপনার দোষ কি?

বলাইবাবু—হ্যাঁ, সেটা বুঝে দেখ দিদি। আর সেটা বাবুকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে ভুলে যেও না।

যূথিকা—আপনি ভাবছেন কেন? আমি বলবো, আমিই ইচ্ছে করে ফিরে এসেছি।

যূথিকাই ব্যস্ত হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কুলিটাকে ডাকে। এবং কুলিটাও একটু আশ্চর্য হয়ে বাক্স বেডিং তুলে নিয়ে গিরিডি যাবার ট্রেনের কামরায় তুলে দিয়ে সেলাম জানায়—কুছ বকশিসভি দিজিয়ে দিদি।

হাত-ব্যাগ থেকে টাকা বের করে কুলির হাতে ফেলে দিয়ে আর বলাইবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা।—চা খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো খেয়ে নিন বলাইবাবু। এই ট্রেন ছাড়তেও আর বেশি দেরি নেই।

বলাইবাবু বলেন—নিশ্চয় নিশ্চয়। একটা চা-ওয়ালাকে ডাক দিও দিদি।

জ্বর-টর হয়নি, শরীর ভালোই আছে, তবু মধুপুর থেকে ফিরতি ট্রেনেই গিরিডি ফিরে এসেছে যূথিকা। একি কাণ্ড! কি বিশ্রী ব্যাপার। কুসুম ঘোষ তাঁর দু'চোখের বিস্ময় সামলাতে গিয়ে শেষে সন্দেহ করেন, মেয়েটার মাথায় সত্যি সত্যি পাগলামির ছিট দেখা দিল না তো?

চারু ঘোষ বলেন—আমি তো যূথির মতি-গতির কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না।

এখন পাটনা যেতে একটুও ভালো লাগছে না ; এই কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলতে পারেনি যূথিকা। কথাগুলি একটুও মিথ্যে নয়। এবং বিশ্বাসও করেন উদাসীনের পিতা আর মাতা। কিন্তু, কেন পাটনা যেতে একটুও ভালো লাগছে না? এ যে একটা অত্যন্ত অন্যায় ভালো-না-লাগা! অনেকবার আক্ষেপ করেন কুসুম ঘোষ।

কেন পাটনা যেতে ইচ্ছে করছে না? এ যে নিতান্ত বোকার মতো ইচ্ছে না-করা! বারবার এবং বেশ একটু রূঢ় স্বরে অভিযোগ করেন চারু ঘোষ।

এবং মাত্র আর তিনটে দিন পার হবার পর, পাটনা থেকে কণিকা মামীর একটা মস্ত বড়ো চিঠি এসে উদাসীনের পিতা আর মাতার মনে আবার একটা কঠিন উদ্বেগের বেদনা ছড়িয়ে দেয়।

জানিয়েছেন কণিকা ; আর তিন-চার দিনের মধ্যে নরেন পাটনাতে এসে পড়বে। এবং এইবার বেশ কিছুদিন পাটনাতেই থাকবে। নরেনের চিঠির ভাষা থেকে বুঝতে পেরেছে কণিকা, এবার পাটনাতে এসে মন স্থির করে একটা পাকা-কথা দিয়ে ফেলবে নরেন। নরেনের মা-র সঙ্গেও আলাপ করে তাই মনে হয়েছে কণিকার। তা না হলে দেড়-মাসের ছুটি নেবে কেন নরেন?

আরও কতগুলি কথা খুবই বিরক্ত হয়ে লিখেছে কণিকা ;—কিন্তু আপনাদের প্রতিবেশী গণেশবাবুর বড়ো ছেলে, অর্থাৎ লতিকার ডাক্তার দাদা শীতাংশু যে কেন এত ঘন ঘন নরেনের মা-র সঙ্গে দেখা করছে, বুঝতে পারছেন কি? মাঝে একদিনের জন্যে আমি সাসারাম গিয়েছিলাম। ফিরে এসে জানলাম, নরেনও একদিনের জন্য পাটনা এসেছিল। যূথিকার সঙ্গে নরেনের ভাবসাব আছে, একথা তো ওরাও জানে। তবু দেখেন, কি কুৎসিত মনোবৃত্তি? নরেনের কাছে লতিকার মা আপনাদেরই প্রতিবেশিনী সেই সাংঘাতিক মহিলাটি, এর মধ্যে একবার পাটনা ঘুরে গিয়েছেন। নরেনকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে লতিকার গান শুনিয়েছেন। নরেনের মা-র কাছে লতিকার একখানা ফটো আর লতিকার লেখা একগাদা কবিতার একটা খাতা রেখে গিয়েছেন। কিন্তু ওদের কোনো মতলবই সফল হবে না, যদি এই সময় যূথিকা এসে পাটনাতে থাকে।

সব শেষে লিখেছে কণিকা—যূথিকার একটা বিশ্রী দোষ এবার দেখলাম। মেয়েটা কি যেন সন্দেহ করেছে আর হতাশের মতো হাঁপিয়ে পড়েছে। ওরকম ভুল করলে চলবে না যূথিকার। ওকে একটু বুঝিয়ে দেবেন, নরেন যদি ভগবান না করেন, কোনো কারণে কিছু সন্দেহ করে ফেলে, তবে কি পরিণাম হবে কল্পনা করুন। যদি লতিকার সঙ্গে নরেনের বিয়ে হয়ে যায়, তবে যূথিকার কি আর কারও কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে?

—এই নে, কণিকার চিঠি পড়ে দেখ। কুসুম ঘোষ রাগ করে চিঠিটাকে যূথিকার হাতের কাছে তুলে দিয়ে যান।

পাটনার মামীর প্রকাণ্ড চিঠিটা পড়েই চমকে ওঠে যূথিকা। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে যূথিকার প্রাণ। অনেকক্ষণ চুপ করে যেন আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে যূথিকা। তারপরেই ছটফট করে ওঠে।

লতিকার মনের আশার ইতরতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে যূথিকা। লতিকার জীবনের জেদটাও কি ভয়ানক বেহায়া। তাইতো? কি হবে উপায়? নরেন সত্যিই যদি ভুল করে লতিকার মতো মেয়েকে...ভাবতে গিয়ে উদাসীনের মেয়ে যূথিকার মনের ভিতরে একটা অস্বস্তি, বোধহয় একটা উদ্বেগের ছায়া ছটফট করতে থাকে।

নরেনের মনটা যদি এত উদার আর কোমল না হতো তবে এক মুহূর্তের জন্যও উদ্বেগে বিচলিত হতো না যূথিকার মন। কিন্তু নরেন খুব বেশি ভদ্র বলেই বোধহয় শীতাংশু ডাক্তারের ইচ্ছা আর চেষ্টার বিরুদ্ধে স্পষ্ট ক'রে অভদ্রতা করতে পারে না! নইলে কবেই মাত্র একটি স্পষ্ট কথা বলে শীতাংশুদার উৎসাহ থামিয়ে দিতে পারতো নরেন।

বললেই তো পারতো নরেন ; বললো না কেন? আমি যূথিকাকে ভালবাসি, সুতরাং, আপনি বৃথা আর লতিকার গান শোনাবার জন্য আমাকে ডাকবেন না ; একথাটাও শীতাংশু ডাক্তারকে বলে দিলে এমন কিছু অভদ্রতা হতো না।

কল্পনা করতে পারে যূথিকা, নরেনের সঙ্গে যূথিকার বিয়ে হয়ে যাবার পর শুধু লতিকা নয়, এই গিরিডির আরও অনেকে যূথিকার ভাগ্যকে হিংসে না করে পারবে না। মাত্র ত্রিশ

বছর বয়সে এক হাজার টাকা মাইনের সরকারী সার্ভিস করে যে নরেন, সে নরেনের পক্ষে যূথিকার চেয়ে ঢের ঢের বেশি শিক্ষিতা এবং সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করবার অসুবিধা ছিল না। কিন্তু শুধু ভালবাসার সৌভাগ্যে যূথিকা ঘোষই যে নরেনের জীবনের সঙ্গিনী হয়ে যাবে। যদি হিংসে করতে হয়, তবে যূথিকার এই ভালবাসাকেই হিংসে করুক না সবাই।

কিন্তু যূথিকা যদি পাটনা যেতে চায়, তবে নিয়ে যাবে কে? শুনতে পায় যূথিকা, বাবা আর মা বাইরের ঘরে বসে এই সমস্যার কথাও আলোচনা করছেন। বলাইবাবু বাতের ব্যথায় আবার পঙ্গু হয়ে গিয়ে উদাসীনের ভাবনাগুলিকে সমস্যায় ফেলেছেন।

—যূথি। চেঁচিয়ে ডাক দেন চারুবাবু।

বাইরের ঘরের দরজার কাছে যূথিকা এসে দাঁড়াতেই গম্ভীর স্বরে আদেশ করেন কুসুম ঘোষ—তোমাকে এখনই, আজ এই সন্ধ্যাতেই পাটনা রওনা হতে হবে।

চারুবাবু—আমি এখনি সেই লোকটাকে খবর পাঠাচ্ছি...কি যেন তার নাম?

হেসে ফেলে যূথিকা—হিমাদ্রিবাবু।

হ্যাঁ, ডাক শুনে চলে আসতে দেরি করেনি হিমু। এবং যূথিকাকে সঙ্গে নিয়ে পাটনা রওনা হয়ে যেতে একবিন্দু আপত্তিও করেনি।

গিরিডি স্টেশনের ভিড় আর হল্লা পিছনে ফেলে রেখে দিয়ে ট্রেনটা যখন আবার রাঙা মাটির মাঠের উপর দিয়ে দু'পাশের যত সবুজ শোভার ভিতর দিয়ে হু হু করে ছুটে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন যূথিকা ঘোষের মুখে যেন একটা প্রাণখোলা হাসির এক ঝলক তরল আভা ছড়িয়ে পড়ে।—হিমাদ্রি যে আমাকে চিনতেই পারছো না!

হিমুও হাসে—তুমি জান, চিনতে পেরেছি কি না।

যূথিকা—তবে এ রকম না চেনবার ভঙ্গী ক'রে গম্ভীর হয়ে আছ কেন?

হিমু—তোমার গম্ভীরতা দেখে।

যূথিকা—আমি গম্ভীর?

হিমু—হ্যাঁ, এতক্ষণ খুব বেশি গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিলে।

যূথিকা—হ্যাঁ, সত্যি হিমাদ্রি ; মানুষের ইতরতার রকম দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি।

হিমু—ওসব কথা ছেড়ে দাও। ওসব কথা যত ভাববে, তত নিজেরই ক্ষতি হবে।

যূথিকা উৎফুল্ল হয়ে বলে—ঠিক কথা বলেছো হিমাদ্রি, এরকম পরামর্শের জন্যেই যে মানুষের একটা বন্ধু মানুষ দরকার।

কিন্তু আবার কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে আনমনার মতো চোখ নিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে যূথিকা ঘোষ। মানুষের ইতরতার কথা না হোক, অন্য কোনো কথা নিশ্চয় ভাবছে। হিমু প্রশ্ন করে ; এই বোধ হয় হিমু নিজের থেকে যেচে, কে জানে কোন্ সাহসের ছোঁয়া পেয়ে, প্রশ্ন করে হিমু—আবার কি ভাবতে আরম্ভ করলে?

খিল খিল করে হেসে ওঠে যূথিকা।—যা ভাবছিলাম, সেকথা তোমাকে বলা উচিত কিনা তাই ভাবছি।

—ভেবে দেখ। হিমুও হেসে হেসে জবাব দেয়।

যূথিকা—কলেজ খোলেনি, তবু কেন পাটনা যাচ্ছি বলতে পার?

হিমু—যদি বলতে পারতাম, তবে বলেই ফেলতাম। তোমাকে আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার হতো না।

যূথিকা—অভিসারে যাচ্ছি।

হিমু মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকায়।

যূথিকা—শুনে লজ্জা পেলে তো হিমাদ্রি?

হিমু—না। কিন্তু তোমার ইচ্ছেটা এই যে, তোমার কথা শুনে আমি যেন লজ্জা পাই। আসলে কিন্তু নিজে লজ্জা পেয়েছ।

যূথিকা—লজ্জা পাওয়ারই কথা বটে। বোম্বাই থেকে নরেন আর দু'এক দিনের মধ্যে পাটনা পৌঁছে যাবে। নরেন হলো আমার...।

হিমু—কি?

যূথিকা—আঃ, যেন একেবারে খোকাটি! স্পষ্ট ক'রে না বললে কিছু বুঝতেই পারে না।

হিমু হেসে ফেলে—এসব কথা যে শুধু মেয়ে-বন্ধুর কাছে বলতে হয় যূথিকা।

যূথিকা—তোমার মতো পুরুষ-বন্ধু মেয়ে-বন্ধুর চেয়েও বেশি মেয়ে।

হিমু—এরকম প্রশংসা আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ করেনি।

যূথিকা—সত্যি হিমাদ্রি, নরেন মানুষটি সত্যি ভালো। তোমার চেয়ে বয়স একটু বেশিই হবে, তবে ত্রিশের বেশি নয় ; কিন্তু এক হাজার টাকা মাইনের সরকারী সার্ভিসে আছে। কথাবার্তায় যদিও বেশ একটু অহঙ্কার আছে, কিন্তু সে অহঙ্কার মানিয়ে যায়। কেন মানাবে না বলো? বেশ বড়ো অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে, বেশ শিক্ষিত, তার ওপর চাকরিতেও এরকম ভাল কেরিয়ার। আমার মতো মেয়ে ওর চোখেই পড়বার কথা নয়। কিন্তু...।

দুটি শান্ত-চোখের দৃষ্টি আরও অলস ক'রে দিয়ে, সুন্দর একটি গল্প শোনবার আনন্দে যেন কৃতার্থ হয়ে বসে থাকে হিমু দত্ত। নস্যির ডিবে ঠুকতেও ভুলে যায়।

যূথিকা—কিন্তু ভালবাসায় সাত খুন মাপ হয়। আমারও সেই সৌভাগ্য হয়েছে হিমাদ্রি। নরেন আমাকে বিয়ে করবার আশায় রয়েছে।

যূথিকার গল্পটা বোধহয় নিজের থেকেই থামতো না, যদি জগদীশপুরেতে এতগুলি ভদ্রলোক এবং তাঁদের সঙ্গে একটি নববর ও একটি নববধূ এই কামরাতে না উঠতো।

মধুপুরেতে গাড়ি বদল করতে অনেকখানি সময় হুড়োহুড়ি আর ছুটোছুটি করে পার হয়ে গেল। পাটনার ট্রেনে উঠে সীটের এক কোণে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে উপন্যাস পড়তে পড়তে অনেক রাত ক'রে দেবার পরও যখন যূথিকার চোখে ঘুমের আবেশ দেখা দিল না, তখন ডাক দেয় যূথিকা—হিমাদ্রি!

সামনের সীট থেকে উঠে এসে হিমাদ্রি বলে—বিছানাটা পেতে দিই।

যূথিকা—হ্যাঁ।

বিছানা পেতে দেয় হিমু।

যূথিকা বলে—নরেন আমার উপর মাঝে মাঝে রাগ করে মনে হয়।

হিমু—তুমি কি এখনও জেগে বসে থাকবে?

যূথিকা—আঃ, হ্যাঁ, তুমি একটু জেগে থাক না কেন? একটু সরে বসে হিমুকে পাশে বসবার জন্য জায়গা করে দেয় যূথিকা।

হিমুর বসবার রকম দেখে আবার বিরক্ত হয়ে বলে যূথিকা—এ-গল্প চেঁচিয়ে বলা যায় না, এটুকুও বুঝতে পার না কেন? আর একটু কাছে সরে এসো।

উপন্যাসটাকে হাতে তুলে নিয়ে হিমাদ্রির কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যূথিকা হেসে ওঠে—এটাতে ধানাইপানাই ক'রে কত কিছুই না বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে! ছাই হয়েছে। ওসবের চেয়ে অনেক অনেক মিষ্টি ব্যাপার আমার আর নরেনের মধ্যে হয়ে গিয়েছে। নরেনের সঙ্গে একবার আমার তর্ক হয়েছিল, কে বেশি ভালবাসে। আমি জোর করে বলেছিলাম, আমি বেশি ভালবাসি। হেরে গিয়েছিল নরেন, শেষে আমাব কথাটাকেই সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

একটা স্টেশনে ট্রেনটা থেমেছে। স্টেশনে অন্ধকার বেশি, আলো কম, এবং মানুষের

গলার আওয়াজের চেয়ে ঝিঁঝির ডাকের জোর বেশি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যূথিকা বলে—এটা বোধহয় সেই স্টেশন, যেখানে চা আনবার নাম ক'রে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে!

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—আমার তাই মনে হয়েছিল। যাকগে,...নরেন এবার দেড় মাসের ছুটি নিয়েছে কেন বলতে পার?

—না, এটা সেই স্টেশনটা নয়। নস্যির ডিবে ঠুকে এক টিপ নস্যি বার করে হিমু। যূথিকার প্রশ্নের উত্তর দিতে বোধহয় ভুলে যায়।

যূথিকা বলে—এবার একেবারে তৈরি হয়েই আসছেন বলে মনে হচ্ছে। বিয়ের শাঁখের শব্দ না শুনে আর ছাড়বেন না। মামী চিঠিতে যা লিখেছেন, সেটাই ঠিক। মনে হচ্ছে এবার সাঙ্গ হলো ধুলোখেলা।

যূথিকার চোখের তারা ঝকঝক করে। এবং দেখে মনে হয়, হ্যাঁ, আর ধুলোখেলা নয়, যূথিকার জীবন এইবার মুক্তোখেলার আশ্বাস পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। কল্পনায় তারই ছবি দেখেছে যূথিকা।

যূথিকা বলে—কে জানে বোম্বাই শহরটা দেখতে কেমন? যেমনই হোক, নরেনের সঙ্গে যেখানে থাকবো সেখানেই তো আমার স্বর্গ।

বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারা যায় মাঠ জুড়ে সাদা কাশের বন ছড়িয়ে রয়েছে। খুব জোরে সোঁ সোঁ শব্দ ক'রে ট্রেনটা বাতাস কাটছে। যূথিকা বলে—ক'টা বাজলো হিমাদ্রি? তোমার ঘুম পায়নি?

—তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় হিমাদ্রি, এবং সামনের সীটের উপর গিয়ে বসে।

পাটনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুধু মামী দাঁড়িয়ে আছেন। যূথিকার চেনা মানুষ বলতে আর কেউ নেই। ট্রেন থেকে নেমে মামীর কাছে এগিয়ে যায় যূথিকা। কুলির মাথায় যূথিকার জিনিসপত্র চাপিয়ে দিয়ে এক দিকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে হিমাদ্রি।

মামী বলেন—সেই ছেলেটি আবার এসেছে দেখছি।

যূথিকা—হ্যাঁ, বলাইবাবু বাতে পঙ্গু হয়ে রয়েছেন।

মামী—ছেলেটি বোধহয় কিছু বলতে চায়।

যূথিকা—ও হ্যাঁ।

হিমুর কাছে এগিয়ে এসে যূথিকা হাতের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে।

হিমু বলে—টাকা দরকার হবে না।

যূথিকা—তার মানে? তুমি কি গিরিডি ফিরে যাবে না?

হিমু হাসে—ফিরবো বৈকি ; কিন্তু ট্রেনভাড়ার দরকার নেই।

যূথিকা—হেঁয়ালি করো না হিমাদ্রি, স্পষ্ট ক'রে বলো।

হিমু—আজই ফিরবো। কথা আছে, এখান থেকে লতিকাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। লতিকার বাবা গণেশবাবু বলে দিয়েছেন, গিরিডি ফিরে যাবার খরচ তিনিই দেবেন।

মামীর কানে হিমুর কথাগুলি পৌঁছেছে। শুনেই প্রসন্ন হয়ে ওঠে মামীর মুখটা। লতিকা গিরিডি চলে যাচ্ছে, তার মানে পাটনাতে থাকবার সাহস আর হচ্ছে না। বুঝে ফেলেছে শীতাংশু ডাক্তার, নরেনকে নেমন্তন্ন ক'রে লাভ নেই। এতদিনে আক্কেলের উদয় হয়েছে, এবং হার মেনে হতাশ হয়ে নরেনকে উদ্‌ভ্রান্ত করবার সব মতলব ছাড়তে হয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই মামীর। নরেন পাটনাতে আসছে জেনেও লতিকা যদি পাটনা থেকে

চলে যায়, তবে তার কি অর্থ হতে পারে? হয় নরেন চিঠি দিয়ে, নয় নরেনের মা নিজেই শীতাংশুকে ডেকে নিয়ে, লতিকার ফটো ফিরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, না, আমাদের রাজী হওয়া সম্ভব নয়।

এত তাড়াতাড়ি এরকম একটা সুসংবাদ শুনতে পাবেন, আশা করতে পারেননি মামী। আগে শুনতে পেলে যূথিকাকে এত তাড়াতাড়ি গিরিডি থেকে পাটনাতে চলে আসবার জন্য চিঠি দিতেন না।

শুনতে পেলেন মামী, ছেলেটিরই মুখের দিকে তাকিয়ে যূথিকা যেন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করছে—লতিকার এখন গিরিডি যাবার দরকার হলো কেন?

একটা আকাট আহাম্মক মেয়ে! কাকে কি জিজ্ঞাসা করতে হয়, তাও বুঝতে শিখলো না, অথচ বয়স তো তেইশ পার হয়ে প্রায় চব্বিশে গিয়ে পৌঁছেছে। এ-কথা এই গোবেচারা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ কি? তা ছাড়া, এত আশ্চর্যই বা হয় কেন যূথিকা? লতিকা কেন গিরিডি চলে যাচ্ছে, এটুকু আন্দাজ করবার মতো বুদ্ধি নেই কি মেয়েটার? খবরটা শুনে ওরই তো এখন সবচেয়ে বেশি হেসে ওঠা উচিত।

কি-যেন বলতে গিয়ে ব্যস্তভাবে যূথিকা আর হিমুর প্রায় কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ান মামী। যূথিকার মুখের দিকে চোখ পড়তেই আশ্চর্য হয়ে যান। এ আবার কি রকমের কাণ্ড? মেয়েটার চোখ দু'টো জ্বলছে যেন ; ছেলেটার মুখের দিকে যেন বিষদৃষ্টি হেনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যূথিকা। ছেলেটি যেন ভয়ানক একটা বিশ্বাসঘাতক, একটা নিষ্ঠুর অপরাধী, যূথিকার জীবনের একটা সুখ-স্বপ্নকে যেন আচম্‌কা আঘাত দিয়ে দিয়ে ধুলোর উপর লুটিয়ে মিথ্যে ক'রে দিয়ে...কি যেন ঐ ছেলেটার নাম, হ্যাঁ, হিমাদ্রি।

মামীর চোখে একটা সন্দেহের বেদনা থমথম করে। কে জানে কি ব্যাপার? যেখানে কোনো সমস্যা আশঙ্কা করতে পারেনি কেউ, সেখানে সত্যিই বিশ্রী একটা সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠেনি তো? যূথিকার বোকা মনটা কোনো ভুল ক'রে ফেলেনি তো? নইলে এত বড়ো একটা মেয়ের পক্ষে এত বড়ো একটা ছেলের মুখের দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকবার আর কি অর্থ হতে পারে?

মামী যে এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে, যেন দেখতেই পাচ্ছে না যূথিকা। হিমুর মুখের দিকে জ্বালাভরা দুটো অপলক চোখ তুলে যূথিকা বলে—তোমার লজ্জা করছে না?

হিমু হয়তো যূথিকার প্রশ্নের উত্তর দিত, কিন্তু মামীকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করে হিমু ; এবং স্পষ্ট ক'রে উত্তর দিতে পারে না বলেই অস্পষ্ট স্বরের একটা প্রতিবাদ হিমুর ঠোঁটের কাঁপুনিতে শুধু বিড়বিড় করে।

যূথিকা বলে—তুমি এখন গিরিডি ফিরে যাও হিমাদ্রি। লতিকাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

হিমু হাসতে চেষ্টা করে—সে কি কথা? আমি যে গণেশবাবুকে কথা দিয়ে এসেছি।

যূথিকা—কথা দিতে লজ্জা করেনি একটুও?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন মামী ; মামীর কপালের রেখা কুঁচকে ওঠে।

যূথিকা বলে—কি? কথা বলছো না কেন হিমাদ্রি?

হিমু—কি জানতে চাইছো, বলো।

যূথিকা—তুমি লতিকাকে গিরিডি নিয়ে যাবে না, আমাকে স্পষ্ট ক'রে কথা দাও।

হিমু—অসম্ভব।

যূথিকা—কি?

হিমু—লতিকাকে গিরিডি নিয়ে যেতেই হবে। মানুষকে কথা দিয়ে মিছিমিছি কথার খেলাপ করতে পারবো না।

প্ল্যাটফর্মের ভিড় শত শত মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে রয়েছে পৃথিবীর একটা ব্যবস্থা ;

শুধু চলে যাবার টানে অস্থির ও চঞ্চল একটা সংসারের একটি টুকরো। এখানে থমকে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য কেউ আসে না। কিন্তু চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষ সত্যিই যেন চিরকালের মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং সামনে বা পিছনে কোনো দিকে এগিয়ে যাবার সাধ্যি নেই।

চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা—তাহলে আমিও গিরিডি ফিরে যাব। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

মামী ডাকেন—যূথিকা?

চমকে ওঠে যূথিকা! আর, মামীকে কাছে দেখতে পেয়েই আতঙ্কিতের মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে, তারপরেই হাসতে চেষ্টা করে।

মামী বলেন—অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, কুলিটা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। চলো এবার।

যূথিকা হাসে—হ্যাঁ, যাবই তো। এখানে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবো কে বলেছে?

মামী—তোমার কাজ শেষ হয়েছে তো?

যূথিকা—কাজ? কিসের কাজ?

মামী—ওকে যা বলবার ছিল, বলা হয়েছে?

যূথিকা—ভ্রূকুটি করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—ওকে আবার কি বলবার ছিল? কিছু না, চলো।

পাটনাতে এসেছে নরেন ; এবং লতিকাও পাটনাতে নেই সুতরাং যূথিকার মনের ভাবনায় এক ফোঁটা উদ্বেগও নেই। তা ছাড়া, মামীও খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, এবার আর শীতাংশু ডাক্তার নরেনকে চা-এর নেমন্তন্ন করবার চেষ্টা করেনি। এবং একথাও সত্যি, নরেনের মা লতিকার ফটো ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে যে চিঠিটা দিয়েছেন, তাতে শুধু ফটো ফেরত পাঠালাম ছাড়া আর কোনো কথা লেখেননি। শীতাংশু ডাক্তারের পাশের বাড়ির সুব্রতবাবুর স্ত্রী একদিন বেড়াতে এসে মামীকে এই খবরও জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

গর্দানিবাগের মাঠের সেই পলাশে এখন আর ফোটা ফুলের শোভা রক্তময় হয়ে হাসে না। নতুন বর্ষার জলে মাঠের ঘাস সবুজ হয়ে উঠেছে। এই মাঠের সবুজের উপর নরেনের পাশে পাশে হেঁটে প্রায় রোজই সকালে আর সন্ধ্যায় বেড়িয়েছে যূথিকা। নরেনকে আর নিমন্ত্রণ ক'রে ডাকতে হয় না। নিজের প্রাণের আবেগে নরেন নিজেই রোজ এসে যূথিকার কাছে দাঁড়ায়। চা-এর জন্য নিজেই তাগিদ দেয় নরেন। আর মাঝে-মাঝে, মামী কিংবা অন্য কেউ কাছে না থাকলে, যূথিকার কানের কাছে নরেনই হেসে হেসে ফিসফিস করে—তোমাকেই কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে হয়।

—কেন?

—তোমার ভালবাসারই জয় হলো।

—তা হলো বৈকি!

—অদ্ভুত?

—কি?

—তোমার ভালবাসার জেদ।

—হ্যাঁ, অদ্ভুত জেদ বৈকি! চার বছর ধরে বলতে গেলে তপস্যা করতে হয়েছে।

নরেন হাসে—তপস্যার সিদ্ধিও হয়েছে।

নরেনের দু'চোখের গর্বময় উৎফুল্লতার দিকে তাকিয়ে যূথিকা বলে—হ্যাঁ, চার বছর অপেক্ষায় থেকে থেকে তারপর যখন তুমি আমাকেই বিয়ে করতে রাজি হয়েছো, তখন স্বীকার করতেই হয়।

—কি?

সিদ্ধিলাভ করেছি। আমার ভালবাসাই জয়ী হয়েছে।

চার পাতা চিঠি লিখে কণিকা মামী গিরিডির উদাসীনের সব উদ্বেগ দূর করে দিয়েছেন। রাজি হয়েছে নরেন। বিয়ের দিন ঠিক করবার কথাও বলেছে। নরেনের মা বলেছেন, পয়লা অঘ্রান খুব ভালো শুভদিন।

মামীর প্রাণটাও যেন হাঁপ ছেড়ে অনুভব করে তাঁরও একটা জেদের তপস্যা সফল হয়েছে। নরেনের মতো ছেলের সঙ্গে যূথিকার মতো মেয়ের বিয়ে ঘটিয়ে দেওয়া চারটিখানি বুদ্ধি ও চেষ্টায় সম্ভব হয় না। গিরিডি থেকে যূথিকার মা তিন পাতা চিঠি লিখে মামিমাকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন, তোমার চেষ্টা আর বুদ্ধির জোরেই মেয়েটার ভাগ্য প্রসন্ন হতে পেরেছে কণিকা। নরেনের মাকে জানিয়ে দিও, আমরা পয়লা অঘ্রানেই রাজি।

মামীর চিন্তায় শুধু একটা অস্বস্তি মাঝে মাঝে ছটফট ক'রে ওঠে। যূথিকা এত বেশি ঘুমোয় কেন? জেগে থাকে যখন, তখনও যেন অদ্ভুত একটা কুঁড়েমির জ্বরে গুটিসুটি হয়ে এঘর কিংবা ওঘরের বিছানার এক কোণে বসে হাই তোলে আর ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়। যে-কথা কোনোদিন যূথিকাকে বলতে হয়নি, সেই কথাই আজকাল বলতে হয়, একটু ভালো ক'রে সাজ করবার কথা। ভালো করে সাজবার নিয়মটাই যেন ভুলে গিয়েছে যূথিকা। কিন্তু খুব ভালো করেই জানে যূথিকা, সন্ধ্যা হবার আগেই নরেন এসে পড়বে। তবু, বিকেল হয়ে এলেও যূথিকার মনে পড়ে না যে, এইবার তাড়াতাড়ি সেজে নেওয়া উচিত। মামী মনে করিয়ে দেন, তবে বুঝতে পারে, এবং তারপরেই ব্যস্তভাবে সাত-তাড়াতাড়ি একটা এলোমেলো সাজ করে। আর, অরুণকে কোলে নিয়ে যত আজে-বাজে কথা বলতে থাকে। অরুণও টানা-ছেঁড়া ক'রে যূথিকার সাজ আর খোঁপাটাকে আরও এলোমেলো ক'রে দেয়।

নরেনের সঙ্গে বেড়িয়ে, বড়ো জোর এক মাইল পথ হেঁটে, আবার যখন ঘরে ফিরে আসে যূথিকা, তখন দেখে মনে হয়, যেন দু'দিন না খেয়ে একশো মাইল হেঁটে একেবারে ক্লান্ত ও আধমরা হয়ে গিয়েছে যূথিকার চেহারাটা। এ আবার কোন্ ধরনের মানসিক ব্যাধি? মামীর চোখ দুটো আবার সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

শুধু মামী কেন, যূথিকাও যে যূথিকাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। ধুলোখেলার পালা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, হাতের কাছে মুক্তো এসে গিয়েছে, তবে আবার জীবনের অহঙ্কারটা এমন ক'রে মুসড়ে পড়ে কেন? জিত হলো, তবুও হেরে গিয়েছি বলে একটা সন্দেহের অস্বস্তি মনের ভিতরে কাঁটার মতো খচখচ করে কেন?

কে হারিয়ে দিল? লতিকা? ভাবতে গিয়ে কপালের দু'পাশে একটা জ্বালার কামড় জ্বলতে থাকে যেন। মামী বুঝবেন কি ছাই? মামী কল্পনাও করতে পারেন না, পাটনা থেকে লতিকার গিরিডি যাবার ট্রেনযাত্রা যে লতিকার জীবনের একটা জয়যাত্রা। হিমাদ্রি চা এনে দিয়েছে, সেই চা হেসে হেসে খেয়েছে লতিকা। লতিকার ঘুম পেয়েছে, আর ব্যস্ত হয়ে বাঙ্কের উপর থেকে বেডিং নামিয়ে লতিকার জন্য বিছানা পেতে দিয়েছে হিমাদ্রি। লতিকা চালাক ; কি ভয়ানক চালাক, সেটা মামীর ধারণাতেই নেই। নিরালা কামরার সীটের উপর পাতা বিছানায় টান হয়ে শুয়েছে লতিকা, আর হিমাদ্রিকে মাথার কাছে বসিয়ে রেখে সারা রাত গল্প করেছে।

আর হিমাদ্রি? হ্যাঁ লতিকাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? হিমাদ্রিই যে যত নষ্টের মূল। কি ভয়ানক চালাক বোকা! চট্ ক'রে কত তাড়াতাড়ি জীবনের ট্রেনযাত্রার এক নতুন বান্ধবী যোগাড় করে নিল। পয়লা অঘ্রানের পর আর ক'টা দিনই বা গিরিডি ও পাটনার মুখ দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে? বড়ো জোর দশটা দিন। নরেনের ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই নরেনের সঙ্গে যূথিকাকে বোম্বাই চলে যেতে হবে। তারপর? তারপর আর কি? লতিকা আর হিমাদ্রি অনন্তকাল ধরে পাটনা থেকে গিরিডি আর গিরিডি থেকে পাটনা যাওয়া-আসা ক'রে চমৎকার ট্রেনযাত্রার পুণ্যে ধন্য হয়ে থাকবে।

গিরিডি থেকে চিঠি আসে। কিন্তু সে চিঠিতে বিশ্বের যত খবর থাকুক না কেন, শুধু একটি খবরের কোনো উল্লেখ থাকে না। হিমাদ্রি এখন কোথায়? লতিকা সত্যিই গিরিডি ফিরেছে তো? ফিরেছে নিশ্চয়। যাবে আর কোথায়? পাটনা ছেড়ে দিয়ে এখন গিরিডিতে গিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে লতিকা। এবং আশ্চর্য নয়, গণেশবাবুর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় চা খেতেও আসছে হিমাদ্রি।

পাটনা নয়, গিরিডিই যে যূথিকার জীবনের উদ্বেগ হয়ে উঠলো। কোনোদিন কল্পনাতেও সন্দেহ করতে পারেনি, কোনো মুহূর্তেও একটু সাবধান হয়ে কল্পনা করতে পারেনি যূথিকা, লতিকার মতো মেয়ে যূথিকাকে এভাবে মিথ্যা জয়ের কাছে ফেলে রেখে দিয়ে নিজে একটা খাঁটি জয়ের কাছে চলে যেতে পারে। পয়লা অঘ্রান আসতে দেরি আছে। তবে এখন আর পাটনাতে থাকবারই বা কি দরকার? এখন গিরিডি চলে গেলেই তো হয়।

গিরিডির চিঠি আসতেও আর বেশি দেরি হয়নি। মা লিখেছেন, যূথিকার এখন গিরিডি চলে আসাই উচিত মনে করি। যূথিকাকে আসবার জন্য বলাইবাবুকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি ; তুমি একেবারে বরযাত্রী হয়েই এসো। বর আনতে এখান থেকে যাবার লোক নেই। তোমার আর অরুণের বাবা দু'জনের ওপর বর আনবার সব দায়িত্ব রইল।

গিরিডির চিঠিটা যূথিকাকেও পড়তে দিলেন মামী। চিঠি পড়েই কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে যূথিকা, তারপরেই বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—বলাইবাবুকে পাঠিয়ে লাভ কি? বাতে পঙ্গু একটা মানুষ।

মামী—তবে কি একাই যেতে চাও?

যূথিকা—একা যাব কেন? হিমাদ্রি কি নেই?

অপলক চোখ তুলে যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবেন মামী, মামীর দু'চোখের মধ্যে যেন একটা ভয়ের ছায়া ছমছম করে! আস্তে আস্তে এবং ভয়ে ভয়ে বলেন মামী—বারবার হিমাদ্রিকে বিরক্ত করাটা ভালো দেখায় না।

যূথিকা চেঁচিয়ে ওঠে।—হিমাদ্রি যে বিরক্ত হয় না, সেটা মা খুব ভালোই জানে।

মামী—আমার মনে হয়, হিমাদ্রিকে না পাঠালেই ভালো হয়।

যূথিকা—বেশ। তাহলে বলাইবাবুকেও আসতে বারণ করে দাও।

মামী—তার মানে?

যূথিকা হেসে ফেলে—আমি একাই গিরিডি যাব।

দুলে দুলে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢোকে ছোটো অরুণ। অরুণের হাতে একটা চিঠি। অরুণ বলে—একটা লোক।

চিঠি খুলে দু'লাইন পড়তেই আশ্চর্য হয়ে যান মামী, এবং বাইরের বারান্দার দিকে উঁকি দিয়ে তাকান।

যূথিকা—কি ব্যাপার?

মামী বলেন—হিমাদ্রি এসেছে।

ঝক ক'রে হেসে ওঠে যূথিকার চোখ। শাড়ির আঁচলটাকে টেনে গায়ে জড়িয়ে ব্যস্তভাবে দাঁড়ায় যূথিকা।—তার মানে?

মামী বলেন—কুসুমদি লিখেছেন, বলাইবাবুর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। হিমুকেই পাঠালাম।

মামীর দুশ্চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে মামা বলেন—না, আমার মনে হয় সে রকম কোনো ভয়ের কারণ নেই।

মামী—তবু, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

মামা—ভদ্রলোকের মেয়ে মাথা খারাপ ক'রে বাজে লোকের সঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছে, এরকম কেস অবশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু বেচারা যূথিকাকে এরকম মাথা খারাপ

মেয়ে মনে করতে পারছি না।

মামী—কিন্তু হিমাদ্রি নামে এই ছেলেটার মনে কি আছে, সেটা কি ক'রে বুঝবে বলো?

মামা কিছুক্ষণ ভাবেন! তারপর বলেন—আচ্ছা, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

মামী—কি ব্যবস্থা?

মামা—আমি এখনি গিয়ে ভোলাকে...রেলওয়ে পুলিশের ডি. এস-পি ভোলাকে চেন তো?

মামী—খুব চিনি।

মামা—ভোলাকে বলে দিচ্ছি, যেন ট্রেনের গার্ডকে প্রাইভেটলি বলে রাখে ভোলা, ওদের দু'জনের উপর একটু ওয়াচ রাখবার জন্য। আমি চললাম...ওদের তাড়াতাড়ি রওনা করিয়ে দাও।

রওনা হতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি করিয়ে দিলেন মামী, অর্থাৎ টেলিফোনে নরেনকে একটা খবর দিতে যতটুকু সময় লাগলো, তার বেশি নয়। এবং স্টেশনে পৌঁছবার পর খুশি হয়ে দেখলেন মামী, যাদের আসবার কথা ছিল, তারা সবাই এসেছে। মামা এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন, তার পাশে নরেন। এবং কি আশ্চর্য, শীতাংশু ডাক্তারও এসেছে।

সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য, শীতাংশু ডাক্তার হেসে হেসে নরেনের সঙ্গে গল্প করছে! এমন কি মামাকেও হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলে শীতাংশু—পয়লা অঘ্রানই বোধহয় বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে?

মামা গম্ভীর হয়ে বলেন—বোধহয়।

শীতাংশু বলে—বড়ো ভালো হলো।

শীতাংশুর কথা শুনে মামীর মুখটা অপ্রসন্ন হয়ে যায়। কি রকম ঢং ক'রে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে শীতাংশু, যেন ছোটো ভাইটির বিয়ের খবর শুনে আহ্লাদে মজে গিয়েছে। কিন্তু মামীই জানেন, এই শীতাংশুই এই কটা বছর এই বিয়ের সম্ভাবনাকে ভাংচি দিয়ে মিথ্যে ক'রে দেবার জন্য কি চেষ্টাই না ক'রে এসেছে! তবে আবার কিসের আশায়, কোন মতলবের উৎসাহে এখানে এসেছে শীতাংশু? মামী ডাকেন—এদিকে এসে একটা কথা শুনে যাও নরেন।

শীতাংশু কপট শুভচ্ছোর স্পর্শ থেকে নরেনকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পাটনার প্রচণ্ড গরমের জন্য দুঃখ ক'রে অনেক কথা বললেন মামী—কার্তিক শেষ হতে চললো তবু দেখছো গরমের গুমোট ছাড়ছে না।

ট্রেনে উঠবার জন্য যূথিকার ব্যস্ততা দেখে মনে মনে রাগ করেন মামী। নরেনের কাছ থেকে অনেকক্ষণ হলো ইচ্ছে করেই সরে গিয়েছেন মামী। এই তো, এইবার একটা সুযোগ পেলি বোকা মেয়ে। নরেনের কাছে এসে একবার দাঁড়া। দু'টো কথা বল। কিন্তু কোথা যূথিকা! কাণ্ডজ্ঞানহীন যূথিকা তখন ট্রেনের কামরার ভিতরে ঢুকে হিমাদ্রির সঙ্গে কী অদ্ভুত মুখরতা আর হাসাহাসি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু মনের অভিযোগ মনেই চেপে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন মামী।

—আমি কিন্তু জানালার ধারে বসবো হিমাদ্রি। হাত-ব্যাগটাকে সীটের নিচে রেখে দাও হিমাদ্রি।

বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, আর কি বিশ্রী চেঁচিয়ে কথা বলছে মেয়েটা! যূথিকার কাছে এগিয়ে এসে মামী ফিসফিস ক'রে বলেন—আস্তে কথা বল যূথিকা।

ট্রেন ছাড়লো, এবং যূথিকা যেন এতক্ষণের ব্যস্ততার ভুলের মধ্যে বিমনা হয়ে থাকা মনটাকে চিনতে পেরে চমকে ওঠে। ভুল হয়েছে, ভয়ানক বিশ্রী ভুল। নরেনের সঙ্গে সামান্য একটু চোখে চোখে কথা বলে নিতেও ভুলে গিয়েছে। এই ভুলটুকু শুধরে নেবার জন্য

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নরেনের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা।

হাসিভরা মুখটাকে জানালার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে যূথিকা, কারণ প্ল্যাটফর্মের কোনো মুখ আর চেনা যায় না। ঝাপসা হয়ে গিয়েছে পাটনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম।

এইবার চোখের কাছে যাকে খুব স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায় যূথিকা, তারই শান্ত মুখের চেহারাটাকে সহ্য করতে গিয়ে ছটফট ক'রে ওঠে।

যূথিকা বলে—কেমন আছ হিমাদ্রি?

হিমু হাসে—ভালো আছি।

যূথিকা—লতিকা ভালো আছে?

হিমু—জানি না। ভালো থাকলেই ভালো।

যূথিকা—খোঁজ রাখ না?

হিমু—খোঁজ রাখা আমার অভ্যাস নয়।

যূথিকা—কিন্তু লতিকার তো সে অভ্যাসটি আছে।

হিমু—জানি না।

যূথিকা—কেন? লতিকা খোঁজ করেনি?

হিমু—কার খোঁজ?

যূথিকা—তোমার?

হিমু—না।

যূথিকা—আশ্চর্যের ব্যাপার।

হিমু—কিসের আশ্চর্য!

যূথিকা—এত গরজ ক'রে পাটনা থেকে গিরিডি নিয়ে গেলে যাকে, তার সঙ্গে সামান্য একটু বন্ধুত্বও হলো না।

হিমু—না।

যূথিকা—তোমার দুর্ভাগ্য।

হিমু—একটুও না।

যূথিকা—কেন? লতিকা দেখতে সুন্দর নয়?

হিমু—সুন্দর বৈকি!

যূথিকা—আমার চেয়েও সুন্দর নিশ্চয়?

হিমু—লোকে তো তাই বলে।

যূথিকা—কে বলে?

হিমু—তোমার মা বলছিলেন।

যূথিকা—কার কাছে?

হিমু—তোমার বাবার কাছে।

যূথিকা—তোমার সামনেই?

হিমু—হ্যাঁ।

যূথিকা—আর তুমিও বেশ দু'কান ভরে কথাটা শুনে নিলে?

হিমু—হ্যাঁ, কানে শুনতে পাই যখন, তখন না শুনে পারবো কেন?

যূথিকা—কিন্তু কথাটা এত মনে ক'রে রাখতে বলেছে কে? মনে হচ্ছে, কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পশেছে।

হিমু—না।

যূথিকা—জোর করে না বললে কি হবে?

হিমু—কত কথাই শুনতে পাই, কিন্তু মরমে পশে আর কোথায়?

যূথিকা—মরম নেই তাহলে।

হিমু—হবে।

যূথিকা—আমার তো তাই মনে হয়।

হিমু—বেশ ভালো মন তোমার।

হিমু দত্তের শান্ত চোখ দুটোও যেন উদাসীনের মেয়ে যূথিকার মুখের দিকে অনর্থক বাচালতায় বিরক্ত হয়ে, এবং একটু তপ্ত হয়ে যূথিকার মুখের দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে হিমু দত্তের চোখ। বিনা দোষের আসামী ফাঁসির হুকুম শুনেও বোধহয় এমন ভয় পাবে না। দেখতে পেয়েছে হিমু, চারু ঘোষের মেয়ের চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছে।

এমন ভয়ানক বিষন্নতা, এতো কঠোর শাস্তি, জীবনে কোনদিন সহ্য করবার দুর্ভাগ্য হয়নি হিমু দত্তের ; এর চেয়ে যূথিকা ঘোষের চোখের সেই সব ভয়ানক অবহেলার আর কৌতুকের হাসিতে যে অনেক বেশি করুণা ছিল।

হিমু বলে—আমাকে মাপ করো যূথিকা, কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমার কি অপরাধ হলো।

চোখ দুটোকে এক মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিয়ে শুকনো ক'রে ফেলেছে যূথিকা।

যূথিকা বলে—যাক গে, তুমি কিছু মনে করো না হিমাদ্রি। তোমাকে সত্যিই অপরাধী বলছি না।

হাঁপ ছাড়ে, বুকের ভিতরের একটা ভয়াতুর বেদনার গুমোট যেন নিঃশ্বাসের জোরে ভেঙে দিয়ে হাঁপ ছাড়ে হিমু। নস্যির ডিবে ঠুকে ঠুকে হাসতে চেষ্টা করে। গিরিডিতে এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সকালবেলা রোদ ওঠবার পরেও উশ্রীর উপর কুয়াশা একেবারে জমাট হয়ে থাকে।

যূথিকাও হাসে—সত্যি কথা বলবে?

হিমু—তোমার কি সন্দেহ আছে, আমি সত্যি কথা বলি না?

যূথিকা—না, তুমি সে বিষয়ে একেবারে খাঁটি গুডবয়। তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হিমু—বলো।

যূথিকা—লতিকা তোমাকে আমার মতো বিরক্ত করেনি?

হিমু—একটুও না।

যূথিকা—চা এনে দাও, বিছানা পেতে দাও, হেন তেন কোনো হুকুমই করেনি?

হিমু—না। বরং লতিকাই ওসব কাণ্ড করেছে। আমি আপত্তি করেছি, তবুও শোনেনি।

যূথিকার চোখের দৃষ্টি আবার কঠোর হয়ে ওঠে।—তার মানে, লতিকা তোমার খুব সেবাযত্ন করেছে?

হিমু—একটু বাড়াবাড়ি করেছে বলতে হবে। নিজেই হাঁক দিয়ে চা-ওয়ালাকে ডেকে এনে আমাকে চা খাইয়েছে। বিছানাটাকেও আমার জন্য ছেড়ে দিয়ে, নিজে সারারাত জেগে উলের টুপি বুনেছে। একটু বেশি ভদ্রতা করেছে লতিকা।

যূথিকা ভ্রূকুটি ক'রে মুখ ফেরায়—কিন্তু তাই বলে লতিকা তোমাকে বিয়ে করতে পারে না।

হিমু—আমি লতিকাকে বিয়ে করতে পারি না।

যূথিকা—কেন?

হিমু—আমার মতো মানুষকে লতিকার বিয়ে করা উচিত নয় বলে।

যূথিকা—নিজেকে কি তুমি এতই ছোটো মনে করো।

হিমু—একটুও ছোটো মনে করি না।

যূথিকা—তবে?

হিমু—লোকে তো ছোটো মনে করে।

যূথিকা—আমিও মনে করি কি?

হিমু—তোমার মন জানে।

আবার হিমু দত্তের দু'চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত হয়ে, আর যূথিকার এই অকারণ বাচালতার উপর বেশ কুপিত হয়ে যূথিকার মুখের উপর পড়তেই চমকে ওঠে, আর ভয় পায় হিমু। যূথিকা ঘোষের চোখের পাতা আবার ভিজে ভারি হয়ে গিয়েছে।

হিমু দত্ত ভয়ে ভয়ে অনুরোধ করে।—গল্প করবার এত জিনিস থাকতে তুমি আজ কেন মিছিমিছি এসব কথা তুলে ট্রেনযাত্রার আনন্দটা মাটি করছো যূথিকা।

হিমুর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় যূথিকা। নিজেই হাত বাড়িয়ে সীটের তলা থেকে একটা ছোটো বাস্কেট বের করে। বাস্কেট খুলে খাবারের প্যাকেট ও একটা ডিস বের করে। আর ডিসের উপর খাবার সাজিয়ে দিয়েই বলে--খাও হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি অপ্রস্তুতের মতো বলে—একি? তোমার খাবার কোথায়?

যূথিকা হাসে—এই তো। একই ডিসে দু'জনে খেতে পারা যায় না কি?

সত্যিই হাত বাড়িয়ে ডিসের উপর সন্দেশ ভাঙে যূথিকা। এবং খেতেও কোনো দ্বিধা করে না।

খাবার খেতে গিয়ে হেসে ফেলে হিমু—একটা কাণ্ডই করলে তুমি!

যূথিকা মুখ টিপে হাসে—কেন করলাম, বুঝতে পারলে কিছু?

হিমু—না।

যূথিকা—লতিকাকে হারিয়ে দিলাম। কেমন? ঠিক কিনা? লতিকা নিশ্চয় এতটা করতে পারেনি?

—না। কথাটাকে কেমন উদাসভাবে, যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে চুপ করে খাবার খেতে খেতে হিমু আবার আনমনার মতো হঠাৎ বলে ওঠে।—এই তো আমাদের শেষ ট্রেন-যাত্রা।

—অ্যাঁ, কি বললে? হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে যেন একেবারে ক্লান্ত হয়ে ঢুলে পড়ে যূথিকা ঘোষের চোখের চাহনি। শেষ ট্রেন-যাত্রা? তার মানে কি? হিমাদ্রির সঙ্গিনী হয়ে একই ট্রেনে পাটনা থেকে গিরিডি আসা-যাওয়ার পালা চিরকাল চলতে থাকবে, এইরকম একটা জীবন কি সত্যিই কল্পনায় কামনা ক'রে রেখেছিল যূথিকা? নইলে এত আশ্চর্য হয়ে যায় কেন যূথিকা? এবং হিমুর এত সহজ ও সরল কথাটা বুঝতে এত দেরি করে কেন?

বুঝতে দেরি হয়নি যূথিকার। চোখের সামনে একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, হ্যাঁ, হিমাদ্রির সঙ্গে এই শেষ ট্রেন-যাত্রা! ধুলোখেলার বন্ধুত্বের এই শেষ। বেশ হলো, খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

যূথিকা বলে—খবরটা তাহলে তুমিও শুনেছ হিমাদ্রি?

হিমু—কিসের খবর?

যূথিকা—আমার বিয়ের।

হিমু—হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো বললাম।

যূথিকা—কি?

হিমু—এই আমাদের শেষ ট্রেন-যাত্রা। তাই মিছে আর তর্ক-টর্ক ক'রে কেন শেষ দিনের আনন্দটা নষ্ট করো?

যূথিকা—আনন্দ?

হিমু—আনন্দ বৈকি। তুমি যা চেয়েছিলে, তাই পেলে, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি

হতে পারে?

যূথিকা—সত্যি ক'রে বলো হিমাদ্রি। শুনে তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

হিমু—হ্যাঁ।

যূথিকা—আনন্দের মধ্যে কি এতটুকু...

হিমু—কি?

যূথিকা—কষ্ট হচ্ছে না।

চমকে মুখ ফিরিয়ে নেয় হিমু দত্ত। নইলে হিমুর জীবনের একটা দুঃসহ বেদনার নিঃশ্বাস বোধহয় এখনই চারু ঘোষের মেয়ের উপর ছড়িয়ে পড়বে, আর ধরা পড়ে যাবে হিমু! মাথা হেঁট করে, চোখ-মুখ একেবারে বিবর্ণ ক'রে আর ধরা পড়ে যাবে হিমু!

হিমুর মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে যূথিকা হাসে। তোমার উপর আমার আর রাগ নেই হিমাদ্রি।

হিমু—কেন বলো তো?

যূথিকা—লতিকার কাছে হার মানতে হলো না। আমারই জিত হয়েছে।

ট্রেনটা থেমেছে। খুব আলোয় ভরা জমজমাট একটা স্টেশন। যেমন লোকের ভিড়, তেমনিই কোলাহল। ট্রেনের কামরার একই জানালার ভিতর দিয়ে পাশাপাশি দু'টি মুখ উঁকি দিয়ে যেন চঞ্চলতা আর মুখরতার একটা আলোকিত উৎসবের মতো একটা দৃশ্যকে দেখতে থাকে। যেন চিরকালের বন্ধু ও বান্ধবীর দু'টি হর্ষোৎফুল্ল মুখ। এবং দু'জনেই জানে না, কখন কোন্ মায়ার আবেশে দু'জনের দুটি হাতের ছোঁয়াছুঁয়ি মুঠোবাঁধা হয়ে এক হয়ে গিয়েছে।

ট্রেনটা ছেড়ে দেয়। যূথিকা বলে—আমি সত্যিই কিছু বুঝে উঠতে পারছি না হিমাদ্রি।

হিমু—কি?

যূথিকা—সত্যিই কি সোনা ফেলে দিয়ে আঁচলে গেরো দিলাম।

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—মানে জিজ্ঞাসা করো না হিমাদ্রি। বুঝতে না পার যদি, তবে চুপ করে থাকো।

চুপ করে হিমাদ্রি। যূথিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—বড়ো ক্লান্ত লাগছে শরীরটা, বুকের ভিতরেও যে হাঁপ ধরছে হিমাদ্রি ; আমি এভাবেই জানালায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিই, কেমন?

হিমু—নিশ্চয়, তুমি চুপ করে ঘুমোও।

যূথিকা—তুমি সরে যেও না কিন্তু।

হিমু—না, কখ্খনো না।

কিন্তু ঘুমোতে পারে না যূথিকা। ঘুমটাই যেন থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ওঠে, আর হিমু দত্তের হাতটাকে আরও শক্ত ক'রে খিমচে ধরে রাখে যূথিকা।

সামনের সীটের এক ভদ্রলোক বলেন—ওঁর কোনো অসুখ আছে বলে মনে হচ্ছে।

হিমু বলে—না। হঠাৎ কাহিল হয়ে পড়েছেন।

ভদ্রলোক আক্ষেপ করেন—তাইতো বড়ো দুঃখের বিষয় হলো! আপনিও বড়ো নার্ভাস হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোকের কথায় জবাব না দিলেও হিমু বোধহয় নিজের মুখটাকে কল্পনায় দেখতে পায়। যেন একটা ক্ষেপা হাওয়ার মাতামাতির মাঝখানে, রাতের নদীর বুকের উপর ভাঙা নৌকাতে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদের শোভা দেখছে হিমু দত্ত। এই নৌকা ডুবে যাবে, অথই জলে তলিয়ে যেতে হবে, সবই জানে হিমু ; কিন্তু তবু পূর্ণিমার চাঁদ দেখবার লোভ যেন ছাড়তে পারছে না। হাসিটা কেঁদে ওঠেনি, হিমু দত্তের জীবনের কান্নাটাই যেন ওর মুখের ওপর হেসে রয়েছে।

হিমু দত্তের বুকের কত কাছে চারু ঘোষের মেয়ের মাথাটা। হাতের উপর কপাল নামিয়ে

দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যূথিকা। যূথিকার খোঁপার সুগন্ধও হিমু দত্তের নাকের কত কাছে মাতামাতি করছে!

হঠাৎ বাইরে থেকে গুঁড়ো বৃষ্টির একটা ঝাপটা এসে যূথিকার মাথাটাকে ভিজিয়ে দেয়। রুমাল দিয়ে যূথিকার মাথা মুছে দিতে হিমু দত্তের হাতটা আজ আর কোনো লজ্জায়, আর কোনো ভয়ে কাঁপে না।

মুখ তোলে যূথিকা--আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি।

হিমাদ্রি--বলো।

যূথিকা--দরকার হলে তুমি কি আমাকে বোম্বাই থেকে গিরিডিতে আনতে পারবে না।

হিমাদ্রি--দরকার কেন হবে?

যূথিকা--আমি বলছি দরকার হবে।

--না। দরকার হলেও না।

যূথিকা--ঠিকই ভেবেছিলাম আমি, তুমি একথা বলবে। তুমি ভয়ানক চালাক।

হিমু--তোমার বোকামির জন্যই চালাক হতে হচ্ছে।

যূথিকা আবার জানালার কাঠের উপর হাত রেখে আর মাথা পেতে ঘুমোতে চেষ্টা করে। তন্দ্রাটা মাঝে মাঝে নিবিড় হয়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু অদ্ভুত কতকগুলি ঠাট্টার ভাষা যেন মাথার ভিতরে একঘেয়ে সুরে বাজতে থাকে। পাটনাতে মামীর সঙ্গে একবার হীরালালবাবুর বাড়িতে কীর্তন শুনতে গিয়ে যে গানের ন্যাকামি সহ্য করতে না পেরে দু-মিনিট পরেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিল যূথিকা, সেই গানের ভাষা যূথিকার এই ক্লান্ত মাথার ভিতরে প্রচণ্ড উৎপাতের শব্দের মতো বেজে চলেছে। পীরিতির রীতি শুন বরনারী!

আজ যূথিকাকে বাগে পেয়ে সেদিনের গানটা যেন যূথিকার অহঙ্কারের উপর প্রতিশোধ তুলছে। পীরিতের রীতিতে ভুল হলে কি দশা হয়, সেটাও ইনিয়ে বিনিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল গানটা। তুহারি ভরম ফান্দে, তুহারি করম কান্দে। বাঃ চমৎকার।

চান্দ কিরণ ছোড়ি, দাবানল পরশিলি। অবকাহে ফুকারে হুতাশা। কিসের ছাই হুতাশা? এত ভয় করবার কি আছে?

ধড়ফড় ক'রে জেগে আর মুখ তুলে হিমুর কানের কাছে যেন স্বপ্নের ঘোরে একটা প্রলাপ ফিসফিস করে যূথিকা--আমি যদি বোম্বাই না যাই হিমাদ্রি?

হিমু--তার মানে?

যূথিকা--তার মানে নরেনের সঙ্গে যদি আমার বিয়ে না হয়?

--ছিঃ, মাথা খারাপের আর কিছু বাকি নেই তোমার? রুক্ষস্বরে প্রায় ধমকের মতো একটা ভঙ্গী ক'রে উত্তর দেয় হিমু।

হেসে ফেলে যূথিকা--তার মানে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সাহস তোমার নেই।

হিমু--না নেই।

যূথিকা--কেন?

যূথিকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীব্র তীক্ষ্ণ ও যন্ত্রণাক্ত একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থেকে হিমু বলে--তোমাকে ভালবাসি বলে।

চমকে ওঠে যূথিকার চোখ আর মুখ। হঠাৎ সূর্যোদয়ের আভা ঘুমন্ত চোখ আর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়লে যে রকম চমক লাগে, সেইরকম চমক। যেন যূথিকার জীবনের একটা আশার স্বপ্নালু আবেশ হঠাৎ আলোকের ছোঁয়া লেগে জ্বলে উঠেছে। হিমুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ; দুই চোখে নিবিড় তৃপ্তির স্নিগ্ধতা জ্বলজ্বল করে।

থেমে গেল ট্রেনটা। রাত প্রায় ভোর-ভোর হয়েছে। প্রায় নির্জন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে মচমচ ক'রে জুতোর শব্দ বাজাতে বাজাতে জানালার কাছে এসে থমকে

দাঁড়ালেন ট্রেনের গার্ড।—আপনাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

হিমু একটু আশ্চর্য হয়ে বলে—না।

চলে গেলেন গার্ড। এবং ট্রেনটাও আবার চলতে শুরু করে। যূথিকা চোখ মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বলে—তুমি এত স্পষ্ট ক'রে একি কথা বলে ফেললে হিমাদ্রি?

যূথিকা—কিন্তু শুধু আমার কাছেই বলতে পারলে। আর কারও কাছে বলবার সাহস আছে কি?

হিমু—সাহস খুব আছে ; কিন্তু বলবার দরকার হবে না।

যূথিকা—যদি দরকার হয়?

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—যদি নরেন তোমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, তবে? সত্যি কথাটা বলতে পারবে তো?

হিমু বলে—না।

যূথিকা—এই তোমার সাহস! এই রকমই সত্যবাদী তুমি!

হিমু—যা ইচ্ছে হয় বলো, আমি তোমার ক্ষতি করতে পারবো না। দরকার হলে হাজারটা মিথ্যে কথা বলে দেবো।

যূথিকা—তাই বলো। পথে এসো এবার।

হিমু—কিন্তু তুমি কি পারবে?

যূথিকা—কি?

হিমু—নরেনবাবুর কাছে সত্যি কথা বলে দিতে?

যূথিকা—কোন্ সত্যি কথা বলে দিতে?

উত্তর দেয় না হিমু। যূথিকার কথার জালে জড়িয়ে পড়ে হিমুর মনের সবচেয়ে লোভনীয় একটা লোভ এইবার ধরা পড়ে গিয়েছে। কি জানতে চায় হিমু?

যূথিকা হাসে—বলো হিমাদ্রি, কোন্ সত্যি কথা জানতে চাইছো?

যূথিকার এই হাসিটা কি চারু ঘোষের মেয়ের মনের সেই শুকনো কৌতূহলের হাসি? তাই যদি হয়, তবে হিমু দত্তের জীবনের চরম কৌতূহল এই মুহূর্তে হিমু দত্তের বুকের ভিতরে শেষ আর্তনাদ তুলে ফুরিয়ে যাবে। ভালোই হবে। আর দুঃখ করবার, এবং সারা জীবন মনের মধ্যে গোপন রত্নের মতো লুকিয়ে রাখবার কিছু থাকবে না।

যূথিকা বলে—হ্যাঁ হিমাদ্রি, আমি অনায়াসে নরেনকে বলে দিতে পারি যে, আমি হিমাদ্রিকে ভালবাসি।

ভালবাসে যূথিকা! শুধু এইটুকু জানবার সাধ যে হিমুর জীবনের চরম সাধ হয়ে আর স্বপ্ন হয়ে হিমুর বুকের ভিতর জমা হয়েছিল, সে সত্য ধরা পড়িয়ে দিলো হিমুর চোখ দুটো। ভিজে গিয়ে চিকচিক করে হিমু দত্তের সেই শান্ত ও নির্বিকার চোখ, যে চোখ, কোনো মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয় না বলে বিশ্বাস করেন কৃষ্ণার মা, অতসীর কাকীমা, কল্যাণীর মামা, নিভার বাবা, সরমার দাদা, আর প্রমীলার মা।

যূথিকা—এ কি করলে হিমাদ্রি? এর পরেও চাও, নরেনের সঙ্গে আমার বিয়ে হোক?

হিমু—নিশ্চয়।

যূথিকা—নিশ্চয় না।

হিমু—তাহলে নিশ্চয় কি? আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কোনোদিন?

যূথিকা—হলে মন্দ কি?

হিমু—অসম্ভব নয় কি?

যূথিকা—একটুও অসম্ভব নয়। শুধু তুমি রাজি হলেই হয়।

উত্তর দেয় না হিমু।

যূথিকা—বলো, শিগ্‌গির বলো, আমাকে যদি বিশ্বাস করে থাক, তবে এখুনি বলে দাও লক্ষ্মীটি!

—কি বিশ্বাস করবো? কি বলবো? প্রশ্ন করতে গিয়ে যেন দম বন্ধ ক'রে ছটফট করে হিমু।

যূথিকা—বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলছি না ; আমি তোমাকে ভালোবাসি।

হিমু—বিশ্বাস করি।

যূথিকা—বিশ্বাস করো, তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে সুখী হতে পারবো না।

হিমু—বিশ্বাস করি।

যূথিকা—তবে আমাকে বিয়ে করতে তোমার বাধা কোথায়? রাজি হয়ে যাও হিমাদ্রি।

হিমু দত্তের মুখে যেন একটা করুণ ও খিন্ন হাসির আভা ফুটে ওঠে। যেন বুকভরা একটা হাসির সুন্দর জ্বালা বুকের ভিতরেই দমিয়ে দিতে চেষ্টা করে হিমু। যূথিকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে হিমু। কে জানে কি ফুটে উঠেছে হিমুর চোখে। আশা আনন্দ মায়া আর বিস্ময়? না, ভয় সন্দেহ কৌতুক আর ফাঁকি?

হিমু বলে—বেশ, আমি রাজি আছি যূথিকা।

যূথিকা—তাহলে গিরিডি পৌঁছেই মামীকে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিই, এ বিয়ে হবে না।

হিমু—জানিয়ে দাও।

যূথিকা—কিংবা নরেনকেই একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতে পারি, কেন এ বিয়ে হতে পারে না।

হিমু—জানিয়ে দিতে পার।

যূথিকা—হিমাদ্রি?

হিমু—বলো।

যূথিকা—বড়ো ঘুম পাচ্ছে হিমাদ্রি।

হিমু—ঘুমোও।

ট্রেনের কামরা নয়। উদাসীনের দোতলার একটি ঘর। উদাসীনের চারদিকে উঁচু পাঁচিল ; সেই পাঁচিলের উপর আবার সারি সারি লোহার সূচীমুখ স্পাইক। একটি পাখিও সে পাঁচিলের উপর উড়ে এসে বসবার মতো ঠাঁই পায় না। বসতে এলেই ডানাতে স্পাইকের খোঁচা খেয়ে ছটফট করে সেই মুহূর্তে উড়ে পালিয়ে যায়।

উদাসীনের দোতলার ঘরের ভিতরে সোফা চেয়ার আর পালঙ্কের উপর গড়াগড়ি দিয়েও যূথিকা ঘোষের মন থেকে ট্রেনযাত্রার ক্লান্তির ঘোর সহজে কেটে যায়নি। কিন্তু কেটে যেতে বেশি সময়ও লাগেনি। সারা সকাল দুপুর আর বিকেল বেলাটা ; বাস্, তারপরেই যেন হঠাৎ চোখ মেলে জেগে উঠলো যূথিকা। উশ্রীর বালুতে বিকালের আলো লুটিয়ে রয়েছে এবং মনেও পড়ে যূথিকার, পৃথিবীর একজনের কাছে একটা প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে এসেছে যূথিকা, পাটনার মামীকে আজই টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিতে হবে, এ বিয়ে হবে না।

টেলিগ্রামের ফরম নিয়ে কথাগুলি লিখতে গিয়ে বার বার হাত কাঁপে, বার বার রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে যূথিকা! তারপরেই নিচের তলায় নেমে গিয়ে কুসুম ঘোষের কাছে এসে বলে—এখুনি একটা টেলিগ্রাম করতে চাই, মা।

কুসুম ঘোষ—কেন?

উত্তর দিতে গিয়ে বিড়বিড় করে যূথিকা। তারপরেই যেন একটা ভয়ের চমক লেগে

কেঁপে ওঠে। এবং তারপরেই কে জানে কার উপর রাগ করে আর প্রায় দৌড় দিয়ে আবার উপর তলায় চলে যায়।

সত্যিই একটা রাগ, সে রাগে গজগজ করে বুকটা, আর ঘেমে ওঠে কপালটা। টেলিগ্রাম করা হলো না! কিন্তু মনে পড়ে যূথিকার, নরেনের কাছে অনায়াসে একটা চিঠি লিখে সত্য কথা জানিয়ে দিতে পারা যায়। পৃথিবীর একজনের কাছে এইরকম একটা প্রতিজ্ঞার কথা বলে রেখেছে যূথিকা।

চিঠি লিখতে দেরি করে না যূথিকা। অনায়াসে অনেক কথা লেখে এবং তারপরেই হঠাৎ ভয়ের চমক লেগে ছটফট ক'রে ওঠে ; এবং সেই মুহূর্তে অনায়াসে চিঠিটাকে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে।

ট্রেনের কামরার ভিতরে যেন স্বপ্নের ঘোরে মিথ্যে কথা বলে একটা অদ্ভুত অসম্ভব ও ভয়ানক অঙ্গীকার ক'রে হিমাদ্রির মনের ভিতরে একটা আশার স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছে যূথিকা ; মনে পড়ে সবই। এবং মনে পড়তেই বুকটা কেঁপে ওঠে, লজ্জাও পায় যূথিকা, একটা অসার দুঃসাহসের লজ্জা। হিমাদ্রির সঙ্গে যূথিকা ঘোষের কোনোদিন বিয়ে হতে পারে, একথা হিমাদ্রি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছে?

বিশ্বাস করতে তো চায়নি মানুষটা। কি ঝোঁকের মাথায় কি ভয়ানক ভুল ক'রে ফেললো যূথিকারই একটা অবুঝ বেদনা। বেচারাকে জোর ক'রে বিশ্বাস করানো হলো। রাজি হয়ে গেল হিমাদ্রি।

কে জানে এই শহরের কোন্ গলির কোন্ ঘরের নিভৃতে কেমন অন্ধকারের মধ্যে বসে এখন চারু ঘোষের মেয়ের অঙ্গীকারের কথাগুলিকে জীবনের এক নতুন সঙ্গীতের মতো মনে মনে সাধছে হিমাদ্রি? ছি ছি, কী ভয়ানক বোকা হিমাদ্রি বেচারার মন! সন্দেহ করেও শেষ পর্যন্ত নিজেই অদ্ভুত এক আশার হাসি হেসে সেই সন্দেহের জোর ভেঙে দিল। উদাসীনের মতো বাড়ির মেয়ের ট্রেনযাত্রার সাথী হতে পারে হিমাদ্রি ; মনের কথা বলাবলি করবার বন্ধু হতে পারে হিমাদ্রি ; আর একই ডিসে সাজানো খাবার খাওয়ার সঙ্গী হতে পারে হিমাদ্রি ; কিন্তু উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষের স্বামী হতে পারে না হিমাদ্রি। তাই যদি সম্ভব হতো, তবে যূথিকা ঘোষ সত্যি যূথিকা ঘোষ হবে কেন, আর হিমাদ্রিই বা হিমাদ্রি হবে কেন?

ছি ছি, শুধু কয়েকটা কথার ভুলে কি অদ্ভুত এক কাণ্ড বাধিয়ে একটা মানুষের সাদা মনের উপর মিছিমিছি রং ছিটিয়ে দিয়ে এখন ভয় ক'রে লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। হিমাদ্রি এখন কোনো দুঃস্বপ্নেও এমন সন্দেহ করতে পারছে না, যে পয়লা অঘ্রান নরেনকে নিয়ে হাসতে হাসতে আর উৎসবের বাঁশি বাজাতে বাজাতে এই উদাসীনের মেয়ের জীবনের কাছে হু হু করে ছুটে আসছে। টেলিগ্রাম করে কিংবা চিঠি লিখে পয়লা অঘ্রানের ইচ্ছাটাকে কোনোই বাধা দেবার ক্ষমতা হয়নি যূথিকার। যূথিকা ঘোষ যে সত্যিই পয়লা অঘ্রানের উৎসবে সাজবার জন্য এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। শর্মা ব্রাদার্সের স্টোর থেকে নানা ডিজাইনের ও নানা রং-এর একশো শাড়ি এসেছে। তার ভিতর থেকে দশটা শাড়ি এখনই পছন্দ ক'রে ফেলতে হবে!

একটি চিঠি লিখে এখনি হিমাদ্রির বিশ্বাসের ভুল ভেঙে দিতে পারা যায়। সত্যি তোমার কোনো অপরাধ নয় হিমাদ্রি, অপরাধ আমার, আমিই মনের একটা মুখর খেয়ালের ঝোঁকে, একটা স্বপ্নের ঘোরে কয়েকটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছি। বড়ো কষ্ট হচ্ছিল হিমাদ্রি, তাই প্রলাপ বকেছিলাম। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করলে কেন? সত্যিই বিশ্বাস করেছ কি?

হিমুর ঠিকানা জানা নেই, তাই চিঠি লেখা সম্ভব হবে না। কিন্তু ঠিকানাটা জানা থাকলেই বা কি হ'তো? অস্বীকার করে না যূথিকা, হিমাদ্রির মতো মানুষের সঙ্গে এক ট্রেনের এক কামরায় একই সীটের উপর পাশাপাশি বসে গল্প করতে গিয়ে যা মন চায় তাই অনায়াসে

বলে দিতে পারে উদাসীনের মতো বাড়ির মেয়ে, কিন্তু উদাসীনের দোতলায় এই ঘরে বসে কাগজ কলম নিয়ে হিমাদ্রিকে একটা চিঠি লেখাও যে নিতান্তই অসম্ভব।

হিমাদ্রি যদি হঠাৎ এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় আর প্রশ্ন করে, সব কথা মনে আছে তো যূথিকা? কল্পনা করতেও ভয় পেয়ে থরথর ক'রে ওঠে যূথিকা ঘোষের নিঃশ্বাস। হিমাদ্রি যদি ঝোঁকের মাথায় এরকম একটা কাণ্ড ক'রে বসে, তবে কি উপায় হবে? বাবা ছুটে আসবে, মা ছুটে আসবে। হিমাদ্রির মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তার পর যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করবে, এ লোকটা কোন্ সাহসে এসব কথা বলছে যূথিকা? এ লোকটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

না, কোনো সম্পর্ক নেই। জানি না, লোকটা কোন্ সাহসে এমন কথা বলে। ভয় পেয়ে, কেঁদে আর চেঁচিয়ে একটা কাণ্ড করতে পারবে যূথিকা, কিন্তু বলতে পারবে না যে, আমিই ওকে একথা বলবার সাহস দিয়েছি। হয়তো পুলিশ ডাকবে উদাসীন, এবং উদাসীনের মেয়ের মিথ্যা কথা প্রমাণ করবার সাধ্যি হবে না হিমাদ্রির। কোনোও প্রমাণ নেই, কেউ সাক্ষী নেই।

এমন অপমানের মধ্যে এগিয়ে আসবার মতো সাহস হবে কি হিমাদ্রির? ভয়ানক ভুল করবে, যদি সাহস করে। দু'হাতে মাথাটাকে শক্ত করে টিপে ধরে মনে মনে যেন প্রার্থনা করে যূথিকা—এমন সাহস যেন না করে হিমাদ্রি। যেন চুপ করে নিজের ঘরের ভিতরে বসে দিন আর রাতগুলিকে পার করে দেয় ; এবং একদিন হঠাৎ চমকে উঠে যেন বুঝতে পারে হিমাদ্রি, পয়লা অঘ্রান পার হয়ে গিয়েছে, বোম্বাই চলে গিয়েছে যূথিকা।

বড়ো বেশি আশ্চর্য হবে, হতভম্ব হয়ে যাবে, আর কষ্ট পাবে বেচারা। যূথিকা ঘোষের একটা কথা বিশ্বাস ক'রে যে এত শাস্তি পেতে হবে, কল্পনাও করতে পারছে না হিমাদ্রি। তার চেয়ে ভালো, আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে গিরিডি ছেড়েই চলে যাক না, পালিয়ে যাক না হিমাদ্রি ; তাহলে তো আর এই শাস্তি পাওয়ার দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হবে না। কিন্তু সেটুকু বুদ্ধি আছে কি হিমাদ্রির? মানুষটা যে বোকা হবার ভুলেই জীবনে শুধু মানুষের যত তুচ্ছতা আর তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে হিমাদ্রি বলেও কেউ ডাকে না। চলে যাক, চলে যাক হিমাদ্রি।

ফুঁপিয়ে উঠলেও, আর বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেও, যূথিকা ঘোষের মনের প্রার্থনাটা যেন হিমাদ্রি নামে একটা মানুষকে এই মুহূর্তে গিরিডি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য নিষ্ঠুর চাবুকের মতো ছটফট করতে থাকে। পয়লা অঘ্রানের উৎসব বন্ধ করবার সাধ্যি নেই যার, যূথিকা ঘোষকে ভয় পাইয়ে দেবার কিংবা জব্দ করবার মতো একটা ভ্রূকুটি করবারও শক্তি নেই যার, সে-মানুষ মানে মানে এখনও সরে পড়ে না কেন?

পয়লা অঘ্রানের আগের দিনেই হঠাৎ গিরিডিতে এসে পড়লেন পাটনার মামী। কুসুম ঘোষ আশ্চর্য হন—এ কি কণিকা? রওনা হবার কথা, একটা টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিতে হয়!

মামী বলেন—টেলিগ্রাম করবারও সময় ছিল না কুসুমদি।

কুসুম ঘোষ—নরেন আর বরযাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আসবে কে?

মামী—অরুণের বাবাই আসবেন। উনিই সব ব্যবস্থা করেছেন। আমি একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে, বাধ্য হয়ে আগেই চলে এলাম।

—দুশ্চিন্তা? আতঙ্কিত হয়ে ভীরু চোখে তাকিয়ে থাকেন কুসুম ঘোষ।

—হ্যাঁ, যূথিকা কোথায়?

—মেয়ে তো গিরিডি পৌঁছবার পর থেকে ওপরতলার ঘরটিতে সেই যে ঢুকেছে, আর নড়তে চায় না।

—কি বলে যূথিকা?

—কিছু না।

—একেবারে কিছু না?

—মাঝে একবার তোমাকে একটা টেলিগ্রাম করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

—কিসের জন্য?

—তা জানি না। কিছুক্ষণ এঘর-ওঘর ক'রে, আর গজগজ ক'রে, তারপর নিজেই চুপ হয়ে গেল।

—আর কোনো কাণ্ড করেনি?

—কাণ্ড? না, কাণ্ড আর কি করবে বলো? হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে একটা চিঠি লিখেছিল, বোধহয় নরেনের কাছে। কিন্তু হঠাৎ নিজেই আবার চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা লম্বা ঘুম দিলো। কাণ্ড বলতে এই তো কাণ্ড।

—বিয়ে করতে কোনো আপত্তির কথা বলেছে কি?

—কোনো আপত্তির কথা বলেনি, বরং নিজেই তো বেশ দেখেশুনে দশটা শাড়ি বাছাই করেছে, শর্মা ব্রাদার্সের দোকান থেকে একশ'টা শাড়ি এসেছিল। বিয়ের নিমন্ত্রণের ব্যাপার নিয়েও নিজের থেকে যেচে দু'চারটে ভালো ভালো কথা বলেছে।

—কি কথা?

—যূথিকার ইচ্ছে, বিয়েতে যেন হিমু-টিমুর মতো লোককে নিমন্ত্রণ না করা হয়।

মামী খুশি হয়ে হেসে ফেলেন—যাক্‌, নিশ্চিত হলাম। এইবার মেয়ের কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে। কিন্তু ওদিকে একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।

অ্যাঁ?

—নরেন আমাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছে, হিমাদ্রি নামে লোকটার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?

চেঁচিয়ে ওঠেন কুসুম ঘোষ—কোনো সম্পর্ক নেই। হিমাদ্রি একটা চাকর গোছের লোক। মাথায় ছিট আছে। লোকটাকে কোনো কাজ ক'রে দিতে বললেই তেড়েমেড়ে এসে কাজ ক'রে দিয়ে চলে যায়।

—কিন্তু হিমাদ্রির সঙ্গে যূথিকার সম্পর্কটা কি দাঁড়িয়েছে?

—ছি ছি, তুমি কি বিশ্রী বাজে কথা বলছো কণিকা?

—একটুও বাজে কথা নয় কুসুমদি।

—খুব বাজে কথা।

—না, নরেনও নিজের চোখে কিছু কিছু দেখেছে। আমি অনেক কিছুই দেখেছি।

—কি দেখেছো তুমি?

—হিমাদ্রির সঙ্গে বিশ্রী রকমের বন্ধুত্ব করেছে যূথিকা।

—কি আশ্চর্য, এমন অসম্ভব কেমন ক'রে সম্ভব হয়?

—সম্ভব তো হলো, আশ্চর্য হয়ে লাভ নেই।

—দুশ্চিন্তা করেও লাভ নেই। চেঁচিয়ে ওঠেন কুসুম ঘোষ।

—কেন? একটু আশ্চর্য হন কণিকা।

কুসুম ঘোষ—ভয়টা কিসের? চুলোয় যাক্‌ হিমাদ্রি।

কণিকা—কিন্তু নরেনকে তো আর চুলোয় ঠেলে দিতে পারেন না কুসুমদি?

—কখ্‌খনো না। কিন্তু নরেনের কথা তুলছো কেন?

—নরেনের মন বড়ো অহঙ্কারী মন। এসব ব্যাপারের সামান্য আভাসও জানতে পেরেছে কি বেঁকে বসবে। যূথিকাকে বিয়ে করতে কোনোমতেই রাজি হবে না।

কিন্তু—নরেন জানবে কি ক'রে?

—জানিয়ে দেবে হিমাদ্রি।

—সে ছোটোলোকের এত সাহস হবে?

—আপনাদের মেয়ে যদি ছোটোলোককে সাহস দিয়ে থাকে তবে...?

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন কুসুম ঘোষ। চারু ঘোষও সব শুনলেন। সিরসির ক'রে কাঁপতে থাকেন চারু ঘোষ। চারু ঘোষের জীবনের নিরেট অহঙ্কারটাই যেন ভয়ে সির-সির ক'রে উঠেছে। হিমু দত্ত নামে একটা লোক, যে লোকটা বলতে গেলে একটা মানুষই নয়, তারই অহঙ্কারের কাছে যেন মাথা হেঁট ক'রে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে আর ধুলো হয়ে লুটিয়ে পড়েছে তিনতলা উদাসীন!

কণিকা বলেন—নরেন বলেছে, গিরিডিতে এসেই প্রথমে হিমাদ্রি নামে লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

চারু ঘোষ হতভম্বের মতো তাকিয়ে বলেন—এটা তো নরেনের মনের একটা ভয়ানক সন্দেহের কথা হলো।

কণিকা বলেন—সেই জন্যেই তো আমি আগে-ভাগে চলে এলাম। একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। হিমাদ্রিকে সরিয়ে না দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারা যাবে না।

চারু ঘোষ—কি ক'রে সরানো যায়? ওকে টাকা সাধলেও সরে যেতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করেন কণিকা। তাঁরও চার বছরের চেষ্টার ইতিহাস এমন করে ভুয়ো হয়ে যাবে, এ দুঃখ যে কণিকারও এতদিনের জেদের একটা ভয়ানক পরাজয়ের দুঃখ। শীতাংশু ডাক্তার যে হেসে হেসে আটখানা হয়ে যাবে, নরেনের মা অভিশাপ দেবেন, এবং গর্দানিবাগে কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবেন না কণিকা, যদি এই বিয়ে ভেঙে যায়।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে উপরতলায় উঠে যূথিকার ঘরের দিকে এগিয়ে যান এবং দরজার কাছে এসেই হেসে ওঠেন কণিকা মামী।—চুপটি করে বসে কি করছো যূথিকা?

চমকে ওঠে যূথিকা—কিছু না। তুমি কখন এলে?

মামী—এই তো সকাল নটার গাড়িতে পৌঁছেচি। শুনলাম, তুমি নাকি আমাকে টেলিগ্রাম করতে চেয়েছিলে?

যূথিকা—হ্যাঁ। কিন্তু করিনি তো? এত ভয় পাচ্ছ কেন?

মামী—নরেনের কাছে কি একটা চিঠি লিখতে চেয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—তবে লিখলে না কেন?

—লেখবার দরকার আর হলো না।

—ওরা সবাই কাল সকাল নটার গাড়িতে এখানে পৌঁছে যাবে।

যূথিকা হাসে—তুমিও বরযাত্রীনী হয়ে ওদের সঙ্গেই এলে পারতে ; একদিন আগে এসে লাভটা কি হলো?

মামী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান।—আসতে বাধ্য হয়েছি।

—কেন?

—বিয়ে ভেঙে যাবার ভয় আছে।

ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে যূথিকা। মুখ কালো ক'রে আস্তে আস্তে বলে—কেন মামী? কি

ব্যাপার হলো?

—হিমাদ্রীকে বিশ্বাস নেই।

যূথিকার হৃৎপিণ্ডের সাড়া বোধহয় এই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে জোরে শ্বাস টানতে চেষ্টা করে যূথিকা। প্রশ্ন করে—কি করেছে হিমাদ্রি?

—কিছু করেনি এখনো, কিন্তু কিছু একটা করবে বলে বুঝতে পেরেছি।

—কি?

—নরেনের কাছে ভয়ানক কোনো কথা বলে দেবে।

—বলুক না, নরেন বিশ্বাস করবে কেন সে কথা?

—নরেন বিশ্বাস ক'রে ফেলবে বলে ভয় হচ্ছে।

—কেন?

—নরেনের মনে একটা খট্‌কা আছে বলে মনে হচ্ছে।

—অকারণে একটা খট্‌কা। বেশ মজার খট্‌কা তো!

—অকারণে নয়। পাটনাতে ট্রেনে উঠবার সময় তুমিই নরেনের চোখের সামনে হিমাদ্রি হিমাদ্রি ক'রে চেঁচিয়ে আর উতলা হয়ে যে কাণ্ড করেছিলে, তাতে নরেনের মনে কোনো খট্‌কা লাগলে সেটা কি দোষের হবে?

—এ সবই তো তোমার অনুমান। নরেনকে ছোটো ক'রে ভাবতে তোমার ইচ্ছে করছে।

—নরেন নিজেই সন্দেহের কথা বলে আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছে।

—কি বলেছে নরেন?

—গিরিডিতে এলেই প্রথমে হিমাদ্রির সঙ্গে আলাপ করবে।

দু'চোখ অপলক ক'রে তাকিয়ে থাকে আর বিড়বিড় করে যূথিকা।—নরেনের মতো মানুষ হিমাদ্রির মতো একটা লোকের সঙ্গে আলাপ করবে কেন?

—সেটা বুঝতে চেষ্টা করো।

—কি জানতে চায় নরেন?

—সেটা বুঝে দেখ।

—হিমাদ্রিই বা কি এমন অদ্ভুত কথা বলে দেবে?

—তুমি জান।

যূথিকা ঘোষের মাথাটা এবার অলস হয়ে ঝুঁকে পড়ে। যূথিকা ঘোষের জীবনের পয়লা অঘ্রানের উৎসবকে ভেঙে গুঁড়ো ক'রে দেবার শক্তি আছে হিমাদ্রির। নরেনের মনের এই খট্‌কা যে হিমাদ্রির জীবনে একটা সৌভাগ্য। চারু ঘোষের মেয়ের ছলনার জ্বালায় শুধু চুপ ক'রে পুড়ে মরে যাবে না হিমাদ্রি। বিনা দোষের শাস্তি অপমান মাথা পেতে সহ্য করবে না, যতই মাটির মানুষ হোক না কেন হিমাদ্রি। নরেনকে অনায়াসে বলে দিতে পারবে হিমাদ্রি ; হ্যাঁ, চারু ঘোষের মেয়ে আমারই হাত ধরে আমাকে বলেছিল, বোম্বাই যেতে চাই না।

মামী বলেন—ছোটোলোকের রাগের কোনো বিশ্বাস নেই যূথিকা।

যূথিকা ঘোষের মাথাটা আরও ঝুঁকে পড়ে। বিশ্বাস করা যায় না ঠিকই কিন্তু ছোটোলোকের মতো রাগ করেছে কে? হিমাদ্রির মনের প্রতি-হিংসাটা, না নরেনের এই খট্‌কাটা?

মামী বলেন—এখনই সাবধান হয়ে একটা ব্যবস্থা করে ফেলা উচিত যূথিকা।

ঝুঁকে পড়া মাথাটাকে আরও নামিয়ে দিয়ে আর হাত তুলে যেন লুকিয়ে চোখ ঘষে যূথিকা। হ্যাঁ, সাবধান হওয়া উচিত, একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলা উচিত, নইলে পয়লা অঘ্রানের সন্ধ্যায় উৎসবহীন উদাসীনের অন্ধকারে ঢাকা চেহারার দিকে তাকিয়ে হাততালি দেবে গণেশবাবুর বাড়ির লোকগুলি। হো হো করে হেসে উঠবে হিমাদ্রি। ছি ছি, হিমাদ্রিও স্বপ্নের

ঘোরে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল। সত্যি ভালবেসে থাকলে কি এরকম ভয়ানক প্রতিশোধ কেউ নিতে পারে?

একগাদা টাকা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলা যায়, চলে যাও হিমাদ্রি। কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে কি?

ভ্রূকুটি করে বলা যায়, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হবে না মনে হয়। ভ্রূকুটিকে ভয় করবে কেন হিমাদ্রি?

ক্ষমা চেয়ে বলা যায়, চলে যাও হিমাদ্রি। কিন্তু তাতে কি চলে যেতে রাজি হবে? ক্ষমা করবে কেন?

যদি একটা সুন্দর নকল হাসি হেসে ওর কানের কাছে একটা সুন্দর কথা ঘুষ দেওয়া যায়, আমি তো মনে মনে তোমারই চিরকালের জিনিস ; তাতেও কি কোনো ফল হবে?

চলে যেতে রাজি হবে না, চারু ঘোষের মেয়ের কথা বিশ্বাসই করবে না হিমাদ্রি।

—যদি ভালবেসে থাক, তবে চলে যাও হিমাদ্রি! যূথিকা ঘোষের নীরব ঠোঁট দুটো যেন হঠাৎ মনে পড়া একটা মন্ত্রকে ধরতে পেরে ফিসফিস করে ওঠে। যূথিকার বন্ধ চোখ, ভেজা চোখ দুটোও যেন দেখতে পায়, যূথিকার কথা শোনা মাত্র গিরিডি ছেড়ে ছুটে চলে গেল হিমাদ্রি। আর একবারও ফিরে তাকালো না। যূথিকাকে বিশ্বাস না করুক, নিজেকে যে বিশ্বাস করে হিমাদ্রি। এইবার এই কথা শোনবার পর না চলে গিয়ে পারবে কেন?

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে যূথিকা বলে—আমি একবার বাইরে ঘুরে আসছি মামী ; তোমরা ভয়-টয় পেও না।

মামী উদ্বিগ্নভাবে বলেন—বেশ তো, আমিও না হয় তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

যূথিকা হাসে—চলো।

লোহার পুল পার হয়েই বাঁ দিকের সরু সড়ক। পথের দু'পাশের সরু ড্রেনের শেওলা খুঁটে খায় পোযা হাঁসের দল। মাঝে মাঝে ছাই-এর গাদা। তারই পাশে ছড়ানো এঁটো কাঁটা নিয়ে কাকে কুকুরে ঝগড়া করে।

বড়ো রাস্তার উপর গাড়ি থামিয়ে এই সরু সড়কের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দেয় ড্রাইভার গিরিধারি—ওই যে দিয়ালকে উপর লকড়িকা ছোটা সাইন বোর্ড দিখাচ্ছে, বাস, ওহি আছে হিমুকা ঘর।

এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় যূথিকা। মামীও যূথিকার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে থাকেন। হ্যাঁ, এই তো হিমাদ্রির ঘর। দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে এক টুকরো কাঠের বড়ো বড়ো হরফে লেখা, ডাক্তার হিমাদ্রি শেখর দত্ত, হোমিও।

—কাকে চাই?

হিমুর ঘরের মাথার উপরে একটা ছোটো ঘরের ঘুলঘুলির কাছে একজোড়া চোখ ভাসিয়ে প্রশ্ন করে একটা লোক।

যূথিকা—হিমাদ্রিবাবুকে চাই।

—সে ইখানে নাই। গিরিডি ছোড়কে চলিয়ে গিয়েছে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা।—হিমাদ্রি নিজেই চলে গিয়েছে মামী।

একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে ছটফট ক'রে আরো উৎফুল্ল হয়ে, চোখের তারা দুটো আরও ঝিকমিকিয়ে, আরও জোরে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা—হিমাদ্রি আমাকেই বিশ্বাস ক'রে পালিয়ে গিয়েছে মামী।

হাসি থামাতে গিয়ে যূথিকার শরীরটা কাঁপতে থাকে ; শরীরের কাঁপুনিটা থামাতে গিয়ে

আস্তে হাত তুলে দেওয়ালটাকে ধরতে চেষ্টা করে যূথিকা। আর দেয়ালটা ধরতে গিয়ে সেই ছোটো কাঠের ফলকটা ছুঁয়ে ফেলে। এবং কাঠের ফলকটাকে ছুঁতে গিয়ে বড়ো বড়ো হরফে লেখা সেই নামটাকেই যেন আঁকড়ে ধরে যূথিকা।

একটা নাম মাত্র। কে জানে কবে কাঠের ঘুণে এই নামটাকেও কুরে কুরে খেয়ে প্রায় মুছে ফেলবে। দেখলেও বুঝতে পারা যাবে না, কার নাম আর কি নাম?

মামী বলেন--চল যূথিকা।

ভিতর দুয়ার

এক

শুধু এক আবু পাহাড়েই ওদের সঙ্গে কমলেশের কতবার দেখা হলো! তিন দিনের মধ্যে পাঁচবার। শুধু চোখের দেখা, এবং দেখে কিছুই বোঝা যায় না, ওরা সত্যিই এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও তাঁর মেয়ে কিনা?

পাঁচবার দেখা হলেও কমলেশের সঙ্গে ওদের একটি কথারও বিনিময় ঘটেনি। গায়ে পড়ে আলাপ করলে অবশ্যই জানতে পারা যেত। কিন্তু কোন অচেনা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি তরুণী মেয়ে থাকে, বিশেষ করে সে মেয়ে যদি দেখতে বেশ সুন্দর হয়, তবে তাদের সঙ্গে যেচে আলাপ না করতে যাওয়াই ভাল। ভদ্রলোক হয় তো শুকনো স্বরে কাটা-কাটা কয়েকটা কথা বলে বাধিত করবেন এবং তরুণী মহাশয়া আরও শুকনো একটি ভ্রূভঙ্গী করে সেই গায়ে-পড়া আলাপের চেষ্টাকে একটু সন্দেহ করবেন, কিংবা করুণা করবেন। এ ধরনের যেচে আলাপ করবার কোন বাতিক কমলেশের নেই। এটা একটা ঠেকে-শেখা সাবধানতাও বটে। সত্যিই, একবার জব্বলপুরের মার্বেল রক দেখতে গিয়ে নর্মদার জল-প্রপাতের কাছে সুন্দর একটি পাথুরে নিরিবিলির মধ্যে এক বাঙ্গালী দম্পতিকে দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে গিয়েছিল আর যেচে আলাপ করেছিল কমলেশ—আপনারা নিশ্চয়ই বাঙ্গালী।

দম্পতির দু'জোড়া চোখে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। স্বামী ভদ্রলোক বাংলা ভাষাতেই উত্তর দিলেন—বাঙ্গালী হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি?

অপ্রস্তুত হয়ে সেই মুহূর্তে সরে গিয়েছিল কমলেশ। আর, সেই বাঙ্গালী হলে বা কি আর না হলেই বা কি, সেই দম্পতি নর্মদার ধারে পাথুরে নিরিবিলির মধ্যে সেই আদম-ইভ খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

কিন্তু ওরা, যাদের এই তিন দিনের মধ্যে পাঁচবার দেখেছে কমলেশ, ওরা হলো বাপ আর মেয়ে। যদি তা না হয় তবে নিশ্চয়ই পিতৃতুল্য আর কন্যাতুল্য দুটি মানুষ। এটুকু দেখেই বোঝা যায়।

যাই হোক, যদি একবারও ওদের কথা শুনতে পাওয়া যেত, আর কমলেশ বুঝতে পারতো যে, ওরা সতিই বাঙ্গালী, তবে না হয় একবার সব কুণ্ঠার মাথা খেয়ে, কাছে এগিয়ে গিয়ে আর যেচে আলাপ করা যেত। এমনও হতে পারে তো, যদি ওরা বাঙ্গালী হয় তবে কমলেশের সঙ্গে ওদের একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও কথায় কথায় হঠাৎ ধরা পড়ে যেতে পারে।

কিন্তু ওরা বড় ব্যস্ত। তিন দিনের মধ্যে কমলেশের সঙ্গে পাঁচবার ওদের দেখা হলো, তবুও বাপ বা মেয়ের চোখে কোন কৌতূহলের এক বিন্দু চঞ্চলতাও ফুটে উঠেছে কিনা সন্দেহ। আবু বাজারের ভীলের ভিড়ের কোন মুখকে যেমন বেশিক্ষণ চিনে রাখা সম্ভব হয় না, তেমনি কমলেশকেও দেখে ওরা বোধ হয় বুঝতেই পারে না যে, এই মানুষটার সঙ্গে ওদের এই নিয়ে কতবার দেখা হলো।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সাজ হলো, গলাবন্ধ একটি লম্বা কোট আর ট্রাউজার। তরুণীর সাজ, নতুন অশথ পাতার মত রং-এর রেশমী শাড়ি, আর অপরাজিতার রঙের মত নীলঘন ব্লাউজ। আবু পাহাড়ের আলো তখনো ফুরিয়ে যায়নি, দিলবরা মন্দিরে ঢুকেই দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল কমলেশ, শ্বেতপাথরের থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী অমল-ধবল পাষাণের গায়ে যেন রঙীন ফুলের একটি গুচ্ছ হেলে পড়ে রয়েছে। দিলবরার সেই স্তবকিত মর্মরের কারুশোভা একেই তো জাদুময় সাদার কমনীয় স্বপ্ন, তার উপর যদি নতুন অশথ পাতার মত ঐ রঙ এসে একটি জায়গায় ফুটে থাকে...সত্যিই দিলবরার সাদা পাথরের

জাদুকে আরও নিবিড় করে দিয়েছে ঐ তরুণী।

সূর্য যখন ডুবেছে, তখন আর একবার দেখতে পায় কমলেশ, নক্কি তালাও-এর ছলছল জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো পিতা-পুত্রীর দুই মূর্তি। মেয়ের মনে সাধ হয়েছে বোধ হয়, আর বাপও রাজি হয়েছে ; বোটে চড়ে সন্ধ্যার প্রথম জ্যোৎস্নার সঙ্গে হেসে হেসে আর বোটের সঙ্গে দুলে দুলে নক্কি তালাও-এর শোভা দেখবে মেয়ে। হয়তো কবিতা লেখে, কিংবা ছবি আঁকে এই তরুণী। হাতে এখন অবশ শুধু একটা ক্যামেরা ঝুলছে দেখা যায়।

কমলেশকে পাশ কাটিয়ে ওরা হেঁটে চলে গেল। কমলেশের সঙ্গে চোখের দেখা-দেখিও হলো। কিন্তু কমলেশের মুখটাকে দ্বিতীয়বার দেখে একটু আশ্চর্য হবারও যেন সময় নেই তরুণীর ; ওর চোখের পিপাসা যে তখন ভয়ানক ব্যস্ত। নক্কি তালাও-এর জল তখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ওদের ব্যস্ততা দেখে বোঝা যায়, ওরা এই আবু পাহাড়ের মানুষ নয়। কমলেশের মত ওরা বেড়াতে এসেছে ; কিন্তু কে জানে কোথা থেকে এসেছে, আর কোথায় চলে যাবে?

বনপথের ছায়ায় ছায়ায় সানসেট পয়েন্ট যাবার সময় কমলেশের একবার মনে হয়েছিল, আবু পাহাড়ের মায়া কাটিয়ে কালই বোধ হয় চলে গিয়েছে সেই নতুন অশথ পাতা রঙের শাড়ি। কিন্তু কি আশ্চর্য, পয়েন্ট পৌঁছেই দেখতে পায়, পাথর-কাটা আসনের উপর আরাম করে বসে সূর্যাস্ত দেখবার জন্য পশ্চিমের আকাশের দিকে দুটি উৎসুক চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে সেই তরুণী। হাতের কাছে একটা খোলা ব্যাগ, হাতের পাশে ছড়িয়ে আছে ছবি আঁকবার নানা সরঞ্জাম। যাক, আপাতত এইটুকু বোঝা গেল যে, ছবি আঁকবার বাতিক আছে মেয়ের, বাপও তাই বোধ হয় মেয়েকে আকাশের রূপ দেখাতে নিয়ে এসেছে।

পরের দিন ক্র্যাগ্‌স। ভাবতেই পারেনি কমলেশ, এতদূর পাহাড়ী খাড়াই পার হয়ে ঐ নরম রঙীন চেহারার মেয়ে এখানেও এসে বসে থাকবে। অদ্ভুত এই জায়গাটা। ভূতলের একটা টুকরো যেন হঠাৎ ক্ষেপামির আবেগে চার হাজার ফুট উপরে উঠে এসে নিরেট ও নিথর হয়ে গিয়েছে। সবুজ পাতার ঝোপঝাপ ঠেলে প্রকাণ্ডদেহ এক একটা পাথরের দানব যত উদ্ভট রকমের থোঁতা-ভোঁতা চেহারা নিয়ে উঁকিঝুকি দিয়ে রয়েছে। সামনে তাকালে নীচের ঐ ভূতলকে রসাতল বলে মনে হয়। এ এক অদ্ভুত রূপ! কখনো মনে হয়, ভয়াল বুঝি সুন্দর হয়েছে। কখনো মনে হয়, সুন্দরই ভয়াল হয়ে উঠেছে। আর্টিস্ট মেয়ের চোখ দুটো যেন চমকে ওঠা তপস্বিনীর চোখের মত। ওর চোখে চমক লেগেছে, দেখতে ভাল লাগছে সামনের ঐ সুন্দর-ভয়াল রূপ। কিন্তু বুঝতে পারে না বোধ হয় ; ওকেও আজ এখানে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। কমলেশ নামে একজন অচেনা লোকের চোখেও কত ভাল লাগছে।

পরের দিন অচলগড় যাবার সময় পথে একবার দেখা হয়েছিল। ওরা অচলগড় থেকে ফিরে আসছে। কমলেশ যাচ্ছে। ট্যাক্সির চাকা অনেক ধুলো উড়িয়ে চলে গেলেও দেখতে পাওয়া যায়, ট্যাক্সির ভিতর পিতা-পুত্রী বসে আছে।

অচলগড়ের পাঁচ ঘন্টা সময় মন্দির আর দুর্গ দেখে পার করে দিলেও, কমলেশ যেন সেই দেখার আনন্দকে মনে ভরে নিতে বার বার ভুলে যায়। চেনা নয়, শুধু বারকয়েক চোখে দেখা একটা মুখ ; তবু বার বার কমলেশের মনে হয়, অচলগড় থেকে ফিরে গিয়ে আবার আবু পাহাড়ের কোন আনাচে কানাচে, কোন মন্দিরের ধারে বা থামের কাছে সেই মেয়েকে কি আর দেখতে পাওয়া যাবে?

দেখতে পায়নি কমলেশ। কোন্ সময়ে ওরা চলে গেল, তারই বা খোঁজ দেবে কে? খোঁজ নিয়েই বা লাভ কি? ওদের পিছু পিছু ছুটে বেড়াবার জন্য কোন শপথ আর প্রোগ্রাম নিয়ে বের হয়নি কমলেশ। একটানা পাঁচ বছর ধরে শুধু মেশিনের মন মতলব ও চেহারা,

আর কল-কব্জার যত আধি-ব্যাধি নাড়া-চাড়া করতে করতে জীবনটাই যে একটা একঘেয়েমির যন্তর-মন্তর হয়ে উঠতে চলছে। তাই একটু হাঁপ ছাড়বার জন্য, মাটিতে আর আকাশে ছড়ানো যত মায়া ছন্দ আর রঙের চেহারা দেখে চোখের স্বাদ একটু বদলে নেবার জন্য বেড়াতে বের হয়েছে কমলেশ। তিন মাসের ছুটি।

আবু রোড স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠবার সময় আর একবার কমলেশের মনে হয়েছিল, সেই পিতা-পুত্রীও কি বেড়াতে বের হয়েছে? ভাবতে গিয়ে কমলেশের মনের একটা গর্ব যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরায়। চোখের এত লোভ এতদিন ধরে লুকিয়ে ছিল কোথায়? সুন্দর মুখ দেখতে কারও চোখে খারাপ লাগে না ঠিকই ; কিন্তু বিশেষ একটি সুন্দর মুখকে আর-একবার দেখবার জন্য চোখ দুটোকে যদি এত বেশি তেষ্টায় পেয়ে বসে, তবে তো বুঝতেই হবে যে মনটাই চোখের কাছে হার মানতে বসেছে।

মনেরে না বুঝাইয়ে নয়নেরে দোষো কেন? না, কথাটা ঠিক নয় বোধ হয়। বরং বলা উচিত নয়নেরে না বুঝাইয়ে মনেরে দোষো কেন? কমলেশের মন আর-একবার একটা চোখের দেখা দেখতে চায়। এই মাত্র।

ইন্দোরের এক সন্ধ্যায় ছত্রীবাগের কাছে লোকের ভিড়ের ভিতর থেকে বাংলা ভাষার একটা কলরব হঠাৎ শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিল কমলেশ, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা গেল না, কে বললো কথাটা, কাকে বললো, এবং কোন দিকে চলে গেল। চারিদিকের যত ইখড়ে-তিখড়ের মধ্যে মেয়েলী গলার মিষ্টি স্বরে ভেজানো বাংলা ভাষার এক টুকরো কলরব--এখানে আর দেরি ক'রে লাভ নেই বাবা।

ইন্দোরের সেই সন্ধ্যায় ছত্রীবাগের ভিড় আর আলো-ছায়ার কাছে আর দেরি করতে চাইছে না কে? সে নয় তো? দু'দিন পরেই দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল কমলেশ, তার বাইনকুলারের কাঁচে নতুন অশথ পাতার রঙ হেসে উঠেছে।

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বাইনকুলার চোখের কাছে তুলে অনেকক্ষণ ধরে দূরের বাগানি নদীর বালি আর পাথরের বুকে আঁকা-বাঁকা ক্ষীণ স্রোতের জলের খেলা দেখছে কমলেশ। তারপর বাইনকুলার ঘুরিয়ে বাঘ গুহার বড় চৈত্যগৃহের দিকে তাকাতেই চমকে ওঠে কমলেশের হাতের বাইনকুলার। যক্ষরাজের ঐ বিরাট মূর্তির ছায়ার কাছ দিয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে সেই তরুণী। যাচ্ছে গুহার দিকে, যে গুহার বুকের ভিতরে শান্ত নিভৃতে দেড় হাজার বছর আগের মানুষের চোখের সাধ যেন তুলি ধরে রঙীন মায়া এঁকে রেখে গিয়েছে। ফিরে আরো গুহার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি কমলেশ। একটা সুন্দর মুখের মেয়েকে দেখবার জন্য লোভী চোখ নিয়ে চিতে বাঘের মত ওৎ পেতে গুহার থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে মনটাই যে লজ্জা পায়। এখানে আর দেরি করেনি কমলেশ।

কিন্তু দেরি করতে হয়েছিল উজ্জয়িনীর রেল স্টেশনে। ট্রেন আসবার সময় হয়নি। প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করতে করতে একবার একটু থমকে দাঁড়াতেও হয়েছিল। কি আশ্চর্য, ওয়েটিং রুমের দরজার কাছে সেই তরুণীই যে দাঁড়িয়ে আছে! কমলেশকে দেখতে পেয়ে তরুণীর চোখ দুটো আশ্চর্য হলো কিনা বোঝা গেল না। বরং মনে হয় কমলেশের, একটা সন্দেহের ছায়া যেন চমকে উঠে সেই মেয়ের চোখে ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

কমলেশের চোখ দুটোও বিরক্ত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। তরুণী মহাশয়া বোধ হয় ভাবলেন যে, একটা লোক পাষাণী-আমি-তব-ধাইব পশ্চাতে গোছের প্রতিজ্ঞা নিয়ে তার পিছু পিছু ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারে না কেন, বাঘ গুহাতে কমলেশই একদিন আগে এসে পৌঁছেছে, ওরাই এল পরের দিন। কিন্তু কমলেশ তো এই মিথ্যা সন্দেহ দিয়ে চোখে ভ্রূকুটি পাকিয়ে তুলতে পারে না যে, উনিই কমলেশের মুখ দেখবার জন্য পিছু পিছু ধাওয়া করে

ছুটছেন।

উজ্জয়িনীতে এসে তরুণীর শাড়ির রঙটাও বদলে গিয়েছে। রেবার ঘোলা জলের গাঢ় গৈরিকের সঙ্গে সবুজের আবছায়া যেমন মিশে আছে, তেমনি মিশালী রং-এর বাহার নিয়ে ফুরফুর করছে তরুণীর শাড়ির আঁচল।

তার পরের কয়েকটা দিন বিনা চমকেই কেটে গেল। কমলেশের দুটো দিন সওগরে এসে ডিজেল ইঞ্জিনের কলকব্জা মেরামতীর একটা নতুন কারখানা দেখতেই কেটে গেল। তারপর দুটি দিনের পর এক অদ্ভুত স্নিগ্ধ ও শান্ত দুপুরে, বিচিত্র আবেশে আনমনা হয়ে যাওয়ার একটি মুহূর্তে, নিজের ছায়ার পাশেই রঙীন শাড়ির ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো কমলেশ। সেই তরুণী ; প্রৌঢ় ভদ্রলোক এখন বোধহয় খজুরাহোর এই মন্দিরময় বিস্ময়ের জগতে অন্য কোথাও অন্য কোন মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আর, এই তরুণী একা একা নিজের চোখের টানে চলতে চলতে এমন এক মূর্তির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ওর পক্ষে শুধু একা একাই দাঁড়িয়ে সেই মূর্তিকে দেখে চলে যাওয়া উচিত ছিল। তরুণী যদি না চলে যায়, তবে কমলেশেরই চলে যাওয়া উচিত।

চৌষট যোগিনী মন্দিরের আঙ্গিনায় পুরনো পাথরের কত অভিমানের মায়া ছড়িয়ে আছে ; এদিকে-ওদিকে কত মকর-বাহিনী গঙ্গা, বরাহ, নন্দী, ব্রহ্মা আর রামচন্দ্র পড়ে আছেন। এই মেয়ে সেখানে গেলেই তো পারে। কন্দর্প মহাদেবের মন্দিরতোরণে এই মিথুন মূর্তির কাছে এসে ঐ পাথরে আলিঙ্গনের ভয়ানক নির্লজ্জ ভঙ্গীটিকে না দেখলেই কি নয়?

আশ্চর্য হয়ে গেল কমলেশ। এই মেয়েও যে নিবিড় এক ভঙ্গী ধরে, পাথরের মত নিথর হয়ে, মিথুনের দুই প্রগল্ভ মুখের হাসি আর চোখ-ভরা আবেগের সেই স্তব্ধীভূত উচ্ছলতার রূপ দেখছে? ওর পাশেই যে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে, কমলেশের মত পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পুরুষ, সেই বোধ আর হুঁসও যেন ওর নেই।

আনমনা হয়ে, বোধ হয় মুগ্ধ হয়ে, মিথুন মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে তরুণী। কমলেশের চোখের আবেশও যেন সব লজ্জার ভয় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তরুণীর ঐ দ্বিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়িয়ে-থাকা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া দেহের ছাঁদও এমন সুন্দর হয়! তরুণী নিজে আর্টিস্ট, কিন্তু ওর শরীরটাই যে একটা আর্ট! এই সত্য কি কখনো উপলব্ধি করতে পেরেছে এই মেয়ে? নইলে ভুলে যায় কেমন করে, ওর পক্ষে এই নিভৃতে কোন পুরুষের চোখের এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়? এই নিভৃতের শান্ত বাতাস হঠাৎ উতলা হয়ে যেতে পারে। আর মানুষের রক্ত-মাংসের আশা হঠাৎ-ভুলে পাগল হয়েও যেতে পারে। অজানা ও অচেনা দুই জীবন্ত নারী-পুরুষের সেই ভুলের লীলা দেখে পাথরের মিথুন হেসে ফেলতেও পারে।

তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্য কমলেশ তৈরী হয়ে পা বাড়িয়ে দিয়েই দেখতে পায় ; চলে গেল তরুণী। যাবার সময় কমলেশের দিকে ছোট একটি ভ্রূক্ষেপ করেই চলে গেল কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ নিতান্তই ভ্রূক্ষেপ। সে মেয়ের চোখে কোন বিড়ম্বনার লজ্জা নেই, সোজা একটা সাদা-মাটা চাহনি মাত্র। যেন একটা প্রাণহীন পাথুরে যক্ষের দিকে তাকিয়ে, আর একটুও আশ্চর্য না হয়ে চলে গেল তরুণী।

ছুটিতে ঘুরে বেড়াবার আনন্দটাই যে একটা শাস্তি হয়ে উঠলো। চোখে-দেখার এক একটা আকস্মিক ঘটনা অকারণে কোথা থেকে এসে মনের ভাবনাগুলিকে বার বার খুঁচিয়ে বিরক্ত করে, কখনো বা ঠাট্টা করে চলে যাচ্ছে। বেড়াতে বের হয়ে এ যে একটা আলেয়ার পাল্লায় পড়তে হলো।

আবার একবার। সারনাথের পথে ফিরে আসছে কমলেশ ; আর পিতা পুত্রীতে টাঙ্গায় চড়ে বুড়ো ধামেক স্তূপের জীর্ণ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে গল্প করতে করতে চলেছে।

কমলেশের টাঙ্গা ওদের টাঙ্গাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই এইবার স্পষ্ট করে শুনতে পায় কমলেশ, আর শুনেই মনের ভিতর একটা স্বস্তির হাসি খুশি হয়ে চমকে ওঠে। ওরা বাংলা ভাষাতেই কথা বলতে বলতে চলে গেল।

কিন্তু, কিসের স্বস্তি আর কিসের খুশি? ওরা বাঙ্গালী হলেই বা কি আর না হলেই বা কি? ওদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য কি কমলেশের মনে এতদিন ধরে সত্যিই একটা গোপন তৃষ্ণা ছটফট করছিল? এটা তবে কি সব কুণ্ঠার মাথা খেয়ে একেবারে গায়ে-পড়ে আলাপ করবার আগ্রহ?

কিন্তু বৃথা! এই আশাটাই যে একটা আত্মবঞ্চনার মোহ। নিতান্ত অনর্থকের জন্য মনের একটা লোভের হয়রানি মাত্র। আবার সুযোগ পাওয়া যাবেই, দৈবের কাছে এমন কোন নিয়ম আশা করা যায় না।

তার চেয়ে ভাল, মীরাটেই ফিরে যাওয়া। তিন মাসের ছুটির মধ্যে একমাস তো একটা আলেয়া দেখার গোলমালেই কেটে গেল। দার্জিলিং-এ গিয়ে কাকার বাড়িতে একটা মাস কাটিয়ে আসবার ইচ্ছাটাকেও আর ভাল লাগে না। যাক্, কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় ধ্যানী তুষারের সাদাতে দুপুরের সোনালী আলোর খেলা না হয় আসছে বছর গিয়ে দেখে আসা যাবে। বাকি দু'মাসের ছুটি এখন হাতে রেখে দেওয়াই ভাল। আসছে বছর বেশ নির্বিঘ্নে বেড়ানো যাবে।

বেনারসের হোটেলে একটি ঘরের নিভৃতে বসে কমলেশের মনে হয়, এই একটা মাস ধরে ঘুরে-বেড়ানো জীবনে শুধু একটা ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। চোখ দুটো শুধু অকারণে আশা করেছে আর হাঁপিয়েছে। আবু পাহাড়ের সানসেট পয়েন্ট আর ক্র্যাগস্, আর বাঘ গুহার চার নম্বর রঙ-মহল, সবই যেন কমলেশের চোখের পাশে সরে গিয়েছে। শুধু একটা সুন্দর মেয়ের মুখ দেখবার জন্য পৃথিবীর আলোছায়ার এত রূপ এক রহস্যের মূর্তি আর এত রঙের খেলাকে কাছে পেয়েও ভাল করে দেখতে ভুলে গিয়েছে কমলেশ।

এই ক্লান্তি আর ভুল মিথ্যে করে দেওয়া উচিত। মীরাটেই ফিরে গিয়ে কাজের জীবনের সেই যন্তর-মন্তরের যত কঠিন লোহা আর ইস্পাতে ঝনঝনার মধ্যে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারলেই এই ক্লান্তি মিথ্যে হয়ে যাবে। একশো পঁচিশ কিলোওয়াটের ডিজেল ইঞ্জিন ধক ধক করে ধমক দিয়ে মেয়েলী গলায় বাংলা ভাষার কলরব শোনবার লোভ ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবে। তাই ভাল। কমলেশের নিঝুম ভাবনাগুলি হঠাৎ জেগে উঠে যেন ঝনঝন করে। তাই ভাল, সেই সব গীয়ার সকেট ফ্লু পিষ্টন আর আরমেচার। যত লোহাড়ে কনডেনসার, ইণ্ডিকেটর আর ট্রান্সফর্মার। সুপারহিটার আর ব্যাটারি চার্জার। হাইটেনশন কেবল্ আর রোটারি। গ্যাস সিলিণ্ডার, ডিস্ক-জকি আর ম্যাগনেটিক ফিলটার। ইঞ্জিনিয়ার কমলেশের কাজের জগৎটা যেন সব একঘেয়েমির তাড়না ভুলে গিয়ে মায়াময় আবেদনের মত কমলেশকে ডাকতে শুরু করেছে।

কিন্তু...হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে আবার কি-যেন ভাবতে থাকে কমলেশ। দার্জিলিং-এর ছোট কাকা যে খুবই দুঃখ করবেন? ছোট কাকার কাছে গিয়ে অন্তত একটা মাস থাকবো বলে যে আগেই একটা ইচ্ছার আশ্বাস ছোট কাকাকে জানিয়ে দিয়েছে কমলেশ। ছোট কাকাও লিখেছেন, অবশ্যই আসবে। এসে ইচ্ছামত ঘুরে ফিরে, এমন কি দূরের তিস্তা আর গ্রেট রঙ্গিতের রঙীন জল, কিংবা, যদি হিমেল হাওয়া একটু সহ্য করতে পার, তবে আরও দূরে গিয়ে পাইন বনের ছায়ার কাছে কস্তুরী হরিণের মেলা দেখে যেতে পার। তা ছাড়া রডোড্রেনডন আছে, অর্কিডও আছে, যার রঙের উল্লাস দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

রঙের নাম শুনলেই ভয় করে। যাক্, তবু ছোট কাকার অনুরোধ তুচ্ছ না করাই উচিত। দার্জিলিং-এ যাবার জন্যই তৈরী হয় কমলেশ।

দুই

শিলিগুড়ি। খেলনা ট্রেনের মত ছোট ট্রেনে ছোট একটি কামরায় ঢুকেই রাঙা হয়ে গেল কমলেশের মুখ। কমলেশের জীবনটাই যেন চোরা মতলবের মত হঠাৎ ফাঁস হয়ে এক জোড়া সুন্দর চোখের কাছে হাতে-হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। কামরার ভিতরে বসে আছে সেই পিতা-পুত্রী। নতুন অশথ পাতার মত রঙের সেই শাড়ির রঙ সকালের আলোতে আরও শোভাময় হয়ে ঝিরঝির করছে।

কমলেশকে দেখতে পেয়ে তরুণীর মুখে একটা মৃদু হাসির শিহর চমকে উঠেছে ; যেন এক অভাবিত বিস্ময়ের কৌতুক সহ্য করতে পারছে না। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের চোখ দুটোও বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছে। আজ অন্তত এইটুকু প্রমাণ পাওয়া গেল যে, কমলেশকে ওরা দু'জনেই চিনতে পেরেছে। অনেকবার চোখে দেখা একটা মানুষের চেহারা ওরা এরই মধ্যে ভুলে যায়নি, দেখেই চিনতে পেরেছে।

আজ এই প্রথম ওদের চোখের খুব কাছে মুখোমুখি বসে বুঝতে পারে কমলেশ, প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু বেশী প্রৌঢ়, আর তরুণীর চোখ দুটোর নিবিড়-কালো টানা-টানা সুন্দরতা আরও সুন্দর। যাক্, এই দু'জনের চোখের আর মুখের সন্দেহ ভরা বিস্ময়টাকে আর খুঁচিয়ে তোলবার দরকার নেই ; যেচে একটা কথা বলতে গেলেই ওরা বিশ্বাস করে ফেলবে যে, বাইনকুলার হাতে এই লোকটা সত্যিই আবু পাহাড় থেকে এই শিলিগুড়ি পর্যন্ত ওদেরই পিছু পিছু ধাওয়া করে এসেছে। ওদের এই অহংকেরে বিশ্বাসটাকে অবজ্ঞা করবার জন্যই চুপ করে বসে থাকে কমলেশ, দু'জনের কারও মুখের দিকে তাকায় না।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন—আপনিও কি দার্জিলিং যাবেন?

কমলেশ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসেন—আপনাকেই তো সেই আবু পাহাড়ে, আর...আরও এখানে-ওখানে কয়েকবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

কমলেশ—হ্যাঁ। একবার উজ্জয়িনী স্টেশনে, একবার খজুরাহোতে, আর একবার সারনাথের পথে...।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনিও বোধহয় একটা সাইট-সিইং উদ্দেশ্য নিয়ে টুরে বের হয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনাকে বাঙ্গালী বলে বুঝতে পারলে যে ভালই হতো।

কমলেশ হাসে—আমারও একবার ইচ্ছা হয়েছিল আপনাদের একটু জিজ্ঞাসা করে জানতে, আপনারাও বাঙ্গালী কিনা।

চেঁচিয়ে ওঠেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক—কেন, কেন জিজ্ঞাসা করলেন না? ওঃ, আপনি বড়ই অন্যায় করেছেন।

কমলেশ—আপনারাও তো আমাকে একটু জিজ্ঞেস করলে পারতেন?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—সত্যি কথা, বলি তবে। আপনাকে দেখে বাঙ্গালী বলে আমার কোন সন্দেহই হয়নি।

কমলেশ—এ কেমন কথা, সন্দেহও করতে পারলেন না?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক—না, আপনার ঐ সুন্দর স্বাস্থ্য, আর এই এত ফরসা গায়ের রং দেখে মনেই হয়নি যে আপনি বাঙ্গালী।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসেন, কমলেশ লজ্জিত হয়, এবং ভদ্রলোকের মেয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নীরবে হাসতে থাকে।

আলাপের জের টেনে প্রৌঢ় ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করেন—দার্জিলিং-এ আপনার কদিনের প্রোগ্রাম?

কমলেশ বলে—দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু শুধু টুরিস্টদের মত মন নিয়ে নয়। ওখানে আমার কাকা থাকেন, তাঁরই কাছে যাচ্ছি।

—আপনার কাকা? নামটা বলবেন কি? দার্জিলিং-এ কোথায় থাকেন?

—আমার কাকা মনতোষ সরকার, জলাপাহাড় রোডে বাড়ি।

—আই সি! চেঁচিয়ে ওঠেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।—আমার ভেরি ভেরি ডিয়ার ফ্রেণ্ড মনতোষবাবু, তোমার কাকা? জানতে পারলে যে আবু ডাকবাংলোতেই তোমাকে নেমন্তন্ন করে পায়েস খাওয়াতাম।

তরুণী এইবার কমলেশের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে লজ্জিতভাবে হাসে। এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর নিজের পরিচয়ও প্রকাশ করে দেন।—এটি হলো আমার মেয়ে জয়ন্তী, আর আমি হলাম...কি আর বলবো, বলবারই যে কিছু নেই...আমি হলাম মনতোষবাবুর বন্ধু অতুল দত্ত। আমার একটা চা-এর বাগান আছে। তোমার কি করা হয় ইয়ংম্যান?

কমলেশ—আমি মীরাটে থাকি, আর একটা চাকরি করি।

—কিসের চাকরি?

কমলেশ হাসে—মিস্তিরিগিরি। মেশিন মেরামতির কাজ।

অতুলবাবু মাথা দুলিয়ে হাসেন—মিস্তিরিগিরিটা রপ্ত করেছিলে কোথায়? রুড়কিতে, না শিবপুরে?

কমলেশ বলে—গ্লাসগোতে।

অতুলবাবু—আমার জয়দেব, এই জয়ন্তীর চেয়ে দু'বছর ছোট, সে'ও এখন গ্লাসগোতে আছে।

অনেকক্ষণ হলো ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। অতুলবাবু একটা বাক্স খুলে নানা রকমের মেশিনের ছবিভরা ক্যাটালগ হাতে নিয়ে কমলেশের চোখের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেন—আমার চা-বাগানের জন্য কিনতে চাই, কিন্তু মডেল দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না, জিনিসগুলি ভাল হবে কিনা?

ক্যাটালগের উপর চোখ বুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় কমলেশ—হাডসনের রোলিং ট্রলি আর ফার্মেণ্টিং ট্রে ; ও আর দেখতে হবে না। খুব পোক্ত জিনিস।

শুনে খুশি হলেন অতুলবাবু ; ক্যাটালগের পাতা অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করলেন, তারপর ক্যাটালগ বুকের উপর রেখে সীটের উপরেই কাত হয়ে পড়ে একেবারে ঘুমোতেই শুরু করে দিলেন।

বাঙ্গালী বলে চিনতে পরলে যিনি আবু পাহাড়েই নেমন্তন্ন ক'রে পায়েস খাওয়াতেন, তিনি মাত্র এই সামান্য কয়েকটি কথায় ও প্রশ্নে আলাপ সেরে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর তাঁরই মেয়ে, জয়ন্তীর অহঙ্কার যেন জেগে জেগেই ঝিমোতে থাকে। তিনধারিয়া লুপ পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ, এর মধ্যে জয়ন্তী ভুলেও একবার কমলেশের মুখের দিকে তাকায়নি।

যখন ঘুম পাহাড়ের দিকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চড়াই ঠেলে ট্রেন উঠতে শুরু করেছে, তখন হিমেল বাতাসের ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে শিউরে উঠলেও কমলেশের চোখে ঘুমের আবেশ নেমে আসে, এবং ঘুমিয়ে পড়বার আগে মনে মনে হেসেও ফেলে। ওরা বাঙ্গালী হয়েই বা কি লাভ হলো? আর বাঙ্গালী না হলেই বা কি ক্ষতি হতো?

দার্জিলিং স্টেশনে ট্রেন থামতেই ব্যস্ত হয়ে স্টেশনের হৈ-চৈ ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে যেন এক নিমেষে মিশিয়ে দিয়ে চলে যায় কমলেশ। অতুলবাবুও যে নামবেন, এবং তাঁকে একটা নমস্কার জানিয়ে চলে যাওয়া উচিত, এই সাধারণ সৌজন্যের বোধ মনের মধ্যে সজাগ থাকা সত্ত্বেও সেই সৌজন্য জানাবার অপেক্ষায় আর দাঁড়িয়ে থাকেনি কমলেশ। থাকতো বোধ হয় ; কিন্তু দেখতে পায় কমলেশ, জয়ন্তী যেন বুঝতেই পারছে না, এবং একটা ভ্রূক্ষেপ

করেও বুঝতে চেষ্টা করছে না যে, এতক্ষণ ধরে যে মানুষটা তারই চোখের সামনে বসেছিল, সেই লোকটা নেমে চলে যাচ্ছে। কত গম্ভীর হয়ে নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে জয়ন্তী।

তিন

কাকিমা বললেন—বার্চ হিল রোডের অতুলবাবুর মেয়ে জয়ন্তী যে তোকে চেনে বলে মনে হলো, কমল?

কমলেশ বলে—কই? না তো। অতুলবাবু আমাকে চেনেন।

কাকিমা—তার মানে?

কমলেশ—ট্রেনে দেখা হয়েছিল ওদের সঙ্গে। শুধু অতুলবাবু আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

কাকিমা—তুই জয়ন্তীকে চিনিস?

কমলেশ—চিনি বৈকি।

কাকিমা—জয়ন্তীর সঙ্গে তুই কথা বলেছিলি নিশ্চয়।

কমলেশ—কখ্‌খনো না।

কাকিমা—হাসেন—তাহলে জয়ন্তীকে চিনলি কি করে?

কমলেশ—তার মানে, শুধু মুখ চেনা। শুধু কয়েকবার চোখে দেখেছি ; এই পর্যন্ত।

কাকিমা—আমিও তো তাই বলছি জয়ন্তীও তোর মুখ চেনে। সেই কথাই বলছিল জয়ন্তী।

কমলেশ—তা হয়তো বলতে পারে। কিন্তু বললেই বা কি আসে যায়?

কাকিমা হঠাৎ বলে ওঠেন—জয়ন্তীকে বিয়ে করবি তো বল?

চমকে অপ্রস্তুত হয়ে বিড়বিড় করে কমলেশ—তুমি গুরুজন হয়ে হঠাৎ এ কিরকমের একটা ঠাট্টা করে বসলে, কাকিমা?

কাকিমা—কেন, জয়ন্তীর সঙ্গে তোর বিয়ে হলে মন্দ কি?

কমলেশ—না, মন্দ কেন হবে? কিন্তু ভাল হবে কি? তাছাড়া বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে, তবে তো?

আর একটা কথা কাকিমাকে বলতে ইচ্ছা করে। জয়ন্তীরও ইচ্ছে হবে, তবে তো বিয়ে হতে পারে।

কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে এখানেই আলোচনা থামিয়ে দিতে চায় কমলেশ।

কাকিমা হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হলেও আবার প্রশ্ন করেন—কেন? জয়ন্তীকে দেখতে কি বেশ সুন্দর বলে মনে হয় না?

কমলেশ—দেখতে সুন্দর তো বটেই। চোখে দেখতে ভালই লাগে।

কাকিমা—তোরও তাহলে ভাল লেগেছে বল?

কমলেশ—হ্যাঁ, ভাল লেগেছে বৈকি।

কাকিমা—তবে, আপত্তি কিসের?

কমলেশ বলে—চোখে ভাল লাগলেই বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে, এমন কোন কথা তো নেই।

মিথ্যে বলেনি কমলেশ। নিজের মনের মধ্যে কোন ফাঁকি রেখে কথা বলেনি। সুন্দর চেহারা, দেখতে ভাল লাগে! সেইজন্য আরও একবার, এবং হয় তো বারবার দেখতে ইচ্ছাও করবে। কিন্তু এই দেখবার ইচ্ছাটুকু ছাড়া মনের মধ্যে আর কোন আগ্রহের সাড়া খুঁজে পায় না কমলেশ। সেকেলে মানুষ কাকিমা। চোখে দেখতে পছন্দ হলেই মেয়ে পছন্দ হয়ে যায়, এবং তার পর তাকে বিয়ে করা হয়, এই নিয়মের মধ্যে কোন ভুল দেখতে পারবেনই বা

কেন?

কাকিমা যেন তাঁর নিজেরই মনের প্রেরণায় নানা গল্প বলতে শুরু করে দেন। সেসব গল্পের অর্ধেকেরই বেশি হলো অতুলবাবুর মেয়ে জয়ন্তীর জীবনের গল্প।

মা নেই জয়ন্তীর। বাপের বড় আদরের মেয়ে। একমাত্র মেয়ে। জয়ন্তী সিমলাতে থেকে পড়তো; পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এম-এ পাশ করেছে এই চার বছর হলো ; ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। তা ছাড়া, যেমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারে, তেমনি সুন্দর গান গাইতে পারে। সারা দার্জিলিং-এ অমন সৌখীন মনের মেয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্কিড পুষতে ওর মতন ওস্তাদ আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। পর পর তিন বছর জয়ন্তীরই অর্কিড এগ্‌জিবিশনের ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। অতুলবাবুর সঙ্গে জয়ন্তী মাঝ মাঝে রাংতুন যায়। সেখানে ওদের চা-বাগানের একটা কুঠিতে এভিয়ারী আছে। নানারকম রঙ্গীন পাখির একটা আড়ত যেন। তিন শো টাকা খরচ করে জয়ন্তীর জন্য তিব্বত থেকে একজোড়া রঙ্গীন কালিজ আনিয়ে দিয়েছেন অতুলবাবু। তিতির ময়না আর বউ-কথা-কও থেকে শুরু করে বিলতি রবিন ম্যাগপাই আর কানারিও আছে। পাখির রঙ্গীন পালক দিয়ে নিজের হাতে কার্পেট তৈরী করে জয়ন্তী, সে কার্পেটের উপর পা দিতে মায়া হয়।

শুনলে মুগ্ধ হতে হয়। কাকিমা যেন এক রূপকথার মেয়ের গল্প বলছেন। কমলেশও চুপ করে বসে শুনতে শুনতে আশ্চর্য হয়ে যায়। এবং মনে মনে বুঝতে পেরে লজ্জাও পায় যে, এই গল্প আরও শুনতে ইচ্ছা করছে।

ওদিকে বার্চহিল রোডের বাড়িতে অতুলবাবুকে একটু আশ্চর্য হতে দেখে জয়ন্তীর কালো চোখের তারাও হঠাৎ একটু চমকে ওঠে!

অতুলবাবু বলেন—কি আশ্চর্য, মনতোষবাবুর ভাইপো সেই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি যে সত্যিই একবার একটু দেখা করতেও এল না।

—দেখা করতে আসবে, এরকম কি কোন কথা ছিল? আস্তে আস্তে, গলার স্বরে কোন চঞ্চলতা না জাগিয়ে প্রশ্ন করে জয়ন্তী।

অতুলবাবু—আসবার কথা মানে এই যে...আমি তো ওর কাকারই বন্ধু ; তা ছাড়া পথেও যখন আলাপ হলো, তখন একবার নিজের থেকেই এলে এমন কি আর...।

বোধ হয় বলতে চান অতুলবাবু, নিজেকে এমন কি আর ছোট করা হতো। কাকার বন্ধুর সঙ্গে একবার নিজের থেকেই দেখা করতে এলে নিজেকে ছোট করা হয় না।

অতুলবাবু—ছেলেটি দার্জিলিং-এ এখন আর নেই বোধ হয়।

জয়ন্তী বলে—আছেন। শুভা মাসিমার সঙ্গে চৌরাস্তায় একবার দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন যে, কমলেশবাবু এখনও দার্জিলিং-এ আছেন।

—ছেলেটির নাম কমলেশ নাকি?

জয়ন্তী হাসে—হ্যাঁ, তুমি তো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রেও নামটা জিজ্ঞেসা করনি।

আক্ষেপ করেন অতুলবাবু—বাস্তবিক বড় অভদ্রতা হয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবেন অতুলবাবু। তারপর বলেন—মনতোষবাবুর কাছ থেকে ছেলেটির...তার মানে কমলেশের অনেক গল্প শুনলাম।

জয়ন্তী চোখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে পার্কের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন বৃথা গল্প শোনবার একটা শাস্তি থেকে দূরে সরে যাবার জন্য চেষ্টা করছে জয়ন্তী। শুনে লাভ কি?

যাকে এতবার চোখে দেখেও কোন লাভ হয়নি, তার জীবনের গল্প শুনে লাভ কি? জয়ন্তীর মনের ভিতরে এই যে প্রশ্নটা সব চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছে, তার শব্দ অন্য কারও কানে পৌঁছবার কথা নয়।

আবু পাহাড়ের দিলবরা এক নিভৃতে যার সঙ্গে প্রথম চোখে-চোখে দেখা, সেই মানুষটার

মুখের দিকে তাকালে কারও চোখ আঁৎকে উঠবে না, বরং আর একটু ভাল করে দেখতেই ইচ্ছা করবে। জয়ন্তীও দেখতে ভুলে যায়নি। ঐ মুখের ছাঁদ তুলি দিয়ে এঁকে রাখতেও ইচ্ছা করে। সারনাথের পথে টাঙ্গা করে যেতে যেতে আনমনার মত হঠাৎ একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে ছিল জয়ন্তী, মনতোষবাবুর ভাইপো সেটা দেখতেই পাননি। যেচে আলাপ করেন না ; এমনই একটি উন্নত অহংকারের মানুষ।

আজ এই বার্চহিল রোডে বাড়ির একান্তে বসে ভাবতে গিয়ে অনেক কথাই মনে পড়ে যায় ; আর মনে মনে লজ্জাও পায় জয়ন্তী। উজ্জয়িনীর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অনেকক্ষণ ধরে বসে অনেক চিন্তার মধ্যে হঠাৎ একটা লোভী চিন্তাও যে মনের ভিতর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কোথায় গেলেন সেই ভদ্রলোক?

কন্দর্য মহাদেবের মন্দিরতোরণের কাছে যে মানুষটিকে দেখতে পেয়ে জয়ন্তীর চোখ দুটোও ভুল করে একবার বেহায়া হয়ে গিয়েছিল, সে মানুষ কিন্তু ভুলেও জয়ন্তীকে একটি কথাও বলেনি। জয়ন্তীকে চোখেই পড়েছিল কিনা কে জানে! ভদ্রলোক বোধ হয় তাঁর সুন্দর চেহারা নিয়ে এই বিশ্বাসেই আত্মহারা হয়ে আছেন যে, তাঁর মুখের দিকে তাকাবার জন্য পৃথিবীর সব মেয়ের চোখ ছটফট করছে।

পথে অনেকবার দেখা হয়েছিল, তাই ব্যরবার মনে হয়েছিল, বোধ হয় আর একবার দেখা হবে। দেখতে ইচ্ছাও করেছিল এবং দেখতে ভালই লেগেছিল। সব সত্যি। কিন্তু তাতেই বা কি?

শুভা মাসিমার কথা শুনে অপ্রস্তুত হতেও হয়েছে। শুভা মাসিমা তাঁর চোখের দৃষ্টিটাকে কেমন যেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন--কমলেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো?

--না, আমার সঙ্গে আলাপ হয়নি। উনি বাবার সঙ্গেই শুধু কয়েকটা কথা বলে আলাপ করলেন।

--এ তো বড় আশ্চর্যের কথা। তুমি যেমন, আমাদের কমলেশও যে তেমনি, খুব মিশুক মানুষ।

—কিন্তু, কই কমলেশবাবুর হাবে-ভাবে সে-রকম তো কোন লক্ষণ দেখলাম না।

—যাক্, তবু একটু চেনাচেনি হয়েছে তো?

--হ্যাঁ, মুখ চেনা!

শুভা মাসিমা আবার যেন কেমন করে হাসেন--হ্যাঁ, মুখ চেনা হলেই তো হলো। আর মুখটি দেখতে ভাল লাগলে তো হয়েই গেল।...আমি শিগগির তোমার বাবার সঙ্গে একটা দরকারী কথা বলতে যাব জয়ন্তী। বলে দিও, কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ যেন বাগানে না চলে যান।

শুভা মাসিমার কথাগুলি শুনতে ভাল লাগেনি। ওঁর ভাসুরের ছেলে, কমলেশ নামে গ্লাসগো ফেরত এক ইঞ্জিনিয়ীর, বেশ ভাল স্বাস্থ্য আর বেশ সুন্দর মুখ একটি মানুষ। তার সঙ্গে মুখচেনা হয়েছে, তাকে দেখতে ভালই লাগে। ব্যাস, তাহলেই হয়ে গেল?

নিজের মনের মধ্যে কোন ফাঁকি রাখতে চায় না জয়ন্তী। সত্যিই ইচ্ছা হতো, তবে কোন কথা ছিল না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাক্, এটা—কল্পনা করতেই যে ভাল লাগে না! কোন ইচ্ছাই হয় না।

গল্প বলতে শুরু করেন অতুলবাবু।—কমলেশের মত ভাল বয়লার স্পেশালিস্ট ইণ্ডিয়াতে খুব কমই আছে জয়ন্তী। মনতোষবাবুর কাছে সবই শুনলাম। কমলেশের বড় ভাই ব্যারিস্টার, মীরাটেই প্র্যাক্‌টিস করেন। কমলেশের মাইনে এখন এক হাজার টাকা। তা ছাড়া কনসালটিং ফী ধরলে মাসে আরও এক-দেড় হাজার হবে। মোটামুটি যাকে বলা যায়, বেশ ভাল রোজগেরে ছেলে। কমলেশের মা মীরাটের মেয়ে ডাক্তারদের মধ্যে বেস্ট, সব চেয়ে বেশি

সুনাম। কমলেশ নানারকম স্পোর্টসেও এক্সপার্ট। টেনিসে গ্লাসগো'র চ্যাম্পিয়ন। বড় ভাই-এর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, কমলেশের বিয়ে হয়নি। মনতোষবাবুও ঠিক বলতে পারলেন না, কেন এখনও বিয়ে করতে চাইছে না কমলেশ।

গল্প শুনে কমলেশকে আরও ভাল ক'রে চিনতে পারা যাচ্ছে। শুনতে ভালই লাগছে। রূপের মানুষ যে এত গুণের মানুষ হতে পারে, সেটা এই গল্প না শুনলে কল্পনাও করতে পারতো না জয়ন্তী। নীৎসের সুপারম্যানের শক্ত শক্ত নিষ্ঠুরতাগুলি বাদ দিলে যা থাকে, যেন সেই রকমই একটি অসাধারণ মানুষ।

চোখে দেখার পালা শেষ হবার পর কানে শোনার এক নতুন পালা শুরু। অতুলবাবুর গল্প অনেকক্ষণ পরে থেমে যাবার পরেও জয়ন্তীর মনে সেই একই প্রশ্ন চঞ্চল হয়ে ওঠে, শুনেই বা লাভ কি? শুনলে শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। কিন্তু যার উপর শ্রদ্ধা হবে, তাকেই চির-জীবনের সঙ্গী ক'রে নিতে হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। আর, সব চেয়ে বড় সত্য হলো, মনের বাধা। মনটাই যে সাড়া দেয় না, ইচ্ছে হয় না।

বড় বেশি আগ্রহ নিয়ে গল্প বলছেন অতুলবাবু। জয়ন্তীর বুঝতে একটুও দেরি হয় না, এই আগ্রহের মধ্যে যেন বার্চহিল রোড আর জলাপাহাড় রোডের একটা সম্মিলিত চেষ্টার আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুই পরিবারের একটা ইচ্ছা খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

কিন্তু ভুল করছে দুই পরিবারেরই মন। কমলেশ নামে সেই ভদ্রলোক কি ভাবছেন জানবার দরকার নেই, অনুমান করতে পারাও যায় না। কিন্তু যা-ই ভাবুন তিনি, ইচ্ছুক হন বা অনিচ্ছুক হন, কিছুই আসে যায় না। জয়ন্তীর ইচ্ছে নেই। বিয়ের কথা একটু বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠলেই বেশ করে আপত্তি জানিয়ে দিতে হবে।

চার

রূপকথার মেয়েকে গল্পের মধ্যে শুনতে খুব ভাল লেগেছে। অস্বীকার করে না কমলেশ! কাকিমাও লক্ষ্য করেছেন, বেশ মন দিয়ে আর দু'চোখ শান্ত করে অতুলবাবুর মেয়ের কাহিনী শুনেছে কমলেশ। তাই কাকিমা জানতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, তবু বার্চহিল রোডের বাড়িতে একবারও যায়নি কমলেশ। কাকা মনতোষবাবু একটু চিন্তিতভাবে বলেন—অতুলবাবু বেশ একটু দুঃখ করেই বললেন।

কাকিমা—কি?

কাকা বলেন—কমল একবার বার্চহিলের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলে অতুলবাবু খুশি হতেন। আর অতুলবাবুর ধারণা, জয়ন্তীও খুশি হতো।

কাকিমা একটু রাগের সুরে বলেন—আমি বলি কমল না হয় গোঁয়ার্তুমি করে হোক আর লজ্জা করেই হোক, বার্চহিলের বাড়িতে আজ পর্যন্ত যায়নি। কিন্তু জয়ন্তী তো এবাড়িতে একবার আসতে পারতো।

কাকা হাসেন—কে জানে, জয়ন্তীও হয়তো গোঁয়ার্তুমি করে কিংবা লজ্জা পায় বলেই এখানে আসতে চায় না।

দার্জিলিং-এর কত দেখবার মত রূপ দেখা হয়ে গেল, কিন্তু সকালে বা বিকালে বার্চহিল পার্কের লতা পাতা ও ফুলের রূপ কেমন হয়ে যায়, সে রহস্যের ছবি দেখবার সময় হয়নি কমলেশের ; ভুলেও এই পথে কোন দিন আসেনি কমলেশ। আবজার্ভেটরি হিল আর লয়েড বোটানি, ভিক্টোরিয়া ওয়াটারফল আর মহাকালের গুহা, ঘুরে ঘুরে অনেক কিছুই দেখা হলো। কার্ট রোড ধরে ছায়ায় ছায়ায় আরো দূরে চলে যেতে ভাল লাগে। রবার্টসন রোড আর ম্যাকেনজি রোডের বড় বড় স্টোরে আর শো রুমে ঢুকে জিনিসপত্রের দর জানতেও ভাল

লাগে। কিন্তু তারপর?

ঘুম পাহাড়ের কুয়াশাকেও সেদিন খুব ভাল লাগলো। সকালের ট্রেনে ঘুমে এসে দুপুর পর্যন্ত বেড়াতে বেড়াতেই পার করে দিল কমলেশ। তিব্বতীদের মঠ দেখে আর কার্ট রোডের পাশে কুয়াশা ভেজা শালের আশেপাশে ঘুরে যখন স্টেশনে এসে বসলো কমলেশ, তখন কুয়াশা আরও নিবিড় হয়ে সারা স্টেশনটাকেই যেন ঝাপ্‌সা করে দিয়েছে। কমলেশের বাইনকুলার আজ ব্যর্থ। বাইনকুলারের চোখও আজ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, দূরের বা নিকটের কোন রঙীন শোভার মায়াকে কাছে ধরে আনতে পারে না। তবু এই হিমেল কুহেলিকার আবরণও যেন একটা শীতল ও শিহরিত মায়ার খেলা। চুপ করে বসে নিজেরই বুকের ভিতরের যত অদ্ভুত নিঃশ্বাসের খেলাগুলিকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

পশমী ওভারকোট গায়ে দিয়ে যে নারীর মূর্তি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে কমলেশের চোখের কাছে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, তার মুখটা বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পায় কমলেশ। জয়ন্তীর সেই মুখ, যে মুখটা রঙীন আলেয়ার মত গত এক মাসের মধ্যে অনেকবার কমলেশের চোখের সম্মুখে এসেছে, সরে গিয়েছে, আর লুকিয়ে পড়েছে। সেই জয়ন্তী, যার জীবনের গল্পগুলিকে শুনতে রূপকথার মত মনে হয়েছে আর ভাল লেগেছে।

বোধ হয় মনে করেছিল কমলেশ, অতুলবাবুও কাছেই আছেন। এদিক-ওদিক তাকায় কমলেশ, এবং কৌতূহল চাপতে না পেরে হঠাৎ বলেই ফেলে—আপনার বাবা কোথায়?

জয়ন্তী বলে—বাবা আসেননি। আপনি এখানে কখন এলেন?

কমলেশ—সকালের ট্রেনে এসেছি। এইবার ফিরে যাব। আপনি?

জয়ন্তী—আমি রাংতুন থেকে আসছি।

কমলেশ—কবে রাংতুন গিয়েছিলেন।

জয়ন্তী—কাল ; বাবা এখন কয়েকটা দিন রাংতুনে থাকবেন।

কমলেশ—তাই নাকি? তা হলে তো আর...।

জয়ন্তী—বাবার সঙ্গে আপনার কোন কাজের কথা ছিল?

কমলেশ হাসে—না, কাজের কথা কিছু নয়। আমি খুব সম্ভব আর এক সপ্তাহের মধ্যে মীরাট ফিরে যাচ্ছি। ভেবেছিলাম, যাবার আগে আপনার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে যাব।

জয়ন্তী হাসে—বেশ তো, এখনই দার্জিলিং-এ না ফিরে, এখান থেকেই সোজা রাংতুন চলে যান না।

কমলেশ—গেলে আজই ফিরতে পারা যাবে তো?

জয়ন্তী—না, আজ আর ফিরতে পারবেন না।

কমলেশ—কেন? যাওয়া আসার ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না?

জয়ন্তী—পাওয়া যাবে। কিন্তু বাবা কি আপনাকে আজ ছেড়ে দেবেন?

কখনই না।

কমলেশ—তা'হলে তো আর-এক বিপদ। কাকিমা কিছু বুঝতে না পেরে ভেবে ভেবে অস্থির হবেন।

জয়ন্তী—সেজন্য আপনি ভাববেন না। আমি আপনার কাকিমার কাছে খবর পাঠিয়ে দেব।

কমলেশ কি যেন চিন্তা করে। তার পরে আনমনার মত বলে—না আজ থাক্, যদি পারি তবে না হয় আর একদিন সময় করে রাংতুন বেড়িয়ে আসবো।

ট্রেন এসে গিয়েছে। কমলেশ ব্যস্তভাবে কথা বলতে গিয়ে হেসেই ফেলে—তবে একটা কথা, আপনি যদি রাংতুনে থাকেন, তবেই আমি রাংতুনে যাব।

চমকে ওঠে জয়ন্তীর চোখের তারা। তারপর জয়ন্তীও হেসে ফেলে—খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন আমি রাংতুনে কখন্ থাকি বা না থাকি।

ট্রেনের ইঞ্জিনের শব্দ, লোকজনের হৈ-হৈ আর দু'জনের হাস্যময় কলরব প্রথম আলাপের মিথ্যা ভয়টাকে যেন এক মুহূর্তেই তুচ্ছ করে আর ঠাট্টা করে দূরে সরিয়ে দিল। ব্যস্তভাবে একই সঙ্গে দু'জনে হেঁটে গিয়ে ট্রেনের একই কামরার একই সীটে পাশাপাশি বসে কমলেশ আর জয়ন্তী।

অনেকক্ষণ কোন কথা না বলে দু'জনেই গম্ভীর হয়ে বসেছিল। এই ঘটনাকেই অদ্ভুত একটা অঘটন বলে মনে হয়। জয়ন্তীর দু'চোখের কালোর গভীরে যেন একটা চিন্তা ছলছল করে, আর কমলেশের চোখে সুস্থির হয়ে ফুটে থাকে একটি ভাবনার বিস্ময়। আবু পাহাড় থেকে ছুটতে ছুটতে দু'টো ছাড়াছাড়ি প্রাণ যেন এতক্ষণে জিরোবার মত একটা ঠাঁই পেয়ে দুজনেই একসঙ্গে পাশাপাশি বসে পড়েছে অদেখা নয়, অনেক দেখা আর অনেক শোনার মায়া দিয়ে তৈরী একটা টান এতদিনে হঠাৎ একটা সুযোগের লগ্ন পেয়েই দু'জনকে কাছাকাছি করে দিয়েছে।

কমলেশ বলে—আমি এর মধ্যে একদিনও আপনাদের বাড়ি যেতে পারিনি বলে আপনার বাবা বোধহয় আমাকে একটু ভুল বুঝেছেন।

জয়ন্তী—ভুল কিছু বোঝেননি, আশা করেছিলেন যে, আপনি দেখা করতে আসবেন।

কমলেশ—আপনি নিশ্চয় আশা করতেও চাননি।

জয়ন্তী মুখ নামিয়ে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। মৃদু স্বরে বলে—আমার কথা ছেড়ে দিন।

কমলেশ—আপনিও তো একবার জলপাহাড় রোডের বাড়িতে যেতে পারতেন।

জয়ন্তী—আমি যেয়েই থাকি। অনেকবার গিয়েছি। আপনার কাকিমা অর্থাৎ শুভা মাসিমা আমাকে খুব চেনেন।

কমলেশ—সেই জন্যই তো আমার অভিযোগ। যে বাড়িতে এতবার গিয়েছেন, সে বাড়িতে আর একবারও গেলেন না, এর কারণ একমাত্র এই হতে পারে যে, এখন একটা মিস্তিরী সেই বাড়িতে আছে।

কোন উত্তর না দিয়ে মুখ তুলে কমলেশের মুখের দিকে তাকায় জয়ন্তী। আস্তে আস্তে বলে—আপনার এসব কথার কোন মানে হয় না।

কমলেশ—বুঝলাম, আমিই বার্চহিলের বাড়িতে গিয়ে আপনাকে চমকে দিলে খুব মানে হতো।

—মানে কিছুই হতো না ; কারণ আমি চমকে উঠতাম না।

কমলেশ গম্ভীর হয়—আপনি একটু বেশী ফিলসফার।

চুপ করে বসে থাকে দুজনেই। দার্জিলিং স্টেশনে এসে গাড়িটা থেমেও গিয়েছে। হঠাৎ যেন একটু ক্ষুব্ধ ঠাট্টার স্বরে হেসে ওঠে কমলেশ—এত কথা বললেন, তবু এই সামান্য কথাটা বলতে পারলেন না যে, একবার চা খেতে আসবেন।

জয়ন্তীও হাসতে চেষ্টা করে।—বলেছি তো। আর কিভাবে বলতে হয় জানি না।

লজ্জিত হয় কমলেশ। এতদিন পরে কমলেশের জীবন একটা ডাক শুনতে পেয়েছে ; কিন্তু কন্দর্প মহাদেবের মন্দির তোরণের কাছে যে মেয়ের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছিল, সেই মেয়ে নয় ; খুবই শান্ত ভদ্র আর শকক্ত ফিলসফির মেয়ে ডেকেছে।

কমলেশ বলে—আচ্ছা, যাব।

পাঁচ

দূর থেকে চোখে দেখার পালা আর দূর থেকে কানে শোনার পালা ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন শুধু কাছ থেকে আর পাশাপাশি বেড়িয়ে মনে প্রাণে জানাজানির পালা। দূর থেকে

চোখে দেখতে ভাল লেগেছিল, দূর থেকে কানে শুনতেও ভাল লেগেছিল। এখন কাছে কাছে থেকে জানতেও ভাল লাগছে বৈকি।

রঙ্গিত রোড ধরে নামতে নামতে আর এগিয়ে যেতে যেতে পাথরের গায়ে আঁকা রঙীন ছবি দেখে থমকে দাঁড়ায় কমলেশ আর জয়ন্তী। বোধিসত্ত্ব পদ্মসম্ভবের মুদ্রা আর আসনের ভঙ্গীটি দেখতে বেশ লাগে। এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর আবার এগিয়ে যায় কমলেশ আর জয়ন্তী।

এক একদিন বার্চহিল রোড ধরে বেশ কিছুদূরে এগিয়ে যেয়ে, সেন্ট জোসেফ কলেজকে পিছনে ফেলে রেখে নীরব নিরালার কোলে গিয়ে দাঁড়াতে, পথের পাশে ছায়াময় একটি তরুকুঞ্জের কাছে বসতে ভাল লাগে। বুনো সবুজের ঢেউ পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে দূরান্তের তুষারময় শিখরশোভার সাদার দিকে যেতে যেতে যেন হঠাৎ মরে গিয়েছে। কমলেশ আর জয়ন্তী যেন মুগ্ধ হরিণ-হরিণীর মত, কথা বলার সব আবেগ হারিয়ে শুধু নীরবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে।

রাংতুন থেকে একবার এসেছিলেন অতুলবাবু। আবার বাগানে চলে গিয়েছেন। যাবার আগে শুনে খুশি হয়ে গিয়েছেন, বার্চহিল রোডের কমলেশ এসে চা খেয়ে গিয়েছে। যাবার আগে মনতোষবাবুর সঙ্গে একটা জরুরী বিষয় আলোচনা করেও গিয়েছেন।

জলাপাহাড় রোডের বাড়িতেও জয়ন্তী এসেছে। চা খেয়েছে। তারপর কমলেশের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেড়াতে চলে গিয়েছে। কোথায় কতদূরে, সে খবর রাখেন না কাকিমা। বোধ হয় বেড়াতে বেড়াতে প্যারেড গ্রাউণ্ড পার হয়ে ওরা ক্যাণ্টনমেণ্ট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দেখে খুশি হয়েছেন কাকিমা, দুটিতে বেশ ভাব হয়েছে।

বার্চ হিল রোডের বাড়িতে লনের আশেপাশে অর্কিডের স্তবকের কাছে দাঁড়িয়ে সেদিন যখন জয়ন্তীর হাত ধরে ফেলে কমলেশ, তখন সন্ধ্যা শেষ হয়ে এসেছে, আর ড্রইং রুমের ভিতরে আলো চমকে উঠেছে।

কমলেশ বলে—আমার ছুটির আর মাত্র এক মাস আছে জয়ন্তী।

জয়ন্তী—তাহলে মিছিমিছি কেন আর হাত ধরছো?

কমলেশ—এতদিনে তোমাকে জানতে পেরেছি, তাই।

এই সত্য জয়ন্তীও অস্বীকার করে না। জয়ন্তীর হাতটা ধরে রেখেছে কমলেশ, একটুও আপত্তি করেনি জয়ন্তী। দু'জনেই দু'জনকে জানতে পেরেছে। কোন ভুল নেই, রূপকথার মেয়ের মত রঙীন রূপে সাধে আর শিক্ষায় সুন্দর এই মেয়েকে কাছে বসিয়ে রাখতে কমলেশের ভাল লাগে। জয়ন্তীরও ভাল লাগে কমলেশ নামে এই রূপের আর গুণের মানুষটির কাছে বসে থাকতে। সেদিন রাগ করে যে কথাটা মনে মনে বলে ফেলেছিল। জয়ন্তী, আজ মনে হয়, সেই কথাটার মধ্যে একটা ভুল ছিল। রাগ করে ধারণা করার ভুল নীৎসের ভয়ানক সুপারম্যানের শক্ত শক্ত নিষ্ঠুরতাগুলি বাদ দিলে যা থাকে, ঠিক তাই নয়, তার চেয়ে অনেক ভাল ; কবিদের কথায় যাকে বলে—তরুণ শিবের মত সকলসুন্দর একটি মানুষ।

জয়ন্তীকে ভাল লাগে, মনে প্রাণে বুঝতে পারে কমলেশ। জয়ন্তীও যে বুঝে ফেলেছে, কমলেশ নামে এই মানুষটিকে মনে-প্রাণে ভাল লেগেছে। আর, সেইজন্যই বোধহয় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াকে আর দূরের চা-বাগানের থরে থরে সাজানো সবুজকে দেখতে নতুন করে এত ভাল লাগছে।

ড্রইং-রুমের নিভৃতেও এসে একই। কৌচের উপর পাশাপাশি বসে থাকে কমলেশ আর জয়ন্তী। কমলেশ বলে—একটি প্রশ্ন করবো?

—কি প্রশ্ন?

—খজুরাহোতে কন্দর্য মহাদেবের মন্দিরতোরণের কাছে তুলি ছুটে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিলে, মনে আছে কি?

—মনে আছে।

—কেন, কিসের জন্যে?

জয়ন্তী হাসে—আজ মনে হচ্ছে, তোমারই জন্য?

—আমাকেও কি একটা পাথর বলে মনে হয়েছিল?

—সেদিন মনে হয়েছিল বটে।

—আজ আমাকে কি মনে হচ্ছে?

—আমাকে তোমার যা মনে হচ্ছে।

জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে কমলেশের চোখের দৃষ্টি যেন উতলা নিঃশ্বাসের দোলায় বিহ্বল হয়ে দুলতে থাকে। কমলেশের দু'হাতের দুই শক্ত মুঠোর মধ্যে বন্দী হয়ে জয়ন্তীর দুটি হাত একটি মত্ত শিহরের ছোঁয়া অনুভব ক'রে শিউরে ওঠে। কি ভাল লাগে? কেন ভাল লাগে? দুটি প্রশ্নের উত্তর এক নীরব আবেগের সঙ্গীতের মত দুটি বক্ষের নিঃশ্বাসের মধ্যে বেজে উঠেছে। দু'জনে দু'জনের দুই সুন্দর শরীরের সব স্পন্দনের ধ্বনি লুব্ধ হয়ে শুনছে। যে ভঙ্গী দেখতে পেলে পাথরের মিথুনও চোখ বড় করে তাকাবে, স্বাস্থ্য ও সুন্দরতার দুটি শোণিতময় দেহ যেন সেই ভঙ্গীই খুঁজছে। আলো জ্বলছে, ড্রইং-রুমের দরজা খোলা, সবই বোধহয় ভুলে গিয়েছে ভাল-লাগার আবেগে উন্মনা দু'টি মানুষ।

কমলেশ ডাকে—জয়ন্তী।

জয়ন্তী—বল।

কমলেশ—বলবার কিছুই নেই।

জয়ন্তী—আমিও কিছু বলতে চাই না।

কিন্তু আপত্তি করলো একটি মোটর-কারের হর্ণের হঠাৎ শব্দ। ফটক খুলে দিচ্ছে রাম সিং, এবং গাড়িটা রোডের উপর থেকে গোঁ গোঁ করে সবেগে ফটক পার হয়ে বারান্দার কাছে এসে দাঁড়ালো। ধকধক করছে গাড়ির এক জোড়া হেড লাইট। সেই সঙ্গে গাড়ির ভিতর হুল্লোড় করে চেঁচিয়ে ওঠে এক পাল ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে। জয়ন্তীদি! জয়ন্তীদি!

কমলেশের মুখের দিকে ব্যথিতভাবে তাকিয়ে থাকে জয়ন্তী। কমলেশ বলে—কারা যেন এসেছে।

জয়ন্তী বলে—কার্সিয়াং থেকে ভক্তি পিসিমা এসেছেন।

—আমি আজ তা'হলে আসি?

—আসুন।

ছয়

কাকিমা বললেন—তোর কাকার ইচ্ছে, এইবার অতুলবাবুর সঙ্গে একবার আলোচনা ক'রে বিয়ের কথাটা পাকাপাকি ক'রে ফেলাই উচিত।

চমকে ওঠে কমলেশ—কার বিয়ে?

কাকিমাও আশ্চর্য হন—তোর আবার কার? জয়ন্তীর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা।

কমলেশ—না, তোমরা না বুঝে-সুঝে এসব ব্যাপারে হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠবে না।

কাকিমা রাগের সুরে বলেন—বুঝতে কি আর বাকি আছে? তোরা কি বুঝিয়ে দিতে কিছু বাকি রেখেছিস?

কমলেশ—খুব ভুল বুঝেছ তোমরা।

বুঝতে কোথায় ভুল হলো, চুপ করে ক্ষুব্ধ মনে তাই বুঝতে চেষ্টা করেন কাকিমা। আর,

কমলেশ ঘরের ভিতরে গিয়ে বন্ধ জানালার কাঁচে কুয়াশার প্রলেপের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, সত্যিই তো, বিয়ের কথা শুনেই মনটা এত জোরে আপত্তি করে উঠলো কেন?

মনের ভিতরে একটা লজ্জাকর ক্লেশ অস্বস্তি ছড়াতে থাকে। ঝোঁকের মাথায় খুবই খারাপ একটা অন্যায় করে চলেছে তার এই কদিনের দার্জিলিং-এর জীবন। জয়ন্তী নামে ঐ মেয়েকে ভালবাসবার জন্য জীবনটা যেন একেবারে হন্তদন্ত আর ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মনটাই বিশ্বাস করতে পারছে না যে, সত্যিই ভালবাসতে পারা গিয়েছে। নইলে বিয়ের কথা শুনেই মনটা চমকে আর ভীরু হয়ে পিছিয়ে যায় কেন?

সেই গাড়ির হঠাৎ হর্ণের শব্দটাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে। মস্ত বড় একটা ভুল থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ঐ শব্দটা। জয়ন্তীকে ভাল লাগে ঠিকই ; কিন্তু কি ভাল লাগে? সেই সন্ধ্যার সেই ভুলের ইচ্ছাটাই এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে দিয়েছে। আর, গাড়ির হর্ণ সেই ইচ্ছাটাকে হঠাৎ একটা রূঢ় শব্দের আঘাত হেনে চমকে দিয়ে দুঃসহ লজ্জা পাইয়ে দিয়েছে। ড্রইং-রুমের কৌচের উপর পাগল হয়ে ওঠা খেয়ালটার জন্যই কি বিয়ে? তবে সত্যিই বিয়ে করবার দরকার কি? আর জয়ন্তীকেই বা বিয়ে করবার দরকার হবে কেন?

মাথাটা দপ্‌দপ্ করে, চিন্তাগুলি যেন নিশ্চিন্ত একটা মীমাংসা খুঁজে পায় না। এক এক সময় মনে হয়, নিজেরই বিরুদ্ধে ভণ্ডামি করছে কমলেশ। আবার মনে হয়, সে নিজেই একটা ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। কিন্তু জয়ন্তীকে বিয়ে করবার জন্য কোন ইচ্ছা যে আজও ব্যাকুল হয়ে উঠছে না, এটুকু বুঝতে অসুবিধে নেই।

চিন্তাটা মাথার ভিতরে ক্লান্তি ধরিয়ে দিচ্ছে। জয়ন্তীকে বিয়ে করতে ইচ্ছা হোক্, এইটুকুর জন্য নীরবে প্রার্থনা করছে কমলেশের মন। নইলে, এতদিনের এত দেখা শোনা আর জানার সব আনন্দ যে কতগুলি হীন জুয়াচুরির আনন্দ হয়ে যাবে।

কি ভাবছে জয়ন্তী? মনে পড়তেই জয়ন্তীর উপর রাগ হয়। জয়ন্তীই বা কেন কোন আপত্তি না ক'রে নিজেকে এমন ক'রে ধরা পড়িয়ে দিল? জয়ন্তী কি নিজেকে শুধু একটা এলিয়ে পড়া সুন্দর আর নরম শরীর বলে মনে করে?

বার্চহিল রোডের বাড়িতে ভক্তি পিসিমাও বুঝতেই পারছেন না, কেন এমন ক'রে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বিছানার উপর পড়ে আছে জয়ন্তী। জয়ন্তীর মুখটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তবু বুঝতে পারা যায়, মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

অতুলবাবু বলেন—থাক্, ওকে আর কিছু জিজ্ঞেসা করিস না ভক্তি। আমার মনে হয়, ওর মার কথা মনে পড়ে কাঁদছে।

ভক্তি পিসিমা বিচলিতভাবে বলেন—মার কথাই বা হঠাৎ মনে পড়লো কেন?

অতুলবাবু—মনে পড়বার একটা কারণ এই যে, আজ ওর বিয়ের কথা শুনে সব চেয়ে খুশি হয়ে উঠতো যে মানুষটা, সে-ই আজ নেই। অথচ ওর বিয়ের কথা একরকমের...। বলতে গিয়ে অতুলবাবুর চোখও ছলছল করে।

ভক্তি পিসিমা—কার সঙ্গে বিয়ে? ছেলেটি কি করে?

অতুলবাবু—খুব ভাল ছেলে। জলাপাহাড় রোডের মনতোষবাবুর ভাইপো কমলেশ, মীরাটে থাকে, ইঞ্জিনিয়ার।

মুখ তোলে জয়ন্তী—বিয়ের কথা চলছে কেন?

অতুলবাবু অপ্রস্তুত হন—আমরা তো বুঝেছি, এইবার বিয়ে হয়ে যাওয়াই উচিত।

জয়ন্তী—না।

আশ্চর্য হন অতুলবাবু—কেন?

জয়ন্তী—বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।

—থাক তবে। অতুলবাবু উঠে দাঁড়ান, অতুলবাবুর এত শান্ত আর স্নেহার্দ্র গলার স্বরেও

যেন বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে।

জয়ন্তী বলে—তুমি কিছু মনে করো না।

অতুলবাবু—না, কি আর মনে করবো যদি কখনও ইচ্ছে হয় তো বলিস।

অতুলবাবু চলে যেতেই ভক্তি পিসিমা ফিসফিস ক'রে বলেন—বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না কেন জয়ন্তী? বল, আমার কাছে একটু খুলেই বল। ছেলেটির সঙ্গে চেনাশোনা আছে?

—হ্যাঁ।

—ছেলেটি কেমন?

—খুব ভাল।

—তবে?

—তবুও বিয়ের কথা ভাবতে ভাল লাগছে না।

—তাহলে বল, ভয় করছে।

—ভয় করছে বৈকি। বিয়ে মানে ঐ, সেই তো, ও আর কতদিন ভাল লাগবে?

ভক্তি পিসিমা যেন শিউরে উঠলেন। আর কোন কথা না বলে নিজের কাজে চলে গেলেন। কাজ বলতে তাঁর ঐ একটি কাজ, উল বোনা। গল্পে আছে ভক্তি পিসিমা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও উল বুনতে পারেন। একটাও ঘর ভুল হয় না।

এই ক'দিনের জানাজানির জীবনে কিছুই তো খারাপ লাগেনি। বরং আরও ভাল লেগেছে। সন্ধ্যার ড্রইং-রুমের নিভৃতে বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ওঠা সেই ইচ্ছার ব্যাকুল ঝঞ্ঝাকেও ভালই লেগেছে ; এই সত্য অস্বীকার করতে পারে না জয়ন্তীর মন। কাঁটার মত মনের ভিতর বিঁধছে, শুধু সেই প্রশ্ন—যে-মানুষকে চিরজীবনের বান্ধব বলে বরণ করে নেবার কথা কখনো মনে হয়নি, তার হাতের মুঠোর মধ্যে হাত ছেড়ে দিলে কেন?

বিয়ের কথা ভাবতে ইচ্ছা করে না, এ যে আরও এক লজ্জাহীন রহস্য। রহস্যটা যেন জয়ন্তীর এই সুন্দর দেহের আর মনের সব সম্মানের ছবিটাকেই ঠাট্টা করছে আর ঠুকে ঠুকে সব রং ঝরিয়ে দিচ্ছে। কমলেশ তার জীবনের কাছে হঠাৎ-পাওয়া এক রূপকথাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। জয়ন্তীও তার জীবনের কাছে ছুটে আসা তরুণ শিবের মত সকল সুন্দর এক সুপারম্যানের কাঁধে মাথা রেখেছিল। বাস্, জানাজানির জীবন এই পর্যন্ত এগিয়ে এসে ঐ ভাবে আঁকা হয়ে পড়ে থাকলেই তো ভাল ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য মুখোসপরা ডাকাতের মত কতকগুলি ভয়ানক নিঃশ্বাস যেন হঠাৎ এসে সেই শান্ত ভঙ্গির ছবিটাকে ভেঙ্গেচুরে দিয়ে একেবারে বুকের রক্ত দাবী করে বসলো। আপত্তি করতে পারেনি জয়ন্তী, আপত্তি করেনি কমলেশ, শুধু গাড়ির হর্ণটা আর্তনাদ করে উঠেছিল বলেই সেই ইচ্ছার গ্রাস থেকে সরে যাবার সুযোগ হয়েছিল।

কিন্তু, আজই আবার তো দেখা হবে। কমলেশ কি না এসে পারবে? এখুনি রাংতুন চলে গেলে কেমন হয়? বিকাল শেষ হয়ে আসছে। এখন যাওয়াই বা যায় কেমন করে?

চুপ করে দু'হাতে মাথা টিপে ধরে শুধু ভাবতে থাকে জয়ন্তী, আর মনের ভিতরটাও মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক আতঙ্কে শিউরে ওঠে। সত্যিই অদ্ভুত। ভাল লাগছে না ; সেই পাগল ইচ্ছাটার উপরে ভয়ানক ঘেন্না হচ্ছে। তাই পালিয়ে যেতে চায় জয়ন্তী।

সারা সকালটা অর্কিডের যত্ন করতে করতেই জয়ন্তীর সময় ফুরিয়ে গেল। আসেনি কমলেশ।

রাংতুনের কুঠিতে এভিয়ারীর রঙীন কালিজের দল এখন কেমন আছে কে জানে? কতদিন ওদের যত্ন করা হয়নি। এই ক'দিন জীবনের সব চেয়ে আদরের কাজগুলিকেই যেন ভুলে গিয়েছিল জয়ন্তী। এক এক করে মনে পড়ছে।

লণ্ডন থেকে দুটি প্যাকেট আজ চারদিন হলো এসে টেবিলের উপরেই পড়ে রয়েছে।

দুটি অ্যালবাম। রেমব্রান্ট আর ভ্যান গোগ। প্যাকেট দুটো খুলে দেখবারও সময় হয়নি। শুধু ঘুরে বেড়িয়ে সময় ফুরিয়েছে।

শেল্‌ফের বইগুলিতেও যে ধুলোর আবরণ পড়েছে। এই ক'দিনের মধ্যে একটিবারও, দশ মিনিটের জন্যও, একটা বই স্পর্শ করবার সুযোগ হয়নি। স্পিনোজা'র শেষ ভল্যুমের শেষে পঞ্চাশটা পাতা বাকি আছে। আজ পর্যন্ত বাকি রয়েই গিয়েছে। পড়বার সময় হয়নি।

গান? জয়ন্তীর গলাটা যে গাইতে জানে, সেটাও যেন এই ক'দিন ভুলেই গিয়েছিল জয়ন্তী। ভক্তি পিসিমা আজ গানের কথা বারবার বললেন বলেই স্বরলিপির বই আর এসরাজটার দিকে জয়ন্তীর চোখ পড়েছে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই কদিনের জানাজানির জীবনে কমলেশ তো কত কথাই বলেছে, আর জয়ন্তীর কান দুটোয় সে-সব কথা শুনে শুনে মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু কই? একদিনের জন্যও কমলেশ তো জয়ন্তীর এই আদরের জগ'তের কোন রূপ দেখবার জন্য ভুলেও একটু আগ্রহ, এক বিন্দু কৌতূহলও দেখালো না? জয়ন্তীর হাতের উড-কাট এচিং আর অয়েল, কত গুণীর মানুষের চোখ যা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, তার রূপ দেখবার জন্য কমলেশের চোখে কোনদিন একটু পিপাসার সাড়াও দেখতে পাওয়া যায়নি। জয়ন্তী গান গাইতে জানে কি না, এই প্রশ্নটাও কোনদিন ভদ্রলোকের মনে মুখর হয়ে ওঠেনি। নইলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করতো, তা হলে কিসের জন্যে? তাহ'লে কি ভাল লাগলো? শুধু সেই, সেই একটা ইচ্ছাকে আর এই একটা চেহারাকে?

বিকাল হয়েছে। বারান্দার উপর চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে উল বুনছেন ভক্তি পিসিমা। এবং তেমনি চোখ বন্ধ রেখে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হঠাৎ ডাক দিলেন—দেখ তো জয়ন্তী, সেই ছেলেটিই বোধহয় এসেছে।

চমকে ওঠে জয়ন্তী। বুঝতে পারে, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঠিকই দেখেছেন ভক্তি পিসিমা। গেট পার হয়ে কমলেশই লনের কিনারা ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে এদিকে আসছে।

ভক্তি পিসিমা বলেন—আমি ভিতের যাচ্ছি জয়ন্তী, তোরাই এখানে বসে গল্প কর।

যা দেখবে বলে ভয় করেছিল জয়ন্তী, তার কিছুই দেখা গেল না। কমলেশ হাসছে। চেহারাটাকে যেন একেবারে বদলে একেবারে শান্ত ও স্নিগ্ধ করে নতুন মূর্তি ধরে কমলেশ এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুব্ধ নয়, লজ্জিত নয়, ব্যথিত নয়, মুগ্ধ নয়, লুব্ধও নয়।

কমলেশ বলে—এইবার মীরাট ফিরে যাবার কথা মনে পড়েছে। তাই ভাবলাম, যাই। আর্টিস্ট জয়ন্তীর হাতের আঁকা যত ছবি দেখে, আর যদি রাজি হয় তো, জয়ন্তীর গলার গান শুনে চলে যাই।

জয়ন্তী চুপ করে দাঁড়িয়ে কমলেশের কথাগুলিকে যেন দু'চোখের অপলক নিবিড়তা দিয়ে শুনতে থাকে। কমলেশ তেমনই খুশির স্বরে আবার বলে ওঠে—আমি সব শুনেছি। শুধু...।

যেন একটা লজ্জার আঘাত পেয়ে হঠাৎ থমকে যায় কমলেশের মুখের ভাষা। তার পরেই বলে—শুধু এই কদিনের ছুটোছুটির জন্য ভুলেই গিয়েছিলাম যে—!

জয়ন্তী আস্তে আস্তে বলে—কি ভুলে গিয়েছিলেন?

কমলেশ বিব্রতভাবে বলে—আপনার জীবন হলো যত সুন্দর সুন্দর গান ছবি রং আর ফিলসফির জীবন।

জয়ন্তী—আমিও যে ভুলে গিয়েছি...

কমলেশ—না না, আপনি কোন ভুল করেননি।

জয়ন্তী হাসে—আমিও তো অনেক কিছুই শুনেছি, কিন্তু আপনার কাছ থেকে শুনতে ভুলে গিয়েছি।

কমলেশ চমকে ওঠে—কি শুনলেন? কার কাছ থেকে শুনলেন?

জয়ন্তী—বাবাই বলেছেন ; সারা ইণ্ডিয়ার মধ্যে যাঁর মত ভাল টেকনোলজিস্ট খুব কমই দেখা যায়, তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসাও করতে পারিনি যে, তাঁর আদরের জগৎটা দেখতে কেমন?

কমলেশ—দেখতে খুব ভাল। প্রথম প্রথম দেখে হয়তো আপনারও ভাল লাগবে না। কিন্তু একবার ঐ মেসিনের যত মান-অভিমান চালাকি রাগ আর ফূর্তির রহস্যটার ভিতরে গিয়ে উঁকি দিতে পারলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। এক শো পঁচিশ কিলোওয়াটের এক একটা দুর্দান্ত যখন বিদ্রোহ করে বসে, তখন হিমসিম খেতে হয়। কোথায় কোন্ এক ছোট্ট পিনের ফাঁকে ফেল্টের একটা কুচি লুকিয়ে রেখে কমপ্রেসরগুলো যেন সারাদিন ঠাট্টা করতে থাকে ; সব এয়ার প্রেসার আর ম্যাগনেটিক অ্যাকশন বানচাল হয়ে যায়।

চুপ করে যেন নিজের আদরের জগৎটাকে স্বপ্নালু চোখ নিয়ে দেখতে থাকে কমলেশ। জয়ন্তী বলে—কি হলো, থেমে গেলেন কেন?

কমলেশ—একটা ইচ্ছে আছে। অ্যাটমিক রিসার্চে চলে যাবার জন্যে মাঝে মাঝে বড় লোভ হয়। সেটা আরও মজার মায়ার ও আশ্চর্যের খেলা।—আপনি কি সায়েন্সের কিছুই জানেন না?

জয়ন্তী হাসে—জানি বৈকি। এইচ-টু-ও হলো জল।

কমলেশও হাসে—বুঝলাম, আমি যেমন ফিলসফার আপনিও তেমনি সায়েন্টিস্ট।—কই, আপনার হাতে আঁকা ছবি?

কোন উত্তর না দিয়ে আনমনার মত চোখ ফিরিয়ে লনের দিকে তাকিয়ে থাকে জয়ন্তী। মুখটা হঠাৎ যেন বেদনার্ত হয়ে ওঠে। তারপরেই হাসতে চেষ্টা করে—না, আজ নয়। যেদিন মীরাট রওনা হবেন, সেদিন যাবার আগে একবার এসে দেখে যাবেন।

—তারপর?

—তারপর আর কি? যদি ইচ্ছে হয় তবে মীরাট থেকে একটা চিঠিতে জানাবেন, ছবিগুলি দেখতে কেমন লাগলো! অনায়াসে হেসে হেসে বলতে থাকে জয়ন্তী।

যে প্রশ্নের উত্তর শোনবার জন্য এই বিকালে জলাপাহাড় রোড থেকে বার্চ হিল রোডের এই বাড়িতে আজ এসেছে কমলেশ, সেই প্রশ্নের উত্তর শোনা হয়ে গেল। সারা রাত এই প্রশ্নটাই কমলেশকে ঘুমোতে দেয়নি। জয়ন্তীকে বিয়ে করবার জন্য কমলেশের মনের ভিতর কোন আগ্রহ আকুল হয়ে ওঠে না। জয়ন্তীর মনেরও কি এই দশা? যদি তাই হয়, তবেই ভাল।

যাক, ভয়াতুর সন্দেহটাকে একেবারে নির্ভয় করে দিয়েছে জয়ন্তী। আমিও যে তোমার সঙ্গে মীরাটে যাব, এমন ইচ্ছা বা আশার দাবী করে বসেনি জয়ন্তী। মীরাটের মানুষকে ভালভাবেই বিদায় করে দেবার জন্য তৈরী হয়ে আছে ওর মন।

কমলেশ হাসে—মীরাটে যাবার আগে আপনার কাছে আমারও যে একটা কীর্তি দেখাবার ইচ্ছে আছে।

জয়ন্তী—বলুন।

কমলেশ—দেখবেন তো?

জয়ন্তী—নিশ্চয়।

কমলেশ—আমার সঙ্গে টেনিস খেলবেন।

জয়ন্তী হেসে লুটিয়ে পড়ে—ওরে বাবা! গ্লাসগোর ব্লু, তার সঙ্গে টেনিস খেলতে গিয়ে শেষে কি...।

কমলেশ—আপনার খেলা দেখবার জন্য আমার কোন লোভ নেই। আপনি আমার খেলার কেরামতিটা একটু দেখবেন, এই লোভ?

জয়ন্তী—তারপর?

কমলেশ হাসতে থাকে—তারপর যদি ইচ্ছে হয় তবে একটা চিঠিতে জানিয়ে দেবেন, আমার টেনিসের হাত ভাল লাগলো কি না।

গম্ভীর হয় জয়ন্তী—প্রতিশোধ নিতে চান, তাই না?

কমলেশের মুখের চেহারা হঠাৎ করুণ হয়ে ওঠে—না জয়ন্তী ক্ষমা চাই।

চমকে ওঠে জয়ন্তী—আমার কাছে ক্ষমা চাইছ! কি অপরাধ করেছ তুমি?

কমলেশ—ঠিক বুঝতে পারছি না, তাই বলতে পারছি না।

কাছে এগিয়ে আসে জয়ন্তী। শান্ত অথচ উজ্জ্বল দুটি চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—বল। কি বুঝতে পারছো না?

কমলেশ—তোমাকে সত্যিই ভালবাসি কিনা বুঝতে পারছি না।

—সত্যি কথাই বলেছ। থর থর স্বরে কথাটা বলেই মুখ ফিরিয়ে নেয় জয়ন্তী।

কথা বলতে গিয়ে গলার স্বরটাকে চেপে দেয় কমলেশ—তুমিও তো সত্যি কথাটা বলতে পার।

জয়ন্তী—আমিও যে বুঝতে পারছি না। মিথ্যেই তোমাকে ক'দিনের জন্য কাছে ডেকে এনে শেষে অপমান করতে হলো!...কিন্তু একটি কথা বলবো কি?

কমলেশ—বল।

জয়ন্তী—আমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে তোমার?

কমলেশ—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার?

জয়ন্তী—হ্যাঁ।

কমলেশ—তাহ'লে আমার আর কোন দুখ নেই।

জয়ন্তী হাসে—তাহ'লে চা খেয়ে যাও।

সাত

প্রজাপতির পাখার পরাগে বোধ হয় একটু ধুলোর ভেজালও থাকে। নইলে এত জানাজানির পর, এবং সেই জানাজানির এক একটি হর্ষ আবেগ ও স্পর্শকে এত ভাল লাগবার পর, আর ভাল লাগাবার মত কি বাকি থাকে যে, চিরজীবনের সঙ্গী হবার জন্য দুটি প্রাণের মধ্যে কোন আকুলতা পাগল হয়ে ওঠে না?

ভালবাসতে ইচ্ছা করে। প্রশ্ন হলো, কেন, ভালবাসবো? এত দেখা শোনা ও জানার পরেও যে এমন একটা প্রশ্ন দু'জনের জীবনের মাঝখানে ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এও তো একটা দুর্বোধ্য রহস্য। কমলেশের মন আর বুদ্ধি এই রহস্যের টেকনোলজি ধরতে পারে না। জয়ন্তীর মনের ফিলসফিও বোধহয় এই রহস্যের কূলকিনারা করতে পারে না।

মীরাট যাবার তারিখটা এগিয়ে দিতে চায় কমলেশ। ঠিক কবে রওনা হবে, তাও অবশ্য ঠিক করতে পারে না। তবে আজ নয়, কালও নয়।

এই রকমেরই বেঠিক মনের অবস্থার মধ্যে, পথে বেড়াতে বের হয়ে, হঠাৎ একদিন কলকাতার বন্ধু মাধবের ডাক শুনে চমকে খুশি হয়ে ওঠে কমলেশ।

মাধব বলে দার্জিলিং-এ আমাদের যে একটা বাড়ি আছে, তা তুমি জানতে না?

কমলেশ—না।

মাধব—তবে চল। এখনি চল। আমি মাত্র আজকের দিনটাই এখানে আছি। ভাগ্যিস তোমার কাকার সঙ্গে ম্যাল-এ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনিই বললেন, তুমি বেশ কিছুদিন ধরে এখানে আছ।

মাধবের বাড়িতে যেতে বার্চহিল রোডটাকে পার হতে হয়, এবং গল্প করতে করতে

জয়ন্তীদের বাড়ির গেটের সম্মুখটাও পার হয়ে যেতে হলো। দেখতেও পাওয়া যায়, জয়ন্তীর যত্নের অর্কিড লনের চারদিকে রঙীন হাসির স্তবক ফুটিয়ে রেখেছে।

মাধব বলে—এই বাড়ির মেয়েকে কখনো চোখে পড়েছে?

কমলেশ চমকে ওঠে—হ্যাঁ, অনেকবার।

মাধব—দেখলে কিন্তু ঐ মেয়েকে কিছুই চেনা যায় না।

কমলেশ হাসে—তা তো বটেই। দেখে আর কতটুকু চেনা যায়?

মাধব—আমরা কিন্তু ওকে বেশ চিনি। তার কারণ ওর সবই জানি।

মাধবদের বাড়ির বারান্দার উপর উঠে চেয়ারে বসতেই মাধব চা আনবার জন্য খানসামাকে একটা হাঁক শুনিয়ে দিয়ে যেন একটা নির্মম অজাগতিক বিস্ময়ের গল্প গড়গড় করে বলতে থাকে।—ঐ মেয়ে, সে আজ প্রায় ছ-সাত বছর আগেকার কথা, কোন্ এক স্টেটের এক প্রিন্সের সঙ্গে খুব ভাব করেছিল। আমি নিজে দেখেছি, এই পথ দিয়ে সেই প্রিন্স বন্ধুর সঙ্গে একই গাড়িতে বসে জয়ন্তীও শিকার থেকে ফিরছে।

—শিকার ক'রে? কমলেশের মনের ভিতরে একটা রঙীন আর মায়াময় রূপকথা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

মাধব বলে—হ্যাঁ, শিকার করে ; দস্তুর মত বন্দুক দিয়ে গুলি ক'রে মেরে রঙীন রঙীন পাখীর এক একটা বোঝা নিয়ে ওরা ফিরতো। একদিন দেখলাম, এক জোড়া কাকার হরিণ, অর্থাৎ বাকিং ডিয়ারের রক্তমাখা চেহারা গাড়ির কেরিয়ারে বাঁধা রয়েছে।...যাই হোক, এসব কাজের জন্য কোন নিন্দে করছি নাষ অতুলবাবু ভয়ানক দুঃখ পেয়েছিলেন যেজন্য, সেটা হলো...।

চা আসে। চা-এর কাপে চুমুক দিয়ে মাধব বলে—সেই শিকারী প্রিন্সটার সঙ্গে একদিন সিঞ্চল ডাক-বাংলোতে রাত কাটিয়ে ঐ মেয়ে সকাল বেলা বাড়ি ফিরে এসেছিল।

চা-এর কাপে চুমুক দিতে গিয়ে ভুল ক'রে যেন একটা কামড় দেয় কমলেশ। হাতটা কাঁপতে থাকে।

মাধব বলে—এমনিতে সত্যিই অসাধারণ শিক্ষিত আর গুণী বটে অতুলবাবুর ঐ মেয়ে, তবু কি অদ্ভুত ব্যাপার জান, ঐ মেয়েই একদিন নিজের হাতে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে বুড়ো একটা সাধুকে বাড়ির বারান্দা থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। আমার বোন শিউলি তখন ওদের বাড়িতেই বেড়াতে গিয়েছিল। সেই বিশ্রী ব্যাপার দেখে শিউলিটা একেবারে হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিল।

কমলেশ—সাধুটা কোন বাজে কথা-টথা বলেনি তো?

মাধব হাসে—তেমন বাজে কথা কিছু নয়। বলেছিল যে, তুমি যার সঙ্গে প্রীত করতে চাও মিস সাহেব, সেও তোমাকে খুব প্রীত করে। জয়ন্তীর এই মেজাজের আসল কারণ এই যে...

চা-এর কাপ নামিয়ে রেখে মাধব বলে—দেখতে খুব সুন্দর বলে প্রচণ্ড একটা অহঙ্কার আছে, আর মনে করে যে, ওকে ভালবাসতে চাইবে না, এহেন মানুষই নেই পৃথিবীতে। অথচ...।

চুপ করে এই অজাগতিক গল্পের অঢেল গ্লানির প্রবাহটাকে যেন একটু থামিয়ে রাখে মাধব। সিগারেট ধরায় তারপরেই বলে, অথচ, ওর হার্টে বিশ্রী একটা ব্যথা আছে। অতুলবাবু সেইজন্য খুবই দুশ্চিন্তা করেন।...এইবার বল কমলেশ। কি-রকম টেক্‌নোলজি চালাচ্ছো? তোমার মা ভাল আছেন? বড়দা এখনো প্র্যাকটিস করছেন নিশ্চয়?

মাধবের সব প্রশ্নেরই উত্তর দেয় কমলেশ। উত্তরগুলি পিস্টন ভাঙ্গা মেসিনের শব্দের মত মাঝে মাঝে যেন খাং-খাং করে আর্তনাদ করে ওঠে।

আরও গল্প হয়। মাধবদের বাড়ির চারদিকে ঘুরে ফিরে, উপরতলার মেঝের নতুন

মোজায়িক দেখে, আর হলদে গোলাপের ঝাড় দেখে, তারপর যেন অচল ইঞ্জিনের মত স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কমলেশ।

—এখন তাহলে চলি মাধব। ক্লান্ত বিকৃত ও ধিক্কৃত একটা চেহারা নিয়ে, আস্তে আস্তে হেঁটে, অন্য পথে ঘুরে বাড়ি ফিরতে থাকে কমলেশ, যে-পথ থেকে বার্চহিল পার্কের কোন সবুজের ছায়াও চোখে পড়ে না।

বাড়িতে ঢুকতেই কাকিমা বলেন--শেষ পর্যন্ত কি ঠিক করলি?

কমলেশ--কিসের ঠিক?

কাকিমা—মীরাটে যাবার আগে যদি একটু স্পষ্ট করে বলে যাস, তবে ভাল হয়।

চেঁচিয়ে ওঠে কমলেশ—কি শুনতে চাও?

কাকিমা—অতুলবাবু যদি তোর কাকাকে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করে বসেন, তবে কিছু একটা উত্তর দিতে হবে তো।

কমলেশ--বলে দিও, বিয়ে হবে না, হতে পারে না।

কাকিমা--হতে পারে না কেন?

কমলেশ—ইচ্ছে করে না, ঘেন্নাও করে।

কাকিমা কথাটা কদিন আগে বললেই পারতিস। তবে আমরাও মিছিমিছি...। কথাগুলি বেশ একটু উত্তপ্ত স্বরে বলতে বলতে চলে গেলেন কাকিমা।

আলেয়া হলেও ভাল ছিল। কমলেশের চোখ দুটো সেই আবু পাহাড় থেকে শুরু করে এই দার্জিলিং পর্যন্ত একটা অপচ্ছায়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। জ্বলছে চোখ দুটো। জীবনের সব আনন্দের ভস্মের উপর যেন একটা হিংস্র ঠাট্টা গড়াগড়ি দিয়ে হাসছে। জুয়াচুরির রূপও এত রঙীন হয়ে সেজে থাকতে পারে? সিঞ্চল ডাক-বাংলোতে শিকারী প্রিন্সের সঙ্গে রাত কাটানো একটা লোভের উচ্ছিষ্ট এমন লজ্জাবতীর ঢং ধরে থাকতে পারে? হার্টের মধ্যে বিশ্রী ব্যথা পুষে রেখে একটা শরীর এমন সুস্থ সুন্দরতার ভঙ্গীও ধরে?

বেঁচে গিয়েছে কমলেশ। এতদিনের সব অঘটনের মধ্যে মাধবের সঙ্গে এই হঠাৎ দেখাটাই হলো একটা আশীর্বাদ। ফুলে ঢাকা একটা ডাস্টবিনকে রূপকথার নীড় বলে মনে করেছিল কমলেশ।

জলাপাহাড় রোডের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে নিজের ভুলগুলিকে যেন প্রাণ ভরে ঘৃণা করে করে শান্ত হতে চেষ্টা করে কমলেশ। যেন হেসে হেসে এই ক'দিনের ইতিহাসকে একটা ধিক্কার গিয়ে মীরাটে চলে যাওয়া যায়।

যাবার আগে ঐ মেয়ের হাতের আঁকা যত রঙীন রাবিশের উপর থুতু ছড়িয়ে দিয়ে চলে আসলে কেমন হয়? টেনিস খেলবার নাম করে ডেকে এনে খুব স্পষ্ট করে একবার বলে দিলে হয়, পৃথিবীর যত জীবজন্তুর মধ্যে তোমাকেই সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য বলে মনে করি।

আট

ভক্তি পিসিমা তাঁর ছেলেপিলেদের এখানে রেখে এখন শুধু একাই কার্সিয়ং-এ ফিরে যাবেন। উল বুনতে বুনতে মোটর গাড়িতে উঠে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন ভক্তি পিসিমা। তারপর ঘুমাতে ঘুমাতে বললেন—ওরা সব রইল জয়ন্তী। আমি অন্তত দশটা দিনের মধ্যে এদিকে আর আসতে পারবো না।

চলে গেলেন পিসিমা। জয়ন্তীর মনে পড়ে, আর মনে পড়তেই নিঃশ্বাসটা এলোমেলো হয়ে যায়, কবে মীরাট রওনা হবে কমলেশ? কম নয় তো, তিনটে দিন পার হয়ে গেল, আর আসেনি কমলেশ। ভালবাসতে চায় যে মানুষ, সে এরকম চেষ্টা করে দূরে সরে থাকে কেন?

নিজের ভুলটাও যেন মনে পড়ে যায়। এই অভিযোগ কমলেশও তো করতে পারে।

জলাপাহাড় রোডের বাড়িতে আর যায়নি জয়ন্তী। পাশাপাশি হেঁটে বেড়াবার আর কাছাকাছি বসবার আনন্দটাকেই ভয় পেয়ে সাবধান হতে হয়েছে। কিন্তু একবার গিয়ে, শুভা মাসিমার কাছে দাঁড়িয়ে সেই মানুষটির সঙ্গে দু-একটা কথা বলে আসতে দোষ কি?

একটা গাড়ি মিষ্টি স্বরের হর্ণ বাজিয়ে গেট পার হয়ে তরতর করে লাল কাঁকর মাড়িয়ে বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াল ; যে এসেছে তাকে চিনতে পারে জয়ন্তী, আর চিনতে পেরেই খুশি হয়ে হেসে ওঠে। ভক্তি পিসিমার দেবর নন্দবাবুর স্ত্রী সেই চিন্তনীয়া। চিন্তনীয়া জয়ন্তীর সিমলার বান্ধবীও বটে। পড়া ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ নন্দবাবুকে বিয়ে করে দিল্লী চলে গেল চিন্তনীয়া। তারপর থেকে আর দেখা নেই।

চিন্তনীয়া বলে—ভক্তিদি কি কার্সিয়াং ফিরে গেছেন?

জয়ন্তী—হ্যাঁ, এই তো চলে গেলেন। বড় জোর একঘন্টা হবে।

চিন্তনীয়া আক্ষেপ করে—ইস্, কি ভুলই হলো! ওখানে এতক্ষণ সময়ে নষ্ট না করলে ভক্তিদির সঙ্গে দেখাটা হয়ে যেত।

জয়ন্তী—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? নন্দবাবু কোথায়?

চিন্তনীয়া—জলাপাহাড় রোডে মনতোষবাবুর বাড়িতে এতক্ষণ ছিলাম। উনি সেখানেই রয়ে গেলেন। উনি আজই চলে যাবেন। মনতোষবাবুর সঙ্গে ওঁর দিল্লী অফিসের কি একটা কাজ আছে।

জয়ন্তী—তাহ'লে নন্দবাবুর সঙ্গে মনতোষবাবুর বেশ জানাশোনা আছে?

চিন্তনীয়া—আছে বৈকি। শুধু দিল্লী অফিসের কাজের সম্পর্কে নয়, মনতোষবাব র বড় ভাই পরিতোষবাবু, যিনি মীরাটে বাড়ি করেছিলেন, যিনি এখন আর নেই, তিনিই তো ওঁকে পার্টনার করে দিল্লীতে কারবার শুরু করেছিলেন। মরে যাবার আগে পরিতোষবাবু তাঁর স্বত্ব মনতোষবাবুর নামে ট্র্যান্সফার করে দিয়ে গেছেন।

জয়ন্তী—তা হলে ওদের সঙ্গে নন্দবাবুর খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলতে হবে।

চিন্তনীয়ার গলার স্বর হঠাৎ বড় বেশি মৃদু হয়ে যায়।—ঐ পরিবারের অনেক খবর উনি জানেন। বিশেষ করে যার সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন, সে'ও দেখলাম এখন ঐ বাড়িতে আছে।

জয়ন্তী—কার কথা বলছো?

চিন্তনীয়া—মনতোষবাবুর ভাইপো ; পরিতোষবাবুর ছেলে কমলেশ, ইঞ্জিনিয়ার ; দার্জিলিং-এ বেড়াতে এসেছে। কি আশ্চর্য, ওকে দেখলেই আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে জয়ন্তী।

জয়ন্তী—কেন? ভয়ানক প্রকৃতির মানুষ নাকি?

চিন্তনীয়া—না, এমনিতে স্বভাবটা খুবই ভদ্র, কোন নিন্দে করা যায় না, কিন্তু ভেতরে অনেক গলদ আছে।

জয়ন্তী যেন দম বন্ধ করে কোনমতে প্রশ্নটাকে উচ্চারণ করে—তার মানে?

চিন্তনীয়া—গলদ আছে বলা ঠিক নয়। গলদ ছিল। এখন অবশ্য...তু'ও বলতে পারি না জয়ন্তী, কার ভেতরে কি থাকে।

জয়ন্তী ভ্রূকুটি করে, আর, যেন একটা দুঃসহ চিৎকার চাপা দিতে চেষ্টা করে।—চোর ডাকাত বোধ হয়?

চিন্তনীয়া হেসে ফেলে—না না, চোর ডাকাত কেন হতে যাবে? হ্যাঁ, তবে একটা কাণ্ড করেছিল বটে।

জয়ন্তী—কিসের কাণ্ড?

চিন্তনীয়া—আই-এ পরীক্ষাতে ম্যাথমেটিক্‌সের পেপারটা বই দেখে বেপরোয়া চুরি করে লিখেছিল। ধরাও পড়েছিল। এক্সপাল্‌শনের অর্ডারও হয়েছিল। আমার শ্বশুর তখন বেঁচে,

তিনিই এদিকে-ওদিকে অনেক ধরাধরি করে কমলেশকে সে-যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

জয়ন্তী হাসে, হাসিটা ধিক্কারের মত।—তাহলে চুরি বিদ্যে দিয়েই বিদ্যে শুরু করেছিল?

চিন্তনীয়া—যাই হোক্, বিলেতে গিয়ে কিন্তু বিদ্যেতে ভালই বাহাদুরী দেখিয়েছে। তবে সেই সঙ্গে ঐ সেই বিদ্যেটি নিয়ে ফিরে এসেছে।

জয়ন্তী—কোন অবিদ্যা নিশ্চয়।

চিন্তনীয়া—হ্যাঁ, মদ খায়। দেখতে তো সত্যিই সুপুরুষটি, যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি রং, কিন্তু পেটে কি-রকমের একটা আলসারও আছে শুনেছি। উনিই বলেছিলেন।

জয়ন্তী—এর চেয়েও ভাল গুণটুন আর কিছু নেই?

চিন্তনীয়া লজ্জায় জিভ কাটে, আর ফিসফিস করে বলে—ছিল। সে-ও এক কেলেঙ্কারির ব্যাপার। কমলেশেরই এক বন্ধুর স্ত্রী আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

জয়ন্তী রুমাল দিয়ে উত্তপ্ত কান দুটো মুছতে চেষ্টা করে।—কেন?

চিন্তনীয়া—ভালবাসা।

জয়ন্তী—কে কা'কে ভালবেসেছিল?

চিন্তনীয়া—তা জানি না ভাই। উনি বলেছিলেন, দু'জনেরই সমান দোষ। সে যাত্রাও আমার শ্বশুর অনেক চেষ্টা করে কমলেশকে মস্ত একটা অপমানের মামলা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। যাক, পরনিন্দা অনেক হলো, এখন তোমার নিন্দা একটু করি।

জয়ন্তীর ঠোঁট দুটো কলের পুতুলের ঠোঁটের মত কেঁপে ওঠে—কর।

চিন্তনীয়া—তুমি বছরের মধ্যে একটা চিঠি দেবারও কি সময় পাও না?

জয়ন্তী—সময় পাই, কিন্তু...।

চিন্তনীয়া—খবর দেবার মত কিছু পাও না?

জয়ন্তী—খবর আছে, কিন্তু সেটা আর তোমাকে জানিয়ে লাভ কি?

চিন্তনীয়া—অ্যাঁ? আমাকে জানাবে না? বলছো কি জয়ন্তী? আমি যে আশায় আশায় শুধু দিন গুনি, এই বুঝি তোমার খবর এল।

জয়ন্তী—খবরটা এই যে, বুকের ভেতর বিশ্রী একটা ব্যথা দেখা দিয়েছে, অথচ মরছি না।

চিন্তনীয়া—ছিঃ, ওরকম করে বলো না জয়ন্তী। সত্যি, ভাল খবর কিছু নেই?

জয়ন্তী—থাকলে জানতেই পারতে।

চিন্তনীয়া—আজ তাহলে চলি জয়ন্তী।

জয়ন্তী—দার্জিলিং-এ আরও কিছুদিন থাকছো তো?

চিন্তনীয়া—না ভাই। কালই চলে যাব শিলিগুড়ি। তারপর বাঘডোগরা হয়ে সোজা বাই এয়ার দিল্লী পাড়ি দেব।

চলে গেল চিন্তনীয়া। আর, জয়ন্তী দু'চোখের উপর রুমাল চেপে নিঝুম হয়ে ড্রইং-রুমের নিভৃতে একটা মরা রঙীন পাখির মত পড়ে থাকে।

সুপারম্যান! হ্যাঁ, সুপারম্যানই বটে। নীৎসের সুপারম্যানও এই কাহিনী শুনলে ঘৃণায় শিউরে উঠবে। লোকটা দার্জিলিং-এ এসে যেন জয়ন্তীর জীবনটাকে ভুলিয়ে কাছে নিয়ে গিয়ে খুন করবার চেষ্টায় এত দিন ধরে ঘুরঘুর করেছে। সেই আবু পাহাড় থেকে এক সাংঘাতিক শ্বাপদের মতলব যেন জয়ন্তীর ছায়া শুঁকে শুঁকে দার্জিলিং পর্যন্ত তাড়া করে এসেছে।

নিজের মূর্খ চোখ দুটোকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। আর ঘৃণা করতে হয়, নিজেরই মনের যত স্বপ্ন, আর এই এত সাবধানী দেহটার যত ভুলগুলিকে। ভাবতে গেলে নিজেরই বুকটাকে নখ দিয়ে আঁচড়ে সব নোংরা নিঃশ্বাস বের করে দিতে ইচ্ছা করে। ঐ লোকটারই হাতে হাত রেখেছিল জয়ন্তী। ভাল লেগেছিল ঐ লোকটার স্পর্শ?

মীরাট চলে যাবে বলে বার বার মায়া ছড়াতে এসেছে। জয়ন্তীর হাতের আঁকা ছবি

দেখতে চায়, আর জয়ন্তীর সঙ্গে টেনিস খেলতে চায়। মতলবের জাল পেতে জয়ন্তীর জীবনটাকে মাতাল লোভের জন্য চিরকালের একটা খোরাক যোগাড় করতে দার্জিলিং-এ এসেছে মনোতোষবাবুর ঐ ভাইপো।

মানুষের উপরটা এত ভাল, আর ভিতরটা এত পচা হয় কি করে? যাক, এতদিনে চিনতে পারা গেল লোকটাকে।

কিন্তু, পোড়া সাপের মতো ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় জয়ন্তী। লোকটাকে প্রাণ ভরে অপমান না করা পর্যন্ত যে মনের এই জ্বালা নিভবে না। সে সুযোগ পাওয়া যাবে তো? ছবি দেখবার অছিলা করে সত্যিই একবার আসবে তো? না, বার্চহিল রোডের বাতাস থেকেই বিপদের গন্ধ পেয়ে পালিয়ে যাবে ধূর্ত লোভের এই প্রাণীটা?

জয়ন্তীর গায়ের শাড়িটা ক্রুদ্ধ তিব্বতী কালিজের রঙীন পালকের মত যেন ফেঁপে আর ফুলে ফুলে কাঁপছে। তারপরেই সব অস্থিরতা যেন একটা অবসাদ হয়ে সারা শরীরটাকে অবশ করে দেয়। এখনি রাংতুন চলে যাওয়া যেত, যদি ভক্তি পিসিমা এতগুলি কাচ্চা-বাচ্চাকে গছিয়ে না দিয়ে যেতেন।

চুপ করে বসে এই বঞ্চনাকে তুচ্ছ করবার চেষ্টা করে জয়ন্তী। আশাটাই ঠকেছে, জীবনটা ঠকেনি। ঠিক সময় বুঝে ভাগ্যেরই একটা কৃপার মত চিন্তনীয়া আজ এসেছিল, তাই লোকটাকে চিনতে পারা গেল। আর, আরও ভয়ানক ভুল থেকে জীবনটা বেঁচে গেল।

লোকটার উপর আর রাগ করাও উচিত নয়। রাগ করলেই যে ওকে সম্মান দেওয়া হয়। যার ঐ চেহারার ভিতরে আল্‌সার লুকিয়ে আছে, যার বুকের ভিতরে পুরনো ভালবাসার ক্ষত লুকিয়ে রয়েছে, যে বিদ্বানের জীবনে একটা চুরির ইতিহাসও আছে, তার উপর রাগ করলে যে নিজেকেও ছোট করা হয়।

সত্যিই মনটা এতক্ষণে যেন সব জ্বালা তাড়িয়ে দিয়ে, সব আক্ষেপের ভার দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শান্ত আর হালকা হয়ে ওঠে। শুধু নিজের শরীরটাকে বড় ময়লা বলে মনে হয়।

স্নান সেরে এসে, যেমন রোজ সন্ধ্যায় মনের মত ক'রে সাজে জয়ন্তী, এই সন্ধ্যাতেও তাই করে। আবু পাহাড়ের সেই দেখার ভুল থেকে শুরু করে এই দার্জিলিং-এর যত শোনার ভুল আর জানার ভুল পর্যন্ত সব ভুলের ক্ষতি যেন মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এইবার নিজের জগতের কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার জন্য তৈরী হয় জয়ন্তী।

শেল্‌ফ থেকে বই টেনে নিয়ে স্পিনোজার শেষ ভল্যুমের উপর চোখের সঙ্গে মন ঢেলে দিয়ে পড়তে থাকে।

ঠিকই, মানুষ বড় দুঃখ দেয়। তার চেয়ে অনেক ভাল, অনেক নিরাপদ ঐ পাখির মেলা, খরগোসের জ্বলজ্বলে রুবির মত লাল চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি অর্কিডের হাসি, আর পাগলাঝোরার জল। একা একা পথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন স্পিনোজা। একটি গাছের ছায়া দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই গাছটি হলো কমলালেবুর গাছ। সে গাছ ফুলে ফুলে ভরে রয়েছে। গাছের একটি শাখা হঠাৎ হাওয়ায় দুলে উঠলো। ফুলে ভরা সেই শাখা স্পিনোজার কান ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুলতে থাকে। হেসে উঠলো স্পিনোজার মুখ। আর, একটা কান কমলালেবুর ফুলের কাছে আরও এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলতে থাকেন স্পিনোজা—বুঝেছি, বুঝেছি, কি বলতে চাইছ মাই ডিয়ার ফ্লাওয়ার?

পড়তে পড়তে জয়ন্তীর সারা মুখে সুন্দর একটি তৃপ্তির হাসি যেন আভা জাগিয়ে ফুটে ওঠে। মানুষের মুখের কাছে কোন আশা নিয়ে কান পাতলেই ভুল করা হয়। কমলালেবুর ফুলের নীরব কথার অর্থ জানেন স্পিনোজা।

বই-এ সেটা লেখা নেই। জানতে ইচ্ছা করে জয়ন্তীর। মানুষের কথা বিশ্বাস করো না,

স্পিনোজাকে এই কথাটিই বোধ হয় বলেছিল পথের ধারে সেই কমলালেবুর গাছের ফুল।

হঠাৎ বই বন্ধ করে জয়ন্তী। যে মানুষটাকে সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাস করা উচিত, সেই মানুষটাই একটা ভয়ানক অহংকারের মূর্তি ধরে, চোয়াল শক্ত ক'রে, জোরে জোরে পা ফেলে এই বারান্দার দিকে আসছে।

জয়ন্তীর শান্ত মূর্তিটা একটুও কাঁপে না। যেন নিরেট পাথর হয়ে, শুধু একটি প্রশ্নকে মনের মধ্যে শানিত করে নিয়ে চুপ করে দেখতে থাকে জয়ন্তী। আসছে আসুক। সুযোগ পাওয়া গেলে শুধু একটি কি দুটি কথা বলে দিতে হবে। কিন্তু কি কথা বললে এই মুহূর্তে ঐ শক্ত চেহারার ধরা-পড়া চোরের মত ভীরু কাতর ও করুণ হয়ে পালিয়ে যাবে?

কমলেশ এসে বারান্দার উপর ওঠে, কিন্তু চেয়ারে বসে না। জয়ন্তী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

কমলেশ বলে—আপনার হাতের আঁকা ছবি দেখতে আসিনি। আপনাকে টেনিস খেলবার জন্য নেমন্তন্ন করতেও আসিনি। শুধু জানিয়ে যেতে এসেছি যে, আপনাকে চিনেছি।

জয়ন্তীও তার পাথরের মত শক্ত ও কঠোর মূর্তিটাকে টান করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।—আমাকে চেনবার সাধ্যি আপনার নেই।

—চিনেছি। চেঁচিয়ে ওঠে কমলেশ। শিকারী প্রিন্সের সঙ্গে ডাক-বাংলায় রাত কাটিয়েছেন যিনি, তাঁকে চিনেছি।

থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে জয়ন্তী। শক্ত ও কঠোর পাথুরে ভঙ্গীর মূর্তিটা যেন এক মুহূর্তে ঘুণ ধরে ঝরে পড়ে যাবে। ঝুপ করে চেয়ারের উপর বসে পড়ে জয়ন্তী। দু'হাত তুলে চোখ ঢাকে, আর বুকটা যেন থেকে থেকে ধুঁকতে থাকে।

কমলেশ বলে—চেহারাটাকে নিয়ে আর এত ঢং করবেন না। বুকের বিশ্রী ব্যথাটা বেড়ে যাবে।

আস্তে আস্তে চোখ তোলে জয়ন্তী—এ খবরটাও তাহলে পেয়ে গিয়েছেন?

কমলেশ—আরও অনেক কিছু জানবার সৌভাগ্য হয়েছে।

বেশ শান্ত অথচ উদাস স্বরে, হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করে জয়ন্তী—বলুন, আর কি জানতে পেরেছেন?

কমলেশ—ফিলসফির মেয়ে একটা বুড়ো মানুষকে চাবুক তুলে মারতে যায়। মেয়ে-জাতের মানুষ হয়েও নিষ্ঠুর ফূর্তি ক'রে হাসতে হাসতে রঙীন পাখী শিকার করে আনে। সুন্দর রূপকথা যে এমন একটি কুৎসিত নর্দমার কথা, সেটা কোনদিন কোন সন্দেহের ভুলেও ভাবতে পারিনি, তাই তার হাত...

জয়ন্তী বলে—বলুন, আর কি বলবার আছে?

কমলেশ—আর কিছু বলবার দরকার হয় না।

জয়ন্তী—বেশ। কিন্তু আমার একটি কথা বলবার আছে।

কমলেশ—কি কথা?

জয়ন্তী—আমাকে চিনতে পেরেছেন, ভালই হয়েছে। তবে আর এত রাগ করছেন কেন। এখন খুশি হয়ে চলে যান।

কমলেশ—নিশ্চয়। খুশি হয়েই চলে যাচ্ছি। সে-কথা আর কষ্ট করে বলতে হবে না।

জয়ন্তীর চোখের দৃষ্টি, অতি উচ্চশিক্ষিতা আর চমৎকার সৌজন্যের ও শোভনতার নিয়মে অভ্যস্ত এক নারীর চোখের দৃষ্টি কী অদ্ভুত রূঢ় হয়ে কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন একটা প্রতারকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জয়ন্তী। জয়ন্তীর চোখের এই চাহনিতে যেন একটা তীব্র জ্বালা ছটফট করছে। জয়ন্তী বলে—আমিও খুশি হয়েই বলছি, কষ্ট করে বলছি না।

—কি বলছেন?

—বলছি, যে মানুষ তার বন্ধুর স্ত্রীর আত্মহত্যার জন্য দায়ী, যার জীবনে বিশ্রী স্ক্যাণ্ডালের দাগ আর মামলার দাগ রয়েছে, তার পক্ষে জোর গলায় চেঁচিয়ে কথা বলা একটুও মানায় না।

—কী বললেন! তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কমলেশ।

—না বোঝবার ভান করবেন না, যা শুনেছি, যা সকলেই শুনেছে ও জেনেছে, সেই কথাই বলছি। পেটের ভিতরে আলসার পুষে রাখা, মদে ডুবে থাকা আর স্কুলের জীবনে বিদ্যা-চুরির গল্পটিকে চাপা দিয়ে রাখা বড় রকমের চালাকি হতে পারে। কিন্তু বড় রকমের মনুষ্যত্ব নিশ্চয় নয়।

কমলেশের মূর্তিটা যেন একটা পাথর। উত্তর দেয় না, প্রতিবাদ করে না কমলেশ।

আর এক মিনিটও দেরি করে না কমলেশ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফটকের দিকে তাকায় ; তারপরেই যেন আগুনের জ্বালা লাগা একটা আতঙ্কিত মানুষের মত যন্ত্রণার্ত অথচ করুণ মূর্তি নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যায়।

নয়

আর কি বাকি রইল? দেখা, শোনা, জানা আর চেনা হয়ে গিয়েছে। এর পরেও, জীবনের এতবড় একটা বৃথা হয়রানির পর, একেবারে খাঁটি ও সত্য একটা ফাঁকির কৌতুক চরমে উঠবার পর কমলেশের পক্ষে মীরাট রওনা হয়ে যেতে আর দেরী করার কোন অর্থ হয় না। জয়ন্তীরও পক্ষে অন্তত কিছুদিনের জন্য রাংতুনের বাগানে চলে যাওয়া উচিত। ভক্তি পিসিমার কাচ্চাবাচ্চাগুলিকে কার্সিয়াং পৌঁছে দিয়ে আসতেই বা কতক্ষণ লাগে?

জয়ন্তীর খবর রাখে না কমলেশ, রাখবার কোন অর্থও হয় না। নিজের খবর ঠিক রাখতে পারলে হয়।

কাকিমা এসে বলেন—সত্যিই কি কাল মীরাট চলে যাবি?

কমলেশ—না।

কাকিমা শুনে খুশি হন।—আমিও তাই বলি। কিন্তু যে-রকম গোঁ ধরেছিলি তুই, বলতে ইচ্ছেই হচ্ছিল না।

কাকিমা চলে যেতেই চমকে উঠে নিজের মনটাকে সন্দেহ করে কমলেশ। এ কি? সত্যিই যে নিজেরই খবর ঠিক রাখা যাচ্ছে না। মীরাটে চলে না গিয়ে এখন আর দার্জিলিং-এ পড়ে থাকবার দরকার কি?

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জলাপাহাড় রোডের এই ঘর আর ও-ঘরের ভিতরে, বড় জোর বাগানের এক নিরিবিলির মধ্যে প্রহরের পর প্রহর অবাধে কাটিয়ে দিয়ে, তারপর সারারাত ধরে অঘোরে ঘুম। ইঞ্জিনিয়ার কমলেশের জীবনের ইঞ্জিন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জলাপাহাড় রোডের কোন পাইনের ছায়ার কাছে, ভিক্টোরিয়া ওয়াটারফলের কোন কলহর্ষের কাছে আর একলা গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হয়। যায় না কমলেশ।

নিখুঁত রূপকথা আশা করতে গিয়ে এবং হাতের কাছে পেয়েও দেখা গেল যে, সে রূপকথার ভিতরে ক্ষত আছে।

ফিলসফারের মত গবেষণা করছে কমলেশের মন।

চিনতে পেরে ভালই হলো। এই ভয়ানক চেনার আঘাতটাকেও যে ভালই লাগছে। মনে হয়, একটা বাধা সরে গিয়েছে।

এই সবই তো কতগুলি কল্পনার ফিলসফি। মানুষের বাস্তব জীবন বড় হিসেবী। আমদানির বেলায় নিখুঁত জিনিস খোঁজে, রপ্তানির বেলায় দাগী জিনিস। জয়ন্তীও এই

হিসাবের বাইরে যাবে কেন? বেশ স্পষ্ট করে হেসে হেসে যে মেয়ে বলতে পারে—খুশি হয়ে চলে যাও, সে মেয়ের মনও হিসাব খুব ভালই বোঝে।

একটা স্বপ্নালু চিন্তা হঠাৎ অতি রূঢ় শক্ত ও বাস্তব একটা প্রশ্ন দিয়ে কমলেশকে যেন চেপে ধরে। জয়ন্তী যদি এই মুহূর্তে এসে বলে, তোমারই সঙ্গে মীরাট চলে যেতে চাই, তবে?

কাকিমা যদি হঠাৎ এসে বলেন—অতুলবাবু রাজি, জয়ন্তীও রাজি আছে। বিয়ে করে জয়ন্তীকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে মীরাট চলে যা কমল, তবে?

বাড়ির বাইরে বের হয়ে জলাপাহাড় রোডের বাতাস গায়ে লাগিয়ে মনের এই শক্ত প্রশ্নটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে কমলেশ। কিন্তু মনের উত্তরটা অশান্ত হয়ে যায়। না, নিজেকে ফাঁকি দিয়ে লাভ নেই। জয়ন্তীকে চিরকালের সঙ্গিনী করে জীবনের পাশে ধরে রাখবার জন্য মনে কোন লোভও নেই। বরং ভাবতে বেশ একটু ঘৃণাই বোধ করে কমলেশ।

কোথা থেকে আর কেমন করে কমলেশের জীবনের সেই কবেকার গল্পগুলি শুনতে পেল জয়ন্তী? এই প্রশ্নও মাঝে মাঝে কমলেশের এই ক্লান্ত ভাবনাগুলিকে আশ্চর্য করে দেয়, হাসিয়েও তোলে। যেখান থেকে আর যার কাছ থেকেই শুনুক, কী ভয়ানক একটা মিথ্যেকে শুনেছে জয়ন্তী। মনে হয়, ঐ যে সেদিন হঠাৎ কোথা থেকে এই বাড়িতে এসে দেখা দিল যে মহিলা, মীরাটের মেয়ে, যার নাম চিন্তনীয়া, সেই মহিলাই বোধ হয় জয়ন্তীর কাছে গল্পগুলি বলেছে। কিন্তু ঐ তো সেই চিন্তনীয়া, যাক্ সে কথা ; মানুষ বোধহয় নিজের জীবনের গল্পগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে লুকিয়ে রেখে পরের জীবনের গল্পগুলি বলে শিউরে উঠতে, আশ্চর্য হয়ে যেতে আর ঘেন্না করতে ভালবাসে। তা না হলে, চিন্তনীয়ার মত নারী কেন...।

মানুষের কাছে থাকাটাই বোধহয় মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় আপদ। এর চেয়ে লোহা আর ইস্পাতের কাছে বসে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ। ফার্নেস, ব্লোয়ার, স্ট্রোকার ও স্টিম টার্বাইন, আর যাই করুক, গায়ে পড়ে ক্ষতি করে না। বয়লার আর জেনারেটর, আর যাই করুক, কাউকে ঘেন্না করে না। কলের ঝনঝনার মধ্যে নিষ্ঠুর ঠাট্টা নেই। এয়ার-ডাক্টের কাছে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে শরীরের জ্বালার মত মনের জ্বালাও জুড়িয়ে নেওয়া যায়।

ক'দিন থেকে কমলেশের রাতের ঘুমগুলিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর কারণও হলো একটা মানুষ।

কাকিমার পুরনো আয়া এক লেপচা বুড়ি। বুড়ির নিউমোনিয়া হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, বাঁচবার আশা খুব কম। কমলেশকে রাত জেগে এই লেপচা বুড়ির ঘরে বসে থাকতে হয়। বুড়ির নিঃশ্বাসের উপর পাহারা রাখতে হয়। চার্ট দেখে ঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়াতে হয়। এমন কি, বুকে একটা লিনিমেন্ট মালিশ করে দিতেও হয়। কাকা আর কাকিমার যা শরীর, তাতে তাঁদের কারও পক্ষে এই রকম রাত-জাগা সেবার খাটুনি সম্ভব নয়।

বুড়িও যেন মরবার আগে অদ্ভুত এক খুশির বাতিকে পাগল হয়ে উঠেছে। কমলেশ ওষুধ খাওয়াবার জন্য কাছে গিয়ে বসলেই বুড়ি হেসে ওঠে, কেঁদে ফেলে, আবার মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলেই হাসতে থাকে। আর, সেই সঙ্গে, দু'হাত দিয়ে কমলেশের গলাটাকে শক্ত করে ধরে বুকের উপর টেনে নিয়ে ফোঁপাতে থাকে। বুড়ির খুশিভরা চোখের জলে কমলেশের গায়ের গেঞ্জি ভিজে যায়।

সকাল ন'টা পর্যন্ত লেপচা বুড়ি হেঁচকি তুলেছে, তারপর একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। তাই কমলেশকে রাত-জাগা চোখের ক্লান্তি চোখে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে একটু বিশ্রাম খুঁজতে হয়।

বিশ্রাম বলতে ঐ, পশমী গেঞ্জি গায়ে দিয়ে, গরম আলোয়ান জড়িয়ে, চটি পায়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে একটু ঘুরে বেড়ানো। এই সময় জলাপাহাড় রোডের গাছের ছায়া আর ঠাণ্ডা বাতাসকে ভালই লাগে। আস্তে আস্তে হেঁটে পথের উপর ঘুরে বেড়ায় কমলেশ। বুঝতে পারে, লেপচা বুড়ির একটা গতি না হওয়া পর্যন্ত মীরাট রওনা হবার তারিখটা ঠিক করাই সম্ভব হবে না।

বাইরের ঘরে কাকিমার সঙ্গে কেউ যেন খুব জোরে হেসে হেসে কথা বলছে। কথাগুলিকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু হাসির শব্দটাকে চিনতে পারা যায়। ওটা চিন্তনীয়ার হাসি।

সিমলার সেই মেয়ে চিন্তনীয়ার বিয়ে কবে হলো, কার সঙ্গে হলো, সে ইতিহাসের কিছুই জানে না কমলেশ। শুধু জানে কমলেশ, কদিন হলো চিন্তনীয়া দার্জিলিংয়ে এসেছে। কতদিন থাকবে, কে জানে।

কী আশ্চর্য, এ বাড়িতে রোজই একবার না একবার আসে চিন্তনীয়া। এই সাতদিনের মধ্যে এমন একটিও দিন পার হয়নি, চিন্তনীয়া এ-বাড়িতে অন্তত একবার না এসেছে। চিন্তনীয়ার সঙ্গে কয়েকবার মুখোমুখি দেখাও হয়েছে কমলেশের, কিন্তু কোন কথা বলেনি চিন্তনীয়া। বরং, চিন্তনীয়ার ব্যস্ততার রকম দেখে মনে হয়েছে কমলেশকে যেন এই প্রথম দেখতে পেয়েছে, কিংবা একটা অপরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা! তাই কোন কথা বলবার নেই। কমলেশের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে চিন্তনীয়া ; যেন একটা অবাঞ্ছিত সান্নিধ্যের স্পর্শ থেকে সরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কমলেশ বিস্মিত হয়েছে, বেশ একটু অস্বস্তিও বোধ করেছে। কোন কথা বলতে চেষ্টা না করে কমলেশ এক দিকে সরে গিয়েছে। কাকিমা বরং চেঁচিয়ে কথা বলেছেন।—চিনতে পারছিস না কমল? অচেনা কেউ নয়, এ যে সিমলের সেই চিন্তনীয়া।

হাসতে চেষ্টা করে কমলেশ—জানি.

কিন্তু চিন্তনীয়ার চোখের দৃষ্টি তবু একটুও প্রসন্ন হয়ে ওঠেনি। কমলেশকে একটা চেনা মানুষ বলে স্বীকার করতে চিন্তনীয়ার মনে যেন একটা ভয়ানক আপত্তি আছে। কাকিমার কথার উৎসাহটাকে দমিয়ে দিয়ে চিন্তনীয়া শুধু বলে—খুব চিন্তায় আছি কাকিমা।

—কেন?

—আজ দু'দিন ধরে ওর কোন টেলিগ্রাম পাচ্ছি না।

—কিসের টেলিগ্রাম?

—কথা ছিল, রোজ অন্তত একটি টেলিগ্রাম করে জানাবে, এখন কোথায় আছে, আর কি করছে। পরশু সন্ধ্যাতে বিলিয়ার্ড খেলতে যায়নি, সে কথাও টেলিগ্রামে জানিয়েছিল। অথ'চ, এই দু'দিন ধরে মানুষটার কোন খবর...।

কাকিমা হাসেন—এত সামান্য কারণে তুমি এত চিন্তা কর?

চিন্তনীয়া ব্যাকুল হয়ে হাসে—অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, কাকিমা, কি করবো বলুন?

কাকিমা—নন্দ এখন কি করছে?

চিন্তনীয়া—কি আর করবে? ভাল ম্যানেজার পেয়েছে, মাত্র ন'শো টাকা মাইনে দিতে হয়। ম্যানেজার ভদ্রলোক কারবারের সব কাজ দেখাশোনা করেন। আর উনি শুধু নতুন গাড়ির খোঁজ করে মাথা ঘামাচ্ছেন। শুধু আমার বেড়াবার জন্যে দুটো টুরার কিনেছে। কত মানা করলাম, তবু শুনলো না।

এই সব কথা, আর শুধু এই ধরনের কথা ছাড়া আর কোন কথা চিন্তনীয়ার মুখে শোনা যায় না। তা ছাড়া, কত জোরে আর চেঁচিয়ে হেসে কথাগুলি বলে চিন্তনীয়া। কাকিমার এত কাছে দাঁড়িয়ে, কাকিমাকে শোনাবার হলে এত জোরে চেঁচিয়ে কথা বলার কোন দরকার হয়

না। মনে হয়, চিন্তনীয়া যেন আর কাউকে কথাগুলি শোনাতে চাইছে।

সেদিন কাকিমা বাড়িতে ছিলেন না। নিশ্চয়ই জানতো না চিন্তনীয়া, কাকিমা এখন বাড়িতে নেই। কিন্তু এসেই যখন দেখতে পেল যে, বাড়িতে কাকা নেই, কাকিমাও নেই, তখন নিশ্চয়ই চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু চলে গেল না চিন্তনীয়া।

খানসামা বলে--মাইজীর ফিরতে তিন-চার ঘন্টা হবে।

তবু ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে খানসামার সঙ্গে প্রায় পনের মিনিট ধরে কথা বলে চিন্তনীয়া।--আমাদের দেরাদুনের বাড়ির জন্য গত মাসে তিন হাজার টাকা দামের অর্কিড কেনা হয়েছে। সাহেব নিজে অর্কিড ভালবাসেন না, কিন্তু আমি ভালবাসি। অথচ, আমি কোনদিন ভুলেও একথা সাহেবকে বলিনি, তবু সাহেব যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারেন। হঠাৎ দেখলাম, একদিন মিসেস ফুলারের নার্সারি থেকে দুজোড়া অদ্ভুত অর্কিড কিনে নিয়ে এলেন।

খানসামা খুশি হয়ে বলে--আহা, এই তো সাচ্চা রহিস মানুষ।

চিন্তনীয়া—খুব সত্যি কথা।

চলে গেল চিন্তনীয়া। চিন্তনীয়ার জীবনের একটা গর্ব যেন হেসে হেসে কথা বলে চলে গেল।

কাকিমা যখন ফিরে এলেন, তখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে।

আর কমলেশ তখন তার বাক্স, বেডিং আর ব্যাগ গুছিয়ে ফেলেছে। যাবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কমলেশ।

কাকিমা আশ্চর্য হন—এ কি? বলা নেই কওয়া নেই, এখুনি কোথায় চললি?

--যাচ্ছি ; মীরাটেই ফিরে যাচ্ছি।

--কেন? ছুটি তো এখনও ফুরোয়নি।

—না, ফুরোয়নি, কিন্তু আমাকে যেতেই হচ্ছে। না যেয়ে উপায় নেই।

দশ

কি আশ্চর্য, এমন অদ্ভুত, এমন মিথ্যে, অথচ এত স্পষ্ট স্বপ্ন মানুষে দেখতে পায়? শিলিগুড়ি পৌঁছবার আগেই ঘুম ভেঙে গেল। ট্রেনের কামরায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় কমলেশ।

বার্চহিল রোডের বাড়ির সেই বারান্দা আর লনের অর্কিড। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পাওয়া যায়, বাড়ির ভিতরে যেন ছুটোছুটি, হাসাহাসি আর চেঁচামেচির একটা উৎসব চলছে।

জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হবে। দু'একটা কথা বলতেও হবে নিশ্চয়, কিন্তু ভেবে উঠতেই পারে না কমলেশ, কি কথা বলা উচিত। সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছে যেখানে, সেখানে এসে দাঁড়ালে এই রকম অপ্রস্তুত হতেই হয়।

নিজের মনের সঙ্গে কোনদিন ভণ্ডামি করেনি কমলেশ, আজও করে না। বুঝতে পেরে মনে মনে লজ্জাও পায়। শুধু মাধবের কথার চাপে পড়ে নয়, নিজেরই চোখের একটা দুঃসহ তৃষ্ণার কথায় কমলেশকে আবার বার্চহিল রোডের এই বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। নতুন অশথ পাতার রং সেই শাড়ি, আবু পাহাড়ে প্রথম দেখা সেই সুন্দর আলেয়াকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে করে, যে আলেয়ার জন্য কমলেশের মনে কোন মায়া ছিল না, রাগও ছিল না।

বাড়ির বাইরের বারান্দায় কাউকে দেখা যায় না। ড্রইং-রুমেও কেউ নেই। একপাল বাচ্চাকাচ্চা ছেলের কলরবের উচ্ছ্বাস আর দাপাদাপি বেশ মিষ্টি একটা হুল্লোড় মাতিয়ে ভিতরের একটা ঘরের বাতাস কাঁপাচ্ছে। কিন্তু জয়ন্তী কোথায়?

ভিতরের ঘরের ভিতরটাকেও বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বাচ্চাবাচ্চা ছেলেগুলির

সঙ্গে হুটোপুটি করছে এক নারী, যাকে এই বাড়িতে কোনদিন দেখতে পায়নি কমলেশ।

কালো পাড়ের একটা সাদা শাড়ির আঁচল দিয়ে শক্ত করে কোমর বেঁধেছে এই নারী। একটা বড় বাচ্চাকে পিঠে, একটা ছোট বাচ্চাকে কাঁধে এবং সবচেয়ে ছোটটাকে বুকে সাপটে ধরে কি একটা মজার খেলা খেলছে। বাচ্চাগুলি কলকল করে চেঁচায়—রাক্ষুসী, রাক্ষুসী।

বাচ্চাগুলির আমোদ হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে। পিঠের উপর চড়ে বসে আছে যেটা, সেটা রাক্ষুসীর ঘাড়ে দুম দুম করে কিল বসায়। আর, কাঁধের বাচ্চা দুটো দু'হাত চালিয়ে রাক্ষুসীর চুল লণ্ডভণ্ড করে। বুকের কাছে যেটা, সেটার ফোলা গালটাকে রাক্ষুসীর মুখ যেন চুমো খাবার ছলে কামড়ে ধরে রয়েছে। ভয়ানক লাথি চালাতে পারে সবচেয়ে ঐ ছোটটা।

দুলে দুলে হাঁটতে থাকে রাক্ষুসী। ভিতরের ঘরের দরজা পার হয়ে, ড্রইং-রুমের দরজায় পর্দা আছে।

দুলে উঠলো পর্দাটা ; আর রাক্ষুসী একেবারে কমলেশের চোখের সামনে এসে পড়ে। রাক্ষুসীর চোখ চমকে ওঠে। তার পরেই হেসে ফেলে।

আর, কমলেশের চোখ চমকে ওঠে, একেবারে অপলক হয়ে, অকল্প এক বিস্ময়ের রূপের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পিঠের আর কাঁধের বাচ্চা দু'টোকে নামিয়ে দিয়ে, শুধু বুকেরটাকে আঁকড়ে ধরে রেখে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে জয়ন্তী। জয়ন্তীর কানের একটা দুল খুলে গিয়ে চুলের সঙ্গে ফাঁস লেগে জড়িয়ে রয়েছে। বাঁ গালে ছোটটার চোখের কাজলের একটা ছোপ লেগে আছে। মাথা হাতড়ে দুল খুঁজতে খুঁজতে জয়ন্তী বলে—আপনি কখন এলেন? বসুন।

আপনি, হ্যাঁ ঠিক কথাই বলে ফেলেছে জয়ন্তী। আবু ডাকবাংলোতে হঠাৎ গিয়ে জয়ন্তীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লে, জয়ন্তী ঠিক এইরকম আশ্চর্য হয়ে আর এইরকম সুরে কথা বলে ফেলতো, কে আপনি?

—আপনার শরীর ভাল আছে তো? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আর দু'চোখে একটা উদ্বেগের বেদনা নিয়ে কমলেশের দিকে তাকিয়ে থাকে জয়ন্তী। কমলেশের পায়ে চটি, গায়ের পশমী গেঞ্জির উপর একটা আলোয়ান। গেঞ্জির বুকটাতে আবার একটা মস্ত বড় ময়লার ছোপ। একটা ভাল মানুষ হঠাৎ পাগল হয়ে কাছে এসে দাঁড়ালে যেমন ভয়-ভয় করে, তেমনি একটা ভয়-ভয় সন্দেহ যেন জয়ন্তীর চোখের বেদনায় মেদুর হয়ে ওঠে।

কমলেশ হাসে—শরীর ভাল আছে। হঠাৎ কি মনে হলো, চলে এলাম। অনেকক্ষণ হলো এসেছি।

জয়ন্তীর চোখের সন্দেহ যেন আরও গভীর হয়ে ছলছল করতে থাকে—কিন্তু আপনি এভাবে এলেন কেন?

—কিভাবে? কমলেশের মনের ভিতরে যেন একটা গলা-ধাক্কা অপমানের ভয় চমকে উঠছে। জয়ন্তীর প্রশ্নটা কি সত্যিই কমলেশকে এই মুহূর্তে সোজা চলে যেতে বলছে?

গায়ের আলোয়ান সামলাতে গিয়ে নিজের চেহারাটাকে যেন মনে পড়ে যায়, আর লজ্জিতভাবে হেসে ফেলে কমলেশ।—ও, বুঝতে পেরেছি। তুমি...আপনি আমার এই অদ্ভুত সাজ দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন।

জয়ন্তী গম্ভীর হয়—হ্যাঁ।

কমলেশ হাসে—কিন্তু আপনিই বা কি কম অদ্ভুত সেজে রয়েছেন?

জয়ন্তী—সত্যি কথা বলুন, কি হয়েছে?

কমলেশ—এমন কিছুই নয়। রাত-জাগা শরীরটাকে একটু হাওয়া খাওয়াবার জন্য সকালবেলা বাড়ির কাছেই পথে বেড়াতে বের হয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ এদিকে চলে এলাম। মনেই পড়েনি যে...।

জয়ন্তী—রাত জাগেন কেন?

কমলেশ—বাধ্য হয়ে। আয়া বুড়ির অসুখ করেছে। টিকবে না বোধহয়। সারা রাত ওয়াচ করে ওষুধ-টষুধ দিতে হয়...এই ব্যাপার। কাকা আর কাকিমার যা শরীর, তাতে ওঁদের পক্ষে তো আর একাজ সম্ভব নয়।

আনমনা হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তী। কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর কমলেশের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু শক্ত স্বরে বলে—বসুন, বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকুন।

—কেন?

—চা আনছি। খানসামা পালিয়েছে, কাজেই...।

বলতে বলতে চলে গেল জয়ন্তী। বাচ্চাগুলিও আশ্চর্য হয়ে, যে লোকটা হঠাৎ এসে ওদের খেলার মজা নষ্ট করে দিয়েছে, তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, জয়ন্তীর পিছু পিছু গুটগুট করে চলে যায়।

দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছে জয়ন্তী। জয়ন্তীকে যে অদ্ভুত এক উৎসবের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে আজ। কোন নিখুঁত রূপকথার জগতেও বোধহয় এমন উৎসব নেই। চা আনতে চলে গিয়েছে জয়ন্তী। কমলেশের মনে হয়, চোখের উপর থেকে যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালী চূড়ার আভার চেয়েও সুন্দর একটা মায়াময় লোভানি সরে গিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছে। ছিঁড়ে গিয়েছে রূপকথার জগৎটা, সেই সঙ্গে যেন একটা অভিশপ্ত অন্ধতার জগৎও ছিঁড়ে গিয়েছে। নইলে এরকম একটি জয়ন্তীকে আজ চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাবে কেন?

গালে কাজলের ছোপ লেগে থাকলে একটা মানুষকে এত সুন্দর দেখায়? কমলেশের অনেক দেখার আনন্দে অভিজ্ঞ চোখ দুটো আজ এতদিন পরে যেন জীবনের সবচেয়ে বড় লোভের ছবি দেখতে পেয়েছে। আজ বোধহয় বুঝতে পেরেছে কমলেশ, এই মেয়েরই নাম জয়ন্তী।

চা আনতে সত্যিই অনেক দেরী করছে জয়ন্তী। চা-এর পিপাসা নয়, কমলেশের জীবনের পিপাসাই যেন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে উদ্দাম হয়ে উঠতে চাইছে। এই মেয়েকে এই মুহূর্তে বুকে তুলে নিয়ে মীরাট চলে যেতে ইচ্ছা করছে।

কেন ভাল লাগছে? মনটা আজ আর বৃথা এই ফিলসফি করতে চাইছে না। ভাল লাগছে, সে ভাল লাগা যেন সব দেখা শোনা জানা ও চেনার একটা ওপার থেকে এসে দেখা দিয়েছে। কি আশ্চর্য, জয়ন্তীর বুকে একটা বিশ্রী ব্যথা আছে বলেই যে ওর সুন্দর শরীরটাকে আরও সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। একটা দাগ না থাকলে মানুষকে মানুষ বলে মনে হবে কেন? আর ভালই বা লাগবে কেন?

চা নিয়ে আসে জয়ন্তী। কমলেশ বলে—বাচ্চাগুলো গেল কোথায়?

জয়ন্তী—বাগানে খেলা করছে।

কমলেশ—ওরা কারা?

জয়ন্তী—ওরা হলো আমার ভক্তি পিসিমার চার ছেলে।

কমলেশ—তাহলে আজকাল ওদের নিয়ে দিনগুলি বেশ খেলা করে কাটিয়ে দিচ্ছেন।

জয়ন্তী হাসে—তা কাটাতে হচ্ছে বৈকি। দিনরাত ওদের সামলাবার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রত্যেকটাই হলো এক একটা সাংঘাতিক দুষ্টুমির রঘু ডাকাত।...কেউ খাবার সময় ঘুমিয়ে পড়বে, কেউ ঘুমোবার সময় খেতে চাইবে, আমাকে একটা মিনিটও জিরোতে দেয় না।

কমলেশ—ভক্তি পিসিমা কোথায়?

জয়ন্তী—কার্সিয়ং-এ। পিসিমার ঐ এক অভ্যেস, হঠাৎ এসে বাচ্চাগুলিকে আমার কাছে গছিয়ে দিয়ে সরে পড়েন ; আর কার্সিয়ং-এ ফিরে গিয়ে মনের সুখে কয়েকটা দিন ঘুমিয়ে

নেন।

কমলেশ হাসে—এদিকে আপনার ঘুম ছুটে যায়।

জয়ন্তী হাসে—তা এক-আধটুকু ছুটলোই বা।

গল্পের জের আর গড়াতে চায় না! কথা ফুরিয়ে যায়। দুজনে দুজনের মুখের দিকেও বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। দুজনেই যেন মনের একটা মুগ্ধতার বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করতে চাইছে। কিন্তু হেরে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ায় কমলেশ। জয়ন্তীও উঠে দাঁড়ায়। বিদায় নিতে চায় কমলেশ, জয়ন্তীও বিদায় দিতে চায়। কথা বলার দরকার হয় না। আসি বলবার দাবি নেই, যেও না বলবারও দাবি নেই।

কমলেশ বলে—আমি জানি, আমাকে চলে যেতে বলছেন আপনি ; আমিও চলে যেতেই চাই।

শিলিগুড়ি স্টেশনের আলোর ভিড়ের মধ্যে ঢোকবার আগে ট্রেনটাকে খুব হঠাৎ মৃদু হয়ে যেতে হলো বলেই বোধহয় একটা ঝাঁকুনির আবেগে দুলে উঠলো। তাই কমলেশের ঘুমের ভারে ঝুঁকে পড়া মাথাটাও দুলে উঠেছে। ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। সেই সঙ্গে এমন অদ্ভুত একটা মিথ্যের মায়া মাখানো স্বপ্নটাও ভেঙ্গে গিয়েছে।

অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। জয়ন্তী নামে একটা ঘৃণ্য ছলনার রকম দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে যে কমলেশ, তারই স্বপ্ন জয়ন্তীর সঙ্গে কত শান্ত আর স্নিগ্ধ ভাষায় কত কথা বলে নিল। ফিলসফার মেয়ে নয় ; রূপকথার মেয়ে নয় ; নিতান্ত এক আটপৌরে জীবনের মেয়েকে দেখতে পেয়েছে এই লোভী স্বপ্নটা। আরও আশ্চর্য, স্বপ্নটা একবারও শিকারী প্রিন্সের কথা তুলে জয়ন্তীর জীবনের গোপন ক্ষতের জঘন্যতার বিরুদ্ধে একটুও রাগ দেখাতে পারলো না।

হেসে ফেলতে ইচ্ছে করে। স্বপ্নটা যেন জয়ন্তী আর কমলেশের ঘৃণাভরা দ্বন্দ্বের যত তর্ক অভিযোগ আর শাস্তি ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু স্বপ্নের পক্ষে যেটা এত সহজে সম্ভব, বাস্তব জীবনের পক্ষে সেটা একটুও সহজ নয়। এমন স্বপ্ন কমলেশের উপর একটা হিংস্র বিদ্রূপ মাত্র।

দার্জিলিং ছেড়ে চলে আসতে পেরেছে কমলেশ। একটা শাস্তির কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে এইবার জীবনের খোলা পথের আলোছায়ার মধ্যে এসে দাঁড়াতে পেরেছে। জয়ন্তীর দার্জিলিং, তার উপর আবার চিন্তনীয়া নামে এক পুরনো বিভীষিকা সেখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে। কমলেশের মত মানুষের পক্ষে ভয় পাওয়া আর পালিয়ে যাওয়াই ভাল।

ভাবতে শুধু একটু খারাপ লাগে, লেপচা বুড়ি এখনও ভুগছে। তবু ডাক্তারের কথাটা স্মরণ করে খুশি হতে চেষ্টা করে কমলেশ, না, মনে হচ্ছে বুড়ি এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবে।

ওই তো কাটিহার যাবার ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনটা বোধহয় আর বেশি দেরি করবে না। দৌড় দেবার জন্যে তৈরী হয়ে হিস্‌হিস্‌ করছে ট্রেনের ইঞ্জিন।

কুলি ডাকে কমলেশ। ব্যস্তভাবে কাটিহারের ওই ট্রেনের দিকে এগিয়ে যায়। আপাতত কাটিহার। তারপর কয়েকটা দিন লখনউ। তারপর মীরাটে কারখানার অফিসে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেই হবে, সাত দিনের মধ্যে কাজে জয়েন করবো।

এগার

ওটা কার গাড়ি? আজ সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে বার তিন চার বার্চহিল রোডের উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল যে গাড়িটা, সেটা মাধব মিত্রের গাড়ি। জয়ন্তীর পক্ষে বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। মাধব মিত্রের গাড়ির হর্নের শব্দ জয়ন্তীর কানের কাছে নতুন কোন শব্দ নয়।

এই তো, পর পর তিন বছর হলো, ওই মাধব মিত্র কলকাতা থেকে এসে বছরের অন্তত তিনটে মাস এই দার্জিলিং-এ থাকেন। কার্ট রোডের ধারে মাধব মিত্রের বাড়িটার শৌখীন চেহারাটা দার্জিলিং-এর পথচারীর কাছেও খুব পরিচিত।

আজ জয়ন্তীদের এই বাড়ির গেটের সম্মুখের পথ ছুঁয়ে মাধব মিত্রের গাড়িটা যেন অন্য কোন ব্যস্ততার আবেগে ছুটে চলে যায়। কিন্তু এমন দিন ছিল, যেদিন মাধব মিত্রের ওই গাড়ি জয়ন্তীদের বাড়ির এই ফটক পার হয়ে সোজা এই বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াতো।

জয়ন্তীর বাবা অতুলবাবুর সঙ্গে চায়ের শেয়ারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার দরকার হয়। কাজেই মাধব মিত্র প্রায়ই অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, এ ছাড়া আর কিছু জানতো না জয়ন্তী। অতুলবাবুও জানেন না যে, চায়ের কারবারের আলোচনা করা ছাড়া কলকাতার মাধব মিত্রের মনে আর কোন ইচ্ছা কিংবা কথা আছে।

কিন্তু জয়ন্তীর পক্ষে ঘটনাটাকে চিনে নিতে খুব বেশি দেরি হয়নি। মাধব মিত্রের এই আসা-যাওয়া একটা অন্য ইচ্ছার ব্যস্ততা। জয়ন্তীকেই দেখতে আসে মাধব। জয়ন্তীর সঙ্গেই কথা বলতে চায়। জয়ন্তীর সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুব খুশি হয়। জয়ন্তীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকতেও চায় মাধব।

অতুলবাবু একদিন তাঁর মেয়েকে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মাধব যে রোজই একবার এখানে আসে, এটা কি তুই পছন্দ করিস?

জয়ন্তীও একেবারে স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছিল—একটুও না।

অতুলবাবু নিজেই একদিন মাধব মিত্রকে বলে দিলেন—দরকার থাকলে তুমি বরং আমার অফিসে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো। বাড়িতে যখন থাকি, তখন একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই। বাড়িতে বসে কারবারের কথা আলোচনা করতে ইচ্ছা হয় না।

মাধব মিত্র অতুলবাবুর এই স্পষ্টভাষিত অনুরোধের মর্ম বুঝতে পেরেছিল কিনা, তা সেই জানে। কিন্তু জয়ন্তীদের বাড়িতে আসবার ইচ্ছাটা, মাধব মিত্রের উৎসাহটা যেন আরও মত্ত হয়ে ওঠে। অতুলবাবু যে সময়ে বাড়িতে থাকেন না, ঠিক সেই সময়েই জয়ন্তীদের এই বাড়ির বারান্দার উপরে উঠে নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে থাকে মাধব মিত্র। মাঝে মাঝে ঘরের দরজার পর্দার দিকে তাকিয়ে কথা বলে—আমি এসেছি। কই? আপনি কোথায়?

জয়ন্তী বের হয়ে আসে। হাসতে চেষ্টা করেও গম্ভীর হয়ে যায়।—আমি আমার পড়া নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি। আপনি বসুন ; চা খেয়ে নিয়ে তারপর যাবেন।

মাধব—বেশ তো, চা নিয়ে আসুন তবে। মাধবের মুখের হাসি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

জয়ন্তী বলে—পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জয়ন্তী নয়, চাকর বীর বাহাদুর চা নিয়ে আসে। চা খায় মাধব। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে ওঠে—আজ আসি তবে।

কত রকমের কথাই না বললো কলকাতার মাধব মিত্র। গত বছরের কারবারের বিপুল প্রফিটের কথা। পুরীতে সমুদ্রের ধারে নতুন বাড়িটার কথা—আমার ইচ্ছা, আপনি কিছুদিন আমার পুরীর বাড়িতে গিয়ে থাকুন আর সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে ফিরে আসুন।

জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে মাধব মিত্রের দুই চোখের তারা দুটো ছটফট করতে থাকে।

একদিন মাধব মিত্র তার ছোট বোন শিউলিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। মেয়েটাকে খুব শান্ত স্বভাবের বলে মনে হয়। বেশ লাজুকও। তা ছাড়া, চোখ দুটোও একেবারে ভীতু ছেলেমানুষের চোখ।

শিউলি বলে—আমি আসতে চাইনি। দাদার ধমক খেয়ে তবে এসেছি।

জয়ন্তী হাসে—কেন? এত ভয় কিসের?

শিউলি—আমার সব সময় ভয় করে।

জয়ন্তী—আমাকেও ভয় করছো নাকি?

শিউলি—হ্যাঁ।

জয়ন্তী—কেন?

—আপনি বড় গম্ভীর। আপনি ভয়ানক বিদ্বান।

হেসে ফেলে জয়ন্তী।—না, ভয় করো না।

গেরুয়া কাপড় পরা একটা লোক এসে ড্রইং-রুমের জানালার কাছে দাঁড়ায় আর উঁকি দেয়।

জয়ন্তীর দুই চোখ জ্বলে ওঠে। আর জানালার কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে জয়ন্তী।—তুমি যদি আবার এখানে আস, তবে আমি নিজের হাতে তোমাকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেব।

ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলে শিউলি।

জয়ন্তী বলে কিছু না। ওটা একটা খারাপ লোক। রোজ এসে ভয়ানক খারাপ কথা বলে, তাই ওকে সাবধান করে দিলাম।

শিউলির ভয় তবু দূর হতে চায় না। এইটুকু মেয়েকে কি বলে বোঝাবে জয়ন্তী ; কেন ওই গেরুয়া-পরা লোকটাকে এমন কঠোর ভাষায় ধমক দিতে হয়েছে।

মাধব মিত্র শুনে একটু আশ্চর্য হয়েছিল। শিউলির কথা থেকে কিছু বোঝা যায়না। তাই সেদিন নিজেই এসে জয়ন্তীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেই ফেলে মাধব।

—কী ব্যাপার ; সাধুটাকে আপনি এরকম অপমান করলেন কেন?

জয়ন্তী—সাধু নয়।

মাধব—তার মানে?

হেসে ফেলে জয়ন্তী।—একদিন এক দেশী প্রিন্সের সঙ্গে সিঞ্চল ডাকবাংলোতে আমার দেখা হয়েছিল। সেই প্রিন্সের সঙ্গে এই ভয়ানক সাধুটিকেও দেখেছিলাম।

মাধব—কিছুই বুঝলাম না।

জয়ন্তী—তারপর থেকে প্রায়ই এই সাধুটা এখানে এসে আমাকে আশীর্বাদ করে, 'আমি শিগ্‌গির রাজরাণী হব।

—বুঝলাম! বুঝলাম! চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মাধব মিত্র।—এই দালালটাকে চাবুক না মেরে সেই বেটা প্রিন্সকে চাবুক মারলেই ভাল করবেন।

জয়ন্তী আর কথা বলে না। মাধব মিত্রের কাছে কথাটা বলে ফেলে জয়ন্তী যেন নিজেই লজ্জিত হয়েছে। ভুল হয়েছে। জীবনের কোন ঘটনার কথা মাধব মিত্রের কাছে বলবার দরকার ছিল না।

মাধব মিত্র সেদিন জয়ন্তীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। আর, আরও অদ্ভুত কয়েকটা কথাও বলে নিল।—আমি আজ নিশ্চিন্ত হলাম।

কে জানে, কী দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল মাধব মিত্র।

কিন্তু জয়ন্তীর চোখ জ্বলছে। মুখ ফিরিয়ে কি যেন ভাবছে জয়ন্তী। বোধহয় চোখের সামনে অন্য একটা বিদ্রূপ দেখতে পেয়েছে।

কে এই মাধব মিত্র? মস্ত বড় কারবার আছে ; আর অনেক টাকা আছে। এ ছাড়া মাধব মিত্রের আর কোন পরিচয় জানতে পারেনি জয়ন্তী। শুধু দেখতে পেয়েছে, এই মাধব মিত্র কোনদিন ভুলেও জয়ন্তীদের বাড়ির ড্রইং-রুমের টেবিলে পড়ে থাকা বইগুলির দিকে একবার তাকায়ওনি। অর্কিডের ফুল ফুটেছে, সেদিকেও তাকায় না মাধব। কোনদিনও জিজ্ঞাসা করেনি যে, বারান্দার দেয়ালে এই যে সুন্দর একটা ছবি টাঙানো রয়েছে, এটা কি সত্যিই খাঁটি কাংড়া

স্টাইলের পেন্টিং? টেনিস লনের দিকে তাকিয়ে কোনদিনও বলেনি মাধব—আপনি কি টেনিস খেলতে ভালবাসেন?

মাধব মিত্রও যেন নিতান্ত একটা দামী মোটর গাড়ির মুখর হর্ন। একটা মস্তিষ্কহীন ব্যস্ততা। রোজই আসে আর চলে যায়।

সে বছর, কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এ এসেই যেদিন জয়ন্তীদের বাড়ির ফটকের কাছে হর্ন বাজালো মাধবের গাড়ি, সেদিন মাধব মিত্র নিজের চোখেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন, একটা লোক একগাদা রঙীন পাখিকে শিকার করে মেরে নিয়ে এসেছে। মরা পাখিগুলোকে মালার মত করে দড়িতে ঝুলিয়েছে। লোকটা জয়ন্তীকে বলছে, খুব ভাল রোস্ট হবে মিস সাহেব ; খুব সস্তা করে দিচ্ছি। কিনে ফেলুন।

দুহাত তুলে নিজের চোখ দুটো চেপে ধরে যেন ফুঁপিয়ে ওঠে জয়ন্তী। তার পরেই চেঁচিয়ে ওঠে।—শিগগির চলে যাও, এখান থেকে।

মাধব মিত্র হাসে।—আপনি সত্যিই খুব নরম।

মাধবের কথার উত্তর না দিয়ে সরে যায় জয়ন্তী। বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আর, মাধব মিত্রও ব্যস্তভাবে জয়ন্তীর পিছু পিছু হেঁটে সেই বারান্দার একটি চেয়ারের কাছে দাঁড়ায়। আর, আবার সেই কথা।—আপনি সত্যিই খুব...যেমন নরম মন, তেমনই নরম আপনার চেহারা। সেদিন কিন্তু...।

জয়ন্তীর চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হয়ে ওঠে।—কি?

মাধব—সেদিন, যখন সেই সাধুটাকে ধমক দিচ্ছিলেন, তখন কিন্তু আপনাকে ভয়ানক শক্ত মনে হয়েছিল।

জয়ন্তী বলে—বাবা এখন অফিসে আছেন।

মাধব—জানি, সেই জন্যেই তো এখন এলাম।

জয়ন্তী—কি বললেন?

মাধব—আপনি তো বুঝতেই পারছেন, কি বলছি।

হঠাৎ জয়ন্তীর একেবারে চোখের কাছে এসে দাঁড়ায় মাধব মিত্র।—আমি জানি, আপনি আশা করে আছেন। আমিও, বলছি ঠিকই।

জয়ন্তী—কি?

—আমাদের বিয়ে হবে। আমার কোন আপত্তি নেই।

জয়ন্তীর ঠোঁট কাঁপতে থাকে।—আপনি খুব ভুল ধারণা করেছেন।

—তার মানে?

—তার মানে, বিয়ে হবে না। হতে পারে না।

—সত্যি কথা বলছেন?

—খাঁটি সত্যি কথা।

—আচ্ছা।

বারান্দা থেকে নেমে যায় মাধব মিত্র।

সেই দিন থেকে, আজ এক বছরেরও বেশি হলো, মাধব মিত্রের গাড়ি আর কোনদিন ফটক পার হয়ে এই বাড়ির বারান্দার কাছে আসে না।

আর এখানে আসেনি মাধব মিত্র ; কিন্তু সামনের ওই সড়ক দিয়ে সারাদিনের মধ্যে কতবারই না ছুটোছুটি করেছে মাধব মিত্রের গাড়ি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে জয়ন্তীর, মাধব মিত্রের গাড়িটা যেন একটা আক্রোশ নিয়ে ছুটছে! মাধব মিত্রের ইচ্ছার আত্মাটা প্রত্যাখ্যানের আঘাত সহ্য করতে না পেরে যেন একটা প্রতিশোধের তৃপ্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একটুও লজ্জিত হয়নি জয়ন্তী। কি আশ্চর্য, যে-কোন একটা মানুষ এসে জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেই একটা দাবি করবার অধিকার পেয়ে গেল, এমন ধারণা যে ভয়ানক একটা অন্যায় ; এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধিও কি ওদের নেই? সেই দেশী প্রিন্সটা তো একটা সভ্য সংস্কারের মানুষই নয় ; একটা লোভের প্রাণী মাত্র। তার ওপর কী কুৎসিত দুঃসাহস! জয়ন্তীর মত এক ভদ্র পরিবারের শিক্ষিতা মেয়ের কাছে কদর্য ইচ্ছার দূত পাঠাতেও সাহস করে। ওই মাধব মিত্রের তো বুঝে নেওয়া উচিত ছিল, শুধু নিজেরই ইচ্ছেটাকে দাবি করবার অধিকার বলে মনে করা সভ্য মানুষের চরিত্রের রীতি নয়।

কিন্তু ধারণা করতে পারেনি জয়ন্তী, ওই মাধব মিত্রের প্রাণটা কী ভয়ানক মিথ্যাচারী হতে পারে। কিন্তু ধারণা করবার সুযোগ পেতে বেশি দেরি হয়নি। একদিন মল্লিক সাহেবের স্ত্রী হেনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই চমকে উঠে, বারান্দার উপরে একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, ঘরের ভিতরে হেনা ও মিস্টার মল্লিকের কথাবার্তার প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পেয়েছিল জয়ন্তী।

মিস্টার মল্লিক হেনাকে বলছেন—তোমার বন্ধু জয়ন্তী যে এরকম এক-একটা গোপন কীর্তির হিরোইন, সেটা আগে কোনদিন ভুলেও ধারণা করতে পারিনি।

হেনা—কি ব্যাপার?

মিস্টার মল্লিক—কী না করেছে তোমার বন্ধু জয়ন্তী। সিঞ্চল ডাক-বাংলোতে এক দেশী প্রিন্সের সঙ্গে সারাটা রাত কাটিয়ে দিয়ে...।

আর শুনতে পায়নি জয়ন্তী ; কারণ, ওই ভয়ানক জঘন্য মিথ্যার শব্দ শোনবার জন্য আর দাঁড়িয়ে থাকতে চায়ওনি জয়ন্তী। সেই মুহূর্তে মল্লিক সাহেবের বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরে এসেছিল জয়ন্তী।

জয়ন্তীর জীবনের নামে এই বীভৎসতার কাহিনী যে কলকাতাতে পৌঁছে গিয়েছে, তাও একদিন জানতে পেল জয়ন্তী! জেঠতুতো দাদার স্ত্রী, অপর্ণা বউদি কলকাতা থেকে চিঠি লিখে প্রশ্ন করলেন—এসব কী বিশ্রী নানা রকমের কথা কানে আসছে জয়ন্তী? যদিও এক বর্ণও বিশ্বাস করি না, তবু ভাবতে আশ্চর্য লাগছে ; কেন তোমার নামে এরকমের জঘন্য গল্প রটেছে। প্রীতির মা বললেন, কোন্ এক ডাক-বাংলাতে নাকি কী-একটা কাণ্ড হয়েছে। একজন সন্ন্যাসী মানুষকে তুমি নাকি চাবুক মেরেছো? তা ছাড়া, তোমার বুকে নাকি খুব খারাপ একটা রোগও দেখা দিয়েছে?

রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলে জয়ন্তী। ধন্য এই অপবাদের চোখ আর কান। জয়ন্তীর বুকের ব্যথাটার নামেও একটা ঘৃণা প্রচার করে ছেড়েছে। মাধব মিত্রকে তো কোনদিনও এই ব্যথার কথাটা বলেনি জয়ন্তী। তবে শুনতে পেল কেমন করে? খুব সম্ভব বিধু ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছে।

হ্যাঁ, ব্যথাই বটে। বুকের ভিতরে একটা ব্যথা। একদিন মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠেছিল জয়ন্তী। বুকের ভিতরে একটা বদ্ধ বাতাস যেন শক্ত লোহার তাল হয়ে পাঁজরের উপর আঘাত করেছে। কী ভয়ানক নিষ্ঠুর স্বপ্নটা! জয়ন্তী স্বপ্ন দেখেছিল, ভক্তি পিসিমার ছোট বাচ্চাটা জয়ন্তীর বুকের কাছ থেকে হঠাৎ আলগা হয়ে পড়ে গিয়েছে, আর, একটা স্রোতের জলে পড়ে ভেসে গিয়েছে!

বুকের পাঁজরে সেই যে একটা ব্যথা লাগলো, সেটা আর গেল না। বেশ কিছুদিন চাপা পড়ে থাকে ; তারপরেই একদিন হঠাৎ তীব্র হয়ে জয়ন্তীর নিঃশ্বাসের বাতাস অদ্ভুত এক বেদনায় উতলা করে দেয়। কোন সন্দেহ নেই, এটা জয়ন্তীর জীবনের একটা স্বপ্নের গোপন ব্যাকুলতার ঘটনা। শিক্ষিতা ফিলসফার নারীর জীবনের ব্যাকুলতা নয়, একটি মেয়েলী মনের পিপাসার ঘটনা। কিন্তু মাধব মিত্রের মস্তিষ্কের বাহাদুরী আছে। এমন একটা মায়ালু স্বপ্নের কথাটাকে একটা রহস্যময় কলঙ্কের কথা বলে রটনা করে দিতে পেরেছে।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের কাণ্ড হলো মীরাটের ইঞ্জিনিয়ার কমলেশের কাণ্ড। ভদ্রলোক কত সহজে এই মিথ্যা রটনার কথাগুলিকে একেবারে বিজ্ঞানের সত্য বলে মনে করে বসলেন। একবারও ভাবলেন না যে, জয়ন্তীর মত মেয়ের জীবনে অমন কুৎসিত ঘটনা একটা অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ সব দিকে শিক্ষিত হয়ে, সব রকম যুক্তি বুদ্ধি বিচার ও সতর্কতা দিয়েও একটা মিথ্যা রটনার কাছে কত সহজে অসহায় হয়ে যায়। মিথ্যাকে অবিশ্বাস করবার শক্তিটুকু যেন এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে যায়।

ভালই হয়েছে। জয়ন্তীর জীবনের একটা প্রবল অভিমান যেন চিন্তার ভিতরে অদ্ভুত এক সান্ত্বনার গুঞ্জরণ ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়—ভালই হয়েছে। যে-মানুষ জয়ন্তীকে এত কাছে পেয়ে চিনতে বুঝতে ও জানতে পেরেও একটা জঘন্য মিথ্যুক কিংবদন্তীর কাছে নিজের বুদ্ধি-বিচার বিকিয়ে দেয়, আর জয়ন্তীকে ঘৃণা করতে পারে ; তাকে এ জীবনে চোখের সামনে আর দেখতে না পাওয়াই একটা সৌভাগ্য। এমন মানুষের ভালবাসার মধ্যে যে কোন শক্তি নেই, থাকতে পারে না, সে সত্য বুঝতেও আর কোন অসুবিধে নেই।

তবু, এ কী উপদ্রব। মনের ভাবনাগুলির যে কোন রকম বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বার বার, প্রায় সর্বক্ষণ, যে-কোন কাজের মধ্যেও, ওই কমলেশের কথাই মনে পড়ছে।

অস্বীকার করবার তো উপায় নেই, ফিলসফির জয়ন্তী ফিলসফি দিয়ে নয়, বিদ্যে দিয়ে নয়, কালচারের যত অভিরুচি আর বিচিত্রতা দিয়ে নয় ; শুধু এক সন্ধ্যার একটি নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় ব্যাকুল হয়ে উঠে এই কমলেশের হাতে হাত রেখে ফেলেছিল। জয়ন্তীর এই শরীরটারও সব সতর্কতা সেই মুহূর্তে যেন অলস হয়ে গিয়েছিল। কমলেশ নামে সেই মানুষটাকে ভাল লেগেছিল কেন, কারণ খুঁজে পায় না জয়ন্তী। কিন্তু কোন সন্দেহ তো নেই যে, ভাল লেগেছিল।

ভাল লাগে বৈকি। এখন যে আরো ভাল লাগে। জলাপাহাড় রোডের সেই বাড়ির সেই ড্রইংরুমের সেই নিরিবিলি ঘন-অন্ধকারের সেই সঙ্কেত যে জয়ন্তীর মনের ভিতরে এখনও হঠাৎ এক-একটি মুহূর্তে উতলা হয়ে ওঠে। না, কোন কথা ছিল না, কোন অসুবিধা ছিল না, যদি চিন্তনীয়া এসে কমলেশের জীবনের ওই ভয়ানক কাহিনীটাকে এত স্পষ্ট করে বলে না ফেলতো। এখনও চিন্তনীয়া যদি হঠাৎ একবার ছুটে আসে আর বলে দেয়—না, ভুল, খুব ভুল, এগুলি নিতান্তই মিথ্যে অপবাদের রটনা, তবে এখনই জলাপাহাড় রোডে গিয়ে কমলেশকে বলতে পারবে জয়ন্তী—ক্ষমা করুন।

সত্যিই কি জলাপাহাড় রোডের বাড়িতে এখনও আছে কমলেশ? না, মীরাটে চলে গিয়েছে?

বুঝতে পারেনি জয়ন্তী, কিন্তু মিররের দিকে চোখ পড়লো বলেই বুঝতে হলো, এত উদ্ধত ভঙ্গী ধরে, কড়াকথার এক নিদারুণ বিদুষী হয়ে কমলেশকে সোজা চলে যেতে বলে দিতে পেরেছে যে-মেয়ে, তারই চোখ দুটো অভিমানিনী গেঁয়ো মেয়ের চোখের মত করুণ হয়ে গিয়েছে।

বারো

অন্যদিন হলে এমন ঝলমলে রোদে ভরা দুপুরে ম্যালের পথে আর বেঞ্চিতে, আর ছোট-ছোট পার্কের এদিকে-ওদিকে মানুষের ভিড় বেশ একটু বেশি হয়ে দেখা দিত। কিন্তু কে জানে কেন, আজ এখানে মানুষের আনাগোনা বেশ একটু কম বলেই মনে হয়। পার্কের ঘাসের উপর রোদের মধ্যে গাছের ছায়াও অলস হয়ে লুটিয়ে রয়েছে। ওখানে এক সাহেব আর এক মেম ক্যামেরা হাতে নিয়ে বেঞ্চির উপর চুপ করে সে আছেন। টাট্টু ওয়ালা ছোকরা ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে-হাঁটা পথিকের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে, হাঁক-ডাক

করে না।

মাধব মিত্রের গাড়িটাও যেন ম্যালের অলস রোদের ছোঁয়া লেগে অলস হয়ে গিয়েছে। জোরে স্টার্ট নিয়ে ছুটতে চায় না মাধবের গাড়ি। হঠাৎ মন্থর হয়ে গিয়েছে ; দূরের একটা বেঞ্চির দিকে হঠাৎ চোখ পড়েছে মাধব মিত্রের ; আর, যেন অদ্ভুত কিছু একটা দেখতেও পেয়েছে।

না, কোন অদ্ভুত আবির্ভাব নয়। চিন্তনীয়া একটা ছবির ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে বেঞ্চির উপর বসে আছে। চিন্তনীয়ার পাশে রাখা আছে একটি পশমী ওভারকোট, তার উপর চকোলেটের একটা প্যাকেট।

কিন্তু সিমলার মেয়ে চিন্তনীয়ার লালচে ঠোঁটের আভা যেন দার্জিলিং-এর এই রোদের ছোঁয়া লেগে অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। দুই ঠোঁটের কোমলতার উপর যেন একটা নিবিড় তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে আছে। কিন্তু চোখের তারা দুটো খুবই চঞ্চল। ম্যাগাজিনের ছবির দিকে তাকিয়ে নিয়েই দূরের আকাশে আঁকা কোন শিখরের সাদা তুষারের সোনালী চমকের দিকে তাকিয়ে থাকে চিন্তনীয়া। পরক্ষণে পার্কের গাছের কুঞ্জগুলির দিকে ; তারপর সড়কের এদিকে কিংবা ওদিকে।

দেখে মনে হবে, কারও অপেক্ষায় এখানে বসে আছে চিন্তনীয়া। কিন্তু তা নয়। এই দার্জিলিং-এ চিন্তনীয়ার পরিচিত এমন অন্তরঙ্গ কেউ নেই যে, এসময়ে এখানে চিন্তনীয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে। চেনা মুখের মধ্যে ওই তো এক জয়ন্তী। কিন্তু সে জয়ন্তী বাড়ির বাইরে খুব কমই বের হয়। তা ছাড়া, এখানে এসে চিন্তনীয়ার সঙ্গে দেখা করবার জন্য জয়ন্তীর মনে কোন ইচ্ছাও থাকতে পারে না। জয়ন্তী জানবেই বা কেমন করে যে, আজ এখন এখানে একটি বেঞ্চির উপর সিমলার মেয়ে চিন্তনীয়া নতুন স্টাইলের সাজে একেবারে চমৎকার ও চার্মিং ও লাভ্‌লি হয়ে বসে আছে?

কারও অপেক্ষায় নয়। চিন্তনীয়া শুধু এখানে বসে থাকার জন্যেই বসে আছে। চোখের সামনের পথ দিয়ে যারা হেঁটে চলে যাচ্ছে, তাদের কাউকে চেনে না চিন্তনীয়া। কল্পনা করবারও দরকার হয় না যে, দার্জিলিং-এ চিন্তনীয়ারা কোন পরিচিত মানুষ এই পথে এসময়ে দেখা দিতে পারে।

হ্যাঁ, চিন্তনীয়ার একজন পরিচিত মানুষ বেশ কিছুদিন এই দার্জিলিংয়ে ছিল ; কিন্তু এখন আর নেই। জলাপাহাড় রোডের একটি বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এই সেদিন জানতে পেরেছে চিন্তনীয়া, চলে গিয়েছে কমলেশ। কাকিমা বললেন, বোধহয় মীরাটেই চলে গেল কমলেশ!

শুনে খুশি হয়েছে চিন্তনীয়া, কাকিমা কয়েকটা বিস্ময়ের কথা বললেন। কে জানে, কমলেশের মনটা হঠাৎ মীরাট চলে যাবার জন্য ছটফট করে উঠলো কেন? এখনও তো ছুটি ফুরোয় নি। ইচ্ছে থাকলে আরও কিছুদিন থাকতে পারতো। তা ছাড়া, এটাও তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার ; না অতুলবাবু, না তাঁর মেয়ে, কেউ একদিন এসে খোঁজও নিয়ে গেল না, কমলেশ আছে কি নেই! অন্তত জয়ন্তীর একবার খোঁজ নিতে আসা উচিত ছিল!

কাকিমার আক্ষেপের কথা শুনে চিন্তনীয়ার মুখে সেই যে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল, সেই হাসি তখনই ফুরিয়ে যায়নি। ওই যে লালচে হয়ে অদ্ভুত একটা হাসি চিন্তনীয়ার নরম ঠোঁটের উপর ভয়নাক এক খুশির জ্বালার মত কাঁপছে, ওটা নিশ্চয় সেই হাসি।

ভাবতে পারেনি চিন্তনীয়া, জীবনে এমন একটা ঘটনা দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে। মীরাটের ইঞ্জিনিয়ার কমলেশ একটা ঘৃণার জীবের মত ব্যর্থ হয়ে ভালবাসার দার্লিং থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

লোকটা মীরাটের এই কমলেশ, নিজেকে কেন যে একটা ইন্দ্রচন্দ্র বলে ধারণা করে

বসলো, তা সে-ই জানে। কিন্তু চিন্তনীয়ার মত মেয়ের ইচ্ছাটাকে যেন ভয়ানক এক অহংকারের জেদ নিয়ে তুচ্ছ করেছিল এই কমলেশ। তপোবনের মানুষ নয় ; নারীর মুখের দিকে তাকাতে বেশ আগ্রহ আছে ; আর চিন্তনীয়ার মুখটাকে তো অন্তত ত্রিশবার একেবারে চোখের কাছে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। কেউ ছিল না সেখানে, উঁকি দিয়ে দেখার মত কেউ ছিল না সেই ঘরের নিভৃতে, কিংবা সিমলার সড়কের সেই নির্জনতায়। তবু চিন্তনীয়াকে একটা কথাও স্পষ্ট করে বলতে পারেনি কমলেশ ; অথচ চিন্তনীয়া কত স্পষ্ট করেই না অনেক কথা বলে দিতে পেরেছিল।

সেদিন মীরাটের কমলেশ ছিল রুড়কির ছাত্র-ইঞ্জিনিয়ার ; ফাইন্যাল পরীক্ষা আসতে তখনো আট মাস বাকি। আর, কমলেশের বাবা পরিতোষবাবুর কারবারের অবস্থাও তখন খুব খারাপ। বাধ্য হয়ে নন্দবাবুকে তখন পার্টনার করেছেন পরিতোষবাবু। শেষে অনিদ্রা রোগে কষ্ট অসহ হওয়াতে ছোটভাই মনোতোষের নাম কারবারের স্বত্ব ট্র্যান্সফার করে দিলেন। দেনায় ভরা কারবারের স্বত্ব ছেলে কমলেশের উপর চাপিয়ে দিতে চাননি পরিতোষবাবু। পরিতোষবাবুও কি সেদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যতে একদিন এই কারবার বছরে তেত্রিশ হাজার টাকার নীট প্রফিট তুলে আনবে?

কী সুন্দর সিমলা। এপ্রিলের সিমলার পাহাড়ী আনন্দও যেন মাঝে মাঝে বাংলা দেশের বসন্তের মত নতুন পাতার সঙ্গে ঝিরঝির করে দুলছে, কাঁপছে ও কথা বলছে। রিজ থেকে সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে নেমে গিয়ে রেসকোর্সের কাছে এসে দাঁড়ায় চিন্তনীয়া আর কমলেশ। খুব কাছে, নীচের দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, প্লেনের ঘাসের সবুজ একেবারে স্রোতের জলের কিনারা পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছে। ফুটেছে রোডোডেনড্রন। তার চেয়ে বেশি রঙীন হয়ে চিন্তনীয়ার মুখে যেন অদ্ভুত একটা ইচ্ছার উৎসব ফুটে উঠতে চাইছে।

চিন্তনীয়া বলেছিল—দুঃখ করছো কেন কমলেশ?

কমলেশ—দুঃখ করছি না বেশ আশ্চর্য হচ্ছি।

—কেন?

—বিয়ে হবে না, একথা বলছো কেন?

—অনেক বাধা আছে ; অনেক অসুবিধে আছে। বাবার আপত্তি, বড়কাকার আপত্তি। মাসিমা, কাকিমা সবারই আপত্তি।

—তোমারও আপত্তি?

—বাধ্য হয়ে আমারও আপত্তি। কি করবো বল? সকলের আপত্তি তুচ্ছ করবার মত সাহস যে পাচ্ছি না।

কমলেশ হাসে—তাহলে আমারও বলবার কিছু নেই।

চিন্তনীয়া—কিন্তু ভালবাসা কি একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

—কি বললে?

—বিয়ে হবে না বলে কি আমাদের ভালবাসাও মিথ্যে হয়ে যাবে?

—মিথ্যে হয়ে যাবে কেন? কিন্তু...।

—কি?

—কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যেতে পারে, নিশ্চয়?

—হয়তো হবে।

—তবে?

—তবে আবার কি? ততদিন...যখনই তুমি ডাকবে, তোমার ইচ্ছে হলেই আমি তোমার কাছে যাব, আমি একটুও আপত্তি করবো না।

চিন্তনীয়ার কথাগুলি যেন পিপাসিত অগ্নিশিখার ভাষা। কমলেশের একটা হাত কত শক্ত

করে জড়িয়ে ধরেছে চিন্তনীয়া।

কমলেশ বলে—একটু সরে দাঁড়াও, কারা যেন আসছে।

চিন্তনীয়ার সেই ভয়ানক গা-ঘেঁষা সান্নিধ্যের স্পর্শ থেকে হঠাৎ একটু সরে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কমলেশ। কমলেশের সারা মুখ জুড়ে যেন একটা অপমানের যন্ত্রণা শিউরে উঠেছে। নিতান্ত সাধারণ অবস্থার এক ছাত্র-ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করবার সাহস নেই চিন্তনীয়ার, কিন্তু একটি ভয়ানক দুঃসাহস আছে। কমলেশকে শুধু একটা পুরুষ যৌবনের প্রাণী বলে মেনে নিতে আর সমাদর করতে আপত্তি নেই এই নারীর ; যার নাম চিন্তনীয়া।

সেই যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল কমলেশ, তারপর আর কোন মুহূর্তে চিন্তনীয়ার মুখের দিকে কোন আগ্রহ নিয়ে তাকাতে পারেনি। আর সেই যে, সিমলা ছেড়ে দিয়ে মীরাটে ফিরে এল কমলেশ, আর কোন দিন সিমলাতে যায়নি। চিন্তনীয়া অবশ্য বছরের প্রত্যেক ডিসেম্বরে আর জানুয়ারীতে মীরাটে এসেছে। বড়কাকার বাড়ির বাইরের ঘরে বসে কমলেশকে চিঠি লিখেছে। চিন্তনীয়ার চিঠি যেন মরিয়া হয়ে বার বার কমলেশকে ডেকেছে—একবার এস। তোমার মত মানুষকে আমার মত মেয়ে ডাকছে, এই সৌভাগ্য, এই সুযোগ তুচ্ছ করতে নেই।

কিন্তু কমলেশের প্রাণের কাছে এই চিঠির আহ্বানকে একটা দুঃসহ শ্লেষের আঘাত বলে বোধ হয়েছে। চিন্তনীয়ার সঙ্গে দেখা করেনি কমলেশ।

এই মীরাটেই একদিন যখন কানপুরের ব্যাঙ্কার নন্দবাবুর সঙ্গে চিন্তনীয়ার বিয়ে হয়ে গেল, তখন ঘরের টেবিলের উপর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিটার দিকে শুধু একবার তাকিয়েছিল কমলেশ। কিন্তু সে বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে পারেনি। কাজেই চিন্তনীয়াকেও আর দেখতে হয়নি।

সেই চিন্তনীয়া এখন কত খুশি হয়ে দার্জিলিংয়ের ম্যালের এক নিভৃতে একটি ছোট বেঞ্চির উপর ঝলমলে রোদের সঙ্গে দীপ্ত হয়ে বসে আছে।

বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে বেশ একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিল চিন্তনীয়া, তাই দেখতে পায়নি, অপরিচিত এক ভদ্রলোক কখন চিন্তনীয়ার এত কাছে এসে দণ্ডাড়িয়ে পড়েছেন।

—নমস্কার! চিন্তনীয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে হাত তোলে মাধব মিত্র।

—নমস্কার! হাত তুলে পাল্টা অভিবাদন জানায় চিন্তনীয়া।

মাধব মিত্র হাসে—আপনাকে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু এখনও জানি না, কে আপনি?

চিন্তনীয়া—আমিও আপনাকে কয়েকবার দেখেছি।

—দেখবেন বইকি। দার্জিলিংয়ে আমার বাড়ি আছে। বছরে অন্তত তিনটে মাস এখানেই থাকি। মাত্র দুটো গাড়িকে এখানে রেখেছি। তার চেয়ে বেশি দরকারও হয় না।

—আপনি বোধহয় কলকাতার...।

—হ্যাঁ। মার্চেন্ট! কলকাতার একটি গরীব দেশী মার্চেন্ট। এই দার্জিলিং পর্যন্তই দৌড়। এখনও লণ্ডনে কোন বাড়ি কিনতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, পুরীতে একটা, শিলংয়ে একটা আর হাজারিবাগে একটা বাড়ি অবিশ্যি আছে। আপনি বোধহয়...।

—আমি এখন মীরাটের মানুষ। আগে ছিলাম সিমলার মেয়ে। ছবির ম্যাগাজিন একপাশে সরিয়ে রেখে দিয়ে হাসতে থাকে চিন্তনীয়া।

—আমি মাধব মিত্র।

—আমি চিন্তনীয়া মজুমদার।

—কিন্তু মিস্টার মজুমদারকে দেখছি না কেন?

—তিনি এসেছিলেন। কিন্তু একদিন থেকেই চলে গিয়েছেন। এখন বোধহয় মীরাট থেকে কানপুর আর কানপুর থেকে মীরাটে ছুটোছুটি করছেন।

কিন্তু হলো না। কে জানে, কেন হলো না? তবু এদের চিন্তায় এই প্রশ্ন নিয়ে কোন জল্পনা কল্পনা ও গবেষণা ছিল না।

কিন্তু চিন্তনীয়া বেড়াতে এসেছিল ; একবার দেওঘরে, আর দুবার পাটনাতে। কলকাতাতে তো প্রতি বছরই একবার আসে। তাই এঁরা সবাই জানতে পেরে চমকে উঠেছিলেন, কেন চিন্তনীয়ার সঙ্গে কমলেশের বিয়ে হয়নি।

তাই এঁরা সবাই খুবই আশ্চর্য হয়ে বেশ একটু দুঃখিত হয়ে আর নিতান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে কমলেশকে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেলেছিলেন—চিন্তনীয়া এসব কী অদ্ভুত কথা বলে গেল? আমরা তো কোনদিন তোমার নামে এ-ধরনের কোন ব্যাপারের কথা শুনিনি।

মনে মনে হেসেই ফেলেছিল কমলেশ। ওধরনের কোন ব্যাপারই যখন হয়নি, তখন এঁরা শুনবেন কি করে? এসব ব্যাপার, কমলেশের জীবনের এই সব কলঙ্ককর ঘটনাগুলি যে চিন্তনীয়া নামে এক নারীর কল্পলোকের চমৎকার সৃষ্টি।

ঠিক কথা, কমলেশের বন্ধু লোকনাথের স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। মীরাটের পুলিসও ঠিক সন্দেহ করেছিল। কিন্তু হাসপাতালের রিপোর্টে শুধু বলা হয়েছিল, খাবারের সঙ্গে ধুতরার বিষ মিশেছিল, তাই এই দুর্ঘটনা। পুলিসের সন্দেহ অভিযোগ হয়ে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েও তাই কিছু করতে পারেনি। প্রমাণের অভাবে মামলা মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল।

লোকনাথ কমলেশের বন্ধু ; খুব সত্যি কথা। লোকনাথের স্ত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল এটাও সত্য ঘটনা ; লোকনাথের কাছে সে-কথা তার স্ত্রী নিজেই একদিন স্বীকার করেছিল। এই সবই সত্য। কিন্তু আরও একটা সত্য এই যে, লোকনাথের স্ত্রীকে কোনদিন চোখেও দেখেনি কমলেশ। তিন বছরের মধ্যে লোকনাথের বাড়িতে মাত্র তিনবার গিয়েছিল কমলেশ ; কিন্তু এই তিনবারই লোকনাথের স্ত্রী মীরাটের বাড়িতে ছিল না, কলকাতায় ছিল।

স্কুলের জীবনের সেই দুঃখের ঘটনাকে আজও স্পষ্ট মনে করতে পারে কমলেশ। ম্যাট্রিকুলেশনের ফাইন্যাল। অঙ্কের পরীক্ষা দিতে গিয়ে পরীক্ষার ঘরের মধ্যেই সীটের উপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল পনের বছরের কমলেশ। হেড মাস্টার ছুটে এসেছিলেন। আর নিজেই কমলেশকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ডাক্তার সরকারের ক্লিনিকে এসেছিলেন।

আরও তিনটে বিষয়ের পরীক্ষা বাকি ছিল। সে পরীক্ষা দিতে পারেনি কমলেশ। ছাত্রজীবনের আরও একটা বছর পুরনো ক্লাসেই থেকে যেতে হলো। মনে আছে কমলেশের, হেড মাস্টারের সঙ্গে আবার দেখা হতে কেঁদে ফেলেছিল কমলেশ।

বিলেতে থাকতে কোন উৎসবের ভোজের টেবিলেও মদের গেলাস স্পর্শ করেনি কমলেশ। বন্ধুরা ঠাট্টা করেছে ; তুমি একটি পিছু-তারিখের মানুষ। হ্যাঁ, পেটে একটা ব্যথা আজও আছে। ডাক্তার সরকার বলেছেন, ক্ষিদে তুচ্ছ করবার ফল। ডাক্তারের সন্দেহ মিথ্যে নয়। বিলেত থেকে দেশে ফিরেই রাজস্থানের এমন একটা জায়গায় খনিজ পাথর গুঁড়ো করবার একটা কারখানার মেশিন বসাবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিল কমলেশ, যেখানে ত্রিশ মাইল দূরের এক বাজার থেকে উটের পিঠে বাহিত হয়ে আটা আর নুন আসে। মীরাটের চেনা-জানা সকলেই বলেছিলেন, যেও না কমলেশ, ও জায়গায় চাকরি করতে গিয়ে শেষে কি না খেয়েই প্রাণটা হারাবে?

এমন কি নন্দবাবুও বলেছিলেন, যাবেন না। ওখানে পাঁচ টাকা খরচ করলেও এক সের দুধ পাবেন না। তবু গিয়েছিল কমলেশ। খুব মনে আছে, কাজের ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যেত, সকাল থেকে এই ছয় ঘণ্টার মধ্যে পেটে এক টুকরো রুটিও পড়েনি।

যাই হোক, চিন্তনীয়ার গবেষণা আর রটনা ধন্য। দেওঘরের জীবনকাকা দুঃখিত স্বরে বলেছিলেন, চিন্তনীয়া বললে যে, অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য তোমার পেটের ভিতরে একটা

ক্ষত হয়েছে। জীবনকাকাকে শুধু একটু কথা বলেছিল কমলেশ, চিন্তনীয়াই জানে, কেন সে একথা বললো।

মীরাটের কারখানার ভিতরে নিজের কেবিনে বসে কমলেশের মন হঠাৎ এক-একবার উতলা হয়ে এইসব কথাই ভাবে। মেসিনের গুঞ্জন আর হর্ষের শব্দ হঠাৎ যখন থেমে যায়, শুধু তখন চমকে ওঠে কমলেশ। তখন কিন্তু দার্জিলিংয়ের সেই নারীর সেই অদ্ভুত ভাষার ধিক্কারের শব্দটা বুকের ভিতরে যেন গুমরে ওঠে। কোন সন্দেহ নেই ; আর কেউ নয়, ওই চিন্তনীয়ার কাছেই এই মিথ্যা অপবাদের গল্পগুলি শুনতে পেয়েছে জয়ন্তী। কি আশ্চর্য, জয়ন্তীর মনে একবার এই প্রশ্ন দেখাও দিল না যে, চিন্তনীয়ার কথাগুলি সত্য না হতেও পারে। কত সহজে চিন্তনীয়ার মুখের নিদারুণ মিথ্যেটাকে বিশ্বাস করে বসে রইলো এক শিক্ষিতা যুক্তিবাদিনী ফিলসফার মেয়ে!

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, একটা চিঠি লিখে জয়ন্তীকে জানিয়ে দিতে, চিন্তনীয়ার মুখের গল্পগুলি আষাঢ়ে গল্পের চেয়েও মিথ্যে। তবু আপনার মত মানুষ সে মিথ্যে এত সহজে বিশ্বাস করে নিল কেন?

না, লিখে কোন লাভ হবে না। এভাবে জীবনের নিরীহতার কৈফিয়ৎ দেওয়াও একটা ভীরুতা। দার্জিলিংয়ের অতুলবাবুর মেয়ে জয়ন্তী এমন কোন মহীয়সী নন যে, তাঁর কাছে চরিত্রের শুদ্ধতার প্রমাণ দিয়ে প্রশংসার সার্টিফিকেট পেতে হবে।

চোদ্দ

শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। দার্জিলিংয়ের আকাশে কদাচিৎ কখনও রোদের আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তা ছাড়া সব সময়ই যেন একটা গম্ভীর বিষাদের সেঁতসেঁতে প্রলেপ দার্জিলিংয়ের আকাশকে ঢেকে রেখেছে।

সেদিনের পর অনেকদিন পার হয়ে গিয়েছে। তিন মাসেরও বেশী হবে। এরই মধ্যে ভক্তি পিসিমা কার্সিয়ং থেকে একবার এসেছেন আর বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছেন। আর জয়ন্তীর এখন জানতেও বাকি নেই যে, কমলেশ এখানে নেই। মনতোষবাবুর বাড়ির আয়া, সেই লেপচা বুড়ি এসেছিল। বুড়ি নিজেই বললে, কমলেশ বাবা মেরাট চলা গিয়া। বলতে গিয়েই কেঁদে ফেলেছে লেপচা বুড়ি।

কিন্তু নিজেরই চোখে দেখতে পেয়ে বেশ আশ্চর্য হয়েছে জয়ন্তী, মাধব মিত্র এখনও দার্জিলিংয়ে আছে। মাধবের গাড়ি এই বার্চহিল রোডের উপর দিয়ে প্রায় রোজই ছুটে চলে যায়। এক-একদিন দেখতে পেয়েছে জয়ন্তী, আর কেউ নয়, মাধব মিত্র নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই বাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে যেতে গিয়ে গেটের কাছে হর্ন বাজায় না মাধব মিত্র। এবাড়ির গেটের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও করে না মাধব মিত্র।

এটা জয়ন্তীর জীবনের একটা স্বস্তি। কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না, প্রতি বছর এই সময়ে যে ব্যস্ত মার্চেন্ট ভদ্রলোকের কলকাতায় থাকবার কথা, সে এখনও দার্জিলিংয়ের কুয়াশার মধ্যে ছুটোছুটি করে কেন?

আরও একটা আশ্চর্য, চিন্তনীয়া এখনও দার্জিলিংয়ে আছে, অথচ আর একদিনও জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। জয়ন্তীর বাবা অতুলবাবুর কাছেই চিঠি লিখেছেন নন্দবাবু, চিন্তনীয়ার চিঠি পাচ্ছি না। চিন্তনীয়ার দিদি অসীমাদিও কোন চিঠি দিচ্ছে না। ওরা সবাই কেমন আছে, আপনি একটু খোঁজ নিয়ে জানাবেন।

দার্জিলিংয়ে এসে চিন্তনীয়া যে অসীমাদির বাড়িতে আছে, একথা জয়ন্তীর জানাই ছিল। অসীমাদি চিরকুমারী মানুষ ; পঞ্চাশের উপর বয়স, মেয়ে স্কুলের টিচার। অসীমাদি তাঁর একাজীবনের গেরস্থালীর কাজ, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে টবের গাছের পাতা ছাঁটা পর্যন্ত

সবই নিজের হাতে করেন। তা ছাড়া স্কুলের কাজ আছে। এত কাজের পর যেটুকু সময় পান, সেটুকু সময়ও চুপ করে বসে থাকেন না। গীতা পড়েন অসীমাদি। চিন্তনীয়া শুধু এই একবার নয়, আরও কয়েকবার দার্জিলিংয়ে এসেছে। কিন্তু সেজন্য অসীমাদিকে কোন চিন্তায় পড়তে হয়নি। নিজেই টাকা খরচ করে আয়া আর বয় রেখেছে চিন্তনীয়া। চিন্তনীয়ার খাওয়া-দাওয়া আর সাজ-প্রসাধন, সবই অন্য রকমের। কিন্তু সেজন্য অসীমাদি একটু বিচলিত নন। তিনি তাঁর গীতা নিয়ে আর টবের ফুলের সেবা নিয়ে পড়ে থাকেন। চিন্তনীয়া দিনে কতবার কফি খেয়েছে সেটা বোধহয় অসীমাদির চোখেও পড়ে না। কিংবা চোখে পড়ে থাকলেও ঘটনাটা অসীমাদিকে চিন্তান্বিত করে তোলবার মত ব্যাপারই নয়। চিন্তনীয়াকে কোন কথা বলতে অথবা আদেশ করতে হলে বড় জোর একটু বলতে পারেন—নন্দ একটা চিঠি লিখেছে চিনু তুই চিঠিটা পড়ে নিয়ে একটা জবাব দিয়ে দিস।

অতুলবাবু খোঁজ নিয়ে এটা জানতে পেরেছেন বলেই জয়ন্তীও জানতে পেরেছে। অতুলবাবু আক্ষেপ করেন—চিন্তনীয়া একটা চিঠি লেখবারও সময় পায় না, কী আশ্চর্য!

কিন্তু এ বাড়িতে এসে একটিবার উঁকি দিয়ে যেতেও পারে না কেন চিন্তনীয়া? প্রশ্নটা জয়ন্তীর মনের একটা আক্ষেপ হয়ে মাঝে মাঝে ছটফট করে ওঠে। চিন্তনীয়া একবার এলে হয়। তাহলে সেই ভদ্রলোকের জীবনের আরও অনেক গল্প নিশ্চয় শুনতে পাওয়া যাবে। চিন্তনীয়া যদি নিজের থেকে কিছু না বলে, তবে জিজ্ঞাসা করেই জেনে নিতে পারা যাবে।

বুঝতে পেরে লজ্জাও পেয়েছে জয়ন্তী। ফিলসফি পড়তে আর একটুও ভাল লাগে না। বুকের ভিতরে যেন ছোট্ট একটা অভিমান ধুকপুক করছে। কোথা থেকে একটা অচেনা মানুষ এসে কদিনের মধ্যেই মনের মধ্যে একটা স্বপ্ন ধরিয়ে দিয়ে নিজেই আবার সেই স্বপ্নকে মিথ্যে করে দিল। শুধু কি মন? অস্বীকার করবার সাধ্যি নেই জয়ন্তীর, জলাপাহাড় রোডের বাড়ির সেই সন্ধ্যার ড্রয়িংরুমের নিরালায় নীরব অন্ধকারটা জয়ন্তীর এই সাবধানের শরীরটার সব আপত্তিকে একজনের স্পর্শের কাছে মিথ্যে করে দিয়েছিল। যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে হিসেব করেও কিছু বুঝতে পারা যায় না, কেন এমন ভুল হলো।

আরও অদ্ভুত, আজ সকাল থেকে বার বার শুধু মনে পড়ছে, জলাপাহাড় রোডের বাড়ির আয়াবুড়ি আর আসে না কেন। একবার যদি আসতো, তবে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারতো জয়ন্তী, মীরাটের কমলেশ দার্জিলিংয়ে আবার কবে আসবে। শিগগির আসবার কোন কথা আছে কিনা। বাড়ির লোকের মুখে এবিষয়ে কোন আলোচনার কথা আয়াবুড়ি শুনতে পেয়েছে কিনা।

অস্বীকার করবার উপায় নেই ; জয়ন্তীর মনে আজ যেন একটা নির্লজ্জ ইচ্ছা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আর একবার দার্জিলিংয়ে আসুক কমলেশ। যদি কমলেশের সঙ্গে দেখাও না হয়, তবু জয়ন্তীর প্রাণটা বোধহয় একটা সান্ত্বনা পেতে পারবে। দার্জিলিংয়ে এলে কি জয়ন্তী নামে এক নারীর কথা স্মরণ না করে পারবেন সেই অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক।

না, আয়াবুড়ি নয়। বারান্দা থেকে চটপট করে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢুকে আর জয়ন্তীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হেসে উঠলো যে আগন্তুক, সে হলো চিন্তনীয়া।

বেশ একটু অদ্ভুত রকমের হাসি ; চিন্তনীয়াকে এভাবে আসতে কোনদিন দেখেনি জয়ন্তী। যেন একটা ধাঁধার হাসি। এই সকালে এরকম একটা মূর্তি নিয়ে কোথা থেকে বেড়িয়ে এল চিন্তনীয়া? চোখের দৃষ্টিটা ক্লান্ত ; যেন ঘুমকাতুরে দুটো চোখ জোর করে তাকিয়ে থাকতে চেষ্টা করছে। চিন্তনীয়ার গায়ের পশমী ওভারকোটও যেন সেঁতসেঁত করছে। চিন্তনীয়ার খোঁপাতে কয়েকটা চোরাকাঁটা। চিন্তনীয়ার জুতোতে অনেক ধুলো ; সেই ধুলোও একটু কাদা-কাদা হয়ে উঠেছে। বোধহয় ধুলোর সড়কে অনেকদূর পেরিয়ে তারপর, শিশির ভেজা কোন মাঠের ঘাসের উপর অনেক হাঁটাহাঁটি করছে চিন্তনীয়া।

চিন্তনীয়া হাসে—আগে এক কাপ চা খাই। তারপর গল্প করবো।

কিন্তু চা আসবার আগেই গল্প শুরু করে দেয় চিন্তনীয়া। গল্পের ভাষাও মাঝে মাঝে চিন্তনীয়ার হাসির শব্দের মত কলকল করে ওঠে।—যাই বল জয়ন্তী ; এইবার দার্জিলিংয়ে এসে এত অসুবিধের মধ্যেও বেশ ভাল আছি।

জয়ন্তী—নন্দবাবু লিখেছেন, তোমার চিঠি পাচ্ছেন না।

চিন্তনীয়া—ঠিকই ; অসীমাদিকে কতবার মনে করিয়ে দিলাম, ভদ্রলোককে একটি চিঠি লিখে দিন বড়দি ; কিন্তু সব কথা স্রেফ ভুলে গেলেন। সর্বক্ষণ গীতা নিয়ে পড়ে থাকলে কাজের কথা মনে করবেন কখন?

জয়ন্তী—কিন্তু তুমি কেন...।

চিন্তনীয়া—আমি ভাই খুব ব্যস্ত আছি। এক মিনিটও সময় পাচ্ছি না। কাজেই ব্যস্ত হয়ে বড়দিকে অনুরোধ করেছিলাম।

চা আসে। চা খায় চিন্তনীয়া। কিন্তু জয়ন্তীর চোখের দৃষ্টি এবার যেন ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। কী সাংঘাতিক তৃষ্ণার্তের মত চা খাচ্ছে চিন্তনীয়া। দেখতে একটুও ভাল লাগছে না। কিন্তু চিন্তনীয়ার মুখের ভাষা কলকল করে বেজে ওঠে।—বাস্তবিক, চমৎকার মানুষ। আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, পুরুষ মানুষের মন এত নরম আর এত উদার হতে পারে।

জয়ন্তী—কার কথা বলছো?

চিন্তনীয়া—তুমি চিনবে না। অথচ ভদ্রলোক তোমাদের এই দার্জিলিংয়েই আছেন। প্রতি বছর এখানে আসেন আর কিছুদিন থাকেন। কলকাতার মার্চেণ্ট মাধব মিত্র।

চমকে ওঠে জয়ন্তী।—তোমার সঙ্গে ভদ্রলোকের চেনা হয়েছে কবে?

—এই তো কিছুদিন হলো। ভদ্রলোকের মনটা যেন শিশুর মন। কথাবার্তাও সেইরকম। বেশ টাকা পয়সার মানুষ, কিন্তু প্রায় সন্ন্যাসীর মত একটা জীবন। বিশেষ করে...।

কি-যেন বলতে গিয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে একটা সলজ্জ হাসির আবেগ ঢাকা দিল চিন্তনীয়া। কিন্তু জয়ন্তী কোন প্রশ্ন করে না। শুধু চোখের দৃষ্টিটা অপলক করে যেন একটা নাটকের রহস্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু কিছুই বলতে পারে না।

চিন্তনীয়া বলে—দেখে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়েছে। বিশেষ করে মেয়েদের চোখের সামনে ভদ্রলোক যেন একটা ভীরু খরগোস। সরে যাবার জন্যে ছটফট করেন। পালিয়ে যেতে পারলে আরও খুশি হন। আমি জীবনে এরকম ভাল-মানুষ কখনো দেখিনি।

জয়ন্তী কোন কথা বলে না, কিন্তু চিন্তনীয়ার খুশীর কথা ফুরোতে চায় না। ভদ্রলোক যেন এই পৃথিবীরই মানুষ নয়। আশেপাশে কে আছে বা না আছে, কে আসছে বা চলে যাচ্ছে, কিছুই যেন ভদ্রলোকের চোখে পড়ে না। যখন জিজ্ঞাসা করলাম, দার্জিলিংয়ের অতুলবাবু কিংবা অতুলবাবুর মেয়ে জয়ন্তীকে কোনদিন দেখেছেন কিনা, তখন অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলেন। তোমাদের বাড়ির সামনের এই রাস্তা দিয়ে ভদ্রলোক রোজই যান, তবু তোমাদের কাউকে চেনেন না।

জয়ন্তী—তুমি কি এখন বেড়াতে বের হয়েছ? না বেড়িয়ে ফিরছো?

চিন্তনীয়া—বেড়িয়ে ফিরছি। মাধববাবু বলেছিলেন, রোজ ভোরে তিনি টাউন থেকে একটু দূরে নিরিবিলি কোন সড়কের পাশে চুপ করে বসে থাকেন।

—কেন?

—ঘুমন্ত ফুল কেমন করে ভোরের আলোতে আস্তে আস্তে জেগে ওঠে দেখতে খুব ভালবাসেন এই মাধববাবু। তাই...।

—কি বললে?

—তাই একবার পরীক্ষা করতে বের হয়েছিলাম। একবার সন্দেহ হয়েছিল, কথাটা একটু

বাড়িয়ে বলেননি তো ভদ্রলোক। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, ঠিক। ভোরের কুয়াশার মধ্যে রাস্তার পাশে একটা নিরিবিলি কিনারায় বড় বড় ঘাসে ঘেরা একটা পাথরের কাছে বসে আছেন ভদ্রলোক। আমি কাছে যেতেই ভদ্রলোকের যেন স্বপ্ন ভেঙে গেল। বেশ একটু রাগও করলেন বলে মনে হলো।

—কেন?

—জানি না, কেন। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, এরকম একটু-আধটু রাগ করলেও মাধববাবু মানুষটা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন।

—কেমন করে বুঝলে?

—মাধববাবু নিজেই অন্তত দশবার বলেছেন, আমাদের দুজনের এই শ্রদ্ধার সম্পর্ক যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।...আচ্ছা, আমি এবার উঠি জয়ন্তী।

চলে গেল চিন্তনীয়া। কিন্তু জয়ন্তীর প্রাণটা যেন একটা ভয়াল স্তব্ধতার মধ্যে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে। ভাবতে ভয় করে, সন্দেহ করলে বুক চমকে ওঠে। চিন্তনীয়ার কথাগুলিকে একটা ভয়ানক গোপন পৃথিবীর অন্ধকারের ভাষা বলে মনে হয়। চিন্তনীয়ার খোঁপাতে চোরকাঁটা ; কী ভয়ানক একটা বিভীষিকার ছবি।

না, অসম্ভব। কোন মেয়ের জীবন শত জঘন্য ভুল করলেও এমন ভয়ানক চোরকাঁটার উপর গড়াগড়ি দিতে পারে না।

কিন্তু চিন্তনীয়াকে যে সত্যিই মিথ্যে কথার একটি ফুলঝুরি বলে মনে হয়। তা না হলে মাধব মিত্রকে একটা শুদ্ধসত্ত্ব মহামান্য বলে প্রচার করতে চিন্তনীয়ার মুখের ভাষায় অন্তত সামান্য একটু কুণ্ঠা থাকতো। এই মাধব মিত্র, যে লোকটা একেবারে অশিক্ষিত রক্তমাংসের একটা নির্লজ্জ লোভ হয়ে জয়ন্তীর জীবনের উপর একটা অপমানের উৎপাত ঘটাতে চেয়েছিল, মাধব মিত্রের ক্ষুদ্র মনুষ্যত্ব কী ভয়ানক মিথ্যা প্রচার করতে পারে ; সেটা জানা আছে জয়ন্তীর। এই মাধব মিত্রের মিথ্যে কথার কাছে কান পেতে আর পাগল হয়ে গিয়ে মীরাটের কমলেশ জয়ন্তীকে একটা অশুচি অস্তিত্বের জঞ্জাল বলে বিশ্বাস করে ফেলেছে। কিন্তু চিন্তনীয়াও যে...।

ছটফট করে জয়ন্তীর মনের একটা দুঃসহ অস্বস্তি। চিন্তনীয়াও যে কমলেশের নামে একটা ভয়ানক অশুচি জীবনের কাহিনী শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সে কাহিনী কি চিন্তনীয়ার মনগড়া একটা ভয়ানক মিথ্যা হতে পারে না? কমলেশ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করে বসে, তুমি যদি চিন্তনীয়ার কথা বিশ্বাস কর, তবে আমি কেন মাধব মিত্রের কথা বিশ্বাস করবো না?

পনেরো

কাকিমার চিঠির ভাষাটা অদ্ভুত। লিখেছেন, আমি খুব অসুস্থ। তোমার কাকার শরীরও ভাল যাচ্ছে না। যদি এসময় একবার আসতে পার, তবে ভাল হয়। তা ছাড়া, অতুলবাবুরও ইচ্ছা, তুমি একবার এখানে আস।

এর মধ্যে অতুলবাবুর ইচ্ছার কথা আসে কেন? কাকিমার চিঠিটাকে দুবার পড়বার পরেও কমলেশের মনের সন্দেহটা ভাঙেনি। অতুলবাবুর ইচ্ছের অর্থটা কি। তাঁর ফিলসফার মেয়েকে তিনি বোধহয় চিনতে পারেননি। নিতান্ত রুক্ষ অহংকারের এক নারী। চিন্তনীয়ার মত এক সাংঘাতিক মিথ্যাবিলাসিনীর মুখ থেকে মন-গড়া অপবাদের গল্প শুনে কমলেশকে একটা অমানুষ বলে বিশ্বাস করে ফেলেছে যে, তার সঙ্গে কমলেশের জীবনের কোন সম্পর্ক যে সম্ভব নয়, এ সত্য জানেন না, বুঝতেও পারেননি অতুলবাবু।

কিন্তু কাকিমার চিঠির অনুরোধ তুচ্ছ করতে পারেনি কমলেশ। তাই দশ দিনের ছুটি নিয়ে দার্জিলিংয়ে এসেছে।

দেখে খুশি হয়েছে কমলেশ, কাকিমাকে যতটা অসুস্থ বলে কল্পনা করা হয়েছিল, ঠিক ততটা অসুস্থ নন। চিন্তিত হবারও তেমন কোন কারণ নেই। আর কাকার শরীর তো সেই চিরকেলে কাশির শরীর। নতুন করে চিন্তিত হবার কিছু নেই।

তাই এখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, তুমি অতুলবাবুর কথা চিঠিতে লিখলে কেন কাকিমা? আরও একটা কথা স্পষ্ট করেই জানতে ইচ্ছে করে—জয়ন্তী কি এর মধ্যে কোনদিনও এখানে আসেনি!

মীরাট থেকে রওনা হবার আগে কোন মুহূর্তেও কল্পনা করতে পারেনি কমলেশ যে, জয়ন্তীর কথা জানবার জন্যে, জয়ন্তীকে দেখবার জন্যে মনের ভিতরে এরকম একটা তেষ্টা জেগে উঠবে।

কল্পনা করতে পারেনি কমলেশ, পথের মধ্যেই একটা স্বপ্নেরও অগোচর ঘটনা একেবারে একটা কঠিন বাস্তবতার মূর্তি ধরে দেখা দেবে। শুনতে পাওয়া গেল, ট্রেনটা কার্সিয়ং স্টেশনে প্রায় দুঘণ্টা থেমে থাকবে। কে জানে কেন? বোধহয় লাইনের কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে।

কার্সিয়ংয়ের ওয়েটিং রুম। অপেক্ষার কোন যাত্রী সেখানে ছিল না। শুধু কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন এক যাত্রিনী। ওয়েটিং রুমে ঢুকতেই, আর সেই যাত্রিনীকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠলো কমলেশ। সে নারী কিন্তু চমকে ওঠে না। বরং চমৎকার একটি লালচে হাসির আভা সে নারীর সারা মুখের ওপর এক ঝলক খুশির মত ছড়িয়ে পড়ে। চিন্তনীয়া বলে—চিনতে পারছেন নিশ্চয়।

—কমলেশ—নিশ্চয়।

চিন্তনীয়া—আমি জানতাম, একদিন না একদিন এরকম হঠাৎ একটা দেখা হয়ে যাবে।

কমলেশ—ট্রেন এখন যাচ্ছে না ; তাই বাধ্য হয়ে...।

চিন্তনীয়া—জানি, কিন্তু নিশ্চয় জানতে না যে, আমাকে এখানে দেখতে পাবে।

কমলেশ—ওসব কোন কথাই আমার মনে হয়নি।

কিন্তু কমলেশের চোখের চাহনি যেন একটা বিস্ময়ের আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে। চিন্তনীয়ার চেয়ারের পাশে মেজের কার্পেটের উপরে রাখা আছে একটি চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগের গায়ে সাদা হরফে লেখা—মাধব মিত্র।

চিন্তনীয়া হাসে—এটা এক যাত্রী ভদ্রলোকের ব্যাগ।

কমলেশ—তার ব্যাগ আপনার কাছে কেন?

চিন্তনীয়া—আমাকে আজ হঠাৎ আপনি করে বলছো কেন'!

উত্তর দেয় না কমলেশ। চিন্তনীয়া বলে,—এ ভদ্রলোক আমার চেনা। কলকাতার এক মার্চেন্ট ; এখন দার্জিলিংয়েই আছে। কিন্তু অসহ্য!

কমলেশ—কি বললেন?

চিন্তনীয়া—লোকটাকে দেখলে আমার ভয় করে। কতবার অপমান করে কথা বলে দিয়েছি, তবু কাছে এসে কথা বলবে, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবে। আমার দার্জিলিং-জীবন দুঃসহ করে তুলেছে এই লোকটা।

কমলেশকে তবু চুপ করে থাকতে দেখে চিন্তনীয়ার চোখে একটা অভিমানের ভ্রূকুটি শক্ত হয়ে ওঠে,—সব শুনেও আমার জন্যে একটা সামান্য সিমপ্যাথির কথা বলতে পারছো না।

কমলেশ হাসতে চেষ্টা করে,—দার্জিলিং ছেড়ে চলে গেলেই পারেন।

—হ্যাঁ, এবার যেতেই হবে। কিন্তু যাবার আগে লোকটাকে শুনিয়ে দিয়ে যাব যে, আমার স্বামী তোমার মত তিনটে মার্চেন্টকে চাকর রাখতে পারে।...যাই হোক্, তুমি আবার দার্জিলিংয়ে এলে কেন। কোন কাজ আছে?

কমলেশ—না।

চিন্তনীয়া—তবে আর মিছিমিছি পুরনো দিনের একটা বাজে অভিমান মনে পুষে রেখে...।

কমলেশ—আপনি এমন কথা না বললেই ভাল করতেন।

চিন্তনীয়া—আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। তুমি যতদিন দার্জিলিংয়ে থাকবে, ততদিন আমিও থাকবো, আর, যখনই ডাকবে তখনই...।

ঘর ছেড়ে চলে যায় কমলেশ। মনে হয়, এক নাগিনীর ফণা কমলেশের বুকে ছোবল দেবার জন্যে ছটফট করে উঠেছে। একটা বেপরোয়া লোভের বিষ কী ভয়ানক পিপাসা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। অথচ নন্দবাবু বলেন, চিন্তনীয়া কেন যেন কমলেশের নাম সহ্য করতে পারে না। চিন্তনীয়ার আপত্তির জন্যেই কমলেশকে কোনদিন চা খেতে ডাকতে পারেননি নন্দবাবু।

ফিরে গিয়ে ট্রেনের কামরার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কমলেশ। হঠাৎ কাঁধের উপর একটা হাতের স্পর্শ ঠেকতেই চমকে ওঠে। দেখতে পায়, কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে মাধব মিত্র।

—কি খবর মাধব? শুকনো স্বরে প্রশ্ন করে কমলেশ।

মাধব বলে—কোন খবর নেই। মিছিমিছি একবার ঘুম বেড়িয়ে আসবার জন্যে বের হয়েছি। দার্জিলিং আর ভাল লাগছে না।

—একাই আছ?

—হ্যাঁ, একা ছাড়া আমার তো কোন গতি হতে পারে না। সেটা তুমিও জান।

—কিন্তু এরকম একেবারে উদাসী সাধুর মত একা কেন? কোন জিনিসপত্রও তো সঙ্গে নেই।

—না ; একটা ব্যাগও না। আমি এরকম একা হয়ে আর শূন্য হয়ে থাকতেই যে ভালবাসি, সেটা তো তুমি ভাল করেই জান।

কমলেশ হাসে।—না, খুব ভাল করে জানতাম না। আজ জানলাম।

মাধব—তোমার ট্রেন ছাড়তে তো অনেক দেরি আছে।

—হ্যাঁ।

—তবে কি এতক্ষণ এই কামরাতেই থাকবে?

—হ্যাঁ।

—আমিও যাই। একবার মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা করে আসি। চা খাওয়াও হবে, আবার পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করাও হবে। তার আগে তো ঘুমের দিকে যাবার কোন ট্রেন নেই।

কমলেশ—কেন। ওয়েটিং রুমে থাকলেই তো পার।

মাধব—না, সম্ভব নয়।

—কেন?

—ওখানে একজন অপরিচিতা মহিলা একা বসে আছেন। কাজেই...।

ব্যস্তভাবে চলে গেল মাধব মিত্র। কমলেশের মনের ভিতরে যেন একটা কঠিন ঠাট্টার চাবুক শব্দ করে আর আছড়ে-আছড়ে পড়তে থাকে। জ্বালা বোধ করে কমলেশ, আর সেই জ্বালাটাই যেন কথা বলতে থাকে ; এই হলো সেই মাধব মিত্র, যার কাছ থেকে জয়ন্তীর জীবনের গল্প শুনতে পেয়েছিল কমলেশ।

কী অদ্ভুত শান্তভাষায় কত মিথ্যে কথা বলে চলে গেল মাধব মিত্র। যে নারীর কাছে বেড়াবার জীবনের ব্যাগটি সঁপে দিয়ে এসেছে মাধব, তাকে এক অপরিচিতা মহিলা বলতে একটুও বাধলো না। মানুষের ভিতরে ও বাহিরে এমন ভয়ানক অমিল থাকতে পারে কেমন করে?

দার্জিলিংয়ে এসে যত বার কার্সিয়ং স্টেশনের ঘটনার কথা মনে পড়েছে কমলেশের, ততবার সারা মনটা যেন লজ্জায় ভরে গিয়েছে। একটা মিথ্যে অপবাদের প্রচারের কাছে কত

সহজে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, যুক্তি-বুদ্ধি সবই অসহায় হয়ে যায়। মাধব মিত্রের সেই-সব কথাকে একটু সন্দেহ করতে পারেনি, কমলেশের এই মূর্খ দুর্বলতাকে যদি কেউ ভয়ানক একরকমের চরিত্রহীনতা বলে অভিযোগ করে ; তবে সেটা ভুল অভিযোগ হবে কি?

দুপুর বেলাতে ঘুমোবার অনেক চেষ্টা করেও ঘুম হলো না। বার বার শুধু মনে পড়ে, জয়ন্তী একবারও এবাড়িতে আর আসেনি। জয়ন্তী জানেও না যে, কমলেশ আবার দার্জিলিংয়ে এসেছে। জয়ন্তী এখন কল্পনাও করতে পারছে না যে, কমলেশের প্রাণটাই লজ্জা পেয়েছে। ইচ্ছে করে, এখনই একবার বের হয়ে সোজা বার্চহিল রোডের দিকে চলে যেতে ; আর জয়ন্তীর কাছে গিয়ে একেবারে মুখ খুলে বলে দিতে—মাধব মিত্রের কথা বিশ্বাস করি না। মাধব যে কতবড় মিথ্যাবাদী তার প্রমাণ পেয়েছি।

সাড়া শোনা যায় ; কোন আগন্তুক এসেছেন আর বাইরের ঘরে কাকার সঙ্গে কথা বলছেন। গলার স্বরটাও পরিচিত বলেই মনে হয়।

উঠে গিয়ে দেখতে পায় কমলেশ, নন্দবাবু এসেছেন। হাসছেন নন্দবাবু, আর কাকার সঙ্গে কারবারের অসুবিধার নানা কথা বলছেন।

কাকা বড় গম্ভীর। কিন্তু নন্দবাবু যেন কাকার এই গাম্ভীর্যকেই হেসে হেসে ঠাট্টা করছেন।—আপনি মিথ্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন মনতোষদা। চিন্তনীয়া এমন বোকা নয় যে ভুল করে একটা বিপদ বা আপদে পড়ে...।

কথা শেষ না করেই, আবার কমলেশের দিকে তাকিয়ে আরও জোরে হেসে ওঠেন নন্দবাবু।—দুদিন হলো দার্জিলিংয়ে এসেছি। কিন্তু চিন্তনীয়ার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি। অসীমাদি কিছুই বলতে পারলেন না, কোথায় গিয়েছে চিন্তনীয়া। শুধু বলে গিয়েছে, দিন চারেক পরে ফিরবে। তাই মনে হচ্ছে, আজই হয়তো ফিরবে চিন্তনীয়া। যাই হোক...।

মনতোষবাবুর চোখের চাহনিটা ক্ষুব্ধ হয়ে ধোঁয়াটে প্রদীপের মত জ্বলছে। কমলেশের চোখের তারা দুটোও শিউরে ওঠে। কিন্তু নন্দবাবু যেন নিজের মনের সুখে বিহ্বল হয়ে চিন্তনীয়া নামে এক নারীর জীবনের প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন।—সত্যি, চিন্তনীয়ার মত নির্ভয় মনের মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। আমি বরং বলবো, দেখা যায় না। তবে একটু ভুলো মন। সব সময় আমাকে ঠিক জানিয়ে দিয়ে যেতে পারে না, কোথায় যাচ্ছে। গত বছর কানপুর থেকে মীরাটে ফিরে অবিশ্যি একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম, সাত দিনের মধ্যেও চিন্তনীয়ার কোন চিঠি পাইনি। না বলে কয়ে কোথায় চলে গেল মানুষটা? কিন্তু ঠিক তার পরের দিনই চিঠি পেলাম, দিল্লীতে আছে চিন্তনীয়া। চিঠিতে অন্য কোন কথা বিশেষ কিছু নেই ; শুধু আমার জন্যেই যত চিন্তা আর ভাবনা। বাস্তবিক, চিন্তনীয়ার মনটা খুবই মায়ার মন, অসম্ভব রকমের সিনসিয়ার।

মনতোষবাবু—তুমি আজ রাত্তিরে এখানেই এসে খেয়ে যেও।

নন্দবাবু—নিশ্চয়। কিন্তু যদি চিন্তনীয়া আজ এসে পড়ে ; তবে অবিশ্যি...তার মানে...চিন্তনীয়া যদি হঠাৎ কোন আপত্তি না করে, তবে নিশ্চয় আসবো।

মনতোষবাবুর ধোঁয়াটে চোখে আর একবার একটা বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কিন্তু কোন কথা বললেন না মনতোষবাবু।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নন্দবাবু।—চলি!

নন্দবাবুর সঙ্গেই হেঁটে হেঁটে, লন পার হয়ে একেবারে ফটকের কাছে এগিয়ে আসে কমলেশ। নন্দবাবু নিজেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। বার বার কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে এইবার যেন একটু সগর্ব ভঙ্গীতে হাসতে থাকেন নন্দবাবু!—আপনার কাছে বলতে কোন লজ্জা নেই কমলেশবাবু, আমি খুবই হ্যাপি মানুষ।

কমলেশের মাথাটা হঠাৎ হেঁট হয়ে যায়। নন্দবাবুর চোখ দুটো একটা তৃপ্তিতে বিহ্বল হয়ে

ফটকের লতা-পাতার দিকে তাকিয়ে থাকে।—চিন্তনীয়া আমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি কি সত্যিই আমাকে সন্দেহ কর? আমি বলেছি, আমি পাগল হয়ে গেলেও তোমাকে সন্দেহ করতে পারবো না। বলুন কমলেশবাবু, খুব খাঁটি কথা বলেছি কিনা!

কমলেশের মুখ থেকে চাপা অর্তনাদের মত অদ্ভুত শব্দ করে শুধু একটা কথা গুমরে ওঠে।—হ্যাঁ।

ষোল

কাকিমা ডাকলেন!—কমল, তুমি কোথায়?

ও ঘর থেকে উত্তর দেয় কমলেশ।—এই যে, আমি এখানে।

কাকিমা—জয়ন্তী এসেছে।

চমকে ওঠে কমলেশ। কিন্তু কল্পনা করতে পারে না, অতুলবাবুর ফিলসফার মেয়ে আজ কি মনে করে, এতদিন পরে, এবাড়িতে আবার এসেছে। জয়ন্তী বোধহয় জানতো না যে কমলেশ এখন এখানেই আছে।

কাকিমা আবার ডাকেন।—জয়ন্তী চলে যেতে চাইছে। একবার এসে দেখা করে যাও।

কমলেশ ঘরে ঢুকতেই হেসে ফেলে জয়ন্তী।—আমি জানতাম, আপনি এখানে আছেন।

কমলেশ—কেমন করে জানলেন!

জয়ন্তী—আয়াবুড়ির কাছে খবর পেয়েছি।

কমলেশ হাসে—তাই বলুন। কিন্তু নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি।

জয়ন্তী কাকিমার মুখের দিকে তাকায়।—শুনুন কাকিমা, এখনও কেমন রাগ করে কথা বলছেন মীরাটের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।

কাকিমা।—না না, রাগ করে বলবে কেন? রাদগ করবার কিছু নেই। কমলেশ কারও ওপর রাগ করবার মত ছেলেই নয়।

জয়ন্তী—আপনি জানেন না কাকিমা, দার্জিলিং থেকে আসার আগে বাড়ি চড়াও করে আমাকে কী ভয়নাক ধমকে আর শাসিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

কাকিমা—না না, ওসব কোন কথাই নয়। যত বাজে কথা। আচ্ছা, তোমরা এখন বাইরের ঘরে গিয়ে বসো। হ্যাঁ, যাবার আগে আমাকে একবার বলে যেও জয়ন্তী।

কমলেশের দুচোখে যেন একটা বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, ঠিক বুঝতে পারছে না, বিশ্বাস করতেও পারছে না কমলেশ, কে কথা বলছে। কাকিমার কথাগুলিতে মনে হয়, যেন আজকের বিকেলের সব আলো-ছায়া একেবারে নতুন রকমের একটা রূপ ধরে নতুন ভাষায় কথা বলছে। জয়ন্তীর মুখের হাসি আর জয়ন্তীর মুখের ভাষা, দুইই যেন দুটি নতুন অভ্যর্থনা। ফিলসফি নিয়ে মাথা ঘামায়, ভালবাসার হিসেব করে, আর এক মুহূর্তের সংশয়ে সব ভেঙ্গে-চুরে দেয়, এই জয়ন্তী সেই মেয়ে নয়।

কিন্তু এই সেই ড্রইং-রুম ; সেই সোফা আর কোচ। তবু ভিতরে না ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে জয়ন্তী।—আমি শুধু একটা কথা আপনার কাছে বলতে এসেছিলাম।

শুধু জয়ন্তী কেন, কমলেশও যে ওই ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এক অদৃশ্য বাধা ; কিন্তু ভয়ানক কঠিন বাধা।

কমলেশ—বলুন, কি বলতে চান।

জয়ন্তী—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—একথা কেন বলছেন?

—একটা মিথ্যে গল্প শুনে আর সে-গল্প বিশ্বাস করে আপনার মত মানুষকে সন্দেহ করেছি!

--আমিও তো ঠিক এইরকম কীর্তি করেছি। বাজে লোকের মুখ থেকে শোনা একটা মিথ্যে গল্পকে বিশ্বাস করে আপনাকে...।

জয়ন্তী করুণভাবে হাসে।—সত্যিই, কি যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

কমলেশ—আমারও আজ বিশ্রী একটা অস্বস্তি ; তার মানে বেশ একটু লজ্জা বোধ করতে হচ্ছে যে...।

জয়ন্তী—থাক্, আর এসব কথা তুলে লাভ নেই। কবে মীরাট ফিরে যাচ্ছেন?

--ধরুন, আর দিন তিন-চারের মধ্যেই।

এরপর আর কি কথা হতে পারে, আর কি বলবারই বা আছে? জয়ন্তী শুধু চুপ করে বারান্দার টবের অর্কিডের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কমলেশ দেখতে পায়, বিকেলের আলো মিইয়ে আসছে। ভালবাসার বাধা জয় করতে এসে দুজনে এখনও যেন অলস হয়ে আছে। নিশ্বাসের বাতাসে ব্যস্ততা নেই ; চোখের চাহনিতে কোন ব্যাকুলতা দুরন্ত হয়ে ওঠে না।

কী আশ্চর্য, যেদিন দুজনের মধ্যে চেনা-শুনা কোন সম্পর্কের সামান্য বন্ধনও ছিল না, সেদিন খাজুরাহোর সেই মন্দিরের একটি নিভৃতে, যুগল পাথুরে মূর্তির আলিঙ্গনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে যে-দুজনের মনে কোন বাধা ছিল না, আজ তারা এভাবে এত কাছাকাছি হয়েও এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, চলে যেতে চাইছে জয়ন্তী। কমলেশও বুঝতে পারে না, আর এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই বা কী লাভ আছে।

না, জয়ন্তীর মনে আর কোন ভয় নেই। চিন্তনীয়া যে-সব ভয়ানক কথা বলেছে, সেগুলি সবই নিতান্ত মিথ্যা। আজ আর এ সত্য বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই। কমলেশের জীবনে কোন খুঁত নেই কোন ভয়ানক ক্ষতচিহ্ন নেই।

কমলেশও বুঝেছে, মাধব মিত্রের মুখের সেই ভয়ানক গল্প, মিথ্যেবাদীর একটা মনগড়া অপবাদের গল্প মাত্র। জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, নিখুঁত জীবনের একটি মেয়ের সুন্দর মুখটা ভোরের ফুলের মত ফুটে রয়েছে। কোন ক্ষত নেই, থাকতেও পারে না।

বোধহয় বুঝতে পারেনি জয়ন্তী আর কমলেশ, বিকেলের শেষ আলো ফুরিয়ে গিয়ে কখন সন্ধ্যার প্রথম আঁধার ছড়িয়ে পড়েছে।

ফটক পার হয়ে কে যেন এবাড়ির এই ঘরেরই বারান্দার দিকে আসছে। জয়ন্তী ব্যস্তভাবে বলে--এবার আমি যাই।

বারান্দায় দেওয়ালের সুইচ টিপে আলো জ্বালে কমলেশ।--সত্যিই যাবেন?

জয়ন্তী—হ্যাঁ।

আগন্তুকের মূর্তি একেবারে বারান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কমলেশের চোখের দৃষ্টি চমকে ওঠবার আগেই আগন্তুকের মুখে যেন একটা দুরন্ত বিস্ময়ের শব্দ বেজে ওঠে।—এ কি? জয়ন্তী এখানে কি মনে করে? কতক্ষণ?

জয়ন্তী—অনেকক্ষণ। কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

চিন্তনীয়া—আমিও তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। কিন্তু ভাবতে পারিনি, তোমাকে এখানে দেখতে পাব।

জয়ন্তী—নন্দবাবু কাল আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

চিন্তনীয়া—কেন?

জয়ন্তী—এমনই।

চিন্তনীয়া বারান্দার উপরে উঠে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়,—ভাল কথা। কিন্তু মনে হচ্ছে,

কমলেশবাবু আমাকে চিনতে পারছেন না।

কমলেশ হাসতে চেষ্টা করে।—না চেনবার তো কোন কারণ নেই।

চিন্তনীয়া—তবু তো নিজের থেকে একটা কথা বললেন না।

কমলেশ—বলতাম নিশ্চয়।

চিন্তনীয়া অদ্ভুত ভাবে হাসে,—না, বলতেন না। কিন্তু আজ পাটনার মেয়ে মানসীর সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয় চুপ করে থাকতে পারতেন না।

কমলেশের দুই চোখ তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে, কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন উদাস হয়ে যায়। চিন্তনীয়াকে পাল্টা কোন কথা বলে জবাব দেবার মত কোন ভাষা, কোন যুক্তি আর কোন জোর নেই আজকের এই কমলেশের।

জয়ন্তী শুধু অপলক চোখ তুলে কমলেশের এই উদাস মূর্তিটাকে দেখতে থাকে। তার পরেই বলে—আমি চলি কমলেশবাবু।

চিন্তনীয়া হেসে ওঠে,—কোথায় যাবে জয়ন্তী? বাড়ীতে?

জয়ন্তী—হ্যাঁ।

চিন্তনীয়া হাসে—বেশ তো সেজন্যে এত ব্যস্ত কেন? তোমার ব্যস্ততা এখন বোধ হয় কলকাতায় আছেন।

জয়ন্তী চকিতে একবার চিন্তনীয়ার এই ভয়ানক হাসিমুখর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই মাথা হেঁট করে।

চিন্তনীয়া বলে—সলিলবাবু এখন কলকাতাতেই আছেন বলে শুনেছি।

বারান্দায় চেয়ারের উপরে বসে পড়ে হাসতে থাকে চিন্তনীয়া।—এইবার কমলেশবাবুর কাকিমার কাছে দুমিনিট কথা বলে নিয়েই চলে যাব।

জয়ন্তী বারান্দার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। যেন চতুর ও হিংস্র একটা পরাভবের কাছে মাথা হেঁট করে এইবার সরে যেতে চাইছে জয়ন্তী। না যেয়ে উপায় নেই। মিথ্যে কথার চিন্তনীয়াকে এইবার নিতান্ত একটা সত্য কথা বলে দিয়েছে। কিন্তু কমলেশ যেন একটা কঠোর আক্রোশের ঝড়ের মত এগিয়ে যেয়ে জয়ন্তীর পথ আটক করে,—কোথায় যাচ্ছো?

জয়ন্তীর চোখের দৃষ্টি থরথর করে কাঁপছে,—চিন্তনীয়ার কথা শুনলে তো?

কমলেশ—শুনেছি।

জয়ন্তী—মিথ্যে কথা বলেনি চিন্তনীয়া।

কমলেশ—নিশ্চয় মিথ্যে কথা।

জয়ন্তী—না।

কমলেশ—হোক্ সত্যি কথা ; কিন্তু একেবারে বাজে কথা।

চিন্তনীয়া হেসে ওঠে।—কিন্তু জয়ন্তী বেচারা কি বিশ্বাস করতে পারছে না, কমলেশবাবুর সেই মানসীও একটা মিথ্যে কথা?

চিন্তনীয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে জয়ন্তী—মিথ্যে কথা না হোক্, একেবারে বাজে কথা।

চিন্তনীয়া হাসতে থাকে, কিন্তু হাসির শব্দটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। রুমাল তুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আর দুই চোখ বড় করে দেখতে থাকে চিন্তনীয়া, জয়ন্তীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে ড্রইং রুমের বিশ্রী অন্ধকারের ভিতরে চলে গেল কমলেশ।

রূপসাগর

রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল।

কে জানে কোন রূপের কথা গান গেয়ে শুনিয়ে যেত সেই নন্দ বাউল! মাথা দুলিয়ে আর টলে টলে নাচত নন্দ বাউল। গুনগুন করত তার হাতের একতারা। গানটা শুনতে ভালই লাগত, যদিও বুঝতে পারা যেত না, কী বোঝাতে চাইছে গানটা। রূপের আবার সাগর হয় কী করে? হলেও, রূপসাগরের ঘাটটা পিছল হবে কেন? এবং সে পথে চলতে গেলে পা দুটো কেনই বা টলমল করবে? বোধ হয় মস্ত একটা মিস্টিক তত্ত্বের কথা মিষ্টি করে গেয়ে চলে যেত নন্দ বাউল।

সে নন্দ বাউল আজ আর নিশ্চয় বেঁচে নেই। আজ নিশীথ রায়ের বয়স ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়ে আরও সাত মাস। নন্দ বাউলকে যেদিন শেষবারের মত দেখেছিল নিশীথ এবং নন্দ বাউলের গলায় গানটাকেও শেষবারের মত শুনেছিল, সে দিনটি হল আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগের একটি চৈতালি দিন। নন্দ বাউল তখন সত্তর বছর বয়সের বুড়ো। তার উপর ছিল যক্ষ্মা রোগ। জরা আর যক্ষ্মায় একসঙ্গে মিলে বুড়ো মানুষের সেই ছোট্ট শরীরটাকে প্রায় শেষ করে এনেছিল। সব সময় ধুকপুক করত নন্দ বাউলের পাঁজরগুলি। হাত-পা কাঠি-কাঠি, ধড়টা ছেঁড়া খড়ের পুতুলের মত, নন্দ বাউলের সেই মূর্তি খালের ধারে একটা কদমের ছায়ার মধ্যে টিনের ছাপর আর বাঁশের বেড়া দেওয়া একটা ঘরের দাওয়ার উপর বসে থাকত।

কিন্তু নন্দ বাউলের মুখের হাসিকে সেই ভয়ানক জরা আর যক্ষ্মাতেও মেরে ফেলতে পারেনি। নন্দ বাউলের রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে সব সময় অদ্ভুত রকমের একটা হাসি ফুটে থাকত। সেদিনও নিশীথের চোখের সামনেই সেই হাসিমুখ নিয়ে মাথা দুলিয়ে, চোখ বন্ধ করে আর একতারা বাজিয়ে রূপসাগরের কথা গেয়ে গেয়ে যেন বিভোর হয়ে গেল বুড়ো বাউলের মর-মর প্রাণটা। গান শেষ করার পর খুব জোরে একবার কেশেছিল নন্দ। মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্তও উথলে পড়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, মুখ ধুয়ে এসে আবার নন্দ তার একতারা কোলের উপর রেখে দাওয়ার উপর চুপ করে বসে রইল। মাথা ঝুঁকিয়ে চোখের সামনের সকলকেই, যেন পৃথিবীর সব আলো ছায়া আর শব্দকে একটা প্রণাম জানাল। আবার ঝিক করে হেসে উঠল বুড়ো নন্দ বাউলের মুখ।

শুনেছিল নিশীথ, সবাইকে আর সব কিছুকেই প্রণাম করে নন্দ বাউল। কদমের ছায়ার কাছে কোনও মানুষ এসে দাঁড়ালেই প্রণাম করে। সে মানুষ কুসুমপুরের নায়েব মশাই হোক আর নৌকাঘাটের মজুর সেলিম শেখ হোক। খালের জলে কচুরিপানার সবুজের মধ্যে যখন নীল ফুল ফোটে, তখন সেই ফুলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে নন্দ। ক্ষেতের উপর ধানের মঞ্জরির দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে। শালিকের ঝাঁক এসে যখন বাঁশঝোপের ভিতরে কর্কশ স্বরে চেঁচামেচি করে, তখন শুধু সেই শব্দ শুনেই মাথা নিচু করে আর জোড়-হাত বুকে ছুঁইয়ে একটা প্রণাম না করে পারে না নন্দ বাউল।

সেই নন্দ বাউল আজ আর নিশ্চয় নেই। এখান থেকে, কালিকাপুরের এই পাহাড় আর শালবনের ছায়ার কাছ থেকে অনেক দূরে রাজশাহি জেলার কুসুমপুরের খালের কাছে সেই টিনের ছাপরের ঘরটাও আর নেই। সেই কদমের ছায়াটা আছে কিনা কে জানে! কিন্তু সেই নন্দ বাউলকে আজও বার বার মনে পড়ে। তাই নন্দ বাউলের মুখের সেই হাসিটাকেও বার বার মনে পড়ে যায়।

কিন্তু মনে পড়ে কেন?

এখানে একটা সেকেলে পুকুর আছে. তার পাথর-বাঁধানো ঘাট এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। কী আশ্চর্য, তিনকড়ি মাহাতো বলেন, এই পুকুরটার নাম রূপসাগর। পুকুরের দক্ষিণ কোণে একটা মন্দির ছিল কোনকালে. সেটাও এখন একটা ভাঙা-পাথরের ঢিপি মাত্র। একটা বুড়ো বটের গোড়ায় সিঁদুর-মাখানো একগাদা নুড়ি পড়ে আছে। রাতের শেয়াল এসে নুড়িগুলিকে ঘাঁটাঘাঁটি করে চলে যায়। কারা যেন আবার এসে নুড়িগুলিকে গুছিয়ে রেখে দিয়ে যায়। বোধ হয় নিকটের ওই গাঁয়ের শাঁওতালেরা।

কাল সন্ধ্যাবেলা রেডিওতে ওই গানটাকেও কে যেন একবার গেয়েছে। অনেক দিন পরে গানটাকে নূতন করে শুনতে বেশ ভালই লেগেছে। এবং ভাবতে গিয়ে মনে মনে একটু লজ্জাও পেয়েছে নিশীথ, গানটাকে যেন আগের চেয়ে আর একটু বেশি ভাল লাগল, যদিও আজও ঠিক বোঝা যায় না, কী বলতে চাইছে গানটা।

ভাল লাগছে অনেক কিছুই। রাখা পাহাড়ের ওই গম্ভীর ধোঁয়াটে নীল দেখতে ভাল লাগে। নিকটের শালবনে সারা রাত ধরে একটা ঝড় ছুটোছুটি করেছে। শালের কাঁচা আঠার গন্ধ এখনও বাতাসে ভেসে আসছে। লাল মাটির উপ দিয়ে কণ্টিকারির একটা আঁকা-বাঁকা ঝোপ অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ঝোপের ছায়ায় খরগোশ দৌড়ায়। আর একটু দূরে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে টবের ট্রেন। ফায়ার-ক্লে, কেওলিন আর রঙিন মাটি টবে বোঝাই করছে কুলির দল। কুলিদের গান শোনা যায়। শুনতে ভালই লাগে।

কালিকা মাইনস-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের এই ছোট বাংলোবাড়িটাও আজ নানারকম মিষ্টি কলরবে ভরে গিয়েছে। ঘাটশিলা থেকে এসেছেন কাকিমা আর কাকিমার ভাই নরুমামা। মুসাবনি থেকে এসেছেন জেঠামশাই। মৌভাণ্ডার থেকে এসেছে নিশীথের দুই খুড়তুতো ভাই—দেবেশ আর চঞ্চল। মুসাবনিতে জেঠামশাইয়ের কাছে থাকে নিশীথের আপন বোন বেণু ; দশ বছর বয়সের ছোট্ট বেণু ; সে-ও এসেছে। জ্বর হয়েছে, তবুও এসেছে। ওই বেণুকে বড় ভালবাসেন জেঠামশাই। বেণু যে এই জেঠামশাইকেই 'বাবা' বলে ডাকে। সেই যখন মাত্র এক বছর বয়স বেণুর, এক মাসের মধ্যে নিশীথের বাবা আর মা দুজনেই মারা গেলেন, তখন থেকে বেণু জেঠামশাইয়ের কাছেই আছে।

জেঠামশাই বললেন--বেণুটা ভয়ানক কান্নাকাটি করল, অগত্যা নিয়ে এলাম।

কাকিমা বললেন-- এনে ভালই হয়েছে। এত কাছে থেকেও দাদার বিয়েটা দেখবে না মেয়েটা, সে কেমন কথা?

জেঠামশাই একবার চোখ মুছলেন। কেন, অনুমান করতে পারে নিশীথ। জেঠামশাই বোধ হয় তাঁর বড় আদরের ভাই সেই নীরেন আর ভ্রাতৃবধূ মায়ালতার কথা ভাবছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন জেঠামশাই--আজ তোর বিয়ে, কিন্তু আজ যারা সবচেয়ে বেশি আনন্দ করত, তারা দুজনেই যে নেই। আমার যে একটুও ভাল লাগছে না, নিশি!

জেঠামশাইয়ের কথায় ঘরের বাতাসও যেন একটু ব্যথিত হয়। কাকিমা চুপ করে আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন। জেঠামশাই নিজে আবার চেঁচিয়ে হেসে উঠে সবাইকে ব্যস্ত করে তোলেন--কই, কোথায় গেল সব? দেবেশ আর চঞ্চল কোথায়? ফুলের ঝুড়িটা কোথায় রাখলে নরু? বেণু, এদিকে আয় দেখি, বেশ মিষ্টি করে একটা গান গেয়ে নে, তারপর রওনা হয়ে যাই।

মীরাকে প্রভু পরম মনোহর...বেণুর গান প্রায় শেষ হয়ে আসে। নরুমামা ফুলের ঝুড়ি হাতে নিয়ে তৈরি হলেন। দুটো মোটরগাড়ি অনেকক্ষণ আগেই তৈরি হয়ে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা নিশীথের নিজের গাড়ি, আর একটা কন্ট্রাক্টর জানকীবাবুর।

এখন মাত্র সকাল আটটা, কালিকা মাইনস-এর শেষ খাদের সীমা পার হলেই যে ল্যামাটির কাঁচা রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে সোজা গালুডি। তারপর পাকা সড়ক ধরে টাটা হয়ে

একেবারে সিনি। সিনিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, তারপরেই দলমা পাহাড়কে বাঁয়ে রেখে আবার ঘুরে যেতে হবে। টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে, খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজ-এর বিভূতি সিনিতে এসে অপেক্ষা করবে। পুরোহিত চক্রবর্তী মশাইকেও সেখান থেকে তুলে নিতে হবে। তারপর সোজা চাণ্ডিল, এবং চাণ্ডিল পার হয়ে পুরনো বরাভূমের গড় ছাড়িয়ে রাজপোখরা, যেখানে মহুয়াবনের পাশে অনেকগুলি গালার কারখানা। বাজার আর থানা পার হয়ে, নতুন পটারি আর রোমান-ক্যাথলিক আশ্রম ছাড়িয়ে যেখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর বাগান নিয়ে ছোট একটি শৌখিন শহর ফুটে রয়েছে, সেখানে একটি বাড়ির ফটকের থামে বাড়ির নামটাও লেখা আছে—অলক্তক। লাক্ষা মার্চেন্ট শীতলবাবুর বাড়ি।

ছেলেবেলার দেখা সেই নন্দ বাউলের মুখের হাসিটাই বোধ হয় আর একবার নিশীথ রায়ের মনের ভিতরে ফুটে ওঠে। রওনা হবার আগে জেঠামশাইকে প্রণাম করে নিশীথ। তারপর ঘরের ভিতরে গিয়ে বাবা আর মার ফোটোকেও প্রণাম করতে ভাল লাগছে। জিওলজির মানুষ নিশীথ রায় শক্তি পাথর আর মাটির রহস্য ঘাঁটাঘাঁটি করে কালিকা মাইনস-এর যে ম্যানেজারের জীবন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বারো ঘণ্টা ব্যস্ত হয়ে থাকে, সেই মানুষের মনেও যেন প্রশ্ন জেগেছে। একটা মানুষকে মনেপ্রাণে ভালবাসলে কি পৃথিবীর সব কিছুকেই এমন করে ভাল লাগে?

কাকিমাও হেসে হেসে ঠাট্টা করেন—কী রে নিশি? তোকে যে আজ বড় বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে?

বেণু চেঁচিয়ে ওঠে—বউদি নিশ্চয় দেখতে আরও বেশি সুন্দর।

কাকিমা—তাই নাকি রে?

নিশীথ হেসে ফেলে—আমার তো তাই মনে হয়।

গাড়ি দুটোও যেন হেসে উঠে স্টার্ট নিল। কাকিমা আর বেণুকে নিয়ে নিশীথের গাড়িটা আগে আগে, পিছনের গাড়িতে জেঠামশাই ও আর সবাই। গালুডির কাছাকাছি এসে রেল-লাইনের লেভেলক্রসিং-এর কাছে একবার থামতে হল। বেণুকে খাওয়াবার জন্য শিশি থেকে গেলাসে ওষুধ ঢালেন কাকিমা, এবং নিজের জন্য ফ্লাস্ক থেকে মিছরি-জল। গাড়ির স্টিয়ারিং দু হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রেখে চুপ করে বসে থাকে নিশীথ।

হু-হু করে ছুটে চলে যাচ্ছে ট্রেনটা। নিশীথ রায়ের মনের ভিতরেও একটা লাল মাটির পথের উপর দিয়ে যেন একটা শিহর ছুটে চলে যায়। ওই তো, ওইরকম একটি ট্রেন, এবং এই লাইনেই ছুটে চলে যাচ্ছিল সেই ট্রেন। যদি সেদিন সেই ট্রেনের সেই কামরাতে নীরাজিতার সঙ্গে দেখা না হত, তবে কি আজ নিশীথ রায়ের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ইচ্ছাটা এরকম ব্যাকুল হয়ে রাজপোখরা নামে এক লাক্ষানগরের আলক্তের কাছে এগিয়ে যাবার লগ্ন খুঁজে পেত?

একটা শিপমেন্টের ব্যবস্থা করবার জন্য কলকাতায় এসে পোর্টঅফিস, কাস্টম-হাউস আর ব্যাঙ্কে পুরো সাতটি দিন ছুটোছুটি করবার পর কালিকাপুরে ফিরবার সময় নাগপুর এক্সপ্রেসের একটা কামরার ভিতরে ঢুকতে গিয়েই পিছু-পা হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল নিশীথ রায়। দরজার পাশে কার্ড ঝুলছে। কার্ডের গায়ে নাম লেখা—নীরাজিতা সরকার। একটা বার্থ রিজার্ভ করেছে কোনও এক যাত্রিনী।

কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল নিশীথ রায়, এই কামরার ভিতরে ঠাঁই না নেওয়াই বোধ হয় ভাল। তারপর সেই কামরাতেই ঢুকে আর চুপ করে বসে বসে একটা অস্বস্তিও অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করেছিল। কামরার ভিতরে নিশীথ রায় ছাড়া শুধু ওই একজনই যাত্রী ছিল, এক তরুণী। যদি ট্রেন ছাড়ার এক মিনিটও আগে বুঝতে পারত নিশীথ, আর কোনও যাত্রী এই কামরাতে উঠবে না, তবে বোধ হয় নিশীথ রায় ওই হাওড়াতেই সেই

কামরা থেকে নেমে অন্য কামরার ভিতরে গিয়ে ঠাঁই নিত।

শিপমেন্টের ব্যবস্থা করতে গিয়ে হাজার হয়রানি ভুগে একেই তো মনটা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়েছিল, তারপর এই অস্বস্তি। অচেনা ও অজানা এই তরুণী দেখতে ভাল হলেই বা কী আসে-যায়? ভদ্রভাবে একটা কথা বললে ভদ্রভাবে উত্তর দেবে কিনা কে জানে? নিজের থেকে যেচে আলাপ করবে বলেও মনে হয় না। একই কামরার ভিতরে দুটো মানুষ শুধু চুপ করে থাকবে, এটাও যে একটা দুঃসহ অভদ্রতার ব্যাপার। মহিলার মনের রীতি-নীতিই বা কেমন, কে জানে? হয়ত নিশীথের চোখের প্রত্যেকটা দৃষ্টিকেই লোভীর দৃষ্টি বলে মনে মনে সন্দেহ করবে, আর এই গর্বে বিভোর হয়ে বসে থাকবে মহিলা। ইচ্ছে করে নিজেকে এভাবে কারও মনের ভিতরে লাঞ্ছিত হতে দেবার সুযোগ দিয়ে লাভ কী?

কিন্তু খড়গপুরে এসে ট্রেনটা থামলেও এবং অন্য কামরায় চলে যাবার জন্য চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত চলে যেতে পারেনি নিশীথ। আজ মনে পড়ে, এবং মনে পড়তেই লজ্জাও পায় নিশীথ, নীরাজিতার মত মেয়েকে চোখের সামনে দখতে পেয়েও সেদিন মনের ভুলে কী ভয়ানক অস্বস্তিই না মিছামিছি পুরো দুটি ঘণ্টা সহ্য করতে হয়েছিল।

ছোট স্যুটকেস আর বেডিংটা নিজেই হাতে তুলে নিয়ে কামরা থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ বাধা পেয়েছিল নিশীথ। বাধা দিল নীরাজিতা।

—আপনি কি এখানেই নামবেন?

অপরিচিতার হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠে উত্তর দেয় নিশীথ।—না আমি এখন যাব টাটানগর।

অপরিচিতা বলে—তবে এখানে নামছেন কেন?

—অন্য কামরায় সিট আছে বোধ হয়।

—অন্য কামরায় যাবেন কেন?

—যাচ্ছি...মনে হচ্ছে, আপনার বোধ হয় খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

—আপনি খুব ভুল বুঝেছেন। বরং আপনি অন্য কামরায় চলে গেলে আমার পক্ষে একলা এই কামরাতে থাকতে কী রকম অস্বস্তি হতে পারে, বুঝে দেখুন।

নিশীথ রায়ের চিন্তার এতক্ষণের ভুলটাই লজ্জিত হয়।—তাই তো, ঠিকই বলেছেন আপনি, আমি অতটা ভেবে দেখিনি।...আপনি কোথায় যাবেন?

—আমিও যাব টাটানগর।

—আপনার বাড়ি টাটানগর?

—না, সাক্‌চিতে আমার মামা থাকেন। আমাদের বাড়ি আরও দূরে।

—রায়পুরে বোধ হয়?

—না, অত দূরে নয় ; ওদিকে নয়। আমাদের বাড়ি সিনি থেকে সামান্য দূরে, রাজপোখরার কাছে।

—সেই লাক্ষানগরের কাছে বোধ হয়?

—লাক্ষানগরেই। আমার বাবার গালার কারবার আছে।

—আপনার বাবার নাম?

—শীতলচন্দ্র সরকার।

—তাই বলুন, তিনি তো আমাদের গালুডির ধীরেনবাবুর কাকা।

অপরিচিতার চিন্তান্বিত চেহারাটা এতক্ষণে যেন একটু সুস্মিত হয়ে ওঠে।—হ্যাঁ। ধীরেনদার সঙ্গে আপনার চেনাশোনা হল কেমন করে?

—আমিও যে গালুডির কাছেই কালিকাপুরে থাকি।

—কালিকাপুর? যেখানে ফায়ার-ক্লে, কেওলিন আর......

—আর ম্যাঙ্গানিজও কিছু কিছু আছে। আমি কালিকা মাইনস-এর ম্যানেজারি করি।

আরও আশ্বস্ত হয় এবং একটা হাঁপ ছেড়ে হেসে ওঠে তরুণী।--তা হলে মুসাবনির ডাক্তার হরদয়ালবাবু হলেন আপনার...

--আমার জেঠামশাই, তাঁকে চেনেন নাকি?

--খুব চিনি। তিনি তো প্রায়ই সাক্‌চিতে আমার মামার বাড়িতে আসেন, তিনি আমার মামার বন্ধু। তিনি একদিন বলেছিলেন যে, তাঁর এক ভাইপো কালিকা মাইনস-এ ম্যানেজারের পোস্টে আছে। কিন্তু...

নীরাজিতার কথার আবেগ হঠাৎ থেমে যায়। কিন্তু কী? ডাক্তার হরদয়ালবাবুর মুখ থেকে শোনা কোনও একটা কথা একেবারে স্পষ্ট করে মনে পড়ে গিয়েছে বলেই বোধ হয় থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে নীরাজিতা ; ভাইপো বিয়ে করতে চায় না, হরদয়ালবাবুর সেই অভিযোগ নীরাজিতার মত এক অনাত্মীয়া ও বিনা-সম্পর্কের মেয়ের মুখের ভাষায় মুখর হয়ে উঠতে পারে না। নীরাজিতার পক্ষে সে কথা আলোচনা করা অশোভন তো বটেই, নির্লজ্জতাও নিশ্চয়।

নিশীথ রায় হঠাৎ হেসে ফেলে--বুঝেছি, জেঠামশাইয়ের মুখে আমার নামে ভয়ানক কোনও অভিযোগ শুনেছেন।

রুমাল দিয়ে কপাল মুছে নিয়ে নীরাজিতা হাসতে চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টাটাই যেন ব্যর্থ হয়ে নীরাজিতার মুখের উপর একটা লাজুক গম্ভীরতার আভা ফুটিয়ে তোলে। নীরাজিতা বলে--হ্যাঁ, অভিযোগই বটে...তার মানে, জেঠামশাইয়ের কোনও কথা আপনি কানেই তোলেন না, আর কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চান।

নিশীথ বলে--ঠিকই শুনেছেন। কালিকাপুর জায়গাটা সুন্দর ; কাজটাও মন্দ নয় ; বেশ ভালই লাগে। কিন্তু...

নিশীথ রায়ের কথার আবেগও হঠাৎ মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নীরাজিতার চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, নিশীথ রায়ের মুখ থেকে ওই কিন্তুর উত্তর শোনবার জন্য ওর মনের ভিতরে একটা কৌতূহল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আনমনার মত, এবং কেমন একটু বিব্রতভাবে বিড়বিড় করে ওঠে নিশীথ রায়--কিন্তু ওখানে একা একা পড়ে থাকতে আজকাল বেশ ভয় করে।

নীরাজিতা হাসে।--জায়গাটা খুব বেশি জংলা বোধ হয়।

অপ্রস্তুত হয়ে যেন নিজের মনের একটা অসতর্ক বাচালতাকে শুধরে দেবার জন্য চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ--না না, সে সব ভয় নয়। জঙ্গলটাই তো সবচেয়ে সুন্দর।

প্রথম আলাপের ভাষাটা সেদিন তরতর তরল করে স্রোতের মত এইভাবে স্বচ্ছন্দে অজস্র প্রশ্ন আর কৌতূহলের কলরব নিয়ে এই পর্যন্ত এসে কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। অনেক পিছনে পড়ে আছে খড়গপুর। ট্রেন তখন রাতের ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হু-হু করে ছুটে চলেছে। বাইরের বাতাস বৃষ্টিতে ভিজছে। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছোট ছোট ঝাপটা কামরার ভিতরে এসে ছিটকে পড়ে। এবং এতক্ষণ পরে এই ক্ষণিক নীরবতার মধ্যে নিশীথের চোখ দুটো স্পষ্ট করে দেখবার সুযোগ পায়, আনমনার মত জানালা দিয়ে বাইরের বর্ষাসিক্ত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে নীরাজিতা। স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, একটা অস্বস্তির ছায়া ছটফট করছে নীরাজিতার মুখের উপর। এবং সেই মুখটি দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর।

রাতের আকাশের মেঘ কখন ফুরিয়ে গিয়েছে, বাইরের বাতাসের বৃষ্টি-ভেজা শিহর কখন থেমে গিয়েছে, বুঝতে পারেনি নিশীথ। বুঝল তখন, যখন আর একবার নীরাজিতার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায় নিশীথ, জানালার কাছে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে আকাশের এক টুকরো চাঁদের স্নিগ্ধ চেহারাটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছে নীরাজিতা।

তবে কি কবিতা লেখার অভ্যাস, কিংবা ছবি আঁকার শখ আছে নীরাজিতার? হতে পারে। কিন্তু নীরাজিতা নিজে বোধ হয় এখন কল্পনাতেও সন্দেহ করতে পারছে না যে, এই চলন্ত ট্রেনের কামরার ভিতরে একটা মানুষের উৎসুক চোখের বিস্ময়ের সামনে ওর নিজের চেহারাটা সুন্দর একটা কবিতার ছবি হয়ে ঢলঢল করছে। যেখানে থাকে নীরাজিতা, রাজপোখরা নামে সেই লাক্ষানগরকেও একটা রূপকথার দেশ বলে মনে হয়।

—আপনি কি প্রায়ই এই পথে যাওয়া-আসা করেন?

নিশীথের প্রশ্ন শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকায় নীরাজিতা। উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

—এইরকম একা একা?

নীরাজিতা হাসে—না, আজই এই প্রথম। ছোটকাকার ব্লাডপ্রেসারের কষ্ট হঠাৎ বেড়ে গেল, তাই তিনি আসতে পারলেন না। অথচ আমাকে যেতেই হবে, কালকেই বড়দির ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন আছে। কাজেই বাধ্য হয়ে...

—কলকাতাতে আপনার প্রায়ই যেতে হয়, তার মানে আপনি স্টুডেন্ট।

—এখন আর নয়।

—তার মানে?

নীরাজিতা হাসে—বাবার ইচ্ছে, মেয়েকে অনর্থক আর বেশি পড়িয়ে কষ্ট দিতে তিনি রাজি নন। তাই ফিফ্‌থ ইয়ারও শেষ করবার সুযোগ পেলাম না।

—এটা কিন্তু ভাল হল না। ফিফ্‌থ ইয়ারে এসে পড়া ছেড়ে দেবার কোনও অর্থ হয় না।

নীরাজিতা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে—বাবা বলেন, তোকে তো আর ফরেস্ট-অফিসার হয়ে জঙ্গলে থাকতে হবে না, এত বোটানি চর্চা করে লাভ কী?

নিশীথও উৎসাহিত হয়ে বলে—আপনি বোটানি পড়েন?

—হ্যাঁ।

—অনার্স কোর্স?

—হ্যাঁ।

নিশীথ হাসে—আমি জিওলজি।

ট্রেনের কামরার আলোকিত নিভৃতের নীড়ে এতক্ষণে দুটি অপরিচিতের খোলা মনের হাসি যেন ঘরোয়া জানাজানির পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আর ভয় নয়, অস্বস্তিও নয়। এবং আলাপের ভাষাও যেন এই ক্ষণিক পুলকের ভুলে আরও অবাধ হয়ে যায়।

নিশীথ বলে—একটা কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, আপনার বাবা কেন হঠাৎ আপনাকে পড়া থেকে ছাড়িয়ে...

হঠাৎ মাথা হেঁট করে নীরাজিতা, আবার একটা অস্বস্তির ছায়া নীরাজিতার মুখের উপর ছটফট করতে থাকে। ছায়াটা ভীরু ; কিন্তু সেই ভীরুটাতা বড় মিষ্টি।

নিশীথ বলে—কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলছি। বোধ হয় আপনার বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে।

কোনও কথা না বলে শুধু আস্তে একবার মাথাটা দুলিয়ে উত্তর দেয় নীরাজিতা—না।

—তা হলে বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে বোধ হয়।

কোনও উত্তর দেয় না নীরাজিতা। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে নেই, নীরাজিতার ওই হেঁটমাথা আর নীরবতা কী কথা বলতে চাইছে।

রাতের ট্রেন ফিকে জ্যোৎস্না গায়ে জড়িয়ে আপন মনের উল্লাসে হু-হু করে ছুটে চলে যাচ্ছে। চাকুলিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ধলভূমগড় আর ঘাটশিলাও পার হয়ে গেল। খোলা জানালার উপর হাত রেখে, এবং সেই হাতের উপর মাথা পেতে দিয়ে নিঝুম হয়ে বসে আছে নীরাজিতা। তবু দেখতে পায় নিশীথ, নীরাজিতার সেই বন্ধ চোখের পাতায়

যেন ভেজা জ্যোৎস্নার রেখা চিকচিক করছে। নিশীথের বুকের ভেতরে সব নিশ্বাস একসঙ্গে চমকে উঠে এলোমেলো হয়ে যায়। কী ভাবছে নীরাজিতা? হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেল কেন নীরাজিতা? চোখে জল কেন? নীরাজিতার চোখ দুটো কি সত্যিই নিশীথের মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা ইচ্ছাটাকেই দেখে ফেলতে পেরেছে?

গালুডিও বোধ হয় পার হয়ে গিয়েছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পায় নিশীথ, টাটার ব্লাস্ট-ফার্নেস-এর রক্তাভা ফুটে থাকে যে আকাশে, সেই আকাশটা বড় কাছে চলে এসেছে। টাটানগর পৌঁছতে আর দেরি নেই।

চুপ করে এবং একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে নিজেরই মনের একটা ছন্নছাড়া তুমুল অস্বস্তির বেদনার সঙ্গে লড়াই করে নিশীথ রায়। জিওলজির পাথুরের কঠোরতা যেন ছোট একটা বনলতার মায়ার কাছে বার বার দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে ডাক দেয় নিশীথ রায়—শুনছেন, টাটানগর এসে পড়েছে।

চমকে উঠে মাথা তুলে তাকায় নীরাজিতা।—কী বললেন?

—টাটানগর।

হাঁপ ছাড়ে নীরাজিতা—ও, তাই বলুন।

—আপনি কি এত রাত্রে একাই সাক্‌চি যাবেন?

নীরাজিতা হাসে—না, তা কেন হবে? মামার গাড়ি নিশ্চয় স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছে।

—আর একটা কথা—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ রায়। ট্রেনটা একটু মৃদুগতি হয়ে, যেন একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টার আনন্দে অলস হয়ে প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে চলেছে। আর কয়েকটি মুহূর্ত পরে, নীরাজিতা-নামে সেই সুন্দর ছবি, ছোট বনলতার মায়ার মত স্নিগ্ধতার এই রূপ, এই ঢিলে খোঁপা ও গলার এই চিকচিকে সুতলীহার আর মুগার-কাজ-করা এই রঙিন শাড়ির আঁচল এই রাতের আলোছায়ার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

নীরাজিতাও যেন দম বন্ধ করে দু চোখের ভীরু বিস্ময় অপলক করে নিশীথ রায়ের সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিশীথ বলে—আপনাকে যদি চিঠি লিখি, তবে...?

--লিখবেন।

—কোনও আপত্তি নেই তো?

—না।

—ঠিকানাটা?

—নীরাজিতা সরকার, অলক্তক, রাজপোখরা, মানভূম।

গরম হাওয়ার ছোঁয়ায় নিশীথের গাড়ির স্টিয়ারিং বেশ তেতে উঠেছে। টাটানগর ছেড়ে আসা হয়েছে অনেকক্ষণ। পথের দু পাশে ন্যাড়া ও রুক্ষ চেহারার পাথুরে ডাঙা। রোদের জ্বালা ভেদ করে পিচ-ঢালা সড়কের আলগা ধুলো উড়িয়ে নিশীথ রায়ের গাড়ি নিজের মনের উল্লাসে ছুটে যেতে থাকে। সিনিও বোধ হয় আর খুব বেশি দূরে নয়।

পথের দু পাশে একটা গাছের ছায়াও নেই। পৃথিবীটা এখানে তার কোটি বছর আগের সেই শ্যামলতাহীন কঠিন চেহারার গর্ব নিয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে। সড়কের দু পাশে ডাঙা যেন সেকেলে জড়ের প্রকাণ্ড শিবির। শুধু পাথর আর পাথর ; এবড়ো-খেবড়ো চাপ-চাপ, তাল-তাল ; আবার থরেথরে সাজানো ; যত নিরেট ও কঠোর ধূসরতা রোদের জ্বালায় মুগ্ধ হয়ে ডাঙার সারা বুক জুড়ে ঝিকঝিক করে হাসছে অজস্র অভ্রের কুচি। অনেক দূরে সেরাইকেলার রিজার্ভ জঙ্গলের সীমানা এক টুকরো মেঘাভ ছায়ার আলপনার মত দেখা যায়।

কাকিমা বলেন—ইস, কি বিশ্রী শুকনো জায়গা রে নিশি! একটু ঘাস পর্যন্ত নেই।

নিশীথ হাসে—এই তো পৃথিবীর বনেদী চেহারা, কাকিমা।

কাকিমা—কী ভয়ানক বনেদী চেহারা রে বাবা!

—তুমি বলছ ভয়ানক, কিন্তু আমাদের কালিকা-মাইনস-এর মালিক রবার্টসন কী বলে জান?

—কী?

—স্টোনি গ্রেভ অব এ প্যারাডাইস। একটা স্বর্গের পাথুরে কবর। রবার্টসন প্রায়ই এখানে এসে এই ডাঙার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। জায়গাটা লিজ নেবার জন্য দিন রাত কী চেষ্টাই না করছে বেচারা!

বেণু চেঁচিয়ে ওঠে—কী? কিসের গল্প বলছ দাদা?

নিশীথ হাসে—আমি বলছি পাথুরে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প। এখানে সিসা আছে, তামা আছে, বেণু। সোনাও থাকতে পারে। তা ছাড়া, আমিও একদিন এই ডাঙার ওই পুবদিকের একটা শুকনো ঝরনার বালি খুঁড়ে খুব সুন্দর একটা গন্ধ পেয়েছিলাম।

কাকিমা হাসেন—প্যারাডাইসের ফুলের গন্ধ?

—গন্ধকের গন্ধ। কিন্তু রবার্টসন স্বপ্ন দেখেছে, পেট্রল আছে এখানে।

বেণু বলে—একটু বউদির গল্প বলো না, দাদা।

হেসে ফেলে, এবং গল্পই বন্ধ করে দেয় নিশীথ। কাকিমাও হেসে বেণুকে আশ্বস্ত করেন--আর একটু পরে বউদিকে তো দেখতেই পাবি। ঝুনুমাসির চেয়েও সুন্দর, কী চমৎকার একটা বউদি।

বাড়িয়ে বলেননি কাকিমা, ঠিকই অনুমান করেছেন। কাকিমার বোন ঝুনুমাসির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর নীরাজিতা। তবু তো কাকিমা আরও অনেক কিছুই জানেন না। কেন সেদিন সেই ট্রেনের কামরার জানালায় হাত রেখে এবং সেই হাতের উপর মাথা পেতে দিয়ে নিঝুম হয়ে চোখ বন্ধ করে বসে ছিল নীরাজিতা, সে কথা কাকিমা জানেন না। নীরাজিতার বন্ধ চোখের পাতায় সেদিন কেন ভেজা জ্যোৎস্নার রেখা চিকচিক করে উঠেছিল, সে কথা প্রথম চিঠির ভাষাতেই জানতে দিতে ভোলেননি নীরাজিতা। যার মুখের দিকে বার বার তাকাতে ইচ্ছা করছিল, অথচ তাকাতে সাহস পাচ্ছিলাম না, এবং যাকে আর জীবনে কোনওদিন চোখে দেখবারও সুযোগ হবে না জানতাম, সেই মানুষ চোখের কাছেই বসে আছে, এমন অবস্থায় পড়লে অন্তত আমার মত কোনও মেয়ের চোখ কি একটু না ভিজে থাকতে পারে, বলুন?

নীরাজিতার শেষ চিঠির কথাগুলিও মনে পড়ে ; আর এভাবে দূর থেকে শুধু ভালবাসার কথা লিখে লিখে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। অলক্তকের মেয়েকে যদি ভাল লেগে থাকে, তবে সোজা চলে এসে তার হাত ধরে তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাও।

এর পর বোধ হয় দুটো সপ্তাহও পার হয়নি। জেঠামশাইয়ের কাছে চিঠি দিয়েছিল নিশীথ, এবং শীতলবাবুকে চিঠি লিখেছিলেন জেঠামশাই। জেঠামশাইয়ের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রথম চিঠিতেই নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের বিয়ের কথা এবং বিয়ের দিনও ঠিক করে ফেললেন শীতলবাবু। নিশীথও শীতলবাবুর কাছ থেকে আকুল আশীর্বাদে মুখর একটি চিঠি পেয়েছিল। আমার বড় আদরের মেয়ে নীরাকে তোমারই হাতে শঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই, নিশীথ।

অনেকগুলি গাছের ছায়া কাছে এসে পড়েছে। অনেকগুলি যজ্ঞডুমুর আর ঘোড়ানিমের একটা জটলা। টু সিনি—সেভেন মাইলস্! পথের পাশে কাঠের পোস্টে লেখা সঙ্কেত চোখে পড়তেই গাড়ির স্পিড মৃদু করে দেয় নিশীথ। এই তো এখানে এসে খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজ-এর বিভূতি অপেক্ষা করবে বলে কথা আছে, এবং পুরুতমশাইও।

কিন্তু শুধু চক্রবর্তী মশাই একাই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিভূতি আসতে পারেনি।

এক ঝুড়ি ফুল পাঠিয়ে দিয়েছে বিভূতি। একগাদা স্থলপদ্ম আর হলদে গোলাপ। চক্রবর্তী মশাই বললেন—বিভূতিবাবু আসতে পারলেন না, তিনি খুবই দুঃখিত। খুব জরুরী কাজে আটক হয়ে পড়েছেন।

খবর শুনে নিশীথের এত হাস্যোজ্জ্বল মুখের শোভাও যেন ব্যথিত হয়ে ওঠে। নিশীথের বন্ধু বলতে বোধ হয় ওই একজনই আছে, খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজ-এর বিভূতি। নিশীথের বিয়েতে বিভূতি আসতে পারল না, জেঠামশাইও দুঃখিতভাবে বলেন—বোধ হয় সত্যিই খুব জরুরি কাজ? আসবার কোন উপায় নেই, নইলে বিভূতি কি নিশির বিয়েতে না এসে পারত?

হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় নিশীথ। কাকীমা বলেন—এখানে আর রেস্ট নিয়ে মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, নিশি। বরং বেলা থাকতেই রাজপোখরা পৌঁছে যাওয়া ভাল।

দুটো গাড়ি আবার একসঙ্গে স্টার্ট নিয়ে ছায়া-কুঞ্জের স্নিগ্ধতার ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়।

ধূলিধূসর দুটো মোটরগাড়ি যখন উৎফুল্ল কলরবের সম্ভার নিয়ে অলক্তকের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন সুবর্ণরেখার বালিয়াড়ির সব বালুকণা বিকালের আলোতে সোনার মত জ্বলছে।

রাজপোখরার এই লাক্ষানগরের চেহারাও অদ্ভুত। এই বিকালের আলোতেও একটা বিরাট নিদমহলের মত মনে হয়। ঝাউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বড় বড় বাড়ি, বড় বড় ফটক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান সবই নীরব। গালার কারখানাগুলিও বড় শান্ত, কারখানা বলেই মনে হয় না। সাড়া-শব্দ যদি কিছু থেকেও থাকে, তবে এই সারিসারি ঝাউয়ের অবিরাম কাতর স্বরের উচ্ছ্বাসে সে সাড়া-শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু বোঝা যায়, মানুষ আছে ; অনেক শৌখিন মানুষের জীবন এখানে শান্ত বৈভবের মধ্যে নীড় রচনা করে রয়েছে। কোনও বাড়ির বারান্দায় বড় বড় অ্যালসেশিয়ান, কোনও বাড়ির বারান্দার সামনে হাল মডেলের মোটরগাড়ি। কোনও বাড়ির লন-এর চারদিকে অজস্র ডালিয়ার ভিড়।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি শান্ত, একেবারে নিস্তব্ধ এই অলক্তক। আগন্তুক দুটি মোটরগাড়ির হর্ন অনেকক্ষণ ধরে অনেকবার বেজেছে। কিন্তু সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অলক্তকের বুকে কোনও চাঞ্চল্যের শব্দ বেজে ওঠে না।

জেঠামশাই বিরক্ত হয়ে বলেন—এ কীরকমের ব্যাপার হল, নিশি? ফটকে তালা ঝুলছে কেন?

অলক্তকের বন্ধ ফটকের ওই তালার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিল নিশীথ। এবং বুঝতেও পারছিল নিশীথ, তার চোখ দুটো যেন দুঃসহ একটা উত্তাপের জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছে। এমন ভয়ানক বিদ্রূপও কী পৃথিবীতে থাকতে পারে? নিশীথ রায়ের জীবনের প্রথম ভালবাসার অলক্তক পাথরের চেয়েও কঠোর হয়ে গেল কেন?

অলক্তকের ফটকে আমপাতার ঝালর দুলছে। দেখে বোঝা যায়, পুরনো দিনের কোনও উৎসবের আমপাতা নয়। টাটকা সবুজ আমপাতা ; আজই বোধ হয় কয়েক ঘণ্টা আগে এই ফটকের রূপ টাটকা সবুজ দিয়ে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। অলক্তকের প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া ও মসৃণ মোজেয়িক-এর বারান্দাটাকেও এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায়। বেণু চেঁচিয়ে ওঠে—ওই যে, বারান্দাতে কী সুন্দর আলপনা আঁকা হয়েছে কাকিমা।

অলক্তকের জীবনে উৎসবের লগ্ন দেখা দেবার আগেই যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে সাবধান হয়ে গিয়েছে অলক্তকের প্রাণ। উৎসবের আমপাতা আর আলপনাকে জঞ্জালের মত ফেলে রেখে দিয়ে বাড়ির মানুষগুলি কোথায় যেন চলে গিয়েছে। কেন? কিসের জন্য? কিন্তু বাড়ির মালিটা পর্যন্ত নেই ; একটা কথা বলে এই দুঃসহ বিস্ময়কে একটু করুণা করবার জন্যও কেউ একখানে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নেই। একটা নির্মম রহস্যকে শুধু তালা দিয়ে বন্ধ করে

ফটকের বুকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে, নিজের বুকের ভিতরে যেন আঁচড়ে আঁচড়ে এই এক মাসের ইতিহাস আর নীরাজিতার চিঠির লেখাগুলিকে খুঁজে খুঁজে পড়তে থাকে নিশীথ। কই? তার মধ্যে তো নীরাজিতার এক বিন্দু সন্দেহ, এবং এক তিল আপত্তির একটা ছায়াও ছিল না। নীরাজিতার মনের কথা, শীতলবাবুর চিঠির কথাগুলিও মনে পড়ে। শীতলবাবু তো শেষ চিঠিতে নিশীথকে একেবারে প্রাণখোলা আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। শুভকাজে আর দেরি করতে চাই না। এই মাসের কোনও ভাল দিনে বিয়েটা হয়ে গেলেই ভাল!

মিথ্যা, ভয়ানক মিথ্যা নন্দ বাউলের মুখের সেই হাসিটা। মনে পড়ে নিশীথের, রূপসাগরের কথা গাইতে গিয়ে নন্দ বাউলের বুকের ভিতর থেকে এক ঝলক কাঁচা রক্ত উথলে পড়েছিল। নিশীথ রায়ের মনে হয়, তারও বুকের ভিতর নিশ্বাসটা বোধ হয় রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

জেঠামশাই বলেন—কী আশ্চর্য, শীতল সরকারের কী মাথা খারাপ হল?

কাকিমা বলেন—বিয়ের তারিখটা জানতে তোর কোনও ভুল হয়নি তো, নিশি?

নিশীথ বলে—না।

—এঁরা কোনও ভুল করেননি তো?

—না, এঁরা কালকেও টেলিগ্রাম করে আমাকে জানিয়েছেন, আমিও টেলিগ্রামে উত্তর দিয়েছি। ভুল হবার কোনও কারণ নেই।

কাকিমা করুণভাবে বলেন—তবে?

—তবে এখনও বুঝতে তোমরা ভুল করছ কেন কাকিমা?

—সত্যিই বুঝতে পারছি না।

—এই বিয়েতে এঁদের আপত্তি আছে।

কাকিমা রেগে চেঁচিয়ে ওঠেন—আপত্তি? কী এমন মস্ত মানুষ শীতল সরকার, আর তার মেয়েই বা কী এমন দেবীটি?

হেসে ফেলে নিশীথ রায়। —এখানে দাঁড়িয়ে, এ রকম রেগে আর চেঁচিয়ে নিজেকে অপমান করে লাভ কী কাকিমা? চলো, আর দেরি না করে ফিরে যাই।

জেঠামশাই ধীরে ধীরে হেঁটে আবার গাড়ির ভিতরে উঠে বসেন। চঞ্চল আর দেবেশ গম্ভীর হয়ে গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে নীরবে অলক্তকের দিকে যেন ওদের রুষ্ট চোখের সব আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বেণু কেঁদে ফেলে। কাকিমা চেঁচিয়ে ওঠেন—ফিরে চলো, নিশি।

সুবর্ণরেখার বালিয়াড়িতে এইবার সন্ধ্যা নামবে। বিকালের শেষ আলোতে রঙিন হয়ে গিয়েছে সুবর্ণরেখার স্রোত নুড়ি আর বালুকণা. দূরের দলমা পাহাড়ের গায়ে ছায়ার রেখাগুলি কালো হয়ে এসেছে। লাক্ষানগরের ঝাউয়ের সারির ছায়া থেকে পালিয়ে যাবার জন্য যেন ছটফট করে স্টার্ট নেয় দুটি ধূলিধূসর মোটরগাড়ি।

কিন্তু গাড়ি দুটো হঠাৎ একটা ইশারার বাধা পেয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তার ওপারের একটি ছোট বাংলোবাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন। বার বার হাত তুলে ইশারায় থামতে বলছেন ভদ্রলোক। ওই বাংলোর চারিদিকে ডালিয়ার ভিড় জঙ্গলের মত ঘন হয়ে রয়েছে। বেণু লোভীর মত চেঁচিয়ে ওঠে—কী সুন্দর ডালিয়া।

প্রৌঢ় বয়সের ভদ্রলোক। ইনিও বোধ হয় একজন লাক্ষা মার্চেন্ট। মোটা শরীর, ঢিলে গেঞ্জি, ঢলঢলে পায়জামা এবং গায়ে একটি চাদর। ভদ্রলোকের মুখটা যেন খুব বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। হন হন করে হেঁটে এসে সোজা জেঠামশাইয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক

হাতজোড় করে অনুরোধ করেন--যদি কিছু না মনে করেন, তবে গরিবের বাড়িতে একবার আসুন। একটু বিশ্রাম করে তারপর যাবেন।

জেঠামশাই বিব্রতভাবে হাসেন--মাপ করবেন, আমরা একেবারে সিনিতে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করব।

ভদ্রলোক বলেন--আমার অনুরোধ রাখলে বড় খুশি হতাম। শুধু দশ মিনিটের মত একটু জিরিয়ে নিয়ে, সামান্য একটু চা ইত্যাদি...

জেঠামশাই একটু বিস্মিত হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভদ্রলোক আরও উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকেন--আপনারা এভাবে চলে যাবেন, ব্যাপারটা দেখতে বড়ই খারাপ লাগছে বলে আপনাদের একটু বিরক্ত করতে চাইছি--

জেঠামশাই গাড়ি থেকে নামেন। ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে চঞ্চল আর দেবেশকেও ডাকাডাকি করেন--চলো বাবা, সবাই চলো। বেণুকে হাত ধরে বলেন--চলো মা, আমার ডালিয়া দেখবে চলো। কাকিমার সামনে গিয়ে বিনীতভাবে হাতজোড় করেন--আসুন।

ভদ্রলোকের আহ্বানের টানে সকলেই সেই ছোট বাংলোবাড়ির দিকে, সেই ডালিয়ার ভিড়ের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে। শুধু চুপ করে একা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে দলমা পাহাড়ের বুকের কালো-কালো ছায়ারেখার দিকে তাকিয়ে থাকে নিশীথ।

ভদ্রলোক নিশীথের কাছে এগিয়ে এসে বলেন--আপনিও চলুন।

--একটা কথাা বলবেন?

--বলুন।

--আপনার প্রতিবেশী এই শীতলবাবুদের ব্যাপারটা কী?

ভদ্রলোক বিপন্নের মত তাকিয়ে থাকেন--আমাকে বৃথা এসব প্রশ্নের মধ্যে টানবেন না। আমার কোনও কথা বলা উচিত নয়।

--বলুন, আমি কিছুই মনে করব না।

--বিয়ের সবই তো ঠিক ছিল। কিন্তু আজ দুপুরেই কোথা থেকে একটা খারাপ সন্দেহের খবর কে যেন এসে দিয়ে গেল, তাই ওঁরা খুব বেশি ভয় পেয়ে গেলেন। কাজেই, অর্থাৎ বোধ হয় শেষ পর্যন্ত কোনও উপায় ছিল না বলেই, তার মানে, চক্ষুলজ্জার ভয়ে বাড়ি ছেড়েই চলে গিয়েছেন।

--কিসের সন্দেহ?

--শীতলবাবু খবর পেয়েছেন যে, পাত্রের...

--বলুন।

--পাত্রের চরিত্র খারাপ।

ভদ্রলোক যেন নিজেরই মুখের ওই ছোট্ট একটি কথার শব্দ শুনে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। চুপ করে নিশীথের গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই ব্যগ্রভাবে গায়ের চাদর টানাটানি করে নিজেরই এই অপ্রস্তুত অবস্থার অস্বস্তিটাকে সামলাবার চেষ্টা করেন। তারপরেই উৎসাহিত স্বরে এবং প্রায় চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন।--থাকগে, যেতে দিন, এসব বাজে কথা আমাদের আলোচনা করাই উচিত নয়। মোট কথা...

নিজের কথার ঝোঁক হঠাৎ সামলে নিয়ে ভদ্রলোক বলেন--আপনি তা হলে এখানেই বিশ্রাম করুন।

চলে গেলেন ভদ্রলোক। নিশীথ তেমনি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ঝাউয়ের শব্দের সঙ্গে নিজেরও আহত নিশ্বাসের ছোট ছোট শব্দগুলিকে মিশিয়ে দিয়ে শুধু দেখতে থাকে, দলমা পাহাড়ের গায়ে ছায়ার রেখা আরও ঘন হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই।

নন্দ বাউলের সেই গানটার অর্থ যেন একটু একটু বুঝতে পারা যাচ্ছে। রূপসাগরের ঘাট

বড় পিছল, চলতে গেলে পা টলমল করে ওঠে। এবং আছাড় খায় তারাই, যারা বড় বেশি মুগ্ধ হয়ে, খুব বেশি ভালবাসে আর হঠাৎ বড় ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পা টলমল করত না, আছাড় খেয়ে পড়ে যেতেও হত না, যদি আগে একটু ধুলো ছড়িয়ে দিতে পারা যেত। একটু ফাঁকি, একটু চালাকি, আর বেশ একটু বাজে অহঙ্কারের ধুলো।

নন্দ বাউলের গানটাই শুধু নয়, ছেলেবেলার একটা পরীক্ষার কথাও মনে পড়ে। সেটা ছিল ডিকটেশন অর্থাৎ শ্রুতিলিখনের পরীক্ষা। নিশীথের খাতাটা শক্ত করে খিমচে ধরে লেখাগুলিতে দুবার পড়েছিলেন সেই বৈদ্যনাথ স্যার ; সেই মস্তবড় টাক আর মস্তবড় একজোড়া গোঁফ। নিশীথের লেখার মধ্যে একটাও বানানের ভুল খুঁজে পেলেন না বৈদ্যনাথ স্যার। পেনসিলের শিষ ঘষে-ঘষে খুব সরু আর তীক্ষ্ণ করে নিয়ে আর একবার খাতাটাকে খিমচে ধরলেন। লেখাটাকে আবার পড়লেন। ভ্রূকুটি করে লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বারো বছর বয়সের নিশীথের মনের ভিতরে যেন মস্ত একটা আশা চাঁদ ঝকমক করে ফুটে ওঠে। এইবার দশের মধ্যে দশ নম্বর দিয়ে ফেলবেন বৈদ্যনাথ স্যার। না দিয়ে পারবেন কেন? বৈদ্যনাথ স্যারের ওই তীক্ষ্ণমুখ পেনসিল নিশীথের লেখার উপর একটাও আঁচড় দিতে পারেনি। সেই মুহূর্তে চমকে উঠেছিল নিশীথ, বারো বছর বয়সের সেই আশার চাঁদ যেন দপ করে নিভে গেল। বৈদ্যনাথ স্যারের পেনসিল অদ্ভুত এক আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে সমস্ত লেখাকেই একটানে কেটে দিয়ে একটা শূন্য বসিয়ে দিল।

বৈদ্যনাথ স্যারের সেই তীক্ষ্ণমুখ পেনসিলের রাগের অর্থ কোনওদিন বুঝতে পারেনি নিশীথ। কিন্তু মনে হয়, আজ যেন একটু একটু বুঝতে পারা যাচ্ছে। এটাই বোধ হয় নিয়ম, যে ভালবাসার ভুল ধরার কিছুই নেই, সেই ভালবাসার আশাকে একেবারে শূন্য করে দিতে ভাল লাগে। কিন্তু ভাল লাগল কার? নীরাজিতার মনের ভিতরেও কী বৈদ্যনাথ স্যারের পেনসিলের মত একটা তীক্ষ্ণমুখ নিষ্ঠুর আক্রোশ লুকিয়ে ছিল?

কোথা থেকে কে যেন হঠাৎ এসে শীতল সরকারের কানের কাছে নিশীথের চরিত্রের গল্প বলে দিয়ে গি য়ছে। কে বলে গেল? এবং কোন্ গল্পটা? এই ত্রিশ বছর বয়সের জীবনের উপর দিয়ে কত গল্পই তো কতরকম কাণ্ড করে চলে গেল ; কিন্তু সে সব গল্পের মধ্যে এমন কী ভয়ালতা আছে যার জন্য নীরাজিতার মত মেয়ের ভালবাসাও ভয়ে ভীরু হয়ে যেতে পারে?

কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারের সেই মস্তবড় সওদাগরি অফিসের একটা আলোচনার গুঞ্জন এবং সেই সঙ্গে অফিসের মানুষগুলির মুখের সেই বাঁকা-বাঁকা হাসির ছবিটা মনে পড়ে। স্মিথ অ্যাণ্ড জনসনের রেয়ার-আর্থ ডিপার্টমেণ্টে তখন রিসার্চ অফিসার হয়ে কাজ করছিল নিশীথ। কাজটা নেবার এক মাস পরেই কলকাতার হাসপাতালেই বাবা মারা গেলেন। সন্ধ্যাবেলাটা ঘরের ভিতরে বসে থাকতে পারেনি নিশীথ। ঘরভরা মানুষের কান্নায় করুণ সেই ঘরের বেদনা সহ্য করতে না পেরে, আর বোধ হয় নিজেরও বন্ধ নিশ্বাসের গুমোট সহ্য করতে না পেরে, একটা পার্কের নিরালা কোণে বেঞ্চির উপর অনেক রাত পর্যন্ত একা একা বসে ছিল নিশীথ। পরের দিনও অফিসের একটা ছোট কামরার নিভৃতে আনমনার মত চুপ করে বসে ছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, অনন্তবাবু আর ধীরাজবাবু হঠাৎ কামরার ভিতর ঢুকে নিশীথের সেই আনমনা মনটাকেই চমকে দিয়েছিলেন।

একগাল হাসি হেসে ঢলে পড়েন অনন্তবাবু—কলকাতার রাতগুলো কী করে একটু ভালভাবে কাটানো যায় বলুন শুনি, নিশীথবাবু?

ধীরাজবাবু মুখ টিপে হাসেন।—নিশীথবাবুকে অনর্থক এসব প্রশ্ন কেন অনন্তবাবু? একটা ভাল পার্কে বেশ একটু রাত পর্যন্ত ওত পেতে বসে থাকতে পারেন, তবে বেশ ভাল জিনিসের সন্ধান পেয়ে যাবেন, এবং রাতটা মন্দ কাটবে না।

—তাই নাকি নিশীথবাবু?—নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন অনন্তবাবু।

হঠাৎ দুজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ান, অনন্তবাবু এবং ধীরাজবাবু। তারপরেই নিশীথের সেই বিমূঢ় চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আর একবার হেসে কামরা ছেড়ে চলে যান।

সেদিন থেকে অফিসের নানা ঘরে নানা জনের মুখ-টেপা হাসির ফাঁকে ফাঁকে একটা চাপা আলোচনার গুঞ্জন রোজই জেগে উঠত। সেই আলোচনার ভাষা কিছু কিছু নিশীথও নিজের কানে শুনেছে। ভাগ্য ভাল, চাকরিটা বেশিদিন ছিল না। ছ মাস যেতেই চাকরিটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু স্মিথ অ্যাণ্ড জনসনের অফিসের ঘরে সেই গুঞ্জনটা কি আজও বেঁচে আছে? এবং সেই গুঞ্জনই কি বাতাসে বাতাসে এতদূরে ভেসে এসে লাক্ষানগরের শীতল সরকারের কানের কাছে নিশীথ রায়ের চরিত্রের গল্প হয়ে বেজে উঠেছে?

কিন্তু ওটা যে একটা ঘোর মিথ্যা অপবাদের গল্প। অনন্তবাবু আর ধীরাজবাবুর মত ভয়ানক অন্ধ মানুষের একটা বিদঘুটে কল্পনার গল্প। এই গল্পটাকেই কি শুনতে পেয়েছেন আর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ফেলেছেন শীতল সরকার ও তাঁর মেয়ে নীরাজিতা?

সুবর্ণরেখার বালিয়াড়িতে ছায়া পড়েছে। পশ্চিম আকাশের রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। চোখে পড়ে নিশীথের, ডালিয়ার বাগানের ভিতরে হুটোপুটি করছে বেণু। বাড়িটার ফটকের থামে একটা নাম লেখা আছে—শিবদাস দত্ত। নামটা বোধ হয় ওই ভদ্রলোকেরই নাম, যিনি অলক্তকের ঘৃণা আতঙ্ক আর দুর্ভাবনার আসল রহস্যের কথাটা নিশীথকে এইমাত্র শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

নিশীথের জীবনের আরও গল্প আছে ; এবং মনে করবার চেষ্টা করলে একে একে মনে পড়েও যায়। এবং এটাও সত্য যে, অনেক বছর আগের দেখা একটি মেয়ের নাম আজও হঠাৎ এক এক বার নিশীথ রায়ের ভাবনার মধ্যে বেজে ওঠে। শ্যামলীর নামটা ভুলে যায়নি নিশীথ।

শ্যামলীর বাবা গোপালবাবু ছিলেন নিশীথের বাবার অফিসের ক্যাশিয়ার। নিশীথের বাবা মারা যাবার পরেও গোপালবাবু মাঝে মাঝে নিশীথের কলকাতার বাসায় আসতেন। নিশীথের একটা ভাল চাকরি হল কিনা, শুধু এইটুকু জানবার ইচ্ছা ছাড়া আর কোনও ইচ্ছা গোপালবাবুর ছিল না। অন্তত সে রকম অন্য কোনও ইচ্ছার কথা তাঁকে কোনওদিন বলতে শোনেনি নিশীথ। সেই গোপালবাবু খুবই আকস্মিকভাবে একদিন সকাল দশটার সময় অফিসে যাবার জন্য তৈরি হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। শুনেছিল নিশীথ, রোজ লক্ষ টাকা ঘেঁটে ঘেঁটে আর গুনে গুনে পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি-জীবন পার হয়েছে, সেই ক্যাশিয়ার গোপালবাবু নিজের জমার খাতায় দশটা টাকাও রেখে যেতে পারেননি।

শ্যামলীর দুর্ভাগ্যের আর একটা খবর জানতে পেরেছিল নিশীথ। শ্যামলীর বিয়ের একটা সম্বন্ধ প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছিলেন গোপালবাবু ; কথা ছিল, আসছে শ্রাবণেই বিয়েটা হয়ে যাবে। কিন্তু সে শ্রাবণ এলেও শ্যামলীর বিয়ে হল না। হবেই বা কেমন করে? বিয়ের খবর আসবে কোথা থেকে? কে দেবে? পাত্রপক্ষই চিঠি দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ বাতিল করে দিল।

আরও একটা সমস্যা। শ্যামলীদের দিন চলবে কী করে? নিশীথ রায় নিজেই যেচে শ্যামলীর মার কাছে গিয়ে একটা কথা বলেছি-বলুন, আপনাদের এই অবস্থায় আমি কী সাহায্য করতে পারি?

শ্যামলীর মা বলেন—শ্যামলীর পড়াটা যেন নষ্ট না হয় ; যাতে অন্তত এই চারটে মাস কলকাতায় থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করে দাও, নিশীথ। শ্যামলীর পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই দেশের বাড়িতে চলে যাব।

হ্যাঁ, সেই চারটে মাস শ্যামলীদের কলকাতায় থাকবার সব খরচ নিশীথই দিয়েছিল। এমন মস্ত কোনও টাকা খরচের ব্যাপারও সেটা ছিল না। মাসে মাসে শ'দেড়েক টাকা, এবং শ্যামলীর পরীক্ষার ফি-এর জন্য একশো কুড়ি টাকা মাত্র, এইমাত্র।

মাঝে মাঝে শ্যামলীদের বাড়িতে যেতে হত। শ্যামলীর পড়ার সুবিধা বা অসুবিধার খোঁজ নিতে হত। এবং এমন একটা সন্ধ্যানও দেখা দিয়েছিল, যে সন্ধ্যায় শ্যমলীর চোখে জল দেখে শ্যামলীকে সান্ত্বনা দিতে হয়েছিল। কারণ, শ্যামলীদের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল নিশীথ, গোপালবাবুর একটা ফোটোর দিকে তাকিয়ে আকুল হয়ে কাঁদছে শ্যামলী।

শ্যামলীর দেশের বাড়িতে চলে যাবার পর বুঝতে পেরেছিল নিশীথ, বেশ চমৎকার একটা গল্প এরই মধ্যে সেই আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে একেবারে আলিপুর পর্যন্ত ছুটে চলে গিয়েছে। আলিপুরের ছোড়দি বললেন—শ্যামলী মেয়েটা তো দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়, নিশি?

চমকে ওঠে নিশীথ।—এ কথা বলবার মানে কী ছোড়দি?

ছোড়দি হাসেন—সত্যিই রাগ করলি নাকি?

—হ্যাঁ।

—তা হলে শুধু আমার ওপর রাগ করছিস কেন? তোদের পাড়াসুদ্ধ মানুষের ওপরও রাগ কর তা হলে?

—তার মানে?

—তার মানে সবাই যে জানে।

—কী জানে?

—শ্যামলীর সঙ্গে তোর খুব ভাবসাব হয়েছে।

—তা হয়ছে। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু তাতে কী আসে-যায়?

ছোড়দি আশ্চর্য হয়ে ভ্রূকুটি করেন—তাতে ভালমন্দ অনেক কিছু আসে-যায়। লোকে আশ্চর্য হয় ; লোকে অনেক কিছু সন্দেহ করে।

নিশীথ আশ্চর্য হয়—সন্দেহ?

—হ্যাঁ। ভাবসাব হল, অথচ বিয়ে হল না, এটা তো ভাল কথা নয়।

—আমার সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ে হবে এরকম কোনও কথা তো ছিল না।

—সেইজন্যেই তো ব্যাপারটাকে এত খারাপ দেখাচ্ছে। শ্যামলীকে বিয়ে করলেই ভাল করতিস।

—কী আশ্চর্য, বিয়ে করতে ইচ্ছে হলে তো বিয়ে করব।

—ইচ্ছে করলেই তো হয়।

—না। মানুষের পক্ষে ইচ্ছে করে ইচ্ছে তৈরি করা সম্ভব নয়।

ছোড়দিও আর কোনও তর্ক না করে নিশীথের হাতের কাছে এক পেয়ালা চা তুলে দিয়েছিলেন। আলিপুরের ছোড়দির বাড়ির সেই চা কোনওমতে খেতে পেরেছিল নিশীথ। কিন্তু বিডন স্ট্রিটের মাসিমার বাড়িতে এসে চায়ের কাপে একটা চুমুকও দিতে পারেনি। মাসিমা বড় বেশি গম্ভীর হয়ে বললেন--তোমার নামে এসব ভয়ানক কথা শুনতে আমাদের বড় কষ্ট হয়, নিশীথ।

—কী কথা?

—গোপালবাবুর মেয়ে শ্যামলীর সঙ্গে...

চা না খেয়েই ঘর ছেড়ে চলে যায় নিশীথ। এবং আশ্চর্য হয়ে ভাবে, মানুষের জীবনের সব সত্য ও মিথ্যা কি এরকম এক একটা ভুয়ো গল্পের সৃষ্টি?

সেই ভুয়ো গল্পটা কি আজও মরে যায়নি? একটা মেয়ের উপকার করতে চেষ্টা করেছিল

নিশীথ, কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার, সেই চেষ্টার গল্পটা একটা উপকারের গল্প না হয়ে নিশীথেরই চরিত্রের গল্প হয়ে গেল! এতদিন পরে সেই ভুয়ো গল্পটাই কি উড়ে এসে অলক্তকের শীতলবাবু আর নীরাজিতাকে চমকে দিয়েছে?

শিবদাস দত্তের বাংলোবাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলে উঠেছে। জেঠামশাই কোথায়? কাকিমাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? শিবদাসবাবুর সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক বের হয়ে পড়ল নাকি? নইলে এতক্ষণ ধরে চা খাওয়ার কথা তো ছিল না? এবং চা খেতেই বা এত সময় লাগবে কেন? দেখতে পেয়ে একটু আশ্চর্য হয় নিশীথ, ডালিয়ার বাগানের পাশে ঘাসের উপর মাদুর পেতে ক্যারাম খেলছে চঞ্চল আর দেবেশ।

এদিকে ওদিকে সব বাড়িরই জানালায় আলো ফুটে উঠেছে, এবং অনেক দূরের দলমা পাহাড় এইবার একেবারে আবছা হয়ে গিয়েছে। আর, একেবারে যেন নিরেট অন্ধকারটি হয়ে মুখ ঢেকে রয়েছে অলক্তক।

ঝাউয়ের কাতর শাসানি থামলেও নিশীথের মনের উতলা নিশ্বাসের অস্থিরতা একেবারে শান্ত হয়ে যায়নি। জানতে ইচ্ছে করে, কোন গল্প শুনতে পেয়ে শিউরে উঠল নীরাজিতা?

একটা ফোটোর গল্প মনে পড়ে। সেটাও চাকরি-জীবনের একটা ঘটনার গল্প। স্মিথ অ্যাণ্ড জনসনের অফিসের চাকরি নয়, কলকাতার বিখ্যাত বাঙালি ব্যবসায়ী পরিতোষবাবুর মিনারেল সাপ্লাই কোম্পানির একটা চাকরি। নিশীথের কাজে বড় খুশি হয়েছিলেন পরিতোষবাবু। কিন্তু অফিসের ম্যানেজার কৈলাসবাবু মাঝে মাঝে ঠোঁটে দাঁত চেপে অদ্ভুতভাবে হাসতেন, এব নিশীথের কাছে এসে হেঁয়ালির মত একটা কথা প্রায়ই ফিসফিস করে বলতেন--শুধুই কি আপনার কাজ দেখে মালিক খুশি হয়েছেন মশাই? আপনি কি তাই মনে করেন?

নিশীথ বলে--তাই তো মনে করি।

ঠোঁটে দাঁত চেপে বিড়বিড় করেন কৈলাসবাবু--খুব ভুল করছেন, নিশীথবাবু। এই অফিসের কেউ অন্তত আপনার চেয়ে কম এফিশিয়েন্ট নয়।

পরিতোষবাবুর গিরিডি-অফিসের ম্যানেজার কাজ ছেড়ে দেবার পর কলকাতার অফিসে একটা আশার সাড়া জেগে উঠল যেদিন, সেদিন নিশীথ রায়ের দিকে অনেকগুলি চোখ বার বার অপ্রসন্ন হয়ে তাকিয়েছিল। কোনও সন্দেহ নেই, এইবার গিরিডি-অফিসের ম্যানেজার হবে পরিতোষবাবুর আদুরে অফিসার এই নিশীথ রায়। আটশো টাকা মাইনে, তার উপর অমন সুন্দর একটি শৌখিন কোয়ার্টার।

তার পরের দিনই পরিতোষবাবুর একটি বেনামি চিঠি পেলেন, অনেক মিনতি করে অনেক কথা লিখেছে একজন হিতাকাঙক্ষী, নিশীথ রায়ের মত সাংঘাতিক খারাপ চরিত্রের মানুষকে আর বেশি প্রশ্রয় দেবেন না। ওর টেবিলের দেরাজটা একটু সার্চ করলেই সব জানতে পারবেন।

নিশীথের টেবিলের দেরাজ সার্চ করেছিলেন পরিতোষবাবু, এবং একটা ফোটো পেয়েছিলেন, সেইসঙ্গে একগাদা প্রেমপত্র, নিশীথের কাছে লেখা ; এবং সেই প্রেমপত্রের বক্তব্যও একগাদা বীভৎসতা।

--এসব কী বস্তু, নিশীথ? নিশীথকে কাছে ডেকে নিয়ে অদ্ভুত একটা গম্ভীর হাসি হেসে প্রশ্ন করেছিলেন পরিতোষবাবু। প্রথমে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল নিশীথ, তারপর চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠেছিল।

পরিতোষবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বলেন--আমার কিন্তু বিশ্বাস করতে একটুও ভাল লাগছে না, নিশীথ।

নিশীথ বলে--সেটা আপনি বুঝে দেখুন। মোট কথা, আমি বিদায় নিলাম।

--সে কী! আমি তো তোমাকে মোটেই সন্দেহ করছি না।

—আপনার অনুগ্রহ। কিন্তু আমার পক্ষে আপনার চাকরিতে থাকা সম্ভব হবে না।

—তা হলে আমার গিরিডি-অফিসের ম্যানেজার হবে কে?

—কৈলাসবাবু।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল নিশীথ, কিন্তু গল্পটা নিশীথকে ছেড়ে দেয়নি। পরিতোষবাবুর অতবড় অফিসের ঘরে যে গল্পটা সেদিন ফিসফিস করে উঠেছিল, সেই গল্পটাকে চার বছর পরেও একদিন শুনতে পেয়েছিল নিশীথ। বেলঘড়িয়ার ডাক্তার রাজকিশোরবাবু, যিনি নিশীথের বড় ভগ্নীপতির বড়দা, তিনি পথে দেখা হতেই দুঃখ করলেন—সবটা শুনেছি নিশীথ, শুনে বড় দুঃখ পেয়েছি। চাকরি যাক, কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু এরকম একটা বিশ্রী কারণে, অর্থাৎ চরিত্রের জন্য চাকরি যাবে কেন?

সেই ফোটোর গল্পটাকেই কি শুনতে পেয়েছে অলক্তক? কিন্তু ওটা কী সত্যিই মানুষের চরিত্রের গল্প হল? কৈলাসবাবুর চক্রান্তের সৃষ্টি ওই গল্পটাকে একটুও সন্দেহ না করে রাজকিশোরবাবুর মত অলক্তকের শীতলবাবুও তা হলে বিশ্বাস করেছেন? এবং নীরাজিতাও।

জেঠামশাই আর কাকিমা যে ওই ডালিয়ার বাগানের আড়ালে ডুব দিয়েই রইলেন। কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। ওঁরা দুজনে তা হলে ঘরের ভিতর বসে গল্প করছেন। বেণুটাই বা কোথায় গেল? ক্যারামের খটাস-খটাস আর শোনা যায় না। দেবেশ আর চঞ্চলও বোধ হয় ঘরের ভিতরে গিয়ে বসেছে।

কিন্তু সন্ধ্যাও যে পার হতে চলল। সবাই বোধ হয় শিবদাস দত্তের আরও বড় অনুরোধের পাল্লায় পড়েছে। শুধু চা নয়, বোধ হয় একেবারে রাতের খাওয়া না খাইয়ে ছেড়ে দেবেন না পরম অতিথিবৎসল ওই শিবদাস দত্ত।

জীবনের ত্রিশ বছর বয়সের সব অনুভবের ইতিহাস যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজতে চেষ্টা করছে নিশীথ—সত্যিই এমন কোনও ছায়া, কোনও শিহর, আর কোনও দাগ আজও সে ইতিহাসের স্মৃতি-বিস্মৃতির ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে কি, যার জন্য নিশীথ রায়ের চরিত্রটাকেই ভয় করতে হবে? যদি থেকে থাকে, তবে এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাক না কেন? তা হলে নিশীথ রায়ের মনও সব ক্ষোভের জ্বালা থেকে এই মুহূর্তে মুক্ত হয়ে যাবে, নীরাজিতার ঘৃণাকে মনে মনে বরং অভিনন্দিত করে কালিকাপুরে ফিরে যেতে পারবে নিশীথ।

সন্ধ্যার আলোতে ঝাউয়ের ছায়া কখনও দোলে, এবং কখনও বা সিরসির করে কাঁপে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে যেন নীল জলের প্রকাণ্ড একটা ঢেউ নিশীথের চোখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সাদা ফেনার ফোয়ারা ছড়াতে থাকে। ঝাউয়ের শব্দ সমুদ্রের কল্লোলের মত মনে হয়।

না, নিতান্ত মিথ্যে নয়। একেবারে মিথ্যে একটা প্রহেলিকার শব্দ নয়। সত্যিই একদিন পুরীর সমুদ্রতটের বালুবেলায় বেড়াতে বেড়াতে নিজেরই বুকের ভিতর একটা ইচ্ছার কল্লোল শুনতে পেয়েছিল নিশীথ। নাটোরের কেশববাবু সপরিবারে পুরীতে বেড়াতে এসেছিলেন। কেশববাবুর চেহারাটা এখনও বড় স্পষ্ট মনে পড়ে, ফরসা পাতলা ও লম্বা মানুষটি। জরির কাজ-করা একটা লক্ষ্ণৌ-টুপি ছিল তাঁর মাথায়, এক হাতে মোষের শিংয়ের স্টিক, আর এক হাতে পাইপ, সেই কেশববাবু প্রায় এক ঘণ্টা ধরে নিশীথের কাছে তাঁর মাছ-ধরার নানা মজার গল্প বলেছিলেন।

সেদিন, পুরীর সমুদ্রের সেই বালুবেলার উপর বিকালের আলোতে কেশববাবুর সঙ্গে প্রথম যখন আলাপ হল, তখন আর একজন সেখানে ছিল, এর তার হাতে একটা সেতারও ছিল। কেশববাবুর মেয়ে অনুরাধা। কেশববাবুর মাছ ধরার গল্প শুনে অনুরাধাও বার বার হেসে উঠেছিল, এবং নিশীথ রায়ের চোখ বেশ একটু বিস্মিত হয়ে দেখেছিল, অনুরাধার মুখের হাসিটা অনুরাধার সেই ছিপছিপে সুন্দর চেহারার সঙ্গে কী সুন্দর মানিয়েছে।

কেশববাবু বললেন—তোমার পরিচয় জানতে পেরে বড় খুশি হলাম। তোমার বাবা নীরেন আর আমি একদিন সাংঘাতিক বর্ষার মধ্যে জেলেডিঙি নিয়ে একেবারে মাঝপদ্মা পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। মাছ ধরতে পারিনি, কোনওমতে প্রাণটা বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলাম। একটু থেমে নিয়ে খুশির স্বরে একটা আক্ষেপ করে ওঠেন কেশববাবু—আঃ, ছেলেবেলার সে সব দিন, কী দিনই না গিয়েছে?

প্রশ্ন করেছিল নিশীথ—পুরীতে আর কতদিন থাকবেন?

—পুরীতে আর মাত্র এক সপ্তাহ।

—তারপর কলকাতায় ফিরবেন?

—না, এই গ্রীষ্মটা শেষ না হবার আগে কলকাতায় ফিরব না। ভাবছি, ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে আর একটা মাস সমুদ্রের হাওয়া খাব।

সেই একটা সপ্তাহ, রোজই বিকালে কেশববাবুর সঙ্গে দেখা হত। তার মানে অনুরাধার সঙ্গেও দেখা হত। বিকেল ফুরিয়ে যখন সন্ধ্যা নামত, যখন ঢেউয়ের নীলটুকু আর দেখা যেত না, শুধু সাদা ফেনার হাসিটুকু আরও অন্ধকারের বুকে নেচে নেচে আছাড় খেত, তখন কেশববাবুই অনুরোধ করতেন—যদি কোনও কাজের তাড়া না থাকে, তবে আর একটু সময় এখানে থেকে যাও, নিশীথ। অনুরাধার সেতার শুনে যাও।

কেশববাবুর শখ, সন্ধ্যা হলে পুরীর সমুদ্রের সেই বালুবেলায় কোনও একটি নিভৃতে বসে মেয়ের হাতের সেতার বাজনা শোনেন। নিশীথও শুনেছিল। আজও মনে পড়ে, অনুরাধার সেতারের ঝংকার আর সমুদ্রের কল্লোল একসঙ্গে মিশে কী অদ্ভুত এক শব্দের উৎসব জাগিয়ে তুলত।

অনুরাধার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা হয়নি বললেই হয়। সাত দিনের মধ্যে মোট সাতটা কথাও হয়নি। কিন্তু অনেক কথা মনে হয়েছিল নিশীথের, তার মধ্যে বিশেষ একটা কথা নীরব কল্লোলের মত নিশীথের বুকের ভিতরেই বেজেছিল। একটা ইচ্ছার কথা। অনুরাধাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

ইচ্ছা করে, ব্যস, ওই পর্যন্ত ; তার পর তো পুরী ছেড়ে চলেই গেলেন কেশববাবু আর অনুরাধা, এবং অনুরাধার সেতারও। সত্যি কথা, কেশববাবুর কলকাতার বাড়ির ঠিকানা জানা সত্ত্বেও কোনওদিন কেশববাবুর বাড়িতে আসেনি নিশীথ। সেই বর্ষাতে না, এবং এই তিন বছরের মধ্যে কোনও একটি দিনেও না। এবং আজ কল্পনাও করতে পারে না নিশীথ, এখন কোথায় কোন সমুদ্রের বালুবেলার উপর বসে সেতার বাজাচ্ছে কেশববাবুর মেয়ে অনুরাধা।

তিন বছর আগের জীবনের এই গল্পটাই কি আজ নীরাজিতার কানে কানে কেউ বলে দিয়ে গিয়েছে? কে নিয়ে নিশীথ রায়ের সেই ইচ্ছার তো ভাষা ছিল না, তবে সেটা মানুষের কানে পৌঁছবে কী করে? ভালবেসে ফেলা আর ভালবাসতে ইচ্ছা করা, এই দুয়ের মধ্যে কি কোনও তফাত নেই? সেই তফাতটুকু বুঝতে পারবে না নীরাজিতা, তাই-বা কী করে সম্ভব হয়?

কে জানে কী ভেবে আর কী শুনে ভয় পেয়েছে নীরাজিতা! কিন্তু নিশীথ রায়ের মন কী বলে! অনুরাধার সেতার শুনে ওরকম একটা ইচ্ছা না হওয়াই কি উচিত ছিল? নিশীথ রায়ের চরিত্রের গায়ে একটা ক্ষতের দাগ ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে তিন বছর আগের ওই একটা ইচ্ছা? আশ্চর্য! এই যে পৃথিবী . বুকের ভিতরে আর বাইরে নির্জীব শক্ত পাথরের স্তর আর স্তূপ পড়ে রয়েছে, তাদেরও গায়ে ক্ষতের চিহ্ন আছে। নানারকম ইচ্ছার ক্ষত, এবং সে ইচ্ছার উপর কারও কোনও হাত ছিল না। মানুষের পাঁজর নিশ্চয় আর্কিয়ান গ্র্যানিটের চেয়ে বেশি নির্জীব আর বেশি কঠিন কোনও বস্তু নয়।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় নিশীথ। শিবদাস দত্তের চায়ের জল কি এই

এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেও ফুটে উঠতে পারল না? তবে এত দেরি হচ্ছে কেন? এখনও রওনা হলে কালিকাপুর ফিরতে কত রাত হয়ে যাবে, সেটা কি অনুমান করতে পারছেন না জেঠামশাই?

চক্রবর্তী মশাই অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছেন। রাজপোখরাতেই তাঁর এক কুটুমের বাড়ি আছে, সেখানেই তিনি আজ থেকে যাবেন। দেখতে পায় নিশীথ, কনট্রাক্টর জানকীবাবুর যে গাড়িটা আজ এখানে বরযাত্রী বয়ে আনবার দুর্ভাগ্য সহ্য করেছে, সেই গাড়ির ড্রাইভার মুনিরামও কোথায় যেন গিয়েছে। মুনিরামও কি শিবদাস দত্তের চা খেতে গিয়ে আটকে পড়ল? কালিকাপুরে ফিরে যাবার উৎসাহটাই শিথিল হয়ে গেল, কিংবা রাজপোখরার এই লাক্ষানগরের উপর রাগ করতেই ওরা ভুলে গেল?

কে যেন গাড়ির কেরিয়ারের ঝাঁপ খুলছে, শব্দ শুনেই চমকে ওঠে নিশীথ।—কে?

—আমি মুনিরাম।

—কী করছ তুমি?

—কাকিমা ফুলের ঝুড়িটা চাইছেন।

স্থলপদ্ম আর হলদে গোলাপের ঝুড়িটা কাঁধে নিয়ে চলে গেল মুনিরাম। কাণ্ড দেখে মনে মনে হেসে ফেলে নিশীথ। বাঃ, তবে কি শিবদাস দত্তের বাড়িতে এই স্থলপদ্ম আর হলদে গোলাপ উপহার দিয়ে, তার বদলে একঝুড়ি ডালিয়া উপহার নেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন কাকিমা? পুরনো কুটুমবাড়িতে এসেও এতটা প্রীতির মাখামাখি কেউ করে না। শিবদাস দত্ত তো মাত্র দেড় ঘণ্টার চেনা এক ভদ্রলোক।

ইচ্ছে না থাকলেও বার বার অলক্তকের দিকে নিশীথের চোখের দৃষ্টিটা সেই রকমই রক্তাক্ত বিস্ময়ের জ্বালা নিয়ে ছুটে যায়। ছায়া, আবছায়া আর অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে শীতল সরকারের বাড়িটা, নিশীথ রায়ের চরিত্রের একটা গল্প শুনে যেন একটা আতঙ্কিত দুঃস্বপ্ন নিরেট হয়ে গিয়েছে।

এত ভয় কেন? যদি কোনওদিন, কিংবা আজও এখনি হঠাৎ এসে নীরাজিতা প্রশ্ন করে, তবে অনায়াসে একটা স্বপ্নের গল্প হেসে হেসে বলে দিতে পারবে নিশীথ। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন, ঘুমের মধ্যে সেই স্বপ্নকে একটুও খারাপ লাগেনি, কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে পড়তেই লজ্জা পেয়েছিল নিশীথ। এক নারীর মূর্তি, এবং সত্যিই পৃথিবীতে ওরকম কোনও নারী আছে কিনা, জানে না নিশীথ। মুখে কথা নেই, চোখে হাসি নেই, একবিন্দু সাজ বা লাজের শোভা নেই, শুধু একটা নারী-শরীর। নিশীথের একেবারে চোখের কাছে এসে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, টিপ টিপ করে নিশীথের হৃৎপিণ্ডটা। সরে যায় না সেই মূর্তি, এবং নিশীথও বলতে পারে না যে, সরে যাও। সে মূর্তির চোখ দুটো শুধু বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে নিশীথের চোখ দুটোকেও অলস করে ফেলতে থাকে। সেই অদ্ভুত মূর্তির দুই ঠোঁটের কাঁপুনিগুলিকে এক চুমুকে পান করে পাগল হয়ে যাবার জন্য নিশীথ রায়ের নিশ্বাসের বাতাস তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায়।

বড় বিশ্রী ও নির্লজ্জ একটা স্বপ্ন। কিন্তু নিতান্তই স্বপ্ন, একেবারে বস্তুহীন একটা অসারতা। এরকম একটা স্বপ্নের দায়ে নিশীথ রায়ের চরিত্রটাকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করতে হবে, এমন কোনও নিয়ম কি আছে?

মাদল বাঁশি বাজিয়ে এবং বড় বড় জ্বলন্ত মশাল নিয়ে সাঁওতালদের একটা উৎসবের মিছিল চলে গেল। তার পরেই বিদ্যুতের একটা ঝিলিক ; অলক্তকের চেহারাটাও যেন ঝিক করে একটা ঠাট্টার হাসি হেসে আবার অন্ধকারের ভিতরে মুখ লুকিয়ে নিল।

আতঙ্কিতের মত চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায় নিশীথ। বুঝতে পারা যায়, আকাশের পুব আর দক্ষিণ জুড়ে ঘন মেঘের ভার থমথম করছে। বাতাসও খুব ঠাণ্ডা হয়ে

এসেছে। ঝড় উঠবে বোধ হয়। বৃষ্টি হবে নিশ্চয়। আরও দেরি করিয়ে দিয়ে, এবং আরও দুর্ভোগে নাকাল করে আর জলকাদা মাখিয়ে দুর্দশার চরম করে দিয়ে তবে মুক্তি দেবে রাজপোখরার এই বিদ্রূপে বিষাক্ত রাত্রিটা। বিরক্ত হয়ে এবং কাকিমা ও জেঠামশাইয়ের কাণ্ডজ্ঞানের উপর আস্থা হারিয়ে বার বার গাড়ির হর্ন বাজাতে থাকে নিশীথ।

এ কী! হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে নিশীথ। অলক্তকের এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় করছে কেন? নিশীথ রায়ের এতক্ষণের এত প্রশ্নের সব অহংকার যেন হঠাৎ একটা আতঙ্কের ঝিলিক খেয়ে চমকে উঠেছে।

কী আশ্চর্য, এতগুলি গল্প এত সহজে মনে পড়ে গেল, কিন্তু সবশেষে মনে পড়ল সেই গল্পটা, যেটা কোনও অপবাদ আর চক্রান্তের গল্প নয় ; শুধু একটা ইচ্ছার গল্প নয়, উপকারের গল্প নয়, অসার স্বপ্নের গল্পও নয়। সেটা যে একেবারে একটা বাস্তব সত্য, একটা ঘটনা, নিশীথ রায়ের ত্রিশ বছর বয়সেরই একটা নিদারুণ ভীরুতা। গালুডির ধীরেনবাবুর স্ত্রী সুনয়নাকে ভয় করে নিশীথ রায়ের মত মানুষ, এই গল্পটা যে সত্যিই নিশীথ রায়ের চরিত্রের গল্প। এই গল্প কেউ না জানুক, নিশীথ রায় নিজে তো জানে। কালিকাপুরের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে কেন? বার বার তিনবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কালিকাপুর থেকে পালিয়ে যাবার জন্য কেন ব্যাকুল হতে হয়েছিল? কেন বাংলোর ফটকের উপর 'আউট' টেনে দিয়ে ভিতরের ঘরের মধ্যে চুপ করে লুকিয়ে বসে থাকতে হয়? কালিকাপুরে কাঁচা সড়কের উপর মোটর গাড়ির শব্দ শুনলেই কেন চমকে উঠতে হয়? চিঠির উপর গালুডির ডাকঘরের ছাপ দেখলেই সে চিঠি খুলতে নিশীথ রায়ের হাত কেন কেঁপে ওঠে?

সে নারীর নাম সুনয়না, বয়সের তুলনায় শরীরটা যেমন বেশি ভারী, মুখটা তেমনই বেশি কাঁচা। কেউ না জানুক, এবং সুনয়নার সেই শান্ত ও গম্ভীর চেহারা দেখে পৃথিবীর কারও চোখে এক বিন্দু সন্দেহ নাই বা দেখা দিক, নিশীথ জানে, কী ভয়ানক আবেদন ওই সুনয়না! সুনয়নার দুঃসাহস দেখে শিউরে উঠতে হয়, ভয় পায়, সরে যাবার জন্য প্রাণটা ছটফট করে ওঠে ; কিন্তু সরে যেতে পারেনি নিশীথ। ভুলে যায়নি নিশীথ রায়, বরং ভাবতে গিয়ে বার বার নিজেরই ভীরুতাকে ঘৃণা করে ধিক্কার দিয়েছে। একবার নয়, অনেকবার এই ভীরুতার অভিশাপ সহ্য করতে হয়েছে।

তবে আর অলক্তকের উপর কিসের অভিমান? অলক্তকের ঘৃণা ভয় আর সন্দেহের উপর এত রাগ করবার কী আছে? সুনয়নার গল্পটা যদি শুনে থাকে নীরাজিতা, তবে কি নীরাজিতার ভয় পাওয়া উচিত নয়? বুকে হাত দিয়ে জোর করে বলবার সাহস আছে কি নিশীথ রায়ের, সুনয়নার লেখা চিঠির কথাগুলি নিশীথ রায়ের চরিত্রেরই গল্প নয়? নিজেকে হীরার টুকরো বলে মনে করলেই বা কী? হীরা হলেও দাগী হীরা। অলক্তকের বন্ধ ফটকের ওই প্রকাণ্ড তালাটার দিকে রাগ করে তাকাবার কোনও অধিকার নিশীথ রায়ের নেই, গল্পটা নীরাজিতা সরকার জানতে পারুক বা না পারুক।

জিওলজির মানুষ, শক্ত পাথর ঘাঁটাঘাটি করে সারা দিনের বারোটি ঘণ্টা পার হয়ে যায়, সেই নিশীথ রায়ের মুখটা অভিমানী ছেলেমানুষের মুখের মত কোমল হয়ে যায়, এবং চোখ দুটোও যেন ছলছল করে। একটা কথা শুধু জানতে পারল না নীরাজিতা। সুনয়না নামে সেই ভয়ের শাসন থেকে বাঁচতে পারা যাবে, নীরাজিতার ভালবাসার মধ্যে এই সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতি দেখতে পেয়েছিল নিশীথ রায়। তাই তো অনেক লোভে লোভী হয়ে, এই রাত্রেই একটি লগ্নের উৎসবে নীরাজিতার হাত ধরে নিশ্চিন্ত হবার আশায় ছুটে এসেছিল নিশীথ রায়।

না, আর রাগ করে নয়, বেশ খুশি মনেই রাজপোখরার এই ঝাউয়ের ছায়া থেকে এইবার অনায়াসে ছুটে চলে যেতে পারবে নিশীথ রায়। পঞ্চাশ মাইল স্পিডে গাড়িটা ছেড়ে দিলে কালিকাপুর পৌঁছে যেতে খুব বেশি রাত হয়ে যাবে না।

কিন্তু ও কী! কার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কাছে এসে পড়েছে বেণুটা?

বেণুর চোখ দুটো যেন নতুন উল্লাসে জ্বলজ্বল করছে। কাছে এসে চেঁচিয়ে ওঠ বেণু--প্রতিভাদি তোমাকে ডাকতে এসেছেন, দাদা। শিগগির চা খাবে চলো।

বেণুর প্রতিভাদি? তার মানে ওই ডালিয়া বাগানের মালিক শিবদাস দত্তের মেয়ে? তাই কি?

নিশীথ রায়ের মনের নীরব প্রশ্নের উত্তর প্রতিভার মুখের কথায় আপনি বেজে ওঠে।--আপনার চা আর খাবার এখানেই দিয়ে যাবার জন্য বাবা বললেন। আমিই বললাম, বাঃ, ত কেন হবে?

--কী বললেন?

--চা খাবেন চলুন।

কোনও কুণ্ঠা নেই, কথার মধ্যে কোনও সূক্ষ্ম সৌজন্যের সতর্কতা নেই, সোজা সরল ও সুস্পষ্ট ভাষার একটা আহ্বান, চা খাবেন চলুন। আকাশে মেঘ, বাতাস বড় ঠাণ্ডা, ঝাউয়ের ছায়া সিরসির করে দোলে, ফটকের আলোটাও যেন ঝাঁজ হারিয়ে ঢলঢল করে ; এবং শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভার মুখের হাসি যেন রাজপোখরার রাত্রিটাকে হঠাৎ আরও স্নিগ্ধ করে দিয়েছে। গাড়ির ভিতরে বসে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিশীথ রায়, এবং একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।

কিসের বিস্ময়? প্রতিভাকেই একটা বিস্ময় বলে মনে হয়, কারণ প্রতিভাও কি জানে না যে, কিসের জন্য নিশীথ রায়ের মনুষ্যত্বটাকেই সন্দেহ করে আর ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে অলক্তকের শীতলবাবু আর তাঁর মেয়ে নীরাজিতা সরকার?

প্রতিভা দত্তের সাজের মধ্যেও বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। একটা চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ি পরেছে প্রতিভা ; প্রতিভার মত বয়সের কোনও আধুনিকা এরকম একটা লাল-পেড়ে শাড়ি পরেছে, এরকম দৃশ্য কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারে না নিশীথ। প্রতিভার চোখের চশমাটা সোনার ফ্রেমের বটে, কিন্তু নিতান্তই সাদাসিধা ফ্রেম। এলোমেলো খোঁপাটা একটা সিল্কের রুমাল দিয়ে বাঁধা। পায়ে জুতো নেই। নিশীথ রায়ের চোখ দুটো স্বীকার করে, ওরকম পা জুতো দিয়ে না ঢেকে রাখাই ভাল। সত্যিই, পিচ-মাখানো কালো পথের উপর প্রতিভা দত্তের পা দুটো যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে, দুটি লালচে কোমলতার স্তবক।

নিশীথ বলে--আপনি মিছেমিছি কষ্ট করলেন। আমার চা খাবার ইচ্ছেই নেই।

--ইচ্ছে নেই কেন?

শিবদাস দত্তের মেয়ের মুখে সত্যিই যে কোনও সঙ্কোচের বালাই নেই। সোজা সরল প্রশ্ন। উত্তর দিতে গিয়ে ভাবতে হয়, উত্তরের ভাষাটাকেও তাড়াতাড়ি তৈরি করতে পারে না নিশীথ রায় এবং আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নেমে কুণ্ঠিতভাবে বলে--আপনি আমাকে এ ধরনের কোনও প্রশ্ন না করলেই আমি খুশি হব।

প্রতিভা বলে--কিন্তু আপনি চা না খেলে কি আমরা খুশি হব?

নিশীথ হেসে ফেলে--খুশি না হোন, দুঃখিত হবারও কোনও কারণ নেই।

--আপনি খুবই ভুল কথা বললেন। আপনি আমাদের সামান্য একটা অনুরোধ তুচ্ছ করবেন, অথচ আমরা দুঃখিত হব না, এটা কেমন করে হয়?

অপ্রস্তুতের মত প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিশীথ রায়, এবং কল্পনাও করতে পারে না বোধ হয়, শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভার সেই ঝকঝকে সপ্রতিভ মূর্তির সামনে নিশীথের চেহারাটাকে কী ভয়ানক বোকা বোকা উদ্ভ্রান্তের মত দেখাচ্ছে।

নিশীথ বলে--আপনিও আমাকে অনুরোধ করতে এসেছেন, ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগছে।

--আশ্চর্য বোধ করছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—আপনি কি জানেন না, কেন অলক্তকের ফটক বন্ধ?

—জানি বইকি।

—জানেন না বোধ হয়, নইলে আমাকে চা খাইয়ে খুশি হবার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন না।

প্রতিভার চশমার সোনার ফ্রেম যেন ঝিক করে জ্বলে ওঠে—বুঝলাম না, কী বলতে চাইছেন আপনি।

—এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে বললে...

—বলুন, আমি কিছুই মনে করব না।

—আপনি জানেন না। নিশ্চয়, ওরা আমার চরিত্রের খবর শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু আমার ভয় কিসের?

—একটুও না?

—কী বললেন?

—আমি কাউকে ঘেন্না করতে পারি না।

—কেন?

—সে অহংকারই আমার নেই।

রাজপোখরার আকাশের পুবে আর একটা লিকলিকে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নিশীথ রায়ের মুখে একটা অদ্ভুত প্রশ্নও যেন ভয়ানক কৌতূহলের জ্বালায় ছটফট করে ওঠে—কিসের অহংকার নেই?

—চরিত্রের অহংকার।

চরিত্রের অহংকার নেই, এরকম একটা কথাকে এত অহংকারের সুরে উচ্চারণ করতে পারে কোনও মেয়ে, কল্পনা করতে পারেনি নিশীথ। লাক্ষানগর রাজপোখরার পথের উপর ঝাউয়ের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে শিবদাস দত্ত নামে এক ভদ্রলোকের মেয়ের মুখে এরকম একটা কথা নিজের কানে শুনতে না পেলে বিশ্বাসও করতে পারা যেত না। কিন্তু কত স্পষ্ট করে, আর একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে কথাটা বলে দিয়েছে প্রতিভা।

প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমার কাচে আকাশের বিদ্যুতের ঝিলিক বার বার চমক জাগিয়ে খেলা করছে। মনে হয় নিশীথের, প্রতিভা দত্তেরও জীবনে একটা অহংকার যেন বার বার ঝিলিক দিয়ে জেগে উঠছে। প্রতিভার মুখটাকেও বড় বেশি অহংকারে গড়া একটা মুখ বলে মনে হয়। পৃথিবীর কোনও ভ্রূকুটির, কোনও অপবাদের, কোনও অভিযোগের ভয় করে না। চরিত্রের অহংকার নেই, এটাই যেন প্রতিভা দত্তের চরিত্রের সবচেয়ে বড় অহংকার।

ভুলে গিয়েছে নিশীথ, শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভা শুধু সৌজন্যের খাতিরে নিশীথের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু চা খাওয়ার একটি সাগ্রহ অনুরোধ জানাতে ; এবং নিশীথের পক্ষেও সৌজন্য রক্ষা করতে হলে এখন শুধু একটা ভদ্রতার হাসি হেসে প্রতিভার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হয়, ডালিয়ার বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওই বাংলোবাড়ির একটি চায়ের আসরের দিকে।

কিন্তু নিশীথ রায়ের চোখ দুটো বোধ হয় নিবিড় এক কৌতূহলের আবেশে হঠাৎ অভিভূত হয়ে গিয়েছে। রাজপোখরার পথের উপর সুন্দর একটা রহস্য নিশীথের চোখের কাছাকাছি এসে মনের ভিতর একটা নীরব বাচালতার ঝড় জাগিয়ে দিয়েছে। অনেক কথা বুকের ভিতর ঠেলাঠেলি করছে। কিন্তু কথাগুলিকে বুকের ভিতরেই চেপে রাখতে হয়। বলা

যায় না। বললেই মাত্রাছাড়া অভদ্রতা হয়ে যাবে ; এবং সেসব কথার একটি কথাও স্পষ্ট করে বলবার কোনও অধিকার নিশীথ রায়ের নেই।

সত্যিই কি ওই কথাটা প্রতিভা দত্তের জীবনের একটা অহংকারের প্রতিধ্বনি? প্রশ্ন করতে পারে না, কিন্তু নিশীথ রায় তার অপলক চোখ নিয়ে প্রতিভা দত্তেরই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ; যেন আশা করছে নিশীথ, প্রতিভা দত্তের মুখটাই আর একটু মিষ্টি এবং আর একটু নরম হয়ে নিশীথ রায়ের প্রশ্নের আকুলতা শান্ত করে দেবে।

চমকে না উঠলেও একটু আশ্চর্য হয় নিশীথ। সত্যিই প্রতিভা দত্তের মুখে যেন একটা আক্ষেপের বেদনা করুণ হয়ে উঠেছে। মাথাটাকে একটু হেঁট করেছে প্রতিভা, এবং মুখের হাসিটাকেও যেন দু ঠোঁটের ফাঁকে গুটিয়ে নিয়েছে। মনে হয়, কী যেন ভাবছে প্রতিভা, এবং সেই ভাবনার ছোঁয়া সহ্য করতে না পেরে প্রতিভার সব অহংকারের ছায়া পালিয়ে গিয়েছে। অহংকারে গড়া মুখ নয়, বেশ একটু বেদনার্ত মুখ।

রাজপোখরার আকাশের চেহারা বদলায় না। থমথমে মেঘের আড়ালে সব তারা ঢাকা পড়ে গিয়েছে, আর বিদ্যুতের চমকও থামছে না। কিন্তু হয় নিশীথ রায়ের চোখের আশা, নয় প্রতিভা দত্তের মুখের ছবি এক একটা চমক লেগে বদলে যাচ্ছে। শুধু দেখতে থাকে নিশীথ রায়, প্রতিভা দত্তের চোখের উপর ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে উঠেই মিলিয়ে গেল, আর আনমনা হাসির মত ছোট একটা হাসিকেও লুকিয়ে ফেলল প্রতিভা। যেন কাউকে ঠাট্টা করছে প্রতিভা, এবং সেই ঠাট্টার আড়ালে যেন একটা উত্তপ্ত ধিক্কারও আছে। নইলে চশমার কাচের আড়ালে প্রতিভা দত্তের চোখ দুটো হঠাৎ ধিক্ করে জ্বলে উঠবেই বা কেন?

বড় শান্ত দেখাচ্ছে প্রতিভাকে ; বেশ শক্ত রকমের শান্ত। ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে কী যেন ভাবল প্রতিভা, এবং তার পরেই আরও শক্ত হয়ে গেল প্রতিভার মুখের রূপ। মনে হয়, খুব সাবধান হয়ে গিয়েছে প্রতিভা। খুব জোরে চলতে চলতে হঠাৎ পায়ের কাছে একটা গভীর গর্ত দেখতে পেয়ে মানুষের চোখ যে রকম চমকে উঠে সাবধান হয়ে যায়, সেই রকম চোখ করে নিজেরই আঙুলের একটি আংটির দিকে তাকিয়ে আছে প্রতিভা।

বোধ হয় ভয় পেয়েছে, নইলে বেণুর ছোট্ট হাতটাকে এত শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে কেন?

—চলো, প্রতিভাদি। ছটফট করে চেঁচিয়ে উঠেছে বেণু।

নিশীথ বলে—বেণুকে যেতে দিন।

কোনও উত্তর না দিয়ে, এবং অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বেণুর হাতটাকে তেমনই শক্ত করে ধরে প্রতিভা বলে—আপনিও চলুন।

—যাচ্ছি, কিন্তু বেণুকে ছেড়ে দিন।

বেণু বলে—হ্যাঁ, আমাকে ছেড়ে দাও, প্রতিভাদি। আমি যাই, নইলে চঞ্চলদা আমার ডালিয়া চুরি করে ফেলবে।

বেণুকে ছেড়ে দিলে নিশীথের চোখের সামনে একলা হয়ে যেতে হবে, এই ভয় ছাড়া আর কি ভয় করতে পারে প্রতিভা? একলা হতে চায় না, এবং নিশীথ রায়ের চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাষার রকম-সকমও বোধ হয় প্রতিভা দত্তের সপ্রতিভ মনের ভিতরে একটা সন্দেহের উৎপাত ঘটিয়ে দিয়েছে।

বুঝতে পারে নিশীথ, শিবদাস দত্তের মেয়ে নিশীথ রায়ের কাছে সৌজন্যের অতিরিক্ত আর কিছু বলতে চায় না, জানতেও চায় না।

—আমার একটা অনুরোধ শুনুন। নিশীথ রায়ের গলার স্বরে যেন একটা অসহায় আবেদন, একটা সান্ত্বনালোলুপ পিপাসা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রতিভা দত্তের সপ্রতিভ মূর্তিও চমকে ওঠে। চোখ তুলে নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে, ভীরু বিস্ময়ে বিব্রত হয়ে প্রতিভা দত্ত বিড়বিড়

করে—কী বললেন?

—বেণুকে চলে যেতে দিন। আমি তো যাচ্ছিই।

প্রতিভা দত্তের হাতটা একবার কেঁপে উঠেই শিথিল হয়ে যায় এবং বেণুও ছাড়া পেয়ে যেন নূতন উল্লাসের নাচের মত ফুরফুর করে দৌড়ে চলে যায়।

নিশীথ হাসে—আপনি বোকা নন ; বেণুকে ছেড়ে দিতে কেন বললাম, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।

—কিন্তু ভুল করলেন।

—কেন?

—আপনি যদি আমাকে একলা পেয়ে কোনও নূতন কথা বলেন কিংবা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি কোনও উত্তর দেব না।

—কী বলব আমি? কী সন্দেহ করছেন আপনি?

—আপনি নীরাজিতার উপর রাগ করে এখুনি একটা হিরোয়িক কাণ্ড যদি করতে চান...

—নীরাজিতার ওপর রাগ ভুলে গিয়েছি ; বিশ্বাস করুন।

প্রতিভা হাসে—বিশ্বাস করলাম।

—তা হলে তোমার আপত্তি করবার কী আছে?

চমকে ওঠে প্রতিভা—মাপ করবেন।

—তা হলে বলো চরিত্রহীনকে তুমি ঘেন্নাই কর।

—না।

—ভয় কর।

—না।

—তবে?

—আমার কথা তুলছেন কেন? আমার কথা আমি ভাবছি না।

—তার মানে?

—আপনার কথা। আপনি কিছু জানেন না বলেই বোধ হয় ভয় পাচ্ছেন না, তাই হঠাৎ শুধু চোখের দেখা দেখে শিবদাস দত্তের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

—সব কিছু জানলেও বোধ হয় ভয় পাব না।

—অসম্ভব।

—না।

—নিশ্চয়।

—কেন?

—আপনি পুরুষ।

—চরিত্র নিয়ে বড়াই করে না সেই রকম পুরুষ।

—কিন্তু স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে বড়াই করতে না পারলে মনে মনে মরে যাবেন।

—তোমার মত মেয়ে যদি স্ত্রী হয়...

—আপনি খুবই ভুল কথা বলছেন, নিশীথবাবু ; আর অনর্থক আমাকে দিয়ে বেহায়ার মত অনেক কথা বলিয়ে নিচ্ছেন।

—তুমিই ভুল করছ, প্রতিভা। তোমাকে দিয়ে তোমার কোনও ইতিহাস বলিয়ে নিতে চাই না। শুধু বিশ্বাস করতে বলি।

—কী?

—চরিত্রের অহংকার নেই, এমন মেয়েকেই আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

—কেন?

—আমার চরিত্রের অহংকার নেই বলে।

মাথা হেঁট করে প্রতিভা। যেন প্রতিভার এতক্ষণের বাচালতা হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছে। লজ্জা পেয়ে নয় ; প্রতিভা দত্তের এই হেঁট-মাথার ভঙ্গিটা যেন বিচিত্র এক অভিবাদনের আবেশে হঠাৎ কোমল হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। নিশীথ রায় নামে এই ভদ্রলোকের, যাকে এক ঘণ্টা আগেও চিনত না, যার নামও কোনওদিন শোনেনি প্রতিভা দত্ত, তার ইচ্ছার দুঃসাহস দেখে আশ্চর্য হতে হয়। প্রতিভা দত্ত নামে একটি মেয়ের জীবনের কোনও গৌরবের কথা, কোনও গুণের কথা শুনতে পাননি ভদ্রলোক। শুধু যে মেয়ের জীবনের এক ভয়ানক স্বীকৃতির কথা শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু তবু একটু ভয় নেই, একটু কুণ্ঠা নেই। সেই মেয়েকেই ভালবাসতে চান। চরিত্র নিয়ে অহংকার করবার অধিকার নেই যে মেয়ের, সে মেয়ের চরিত্রটা কী রকমের, এটুকু না বুঝবার মত মূর্খ নন ভদ্রলোক। কিন্তু...তবু...কী আশ্চর্য, চরিত্রে ক্ষত আছে, শুধু এটুকু জেনেই ভালবাসার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। খামখেয়ালি ভদ্রলোক, মাথা-খারাপ ভদ্রলোক, কিন্তু বুঝতে পারে প্রতিভা দত্ত, নিজেরই বুকের দুরুদুরু চঞ্চলতার ভাষা বোধহয় বুঝতে পারে, ভদ্রলোকের এই খামখেয়ালির দাবি যে প্রতিভা দত্তেরই জীবনের জন্য দুর্লভ এক শ্রদ্ধার ঘোষণা হয়ে বেজে উঠেছে।

প্রতিভা দত্তের চরিত্রের অহংকার মিথ্যে করে দিয়েছে যে ঘটনা, একটা-দুটো নয়, অনেক অদ্ভুত ভাষা, অদ্ভুত দৃষ্টি, অদ্ভুত চিঠি আর...একটা ভয়ানক অদ্ভুত স্পর্শ, সবই যে প্রতিভা দত্তের ভাবনা ও অনুভবের স্তরে স্তরে আজও নানা ধিক্কার, নানা আক্ষেপ আর নানা লজ্জা ছড়িয়ে রেখেছে।

এই ভদ্রলোক কল্পনাতে যত বড় একটা সন্দেহকে ধারণা করতে চেষ্টা করুন না কেন, এ ধারণা করতে পারছেন না যে, মাত্র এক বছর আগে, চরিত্রবান এক শিক্ষিত ভদ্রলোক শিবদাস দত্তের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল হয়েও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারেননি। বরং ভয় পেয়ে, ঘৃণা করে, এবং রাগ করে হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। শীতল সরকারের ওই অলক্তক আজ নিশীথ রায়কে যে-ধরনের ঠাট্টা আর অপমান করেছে, শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভাকেও যে প্রায় সে-ধরনেরই একটা বিদ্রূপে আহত হয়ে একদিন এই ডালিয়ার বাগানের নিভৃতে মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। এবং ওই শিবদাস দত্তও বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে আছাড়-খাওয়া ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের সব আয়োজনও ঠিক ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি চিঠি পেলেন শিবদাস দত্ত, বিয়ে করতে রাজি নন সেই ভদ্রলোক, সেই চমৎকার শিক্ষিত ইয়ংম্যান। ভদ্রলোক নিজেই অত্যন্ত শক্ত ভাষায় শিবদাস দত্তকেও ভর্ৎসনা করে চিঠি দিয়েছিলেন ঃ আশা করি, আমার আচরণে বিস্মিত না হয়ে নিজের মেয়ের চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে সাবধান হতে চেষ্টা করবেন।

প্রতিভা দত্তের চরিত্রের কোন ঘটনার গল্প শুনতে পেয়ে বিয়ের জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল সেই ভদ্রলোক হঠাৎ সাবধান হয়ে গেলেন, আজও কল্পনা করতে পারে না প্রতিভা। হ্যাঁ, অসম্ভব নয়, প্রতিভা দত্তের হাতের লেখা এমন চিঠি পৃথিবীর কোথাও হয়ত আজও আছে, যে-চিঠির ভাষা প্রতিভা দত্তের চরিত্রের রূপ ধরা পড়িয়ে দিতে পারে। সন্দেহ হয়েছিল প্রতিভার, প্রায় সাত বছর আগে মধুপুরে লেখা সেই চিঠিগুলি কি? মিথ্যে নয়, এক বিন্দুও মিথ্যে নয়, মধুপুর থেকে চিঠি পাওয়ার আশায় দিন গুনত প্রতিভা, এবং মধুপুরে চিঠি লিখতে ভাল লাগত।

জীবনের অতীতের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি আজ এই মুহূর্তে প্রতিভা দত্তের চোখের উপর দিয়ে যেন চকিত মিছিলের মত ছুটে চলে যায়। এই রাজপোখরা থেকে মোটরগাড়িতে একটানা দৌড়ে পথ পার হয়ে রাঁচি পৌঁছে হোটেল-মিরাণ্ডার বারান্দায় বসে এক পেয়ালা চা

খতে হল ; তারপর হাজারিবাগ রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে চুটুপালু পাহাড়া পথের কত বাঁক পার হয়ে, সমস্ত খাড়াই পথটা গাড়ির দোলানির সঙ্গে হাসতে হাসতে পার হয়ে একেবারে চুটুপালুর মাথার উপরে এসে থামতে হয়েছিল। নীচের শালবন সবুজ রঙের পাতলা বনাতের মত দেখায়। ঝরনাগুলি সরু সরু রেখার মত। শোভেন্দুর সঙ্গে সেই একটি দিনের জন্য অত দূরে বেড়াতে যেতে দিতে শিবদাস দত্তও কোনও আপত্তি করেননি। এবং আজও ভুলে যায়নি প্রতিভা, সেদিন চুটুপালুর মাথার উপরে সেগুনের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে, এবং কোনও কথা না বলে শোভেন্দু হঠাৎ প্রতিভার কাঁধে হাত রেখেছিল। ভুলে যায়নি প্রতিভা, সেদিন শিউরে উঠেছিল প্রতিভা, শোভেন্দুর হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হ...ছিল। এবং ফিরবার পথে শোভেন্দুও প্রতিভার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। কে জানে শোভেন্দুর সেদিনের রাগ হয়ত আজও পৃথিবীর এখানে ওখানে প্রতিভার চরিত্রের নামে ভয়ানক গল্প রটিয়ে বেড়ায়।

রাজগিরে বেড়াতে যেতে হয়েছিল একবার। শিবদাস দত্ত ছিলেন ; সে সময় প্রতিভা দত্তের মা বেঁচে ছিলেন, এবং তিনিও সঙ্গে ছিলেন। আজও স্মরণ করতে পারে প্রতিভা, সেই ভদ্রলোকের নাম বিকাশ ; বিলেতে গিয়ে সার্জারির পরীক্ষায় পাস করে এবং তিন-চারটে সোনার মেডাল নিয়ে দেশে ফিরেছে সেই বিকাশ। রাজগিরে বাড়ি ভাড়া করে বাবা মা আর অনেকগুলি ভাইবোনের সঙ্গে প্রায় একটা মাস রাজগিরে ছিল বিকাশ। সেই মস্তবড় পাথরটা, জরাসন্ধের বৈঠক, তারই কাছে রোজ সন্ধ্যায় ঘুরে ফিরে বেড়াত বিকাশ। প্রতিভাও বেড়াতে যেত ; এবং বিকাশের সঙ্গে রোজই দেখা হত। কিন্তু আলাপ হয়নি। তবু অস্বীকার করে না প্রতিভা, এবং আজও স্মরণ করতে পারে, বিকাশকে দেখতে ভাল লাগত। সন্ধ্যা হলে এক এক দিন এমন কথাও মনে হয়েছে, এতক্ষণে বোধ হয় জরাসন্ধের বৈঠকের কাছে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিকাশ।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, অস্বীকার করে না প্রতিভা, ইচ্ছে করে হোক কিংবা অনিচ্ছাসত্ত্বে হোক, মনটা অনেকবার উঁকি দিয়ে পৃথিবীর অনেক সুন্দর মুখ দেখেছে। কোনও কোনও দেখার অনুভব মনের কোণে রঙ ছিটিয়ে দিয়েছে। এবং সেজন্য নিজের উপর কোনও মুহূর্তে এতটুকুও রাগ হয়নি।

বুঝতে পারেনি প্রতিভা, কতক্ষণ এভাবে এক ঠাঁইতে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। ফটকের আলো পথের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে ; এবং বুঝতে পারে প্রতিভা, নিশীথ রায়ও এক পা নড়েনি—যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। নিশীথের পায়ের হরিণের চামড়ার চটি একেবারে স্তব্ধ হয়ে পথের মাটির সঙ্গে লেগে রয়েছে, একটুও উসখুস করে না।

জানে না, কোনও দুঃস্বপ্নেও সন্দেহ করতে পারবে না এই নিশীথ রায়, প্রতিভা দত্তের এই শরীরের স্নায়ু ও শিরার ভিতর আজও মাঝে মাঝে যে বিদ্রূপের শিহর তপ্ত হয়ে ছুটাছুটি করে। কিন্তু এর জন্য নিজের উপর ছাড়া আর কারও উপর প্রতিভা দত্তের মনে কোনও অভিযোগ নেই। যদি ঘৃণা জাগে, সে ঘৃণা নিজেরই জীবনের একটা শুভ বিশ্বাসের প্রগল্‌ভতার বিরুদ্ধে। সেই বিশ্বাসের আনন্দকে একটু সামলে রাখবার মত মনের জোর পায়নি, সে ভুল নিজের ভুল ছাড়া আর কারও ভুল নয়।

ভালবাসতে হলে শুধু মন প্রাণ দিয়ে নয়, আরও কিছু দিয়ে ভালবাসতে হয়, এ কথা তিন বছর আগের প্রতিভা দত্তকে কেউ কানে কানে বলে শিখিয়ে দেয়নি। কিন্তু মিহির মিত্রের সঙ্গে এক বছরের চেনাশোনার পর যেন নিজেরই নিশ্বাসের মধ্যে এই কথা শুনতে পেয়েছিল প্রতিভা। কিসের অন্যায়? কেন ভুল হবে? ক্ষতি কী? যার সঙ্গে সারা জীবন আপন হয়ে থাকতে হবে, স্বামী হবে যে, মনে প্রাণে ভালবেসেছে যে, দেখা হলেই একটা চরম সান্ত্বনা পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় যে, তার বুকের কাছে মাথাটা এগিয়ে দিতে আপত্তি হয়নি প্রতিভার।

প্রতিভা নিজেই আজ আশ্চর্য হয়ে যায়, আজকের এই ভীরু শরীরটা কেমন করে সেদিন এত দুঃসাহস পেয়েছিল? তিন বছর আগে কলকাতার বাড়িতে সেই এক বছরের জীবন যেন একটা একটানা উৎসবের মত পার হয়ে গিয়েছিল।

সেই মিহির মিত্র বিলেত চলে যাবে, কোনওদিন এরকম বিচ্ছেদের অভিশাপ কল্পনা করতে পারেনি প্রতিভা। মিহির মিত্র বিলেতে থাকতেই একটা বিয়ে করে ফেলবে, এমন আশঙ্কা কখনও প্রতিভা দত্তের কোনওক্ষণের দুর্ভাবনার মধ্যেও দেখা দেয়নি। যেদিন প্রথম খবরটা শুনেছিল প্রতিভা, সেদিন খবরটাকে বিশ্বাসই করতে পারেনি। কিন্তু মিহির মিত্রের একটি চিঠি এসে প্রতিভা দত্তের ভুল ভেঙে দিয়েছিল। মিহির মিত্র দুঃখ প্রকাশ করেনি ; বরং যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে চিঠিটা লিখেছিল ; কিছু মনে করো না প্রতিভা, এবং বিশ্বাস করো, তোমাকে ভয় পেয়ে আমি বিলেতে পালিয়ে এসেছি এবং বিয়ে করেছি।

কিসের ভয়? এই প্রশ্নের উত্তরও ছিল সেই চিঠিতে। প্রতিভা দত্তের চরিত্রকেই ভয় পেয়েছে মিহির মিত্র ঃ আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি, তবু তুমি ও ভুল কেন করলে, প্রতিভা? যেটা বিয়ের পরে হওয়া উচিত, সেটা...ছিঃ...তুমিই বুঝে দেখো, তার পর তোমার জন্য আমার মনে কোনও আগ্রহ আর থাকতে পারে কি?

মিহির মিত্রের চিঠিটাকে একটা মাস হাতের কাছে রেখেছিল প্রতিভা। চিঠিটাকে বার বার পড়ে যেন নিজের জীবনের শেষ গর্বটাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেষ্টা করত। এবং একদিন মাঝরাতে ঘুম থেকে বিছানার উপর উঠে বসে ভূতে-পাওয়া মানুষের মত রেগে কেঁদে আর হেসে হেসে চেহারাটাকে আধমরা করে ফেলেছিল প্রতিভা। মিহির মিত্রের ভালবাসা মিথ্যে হয়ে গেল, সেজন্য নয়। মিহির মিত্র অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করল, সেজন্য নয়। নিজেকে ঘৃণা করেছিল প্রতিভা। বুকের পাঁজরগুলিতে দিনরাত একটা আতঙ্ক যেন যন্ত্রণা দিয়ে প্রশ্ন করত, চরিত্র হারালে কেন, প্রতিভা? ছিঃ!

রাজপোখরার বাড়িতে এসে তিন বছরের মধ্যে প্রতিভা দত্তের পাঁজরভাঙা সে আতঙ্ক অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রতিভা দত্তের জীবনটাই শান্ত হয়ে গিয়েছে। একটি সত্য বুঝে নিয়েছে প্রতিভা, মানুষকে ভালবাসার নিয়ম সে জানে না। ভালবাসতে গিয়ে এত ভুল করে যে মেয়ে, পৃথিবীর কাউকেই তার আর ভালবাসতে যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া কাউকে ভালবাসার অধিকারও তার নেই। তার পক্ষে কারও স্ত্রী হওয়া উচিত নয়।

পৃথিবীর কারও উপর রাগ নেই, কোনও অভিযোগও নেই প্রতিভার। এমন কি, এক বছর আগে প্রতিভাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে উঠেও শেষ পর্যন্ত প্রতিভার চরিত্রকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেন যে ভদ্রলোক তাঁর উপরেও না। সে ভদ্রলোকের অপরাধ কোথায়? সে ভদ্রলোক ঘৃণার কথা চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন, সে ঘৃণা যে একেবারে রক্তমাংসের ঘটনা দিয়ে গড়া বাস্তব সত্য। কে জানে হয়ত দূর বিলেত থেকে মিহির মিত্রের জীবনের একটা এক বছরের নিছক রোমান্সের গল্প প্রতিভা দত্তের চরিত্রটাকে ঠাট্টা করবার জন্য চারদিকে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে এই লাক্ষার দেশ, এই ম্যাঙ্গানিজ ফায়ার-ক্লে আর কেওলিনের দেশে এসে পড়েছে। ভালই হয়েছে, নিজেকে চিনতে পেরেছে প্রতিভা।

অনেকক্ষণ এইভাবে পথের উপর দাঁড়িয়ে এই নীরব ভাবনার অভিনয় করতে গিয়ে পার হয়ে গিয়েছে। আর দেরি করা উচিত নয়। চায়ের আসরে এতগুলি মানুষ অপেক্ষায় চুপ করে বসে আছে। তারাই বা কী ভাবছে? বেণুও বোধ হয় আবার এখনি ছুটে আসবে। নিশীথ রায়কে স্পষ্টই বলে দেওয়াই ভাল, না, আর এভাবে আপনি আমাকে অকারণে পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না।

ভুল করছে, খুব অন্যায় করছে নিশীথ রায়। প্রতিভা দত্ত যেন জোর করে মনের ভিতর নিশীথ রায়ের চোখের চাহনি, মুখের ভাষা আর এই থমকে-থাকা শক্ত চেহারাটার উপর রাগ

জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টাও বোধ হয় বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ; তাই থেকে থেকে হঠাৎ কেঁপে উঠছে প্রতিভা দত্ত, এবং এতক্ষণে নিজেরই মনে একটা নতুন ভুলের রকম চোখে পড়ছে। না, নিশীথ রায়কে শুধু চা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে নয় ; প্রতিভা দত্তের প্রাণের একটা আহত গৌরবের দুঃসহ বেদনা যেন একটা আবেগে ছুটে এসে এখানে দাঁড়িয়েছে। দেখতে ইচ্ছা হয়েছে, চরিত্রহীন মানুষ সত্যিই দেখতে কেমন? ভালবাসার মানুষের কাছ থেকে ঘৃণার আঘাতে পীড়িত হলে চোখে মুখে যে বেদনা ফুটে ওঠে, সেই বেদনাই বা দেখতে কেমন।

কিন্তু আসা উচিত হয়নি। কোনও দরকার ছিল না। আর এই বুদ্ধিমান নিশীথ রায়ের ধূর্ত প্রশ্নের কাছে নিজেকে এমন করে ধরা পড়িয়ে দেবারও কোনও দরকার ছিল না।

—চলুন।

কথাটা বলেই আস্তে আস্তে মুখ তোলে প্রতিভা, আর যেন জোর করে মনের সব শক্তি দিয়ে নিজেকে সাবধান করে দিয়ে আবার সেই সামান্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। —অনেক দেরি হয়ে গেল, সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

—কিন্তু তুমি আমাকে একটি কথা দাও, প্রতিভা।

—পারব না। মাপ করবেন।

—তা হলে, আমার অন্য একটা কথা শোনো।

—বলুন।

—তুমি যদি রাজি না হও...

—নীরাজিতাকে এত শিগগির ভুলে যাচ্ছেন কেন?

—ভুলে গিয়েছি, ভুলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারব না।

—নিজেকে বৃথা কষ্ট দেবেন কেন?

—তাই ভাল লাগবে।

—তা হলে একজনের ওপর যে ভয়ানক অন্যায় করা হবে।

—কার ওপর?

—স্ত্রীর ওপর।

—কার স্ত্রী?

—আপনার।

—আমার স্ত্রী কেউ হবে না। কোনও কালেই হবে না।

—তার মানে, আপনি বিয়ে করবেন না!

—না। শুধু তুমি যদি হও...

আঁচল তুলে চশমা-সুদ্ধ চোখ ঢেকে ফেলে প্রতিভা দত্ত। নিশীথ রায় চমকে ওঠে।—কী হল প্রতিভা?

—কিছু না।

—তবে একটি কথা বলো, প্রতিভা। হ্যাঁ কিংবা না।

—হ্যাঁ।

প্রতিভা দত্তের একটি হাত ধরবার জন্য হাত এগিয়েই হাতটাকে সামলে নেয় নিশীথ রায়, এবং ব্যস্ত হয়ে বলে, চলো।

শিবদাস দত্তের বাংলোবাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরটার ভিতরে চায়ের আসরও যেন মনে মনে আশা-নিরাশার বড় কঠিন এক দ্বন্দ্ব সহ্য করছিল। কাকিমার চোখের চেহারা দেখে মনে হয়, তিনি যেন প্রাণপণে আশা ধরবার চেষ্টা করছেন। বার বার বারান্দার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন। আসছে কি নিশি? সত্যিই নিশিটা একবার ভুল করেও এদিকে এসে পড়বে না

কি? যদি আসে তবে...কাকিমা আবার তাঁর মনের অদ্ভুত একটা ইচ্ছাকে যেন জোর করে সাহস দিতে থাকেন। কেন, সম্ভব হবে না কেন?

কিন্তু নিশীথ আসছে না। আসবে বলে মনে হয় না। প্রতিভার অনুরোধও কি ব্যর্থ হয়ে গেল? নিশিটার যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে, যদি ভদ্রতাবোধ থেকে থাকে, তবে প্রতিভার অনুরোধ রক্ষা না করে থাকতে পারবে না। মেয়েটা নিজেই গিয়েছে নিশিকে ডেকে আনবার জন্য ; নিশিরও তো একটু বোঝা উচিত।

চায়ের আসরে কাটা-ফলে সাজানো ডিশগুলি চুপ করে পড়ে আছে। কেক-বিস্কুটের একটা স্তূপ, পাঁউরুটির স্লাইসের দুটো স্তূপ, আর দুটো প্লেটের উপর মাখনের দুটো বড় চাকা, সবই যেন অপেক্ষায় থেকে থেকে প্রায় হতাশ হয়ে মিইয়ে আসছে।

শিবদাস দত্ত গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে কোমরে ন্যাপকিন জড়িয়েছেন। এবং জেঠামশাইয়ের আপত্তি অগ্রাহ্য করে নিজের হাতেই লুচি ভেজে ও আলুর দম রেঁধে ফেলেছেন।—আপনারা যখন দয়া করে এতটা সময় থেকেই গেলেন, তখন কি শুধু আর চা-বিস্কুট দিয়ে আপনাদের...না, সে হতে পারে না। আপনি জানেন না, আমি একটি ওস্তাদ রাঁধিয়ে এবং আমার রান্নার সুনাম আছে।

কাকিমা হেসে হেসে আপত্তি করছিলেন।—যদি নিতান্তই লুচি আলুর দম খাওয়াতে চান, তবে আপনি কেন...

শিবদাস দত্ত বলেন—প্রতিভার কথা বলছেন? হাসালেন! ও মেয়ে রান্নাবান্না জানেই না ; তা ছাড়া আমার মত ভাল রাঁধতে ওর সাধ্যি কী! ও তো দূরের কথা, ওর মারও কোনওদিন সাধ্যি হয়নি।

কাকিমা হাসেন।—না, না, আমি প্রতিভার কথা বলছি না। আমি বলছি, আমিই তো পারি।

—আপনার হাতের রান্না খাবার সৌভাগ্য অস্বীকার করব না। মাথা পেতে স্বীকার করব। কিন্তু আজ নয়। আজ আমি আমার হাতের রান্না আপনাদের খাওয়াবার সৌভাগ্য ছেড়ে দেব না।

শিবদাস দত্তই বাড়ির ভিতরের বারান্দায় একটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আর স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করেছেন। সত্যিই আধ ঘণ্টার বেশি সময় নেননি শিবদাস দত্ত। শিবদাস দত্তের কাণ্ড দেখে জেঠামশাই, কাকিমা আর বেণুর হাসাহাসি থামতে না থামতেই লুচিভাজার গন্ধে ভরে গেল বাংলোবাড়ির বাতাস।

বেণুর হাত ধরে প্রতিভা চলে যাবার পরেই কাকিমার মনটা যেন একটা আশার চমক সহ্য করতে গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে অনেক কথা ভেবে ফেলেছে। এমন কি একবার জেঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসাও করে ফেলেছেন কাকিমা, চক্রবর্তী মশাই গেলেন কোথায়?

ড্রাইভার মুনিরাম বলে, এই রাজপোখরাতেই আছেন ; কালীমন্দিরের সেবাইত উনকা কুটুম আছেন।

প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়েও শুধু একটি কথা ভেবেছেন কাকিমা। কাকিমার মনের ভিতরে যেন একটা জেদ বার বার মুখর হয়ে কাকিমার ভাবনাকে আরও বিচলিত করে তুলেছে। বেশ মেয়ে ; বেশ সুন্দর মেয়ে। শীতল সরকারের মেয়েটা কি দেখতে প্রতিভার চেয়ে ভাল? কখনওই না। এ মেয়ের সঙ্গে যদি দুটো ভাল কথা না বলতে পারে নিশি, তবে বুঝতে হবে, নিশির চোখ নেই। তা ছাড়া, শীতল সরকারের ও তার মেয়ের এরকম ভয়ানক অমানুষিক ব্যবহারের পর আর ওদের কথা মনে রাখবারই বা দরকার কি নিশির?

জেঠামশাইয়ের মনটা যেন ভার হয়ে রয়েছে, সেটা তাঁর চোখ দেখলেই বোঝা যায়। মাঝে মাঝে হাসছেন বটে, এবং শিবদাস দত্তের প্রীতি, ভদ্রতা আর অকপট ব্যবহারের রকম

দেখে বেশ খুশি হয়ে যাচ্ছেন ঠিকই ; কিন্তু শীতল সরকারের অদ্ভুত ব্যবহারের আঘাতটা সহ্য করতে গিয়ে যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন জেঠামশাই। তাঁর মনের ইচ্ছাও মাঝে মাঝে দু-একটা হঠাৎ প্রশ্নের মধ্যে যেন তাঁরও একটা আশার দুঃসাহস ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। কাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে জেঠামশাইও বলেছেন, শিবদাসবাবুর মেয়ে, এই প্রতিভার মত মেয়ে,...বাস্তবিক...ওর মুখের একটি কথা শুনেই আমি বুঝে ফেলেছি, এ মেয়ের মন, যেন...যাকে বলে সোনার খনি।

জেঠামশাইও বার বার বারান্দার দিকে তাকিয়েছেন। তাঁরও চোখে ওই একই প্রশ্ন--নিশি আসছে কি? আসবে তো নিশি? প্রতিভার অনুরোধের দাবি ঠেলতে না পেরে নিশি যদি এখানে চায়ের আসরে এসে বসে, তবে...তবে অন্তত এইটুকু বোঝা যাবে যে, একেবারে হতাশ হবার কোনও কারণ নেই।

শিবদাস দত্ত তাঁর কোমরের ন্যাপকিন খুলে রেখে চাদর গায়ে দিয়ে চায়ের টেবিলের কাছে একটি চেয়ারে বসেন। এবং টেবিলের উপর সাজানো খাবারের স্তূপের দিকে তাকিয়ে তৃপ্ত হয়ে বলেন--যাক, আপনারা যে আমাকে এই সামান্য ভদ্রতাটুকু করবার সুযোগ দিলেন ডাক্তারবাবু, তার জন্যে আপনাদের সহস্র ধন্যবাদ।

জেঠামশাই বলেন--আমাদের ধন্য করে দিলেন বলুন।

শিবদাসবাবু হঠাৎ গম্ভীর হন।--না ডাক্তারবাবু। আপনারা জানেন না, আজ আপনাদের একটু আপ্যায়ন করে আমি আমার একটা ভয়ানক দুঃখকে শান্ত করবার সুযোগ পেয়েছি।

জেঠামশাই আশ্চর্য হন।--আপনার দুঃখ? আপনার মত মানুষকেও ভগবান দুঃখ দেন কেন, জানি না মশাই!

শিবদাস দত্ত হাসেন।--ঠিক আপনারা আজ অকারণে যে দুঃখটা পেলেন, প্রায়ই সেইরকম একটা দুঃখ।

--তার মানে? জেঠামশাইয়ের গম্ভীর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে।

শিবদাস দত্ত বলেন--প্রতিভা এখন সামনে নেই তাই বলছি। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, মশাই। মেয়েটার বিয়ের সব ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছে। বেশ ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। যেদিন বিয়ে হবার কথা, ঠিক সেদিনই সকালবেলা ছেলেটির কাছ থেকে একটা ভয়ানক চিঠি পেলাম, বিয়ে করতে সে রাজি নয়।

--কেন? ছেলেটার এরকম মাথা খারাপ হল কেন? রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন কাকিমা।

শিবদাস দত্ত হাসতে হাসতে চাদর তুলে চোখ দুটো বেশ ভাল করে ঘষে নিয়ে বলেন--মাথা খারাপই হয়েছিল বোধ হয়, নইলে ওরকম চিঠি লিখতে পারত না। যাই হোক, আমিও একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছি।

--কী রকম? প্রশ্ন করেন জেঠামশাই।

--তার মানে মেয়েটাই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে।

--বুঝলাম না, শিবদাসবাবু।

--মেয়েটা বিয়েই করবে না! আমিও বলি, তাই ভাল।

কাকিমার মুখটা করুণ হয়ে ওঠে।--এ কী বলছেন? এরকম জেদের কোনও অর্থ হয় না। এ তো চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া।

--শিবদাসবাবু হাসেন।--যাই হোক, তাই বলছি, আপনারাও কিছু মনে করবেন না। শীতলবাবু ভয়ানক ভুল করলেন মনে হচ্ছে, এবং আপনাদেরও মনের উপর একটা আঘাত লাগল ; কিন্তু সেজন্য বিমর্ষ হয়ে পড়বেন না।...হ্যাঁ, আপনাদের ছেলেটির কী যেন নাম?

--নিশীথ।

--হ্যাঁ, নিশীথেরও উচিত এসব ভুলে গিয়ে, বেশ খুশিমনে আবার...অর্থাৎ রাগ করে

চিরজীবন নিজেকে ঠকিয়ে রাখবার কোনও অর্থ হয় না।

হেসে ফেলেন কাকিমা।—আপনাকেও তো ঠিক এই কথাই আমরা বলেছি।

—আজ্ঞে?

—প্রতিভা বিয়ে করবে না কেন, এবং আপনিই বা প্রতিভার বিয়ে দিতে উৎসাহ বোধ করবেন না কেন?

শিবদাসবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলেন--আমার কথাগুলি কেমন যেন হয়ে গেল মনে হচ্ছে। আপনাদের কাছে বোধ হয় খুব বাজে কথা বলে মনে হচ্ছে...কিন্তু ব্যাপার কী জানেন, আমি সত্যিই বড় ভয় পেয়েছি, ডাক্তারবাবু।

শিবদাসবাবুর মুখের সেই বেদনার দিকে তাকিয়ে জেঠামশাই ও কাকিমা দুজনেই বেদনাহতের মত স্তব্ধ হয়ে যান। নিশীথকে ডাকতে গিয়েছে প্রতিভা ; এবং এখনও দুজনের একজনও আসছে না। কী এত কথা বলছে প্রতিভা? কী এত কথা বলছে নিশি? দুজনে বোকার মত একটা বাজে তর্ক বাধিয়ে ঝগড়া করছে না তো? ভগবান জানেন। কিন্তু যদি ঝগড়া-টগড়া বা বাজে তর্ক না করে থাকে, যদি একটু বুঝে দেখে যে, ওদের দুজনের জীবনে একটা মিল আছে, একটা দুঃখের মিল, তবে দুজনের জন্য দুজনেরই মনে কি কোনও মায়াও দেখা দেবে না? বেচারা শিবদাস দত্তের এই স্যাঁতসেঁতে চোখ দুটো এখনই হেসে উঠতে পারে, যদি শোনা যায় যে...

কে এল?

না, নিশি নয়। প্রতিভাও নয়। হঠাৎ এসে চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছে বেণু। কাকিমা বলেন—নিশি আসবে না?

বেণু চিন্তিতভাবে বলে—আসবে বোধ হয়।

—প্রতিভা কোথায়?

বেণুর মুখটা যেন দুশ্চিন্তার বাধা তুচ্ছ করে হঠাৎ হেসে ওঠে।—প্রতিভাদির সঙ্গে বড়দার তর্ক শুরু হয়েছে।

শিবদাসবাবু বিব্রতভাবে বলেন—তর্ক? ছিঃ, এসব প্রতিভার খুবই অন্যায়...আমি যাচ্ছি।

জেঠামশাই ও কাকিমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন--না না না। আপনি যাবেন না।

—নিশীথ বেচারার মন একে তো লজ্জিত ও দুঃখিত, তার ওপর যদি কেউ গিয়ে তর্ক করে বেচারাকে বিরক্ত করে, তবে...আমিই একবার যাই, ডাক্তারবাবু।

জেঠামশাই হাসেন—আপনি কেন যাবেন?

—নিশীথের চা আর খাবার পৌঁছে দিয়ে আসি।

কাকিমা হাসেন—না। যদি নিশি না আসে, যদি খাবার পৌঁছতেই হয়, তবে খাবার পৌঁছে দেবার লোকের অভাব হবে না। আমি আছি, চঞ্চল আছে, দেবেশ আছে।

—তা হলে আপনারা খেতে আরম্ভ করে দিন। আমি নিশীথের অপেক্ষায় থাকি।

বারান্দার উপর ছায়া দেখতে পেয়ে আর পায়ের শব্দ শুনে হেসে উঠলেন কাকিমা।—না, আপনাকে আর অপেক্ষা করতে হল না।

নিশীথ আর প্রতিভা এসেছে। নিশীথের মুখটা শান্ত ও প্রসন্ন, প্রতিভা গম্ভীর। কাকিমার মনের একটা সাধের সন্দেহ যেন খুঁটে খুঁটে দুজনের মুখের ভাবের রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন না কাকিমা। তাঁর চোখের চাহনিতে আশা-নিরাশার সেই দ্বন্দ্বই চলতে থাকে। একবার আশা হয়। এবং পরমুহূর্তে সেই আশাকেই সন্দেহ করেন। না, এত সহজে এবং তাড়াতাড়ি কিছু আশা করা যায় না। নিশীথ আর প্রতিভা, দুজনে দুটি বাচ্চা ছেলে আর মেয়ে তো নয় যে, পাঁচ মিনিটের চেনাশোনার মায়াতেই মনে-প্রাণে বন্ধু হয়ে যাবে।

জব্দ হোক শীতল সরকার ও তাঁর মেয়ের অহংকার, কাকিমার মনে এরকম একটা জেদের দাবি যে ছটফট করছিল না, তা নয়। রাজপোখরা থেকে ফিরে যাবার আগে যেন শুধু অসহায় একটা বেদনার ভার নিয়ে ফিরতে না হয়, শীতল সরকারের জন্য একটা পাল্টা বিস্ময়ের আঘাত রেখে দিয়ে চলে যেতে পারলেই ভাল ছিল ; কাকিমার কল্পনার মধ্যে প্রতিশোধ নেবার একটা কঠোর আগ্রহের দাবিও বার বার জোর করে উঠছিল ঠিকই। কিন্তু শুধু সেজন্য বোধ হয় নয়। নিশীথের হঠাৎ আহত জীবনের বেদনার দাগটাকে এই মুহূর্তে মুছে দিয়ে, ছেলেটাকে হাসিয়ে আর সখী করে ফিরিয়ে নেবার জন্য মনের ভিতর একটা মায়ার দাবিও বার বার জোর করে উঠছিল! কিন্তু শুধু সেজন্যও বোধ হয় না। প্রতিভা মেয়েটাকে দেখতে বড় ভাল লেগেছে, একটু মায়াও পড়ে গিয়েছে ঠিকই। এটাও একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নিশ্চয় নয়, যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে পড়ে আশা করতে চেষ্টা করছেন কাকিমা, আজই এই মুহূর্তে প্রতিভারই সঙ্গে নিশীথের বিয়ে হয়ে যাক না।

কাকিমার এই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেলে তিনি দুঃখিত হবেন নিশ্চয়। কিন্তু সে দুঃখ ভুলে যেতেও পারবেন। এক মাস দু মাস বা দু বছর পরে, একদিন না একদিন পৃথিবীর কোনও মেয়ের সঙ্গে নিশীথের বিয়ে হয়ে যাবে। নীরাজিতার চেয়ে অনেক সুন্দর ও অনেক ভাল মেয়ের সঙ্গে এবং হয়ত এই প্রতিভার চেয়েও ভাল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে নিশীথের। নিশীথের জন্য দুঃখ করবার এবং শীতল সরকারকে জব্দ করবার কথা চিন্তা করবার আর কোনও দরকার হবে না। কিন্তু...কাকিমা বারবার তাকিয়ে দেখতে থাকেন, এবং জেঠামশাই দু-একবার অপলক চোখ নিয়ে দেখতে থাকেন, শিবদাস দত্তের ওই স্যাঁতসেঁতে চোখ, বার বা চাদর দিয়ে ঘষে চোখ দুটোকে লাল করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। কে জানে কোন অভদ্রর কাছ থেকে হঠাৎ একটা অপমানের মার খেয়ে ভদ্রলোকের জীবনটাই আতঙ্কে ভরে গিয়েছে! মেয়ের বিয়ে দেবার কথা ভাবতেই ভয় পান। মেয়ের বিয়ে হবে না বলেই মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। তার মানে, সেই অপমানের দুঃখটাকেই চিরস্থায়ী করে মনের মধ্যে পুষে রেখে চোখ দুটোকেই স্যাঁতসেঁতে করে রেখেছেন।

শিবদাস দত্তের ওই চোখের সজলতা একেবারে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আর হাসিয়ে দিতে পারা যায় না কি? ভগবান কি সহায় হবেন? যে কথা ভাবেন জেঠামশাই, সেই কথা ভাবেন কাকিমা। শিবদাস দত্তের মত একটি সরল প্রাণের মানুষ সুখী হবে, অন্তত এইজন্য প্রতিভার সঙ্গে নিশীথের বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে যান কাকিমা। না, ও মেয়ের মুখটা বড় বেশি বিষণ্ণ। বোধ হয় মানুষকে বিশ্বাস করবারই সাহস হারিয়েছে এই মেয়ে।

চা ও খাবারের সৎকার শুরু হয়। শিবদাস দত্ত টেবিলের এদিকে ওদিকে ঘুরে চেঁচামেচি করেন। চঞ্চল আর দেবেশের ডিশে গাদা গাদা লুচি ঢালতে থাকেন। প্রতিভাও টেবিলের এক দিকে টি-পট ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং কাকিমা দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে যান, নিশীথও কোনও সংকোচ না করে, বরং চঞ্চল ও দেবেশের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেশ আগ্রহের সঙ্গে হাত চালিয়ে খাবার খেয়ে চলেছে।

কাকিমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলে বেণু। চমকে ওঠেন কাকিমা। কিন্তু বেণু যেন ভয়ানক আবদারের আবেগে দুরন্ত হয়ে কাকিমাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর দেরি কেন? কিসের অসুবিধা? বেণুর প্রশ্নগুলি কাকিমাকে ভয়ানক বিব্রত করছে। কাকিমা বলেন—আমাকে বিরক্ত করিস না। বাবাকে বল না গিয়ে।

—কী? কী বলছে বেণু? প্রশ্ন করলেন জেঠামশাই।

বেণুও সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে জেঠামশাইয়ের কানের কাছে সেই ভঙ্গিতে একটা দুরন্ত আবদারের দাবি ফিসফিস করে শুনিয়ে দিতে দিতে ছটফট করতে থাকে। চমকে ওঠেন

জেঠামশাই। বিড়বিড় করে বলেন--তা আমি...কী করব রে বেণু।

কিন্তু বেণু হতাশ হয় না। চুপ করে জেঠামশাইয়ের কোল ঘেঁষে বসে কি যেন ভাবে, তার পরেই উঠে প্রতিভার কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে প্রতিভার হাত ধরে।

প্রতিভা হাসে—কী বেণু?

প্রতিভার কানের কাছে কী যেন বলতে চায় বেণু। প্রতিভাও হেসে হেসে মাথাটাকে অনেকখানি নামিয়ে বেণুর মুখের কাছে কান পাতে। চমকে ওঠে প্রতিভা। এবং প্রতিভার মুখের সেই হাসি যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে কালো হয়ে যায়। প্রতিভার গলার স্বর এবং মুখের ভাষাও ভীরু স্বপ্নের ভাষার মত বিড়বিড় করে।—আমাকে এসব কথা বলতে নেই, বেণু।

—তবে কাকে বলব?

প্রতিভার প্রাণটা যেন আরও ভয়ানক একটা প্রশ্নের শব্দ শুনতে পেয়েছে। উত্তর দিতেনা পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আর টি-পট ছুঁয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে, বাগানের ডালিয়ার উপর বারান্দার বাতির আলো ছড়িয়ে পড়েছে, অল্প হাওয়ায় ডালিয়াগুলির রঙিন শোভা দুলছে।

প্রতিভার মুখের এই নীরবতাও বেণুকে হতাশ করতে পারে না।

আস্তে আস্তে টেবিলের আর-এক দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশীথের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় বেণু!—বড়দা!

—কী?

নিশীথের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বেণু।

হেসে ওঠে নিশীথ। সঙ্গে সঙ্গে কাকিমার মনের সব আশা যেন তাঁর দু চোখ ছাপিয়ে হেসে ওঠে। এমন কী জেঠামশাইয়ের মুখের গম্ভীরতাও হঠাৎ ফিকে হয়ে যায়।

বেনুর পিঠে হাত বুলিয়ে নিশীথ হাসে।—বেশ ভাল মেয়েটির মত এখন তুমি চুপটি করে বসে থাকো তো, বেণু?

কিন্তু বেণু চুপটি করে বসে না। বেণুর মনের ভিতরেও যেন একটা দুরন্ত জেদ আকুল হয়ে উঠেছে। রাগ করে বেণু—না, কখ্খনও চুপটি করে বসব না। তোমার কোনও কথা শুনব না।

নিশীথের একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বেণুও তার আশার দাবিকে একেবারে বিদ্রোহের ভঙ্গিতে ব্যক্ত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হেসে ওঠেন শিবদাস দত্ত—কী হল? বেণু-মা এত রাগ করে কেন?

বেণু চেঁচিয়ে ওঠে—প্রতিভাদির বিয়ে হবে কবে?

—আঃ, সত্যিই, আস্তে একটা আক্ষেপ করে ওঠেন জেঠামশাই। বোকা মেয়েটা কী সাংঘাতিক একটা কথা মনের ঝোঁকের ভুলে বলে ফেলেছে। কাকিমাও বিব্রত বোধ করেন। এবং ঠিকই, যা আশঙ্কা করেছিলেন দুজনে, তারই প্রমাণ দেখতে পান। হো-হো করে হেসে উঠলেন শিবদাস দত্ত, এবং চাদর তুলে জোরে জোরে চোখ ঘষলেন।

চঞ্চল আর দেবেশকে আরও দুবার লুচি আলুর দম সেধে দিয়ে শিবদাসবাবু এইবার চেঁচিয়ে তাঁর আর একটি অপরাধের জন্য মার্জনা চাইতে থাকেন।—নিজের মনের বাতিক মেটাবার জন্য আপনাদের তো এতক্ষণ আটক করে রেখে রাত করে দিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আপনাদের একটা দুর্ভোগে ফেললাম।

—কিসের দুর্ভোগ?

—ধরুন, এখন যদি রওনা হন তবে টাটা পৌঁছতে পৌঁছতে...

—আজ আর রাত করে টাটা পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে নেই। আমরা মাঝপথেই আজকের রাতটার মত রেস্ট নেব।

—মাঝপথে মানে?

—সিনির কাছাকাছি। নিশীথের ছেলেবেলার এক বন্ধু থাকে সেখানে। তার বেশ বড় কোয়ার্টার আছে। সে বেচারা কাজের চাপে পড়ে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি...অবিশ্যি না এসে ভালই হয়েছে। শীতলবাবুর অদ্ভুত ব্যবহারের রকম দেখে আমাদের মত ওর আর দুর্ভোগ ভুগতে হল না।

কাকিমা হাসেন--এলে অবিশ্যি আপনার লুচি আলুর দমের আনন্দ বেশ ভাল করে ভোগ করে যাবার সৌভাগ্য হত সে বেচারার।

শিবদাসবাবু বললেন--আর একটা অনুরোধ করতে চাই, যদি সাহস দেন তো বলি।

জেঠামশাই হাসেন—নির্ভয়ে বলুন।

—আজকের রাতটার মত এখানেই যদি থেকে যেতেন, তবে...

--আপনাকে সত্যিই এবার একটু ভয় করতে হচ্ছে, শিবদাসবাবু। আপনি আর এসব অনুরোধে করবেন না। আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে অনেক উপদ্রব করলাম ; এবার আমাদের বিদায় দিয়ে খুশি হয়ে যান।

—মাঝরাত্রিতে হঠাৎ বন্ধুর বাড়িতে উঠলে, সে বন্ধু যতই বন্ধু হোক, তাকে একটু অসুবিধায় ফেলা হয়, এবং নিজেদেরও কষ্ট পাওয়া হয় না কী?

—নিশীথের বন্ধুটি সেরকম বন্ধু নয়। প্রাণের বন্ধু বলতে যা বোঝায়, তাই। বিভূতির মত ভাল ছেলে খুব কম দেখা যায়।

—বিভূতি? প্রশ্ন করেই শিবদাস দত্তের চোখের দৃষ্টিটা থমকে থাকে। আর, প্রতিভা দত্তের চোখ দুটো আশ্চর্য হয়ে হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

--খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজে কাজ করে বিভূতি। সিনির কাছে ওর একটা অফিস আর কোয়ার্টারও আছে। বিভূতির বাবা যোগেশ এখন বেঁচে নেই ; যোগেশও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বিভূতিও তার বাপের জীবনের সবচেয়ে বড় 'গ্লোরি' যেটা ছিল, সেটা সম্পূর্ণভাবে পেয়েছে।

শিবদাসবাবু যেন আর্তনাদ করেন--কী সেটা?

—নিখুঁত চরিত্র, স্টেনলেস স্টিলের মত চরিত্র। নিশীথও কতবার আশ্চর্য হয়ে বিভূতির কত সুখ্যাতির গল্প আমাদের কাছে করেছে। তাতেই বুঝেছি যে ওরকম নিখুঁত চরিত্রের ছেলে হয় না।

শিবদাসবাবু বলেন, এই বিভূতির সঙ্গেই প্রতিভার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল, আর বিভূতিই চিঠি দিয়ে...

প্রতিভা দত্তের ছায়াটা ছটফট করে ওঠে। চায়ের আসর থেকে আস্তে আস্তে যেন আলগা হয়ে, তারপর একেবারে ঘর ছেড়েই চলে যায় প্রতিভা। জেঠামশাই আর কাকিমা শিবদাস দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। যেন বোবা হয়ে গিয়েছেন, বোকা হয়ে গিয়েছেন, নিজেদের মুখরতার লজ্জায় মনে মনে মরে গিয়েছেন দুজনেই।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ। চায়ের আসর থেকে সরে গিয়ে বাইরের বারান্দার উপরে দাঁড়ায়। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে, একটা কঠোর স্বরে চাপা আক্রোশ চাপতে না পেরে ডাক দেয় নিশীথ, একবার শুনে যাও, কাকিমা।

বিচলিত হন, একটু আতঙ্কিতও হন কাকিমা, এবং সেই সঙ্গে যেন একটা আশার সাহসও কাকিমাকে ব্যস্ত করে তোলে। নিশীথের ডাকটা যেন দুঃখ রাগ ও যন্ত্রণার একটা গম্ভীর প্রতিধ্বনির মত বেজে উঠেছে।

কাকিমা উঠে গিয়ে নিশীথের কাছে এসে দাঁড়াতেই নিশীথ বলে, এখনি কি একটা বিয়ের ব্যাপার হয়ে যেতে পারে না?

কাকিমা চমকে ওঠেন, বিয়ে! তুই প্রতিভাকে বিয়ে করতে চাস?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু প্রতিভা কি...

—প্রতিভা রাজি আছে। কিন্তু এখনই বিয়ে করতে রাজি হবে না বোধ হয়।

—খুব হবে। খুব হবে। রাজি করিয়ে ছাড়ব—বলতে বলতে প্রায় ছুটে চলে গেলেন কাকিমা। এবং বারান্দা থেকে নেমে ডালিয়া-বাগানের রঙিন ভিড়ের আশেপাশে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে থাকে নিশীথ। চোখ তুলে দেখতেও পায় নিশীথ, রাজপোখরার আকাশের মেঘের ঘটাই একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে। কোথায় ঝড় আর কোথায় বিদ্যুৎ? খোলা আকাশের এক দিকে এক টুকরো চাঁদ ঝকঝক করছে।

বেণু ছুটে গিয়ে প্রতিভার হাত সেই যে ধরল, ধরেই রইল। হাত ছাড়ল তখন, যখন প্রতিভা বলতে বাধ্য হল, হাত ছাড় বেণু, নইলে সাজব কী করে?

চক্রবর্তী মশাইকে ডাকবার জন্য মুনিরামকে গাড়ি নিয়ে ছুটিয়ে দিয়ে জেঠামশাই সেই যে বারান্দার উপর দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়েই রইলেন, যতক্ষণ না চক্রবর্তী মশাইকে নিয়ে মুনিরাম ফিরে এল।

শিবদাস দত্ত চেয়ারের উপর বসে সেই যে ফুঁপিয়ে উঠলেন, তারপর থেকে চাদর দিয়ে চোখ ঘষতেই থাকেন ; হেসে উঠলেন তখন, যখন কাকিমা এসে কাছে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিলেন, আপনার কিছু ভাবতে হবে না ; আমরাই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

তবু পায়ে চটি, পায়জামা পরা আর গেঞ্জি গায়ে সেই চেহারার উপরেই চাদর ফেলে দিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলেন শিবদাস দত্ত ; এবং ফিরে আসতে আধ ঘণ্টাও সময় নিলেন না।

একে একে, রাজপোখরার আকাশের টুকরো চাঁদের আলোতে পথের ঝাউয়ের ছায়া পার হয়ে শিবদাস দত্তের ডালিয়া-বাগানের ধারে এসে দাঁড়ালেন যাঁরা, তাঁদের পরিচয়ও পেলেন জেঠামশাই। এসেছেন রাজেনবাবু আর জ্যোতিবাবু ; হরবংশবাবু আর মিসেস ফস্টার। জ্যোতিবাবুর স্ত্রী এসেছেন ; তাঁর সঙ্গে অভয়া আর মঞ্জুলিকাও এসেছে। রাজেনবাবুর বড় ছেলে মাধবও এসেছে। মিসেস ফস্টার প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া হাতে নিয়েই চলে এসেছেন। হরবংশবাবুর হাতে রঙিন শাড়ির প্যাকেট দেখা যায়।

অভয়া আর মঞ্জুলিকার চটপটে হাতে উঠোনের উপর প্রকাণ্ড একটা আলপনা আঁকা হতেই বা কতক্ষণ লেগেছিল? দেরি হয়নি। কোনও কাজেরই দেরি হয়নি। মাধব তিনবার বাইরে দৌড়ে গিয়ে তিনবার ফিরে আসে ; এবং একা হাতেই চা তৈরি করে আর খাবার পরিবেশন করে। রাজপোখরার ইতিহাসে এক অদ্ভুত হঠাৎ-উৎসবের সব ব্যস্ততাকে মিষ্টি করে দিতে মাধবেরও এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগেনি।

বিয়ে যখন শেষ হয়েছে, কাকিমা যখন প্রতিভার সিঁদুর-আঁকা কপালটার দিকে তাকিয়ে হেসে-কেঁদে প্রতিভার গলা জড়িয়ে ধরেছেন, যখন উৎসবের মুখরতা একটু শান্ত হয়েছে আর মিসেস ফস্টার নবদম্পতিকে 'ব্লেসিং' জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন, তখন শিবদাস দত্তের বাড়ির ফটকের কাছে একজন আগন্তুকের ছায়া এগিয়ে আসে। ছায়াটা ফটক পর্যন্ত এসে যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে থমকে যায়।

শিবদাস দত্ত ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে ডাক দেন—আসুন, আসুন শীতলবাবু।

শীতলবাবুর ছায়া আতঙ্কিতের মত সেই মুহূর্তে সরে গিয়ে এবং প্রায় ছুটে পালিযে যায়।

অলক্তকের মানুষগুলি ফিরে এসেছে? শিবদাস দত্ত বোকার মত এবং ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে থাকেন, ফিরে এসেছে বোধ হয়। তা না হলে অলক্তকের জানালায় আলো ফুটে উঠবে কেন?

সেই মুহূর্তে পটপট করে, যেন একটা অন্ধকারের ধিক্কারে আহত হয়ে অলক্তকের আলোগুলি নিবে যায়।

লাক্ষানগর রাজপোখরার ঝাউয়ের মাথায় যখন সকালবেলার রোদ ঝলমল করে, তখন অলক্তকের বন্ধ দরজা ও জানালাগুলি আস্তে আস্তে খুলতে থাকে। ততক্ষণে অলক্তকের বাইরের বাবান্দাকে ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে দিয়েছে মালী। সেই আলপনার এক কণিকা সাদা গুঁড়োও আর বারান্দার কোথাও নেই। ফটকের আমপাতার ঝালরও অদৃশ্য হয়েছে।

ঘরের ভিতরে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে শীতল সরকারের ক্লান্ত চোখের দৃষ্টিও আর কোনও আতঙ্কে ছটফট করে না। দূরে দলমা পাহাড়ের মাথা রোদে ছেয়ে গিয়েছে। আর নিকটে শিবদাস দত্তের বাংলোর ডালিয়াবাগানও শান্ত হয়ে গিয়েছে। কাল রাতে যেন একটা বিচিত্র খেয়ালের মাতলামিতে পাগল হয়ে শিবদাস দত্তের বাগানের ডালিয়াগুলি হেলে-দুলে কী না কাণ্ড করেছে?

বাড়ির সবাইকে, সেই সঙ্গে নীরাজিতাকেও আদ্রা স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের ভিতরে কয়েক ঘণ্টার অস্বস্তিকর অপেক্ষার বন্ধন থেকে মুক্ত করে কলকাতার ট্রেনে চড়িয়ে দেবার পর, হাঁপ ছেড়েছিলেন শীতলবাবু। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তার পর নিজে সেই ওয়েটিং রুমের ভিতরে একা একা বসে, ঘুমিয়ে সারা দুপুর বিকেল আর সন্ধ্যা পার করে দিলেন। রাত দশটার আগে রাজপোখরা আর ফিরবেন না, সেই অনুযায়ী হিসেব করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করে রাত দশটার কিছু পরেই রাজপোখরা ফিরেছিলেন শীতল সরকার। যা আশা করেছিলেন, তাই দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। শীতল সরকারকে অপ্রস্তুত করবার জন্য, উদ্বিগ্ন করবার জন্য, বিপদে ফেলবার জন্য সাক্‌চির ডাক্তার হরদয়ালবাবু কোনও প্রতিশোধের মূর্তি ধরে ঝাউয়ের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে নেই। কেউ নেই। ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ, পীড়িত বা ব্যথিত কোনও ছায়া পথের উপর ঘুরে বেড়ায় না। অলক্তকের বন্ধ ফটকের মস্তবড় তালাটা দেখতে পেয়ে ওদের পক্ষে ব্যাপারটা বুঝতেও কোনও অসুবিধা হয়নি। তা ছাড়া, শিবদাস দত্তকেও বলে রাখা হয়েছিল, যদি ওরা রাগ করে কোনও অশোভন কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, তবে শিবদাস দত্ত যেন সোজা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, কেন, আর কিসের জন্য অলক্তকের মন ভয় পেয়ে, ঘৃণা আর রাগ করে এই বিয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছে।

অলক্তকের ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে, জানালা দিয়ে মুখ বের করে রাজপোখরার সেই আকাশের দিকে নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়েছিলেন শীতল সরকার, যে আকাশে তখন আর মেঘ ছিল না, বিদ্যুতের চমকও ছিল না। বরং, পরিষ্কার আকাশটা টুকরো চাঁদের আলোতে ঝলমল করছিল।

শীতল সরকারের চোখ দুটো চমকে উঠল তখন, যখন শিবদাস দত্তের বাংলোর দিকে চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ ছুটে চলে গেল। ও কী? কী ব্যাপার? শিবদাস দত্তের ডালিয়াবাগানের উপর এত রাত পর্যন্ত আলোর হাসি ঝলমল করে কেন? এত ছায়া ঘোরে কেন? আর, ও রকম শান্ত আর চাপা চাপা কলরবের মিষ্টি শব্দই বা শোনা যায় কেন?

তাই বিস্মিত হয়ে শিবদাস দত্তের বাংলোর কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন শীতল সরকার। আর, বারান্দার উপর ডাক্তার হরদয়ালবাবুর হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিটিকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠেছিলেন, সত্যিই যে উৎসব! শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভার সঙ্গে কারও বিয়ে হয়ে গেল? নিশীথের সঙ্গেই কি?

শিবদাস দত্তের ফটকের কাছে আলো-ছায়ার মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে ছুটে চলে গিয়েছিলেন শীতল সরকার। এবং, কে জানে কেন, হয় রাগ করে নয় ভয় পেয়ে অলক্তকের আলোগুলিকে আবার পটাপট করে নিবিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সকাল হতেই শীতল সরকারের সেই ভয় একেবারে যেন ধুয়ে মুছে বারান্দার

আলপনাটারই মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তাঁর মনেও কিছুমাত্র গ্লানি নেই। বাধ্য হয়ে হরদয়াল ডাক্তারের সঙ্গে একটা অভদ্রতা করতে হয়েছে, এইমাত্র। উপায় ছিল না। সময়ও ছিল না যে ; তা না হলে টেলিগ্রাম করে হরদয়াল ডাক্তারকে নিশ্চয়ই জানিয়ে দিতেন শীতল সরকার, আজ বিয়ে হবে না, চিঠিতে বিস্তারিত জানাবেন পরে।

কিন্তু শিবদাস দত্ত এ কী কাণ্ড করে বসে রইলেন! ভদ্রলোক বরাবরই একটু কেমন যেন ঢিলেঢালা স্বভাবের মানুষ। যেমন কথাবার্তায়, তেমনি সাজ-পোশাকে। এবং প্রকৃতিতে। মনের জোর বলে কোনও বস্তুই শিবদাস দত্তের প্রকৃতিতে নেই। কিন্তু নিজের মেয়ের জীবনের শুভাশুভ বিবেচনা করবার শক্তিটুকুও যে নেই, শিবদাস দত্তকে এতটা সন্দেহ করতে পারেননি শীতল সরকার। হরদয়াল ডাক্তারের ভাইপো নিশীথ রায় নামে যে ছেলের সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে দিলেন শিবদাস দত্ত, সেই ছেলের চরিত্রের কথা জানতে পেরেও একটুও কুণ্ঠা, একবিন্দু ভয় দেখা দিল না শিবদাস দত্তের মনে?

শীতল সরকারের সম্পর্কে শিবদাস দত্তের মনে কোনও শত্রুভাব আছে, এমন অভিযোগ শিবদাস দত্তের শত্রুও করবে না। অবশ্য, শিবদাস দত্তের কোনও শত্রু আছে কিনা সন্দেহ। কাজেই, প্রতিবেশী শীতল সরকারের উপর রাগ করে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও একটা গায়ের জ্বালা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে শিবদাস দত্ত, এ সন্দেহের কোনও অর্থ হয় না। শীতল সরকারের উপরে কেন, বোধ হয় এই পৃথিবীর কারও উপর রাগ করে না শিবদাস দত্ত, এবং রাগ করলেও গায়ের জ্বালা ধরে না নিশ্চয়। তা ছাড়া, গায়ের জ্বালা থাকলেই বা কী? হরদয়াল ডাক্তারের ভাইপোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে যদি কারও ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে শিবদাস দত্তের নিজেরই ক্ষতি, বিশেষ করে তাঁর আদরের মেয়ে প্রতিভারই ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি সহ্য করতে গিয়ে শিবদাস দত্তের সারাজীবনের গায়েই যে জ্বালা ধরে যাবে।

সন্দেহ হয়, হরদয়াল ডাক্তারের কথার চালাকিতে মুগ্ধ হয়ে, কিংবা নিশীথেরই সুন্দর চেহারাটার দিকে তাকিয়ে একটা ভালমানুষি মায়ায় পড়ে শিবদাস দত্ত এই কাজটা করেছেন। শীতল সরকারকে অবিশ্বাস করেছেন শিবদাস দত্ত, আর হরদয়াল ডাক্তারকেই বিশ্বাস করেছেন। ভদ্রলোকের মনে এই সন্দেহটুকুও হল না যে, ভাইপোর চরিত্র সম্বন্ধে আসল খবর জানা থাকলেও হরদয়ালবাবুর পক্ষে সেটা মুখ খুলে বলে ফেলা সম্ভব নয়, বরং দরকার পড়লে মুখ বন্ধ করে সত্য কথাটা চেপেই যাবেন।

শিবদাস দত্তের উপর একটুও ক্ষোভ জাগে না ; বরং দুঃখ বোধ করেন শীতল সরকার। ভদ্রলোক তাঁর ওই ঢিলে-ঢালা স্বভাবের দোষেই এই ভয়ানক ভুল করে বসে রইলেন।

ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে শিবদাস দত্তের ভুলের কথা ভেবে যখন মনে মনে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন শীতলবাবু, ঠিক তখন অলক্তকের ফটক পার হয়ে তাঁরই দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসেন শিবদাস দত্ত।

হ্যাঁ, ঠিকই ধারণা করেছিলেন শীতল সরকার, শিবদাস দত্ত নিজেই আসবেন। না এসে পারবেন কেন? এতক্ষণ যে আসতে পারেননি, তার একমাত্র কারণ, এতক্ষণ ভোর থেকে এই এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত মেয়ে-বিদায়ের ব্যাপার নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল। অলক্তকের ঘরের ভিতরে বসে শুনতে পেয়েছিলেন শীতল সরকার, শিবদাস দত্তের ডালিয়াবাগানের কাছে আবার একটা কলরব বাজছে। মোটরগাড়ির ইঞ্জিন গুমরে উঠছে আর হর্ন বাজছে। রাজপোখরার বাতাস থেকে ভোরবেলার এই জাগ্রত উৎসবের হর্ষ ছুটে চলে যেতেই বুঝতে পেরেছিলেন শীতলবাবু, শিবদাস দত্তের নতুন কুটুম হরদয়াল ডাক্তার সদলবলে চলে গেলেন। নীরাজিতা যে বিপদ থেকে বেঁচে গেল, সেই বিপদটাই কী ভয়ানক একটা জেদ করে, আর কে জানে কোন কৌশলে শিবদাস দত্তের মেয়েটাকে যেন একটানে

লুফে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

টিলে পায়জামা, গায়ে গেঞ্জি, আর গেঞ্জির উপর চাদর। শিবদাস দত্ত এগিয়ে এসে শীতল সরকারের মুখের দিকে চোখ তুলে কী যেন বলতে গিয়ে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে ফেললেন।--প্রতিভাকে ছেড়েই দিলাম, শীতলবাবু।

--ভুল করলেন।

--অ্যাঁ, ভুল? কী ভুল হল, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন, শীতলবাবু।

--প্রতিভার উপর আপনি অন্যায় করলেন।

--কিন্তু...প্রতিভা তো...

--প্রতিভা যদি জানত যে নিশীথের চরিত্র ভাল নয়, তবে...

--জানে, জানে। আপনার কাছ থেকে শুনে আমিই প্রতিভার কাছে কথাটা বলে ফেলেছিলাম।

শীতলবাবু আশ্চর্য হন।--প্রতিভা জেনেও কোনও আপত্তি করল না?

--কই, কোনও আপত্তির কথা তো ওর মুখে শুনলাম না।

শীতলবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বলেন--কিন্তু আপনার আপত্তি করা উচিত ছিল।

ত্রুটি স্বীকার করেন শিবদাস দত্ত।--ঠিকই উচিত ছিল ; কী আশ্চর্য, কথাটা আমার আর মনেই পড়েনি, শীতলবাবু।

--প্রস্তাবটা কি হরদয়ালবাবুই তুলেছিলেন?

শিবদাস দত্ত বিব্রতভাবে বলেন, কই তাও তো ঠিক মনে পড়ছে না। কে যে কখন প্রস্তাব করল, আর কার চেষ্টায় বিয়েটা হয়ে গেল, আমি ঠিক এখনও ধরতে পারছি না শীতলবাবু।

--তা হলে অনুমান করছি, নিশীথ আর প্রতিভা দুজনে নিজেরাই ইচ্ছে করে...

--হতে পারে। আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, ওঁরা চা পর্যন্ত না খেয়ে রাজপোখরা থেকে ফিরে যাচ্ছেন দেখতে পেয়ে আমার বড় খারাপ লেগেছিল। তাই, বাধ্য হয়ে, চা খেতে নেমন্তন্ন করে ফেললাম। আর, তার পরিণাম এই হল যে, মেয়েটার বিয়েই হয়ে গেল।

চাদর দিয়ে ভেজা-চোখ ঘষে আবার ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে রাজপোখরার সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকেন শিবদাস দত্ত। ঝাউয়ের ছায়ার সারি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে সড়কটা খোলা ডাঙার বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেন ছায়ানীল দিগন্তের পায়ের কাছে গিয়ে মুছে গিয়েছে। শিবদাস দত্ত প্রশ্ন করেন, হরদয়ালবাবুর ভাইপো নিশীথ কোথায় যেন কাজ করে, জায়গাটার নাম বলতে পারেন শীতলবাবু?

করুণভাবে হাসতে থাকেন শীতল সরকার, সেসব খবর আমি জানি। সবই আমার কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। জায়গাটা খুব দূরদেশের কোনও জায়গা নয়। আর নিশীথের চাকরিটাও খারাপ নয়। নিশীথের বিদ্যাবুদ্ধিও যথেষ্ট। সেসব নিয়ে ভাবনা করবার কিছু নেই। প্রশ্ন হল, ওই একটি প্রশ্ন, যেটা ভাবতে গিয়ে আপনার জন্য দুঃখ বোধ করতে হচ্ছে।

শিবদাস দত্ত আবার শীতল সরকারকে আশ্চর্য করে দেন।--দুঃখ? দুঃখ বোধ করছেন কেন? আমি তো, বলতে গেলে, কান্নাকাটি করেও বেশ ভালই বোধ করছি, শীতলবাবু।

--নিশীথের চরিত্র যদি ভাল হত, তবে আর কিছু বলবার ছিল না। দুঃখ বোধ করতাম না।

--ও, হ্যাঁ। তা বটে। কিন্তু...কথাটা কী জানেন, চরিত্র বলতে আমি স্পষ্ট করে কিছু বুঝে উঠতে পারি না। এটাই বোধ হয় আমার চরিত্রের ভয়ানক একটা...

শীতলবাবু হাসেন--তা না হলে আর এই ভুল করবেন কেন?

--নিশীথ কি খুব রাগী স্বভাবের মানুষ?

--সে খবর রাখি না। মোট কথা...

--মিথ্যে কথা-টথা বলবার অভ্যাস আছে বোধ হয়।

—আরে না মশাই, ওসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয় না।

—তা হলে, সন্দেহ করতে হয় যে...

—সন্দেহ নয়, প্রমাণ আছে আর সাক্ষি আছে, নিশীথের চরিত্র ভাল নয়, এক মহিলার সঙ্গে নিশীথের ঘনিষ্ঠতা আছে।

—আমারও সম্প্রতি এক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

—তার মানে? কার সঙ্গে?

—মিসেস ফস্টারের সঙ্গে। চমৎকার মানুষ। কদিনেরই বা পরিচয়, তাতে আবার বিদেশি মানুষ, কিন্তু আলাপ করলে একেবারে ঘরের মানুষের মত মনে হয়।

শীতলবাবু হাসেন—আপনার দোষ এই যে, আপনি পৃথিবীর সবাইকে আপনারই মত ভালমানুষ ভাবেন।

—ঠিক কথা, শীতলবাবু। নিশীথকে দেখে মনে হল, ছেলেটি আমার চেয়েও ভালমানুষ।

—মোটেই নয়।

বিরক্ত হয়ে একবার ঘরের ভিতরে টেবিলটার দিকে তাকান শীতলবাবু। টেবিলের উপর সেই চিঠি এখনও পড়ে আছে, যে চিঠিটা কাল সকালে শীতল সরকারের হাতে পৌঁছেছিল, এবং যে চিঠির বক্তব্য পড়েই আতঙ্কিত হয়ে, নীরাজিতার অদৃষ্টের বিপদ বুঝতে পেরে, শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে সাবধান হতে পরেছেন শীতলবাবু। ওই চিঠিটাই নীরাজিতার জীবনটাকে একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নীরাজিতা নিজেও ওই চিঠি বার বার তিনবার পড়েছে। তার পর মনে পড়ে শীতলবাবু, নীরাজিতা নিজেই চেঁচিয়ে উঠেছিল—আমি এখনি কলকাতা চলে যাব।

চিঠিটা যেন ছোট একটা ইতিহাসের বৃত্তান্ত। আট পৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট। ওই চিঠির একটা পাতা পড়লেই শিবদাস দত্তের মোহ ভেঙে যাবে, এবং বুঝতে পারবেন যে, ভালমানুষি খেয়ালের ভুলে মেয়েকে তিনি কোন সর্বনাশের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ঠিক কথা, চিঠিটা নিশীথ রায়ের চরিত্রের গল্প বলতে গিয়ে যেসব কথা বলেছে, তার কোনওটাই অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। চিঠিটা যে লিখেছে, তার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোনও কারণ নেই, তার নিজের কোনও স্বার্থের অভিসন্ধিও নেই। শুধু সত্যের খাতিরে, এক নিরীহ ভদ্রলোকের মেয়ের জীবনকে একটা বিপদ থেকে সাবধান করে দেবার জন্য এই চিঠি এসেছে। এখনও ভেবে দেখতে পারেন, নিশীথ রায়ের মত মানুষের কাছে মেয়েকে সঁপে দেবেন কিনা। আপনাদের কোনও দোষ নেই, আপনার মেয়েরও কোনও ভুল হয়নি। সব না জেনে, আপনাদের শুধু বিশ্বাস করবার ভুলেই এই বিয়ে হতে চলেছে। কিন্তু গালুডির ধীরেন যে আপনাদেরই আত্মীয়। আপনারা কি জানেন না, সে কী প্রকৃতির মানুষ। আর, তার স্ত্রী সুনয়না কোন প্রকৃতির মেয়েমানুষ?

দোষ শুধু নিশীথের একার নয়। দোষ তিনজনের। ধীরেনের নয়, সুনয়নার দোষ আর নিশীথের দোষ। সুনয়নার সঙ্গে নিশীথের যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তারপর নিশীথের পক্ষে বিয়ে করবার চেষ্টা বা ইচ্ছা না করাই উচিত ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সব জেনে-শুনেও, কেন যে নিশীথ আর এক নারীর জীবনকে একটা সমস্যার মধ্যে টেনে আনবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছি না।

নিশীথের সাধ্য নেই, সুনয়নার ছায়া থেকে সে সরে যেতে পারে। কারম সুনয়নাই তাকে সরে যেতে দেবে না। লজ্জার কথা, আপনার আত্মীয় ধীরেনই নিশীথকে সুনয়নার গ্রাস থেকে মুক্তি দেবে না। আপনি জানেন, ধীরেন কী বস্তু।

ধীরেন, সুনয়নার যে দশা করেছে, তাতে সুনয়নার পক্ষেও নিশীথের অমন দশা করে

তোলাই স্বাভাবিক। আর নিশীথের পক্ষেও অমন দশা মেনে নিয়ে পড়ে থাকাই উচিত, বিয়ে করা মোটেই উচিত নয়।

জানেন না নিশ্চয়, আগে নিশীথই গালুডিতে গিয়ে সুনয়নার মুখের হাসি দেখে মুগ্ধ হত ; সুনয়নার জীবনের অভিমান ভাঙিয়ে, আর সুনয়নাকে ভালবাসার সান্ত্বনা দিয়ে ফিরে যেত। আজকাল অধঃপতনের রকমটা আরও ভয়ানক হয়ে আরও গভীরে নেমে গিয়েছে। নিশীথ আজকাল গালুডিতে যায় না, সুনয়নাই কালিকাপুরে আসে। খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, নিশীথের কালিকাপুরের কোয়ার্টারে কতদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুনয়নাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কালিকা মাইনস-এর কুলি কেরানি থেকে শুরু করে ডাক্তার পর্যন্ত সকলেই জানে, সুনয়নার চোখের সামনে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকে নিশীথ।

আমি জানি, সুনয়না নিজের থেকে চলে না গেলে সুনয়নাকে চলে যেতে অনুরোধ করবার সাহস পর্যন্ত নিশীথের কোনওদিন হয়নি। সুনয়না বললেই, শত কাজ থাকলেও, পাহাড়ের ধারে একবার বেড়িয়ে না এসে পারে না নিশীথ, নিশীথের মনে শত দুর্ভাবনা থাকলেই বা কী? সুনয়না দাবি করলেই, কালিকাপুরের সেই ছোট পুকুরটা, সেই রূপসাগরের এক কোণে ঘাসের উপর বসে আর বুনোফুলের উপর রঙিন ফড়িংয়ের খেলা দেখতে দেখতে সুনয়নার সঙ্গে গল্প করতে হয়। একদিন জ্বর হয়েছিল নিশীথের ; আমিই খবর পেয়ে নিশীথকে দেখতে গিয়েছিলাম। নিশীথের ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজের চোখে দেখতে পেয়েছি, নিশীথের শিয়রের কাছে বসে আছে সুনয়না। আমাকেই সাবধান করে দিল—ঘরে ঢুকবেন না, নিশীথবাবুর জলবসন্ত হয়েছে।

তবে আর বাকি রইল কী? নিশীথের বিয়ে করবার দরকারই বা কী? পরনারীর মোহ মায়া লোভ আর সেবা নিয়ে এত জড়িয়ে পড়েছে যার জীবন, সে মানুষ আপনার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন? জানি না, আপনার মেয়ে নিশীথকে চেনে কিনা! চিনে থাকলেও, কতটুকু চিনেছে জানি না এবং যেটুকু চিনেছে, সেটুকু ভুল চেনা চিনেছে।

আমি পড়েছি সে সব চিঠি ; সুনয়না যেসব চিঠি নিশীথকে লিখেছে সেসব চিঠির ভাষা আর কথা এখানে উল্লেখ করে আপনাকে আর বেশি আতঙ্কিত করতে চাই না, যেটুকু জানিয়েছি, তাই যথেষ্ট বলে মনে করি। হ্যাঁ, এইটুকু শুধু না বলে পারছি না ; নিশীথ বিয়ে করে, এটা সুনয়নার একটুও পছন্দ নয়। সুনয়নার আপত্তি শুধু আপত্তি নয়, সে আপত্তি একটা উন্মাদের রাগ। যদি বিয়ে করে নিশীথ তবে নিশীথের স্ত্রী নামে সেই দুর্ভাগিনীকে চিরকালের মত সরিয়ে দেবে সুনয়না, নয় নিজে চিরকালের মত সরে যাবে। এই অবস্থায়, বুঝে দেখুন...

চিঠিটা বাতাস লেগে ফরফর করছে ; শীতলবাবু যেন তখনও চিঠিটার দিকে তাকিয়ে ভয় পাচ্ছেন, এবং শিউরে উঠছে তাঁর চোখ-মুখ। যাক, ভাগ্য ভাল নীরাজিতা এখন নিরাপদ। এতক্ষণে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে নীরাজিতা। কিন্তু, শিবদাস দত্তের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে শীতল সরকারের চোখ দুটো এইবার ছলছল করে ওঠে। এবং ক্ষুব্ধ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন শীতলবাবু—আপনার ওপর এবার আমার সত্যিই রাগ হচ্ছে, শিবদাসবাবু।

—আমার ত্রুটি যদি কিছু হয়ে থাকে, তবে অবশ্য...

—ত্রুটি? আপনি প্রতিভার জীবনটাকেই নষ্ট করলেন।

শিবদাসবাবুর দুই চোখ আরও ব্যথিত হয়ে থরথর করে।—বুঝলাম না শীতলবাবু।

নিশীথ অন্য এক নারীর প্রতি আসক্ত। এবং সেই নারীও নিশীথের প্রতি আসক্ত। সবচেয়ে ভয়ের কথা এই যে, সেই নারী একটি ভয়ানক স্বভাবের মানুষ। আপনার মেয়ের প্রাণটাই নিরাপদ থাকবে কিনা সন্দেহ।

শীতল সরকারের দুই হাত জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকেন শিবদাস দত্ত।—অসম্ভব। বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি মিছেমিছি ভয়ানক একটা সন্দেহের কথা বলছেন, শীতলবাবু।

শীতলবাবু বলেন, আপনি কি বলতে পারেন, আপনাকে মিছেমিছি ভয় দেখিয়ে আমার কোনও লাভ আছে?

—না না; যত ভুল কথাই বলি না কেন, আপনাকে ওকথা বলতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি একটা মিথ্যে গল্প শুনেছেন।

—না। মিথ্যে নয়, গল্পও নয়। যার কাছ থেকে এসব খবর পেয়েছি, সে যদি মিথ্যেবাদী হয়, তবে এ সংসারের সত্যবাদী কেউ নেই। যে লিখেছে, তাকে আমি তিনপুরুষ ধরে চিনি। তার ঠাকুরদাকে চিনতাম, তার বাবা নিজের মুখে আমাকে বলেছেন, বিভূতি হল আয়রন-ম্যান। অর্থাৎ....

শিবদাস দত্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন, এবং শীতল সরকার বিরক্ত হয়ে বলেন, এখনও যদি স্পষ্ট করে না বুঝে থাকেন, তবে আমি আমার নিজেরই জানা একটা ঘটনার কথা বলি।

—বলুন।

—মিস্টার স্টোকারের একটি যুবতী ভাইঝি এই বিভূতির কাছ থেকে চমৎকার একটি ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত ইণ্ডিয়া ছেড়েই চলে গিয়েছে।

—কেন?

—বিভূতির চরিত্র লোহার চেয়েও শক্ত। সুন্দরী মিস স্টোকারেরও সাধ্যি হয়নি যে, বিভূতিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা বাজে কথা বলে।

শিবদাস দত্তের চোখে ছোট একটা ভ্রূভঙ্গি শিথিল হয়ে যেন হাসতে থাকে।—তা হলে বলুন, খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজে বিভূতি আপনাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, নিশীথের চরিত্র ভাল নয়?

—বললাম যে, নিশীথের চরিত্রের একটা ইতিহাস লিখে জানিয়েছে।

শিবদাস দত্তের লাল চোখের করুণতা আর নিশ্বাসের উদ্বেগ যেন সেই মুহূর্তে হো-হো করে হেসে মরে যায়। শীতল সরকারের হাত ছেড়ে দিয়ে যেনদুর্বার এক খুশির উচ্ছ্বাস সহ্য করতে গিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠেন শিবদাসবাবু।

শীতল সরকার ভ্রূকুটি করেন, আপনি কি সবই অবিশ্বাস করলেন?

—খরয়োসান-ম্যাঙ্গানিজে বিভূতি চিঠি দিয়েছে আপনাকে। তাই বলুন। বিশ্বাস করতেই হাসি পাচ্ছে, শীতলবাবু।

কলকাতার রেসের মরশুম পড়তেই গালুডিতে আর একটা দিনও থাকে না যে ধীরেন বোস, তারই স্ত্রী সুনয়না যেন গালুডির আলোছায়ার মধ্যে নিজের জীবনটাকে সঁপে দিয়ে বসে আছে। কলকাতায় যাবার জন্য সুনয়নার মনে কোনও ব্যাকুলতা নেই ; যদিও সুনয়নার মা আজও বেঁচে আছেন, এবং প্রায় প্রতি মাসেই একটি করে চিঠি লেখেন ঃ অন্তত এবার পূজার সময় কলকাতায় এসে একটা মাস আমার সঙ্গে থেকে তারপর চলে যাস, সুনি ; এমন কিছু সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে তো থাকিস না। গালুডি থেকে এবেলা রওনা হলে ওবেলায় কলকাতাতে পৌঁছতে পারা যায়। তবে কেন? কিসের অসুবিধা? বাধাই বা কিসের? ধীরেনের যদি সময় না হয়, তবে তুই তো একলাই চলে আসতে পারিস।

সুনয়নার জীবনের উপর মায়া করার মত একজনই মানুষ আছেন। তিনি হলেন সুনয়নার মা ; আর যাঁরা আছেন, তাঁরা আপনজনের মত। সুনয়নার জেঠতুতো দাদা পরেশ আছেন, যিনি সুনয়নার লেখাপড়ার খরচ থেকে শুরু করে বিয়ে দেবার খরচ পর্যন্ত সব দায় স্বীকার করে খুড়তুতো বোনের জীবনের উপর অনেক দয়া করছেন। আজও সুনয়নার মা, পরেশেরই কলকাতার বাড়িতে আছেন। বিধবা খুড়িমাকে দয়া করলেও শ্রদ্ধা করেন পরেশদা। আজও সুনয়না ইচ্ছে করলে পরেশদার বাড়িতে এসে একটা বছর থাকতে পারে ; এবং থাকলে

বাড়ির কোনও মানুষ একটুও বিরক্ত না হয়ে বরং খুশিই হবে। কিন্তু কলকাতায় আসবার জন্য সুনয়নার মনে কোনও ইচ্ছা আছে কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য হয়েছেন পরেশদা। তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে সুনয়নার ; বিয়েতে আট-দশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলতেও একটুও কুণ্ঠিত হননি পরেশদা। যে মেয়ের জীবনের উপকার করতে গিয়ে এতটা করলেন পরেশদা, সেই মেয়ে এই তিন বছরের মধ্যে কলকাতায় আসবার নামও করল না। মনে মনে বেশ ক্ষুণ্ণও হয়েছেন পরেশদা। মানুষও এমন করে উপকার ভুলে যায় ; এত অকৃতজ্ঞ হয়। কাকা বেঁচে থাকলে, কিংবা সুনয়নার কোনও আপন দাদা থাকলে, সুনয়নার জন্য এর চেয়ে বেশি কী আর করতেন? বিয়ের পর পরেশদাকেই সব চেয়ে বেশি পর বলে মনে করে ফেলল সুনয়না, কী দুঃখের কথা।

পরেশদা কল্পনাও করতে পারেন না, কেন, সুনয়নার মন কিসের বিভ্রমে এত কঠোর হয়ে গেল? ধারণা করতে পারেন না পরেশদা, তিনি নিজেই ভুল করে একটা ভুল সন্দেহ নিয়ে সুনয়নার জীবনের একটা কঠোর অভিমানকেই অকৃতজ্ঞতা বলে মনে করেছেন। এবং সুনয়না জানে, আর কলকাতায় গিয়ে মার কাছে কিংবা পরেশদার সামনে দাঁড়াবার কোনও অর্থ হয় না। সুনয়নার মুখে হাসি দেখলেও ওঁরা কিছু বুঝতে পারবেন না ; চোখে জল দেখলেও না।

এই গালুডির আলো ছায়া থেকে সরে গিয়ে পৃথিবীর কোনও জনতার চোখের সামনে মুখ দেখাতে যেন ভয় করে সুনয়নার। দরকার নেই। গালুডির এই ছোট বাংলোবাড়ির একটি ঘরের ভিতরে শুধু আয়নার কাছে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেই হল। এই আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে চিনতে পারে সুনয়না। কেন হঠাৎ চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, কেন ঠোঁটের উপর অদ্ভুত হাসি সিরসির করে ওঠে, আর কেনই বা একটা রুক্ষ ভ্রূকুটি মাঝে মাঝে চোখ দুটোর উপর ছটফট করে সবই বুঝতে পারে সুনয়না। কখনও নিজের এই জীবনের উপর প্রবল মায়া, কখনও নির্মম ঘৃণা এবং কখনও বা একটা উল্লাস সুনয়নার চোখ মুখ আর ঠোঁটের উপর খেলা করতে থাকে।

পরেশদার দোষ নেই। কিন্তু উপকার করতে গিয়ে, সুনয়নার জীবনে একটা উৎসবের আনন্দ এনে দিতে গিয়ে, আট-দশ হাজার টাকা খরচ করে কী ভয়ানক অভিশাপের মধ্যে সুনয়নাকে ঠেলে দিয়েছেন পরেশদা। গালুডি স্টেশন পার হয়ে, লাইন ধরে আধ মাইলের বেশি যেতে হয় না, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে যে সুন্দর চেহারার বাংলোবাড়িটা, সেই বাড়িটাকে দেখেই কি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পরেশদা? বাড়ির ফটকের দুপাশে দু-সারি দেওদার ; ছায়াটা যেমন মিষ্টি, তেমনই মিষ্টি বাংলোবাড়ির চারদিকের যত লতার ফুলের রূপ আর গন্ধ। এহেন মিষ্টি চেহারার বাড়ির মানুষটার চেহারাও তো কম মিষ্টি নয়। ধীরেন বোসকে দেখলে সবার আগে সবারই মনে এই সন্দেহ দেখা দেবে যে, মানুষটি হয় কবি, নয় দার্শনিক। এমন চমৎকার একটি জায়গাতে, এমন সুন্দর একটি বাংলোবাড়ি তৈরি করে নিয়ে যিনি জীবনের নীড় গড়ে নিয়েছেন, তাঁর মনের রুচি আর শখের প্রকৃতি সহজেই বুঝে ফেলতে পারা যায়। তা ছাড়া, পরেশদা নিজে এসে নিজের চোখে দেখে গিয়েছিলেন, কী চমৎকার কারবার করে ধীরেন বোস। কারবারের বাৎসরিক প্রফিটের হিসাব পর্যন্ত জেনে গিয়েছিলেন পরেশদা। ঘাটশিলা, চাইবাসা আর গোলমুড়িতে স্টোন-চিপ ও লাইম-ঘুটিং সাপ্লাই করে ধীরেন বোস। গালুডি থেকে চার মাইল দূরে একশো বিঘা জায়গা জুড়ে ধীরেন বোসের ইজারা কোয়ারি। একশো মজুর কাজ করে ; আর, চারটি ট্রাক দিবারাত্রি ছুটোছুটি করে। সে ধীরেন বোসের সঙ্গে সুনয়নার বিয়ে দেওয়া, সৌভাগ্যের অনুগ্রহ বলে মনে করেছিলেন পরেশদা। অস্বীকার করে না সুনয়না, সুনয়নাও যে বিয়ের আগে একদিন, কলকাতার বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের ছবি দেখতে দেখতে বুকের ভিতরে একটা নিবিড় নিঃশ্বাসের বিস্ময় সামলে রাখবার চেষ্টা করেছিল ; সত্যিই তো,

ধীরেন বোসের মত মানুষ সুনয়নাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এর মধ্যে সৌভাগ্যের অনুগ্রহ ছাড়া আর কী রহস্য থাকতে পারে?

পরেশদা কি ধীরেন বোসকে চিনতে আর বুঝতে ভুল করেছিলেন? না, একটুও ভুল করেননি। ধীরেন বোস তার জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে একটি কথাও বাড়িয়ে বলেনি, এবং মিথ্যেও বলেনি। বিয়ের পর গালুডির এই বাড়িতে এসে, দেওদারের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেন জীবনের এক সফল স্বপ্নের আনন্দে স্নিগ্ধ হয়ে সুনয়না নিজেও বুঝতে পেরেছিল, গালুডির এই নিরালা বাংলোবাড়ির সুখের মধ্যে কোনও ভেজাল নেই, মিথ্যে নেই। ধীরেন বোস ভালবাসতে জানে, ভাল কথা বলতে জানে, আর কাজ-কারবার নিয়ে খাটতেও জানে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এহেন ধীরেন বোস একদিন, বিয়ের পর মাত্র দুটো মাস পার হয়েছে সেই দিন, সুনয়নারই হাত ধরে রেল-লাইনের পাশে বেড়াতে বেড়াতে যেকথা বলল, সে কথা একেবারে নতুন রকমের একটা জীবনের ইচ্ছার কথা।—এই মাটি-বেচা জীবন আর ভাল লাগে না, সুনয়না।

আশ্চর্য হয়েছিল সুনয়না—তার মানে?

—বড় বেশি পরিশ্রম। দিনরাত মজুরদের পিছনে লেগে থাক ; মাসে দশবার এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি কর ; টেণ্ডার নিয়ে সাধাসাধি কর ; বিল আদায় করতে হিমসিম খাও ; তবে গিয়ে বড় জোর হাজার-দুহাজার টাকা মাসে রোজগার করা যায়। এ অবস্থায় চললে টাকার মুখ আর কখনও দেখতে হবে না।

—এর চেয়েও বেশি টাকা রোজগার করার দরকার কী?

ধীরেন বোস হাসে—তুমি বোধ হয় প্লেন লিভিং আর হাই থিংকিং ভালবাস।

সুনয়নাও হাসে—ওসব তত্ত্বকথা বুঝি না। তবে এটুকু বুঝি যে যেমনটি আছি, তেমনটি থাকতে পারলেই ভাগ্যির কথা।

—না, সুনয়না। এতে সুখী হওয়া যাবে না।

—সুখী হয়েই তো আছি।

—তুমি বুঝবে না, সুনয়না।

—বুঝিয়ে দাও।

ধীরেন বলে—আমি বরং বলব যে, হাই লিভিং আর প্লেন থিংকিং হল আসল সুখের জীবন।

সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে রেল-লাইনের পাশে পাশে স্বামীর হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে এই প্রথম চমকে ওঠে সুনয়না। ধীরেন বোসের কথাগুলিকে একটু বেশি অদ্ভুত মনে হয়েছে ; তার চেয়ে বেশি অদ্ভুত মনে হয়েছে ধীরেন বোসের গলার স্বর। ধীরেন বোসের মুখের ওই তত্ত্বকথার মত ধীরেনের গলার স্বরটাও যেন কেমন এলোমেলো ; এবং ধীরেনের নিঃশ্বাসের বাতাসে অদ্ভুত একটা গন্ধও যেন টলমল করছে।

ধীরেনের মুখটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে সুনয়না। ধীরেন বলে, এখনও বুঝতে পারলে না সুনয়না?

—না।

সুনয়নার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নেয় ধীরেন—আমি ভালরকম পয়সা করতে চাই সুনয়না। মাসে দু-এক হাজার নয়, দু-এক লাখ হলে তবে খুশি হতে পারি।

—আজ বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

—একটা পরামর্শের কাজে গিয়েছিলাম।

—কী খেয়ে এসেছ?

ধীরেন হাসে—যা খেয়েছি, সেটা খাওয়া কি দোষের?

--না, দোষের নয়। কিন্তু আমার সামনে খেলেই তো পারো।

--তুমি কিছু মনে করবে না?

--আমার সামনে খেলে একটুও আপত্তি করব না। কিন্তু...

--কী?

--তুমি আবোল-তাবোল কথা বলতে পারবে না।

--তার মানে?

--এই যে, এখন যেসব কথা বলছ। দু-এক লাখ টাকার কথা, বড়লোক হবার কথা।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ধীরেন--এটা যে আমার স্বপ্নের কথা, সুনয়না। আমাকে বড়লোক হতেই হবে। মাটি-বেচা এই সামান্য রোজগারে আমি সুখী হব না, তুমিও সুখী হতে পারবে না।

সেইদিনই কলকাতার বাড়িতে চিঠি দিয়েছিল সুনয়না।--আমি এখন কলকাতায় যেতে পারব না, মা। কবে যেতে পারব, তাও বলতে পারছি না।

গালুডির এই তিন বছরের জীবনের মধ্যে শেষ দুটো বছরের জীবনটাই সুনয়নার জীবনের একটা মোহ। অতি অদ্ভুত ও অতি নির্মম একটা মোহ। সেই মোহ দু বছর ধরে সুনয়নার চোখে মুখে বিচিত্র হাসি, বিচিত্র জ্বালা আর অদ্ভুত উল্লাসের শিহর জাগিয়ে সুনয়নার জীবনটাকে ব্যস্ত করে রেখেছে। কালিকা মাইনস্-এর নিশীথ রায় হল সুনয়নার জীবনের নতুন মোহ।

মনে পড়ে সুনয়নার, যেদিন নিশীথ রায়কে এই বাড়িতে চা খেতে ডেকেছিল ধীরেন, এবং নিশীথও যেন সেই চা খেতে এসে ধন্য হয়ে গিয়েছিল, সেদিন নিশীথ রায়কে একটা নতুন অভিশাপের আবির্ভাব বলে মনে হয়েছিল সুনয়নার। নিশীথের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি সুনয়না ; কিন্তু নিশীথ রায় সেজন্য নিজেকে একটুও অপমানিত বোধ না করে ধীরেন বোসের হাতে দু হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে চলে গিয়েছিল।

--কিসের চেক? জিজ্ঞাসা করেছিল সুনয়না।

--শেয়ার কেনা-বেচা করব, সেইজন্যে নিশীথ রায়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিলাম।

হ্যাঁ, ধীরেন বোস তার নতুন ইচ্ছার নেশা আর অহংকারে মাটি-বেচা কারবার অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর, রেসের মরসুমে রেস, এবং শেয়ার মার্কেট। মাসের বিশটা দিন কলকাতাতেই পার করে দেয় ধীরেন। গালুডিতে যখন ফিরে আসে, তখন দু-চারটে হুইস্কির বোতল ছাড়া আর কোনও সম্পদ সঙ্গে নিয়ে আসে না। সেই হুইস্কি ফুরোয় ; এবং আবার কলকাতার রেসের কিম্বা শেয়ার মার্কেটের আহ্বান এসে ধীরেন বোসের আশা আর কল্পনা উতলা করে দেয়। আবার কলকাতা যাবার জন্য ছটফট করতে থাকে ধীরেন বোস। আবার টাকা চাই। কিন্তু কোথায় টাকা?

--তুমি যদি নিশীথ রায়কে নিজের মুখে বল, তবে কিছু বেশি টাকা ধার পাওয়া যেতে পারে।

নেশার আবেশে ছল-ছল দুটো লাল চোখের অলস দৃষ্টি তুলে সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন আবেদন করেছিল ধীরেন। আর, সুনয়নার দু চোখে যেন দুটো আগুনের জ্বালা দপদপ করে উঠেছিল।

কিন্তু সুনয়নার চোখের সেই চাহনিতে যেন প্রচণ্ড একটা অবহেলার কঠোর হাসি দিয়ে তুচ্ছ করে চেঁচিয়ে ওঠে ধীরেন--গালুডির টিম্বার-মার্চেন্ট রামগোপাল চৌহানকে চেন?

--না।

--রেলওয়েতে স্লিপার সাপ্লাই করে, কনট্রাক্টর গোপাল চৌহান আমার বন্ধু।

--বুঝলাম।

—রামগোপালকে বলা আছে, কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য যখনই তোমার গাড়ির দরকার হবে, তখনই পাঠিয়ে দেবে।

—আমার গাড়ির দরকার নেই।

ধীরেন উঠে দাঁড়ায়—দরকার আছে। তোমাকে আজই একবার কালিকাপুর যেতে হবে।

—কেন?

—নিশীথকে গিয়ে বলতে হবে, অন্তত তিনটে হাজার টাকা আমার খুব দরকার।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে, ভ্রূকুটি করে চোখের চাহনি প্রায় হিংস্র করে নিয়ে সুনয়না বলে—আর একবার ভেবে নিয়ে বল।

—কিছুছু ভাববার নেই। আমার ওসব ভাববার গরজ নেই।

—নিশীথ রায়ের কাছে গিয়ে আমি টাকা চাইলে নিশীথ রায় যদি আমাকে অপমান করে?

ধীরেন হো-হো করে হেসে ওঠে—অপমান? নিশীথ রায় তোমাকে অপমান করবে? ছিঃ, তোমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে নিশীথ রায়।

সুনয়না সেদিন যেন নিজের অদৃষ্টটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য একটা আক্রোশ নিয়ে কালিকাপুর মাইনস্-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের কাছে দাঁড়িয়েছিল। টাকার জোরে পরস্ত্রীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকাবার আনন্দ পেতে চায়, সে মানুষও এইরকম ভ্রূকুটি দিয়ে ঘৃণা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে গিয়েছিল সুনয়না।

কিন্তু সুনয়নারই অদৃষ্টের পরিহাস। ঘৃণা করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সুনয়না। সুনয়নার কথা শুনে কী ভয়ানক চমকে উঠল নিশীথ রায়। ভয় পেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল নিশীথের চোখ দুটো।

—আপনি কেন এসেছেন? সামান্য টাকার জন্য আপনি এতটা পথ কষ্ট করে এখানে ছুটে এসেছেন, ছিঃ। একটা চিঠি দিলে আমিই তো গালুডিতে গিয়ে, ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে...

নিশীথের গলার সেই ভয়াতুর ভাষার শব্দ শুনে নিশীথের ভীরু চেহারার দিকে সুনয়না হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

প্রশ্ন করে সুনয়না—আমার এখানে আসা কি অন্যায় হয়েছে?

—নিশ্চয়। ধীরেনবাবু শেয়ারের কারবার করেন, তাঁর টাকার দরকার পড়েছে ; কিন্তু সেজন্য আপনি টাকার যোগাড়ে ছুটোছুটি করবেন কেন?

—তা হলে আমি চলে যাই।

—নিশ্চয়। আমি নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে আসব, যদি অবশ্য টাকার যোগাড় করতে পারি।

—আপনি টাকা দেবেন কেন?

সুনয়নার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে নিশীথের মুখের চেহারা এইবার করুণ হয়ে যায়।—ঠিকই বলেছেন। আর টাকা দেবার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু...

—কী?

—কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আর টাকা দেওয়া উচিত নয় ; তবে আমি দেব না।

—সেটা আপনি ভেবে দেখুন।

—আপনি যদি আমাকে মিছেমিছি কোনও সন্দেহ না করেন, তবে এবারের মত টাকা দিতে পারি।

—কিসের সন্দেহ?

নিশীথ হঠাৎ নিরুত্তর হয়ে যায়।

সুনয়না বলে—না, কোনও সন্দেহ করছি না।

—শুনে সুখী হলাম।

নিশীথ হেসে ফেলে--ভয় ভেঙে গেল। আপনি আমাকে ভুল বোঝেননি।

চলে যায় সুনয়না ; এবং পরদিনই নিজে গালুডিতে এসে ধীরেনের হাতে তিন হাজার টাকার একটা চেক ধরিয়ে দেয় নিশীথ। তারপর, আর পনোরোটা মিনিটও দেরি করেনি ধীরেন। চেক হাতে নিয়ে যেন একটা দুরন্ত স্বপ্নের নেশায় আকুল হয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্য স্টেশনের দিকে ছুটে চলে যায়।

আর, সুনয়নার দু চোখ থেকে ঝরঝর করে একটি নীরব কান্নার বেদনা জল হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।

—এ কী করছেন? চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ।

—আপনি কী ভয়ানক ভুল করলেন, বুঝতে পারছেন? আস্তে আস্তে বলে সুনয়না।

—না।

—ধীরেন বোসের স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখবার দায় স্বীকার করে নিলেন।

—না, কখখনও না ; হতে পারে না। আপনি আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

—আপনি বিপদে পড়ে গিয়েছেন। আমার দোষ দেবেন না।

—কিসের বিপদ?

—এই যে এত রাত হয়ে গিয়েছে ; অথচ আপনি এখানে আমার সামনে একা বসে আছেন। গালুডিতে ফিরে যাবার এখন আর কোনও গাড়ি নেই।

—তাতে কী হয়েছে? আমি এখনি গিয়ে স্টেশনে বসে থাকব।

—কিন্তু আমি যেতে দেব না।

সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনও প্রতিবাদের ভাষা ফিসফিস করেও উচ্চারণ করতে পারেনি নিশীথ। কী অদ্ভুত রকমের একটা আক্রোশ নিয়ে জ্বলজ্বল করছে সুনয়নার চোখ দুটো। সেই সঙ্গে সুন্দর গড়নের ঠোঁট দুটো কী নিবিড় আবেশে গোলাপের পাপড়ির মত ফুলে উঠেছে।

নিশীথ বলে--আমাকে যেতে দিন।

—না।

—কেন?

—আপনার যাবার ইচ্ছা নেই।

—কে বললে?

—আপনি নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন।

যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে নিশীথের মুখটা। কী ভয়ঙ্কর সত্য কথা বলে দিয়েছে সুনয়না। সুনয়না এই জ্বলজ্বল চোখের দৃষ্টি যেন নিশীথের বুকের তপ্ত নিঃশ্বাস আর শোণিতের সব ক্রন্দনের খেলা একেবারে স্পষ্ট করে দেখে ফেলেছে।

না, সে রাতে কালিকাপুর ফিরে যেতে পারেনি নিশীথ। সকাল হতে যখন এই বাংলোবাড়ির দেওদারের ছায়া পার হয়ে হনহন করে হেঁটে স্টেশনের দিকে চলে গেল নিশীথ, তখন শুধু মনে হয়েছিল, হঠাৎ আত্মহত্যা করবার পর নিশীথ রায়ের একটা রক্তমাংসহীন প্রেতচ্ছায়া ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। সুনয়নার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি নিশীথ। আর, সুনয়না শুধু অপলক চোখ তুলে নিশীথ রায়ের সেই পলাতক মূর্তির দিকে তাকিয়ে এই দেওদারের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

নিশীথ রায়কে ভালবাসে সুনয়না, এ কথা কারও মুখে শুনতে পেলে সুনয়না আশ্চর্য হয়ে হেসে ফেলবে। পৃথিবীর কোনও মানুষকে ভালবাসতে পারে সুনয়না, এই কথাটা সুনয়নারই কাছে আজ সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাসের কথা হয়ে গিয়েছে। নিশীথ রায়কে ভালবাসার কথা কোনওদিন মনেও হয়নি সুনয়নার। শ্রদ্ধা? সে তো আরও অসম্ভব। মায়া? তাই বা বলা যায়

কী করে? জলবসন্ত হয়ে একলা ঘরে খাটের উপর শুয়ে একদিন ছটফট করেছিল নিশীথ এবং সেই নিশীথের গলা জড়িয়ে ধরেছিল সুনয়না। কিন্তু জানে সুনয়না, সে মায়া নিশীথ নামে একটা মানুষের জন্য মায়া নয়। নিজেরই একটা স্বার্থকে, সুনয়নার একটা ইচ্ছার সান্ত্বনাকে জড়িয়ে ধরে ছিল সুনয়না।

এক বুক জলে ডুবে যাবার পর আরও গভীরে তলিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, এমন আক্রোশ কোনও মানুষের জীবনে সম্ভব নয়। কিন্তু সুনয়নার জীবনে সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে। ডুবলে একেবারে জলের গভীরে ডুবে যাওয়াই ভাল। হাঁটুজলে নাকানি-চুবানি খাওয়া আরও দুঃসহ ব্যাপার। নিশীথ রায়কে যেন এই ডুবন্ত জীবনের চিরসাথী করবার জন্য একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে সুনয়নার জীবনে একটা উল্লাসের বিকার বরণ করে নিয়েছে। নিশীথ রায় সুনয়নাকে ভয় পায়, কিন্তু নিশীথকে ভয় পাইয়ে সুখী হওয়াই যেন সুনয়নার জীবনের সাধ। সুনয়নার দিকে মাঝে মাঝে যেভাবে তাকায় নিশীথ, তার মধ্যে ঘৃণা ছাড়া আর কোনও ভাবের ছায়াও থাকে না। কিন্তু সুনয়নার বুকের ভিতরে যেন একটা অট্টহাসির শব্দ বেজে ওঠে, দেখি, কত ঘৃণা করতে পারে।

টাকা চায় না সুনয়না ; কিন্তু নিশীথ রায় টাকা দেয়। কোনওদিনও আপত্তি করে না সুনয়না। টাকা নিতে লজ্জাও নেই বোধ হয়। বরং নিশীথ রায়ের শরীরটার মত নিশীথ রায়ের টাকাকেও যেন নিজের ইচ্ছামত খেলা করবার বস্তু বলে মনে করে ফেলেছে সুনয়না। ধীরেন বোস নামে একটা মানুষ, যাকে ইহজগতের সব মানুষ আজও সুনয়নার স্বামী বলে জানে, সে মানুষ ইচ্ছে করেই সুনয়নার জীবনকে একলা করে দিয়ে রেস শেয়ার আর হুইস্কির জগতে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে। আত্মহত্যা করতে পারেনি সুনয়না ; পাগল হয়ে যেতেও পারেনি। তাই বেঁচে থাকবার জন্য নিশীথ রায়ের টাকা আর নিশীথ রায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে। এই সত্য বুঝতে পারে নিশীথ, এবং এই সত্য স্বীকার করে সুনয়নার মন। নারী ও পুরুষের মধ্যে এর চেয়ে পঙ্কিল সম্পর্ক আর কী হতে পারে?

সুনয়না জানে, হাঁপ ছাড়তে চায় নিশীথ। টাকা নাও, কিন্তু আর এসো না—নিশীথের চোখ দুটো যেন নীরবে ধিক্কার দিয়ে এই কথা বলে দিতে চাইছে। কিন্তু সুনয়নার অন্তরাত্মাও যেন নীরবে খিলখিল করে হেসে ওঠে ; এবং নিশীথকে একদিন স্পষ্ট করে বলেও দিয়েছে সুনয়না—টাকা চাই না, দিয়ো না ; কিন্তু আমি আসবই। সাধ্যি থাকে তাড়িয়ে দিয়ো।

—একদিনের ভুলকে চিরকালের ভুল করে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী সুনয়না? বিড়বিড় করে একদিন সুনয়নাকে নিজের মনের একটা মুখচোরা ঘৃণার আভাস জানিয়ে দেবার জন্য একটু মুখরতা করেছিল নিশীথ।

সুনয়না বলে, ভুলটা এত বিস্বাদ হয়ে গেল কেন? কারও সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে বোধ হয়?

কী করে বোঝাবে নিশীথ, হ্যাঁ, মানুষের জীবন যে ভালবাসাই খোঁজে ; ভালবাসাহীন এই গলা-জড়িয়ে ধরা জীবন যে একটা ভয়ানক শাস্তি। আজীবন সহ্য করার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। কিন্তু সুনয়না যেন না-বোঝার জন্য পণ করে বসে আছে।

শুধু একদিন, কে জানে কোন ভাবনার ব্যথায় ছটফট করে উঠেছিল সুনয়নার মন। কালিকাপুরের পুরনো কালের সেই ছোট পুকুরটা, রূপসাগর যার নাম, তারই ভাঙা ঘাটের পাথুরে সিঁড়ির উপর নিশীথের পাশে দাঁড়িয়ে একটা লাল শালুকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আনমনার মত বলে উঠেছিল সুনয়না—ভালবাসতে পারলে ভালই হত, নিশীথ।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠে নিশীথ—তার মানে?

—তার মানে, সরে যেতে পারতাম। তুমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে।

—অদ্ভুত কথা বলছ।

—কেন?

—আমি তো জানি, মানুষ কাউকে ঘৃণা করলে তবেই তার কাছ থেকে সরে যেতে পারে।

হেসে ফেলে সুনয়না—তবে তুমি আমার কাছ থেকে সরে যেতে পারছ না কেন? তুমি তো আমাকে যথেষ্ট ঘেন্না কর।

মাথা হেঁট করে বিড়বিড় করে নিশীথ—ঘেন্না করি না বোধ হয়।

—তবে কী?

নিশীথও হাসতে চেষ্টা করে, বোধ হয় ভয় করে। শুধু মনে হয়, তোমার ক্ষতি করছি, নিজেরই ক্ষতি করছি।

—আমার ক্ষতি করেছ বইকি। কিন্তু তোমার কী ক্ষতি হয়েছে, বুঝতে পারছি না। অবশ্য, টাকার দিক দিয়ে কিছু ক্ষতি হয়েছে ঠিক। কিন্তু...

—কী?

সুনয়না হাসে—তোমার কি এই ধারণা যে, আরও কম টাকাতে সুনয়নার মত একটা মানুষকে যখন তখন এভাবে এরকম একটা রূপসাগরের নিরালা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে যা-ইচ্ছে-তাই বলা যায়?

চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ—আমি টাকার ক্ষতির হিসেব করছি না।

—তবে কিসের হিসেব করছ?

—ফাঁকির হিসেব।

—ফাঁকি?

—নিশ্চয়ই। ভালবাসার চিহ্ন নেই, তবু এরকম মেলামেশা...কোনও অর্থ হয় না ; নিছক একটা ফাঁকি নিয়ে পড়ে থাকা।

—তাই বলো। ভালবাসা পাওয়ার জন্যে, আর ভালবাসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।

—ঠিক কথা।

—তা হলে কাউকে ভালবেসে ফেলো।

—ফেলেছি বোধ হয়।

—তবে তাকে বিয়ে করো।

—নিশ্চয়ই করব।

—বেশ তো। কিন্তু তাতে আমার কী আসে যায়?

আবার চমকে ওঠে নিশীথ—তার মানে?

—আমার যা দরকার তা পেতেই থাকব। আমাকে সরিয়ে দেবার সাধ্য তোমার হবে না।

—আমার সাধ্য না হোক ; কিন্তু আর একজনের সাধ্য যে হবে না, এতটা ধারণা করছ কেন?

—আমাকে বড় বেশি দুর্বল বলে মনে করছ, নিশীথ? খুব ভুল করছ।

—তুমি আমাকেও বড় বেশি দুর্বল বলে মনে করছ।

—সত্যি কথা।

—কেন?

—আমাকে তুচ্ছ করবার সাধ্য তোমার নেই ; তাই তুমি দুর্বল।

নীরব হয়ে যায় নিশীথ।

খিলখিল করে হেসে ওঠে সুনয়না—আমার কথা ভাবতে তোমার মনে যে ঘৃণা লাগে, সেই ঘৃণাকেই যে তুমি ভালবাস। এত বিদ্বান হয়ে এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পার না কেন?

নীরব নিশীথ রায়ের মাথাটাও এইবার হেঁট হয়ে যায়। একটুও মিথ্যে বলেনি, বাড়িয়েও

বলেনি সুনয়না। যে নারীকে বেশিক্ষণ কাছে রাখবার জন্য কোনও আগ্রহ অনুভব করে না নিশীথ, যে নারীকে চিরকালের সঙ্গিনী বলে কল্পনা করতেও বুক কেঁপে ওঠে, সেই নারীর হাত ধরবার জন্য কতবার নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছে নিশীথ রায়ের এই ভদ্র শরীরের একটা মত্ততা। পরনারীর মন, প্রাণ ও দেহের সঙ্গে এ হেন ছন্নছাড়া সম্পর্কের অনুভব যে নিশীথ রায়ের বুকের পাঁজরের স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। অস্বীকার করতে পারে না নিশীথ।

সুনয়না বলে—আমি একটা অনুরোধ করব, শুনবে?

—বলো।

—তুমি বিয়ে করো না।

—একথা বলবার অধিকার তোমার নেই।

—নেই ঠিকই ; কিন্তু তোমার ভালর জন্যই বলছি।

—যে মেয়ে আমাকে ভালবাসে তাকেও বিয়ে করব না, আমাকে এরকম পরামর্শ দেওয়া মানে আমার ক্ষতি করা।

সুনয়নার চোখের দৃষ্টি দপ করে জ্বলে ওঠে।—আজ পর্যন্ত তোমার কোনও ক্ষতি করিনি ; কিন্তু যদি বিয়ে কর, তবে ক্ষতি করব। না করে পারব না। আমার ইচ্ছে না থাকলেও তোমার ক্ষতি করে ফেলব নিশীথ।

আর কোনও কথা না বলে, কালিকাপুরের রূপসাগরের সেই নিরালা থেকে যেন একটা যন্ত্রণাকে মূর্তি নিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল সুনয়না।

তারপর আর সাতটা দিনও পার হয়নি, আবার কালিকাপুরে এসে ম্যানেজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের সামনে গাড়ি থেকে নেমেই একটা নির্মম বিস্ময়ের আঘাতে সুনয়নার প্রাণটাই যেন কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিশীথের মালী হেসে হেসে খবর দিল—সাহেব বিয়ে করতে গিয়েছেন।

কার সঙ্গে বিয়ে? কোথায় বিয়ে? মালীর কাছে প্রশ্ন করে কোনও উত্তর পায়নি সুনয়না। উত্তর পেয়েছিল কালিকাপুর থেকে ফিরে এসে, গালুডির এই বাংলোবাড়ির ভিতর ঢুকে নিজেরই ঘরের টেবিলের কাছে এসে। ধীরেন বোসের নামে একটা হলদে খামের চিঠি এসেছে। বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। রাজপোখরার শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথ রায়ের বিয়ে। ছাপার অক্ষরে লেখা চিঠির এক প্রান্ত হাতের লেখার একটি অনুরোধও রয়েছে ঃ তুমি না আসতে পার, অন্তত সুনয়নাকে পাঠিয়ে দিয়ো, ধীরেন। ইতি শীতল সরকার।

আয়নাতে নিজের মুখের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে সুনয়নার নিজেরই বুক থরথর করে কেঁপে ওঠে। সর্বনাশ। নিজেরই এ কী ভয়ানক ক্ষতি করল নিশীথ রায়! নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের ভালবাসাবাসির মূর্খ অহংকারটাকে এই সুনয়না বোস যে একমুহূর্তে চূর্ণ করে ধুলো করে দেবে। সুনয়নার চরিত্রহারা রক্তমাংসের আক্রোশগুলিকে কি ভয় করতে ভুলেই গেল নিশীথ রায়? আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেরই চোখের আগুনের জ্বালাটাকে দেখতে থাকে আর কাঁপতে থাকে সুনয়না।

আর একবার রামগোপাল চৌহানের গাড়ি চেয়ে পাঠাতে হয়, এবং কালিকাপুরেও যেতে হয়। কিন্তু তখনি ফিরে আসতেও হয়। না, ফেরেনি নিশীথ রায়। নীরাজিতাকে সঙ্গে নিয়ে কালিকাপুরে ফিরে আসতে আরও সাতটা দিন দেরি করবে নিশীথ। কালিকা মাইনস্-এর কেরানিবাবুর কাছ থেকে খবর নিয়ে জানতে পারে সুনয়না, সাক্‌চিতে বউভাতের অনুষ্ঠানের পর, আরও পাঁচটা দিন ওদিকেই পার করে দিয়ে ম্যানেজার নিশীথ রায় মঙ্গলবার এখানে ফিরবেন।

আর মাত্র তিনটে দিনের অপেক্ষা ; সেই অপেক্ষার যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে একটা

ঘণ্টাও বোধ হয় ঘুমতে পারেনি সুনয়না। এবং ঘুমহারা চোখের সব যন্ত্রণা বিদ্যুতের জ্বালার মত ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠল তখন, যখন মঙ্গলবারের বিকালের আলোতে সুনয়নাকে গালুডি থেকে কালিকাপুরে নিয়ে যাবার জন্য কন্ট্রাক্টর চৌহানের গাড়ি বাংলোবাড়ির দেওদারের ছায়ার কাছে এসে দাঁড়াল।

বিকালের আলো যখন রঙিন হয়ে এসেছে, কালিকাপুরে শালবনের উপরে উড়ন্ত পাখিগুলিকে যখন রঙিন আলোর উড়ন্ত ফুলের ঝাঁক বলে মনে হয়, তখন কালিকা মাইনস্-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের ফটকের কাছে কন্ট্রাক্টর চৌহানের গাড়িও তীব্রস্বরের হর্ন বাজিয়ে উড়ন্ত আক্রোশের মত হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর থেমে যায়।

গাড়ি থেনে নামে না সুনয়না। গাড়ির ভিতরে চুপ করে বসে, নিজেরই দুই চোখের বিদ্যুতের জ্বালা জোর করে চোখেরই উপর সুস্থির করে রেখে নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বারান্দায় কেউ নেই। বারান্দার গা-ঘেঁষা প্রথম ঘরের দরজায় যে পর্দাটা ফুরফুর করে উড়ছে, সেই পর্দার দিকে চোখ পড়তেই সুনয়নার দু চোখের জ্বালাময় চাহনিতে একটা নতুন হাসির শিহর লাগে। সুনয়নার চোখের দৃষ্টিটাও যেন একটা হিংস্র কৌতুকের আবেগে ফুরফুর করে উড়তে থাকে। লাল ভেলভেটের চটি-পরা এক জোড়া পা, আর লালচে মেঘের মত রঙের একটা সিল্কের শাড়ির আঁচল দেখা যায়। কালিকা মাইনস্-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের জীবনের নীড়ে নব-বিহগীর আবির্ভাব ; নতুন সুখের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে সেই নীড়।

—আর একবার হর্ন বাজাও, ড্রাইভার। আনমনার মত অপলক চোখ নিয়ে নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের সেই ঘরের ভিতরের রঙিন আবির্ভাবের ছায়ার দিকে তাকিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে সুনয়না। ড্রাইভার আবার হর্ন বাজায়।

কনট্রাক্টর চৌহানের এই গাড়ির হর্নের শব্দ চিনতে নিশীথ রায়ের পক্ষে একটুও অসুবিধা নেই ; বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি করবার কথা নয়। জানে সুনয়না, এবং সুনয়নার বুকের ভিতরের আক্রোশটাও আশায় ছটফট করছে, এই মুহূর্তে চমকে উঠবে আর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়াবে নিশীথ রায় ; আর, এক জোড়া ভীত ও করুণ চোখের দৃষ্টি তুলে অসহায়ের মত এই গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে।

তারপর আর কতক্ষণই বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে নিশীথ রায়? আস্তে আস্তে, ওই ভীরুতারই ভারে অতিষ্ঠ হয়ে সুনয়নার এই দুই চোখের চাহনির কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াতে হবে। সুনয়না বলবে—চলো, বেড়িয়ে আসি। এখনই চলো। ওজর আপত্তি শুনতে চাই না। এখনই যেতে হবে।

সুনয়নার সেই আহ্বান অস্বীকার করতে পারবে কি নিশীথ রায়? সাধ্য হবে কি?

সুনয়নার কল্পনার ভাষাগুলিই যেন নীরবে হেসে ওঠে। রুমাল তুলে দুই ঠোঁটের অদ্ভুত এক থরথর হাসির কাঁপুনি চেপে রাখতে চেষ্টা করে সুনয়না।

নিশীথকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাওয়া যায়? রূপসাগর নামে সেই সেকেলের ইতিহাসের ছোট পুকুরটা বেশি দূরে নয়। বড় বড় তালের ছায়ায় রূপসাগরের কিনারার সেই নির্জন নিভৃতের অনেক জায়গা এখনও নরম ঘাসে ছেয়ে রয়েছে। সেই নিভৃতের আবেদন ভুলে যাবার সাধ্য হবে কি এই নিশীথ রায়ের? সেখানে গিয়ে আজও এই মুহূর্তে নিশীথ রায়ের হাত ধরে যদি সুনয়না, তবে নিশীথ রায়ের চোখ দুটো সুনয়নার মুখের দিকে পাগলের মত না তাকিয়ে থাকতে পারবে কি?

থাক রূপসাগরের ছায়াময় নির্জনতা আর নিভৃত। কালিকাপুরের শালবনের কিনারা ধরে এগিয়ে গিয়ে লালমাটির কাঁচা সড়ক যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কালো টিপির মত ছোট পাহাড়ের যে কোনও একটা পাথরের উপরে বসে সূর্যাস্তের শেষ আভার দিকে তাকিয়ে

নিশীথ রায়কে যদি প্রশ্ন করা যায়—কী ইচ্ছে করছে, নিশীথ? আমার কাছ থেকে এখনই উঠে যেতে চাও? এখনই ঘরে ফিরতে মন চাইছে? আমি বলছি, না যেয়ো না।

চলে যেতে সাধ্য হবে কি নিশীথ রায়ের? আবার মুখের উপর রুমাল বুলিয়ে যেন একটা হাসির জ্বালা মুছতে থাকে সুনয়না। পৃথিবীর যে কোনও মানুষ বিয়ে করুক, কিন্তু তুমি বিয়ে করলে কেন নিশীথ রায়? নিজেকেই চিনতে আর বুঝতে ভুল করলে কেন? বিশ্বাস করলে না কেন যে, তুমিও ডুবে গিয়েছ? সুনয়না বোস তোমার সেই ডুবন্ত জীবনের সঙ্গিনী।

না, রূপসাগর নামে পুকুরটার কিনারাতে নয় ; শালবনের শেষের সেই ছোট পাহাড়ের পাথরের উপরেও না ; আজ নিশীথ রায়কে তার এই মিথ্যে খেলাঘরের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে একবার গালুডিতে চলে গেলেই ভাল। গালুডির বাড়ির বারান্দার উপরে সেই বেতের চেয়ারের উপর বসে সুনয়নার হাতের যত্ন আর আগ্রহের ছোঁয়া দিয়ে তৈরি এক পেয়ালা চা খেয়ে নিক নিশীথ, দেওদারের ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকুক। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা পড়ুক গালুডির রাঙামাটির মাঠ। ঘরের আলো জ্বলে উঠুক। সুনয়না বোসের মুখটা ভাল করে নিশীথ রায়ের চোখে পড়ুক। তারপর দেখা যাক, আজকের রাত শেষ না হবার আগে কী করে কালিকাপুরে ফিরে আসতে পারে নিশীথ রায়?

সুনয়না বোসের কল্পনা এইবার একটি প্রতিজ্ঞার মত যেন নিরেট কঠোর আর নির্ম্মম হয়ে ওঠে। তাই ভাল। নিশীথ রায় যেন আজ তার মন প্রাণ আর আত্মার হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলতে পারে যে, ডুবন্ত জীবনের পাঁক থেকে মুক্ত হয়ে তীরে উঠবার মত শক্তিও তার নেই, সাহসও নেই। ভালবেসে বিয়ে-করা জীবনের রঙিন নীড়টাই ভুয়ো ; বিশ্বাস করবার চরম সুযোগ পেয়ে যাক নিশীথ, সুনয়নাকে তুচ্ছ করবার ইচ্ছাটাও একটা কপট ইচ্ছা।

আর সারারাত ধরে এই কোয়ার্টারের একটি ঘরের নিভৃতে নিশীথ রায়ের অপেক্ষায় জেগে বসে থেকে আজই বুঝে ফেলুক নীবাজিতা, কেমন মানুষকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছে।

কিন্তু ও কে? গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়েছে আর গাড়ির দিকে তাকিয়েছে যে, সে তো নিশীথ রায় নয়। নীরাজিতাও নয়। কিন্তু সুনয়নার চোখের অপরিচিত কোনও মূর্তি নয়। ও যে প্রতিভা!

সেই প্রতিভা ; চোখে সেই সোনার ফ্রেমের চশমা। সুনয়নার দুই চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা ভয়ানক বিস্ময়ের আবেশ থমথম করে। প্রতিভা এখানে, তবে মিহির মিত্র কোথায়?

প্রতিভাদের কলকাতার বাড়িটাকে এখনও যেন স্পষ্ট করে চোখে দেখতে পাচ্ছে সুনয়না। প্রতিভার বাবা শিবদাসবাবু সম্পর্কের দিক দিয়ে পরেশদার খুড়শ্বশুর হন। বউদিদের সঙ্গে কয়েকবার প্রতিভাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে প্রতিভার সঙ্গে চেনাশোনার যে সূচনা হয়েছিল, সেটা তিন বছরের অন্তরঙ্গতায় কী সুদুর বন্ধুত্বের ইতিহাস হয়ে উঠেছিল। সেই তিন বছরের স্মৃতি আজও সুনয়নার মনে একটুও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। মনে আছে সবই ; প্রতিভার সঙ্গে শেষ দেখার ঘটনার সেই ছবিও মনে আছে।

সুনয়নার মাথার ভিতরে একটা ভয়ানক বিস্ময়ের বিদ্রূপও বাজতে থাকে। যে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন, সেই শেষ দেখার দিনে কেঁদে ফেলেছিল সুনয়না, আজ যে সেই প্রতিভা সুনয়নার এই মুখ এখানে দেখতে পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠবে।—তুমি এখানে কেন সুনয়না? প্রতিভার প্রচণ্ড বিস্ময়ের এই প্রশ্নের কি জবাব দেবে সুনয়না?

জানত সুনয়না, এবং কে না জানত যে, মিহির মিত্রের সঙ্গে প্রতিভার ভালবাসা হয়েছে ; মিহির মিত্রের সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে হবে? কে না দেখতে পেয়েছিল, মিহির মিত্রের সঙ্গে প্রতিভার মেলামেশার রীতিনীতির মধ্যে কোনও কুণ্ঠার বালাই নেই? যারা সব খবর জানত না, তারা মিহির আর প্রতিভাকে একসঙ্গে দেখে স্বামী-স্ত্রী বলেই মনে করে ফেলত। কিন্তু

সুনয়না কল্পনাও করতে পারেনি যে, বিয়ে না হতেই প্রতিভার মত মেয়ে...

সত্যিই, সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে ভয় পেয়ে সেদিন কেঁদে ফেলেছিল সুনয়না।

সিনেমার ছবি দেখবার জন্য সন্ধ্যাবেলা প্রতিভাকে ডাকতে এসেছিল সুনয়না। এবং ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকেই শিউরে উঠেছিল সুনয়নার চোখ। আর দু হাতে চোখ ঢেকে, ভয় লজ্জা দুঃখ আর ঘৃণারও একটা দুঃসহ আলোড়ন বুকের ভিতরে চেপে রেখে ঘর ছেড়ে ছুটে বের হয়ে গিয়েছিল সুনয়না। মিহির মিত্র প্রতিভার ভালবাসার মানুষ হলেনই বা, কিন্তু স্বামী তো নন। কিন্তু এ কী অদ্ভুত দুঃসাহস প্রতিভার। প্রতিভার শরীরে রক্তে কি একটুও ভয় নেই লজ্জা নেই?

প্রতিভাদের বাড়ির বারান্দায় মাত্র আর পাঁচ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল সুনয়না। প্রতিভাও সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কী আশ্চর্য, সুনয়নাকে চোখ মুছতে দেখে, আর সুনয়নার মুখটাকে আতঙ্কিত হতে দেখে হেসে ফেলেছিল প্রতিভা।—লজ্জার ব্যাপার বলতে পারো ; কিন্তু এতে তোমার কাঁদবার কী আছে, সুনয়না? ভয় পেলে কেন?

—ছিঃ! শুধু এই ঘৃণার কথা কোনওমতে বলতে পেরেছিল আর চলে গিয়েছিল সুনয়না। দুই বান্ধবীর মধ্যে সেই শেষ দেখা আর শেষ কথা। তার পর এই আজ।

সুনয়নার মুখের সেই ধিক্কারের প্রতিধ্বনিটা যেন তিন বছর পরে ছুটে এসে সুনযনারই জীবনের উপর এক প্রচণ্ড কৌতুকের ধ্বনি হয়ে এই মুহূর্তে বেজে উঠবে! মাথা হেঁট করে সুনয়না, আর অনুমান করতে পারে ; এইবার আস্তে আস্তে হেঁটে এই গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে প্রতিভা ; প্রতিভার মুখটা বোধ হয় এক মিনিট ধরে হো-হো করে হেসে নিয়ে তারপরেই চেঁচিয়ে উঠবে ছিঃ।

কোথায় গেল আর কেমন করে কিসের অভিশাপে পুড়ে গেল তিন বছর আগের সুনয়নার সেই ভয়, লজ্জা আর ঘৃণার অহঙ্কার। প্রথমে বুঝতে পারেনি সুনয়না, চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে বলেই মাথাটা আপনি হেঁট হয়ে গিয়েছে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে চমকে ওঠে, এবং সন্দেহ করে ; সত্যিই কি আজ তিন বছর আগের সুনয়নার সেই অহঙ্কারের জন্য একটা মমতার কান্না এসে সুনয়নার অন্তরাত্মায় ছটফট করে উঠেছে? ঘৃণা করছে নিজেকে? লজ্জা পেল, ভয় পেল কি গালুডির সুনয়না?

—এসো সুনয়না! সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ খুশির স্বরের আহ্বান শুনেই মুখ তোলে সুনয়না। হ্যাঁ, প্রতিভা এসে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে আর ডাকছে।

সুনয়না হাসে, আশ্চর্য!

—কিসের আশ্চর্য?

—তোমাকে এখানে দেখতে পাব বলে যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

—আমিও যে ভাবতে পারিনি, তোমাকে এখানে দেখতে পাব।

গাড়ি থেকে নামে সুনয়না।—তুমিও খুব আশ্চর্য হয়েছ বলো?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—অন্য কাউকে দেখতে পেলে আশ্চর্য হতাম না। তুমি বলেই—

সুনয়নার মুখের হাসি হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তিন বছর আগের সুনয়নার জীবনের গৌরব যে বুকের ভিতর আর্তনাদ করে উঠেছে। কী ভয়ানক ধিক্কার প্রতিভার এই সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের মধ্যে বেজে উঠেছে!

সুনয়না আস্তে আস্তে বলে, নিশীথবাবু কোথায়?

—মাইনস্-অফিসে গিয়েছে। ডেকে পাঠাব?

প্রতিভার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সুনয়নার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।—না। আমি

নিজেই যাব।

প্রতিভা হাসে, এখনি যাবে?

—হ্যাঁ। আর, এখনি নিশীথবাবুকে একবার গালুডিতে নিয়ে যাব।

—দরকার থাকলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে।

—তুমি অনুমতি না দিলেও চলবে।

—ছিঃ, এ কী কথা বলছ সুনয়না!

শিউরে ওঠে সুনয়নার চোখ। ছিঃ, সত্যিই যে তিন বছর আগের ধিক্কারের প্রতিধ্বনিটা বেজে উঠেছে!

কিছুক্ষণ আনমনার মত কী যেন ভাবে সুনয়না ; তারপরেই হাসতে চেষ্টা করে।—তুমি বোধ হয় আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ প্রতিভা।

—বিশ্বাস করো সুনয়না, একটুও ভয় পাইনি।

—একটা ঠাট্টা করেছি শুধু। সত্যি কি বিশ্বাস করলে যে তোমার নিশীথবাবুকে গালুডিতে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি?

—নিয়ে গেলে আমার ক্ষতি কী?

সুনয়না হাসে—ক্ষতি নেই?

—না।

—এমন বিশ্বাস কেমন করে হল?

—জানি না।

—মস্ত বড় বিশ্বাস পেয়েছ, প্রতিভা। সবচেয়ে ভাল হত, যদি তোমার নিশীথবাবুও এই বিশ্বাস পেতেন।

—আমার মনে হয়, নিশীথও তাই বিশ্বাস করে।

—কী?

—তারও কোনও ক্ষতি হবে না।

—তার মানে?

—আমাকে জানে নিশীথ।

—কী জানে?

—সবই জানে।

—কেমন করে জানতে পারলে?

—আমিই জানিয়েছি।

—তবুও ভালবাসা হল?

প্রতিভা হাসে—সেইজন্যেই ভালবাসা হল।

—কিন্তু তুমি কি কিছু জেনেছিলে?

—নিশীথের কথা বলছ?

—হ্যাঁ।

—নিশীথই জানিয়েছে।

—বিয়ের পরে?

—বিয়ের আগে। তা না হলে এ বিয়ে হতই না।

সুনয়নার মনের ভিতরে এতক্ষণের প্রতিভার উল্লাস যেন হঠাৎ আহত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। প্রতিভার কাছে হার মানতে হচ্ছে যে! কী কঠিন প্রতিভার বিশ্বাস। কত উদার প্রতিভার সাহস। প্রতিভার জীবনকে ভয় পাইয়ে বিষণ্ণ করে দেবার শক্তি নেই সুনয়নার। অন্য কোনও মেয়ে নয় ; নিখুঁত চরিত্রের নীরাজিতা নয়। এ যে সেই প্রতিভা!

এবং প্রতিভা বলেই যে অদ্ভুত একটা মায়ার ছোঁয়া লেগে সুনয়নার আক্রোশটাও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। প্রতিভা আর নিশীথ, বেচারা এই দুটি মানুষ যে দুটি আহত জীবনের মানুষ। অনেক আশা করে দুজনে দুজনের ভালবাসা পেয়ে সুখী হতে চাইছে।

হেসে হেসে আর ঠাট্টা করতে পারে না সুনয়না। সুনয়নার গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে করুণ অভিনন্দনের মত ফিসফিস করে।--তোমরা দুজনেই দেখছি মস্ত মহৎ--আশ্চর্য!...হ্যাঁ, কিন্তু আমি যে অন্য রকমের খবর পেয়েছিলাম, প্রতিভা।

--কী?

--শুনেছিলাম, এমন কি নিমন্ত্রণের চিঠিও পেয়েছিলাম, নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের বিয়ে।

--ঠিকই শুনেছিলে। কিন্তু সে বিয়ে হল না।

--কেন?

--নিশীথের চরিত্রে নাকি দাগ আছে ; কে যেন সে খবর নীরাজিতার বাবা শীতলবাবুকে জানিয়েছে।

--তাইতেই বিয়ে ভেঙে গেল?

--হ্যাঁ। নীরাজিতা সরকারের পাণিগ্রহণের জন্য রাজপোখরাতে গিয়ে দেখতে পেলেন নিশীথ রায়, শীতল সরকারের বাড়ি অলক্তকের ফটক বন্ধ, বাড়িতে কেউ নেই।

সুনয়নার চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে ওঠে।--কী বলছ, প্রতিভা!

--একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি কথা বলছি।

--মানুষকে এমন অপমানও করতে পারে মানুষ? নীরাজিতারও কি মাথা খারাপ হয়েছিল?

--জানি না।

--চমৎকার দুর্ঘটনা।

--হ্যাঁ, চমৎকার দুর্ঘটনাই বটে। তা না হলে, আমাকে আর এখানে আসতে হত না।

সুনয়না যেন দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্লান্তভাবে বলে--খুব ভাল করেছ প্রতিভা। তুমি একটা ভদ্রলোকের জীবনকে অপমান থেকে বাঁচিয়েছ। খুব ভাল হল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার কী যেন ভাবতে থাকে সুনয়না। তারপর মুখের চেহারাটা যন্ত্রণাক্ত হয়ে ওঠে। যেন প্রাণপণে মনের ভিতরটা কুণ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম করে আরও কঠোর একটা কৌতূহলের চঞ্চলতা চেপে রাখতে চেষ্টা করছে সুনয়না। কিন্তু পারছে না। প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে চায় ; বার বার কেঁপে ওঠে সুনয়নার ঠোঁট দুটো।

প্রতিভা বলে--তুমি কী যেন বলতে চাইছ, সুনয়না।

--সামান্য একটা কথা জানবার ছিল, না জানলেও চলে...অর্থাৎ...

--আমি বলতে পারি, তুমি কার কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছ।

--তার মানে...

--তার মানে, মিহির মিত্রের কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছ।

--হ্যাঁ।

--সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। লণ্ডন থেকেই একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, আমাকে ভাবতেই ভয় পায় মিহির মিত্র।

সুনয়না আশ্চর্য হয়, কিসের ভয়?

--চরিত্রের ভয়।

--কার চরিত্র?

--আমার।

আবার আনমনার মত বিড়বিড় করে সুনয়না--মানুষ মানুষকে এমন অপমান করতে

পারে!

—কিন্তু সেজন্য আর দুঃখ করবার দরকার কি সুনয়না? মানুষ মানুষকে সম্মান করতে পারে, সেটা তো দেখতে পাচ্ছ।

—কী?

—নিশীথ আমাকে বিয়ে করেছে। এর চেয়ে বেশি সম্মান কোনও পুরুষ কি কোনও মেয়েকে...

—নিশ্চয়, প্রতিভা। খুব সত্যি কথা। খুব ভাল হল। নিশীথবাবু মানুষের মত মানুষ বলেই...হঠাৎ কথা বন্ধ করে সুনয়না। আর, প্রতিভাই আশ্চর্য হয়ে যায়। কেঁদে ফেলেছে সুনয়না।

—এ কী ব্যাপার, সুনয়না? প্রশ্ন করেই প্রতিভা অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

—খুব ভাল হল, প্রতিভা। সুনয়নার চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের শান্ত। সুনয়নার গলার স্বরে যেন নিবিড় এক সান্ত্বনার আবেগ টলমল করে। হঠাৎ যেন সুনয়নার জীবনটাই সুখী হয়ে গেল, পরম নিশ্চিন্ততার আবেশে শান্ত হয়ে গেল।

—চলো প্রতিভা, তোমার ঘরের ভিতরে বসে একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে তারপর চলে যাব।...তুমি আজই এসেছ?

—কাল এসেছি।

—সাক্‌চিতে বউভাত হল বোধ হয়।

—হ্যাঁ।

—তোমার জ্যেঠাশ্বশুর হরদয়ালবাবু চমৎকার মানুষ। ওঁরা সবাই নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন।

—সবাই বড় বেশি খুশি হয়েছে।

সুনয়না হাসে—হওয়াই উচিত। এবার নিজেরা দুটিতে মিলেমিশে খুশি হয়ে আর সুখী হয়ে থাক।

ঘরের ভিতরে ঢুকে প্রতিভার সঙ্গে গল্প করতে করতে সুনয়না যেন নিজের সত্তার অস্তিত্বটাও ভুলেই গিয়েছে। ঘরের চেহারাটা এবার বদলে দিতে হবে, প্রতিভা। এ ঘরে এসব টেবিল চেয়ার রাখবে না। এই ঘর শুধু তোমাদের দুজনের গল্প করবার ঘর। বাইরের কেউ যেন এখানে এসে না বসে।

ঘরের এদিকে-ওদিকে আর আলনার উপর এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে সুনয়না বলে—আমি গালুডি থেকে তোমার জন্য একজন ঝি পাঠিয়ে দেব। খুব ভাল কাজ জানে, খুব পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মানুষ। চমৎকার ঘর গোছাতে পারে ঝি-টা। তোমার অনেক কাজের ঝঞ্ঝাট বেঁচে যাবে, প্রতিভা।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে দূরের শালবনের আবছায়ার দিকে তাকিয়ে সুনয়নার মুখরতা যেন আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে।—এখানে বেড়াবার মত অজস্র ভাল ভাল আর বড় সুন্দর জায়গা আছে, প্রতিভা। নিশীথবাবু হয়ত এবার ঘরকুনো হবার জন্য চেষ্টা করবেন, কিন্তু তুমি বাধা দিও। রোজ সকালে একবার, আর সন্ধ্যায় একবার দুজনে মিলে বেড়িয়ে এসো।...আচ্ছা, আমি চলি এবার, প্রতিভা। নিশীথবাবুকে বলো, আমি নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। একদিন সময় করে দুজনে গালুডিতে আমার ওখানে যেয়ো, কেমন?

—একটু অপেক্ষা করো সুনয়না। নিশীথের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলেই ভাল হয় না কী?

সুনয়না ছটফট করে ওঠে—না, প্রতিভা। আমি চলি। নিশীথবাবুকে বলো, যেন আমার

অভদ্রতার জন্য কিছু না মনে করেন।

সুনয়নার সঙ্গে ফটক পর্যন্ত হেঁটে এসে প্রতিভাও গাড়ির কাছে দাঁড়ায়। সুনয়না হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর আবার অদ্ভুত রকমের একটা হাসি হেসে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায়।—একটা অনুরোধ ছিল প্রতিভা।

—বলো।

—কালকেই কি যেতে পারবে?

—আমার পক্ষে না পারবার তো কথা নয়। কিন্তু নিশীথের যদি কোনও কাজ থাকে, তবে...

সুনয়না বলে—তবুও চেষ্টা করো প্রতিভা। একটু তাড়াতাড়ি করো...কালই যদি যেতে পার তবে বড় ভাল হয়...নইলে...

কথা শেষ না করেই চুপ করে গেল সুনয়না।

আর, কনট্রাক্টর চৌহানের গাড়িও শব্দ করে স্টার্ট নিয়ে কালিকাপুরের সড়কের লাল ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে গেল।

গালুডির বাংলোবাড়ির গেটের দেওদারেব ছায়া পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে সুনয়না। একটা কাচের গ্লাস আছাড় খেয়ে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল। বাড়িটার বুকের একটা ভয়ানক পিপাসার স্বপ্ন যেন আর্তনাদ করে উঠেছে। ধীরেন বোস তা হলে কলকাতা থেকে আজই ফিরে এসেছে!

অন্যদিন হলে, এই একটা সামান্য গেলাসের আছাড় খাওয়া শব্দ শুনেই সুনয়নার মুখের উপর এক ঘৃণার জ্বালা ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু কী আশ্চর্য, সুনয়নার জীবনটা যেন সব অভিযোগের বেদনা হারিয়ে একেবারে হালকা হয়ে ফিরে এসেছে। সুনয়নার লজ্জাহীন রক্তমাংসের আক্রোশগুলিও যেন ভস্ম হয়ে ঝরে গিয়েছে। পৃথিবীর কারও উপর এক বিন্দু রাগ নেই ; বরং মনে হয় সুনয়নার প্রাণটাই যেন একটা পঙ্কিল হিংসার রসাতলে তলিয়ে যাবার গ্লানি থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। কালিকাপুরের দুটি মানুষ, সেই সুন্দর স্বামী-স্ত্রী বেচারাদের সৌভাগ্যকে অভিনন্দিত করে চলে আসতে পেরেছে সুনয়না।

ধীরেন বোস নামে যে মানুষটার হাতেব গেলাস খসে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল, সেই মানুষটার উপরেও যে একটুও রাগ হয় না। যেমন আছে থাকুক, যা নিয়ে থাকতে ভাল লাগে তাই নিয়ে ভাল থাকুক মানুষটা। ওকে ঘৃণা করবার কোনও অধিকার নেই সুনয়নার। এতদিন যে ঘৃণা করেছে সুনয়না, সেটা তো সুনয়নারই জীবনের একটা মাতাল অভিমানের রাগ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে একবার থমকে দাঁড়ায় সুনয়না। একটা সোফার উপরে কাত হয়ে পড়ে আছে ধীরেন বোস। হুইস্কির বোতল প্রায় খালি হয়ে এসেছে। সোফার কাছে ছোট একটা টেবিলের উপর অনেক কাগজপত্র পড়ে আছে। কলকাতায় গিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর শেয়ার-মার্কেটে ভাগ্যের যে কারবার করে এসেছে ধীরেন বোস, তারই নথিপত্রের কতগুলি আবর্জনা।

অন্যদিন হলে, ধীরেন বোসের এই চেহারার দিকে, নেশায় বিগলিত এই অস্থিহীন ও অর্ধলুণ্ঠিত অবস্থার দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে নিজের ঘরের দিকে চলে যেত সুনয়না। কিন্তু আজ বোধ হয় শুধু একবার ভ্রূক্ষেপ করেই চলে যেতে চায়।

তাকাতে গিয়ে সুনয়নার চোখে যেন একটা নতুন বিস্ময়ের চমক লাগে। দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়। ধীরেন বোসের চেহারাটা যেন সোফার উপরে পড়ে আগুনে পোড়া সাপের মত কাতরাচ্ছে। নেশা করে শরীরটাকে এবং সেই সঙ্গে বোধ হয় মন, প্রাণ আর আত্মার সব

সাড়াও অবশ করে পড়ে থাকাই ধীরেন বোসের জীবনের নিয়ম। এরকম জ্বালাময় অস্থিরতা নিতান্তই ব্যতিক্রম। সন্দেহ হয় সুনয়নার, কলকাতা থেকে কী একটা জ্বরের জ্বালা কিংবা কঠিন কোনও অসুখের অস্বস্তি নিয়ে গালুডি ফিরে এসেছে মানুষটা?

দেখতে পেয়েছে ধীরেন বোস, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুনয়না। সুনয়নার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আস্তে আস্তে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ধীরেন বোস। এটাও ধীরেন বোসের অভ্যাসের ব্যতিক্রম। এমন অবস্থায় সুনয়নাকে দেখলে একবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠাই ধীরেন বোসের জীবনের নিয়ম। এবং ধীরেন বোসের সেই বিদঘুটে আনন্দের আওয়াজটাকে ঘৃণা করে তৎক্ষণাৎ অন্য ঘরে চলে যাওয়া সুনয়নারও জীবনের নিয়ম।

আজ কিন্তু চলে যায় না সুনয়না। ধীরেন বোসের চোখের দৃষ্টি যেন একটা নীরব হাহাকার। যেন ভয়ানক একটা ছায়া দেখে ভয় পেয়ে বোবা হয়ে গিয়েছে ধীরেন বোস।

ঘরের ভিতরে ঢুকে, আস্তে আস্তে হেঁটে ধীরেনের কাছে এসে দাঁড়ায় সুনয়না--কখন কলকাতা থেকে ফিরলে?

--এই তো, সন্ধ্যার একটু আগে।

--চা-খাবার খেয়েছ?

--অ্যাঁ? চমকে ওঠে ধীরেন বোস।

--চা-খাবার!

--কোথায় চা-খাবার? কে দেবে?

--কেন? শুকদেব বাড়িতে ছিল না?

--ছিল।

--তবে?

--কিন্তু শুকদেব কেন মিছেমিছি আমাকে চা-খাবার খাওয়াবে!

--তুমি চেয়েছিলে?

--না।

--কেন?

ধীরেন হাসে--শুকদেবের কাছে চা-খাবার কবেই বা চেয়েছিলাম? তা ছাড়া...

--কী?

--বেচারা শুকদেবকে বিরক্ত করে লাভ কী? ওর কাছ থেকে চেয়ে চা-খাবার খেয়েই বা লাভ কী?

--কিন্তু আজকাল আমার কাছ থেকেও তো চা-খাবার কোনওদিন তোমাকে চাইতে দেখি না।

--তা তো বটে। তোমাকেও বিরক্ত করতে চাই না বলেই--

সুনয়না হাসে--ভাল কথা...আচ্ছা, একটু ভাল হয়ে বসো ; চা-খাবার আনছি।

সুনয়নার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় ধীরেন বোস। নেশাক্ত আর অবসন্ন চোখ দুটো যেন একটা মৃত্যুময় অন্ধকারের কবর থেকে হঠাৎ উঁকি দিয়ে একটা অকল্প্য আলোকের দিকে তাকিয়েছে। বড় বেশি বিস্মিত হয়েছে ধীরেনের নেশাক্ত চোখ কিন্তু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে চলে যায় সুনয়না।

পনেরো মিনিটও সময় লাগে না। চা-খাবার নিয়ে ধীরেন বোসের সেই অদ্ভুত এক নতুন জাগরণের দুই চোখের বিহ্বল দৃষ্টির কাছে এসে দাঁড়ায় সুনয়না। চা-খাবার খায় ধীরেন বোস ; আর সুনয়না চুপ করে দাঁড়িয়ে ধীরেনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জানে না, এবং হিসাবও রাখে না সুনয়না, চা-খাবার খেয়ে একটা হাত আলগাভাবে এগিয়ে দিয়ে কতক্ষণ ধরে বসে আছে ধীরেন। বুঝতে পেরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে সুনয়না। এক

গেলাস জল নিয়ে এসে নিজেরই হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ধীরেনের শিথিল হাতটাকে ধুয়ে দেবার পর তোয়ালে খোঁজে। ধীরেনের হাতটাকে মুছে দেবার পর আবার চুপ করে দাঁড়ায়। আস্তে একবার হাঁপ ছাড়ে সুনয়না ; তার পরেই চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দেয়।

ধীরেন বলে--একটা চিঠি ছিল।

মুখ ফেরায় সুনয়না।--চিঠি?

--হ্যাঁ। রাজপোখরা থেকে শীতলকাকা আমাকে লিখেছেন।

সুনয়নার হাতে দুটো চিঠি তুলে দিয়ে ধীরেন বলে--সেই সঙ্গে আর একটা চিঠিও আছে। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতিবাবু শীতলকাকাকে যে চিঠিটা লিখেছেন।

ধীরেন বোসের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, অবিচল ও নিষ্কম্প মূর্তি নিয়ে চিঠি দুটো পড়তে থাকে সুনয়না ; এবং পড়া শেষ হতেই চিঠি দুটো টেবিলের উপর রেখে দেয়।

ধীরেন বোসের স্ত্রী সুনয়না বোসের এই শান্ত ও সুন্দর রক্তমাংসের এক ভয়ঙ্কর অনাচারের তদন্ত করে যেন সংসারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেছে এই চিঠি। কিন্তু একটিও মিথ্যে কথা বলেছে কি? একটিও না। একটুও বাড়িয়ে লেখেনি খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতিবাবু ; সুনয়না বোসের চরিত্র একটা অভিশাপ মাত্র। নিশীথ রায়ের জীবনকে ক্লেদাক্ত করেছে সুনয়নার নিঃশ্বাসের গোপন দুঃসাহস।

কিন্তু কী আশ্চর্য, সুনয়নার শান্ত ও গম্ভীর মুখের উপর একটা ক্ষীণ হাসির রেখা যেন দূর প্রদীপের আলোর মত মিটমিট করে। তারপরেই আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সোফার কাছে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে ধীরেনের মাথায় হাত রাখে সুনয়না।

ধীরেন বোসের নেশাক্ত চোখের বিস্ময়কে আবার নতুন করে চমকে ওঠবার সুযোগ দেয় না সুনয়না। এক হাতে ধীরেনের মাথা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। ধীরেনের মাথার উপর নিজেরও মাথাটাকে কাত করে পেতে দেয় ; আর, ধীরেনের কপালে হাত বোলাতে থাকে। তারপর...

তারপর বোধ হয় একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল ধীরেন বোসের অলস সত্তাটাই। যখন হঠাৎ চোখ মেলে তাকায় ধীরেন তখন বুঝতে পারে, অনেকক্ষণ হল চলে গিয়েছে সুনয়না। দেয়ালঘড়ির কাঁটা রাত ন'টার ঘর পার হয়ে গিয়েছে ; শুধু টিকটিক করে বাজছে ঘরের শূন্যতা।

সোফা থেকে নামে ধীরেন। চটি পায়ে দিতে ভুলে যায়। বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ধীরেন। যেন সুনয়নাকে কী একটা কথা বলবার ছিল ; এবং সে কথা না শুনেই চলে গিয়েছে সুনয়না।

ঘুমিয়ে পড়েছে কি সুনয়না? ঘর থেকে বের হয়ে এবং বারান্দা পার হয়ে সুনয়নার ঘরের ভিতর ঢোকে ধীরেন বোস। হ্যাঁ ঠিকই সন্দেহ করেছিল ধীরেন। ঘুমিয়ে পড়েছে সুনয়না। কিন্তু বিছানার উপরে নয়। একটা চেয়ারের উপর, একেবারে নিঝুম হয়ে বসে আছে সুনয়না, মাথাটা যেন দুর্ভর ক্লান্তির ঘোরে একদিকে কাত হয়ে আছে। চোখ দুটো কুঁচকে আছে ; আর চোখের কোলের সিক্ত কাজল কাদা হয়ে রয়েছে।

সুনয়নার হাতে ছোট একটা শিশি। কোলের উপর ছোট হাত-ব্যাগটা হাঁ করে পড়ে আছে।

হাত বাড়িয়ে সুনয়নার হাতের শিশিটাকে আস্তে আস্তে তুলে নেয় ধীরেন।

চমকে ওঠে, চোখ মেলে তাকায় সুনয়না, আর শিশিসুদ্ধ ধীরেনের হাতটাকে চেপে ধরে।

হেসে ফেলে ধীরেন।--এটা আমারই দরকার ; তোমার দরকার নয়।

--ছিঃ! শিশিটা কাড়বার চেষ্টা করে সুনয়না।

ধীরেন হাসে—তা হয় না সুনয়না। আমাকে যেতে দাও।

—কিন্তু তাতে কি আমার যাওয়া তুমি আটকাতে পারবে?

—তা জানি না। তোমার যাবার ইচ্ছে থাকলে যেয়ো ; কিন্তু আমাকে আগেই যেতে হবে।

আরও শক্ত করে, দু হাত দিয়ে ধীরেনের হাতটাকে যেন খিমচে ধরে সুনয়না।—একটা দয়া করবে?

—বলো।

—তোমার পায়ে পড়ি ; আমাকে আগে যেতে দাও।

সত্যিই, সুনয়না যেন একটা দুর্বার আনন্দের জ্বালায় হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ; আর ধীরেন বোসের চটিহীন পা দুটোর উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে, সেই হাত মাথায় ছুঁইয়ে, আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ায় সুনয়না।

ধীরেন তবু অবিকার ও অবিচল।—তা হয় না, সুনয়না। বড় জোর...

কী?

—বড় জোর এই বিষ দু ভাগ করে, দুজনে এক সঙ্গেই...

চেঁচিয়ে ওঠে সুনয়না।—ঠিক, ঠিক বলেছ। তবে আর দেরি করো না লক্ষ্মীটি ; দয়া করে আমার পাশে বসো।...এসো...

আয়না-টেবিলের উপর থেকে ছোট একটা গেলাস হাতে তুলে নিয়ে সুনয়নারই সঙ্গে এক চেয়ারের উপর বসে ধীরেন বোস। শিশির ভিতরে যে শান্ত ও সুন্দর ক্ষমার মধুরতা তরল হয়ে টলটল করছে, সে মধুরতাকে গেলাসে ঢেলে দু ভাগ করে ধীরেন।

সুনয়নার হাতে শিশিটা, আর ধীরেনের হাতে ছোট গেলাস। সুনয়নার মুখের দিকে তাকায় ধীরেন।

—কী বলছ?

—মনে কোনও দুঃখ নেই তো সুনয়না?

—না।

—কোনও রাগ?

—একটুও না। কিন্তু তুমি?

—কী?

—আমার উপর কোনও ঘেন্না...

—ছিঃ।

—তবে?

সুনয়নার ঠোঁট দুটো যেন বিপুল পিপাসার আবেগে থরথর করে কাঁপছে। যাবার আগে একটা চরম স্পর্শের স্বাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় সুনয়না।

এক হাতে সুনয়নার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নেয় ধীরেন, সুনয়নার দুই ঠোঁটের সেই শিহরিত পিপাসার দিকে লোভীর মত তাকায়। নিশ্চিন্ত হতে চায় ধীরেনও। এবং বুঝে নিতে চায়, শেষ পর্যন্ত ভালবেসেই চলে যাওয়া গেল। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?

শেষ চুমোর তপ্ততা যেন শান্ত হতে চায় না। বিষের ছোঁয়া বরণ করে ভিন্ন আর ছিন্ন হবার আগে দুটি জীবনের ক্ষত যেন মিলনের উৎসবে বিহ্বল হয়ে উঠেছে।

বাইরে ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে সময়ের শব্দটা যেন আচমকা ঝঙ্কারের মত বেজে ওঠে। ধীরেন বলে—আমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে, সুনয়না। বুকের ভেতরটা কেমন যেন হাঁসফাঁস করছে।

—কেন?

ধীরেনের দু চোখ থেকে ঝরঝর করে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে থাকে।—এভাবে গলাগলি হয়ে দুজনে মরে না গিয়ে এভাবে বেঁচে থাকলে ক্ষতি কী হত, সুনয়না!

—কী বললে? মুখ তুলে ধীরেনের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সুনয়নার হাতের শিশিটা যেন পিছলে পড়ে যেতে চায়।

—এভাবে দুজনের বেঁচে থাকার সাধ্য কি হবে না?

—খুব সাধ্য হবে।

ধীরেনের হাত থেকে গেলাসটা কেড়ে নিয়ে, গেলাস আর শিশি, দুটি বস্তুকেই একসঙ্গে আঁকড়ে ধরে জানালার বাইরে ছুঁড়ে দেয় সুনয়না।

সুনয়নাকে নিয়ে গাড়িটা সড়কের লাল ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ফটকের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতিভা। প্রতিভার মনের ভাবনাগুলিকে যেন একটা দুরন্ত হেঁয়ালির মধ্যে ফেলে রেখে, আর নিজের জীবনটাকে সব হেঁয়ালির গ্রাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, একেবারে হালকা হয়ে চলে গেল সুনয়না।

ভয় পেয়েছে কি সুনয়না? কিন্তু কই, সুনয়নার চোখে তো ভয়ের কোনও ছায়া দেখা গেল না। ভয় পেলে কি মানুষের মুখ অমন শান্ত ও সুন্দর হাসিতে ছেয়ে যেতে পারে?

তবে কি হার মেনে, হতাশ হয়ে আর ক্লান্ত হয়ে নিজের জীবনের একটা বিদ্রূপের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ছটফটিয়ে পালিয়ে গেল সুনয়না?

তাও যে মনে হয় না। যার বুকের ভিতরে আক্রোশের জ্বালা থাকে, বিফল স্বপ্নের অভিমান থাকে, কিংবা ব্যর্থ অহংকারের বেদনা থাকে, সে কি এমন করে খুশি হয়ে, শুভ ইচ্ছার উপহার দিয়ে আর অবাধ প্রীতি জানিয়ে চলে যেতে পারে?

তবে কি একটা জয়ের আনন্দে আকুল হয়ে চলে গেল সুনয়না?

ফটকের কাছ থেকে সরে আসে ; আস্তে আস্তে হেঁটে আবার ঘরের দিকে ফিরে যায় প্রতিভা। এবং বারান্দার উপর উঠে চেয়ারের উপর বসে পড়তেই আশ্চর্য হয়ে নিজেরই চোখের উপর হাত বোলায় প্রতিভা। ভিজে গিয়েছে চোখ দুটো। কিন্তু বুঝতে পারে না, কার জন্য এবং কিসের মায়ায় চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল?

কার জন্য দুঃখ হয়? সুনয়নার জন্যই বোধ হয়। কিন্তু নিশীথের মুখটাও মনে পড়ছে কেন? সে বেচারার বুকের ভিতরে কোনও বেদনা চিরকালের আক্ষেপ হয়ে লুকিয়ে রইল না তো?

বুঝতে কি আর কিছু বাকি আছে? কেন এসেছিল সুনয়না, এই প্রশ্ন প্রতিভার কাছে এখন আর না-বোঝবার মত কোনও রহস্য নয়। কিন্তু সুনয়না যে সেই রহস্যকে ছিন্নভিন্ন করে, একেবারে ধুলো করে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সুনয়নার চোখের সেই হাসির ছায়াটা যেন প্রতিভার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই দপ করে হেসে উঠল আর নিবে গেল। তবে কি প্রতিভারই জীবনের উপর করুণা করেছে সুনয়না?

হয়ত তাই। কিন্তু শুধু তাই নয়। কালিকা মাইনসের ম্যানেজার নিশীথ রায়ের জীবনেরও উপর সুনয়নার মায়া হঠাৎ খুশি হয়ে হেসে ওঠেনি কি? এবং এই মায়া কি নিতান্তই মায়া? কিংবা...

প্রতিভার ভাবনাটা ভুল করেনি বোধ হয়। নিশীথ রায়কে সত্যিই ভালবেসেছে সুনয়না। তা না হলে, নিশীথ রায়ের জীবনের ঘরে প্রতিভাকে দেখতে পেয়ে এত খুশি হয়ে উঠবে কেন সুনয়না? যেখানে আঘাত হানবার সুযোগ ছিল, আঘাত হানা উচিত ছিল, সেখানে সান্ত্বনা দিয়ে আর সাহস দিয়ে, এবং যেন নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল সুনয়না। সুনয়নার মুখটা

মনে পড়লে প্রতিভার মাথাটা আস্তে আস্তে হেঁট হয়ে যায়।

কালিকাপুরের শালবনের ছায়াময় কালো চেহারা আর দূরের পাহাড়ের চেহারা হঠাৎ বদলে গিয়েছে মনে হয়। দেখতে পায় প্রতিভা, যেন হেসে ঢলঢল করছে চারিদিকের মাঠ, পাহাড় আর শালবন। সন্ধ্যা হতেই পুবের আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ নিশ্চয়।

বারান্দার আলো দপ করে জ্বলে ওঠে। বেয়ারাটা এসে সুইচ টিপছে। প্রতিভার হাতের কাছে একটা চিঠি দিয়ে চলে যায় বেয়ারা।

রাজপোখরার চিঠি ঃ শিবদাসবাবু লিখেছেন। চিঠির লেখা পড়তে পড়তে প্রতিভার চোখ দুটো আবার জলে ভরে যায়। চিঠির কথাগুলি যেন একটা ছোট ছেলের কান্নাহাসির মত করুণ-মধুর যত কথা। বোঝা যায়, চিঠি লিখতে লিখতে শিবদাস দত্তের চোখ দুটো বার বার কেঁদেছে আর হেসেছে ঃ ভাল আছিস তো মা? আমার যে এখুনি ছুটে গিয়ে তোকে একবার কোলে নিতে ইচ্ছে করছে।...নিশীথ ভাল আছে তো?...কোনও ভাবনা করিস না, প্রতিভা...মানুষের মিথ্যে কথা শেষ পর্যন্ত কারও ক্ষতি করতে পারে না।

চিঠির শেষ লাইনে একটি কথা লিখেছেন শিবদাস দত্ত, একটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু শিবদাস দত্তের এই আক্ষেপের ভাষা যেন একটা প্রাণখোলা হাসির প্রতিধ্বনি।—শীতলবাবু একটা অদ্ভুত কথা বললেন ঃ বেচারা নিশীথের চরিত্রের নানারকম অপবাদ করে একটা ভয়ানক বাজে চিঠি বিভূতিই লিখেছে। আমি সে চিঠি পড়েছি আর বার বার হেসেছি।

প্রতিভার চোখে-মুখে যেন একটা হঠাৎ প্রসন্নতার দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে। বিভূতি, খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সেই বিভূতি, লোহার মত কঠিন যার চরিত্রের শুদ্ধতা, সেই ভদ্রলোকই তা হলে শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতার জীবনকে কলুষের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়েছে।

হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় প্রতিভা। সুইচ টিপে বারান্দার আলো নিবিয়ে দেয়, আর ছাদের আলোতে ঢলঢল করছে কালিকাপুরের মাঠ পাহাড় আর শালবনের যে শোভা, তারই দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিভূতিকে যে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে। জানে না বিভূতি, এখন কল্পনাও করতে পারছে না বিভূতি, প্রতিভার জীবনের কত বড় উপকার সে করে ফেলেছে। বিভূতির চিঠি অলক্তকের উৎসবের আলপনা মুছে দিয়েছিল বলেই না প্রতিভা আজ নিশীথ রায়ের ভালবাসার এই ঘরে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে।

যেন প্রতিভার মুখের ভিতর থেকে হাসিটা বার বার উথলে উঠছে। ভাগ্য ভাল প্রতিভার, প্রতিভাকে ঘৃণা করেছিল বিভূতি। আরও ভাগ্য, নিশীথকেও ঘৃণা করে বিভূতি। তা না হলে, আজ যে শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতা এই বাড়ির এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কালিকাপুরের পূর্ণিমা-চাঁদের আলোতে ঢলঢল ওই শালবন আর পাহাড়ের শোভা দু চোখে ভরে দেখত।

ফটকের কাছে গাড়ির শব্দ। দেখতে পায় প্রতিভা, হ্যাঁ, নিশীথেরই গাড়ি। গাড়ির হেড-লাইট জ্বলছে না। নিশীথের গাড়িটাও যেন এই জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা গায়ে মেখে আস্তে আস্তে হেসে গড়িয়ে বাড়ি ফিরছে।

বারান্দার উপর উঠে আশ্চর্য হয় নিশীথ।—তুমি কি আমার আসতে দেরি দেখে...

প্রতিভা হাসে।—না, তোমার আসতে দেরি দেখে ভাবনা করব আমি সে মেয়ে নই।

নিশীথও হাসে।—এতটা তুচ্ছ করো না, প্রতিভা!

নিশীথের কাছে এগিয়ে গিয়ে, নিশীথের গলা দু হাতে জড়িয়ে হেসে ওঠে প্রতিভা।—বাবার চিঠি এসেছে।

—তাই বলো। সেজন্য এত খুশি।

—শুধু সেজন্য নয়।

—তবে?

—মনে পড়ল, তোমার বন্ধু বিভূতিবাবু বড় উপকারী মানুষ।

নিশীথ হাসে—হ্যাঁ, বিভূতি বেচারা আমার একটা উপকার করেছে, স্বীকার করতেই হবে।

—তার মানে?

—বিভূতি তোমাকে ঘেন্না করতে পেরেছিল বলেই না আমি আজ...

প্রতিভার মাথায় হাত বুলিয়ে নিশীথ মুগ্ধ হয়ে বলে—আজ তোমাকে এখানে চোখের এত কাছে দেখতে পাচ্ছি।

—বিভূতিবাবু কি তোমাকে শ্রদ্ধা করে?

—তা জানি না। তবে অশ্রদ্ধাই বা করবে কেন?

সুইচ টিপে আলো জ্বেলেই নিশীথের হাতের কাছে শিবদাস দত্তের চিঠিটা এগিয়ে দেয় প্রতিভা।

চিঠি পড়েই হো-হো করে হেসে ওঠে নিশীথ।—বিভূতিটার মাথা খারাপ।...যাই হোক বিভূতির কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

—কেন?

—বেচারা চেষ্টা করে শীতলবাবু আর তাঁর মেয়ের উপকার করবার জন্য এভাবে অলক্তকের উৎসবটা ভেঙে দিতে পেরেছে বলেই তো তোমাকে...

প্রতিভাকে বুকের কাছে টেনে নেয় নিশীথ। আস্তে আস্তে ফিসফিস করে প্রতিভার কানের কাছে যেন জীবনের একটা সৌভাগ্যের আর তৃপ্তির গুঞ্জরণ শোনাতে থাকে, ভালই করেছে বিভূতি।

—একটা কথা...

—কী?

—শীতলবাবুর কাছে তোমার নামে এরকম অপবাদের চিঠি দিয়েও বিভূতিবাবু ফুল উপহার পাঠিয়েছিল কেন?

—ফুল? ও, হ্যাঁ...মনে পড়েছে, একঝুড়ি ফুল পাঠিয়েছিল বিভূতি।

—কেন?

—এটাও বিভূতির একটা অভ্যাস, একটা স্টাইলও বলতে পার। চিরকাল বিভূতিকে তো এইরকম নানা কাণ্ড করতে দেখছি।

—তার মানে?

—তার মানে, বেচারা মিছেমিছি নানারকম কাণ্ড করে ফেলে। যা না করলেও চলে, তাও করে।

—কিছুই বুঝতে পারছি না।

—যেমন ধরো ; বি-এস্‌সি পরীক্ষাতে যে কাণ্ডটা করেছিল বিভূতি। পরীক্ষার হলে বসে অমন বেপরোয়া হয়ে, এত বড় একটা বই আলোয়ানের আড়ালে রেখে, গার্ডের চোখে ধুলো দিয়ে...ওভাবে দশ-বারোটা নম্বর বেশি পাওয়ার জন্য...না, কোনও দরকার ছিল না। তবু...

—এইবার বুঝলাম।

—ওর চাকরিটার কথাই ধরো না কেন। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সাহেব-মালিক বিভূতির সেই চমৎকার চালাকিটা ধরতেই পারেনি। নইলে আমাদের ত্রিপুরারি সেনের মত এত যোগ্য ক্যান্‌ডিডেটকে বাদ দিয়ে বিভূতিকে চিফ সুপারভাইজার করবে কেন?

—সেটা আবার কী ব্যাপার?

—ত্রিপুরারি সেনকেই চিফ সুপারভাইজার করা হবে, খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিলাতি

মালিকেরা একরকম সিদ্ধান্ত করেই ফেলেছিলেন ; বিভূতিও ওই কাজের জন্যে দরখাস্ত করেছিল ; কিন্তু বিভূতির চেয়ে ত্রিপুরারি দশগুণ বেশি কোয়ালিফায়েড। ওই কাজ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই বিভূতির পক্ষে ছিল না, কিন্তু বিভূতি দমবার পাত্র নয়। বিভূতি এক পুলিস অফিসারকে বেশ কিছু টাকা খাইয়ে ত্রিপুরারির নামে একটা খারাপ রিপোর্ট করিয়েছিল যে, ত্রিপুরারি আগে রেভল্যুশনারি দলে ছিল, এবং এখনও হাড়ে-হাড়ে অ্যান্টি-ব্রিটিশ। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের ডিরেক্টর-বোর্ড এই রিপোর্ট পেয়েই ত্রিপুরারির সম্পর্কে সাবধান হয়ে গেল। কাজটা পেয়ে গেল বিভূতি।

—চমৎকার ব্যাপার।

—টাকা-পয়সার ব্যাপারেও বিভূতির এরকম খেয়াল আছে ; যা না করলেও চলে, তাই করবে।

—কী রকম।

—বিভূতি বেশ বড়লোকের ছেলে। চাকরি-বাকরি না করলেও ওর চলে যাবে, কোনও অভাবেই পড়তে হবে না। কিন্তু টাকার ওপর বিভূতির বড় মায়া। কোনও চ্যারিটিতে কোনওদিন একপয়সা চাঁদা দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, কারও কাছে ধার স্বীকার করে না বিভূতি।

—তার মানে?

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ।—কারও কাছ থেকে টাকা বা কোনও জিনিস ধার নিলে সেটা মনেই রাখতে পারে না বিভূতি ; এমনই ভুলো মন। গালুডির চৌহানবাবুর সঙ্গে বিভূতির একবার কলকাতার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। আলিপুরে একটা বাড়ি কেনবার জন্য সেদিন পাঁচ হাজার টাকা বায়না করবে বলে ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গিয়েছিল বিভূতি। কিন্তু ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। অগত্যা চৌহানবাবুর কাছে থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়েছিল। চৌহানবাবু কোনও রসিদ চাননি, আর বিভূতিও দেয়নি। বাস্...তারপর এই তো পুরো তিনটি বছর পার হয়ে গিয়েছে, বিভূতি এখনও মনে করতে পারছে না যে, চৌহানবাবুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। চৌহানবাবু বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন।

—আরও চমৎকার ব্যাপার।

—বিভূতির এসব কাণ্ড দেখতে ভাল লাগে না ঠিকই, এরকম কাণ্ড করা উচিতও নয়, কিন্তু একটি বিষয়ে বিভূতির প্রশংসা না করে পারি না।

—কী?

—সেটা তুমিও শুনেছ। বিভূতির চরিত্র নিখুঁত ; বিভূতি আমার বিশ বছরের চেনা বন্ধু ; কিন্তু শতমুখে স্বীকার করব, জীবনে সেরকম কোনও ভুল করেনি বিভূতি, যে ভুল...

—কী?

নিশীথ গম্ভীর নয়, এবং গম্ভীর মুখটা ধীরে ধীরে করুণ হয়ে উঠতে থাকে।—যে ভুল আমি করেছি।

প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমার আড়ালে চোখের তারাদুটো যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে জ্বলে ওঠে।—তুমি কোনও ভুল করোনি, নিশীথ!

—কী বললে?

—আমিও কোনও ভুল করিনি। আমি চেঁচিয়ে গর্ব করে বলছি, নিশীথ, তোমার আমার ওই ভুলকেও আমি নমস্কার করতে পারি, কিন্তু তোমার বন্ধু বিভূতির চরিত্রকে ঘেন্না করতেও ঘেন্না হয়।

—বিভূতির উপর খুব রাগ করছ বলে মনে হচ্ছে।

নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে এইবার প্রতিভার চোখ দুটো সত্যিই রাগ করে ছটফট

করতে থাকে।—বড় ভুল কথা বললে নিশীথ।

—অ্যাঁ?

হেসে ফেলে প্রতিভা ; আর তেমনই ছটফট করে সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে দিয়ে নিশীথের বুকের সঙ্গে আরও নিবিড় হয়ে এলিয়ে পড়ে।—বিভূতিকে সত্যিই ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে, নিশীথ। বিভূতি তোমার যে উপকার করেছে, তার চেয়ে বড় উপকার হয় না!

—কী?

—আমাকে বিয়ে করেনি বিভূতি, এর চেয়ে বড় উপকার আমার জীবনে আর কী হতে পারে? বিভূতি বেচারা আমার মুক্তিদাতা।

সত্যিই যেন মুক্তির আনন্দে উচ্ছল একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে প্রতিভা।

নিশীথের নিঃশ্বাস হঠাৎ যেন কেঁপে ওঠে, আমাকে মুক্তি পেতে হবে—

হেসে ওঠে প্রতিভা ; এবং নিশীথও প্রতিভার চমকে-ওঠা বুকের শিহরটুকু অনুভব করতে পারে। নিশীথ বলে—কিন্তু তুমি সেজন্য কিছু ভেবো না, প্রতিভা। আমি কাউকে ভয় করি না; কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রতিভা বলে, আজ সন্ধ্যার একটু আগে সুনয়না এসেছিল।

চমকে ওঠে নিশীথ ; এবং বুঝতে পারে নিশীথ, তার বুকের এই টিপটিপ শব্দ, ভীরুতার এই আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে প্রতিভা।

নিশীথের হাত ধরে প্রতিভা।—চলো ঘরের ভিতরে গিয়ে বসি।

ঘরের ভিতরে না গিয়ে, দু পা এগিয়ে গিয়ে বারান্দার চেয়ারের উপর ক্লান্তভাবে বসে পড়ে নিশীথ। চেয়ারের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিভা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর, যেন বুকের ভিতরের ভীরু নিঃশ্বাসগুলির সঙ্গে মনে মনে সংগ্রাম করে আরও ক্লান্ত হয়ে যাবার পর, আস্তে একটা হাত তুলে প্রতিভার হাত ধরে নিশীথ।—তোমাকে অপমান করেনি তো সুনয়না?

—না।

—আমাকে অপমান করে গিয়েছে বোধ হয়?

—না।

—কেন? আমাকে অপমান করা ছাড়া সুনয়নার তো এখানে আসবার কোনও দরকার হতে পারে না।

—তা জানি না।...কিন্তু সুনয়না তোমাকে গালুডিতে গিয়ে চা খেয়ে আসবার নেমন্তন্ন করে গিয়েছে।

—দুঃসাহস।

—প্রতিভা হাসে—কার দুঃসাহস?

—সুনয়নার ; আমাকে গালুডিতে গিয়ে চা খেতে নেমন্তন্ন করা যে তোমাকে অপমান করা।

—আমাকেও নেমন্তন্ন করেছে সুনয়না।

—সে কী! আশ্চর্য হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ।—তোমাকে নেমন্তন্ন করে কেন? তোমাকে চেনে না কি সুনয়না?

—হ্যাঁ। সুনয়না যে আমার অনেকদিন আগের চেনা বন্ধু।

—তাই বলো, বন্ধু বলেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে নেমন্তন্ন করে ফেলেছে। নইলে...

—কী?

—নইলে আমার সামনে তোমাকে, আর তোমার সামনে আমাকে অপমান না করে খুশি হত না সুনয়না।

—সুনয়নাকে এরকম ভয়ানক মানুষ বলে মনে করছ কেন?

—জানি বলেই মনে করছি। তুমি কিছুই জান না।

—কিন্তু আমাকে বন্ধু বলে নেমন্তন্ন করেনি সুনয়না।

—তবে?

—তোমার স্ত্রী বলে।

—অসম্ভব।

—বিশ্বাস করো, নিশীথ। সুনয়না খুব খুশি হয়েছে।

—কিসে খুশি হল?

—আমাকে এখানে দেখতে পেয়েছে বলে।

—বুঝলাম না প্রতিভা।

—বুঝতে পার না কেন নিশীথ? আমাকে যে চেনে জানে, আমার ভুল নিজের চোখে দেখেছে সুনয়না ; আমার জন্যে একদিন কেঁদে ফেলেছিল সুনয়না।

বলতে বলতে মাথা হেঁট করে প্রতিভা। এবং প্রতিভার সেই হেঁটমাথা-মূর্তির দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে নিশীথ। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসে প্রতিভার চোখে হাত দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ—ছিঃ, প্রতিভা! সেজন্য সুনয়নাকে ভয় করবার কোনও দরকার হয় না।

—সুনয়নাকে ভয় করছি না, নিশীথ। ভয় করছি নিজেকে।

—কেন?

—সহ্য করতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না।

যেন প্রতিভার জীবনের পথে একটা অতি নিষ্ঠুর পরীক্ষার আসন্নতার ছায়া দেখতে পেয়েছে প্রতিভা। সেই পরীক্ষার কাছে পরাভব যেন মানতে না হয় ; তারই জন্য প্রাণের ভিতরে একটা প্রতিজ্ঞার জোর ভরে রাখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে প্রতিভা।

—কী সহ্য করতে হবে বলে ভাবছ, প্রতিভা?

—তোমার কথা শুনে কোনও লাভ নেই, ক্ষতিও নেই, নিশীথ। জিজ্ঞাসা করো না।

—আমি বলতে পারি।

—প্রতিভা হাসে।—তবে বলো।

—ভাবছ, সুনয়না যদি আমাকে আবার...অসম্ভব ; আমি আত্মহত্যা করতে পারব, তবু সুনয়নার ছায়ার কাছেও আমি আর দাঁড়াতে পারব না।

—কিন্তু যদি বুঝতে পার যে, সুনয়না তোমাকে ভালবাসে? তবে?

—হেসে ফেলে নিশীথ।—যদি পশ্চিমে সূর্য ওঠে, তবে?...তোমার প্রশ্নটারই কোনও অর্থ হয় না, প্রতিভা। সুনয়নার মত মানুষ ওসবের ধার ধারে না। সুনয়না একটা বেপরোয়া উৎপাত মাত্র। মানুষকে নিজের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দেওয়াই ওর প্রাণের একটা আনন্দ।

প্রতিভা হাসে।—কিন্তু যদি সত্যিই সুনয়না তোমাকে ভালবেসেছে বলে তুমি বুঝতে পার, তবে...

—যদি একটা কাল্পনিক ঘটনা বলে সেটা মেনেই নিই, তবু তাতেও কিছু আসে-যায় না। নিশীথ রায় সুনয়নাকে কোনওদিন ভালবাসেনি, ভালবাসতেও যাবে না। তুমি মিছিমিছি...

—না আমিও সেজন্য ভাবি না। সুনয়না যদি তোমাকে ভালবাসে, তবে আটকাবে কে? আর সেটা তোমার দোষই বা হবে কেন? কিন্তু...

—আর কিন্তু কেন? কোনও কিন্তু নেই।

—যাই হোক ; তা হলে গালুডিতে গিয়ে সুনয়নার বাড়িতে চা খেয়ে আসি চলো।

-আমি যাব না।

—আমি যাব কি?

—সেটা তোমার ইচ্ছে। আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে, তুমি যাও।

—কিন্তু তুমি না গেলে, শুধু আমি একা গেলে সুনয়নাকে অপমান করা হয় নাকি?

—আমার জীবনের মানের উপর কোনও দরদ আছে সুনয়নার যে আমাকে ওর মান-অপমানের কথা ভাবতে হবে?

—আছে।

—কী? ভ্রূকুটি করে তাকায় নিশীথ।

—সুনয়না বলতে গেলে আমাদেরই দুজনের কথা ভেবে অনেক কথা বলেছে।

—কী কথা?

—তোমার সঙ্গে রোজ বেড়াবার কথা।

—তার মানে?

—হ্যাঁ, সুনয়না একটা ঝি পাঠিয়ে দেবে বলে গিয়েছে ; খুব ভাল কাজ জানে ঝিটা ; আমাকে কোনও ঝঞ্ঝাট সইতে হবে না।

বারান্দার আলো জ্বালিয়ে প্রতিভার মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে নিশীথ। যেন দেখতে চায় নিশীথ, প্রতিভার চোখ দুটো হঠাৎ ঠাট্টার আবেগে হাসছে না তো? নইলে এসব আবোল-তাবোল কথা বলে কী লাভ হচ্ছে প্রতিভার?

প্রতিভা বলে—সুনয়নার ইচ্ছে, এই ঘরের ভিতরে কোনও চেয়ার-টেবিল থাকবে না। এই ঘরটা শুধু আমার জন্য একটা নিরিবিলি ঘর হবে।

—সুনয়নার এসব কথা বলে লাভ কী?

—সুনয়না তোমার ভাল চায়।

—আমার ভাল চেয়েই বা সুনয়নার লাভ কী?

—সুনয়না তোমাকে ভালবাসে।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় নিশীথ। এবং অনেকক্ষণ পার হয়ে যাবার পরেও যখন কথা বলে না নিশীথ, তখন প্রতিভাই কথা বলে—তা হলে চলো।

—আজ এত রাতে কেমন করে যাব? আজ নয়।

—কবে যাবে?

—একদিন যাওয়া যাবে।

—কিন্তু সুনয়না যাবার সময় বিশেষ একটি অনুরোধ করে গিয়েছে।

—কী?

—যেন কালই আমরা যাই। যেন দেরি না করি।

—কী? নিশীথের চোখ দুটো যেন একটা বিভীষিকার ছায়া দেখে চমকে উঠেছে।

—হ্যাঁ, কালই একবার গালুডি যাবার জন্য চেষ্টা করতে বলে গিয়েছে সুনয়না, নইলে...

—নইলে কী?

—সে কথা বলেনি সুনয়না।

হাত বাড়িয়ে প্রতিভার একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নিশীথ—প্রতিভা।

—বলো।

—সুনয়না বোধ হয়...আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে, প্রতিভা ; সুনয়না যেন ভয়ানক কিছু করবে বলে মনে হচ্ছে—

—কেমন করে বুঝলে?

সে মানুষ এরকম ভাষায় কথা বলে না। কোনওদিন বলেনি। এ ভাষা সুনয়নার মুখে একেবারে নতুন ভাষা। সুনয়না বোধ হ য় চিরকালের মত সরে যাবার মতলব করেছে।

—কোথায় সরে যাবে?

ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ—তুমি বড় ভুল করেছ, প্রতিভা।

প্রতিভার মুখ করুণ হয়ে যায়—কী ভুল করলাম?

—তুমি সুনয়নার কথার অর্থ বুঝতে পারনি। ছি-ছি, আমাকে তখনই যদি একবার খবর পাঠাতে।

—তবে কী হত?

—তবে সুনয়নাকে আটকে রাখতাম।

—আটকে রেখে কী লাভ হত?

—আঃ, একটা মানুষ নিজেকে সহ্য করতে না পেরে প্রাণটারই ইতি করে দিতে চায়, তাকে আটকে রেখে দুটো ভাল কথা বলে সান্ত্বনা দিয়ে, তাকে তো বুঝিয়ে দিতে পারা যেত যে, না এরকম হতাশ হতে নেই। সুখী হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার তোমারও আছে।

—আমি এতটা ভাবতে পারিনি নিশীথ ; সুনয়নার কথা শুনে একটা খটকা লেগেছিল, এই মাত্র।

চুপ করে বাইরের পৃথিবীর জ্যোৎস্নাসিক্ত বিহ্বল শোভার দিকে তাকিয়ে নিশীথের চোখ দুটো যেন ধীরে ধীরে সজল হয়ে উঠতে থাকে। আনমনার মত, যেন ভাঙা-ভাঙা নিশ্বাসের বেদনার শব্দ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে অস্ফুটস্বর এক-একটা কথা বলে নিশীথ।—রাত হয়ে গিয়েছে...কিন্তু এখনই একবার...এমন কিছু দূর নয় গালুডি—গেলে ভাল হত।

হঠাৎ প্রতিভার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে নিশীথ।—ও কি! তুমি আবার এ কী কাণ্ড করেছ, প্রতিভা?

দেখেছে নিশীথ, এক হাতে কপাল টিপে চুপ করে চেয়ারের উপর বসে আছে প্রতিভা। আর, দু চোখের দুই কোণে বড় বড় জলের ফোঁটা টলমল করছে।

প্রতিভা হাসে।—ঠিক আছে। তুমি যা বলছ, সবই শুনছি ; সব সহ্য করতে পারছি ; তুমি দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবে না।

—তুমি কি আমার কথায় দুঃখ পেলে?

—না। মানুষের জন্য মানুষের মনে মায়া থাকবে, এতে আশ্চর্য হব কেন, সহ্য করতেই বা পারব না কেন?

—আমার সত্যিই যে বড় কষ্ট হচ্ছে, প্রতিভা।

—সুনয়নার জন্য নিশ্চয়?

—হ্যাঁ।

—আমারও কষ্ট হচ্ছে, নিশীথ, বিশ্বাস করো।

—তুমি আমাকে ভুল বুঝলে না তো?

—একটুও না। তোমাকে ভাল করে চিনতে পারলাম।

—তাই কি কষ্ট পাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—আমাকে সন্দেহ হয়?

—না, সন্দেহ নয়। তোমাকে বিশ্বাস করি।

—কী?

—সুনয়নাকে আজ ভাবতে তোমার ভাল লাগছে।

—সত্যি কথা। মনে হচ্ছে, সুনয়নার কাছে যেন ছোট হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে, সুনয়নাকে ভুল বুঝেছিলাম। বুঝতে পারছি, সুনয়নার অনেক ক্ষতি করেছি। সুনয়না সুখী না হলে আমি...আমরা সুখী হতে পারব কিনা, বুঝতে পারছি না, প্রতিভা।

নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিভার চোখ দুটো ক্ষীণ দীপের শিখার মত করুণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলে। জীবনের সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষাটাকে সহ্য করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে প্রতিভা।

এগিয়ে এসে প্রতিভার কাঁধের উপর মাথার ভার এলিয়ে দিয়ে ছটফট করে ওঠে নিশীথ। —তোমার কাছেই পরামর্শ চাইছি, প্রতিভা। একটা উপায় বলে দাও।

—এই রাতটা কেটে যাক, তারপর চলো গালুড়ি যাই।

—কিন্তু গালুড়ি গিয়ে যদি দেখতে পাই যে,...না, সে রকম কিছু ঘটে যাবে না, কী বলো, প্রতিভা? সুনয়না নিজেই যখন কালকে যেতে বলেছে, তখন সুনয়নাকে বিশ্বাস করা যায়, নিশ্চয় আমাদের অপেক্ষায় থাকবে সুনয়না।

—আমার তো তাই মনে হয়।

নিশীথের মাথায় হাত বোলায় প্রতিভা। নিশীথকে এভাবে আশ্বস্ত করবার অর্থ কী বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারে না প্রতিভা। শুধু বুঝতে পারে যে, নিশীথকে আশ্বস্ত করবার মত জোর আছে প্রতিভার প্রাণে, এবং হাত দুটোও অভিমানের বেদনায় দুর্বল হয়ে যায়নি।

অনেকক্ষণ পরে নিশীথের দিকে একবার তাকায়, এবং তাকাতে গিয়ে অনেকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারে না প্রতিভা। একেবারে আনমনা হয়ে গিয়েছে নিশীথ, যেন অনেক দূরের কোনও মায়ার জগতের দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার আর বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই প্রতিভার, যাকে ভয় করত তাকেই আজ মায়া করতে চায় নিশীথের মন। যাকে এতকাল ঘৃণা করে এসেছে, তাকেই ভাল লাগতে শুরু করেছে।

কিন্তু ভুল করছে কি নিশীথ? ভুল নয়, একটুও ভুল নয়। যদি এটা ভুল হয়ে থাকে তবে এটা মানুষেরই মনের ভুল। এ রকম ভুল না করলেই বোধ হয় মানুষ অমানুষ হয়ে যায়।

ঠিকই তো ; প্রতিভার মনটা যে নীরবে প্রশ্ন করে করে নিজের মনের কাছ থেকেই উত্তর আদায় করতে থাকে। আজ সুনয়নার কথা ভাবতে গিয়ে যদি হো-হো করে হেসে উঠত নিশীথ, তবে নিশীথকে একটা নিষ্ঠুর হাসির হৃদয়হীন অভিনেতার মত মনে হত না কি? এবং নিশীথের সেই হাসির শব্দ শুনে প্রতিভারই বুকের ভিতরটা ভয় পেয়ে চমকে উঠত না কি?

তাই এইটুকু বুঝতে পারছে বলেই নিশীথের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে প্রতিভার হাতটা একটুও ব্যথিত না হয়ে বরং খুশিই হয়ে ওঠে। এটা কোনও পরীক্ষা নয়।

কাল সকালে সুনয়নার চোখের কাছে গিয়ে যখন দাঁড়াবে নিশীথ, তখন, এবং তারপর যা হবে, তারই ছবি যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে প্রতিভা ; এবং বুঝতে পারছে, সেটাই তো পরীক্ষা। সহ্য করতে পারা যাবে কি?

পারা যাবে না বোধ হয়, এবং সেজন্য দুঃখ নেই।

জানবে সুনয়না, নিশীথের মন সুনয়নাকে আজ শ্রদ্ধা করে ; সুনয়নাকে ভাল লেগেছে নিশীথের ; সুনয়নাকে মহৎ বলে মনে হয়েছে নিশীথের। সুনয়নাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে নিশীথের ব্যথিত মুখটা আবেদনময় হয়ে উঠবে। তুমি কোন দুঃখে আর কেন নিজেকে ঘেন্না করবে, সুনয়না? তোমারও বেঁচে থাকবার সব অধিকার আছে।

সুনয়নাও আশ্বস্ত হয়ে বেঁচে থাকতে চাইবে। এবং তার পর? নিশীথ ও সুনয়নার এই ক্ষমাময় নতুন সম্পর্কের পাশে একটা অবান্তর ছায়ার মত প্রতিভা যদি পড়ে থাকে, তবে এই দুই বেচারার জীবনের আনন্দে বিড়ম্বনা ঘটানো হয় না কি?

মনে মনে হেসে ফেলে প্রতিভা। আর, যেন মনেরই একটা দুরন্ত ব্যাকুলতায় হঠাৎ ছটফট করে উঠেই মুখ ফিরিয়ে নেয় ; চোখ ভিজে গিয়েছে, কিন্তু মুখের উপর যেন অদ্ভুত একটা প্রতিজ্ঞার হাসি ঢলঢল করতে থাকে ; চাঁদের আলোতে ঢলঢল শাল-বনের শোভার চেয়েও

মধুর ও মায়াময় সেই হাসি।

নিশীথের জন্য চা তৈরি করতে হবে ; ব্যস্ত হয়ে ওঠবার আগে প্রতিভা শুধু মনে মনে একটা প্রার্থনা সেরে নেয়। যেন মনের এই হাসির জোরটা কাল পর্যন্ত অটুট থাকে।

কালিকাপুর থেকে গালুডি ; সকালবেলার রোদ, শালবনের হাওয়া আর সড়কের লাল ধুলোর সঙ্গে যেন ছোঁয়াছুঁয়ির আর ছুটোছুটি খেলার মত একটা খেলার আবেগে দৌড়তে থাকে নিশীথের গাড়ি। সড়কের এক বাঁক ঘোরবার সময় স্টিয়ারিং ঘোরাতে গিয়ে একটু চমকে ওঠে, এবং সাবধান হয় নিশীথ। হঠাৎ বড় বেশি আনমনা হয়ে গিয়েছিল নিশীথ, এবং গাড়ির স্পিড একটুও কমিয়ে না দিয়ে একেবারে বাঁকের কাছে চলে এসেছিল। এবং আর একটু ভুল হলেই, স্টিয়ারিং ঘোরাতে আর একটু দেরি করলেই...। না, খুব বেঁচে গিয়েছে গাড়িটা, তেঁতুলগাছটার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। আর সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলে গাছটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়িটা চুরমার হয়ে যেত।

গাড়ির সামনের সিটে নিশীথেরই পাশে বসে ছিল প্রতিভা। গাড়িটার স্পিডের মাথায় বাঁক ঘোরবার সময় প্রতিভার শান্ত চেহারাটা নিশীথের গায়ের উপর আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমটাও ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

নিশীথ লজ্জিতভাবে হাসে।—গাড়িটা খুব বেঁচে গিয়েছে, প্রতিভা। আর একটু ভুল হলেই...

চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রতিভাও হাসে।—আমার চশমাটাও বেঁচে গিয়েছে।

গাড়ির স্পিড মৃদু করে দিয়ে নিশীথ রায় যেন উদাসভাবে সামনের আকাশের দিকে তাকায়। আর প্রতিভা চোখের উপর চশমাটাকে চেপে দিয়ে পাশের শালবনের দিকে তাকায়।

দুজনেরই প্রাণ যেন ইচ্ছে করে একটা পরিণাম ভুলে যাবার জন্য চেষ্টা করছে। দুজনেই ভুলে গিয়েছে যে, শুধু গাড়িটা আর চশমাটা নয়, নিশীথ আর প্রতিভার প্রাণ দুটোও চুরমার হয়ে যেত, যদি আরও একটু বেশি রকমের আনমনা হয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাতে ভুলে যেত নিশীথ। কিন্তু সেটা যেন দুর্ঘটনা হত না ; হঠাৎ খেয়ালের আত্মহত্যার মত সে দুর্ঘটনা যেন বেঁচে যাওয়ার মত একটা সুন্দর পরিণাম হয়ে উঠত। তা হলে আর এইভাবে, এমন সুন্দর একটা সকালবেলার আলো-ছায়া, পাখির ডাকের শব্দ আর শালবনের হাওয়ার ভিতর দিয়ে ছুটে ছুটে একটি অগ্নিময় পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে হত না। অদৃষ্টের যত জটিল প্রশ্নের জ্বালা বরণ করবার জন্য, আর পাগল হয়ে যাওয়ার মত একটা বিপদের দিকে এ রকম অসহায় হয়ে দৌড়তে হত না।

না, আর বেশিক্ষণ কল্পনা করবার এবং সামনের আকাশের দিকে কিংবা পাশের শালবনের দিকে তাকিয়ে থাকবার দরকার হয়নি। রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে সামান্য কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা যখন আরও মন্থর হয়ে বাঁ দিকের পথে ঘুরে যায়, তখন একটি বাংলোবাড়ির ফটকের দু পাশের দুটি দেওদারের প্রকাণ্ড রৌদ্রাক্ত চেহারাও চোখে পড়ে যায়।

বাংলোবাড়ির ফটকের সামনে গাড়িটা থামে। আর, নিশীথ ও প্রতিভা যেন একটা নতুন বিস্ময়ের ভারে হঠাৎ অনড় হয়ে শুধু চোখ মেলে দেখতে থাকে, বাংলোবাড়ির বারান্দার উপরে যেন দুটি নতুন ধরনের সুখী মানুষ গায়ে-গায়ে মেশামেশি হয়ে হাসাহাসি করে...

কী করছে ওরা দুজনে? ধীরেন আর সুনয়না?

একটা টেবিলের কাছে চেয়ারের উপর বসে আছে ধীরেন। টেবিলের উপর একটা কাগজ। পেন্সিল হাতে নিয়ে কাগজের উপর কী যেন লিখছে ধীরেন। আর সুনয়না ধীরেনেরই চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে টেবিলের সেই কাগজটার কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলছে। কে জানে, কোনও স্বপ্নের আর কোনও আহ্লাদের জমা-খরচের হিসেব করছে ওরা দুজন?

নিশীথের গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই চেয়ার ছেড়ে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় ধীরেন ; আর, সুনয়না যেন একটা প্রবল খুশির ফোয়ারার মত হেসে ওঠে।—কী আশ্চর্য, সত্যিই তুমি আশ্চর্য করে দিলে, প্রতিভা।

ধীরেন বলে—কী সৌভাগ্য! আমিও ভাবতে পারিনি, নিশীথবাবু, আপনি নিজেই কষ্ট করে একেবারে মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে...

গাড়ি থেকে নেমে নিশীথ আর প্রতিভা এগিয়ে আসে। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে যেন এই নতুন বিস্ময়ের কুহক সহ্য করতে চেষ্টা করে বিড়বিড় করে নিশীথ।—তার মানে?

নিশীথের প্রশ্নটা যেন একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের গুঞ্জন! গালুডির এই বাংলোবাড়ির জীবনটা এ কোন ছদ্মবেশ ধরে নতুন রকমের সৌজন্য সমাদর আর প্রীতির অভিনয় শুরু করে দিয়েছে? এত হাসে কেন ওরা? এত খুশি কেন ওরা?

ধীরেন বলে...আমাদের উচিত ছিল, একদিন গিয়ে আপনাদের দুজনকে এখানে এনে, অন্তত একটু চা খেয়ে যাবার জন্য—

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সুনয়না।—থামো, থামো, তুমি অভদ্রতা করতে গিয়ে আমাকে বিপদে ফেলছ।

—কেন?

—আমি যে কালই কালিকাপুরে গিয়ে প্রতিভাকে আর নিশীথবাবুকে নেমন্তন্ন করে এসেছি।

—তাই বলো।

—নিশীথ হাসতে চেষ্টা করে।—তার মানে, নেমন্তন্ন না করলে আমরা আসতাম না?

সুনয়না হাসে।—নিশ্চয় আসতেন না।...তা ছাড়া...

—কী?

—নেমন্তন্ন করেও একটা ভয় ছিল।

—তার মানে?

—অর্থাৎ, প্রতিভা আসতে পারে বলে মনে মনে একটা বিশ্বাস ছিল ; কিন্তু াপনি আসবেন বলে বিশ্বাসই করতে পারিনি।

নিশীথ বোধ হয় আবার আরও কিছুক্ষণ আরও বেশি আশ্চর্য হয়ে সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু ধীরেনের একটা উল্লাসের ভাষা শুনে চমকে ওঠে, আর ধীরেনেই মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে নিশীথ।

ধীরেন বলে—আর এখানে নয়, নিশীথবাবু।

—কী?

—এই বাড়ি বেচে দিলাম। চৌহানবাবুই কিনে নিলেন। কালকেই বিক্রি রেজেস্টারি করা হবে।

নীরব হয়ে, আর চোখ দুটো অপলক করে, যেন প্রকাণ্ড একটা কৌতূহলের তোলপাড় শব্দ বুকের ভিতরে সামলে রেখে শুনতে থাকে নিশীথ, গালুডির ধীরেনবাবু যেন তাঁর জীবনের এক পরম জয়ের তৃপ্তি, গান করে শুনিয়ে চলেছেন।

—চৌহানবাবু দর দিয়েছে মোট ছত্রিশ হাজার টাকা। আমিও তাতেই রাজি ; এতেই আমার সব দেনা মিটিয়ে দিয়ে হাজার পাঁচেক টাকা হাতে থেকে যাবে।...বাস্, ওতেই হয়ে যাবে।...আপনি তো জানেন, একটা কোয়ারি আমার লিজ নেওয়া আছে।...সেখানে আপনিও তো একবার গিয়েছিলেন, কিসের সাল্‌ফেট না কার্বনেট খুঁজতে...হ্যাঁ, সেই গাঁয়ে, সেই করমপুরাতে গিয়ে থাকব। কিস্তিতে একটা ট্রাক কিনে নেব। তার পর, একটা বছর খেটেখুটে দু-চারটে ভাল অর্ডার যদি সাপ্লাই করতে পারি, তবে আর কী? ট্রাকের কিস্তি শোধ করে

দেব, আর কারবারটাও মোটামুটি দাঁড়িয়ে যাবে।...প্রফিট? মাসে শ-দুই টাকা হলেই হয়ে গেল। তারপর...তারপর সুনয়নার হাত। যদি রোজ মুরগিভাত খাওয়াতে পারে সুনয়না, তবে তাই খাব। যদি, ভাজা-নিমপাতা, জংলা-কুলের অম্বল আর ডাল-ভাত খাওয়ায় সুনয়না, তবে তাই খাব।...হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনার টাকাগুলো দিতে খুবই দেরি হয়ে গেল যদিও...সুনয়না বললে মোট এগারো হাজার টাকা আপনার কাছ থেকে ধার নেওয়া হয়েছে..এইবার সে টাকাটা আপনাকে অনায়াসে দিয়ে দিতে পারব।

হো-হো করে হেসে ওঠে ধীরেন। সুনয়না চুপ করে দাঁড়িয়ে আর মাথা হেঁট করে যেন একটা অদ্ভুত লাজুক-হাসি লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমার কাচও যেন ঝিক ঝিক করে হাসে। আর, নিশীথ রায়ের চোখ দুটো চিকচিক করতে করতে হঠাৎ একেবারে যেন মুগ্ধ হয়ে যায়।

প্রতিভা বলে, চা খাওয়াবার যে নামও করছ না, সুনয়না? তোমার মতলব কী?--মতলব হল, শুধু চা খাইয়ে ছাড়ব না। দুপুর না হবার আগে যেতে পারবে না, আর ভাত খেয়ে যেতে হবে।

ধীরেন বলে--আমি তা হলে এখনই একবার বাজার ঘুরে আসি। থলিটা দাও সুনয়না।

প্রতিভা হাসছে ; প্রতিভার জীবনের যত ভয় অভিমান আর উদ্বেগ কি একেবারে মিথ্যে হয়ে আর শূন্য হয়ে চৈতী ঝড়ের ধুলোর মত উধাও হয়ে গেল? প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয় নিশীথ। প্রতিভা যেন সেইসব অদ্ভুত গল্পের নায়িকার মত, যারা পরীক্ষায় জ্বলন্ত অঙ্গার মুঠো করে ধরতে একটুও ভয় পায় না, এবং পরীক্ষায় জয়ী হয়ে নিজেরই দুঃসাহসিক হাতটার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে, হাতে একটা ফোস্কাও পড়েনি, কোনও জ্বালা জ্বলে না।

ধীরেনবাবু হাসছেন। এই ভদ্রলোকের জীবনটাও যে জয়ের গর্বে হাসছে বলে মনে হয়। সুনয়নাকে সঙ্গে নিয়ে করমপুরা নামে এক জংলা গাঁয়ে থাকবেন, আর সুনয়নার হাতে রান্না ডাল-ভাত খেয়ে ধন্য হয়ে যাবেন। পরশপাথরের মত কী যেন একটা বস্তু, কী চমৎকার স্বপ্ন কুড়িয়ে পেয়েছেন ভদ্রলোক।

সুনয়নাও হাসছে। বর্ষার জলে ধোয়া হয়ে গায়ে আবার নতুন রোদ লাগিয়ে যেমন ঝলমল করে হেসে ওঠে শালবন, সেইরকম ঝলমলে সুখী হাসি। সুনয়নার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে নিজেরই চোখের চেহারাটা কল্পনা করতে পারে নিশীথ। নিশীথের চোখ ছাপিয়ে যেন অদ্ভুত এক তৃপ্তি উথলে উঠছে। হেসে হেসে প্রতিভার সঙ্গে কথা বলছে যে-সুনয়না, তার মুখের দিকে তাকাতে নিশীথ রায়ের চোখের চাহনি এত তৃপ্ত হয়ে যাবে, এ যে নিশীথ রায়ের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। নিশীথের চোখ দুটো যেন সুনয়নার মুখের দিকে একটা সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের মত তাকিয়ে আছে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ।—বাঃ, খুব কাণ্ড করলেন আপনারা।

—জাঁকিয়ে সুখের সংসার করতে দুজনে করমপুরাতে চললেন ; এদিকে কালিকাপুরের অবস্থা যে কাহিল।

—কী হল?

প্রতিভা বলে—রান্না করবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমাকে রান্না করতে দেখলে ভদ্রলোক হেসে হেসে...

—প্রতিভার রান্নাবান্নার রকম যদি আপনি দেখতেন, তবে আপনিও হাসতেন। বেগুন ভাজতে গিয়ে আগে কড়াতে বেগুন ছাড়ে, তারপর তেল।

সুনয়না হাসে।—কী আর করবে বেচারা? ওসব কাজের ধার ধারেনি কখনও, কিছু শেখেওনি ; আর, বেচারা কল্পনাও করতে পারেনি যে, রান্না করবার একটা লোকও পাওয়া

যাবে না, এমন একটা জায়গাতে এসে ওকে থাকতে হবে।

—তা হলে, আমারই অপরাধ?

ধীরেন বলে—কোনও চিন্তা করতে হবে না। চৌহানবাবুর বাড়িতে রান্না করে যে পাঁড়ে, তার ভাইটাও বেশ রান্নাবান্না জানে। আমি ওকে ঠিক করে দিচ্ছি। মাইনে পঁচিশ টাকা, খাওয়া ; আর বছরে একজোড়া ধুতি আর একজোড়া গামছা।

—একটা ঝিয়ের কথা বলেছিলাম, মনে আছে তো?

—হ্যাঁ।

—করমপুরা যাবার আগেই আমি সেই ঝিটাকে তোমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।

—না, এবার এক কাপ চা না হলে আর...

—এখনি হয়ে যাবে...এসো, প্রতিভা।

—আমি বাজার ঘুরে আসি, কেমন?

—এসো।

—আমি একবার চট করে ঘাটশিলা ঘুরে আসি।

প্রতিভা রাগ করে তাকায়।—ঘাটশিলাতে আবার কিসের কাজ?

—ঠিক কাজ নয়, একটা অনুরোধ রাখবার কাজ। যাব, শুধু আধ ঘণ্টা থাকব, আর ফিরে আসব।

সুনয়না হাসে।—যান যান। কোনও ঠিকাদারের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে আসবেন না, তা হলেই হবে।

নিশীথও হাসে।—ঘুষ খাওয়ার মত চরিত্রের জোর যদি থাকত তবে তো খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতির মত এত দিনে প্রায় লাখখানেক টাকা...থাকগে ওসব বাজে কথা।

ঘাটশিলাতে গিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে যে কাজটা সেরে দিয়ে চলে আসবে বলে মনে করেছে নিশীথ, সেটা সত্যিই কোনও কাজ নয়। কালিকা-মাইনস্-এর স্টোরবাবু রমেশের বাবা ত্রিলোচনবাবুর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ। রমেশ বার বার অনুনয় করে বলে গিয়েছে, একবার দয়া করে গরিবের বাড়িতে যাবেন স্যার।

রমেশের বাড়ি ঘাটশিলা, চাকরি করে কালিকাপুর। রমেশের বাড়ির যা অবস্থা, এবং পৈতৃক সম্পত্তি বলতে যা আছে, তাতে রমেশের চাকরি করবার কোনও দরকারই ছিল না। তবু চাকরি করে রমেশ। এবং, নিশীথ জানে, চল্লিশ টাকা মাইনে পেয়েই স্টোরবাবু রমেশ খুশি ; ধূর্ত ঠিকাদারগুলো রমেশকে খুশি করবার জন্য কতবার সেধেছে, কিন্তু রমেশ শুধু ঠিকাদারগুলোকে মুখ খুলে গালাগালি দিয়ে খুশি হয়েছে। একটাও অন্যায় পয়সা স্পর্শ করে না রমেশ। তাই বোধ হয় রমেশকে একটু বেশি পছন্দ করে নিশীথ।

ঘাটশিলা যাবার পথে গাড়িটা উদ্দাম হয়ে ছুটতে থাকে, কিন্তু নিশীথ রায়ের হাত আর কোনও ভুল করে না। অনেক কথা মনের ভিতরে তোলপাড় করতে থাকলেও আনমনা হয়ে যায় না। এবং, কেন যেন বার বার বিভূতির কথাই মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে, বিভূতির চরিত্রের বেশ সুনাম আছে। বিভূতির সেই চরিত্রের খ্যাতি জেঠামশাই পর্যন্ত শুনেছেন ; বিশ্বসুদ্ধ মানুষই বোধ হয় শুনেছে।

বিভূতির সঙ্গে একদিন তো দেখা হবেই। ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায়, আর মনে মনে একটা অস্বস্তির হাসিও হেসে ফেলে নিশীথ। নিশীথের পাশে প্রতিভাকে দেখতে পেয়ে বেচারা বিভূতির চোখ দুটো বোধ হয় শিউরে উঠবে। নিশীথকেও একটা ঘৃণার জীব বলে মনে করবে ; মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আর কোনও কথা না বলেই চলে যাবে। নিশীথের জীবনকে একটা অশুচি বিভীষিকার বিলাস বলে মনে করবে, কিংবা মনে মনে ঠাট্টা করে একটা ধিক্কারের হসি লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করবে বিভূতি। বাঃ, বেশ হয়েছে। যেমন 'দেবা'

তেমনই 'দেবী'। নিশীথের মত মানুষের সঙ্গে প্রতিভার মত নারীকেই মানায়। না প্রতিভা, না নিশীথ, দুজনের কেউই পৃথিবীর কোনও শুচিতাময় জীবনের মানুষকে ঠকাবার সুযোগ পেল না ; সাধ্যই হল না। বেশ ভাল হল। ভাবতে গিয়ে একটা নিশ্চিন্তমনে হাঁপ ছাড়বে বিভূতি।

চরিত্রহীন মানুষের প্রতি বিভূতির ঘৃণা যেমন ভয়ানক, চরিত্রশীল মানুষের প্রতি বিভূতির মায়াও তেমনই ভয়ানক। আজও মনে করতে পারে নিশীথ, নিরীহ ও নির্দোষ চরিত্রের মানুষকে আরও কতবার এইভাবে রক্ষা করেছে বিভূতি। কলেজের ছাত্র ছিল যখন বিভূতি, তখন ইংলিশের লেকচারার অমিয়বাবুকে ঠিক এইরকম একটা ভয় থেকে রক্ষা করেছিল। মঞ্জু নামে থার্ড ইয়ারের যে ছাত্রীটির সঙ্গে অমিয়বাবুর বিয়ের কথা একেবারে পাকাপাকি হয়েছিল, বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেই ছাত্রীটির জীবনের কয়েকটা আশ্চর্য-রকমের গোপন ঘটনার বৃত্তান্ত যোগাড় করতে পেরেছিল বিভূতি ; এবং অমিয়বাবুকে জানিয়েও দিয়েছিল। একটিও মিথ্যে কথা বলেনি বিভূতি। ওই মঞ্জু নামে ছাত্রীটি বছর চারেক আগে বাড়ির মাস্টারের সঙ্গে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল এবং প্রায় এক বছর পরে বাড়ি ফিরেছিল। ঘটনাটা হল কানপুরের। কী আশ্চর্য, প্রায় চার-পাঁচ বছর আগের সেই কানপুরের একটা ঘটনার বৃত্তান্ত কলকাতাতে বসেই যোগাড় করতে পেরেছিল বিভূতি।

নিশীথ এবং আরও কেউ কেউ বিভূতিকে একটু অনুযোগও করেছিল—এসব ব্যাপারে তোমার এত ইন্টারেস্ট না থাকাই ভাল, বিভূতি। একটা মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিয়ে তোমার যে কী লাভ...

বিভূতি বলেছিল, সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু উপায় নেই। বেচারা অমিয়বাবুর কাছেও তো আমার একটা কর্তব্য আছে। অমিয়বাবুর মত একজন শুদ্ধ ও সজ্জন মানুষের স্ত্রী হবে মঞ্জু নামে এ রকম একটা...এক্সকিউজ মি, নিশীথ—

বন্ধুরা বলেছিল--কিন্তু তুমি তো চিরকাল মঞ্জুর বিয়ে বন্ধ করে রাখতে পারবে না। আজ না হোক, কাল, অমিয়বাবুর না হোক, অন্য কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ে হয়ে যাবেই।

—হ্যাঁ, হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি আমি সেখবরও কোনওদিন পাই, যেদিনই পাই না কেন, তখন একবার দেখে নেব।

--অ্যাঁ! নিশীথ এবং আরও কোনও কোনও বন্ধু আতঙ্কিতের মত চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিল।

—হ্যাঁ, চরিত্রের ক্ষত লুকিয়ে, আর একটা সজ্জন মানুষের বিশ্বাস ফাঁকি দিয়ে যদি কোনও মানুষ বিয়ে করে ফেলে, তবেই বা তাকে ক্ষমা করব কেন?

—কী করবে তুমি?

—জানিয়ে দেব। স্বামী, কিংবা স্ত্রী, যে বেচারা ঠকবে, তাকে সব খবর জানিয়ে দেব।

—স্বামী-স্ত্রীর জীবনে মিছিমিছি একটা অশান্তি এনে দেবে?

—ওই রকম অশান্তি হওয়াই যে ভাল। ওটা প্রায়শ্চিত্ত, এবং ওতে ফল ভালই হবে।

—ফল ভাল হবে কেমন করে?

—হয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, নয় ভালবাসা ভেঙে যাবে।

নিশীথ ভয় পেয়েছিল।—তোমার মনটা তোমার চরিত্রের মতই শক্ত।

বিভূতির চোখ দুটো হেসে উঠেছিল। আমি তাই চাই। এবং এখানেই বোধ হয় তোমার ও আমার প্রভেদ।

সেদিন ভয় পেয়েছিল, কিন্তু রাগ করতে পারেনি নিশীথ। এবং আজও ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়, আজও যে রাগ হচ্ছে না। বেচারা বিভূতির মনটা এমন কঠোর বলেই তো প্রতিভাকে আজ বুকের কাছে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে নিশীথের। আঃ, সারাটা রাত

কেমন নিঝুম হয়ে নিশীথের বুকের কাছে মাথা গুঁজে দিয়ে ঘুমিয়ে রইল প্রতিভা ; যেন কত শত বছরের একটা চেনা আশ্রয়ের শান্তি তৃপ্তি আর নিবিড়তার মধ্যে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে জীবনটা সঁপে দিয়েছে প্রতিভা। বার বার তিনবার প্রতিভার সেই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিল নিশীথ।

আজ বিভূতির সঙ্গে যদি একবার ধীরেনবাবু আর সুনয়নার দেখা হয়ে যায়? নিশীথের বুকের সব নিঃশ্বাসের বাতাস যেন এক বিপুল কৌতুকের আবেগে নেচে ওঠে। হেসে ফেলে নিশীথ। দেখে লজ্জিত হবে কি বিভূতি? কিংবা আশ্চর্য হবে? সুনয়নাকে সত্যিই বাঁচিয়ে দিয়েছে বিভূতির চিঠির সেইসব অভিশাপময় অভিযোগ। সুনয়নার অদৃষ্ট যে একটা পুণ্যস্নান সেরে নিয়ে ধীরেনবাবুর জীবনে নতুন আশীর্বাদ হয়ে ধরা দিয়েছে। বাঃ, বেশ করেছে বিভূতি। মনে হয়, থার্ড-ইয়ারের ছাত্রী সেই মঞ্জুর জীবনেও এখন তার স্বামীর ভালবাসার সাথী হয়ে এইরকম একটি মহুয়া-বনের স্নিগ্ধ ছায়ার পাশে...

হ্যাঁ, স্টোরবাবু রমেশের বাড়িটা দেখা যায়। সড়কের দু-পাশে এই ছোট ছোট দুটো মহুয়াগাছের ছায়া পার হয়ে গেলেই রমেশের বাড়ির বাগানের কাছে পৌঁছে যাবে নিশীথের গাড়ি।

কী কাণ্ড করেছে রমেশ! সারা বাগান জুড়ে কতবড় একটা মণ্ডপ। রমেশের বাবার শ্রাদ্ধবাসর, যেন একটা মহামেলা কিংবা মহোৎসবের আসর। মণ্ডপের প্রবেশপথে সত্যিকারের দুটি সোনার কলস রাখা হয়েছে ; তার উপর আম্রপল্লব আর নারকেল। বাগানের পশ্চিম দিকের একটা ময়দান, গাড়ির পার্কিং-এর জন্য খড়ি দিয়ে দাগিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক গাড়ি এসেছে। আসবেই তো, রমেশের বাবা ত্রিলোচনবাবু বলতে গেলে একজন দিগ্বিজয়ী কন্ট্রাক্টর ছিলেন। এবং টাটানগর ও তার আশপাশের যে কোনও গণ্যমান্য ও সজ্জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এক টাটানগরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা এক শতেরও বেশি। এই কথা রমেশের কাছেই শুনেছিল নিশীথ।

রমেশও এসে এবং হেসে হেসে বিনীতভাবে বলে, আমি ঠিকই বলেছিলাম স্যার। টাটানগর থেকে ঠিক এক শত জন রেসপেক্টবল এসেছেন। সবসুদ্ধ গাড়ি এসেছে ত্রিশের ওপর। ওঁরা যে বাবাকে বড় ভালবাসতেন, স্যার।

মণ্ডপের ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পায় নিশীথ—হাজারেরও বেশি নিমন্ত্রিত সজ্জন বসে আছেন। রমেশ বলে, এখন শুধু কীর্তন ; বেলা দুটো পর্যন্ত কীর্তন চলবে। বিকেলে ভাগবত-পাঠ। আর সন্ধ্যার পরেই যাত্রা...'বিল্বমঙ্গল' গাওয়া হবে। খুব ভাল যাত্রাপার্টি আনিয়েছি, স্যার।

নিশীথ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—এবার আমি চলি রমেশ।

রমেশ অনুনয় করে—কিছুক্ষণ থেকে যান, স্যার।

রমেশের অনুনয়ের বিনিময়ে আর একবার হেসে শুধু বলতে হবে না, উপায় নেই রমেশ। আমাকে এখনি গালুডি ফিরতে হবে, এই সামান্য কয়েকটা কথা বলে অনায়াসে এইমুহূর্তে আবার গালুডির দিকে ছুটতে পারত নিশীথ ; কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়ে দূরের ভিড়ের এক দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে নিশীথ, জেঠামশাই এসেছেন দেখছি—

হ্যাঁ, রমেশের বাবার বন্ধু ডাক্তার হরদয়ালবাবুও সাকৃচি থেকে এসেছেন এবং নিশীথকে দেখতে পেয়েই নিশীথের দিকে এগিয়ে আসছেন।

—আপনি তা হলে একটু বসুন স্যার, আমি অন্য দিকের ডিউটিগুলি একটি একটি করে...

—হ্যাঁ।

চলে যায় রমেশ ঃ এবং জেঠামশাই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে নিশীথের কাছে দাঁড়ান। তারপরে আসরের একদিকে চেয়ারের উপর প্রায় গড়িয়ে পড়ে থাকা প্রকাণ্ড-চেহারার এক

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বিরক্তভাবে বিড়বিড় করেন, ওই যে হাসছে, ওই যে প্রকাণ্ড-চেহারা ভদ্রলোক, বুকে সোনার চেন ঝুলছে, ওই ভদ্রলোক হল রাজপোখরার সেই অভদ্রটার কুটুম।

নিশীথ হাসে—তাতে আপনার কী? আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন?

—হ্যাঁ...বিরক্ত হবার কোনও দরকার ছিল না ; কিন্তু সত্যি বিরক্তি বোধ করছি। লোকটা আবার চেঁচিয়ে ভাগ্নীর বিয়ের কথা বলে লেকচার দিচ্ছে।

—কে ওঁর ভাগ্নী?

—ওই তো শীতল সরকারের মেয়েই তো ওর ভাগ্নী। শীতল সরকারের মেয়ের বিয়ে ঠিক করে এইমাত্র উনি খরসোয়ান থেকে ফিরছেন।...যাকগে, এসব কথার সঙ্গে আমাদের এখন আর কোনও সম্পর্ক নেই...প্রতিভা কেমন আছে?...শিবদাসবাবুর চিঠি পেয়েছ?

নিশীথ মাথা নাড়ে। প্রতিভা ভাল আছে, এবং শিবদাসবাবুর চিঠি প্রায় রোজই আসে। জেঠামশাই ব্যস্তভাবে বলেন, আমি এখনই টাটা ফিরব, নিশি।...তুমি কি এখন...

—আমি এখন গালুডি যাব।

চলে গেলেন জেঠামশাই, এবং নিশীথ যেন একটা অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনবার লোভ সামলাতে না পেরে আস্তে আস্তে হেঁটে, আসরের যত চেয়ারের এক-একটা সারি পার হয়ে সেই প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোকেরই কাছে একটি চেয়ারের উপর এসে বসে।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা, সেই প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোক তাঁরই পাশের চেয়ারে আসীন, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

—যাক, শেষ পর্যন্ত পাত্রকে রাজি করাতে পেরেছি। এক কথায় কি ওরকমের একটা জাঁদরেল পাত্র রাজি হয়, মশাই?

—খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সুপারিনটেণ্ডেন্ট। যেমন শিক্ষিত, তেমনই কঠোর চরিত্র।

—তার মানে?

—তার মানে আজকাল এরকম খাঁটি চরিত্রের ইয়ং-ম্যান আপনি ভূভারতে পাবেনই না। সেই জন্যেই তো প্রায় হাতে-পায়ে ধরে সাধতে হয়েছে।

—বুঝলাম না।

কী যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যান শীতল সরকারের মেয়ের মামা, প্রকাণ্ডকায় সেই ভদ্রলোক। বুকের সোনার চেনে হাত বুলিয়ে নিয়ে নিশীথের দিকে একবার সন্দিগ্ধভাবে তাকান। তারপর নিশীথকেই প্রশ্ন করেন, মশাইয়ের কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে?

—কেন?

—আমরা একটা প্রাইভেট বিষয়ে আলোচনা করছি বলে?

—না।

এইবার নিশীথের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করেন প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোক। হ্যাঁ...কী বলছিলেন? কেন পাত্রকে হাতে-পায়ে ধরে সাধতে হয়েছে?

—হ্যাঁ।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা গলার স্বর মৃদু করে ফেলেন।—আপনার কাছে খুলে বলতে আপত্তি নেই। একটা সমস্যা ছিল...অর্থাৎ ভাগ্নীটি এক চরিত্রহীন যুবকের সঙ্গে প্রেম করে বসেছিল।

—এ তো ভাল কথা নয়—

—ভাগ্নীর কোনও দোষ নেই। বেচারী জানতই না যে, ছেলেটির চরিত্রে দোষ আছে।

—যাই হোক, না জেনে-শুনে ভুল করেও তো প্রেম করেছে?

--হ্যাঁ ; কিন্তু শুধু চিঠিতে। বিশ্বাস করুন, শুধু চিঠি। শারীরিক কোনও ইয়ে-টিয়ে...একেবারেই না। একবার সেই-যে ট্রেনের মধ্যে দুজনের দেখা হয়েছিল, তারপর আর দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎও হয়নি।

--পাত্র না-হয় রাজি হল, পাত্রী কী বলে!

--পাত্রী আগেই রাজি হয়েছে। বলামাত্র রাজি হয়েছে। না হয়ে কি পারে মশাই? মেয়েটার এরকম একটা উপকার করল যে, তার ওপর একটা শ্রদ্ধার ভাব।

—একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমার কাছেই বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছে মেয়েটা, বিভূতিবাবুর মত মানুষ কি রাজি হবে মামা? আমি ভরসা দিয়ে এসেছিলাম, রাজি করাবই।

—বেশ ভাল হল। শীতলবাবুও একটা মনস্তাপের কারণ থেকে বেঁচে গেলেন।

—গেলেন বইকি। এই দেখুন, আমাকে অনুরোধ করে কী চিঠি লিখেছিলেন শীতলবাবু।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে নিয়ে পাশের ভদ্রলোকের হাঁটুর উপর রেখে ফিসফিস করেন।—এই নিয়ে পাঁচবার হল, শীতলবাবুকে আমি একটা পারিবারিক বিপদ থেকে বাঁচালাম।

হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ ; তারপরই হন হন করে হেঁটে আসরের ভিড়ের কলরব, মৃদঙ্গের শব্দ আর মণ্ডপের সোনালি ঝালরের ঝিকিমিকি উল্লাসের কাছ থেকে সরে গিয়ে সোজা নিজের গাড়িতে গিয়ে বসে। স্টার্ট নিতেও দেরি করে না। আবার ছোট-মহুয়াবনের ছায়া পার হয়ে গালুডির দিকে ছুটতে থাকে নিশীথের গাড়ি, এবং সেই সঙ্গে নিশীথের জীবনের একটা বিস্ময়ের হাসি। বাঃ, বেশ ভাল হল, শেষ পর্যন্ত নীরাজিতারও দুঃখ করবার কিছু রইল না। নীরাজিতার জীবনকে নিশীথের মত মানুষের স্পর্শের ভয় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যে, তারই কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছে নীরাজিতা। হওয়া উচিত। বিভূতির জন্য শ্রদ্ধা জেগেছে নীরাজিতার মনে। ভাল হয়েছে। বিভূতির জীবনের সঙ্গিনী হয়ে ধন্য হতে চায় নীরাজিতা। হবে বইকি।

এতক্ষণে যেন নিজেকে ক্ষমা করতে পারে নিশীথ। নীরাজিতারও কোনও ক্ষতি হল না। বরং নীরাজিতা এখন নিজেরই সৌভাগ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে, বিভূতির মত মানুষের জীবনসঙ্গিনী হয়ে সুখী হওয়া অদৃষ্টের লেখা ছিল বলেই বোধ হয় নিশীথ রায়ের চরিত্রটা ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল।

রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হবার সময় আর একবার হেসে ফেলে নিশীথ। নীরাজিতা বোধ হয় এখন মনে মনে নিশীথ রায় নামে শুচিতাহীন রক্তমাংসের একটা মানুষকে, একটা অধঃপতিত চরিত্রকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। একটা দুশ্চরিত্র মানুষের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থাটা ভেঙে গেল বলেই না নীরাজিতা বিভূতির মত মানুষের স্ত্রী হবার সৌভাগ্যটাকে পেয়ে গেল।

বাংলোবাড়ির ফটকের কাছে গাড়ি থামিয়ে, আর দেওদারের ছায়া পার হয়ে ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ, নীরাজিতার বিয়ে।

সুনয়না আর প্রতিভা একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে পাশের ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ধীরেন।

নিশীথ বলে, বিভূতির সঙ্গে নীরাজিতার বিয়ে।

খবরটা যেন একটা চরম মীমাংসার খবর। বিভূতির সঙ্গে নীরাজিতার জীবনের মিলন হবে, খুবই ভাল খবর। এ খবর শুনে কেউ চমকে ওঠে না, ভ্রূকুটিও করে না। কারও চোখের চাহনিতে তুচ্ছতা বা বিদ্রূপের ছায়া কাঁপে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা স্বস্তিময় নীরবতা যেন থমথম করে। নিশীথের মুখের এই শুভবার্তার মধ্যে একটা পরিণামের প্রাণ

যেন হাঁপ ছেড়ে বলছে, সব ভাল যার শেষ ভাল।

খবরটা যেন অনেকগুলি মানুষের জীবনের একটা উদ্বেগেরও অবসান। কেউ আর এই অভিযোগ করতে পারবে না যে, আমি সুখী নই। প্রতিভা আর সুনয়নার মুখের হাসি যেন শান্ত অভিনন্দনের হাসি। ভালই হয়েছে ; যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে। নীরাজিতার ভাবনায় ও কল্পনায় আর এমন কোনও যন্ত্রণার দংশন থাকতে পারে না, যার জন্য কোনও মানুষের বিরুদ্ধে তার মনে অহরহ একটা আক্রোশের জ্বালা ছটফট করবে। নীরাজিতার কোনওই ক্ষতি হল না।

ধীরেন বলে—খুব ভাল হল।

ধীরেনের কথাগুলি যেন ধীরেনের একলা উপলব্ধির কথা নয়। এই চারটি মানুষেরই মন নীরবে ধীরেনের মত শুভেচ্ছার অনুভবে ভরে গিয়েছে। নীরাজিতা কিংবা বিভূতি দুজনের কেউ ওদের জীবনের এই শুভ পরিণামের রূপ, ওদের বিয়ে দেখবার জন্য নিমন্ত্রণের চিঠি দেবে বলে আশা করা যায় না ঠিকই ; ভয় আছে ওদের দুজনেরই মনে। এই চারজন মানুষের ছায়ার মধ্যে ক্ষত আছে, এবং সে ক্ষতকে খুবই ঘৃণা করে দুজনে। কিন্তু নীরাজিতার এই ঘৃণা আর এই ভয়কে ঘৃণা করতে এই চারজন মানুষের মনে কোনও ইচ্ছার ছায়াও নেই ; বরং, মনে হয় যে, এবং সত্যই একেবারে স্পষ্টভাষায় আর একটা কথা বলে সবাইকে হাসিয়ে দেয় নিশীথ।

--বিভূতির সঙ্গে নীরাজিতার বিয়ে অবধারিত ছিল বলেই...

সুনয়না হাসে—কী?

--প্রতিভার সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে গেল।

ধীরেন বলে—এবং সুনয়না আমাকে ডাল-ভাত খাওয়াবার গ্যারাণ্টি দিয়ে একটা গাঁয়ের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে।

গালুডির এই বাড়িতে এই চারজন মানুষের নিরুদ্বিগ্ন ও কৃতার্থ জীবনের হাসি আরও অনেকক্ষণ মুখর হয়ে থাকে। খাওয়ার পাট সারা হবার পর যখন কালিকাপুরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় নিশীথ আর প্রতিভা তখন শুধু এদের দুজনের মুখের হাসি নয়, ধীরেন আর সুনয়নার মুখের হাসিও যেন অদ্ভুত এক অনুভবের আবেশে ছলছল করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায় ; চোখে চোখে যেন একটা ক্ষমার উৎসব জেগে উঠে নীরবে বলছে, যদি কোনও ক্ষতি করে থাকি, তবে ক্ষমা করো।

আবার কালিকাপুরের দিকে ; গালুডির রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে নিশীথের গাড়িটা আবার সড়কের দু পাশের শাল আর সেগুনের ছায়ার ভিতরে এসে পড়তেই নিশীথ বলে, এইবার একটা কথা সাহস করে বলব প্রতিভা?

প্রতিভা হাসে।—প্রতিভার কাছে ভয় করে কিছু বলবার ছিল নাকি?

নিশীথও হাসে।—ছিল।

—কী কথা?

—নীরাজিতার কথা। নীরাজিতা যে খুশি হয়ে বিভূতিকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এ খবর শোনবার পরে মনের একটা ভার মিটে গেল। বেচারার তো কোনও দোষ...

—হ্যাঁ, বলো।

—নীরাজিতা চরিত্রহীন মানুষকে ভয় পায় আর ঘৃণা করে, এটা নিশ্চয় ওর অপরাধ নয়। বিভূতির মত মানুষের সঙ্গেই ওর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল, খুব ভাল হল।

রাজপোখরাতে ডালিয়া-বাগানের কাছে একটা ছোট চেয়ারের উপর বসে আর সামনের ছোট একটা টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে প্রতিভার কাছে লেখা একটা চিঠিতে ঠিক এই কথাগুলি লিখলেন শিবদাসবাবু।—খুব ভাল হল প্রতিভা। আজ নীরাজিতার সঙ্গে বিভূতির

বিয়ে হয়ে গেল। আমি খুব ফুর্তি করে বিয়েতে খেটেছি। মাংস রাঁধবার ভার আমার উপরেই ছিল।

শিবদাসবাবুর চিঠি লেখা যখন সারা হয়, ঠিক তখনই অলক্তকের বারান্দার আলপনা পিছনে ফেলে রেখে আর বিভূতির পাশে পাশে হেঁটে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায় নীরাজিতা।

অলক্তকের শঙ্খ-মুখর ফটক পিছনে ফেলে রেখে বিভূতির গাড়িটা যখন গম্ভীর গুঞ্জন তুলে আস্তে আস্তে ঝাউয়ের ছায়া পার হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন ডালিয়ার বাগানের কাছে শিবদাসবাবুর চেহারাটার দিকে দুজনে একসঙ্গে তাকায়,. বিভূতি আর নীরাজিতা। তারপর দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে।

বিভূতির গাড়ি এখন আর পথের কোথাও থামবে না। রাজপোখরা থেকে সিনি ; সিনিতে বিভূতির বাংলোবাড়িটা এখন অনেক আলো আর অনেক ফুলের স্তবক ঘরে ঘরে সাজিয়ে নিয়ে বিভূতি আর নীরাজিতার জীবনের শুভমিলনের আনন্দ বরণ করবার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

শুভ মিলন নিশ্চয় ; কিন্তু শুধু শুভ বলতে রাজি নয় খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি।

বিভূতি বলে, শুদ্ধ বিবাহ বলতে আমার আরও ভাল লাগে।

—কী বললে?

—চরিত্রের দিক দিয়ে যারা শুদ্ধ, শুধু তাদেরই বিয়েকে একটা শুভ ব্যাপার বলা যেতে পারে। কিন্তু ট্র্যাজেডি এই যে, ঘোর চরিত্রহীন মানুষগুলোও নিজেদের বিয়েকে শুভ-বিবাহ বলে রঙিন কাগজের চিঠিতে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে নেমন্তন্ন করতে একটুও লজ্জা পায় না।

নীরাজিতা হেসে ওঠে।—তাতে নিজেকেই ঠকানো হল।

—কিন্তু এও এক আশ্চর্য, ঠকতেও লজ্জা পায় না। দৃষ্টান্ত...

গাড়ি ড্রাইভ করছে বিভূতি ; এবং একই সিটের উপর বিভূতির পাশে বসে আছে নীরাজিতা। গাড়ির ভিতরে যে আলোটা জ্বলছে, সে আলোটাকে জড়িয়ে একটা ফুলের মালা দুলছে। চকিতে একবার নীরাজিতার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বিভূতি বলে—আমি দৃষ্টান্ত হিসাবে কাদের কথা বলছি, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ নীরা?

নীরাজিতা হাসে, খুব বুঝতে পেরেছি ; কিন্তু ওদের কথা আমাদের আলোচনা না করাই ভাল।

—ঠিক কথা।

চুপ করে বিভূতি, এবং নীরাজিতাও চুপ করে চলন্ত গাড়ির শব্দের সঙ্গে জীবনের এক বিপুল কৌতূহলের চঞ্চলতা মিশিয়ে দিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে। বিভূতি, খরসোয়ান-ম্যাঙ্গা-নিজের বিভূতি, যার বুকের বাতাস শরৎকালের সকালবেলার বাতাসের মত, একফোঁটা ধুলোর চিহ্ন নেই যে বাতাসে, সেই মানুষ যেন নীরাজিতারই অদৃষ্টের ইঙ্গিতে পরিত্রাতার মত এসে নীরাজিতাকে একটা ভয়ানক ভুলের গ্রাস থেকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেরই জীবনের সঙ্গিনী করে নিয়েছে। কালিকাপুরের নিশীথের তুলনায় কোনও দিক দিয়ে ছোট হওয়ার দূরে থাকুক, বরং সবদিক দিয়ে বড়, এই বিভূতি, যে নীরাজিতার জীবনে একটা আকস্মিক গৌরবের উপহার। খরসোযান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি রোজগারে বড়, পদ-প্রতিষ্ঠায় বড়, চরিত্রে বড়। নীরাজিতার মনে দুঃখ করবার কিছু নেই। সব দিক দিয়ে জিত হয়েছে নীরাজিতার। সব খবর জানেন পিসিমা, তাই আশীর্বাদ করবার সময় তিনি আনন্দের আবেগে কেঁদে ফেলেছেন।—কোনওদিন তো শিবপূজো করিসনি নীরা, তবু তোর ওপর শিবের কী দয়া। নইলে এত সহজে ওরকম খারাপ স্বভাবের একটা মানুষের মতলব থেকে বাঁচতে পারতিস না। সৌভাগ্য

বলে সৌভাগ্য! পুণ্যি বলে পুণ্যি! নইলে কি বিভূতির মত সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়?

ভাবলে এখনও ভয় করে। কালিকাপুরের নিশীথ, ইস, কী অদ্ভুত ছলনা জানে লোকটা! যার শরীরটা এত কলুষ ছুঁয়েছে, তার মুখটা কী অদ্ভুত কপটতা করে খাঁটি ভালবাসার হাসি হেসেছিল। কিন্তু ভাগ্য ভাল ; পিসিমা সেদিন একটুও বাড়িয়ে বলেননি ; শিবেরই দয়া ; নীরাজিতার জীবন একটা উচ্ছিষ্ট পৌরুষের স্পর্শে অপমানিত হবার ভয় থেকে বেঁচে গিয়েছে।

মনে মনে নিজের বেকুব মনটার ওপরেও রাগ করে নীরাজিতা। না বুঝে-সুঝে, একটুও সন্দেহ না করে ট্রেনের কামরাতে দেখা একটা মানুষের চোখের চাহনি সেই আগ্রহটাকে কেন হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছিল? মনটা লোভী হয়ে উঠেছিল ; সেকথা ভাবতে মনের উপরই রাগ হয়। কিন্তু সেই ভুলের মনটাকে ক্ষমা করেও দিতে পেরেছে নীরাজিতা। কী করে বোঝা যাবে? দেখে বুঝতে পারা যে নিতান্তই অসম্ভব। ফুলের পাপড়ির উপর যে শিশিরের ফোঁটা টলমল করে, সেটা সাপের বিষের ফোঁটাও হতে পারে বলে সন্দেহ করতে পারে কে? সন্দেহ করবার এত বড় শক্তিও বা কজন মেয়ের আছে?

শুধু কি নিজেরই সেই ভুলের মনটার উপর রাগ হয়? নিশীথের মুখটা মনে পড়লে এখনও নীরাজিতার মনে একটা ঘৃণাভরা রোষের জ্বালা ছটফটিয়ে ওঠে। অলক্তকের ফটক তালাবদ্ধ হয়ে একটা কঠোর উপেক্ষা দিয়ে মানুষটাকে তাড়িয়ে যে শাস্তি দিয়েছে, সেটা কী আর এমন শাস্তি? আরও শাস্তি হওয়া উচিত ছিল ; এবং বুঝতেই পারা যাচ্ছে, সে শাস্তি পেয়ে যাবে লোকটা। প্রতিভার মত মেয়ের চরিত্রের কাছে অপমানিত হতে হতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, হয়েই যেন যায়, লোকটার চরিত্রহীন আহ্লাদের প্রাণটা।

—কী ভাবছ নীরা?—হঠাৎ প্রশ্ন করে বিভূতি ; এবং সেই প্রশ্নের শব্দে যেন একটু চমক লেগে কেঁপে ওঠে নীরাজিতা।

—বাড়ির কথা ভাবছ বোধ হয়? এবং সেই জন্যে এত গম্ভীর হয়ে...

নীরাজিতা হেসে ফেলে।—বাড়ির কথাই ভাবছি, কিন্তু সে বাড়ি অলক্তক নয়।

—তবে?

—যে বাড়িতে যাচ্ছি।

—সেটা আমার নিজের রোজগারের টাকায় কেনা বাড়ি। সেবাড়ির ফটকের কাছে এসে দাঁড়াবারও ওদের সাধ্যি নেই।

নীরাজিতা যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে।—ওরা...ওরা তোমার বাড়ির কাছে আসবে কেন?

বিভূতি হাসে, তুমি কাদের কথা ভাবছ?

—আমি ভাবছি...ওই ওদের কথা...যাদের বিয়েকে একটা ভয়ানক অশুচি কাণ্ডের দৃষ্টান্ত বললে তুমি এখনই...

—না না, ওদের কথা বলছি না। শিবদাস দত্তের মেয়ে আর নিশীথ কোন সাহসে আমার বাড়িতে আসবে?...ওরা নয় ; আমার দুটি দরিদ্র ভ্রাতা আছে, দুটি হতভাগ্য, সদাগর অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি। ষাট-সত্তর টাকা মাইনে পায়।

—ঠাকুরপোরা কি কেউ...

—না, কেউ না। ওরা কেউ আসেনি। ওদের আসা নিষেধ।

—তোমার বিয়েতেও যদি ওরা না আসে...

—ওরা তো আসতেই চায়, কিন্তু আমি আসতে দেব কেন?

—ওরা ভাল করে জানে যে, বড়দার চরিত্রে কোনও মায়াভরা দাদাপনা নেই।

নীরাজিতা অপ্রস্তুতের মত কুণ্ঠিতভাবে বলে—আমি সত্যিই সব খবর জানি না। কিন্তু

ধারণাও করতে পারছি না, কেন তুমি ওদের সম্পর্কে এত...

—ওরা এলে আর যেন নড়তেই চায় না। বড়দার সঙ্গে দেখা করবার কাজটা তো এক সেকেণ্ডেই হয়ে যায়, কিন্তু তারপর আরও সাতটা দিন ধরে পড়ে থেকে বড়দার অন্ন ধ্বংস করতে চায়। এসব আমি নিতান্ত অপছন্দ করি।

নীরাজিতা আরও কুণ্ঠিতভাবে, যেন একটু ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে--সিনির বাড়িতে কি তা হলে মা শুধু একাই এসেছেন?

--মা? কার মা?

—তোমার মা?

—আমার মা তো দেশের বাড়িতে থাকে।

—তা জানি। বাবার কাছে শুনেছি...

--কী শুনেছ?

—তোমার মা এখন হালিশহরে তোমাদের পুরনো বাড়িতে একাই থাকেন।

--ঠিকই শুনেছ।

--আমি ভেবেছিলাম, তোমার বিয়েতে মা নিশ্চয় সিনিতে আসবেন।

--আসবার উপায় নেই।

--কেন?

—আসতে দিচ্ছে কে? দেশ-গাঁয়ের একটা বুড়ি মানুষকে আমার সিনির বাড়িতে থাকতে দিলে ম্যাকেঞ্জি, লিস্টার আর হ্যারিস মনে করবে যে অনর্থক একটা বুড়ি চাকরানিকে খাটিয়ে-খাটিয়ে কষ্ট দিচ্ছে বিভূতি।

--সর্বনাশ!—নীরাজিতার বুকটা যেন বেঁফাস চমকে উঠে ছোট একটা আর্তনাদ ছেড়ে কাঁপতে থাকে।

—সর্বনাশ মানে?—স্টিয়ারিং শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নীরাজিতার মুখের দিকে চকিতে একটা শক্ত চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে, এবং গম্ভীর গলার স্বর গমগমিয়ে প্রশ্ন করে বিভূতি।

—সাহেবরা ওরকম ধারণা করলে করুক না কেন? তা বলে বুড়ো মা কি তার ছেলের কাছে থাকবে না? এ তো আশ্চর্যের কথা?

—একটুও আশ্চর্যের কথা নয়, নীরা। মা যে কী ভয়ানক উৎপাত সৃষ্টি করতে পারে, সেটা তুমি নিজের চোখে না দেখবার আগে বিশ্বাস করতে পারবে না।

—শুনিই না ; কী উৎপাত করেন?

--আমার সিনির বাড়িতে মাকে একবার আসতে দিয়েছিলাম। সাত দিন ছিল। কিন্তু সেই সাত দিন শুধু কেঁদে-কেটে আর গালাগালি দিয়ে আমাকে ছারখার করেছে।

—বুঝলাম না।

—আমার দুটি দরিদ্র হতভাগা ভ্রাতাকে আমি টাকা দিয়ে সাহায্য করি না, এই হল আমার পাপ ; এবং কেন সাহায্য করব না আমি, এই হল আমার মাতৃদেবীর অভিযোগ।

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। সিনি পৌঁছতে দেরি আছে।

দূরে পাহাড়ের মাথার উপরে মেঘের গায়ে ফিরে জ্যোৎস্নার সাদা ছোঁয়া লুটিয়ে পড়েছে। এবং নীরাজিতার চোখের দৃষ্টিও যেন সাদা হয়ে বিভূতির হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ ঠিকই, বেশ শক্ত হাত। স্টিয়ারিং-এর লোহার সঙ্গে বিভূতির হাতের মুঠো দুটো লোহার গিঁটের মতই শক্ত হয়ে এঁটে আছে।

নীরাজিতার চোখ দুটো সাদা হয়ে গিয়েও যেন জোর করে একটা রঙিন কল্পনার ছবি দেখবার চেষ্টা করছে। সিনির বাড়িটা কি সত্যিই বিভূতির একলা জীবনের কঠোর শাসনে একেবারে নীরব হয়ে আছে? হাসিমুখে এগিয়ে এসে নীরাজিতাকে হাত ধরে ঘরের ভিতরে

নিয়ে যাবার কেউ নেই? বিভূতির বউ দেখতে কী সুন্দর, এমন কথা বলবারও কোনও মানুষ থাকে না সেখানে।

বিভূতি বলে—আমার বাড়িতে তুমি কোনও বাজে গণ্ডগোল শুনতেই পাবে না, নীরা। হই-হল্লা আমি নিতান্ত অপছন্দ করি।

তবে কি সিনির বাড়িতে কোনও উৎসবের আয়োজন নেই? খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি, জীবনের একটা মধুর পরিণামের ঘটনাকে প্রীতি জানাবার জন্য কেউ সেখানে আসবে না?

—আমার একটা আশঙ্কা আছে, নীরা।

—কী?

—মস্ত বড় একটা বাজে খরচের পাল্লায় পড়তে হবে।

—কিসের জন্য?

—একটা প্রীতিভোজ দিতেই হবে। অন্তত হ্যারিস, লিস্টার আর ম্যাকেঞ্জিকে একটা কক্‌টেল দিতেই হবে ; তা ছাড়া আর আট-দশজন ভি আই পি আছেন। তাঁদেরও একটা খানাপিনা না দিলে নয়। অন্তত তিন-চার শো টাকা খরচ হয়ে যাবে।

সিনির দিকে মোড় ফেরার সাইন দেখাচ্ছে যে পোস্টটা, সেটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গাড়ির হেড-লাইটের আলো পড়ে লেখাটা জ্বলছে—টু সিনি সেভেন মাইলস্‌। কিন্তু নীরাজিতার চোখের সাদা চাহনির উপর যেন রক্তাক্ত আতঙ্কের ছায়া লুটিয়ে পড়েছে। লেখাটাকে কতকগুলি লাল আঁচড়ের দাগ বলে মনে হয়।

টু সিনি ; নীরাজিতার জীবন খরসোয়ান-ম্যাঙ্গনিজের বিভূতির জীবনের ঘরের দিকে হু-হু করে ছুটে চলে যাচ্ছে। কারণ বিভূতির গাড়ি বেশ স্পিড নিয়ে ছুটছে। কিন্তু নীরাজিতার বুকের ভিতরের একটা ভীরুতা যেন এই স্পিড সহ্য করতে না পেরে এখনই গাড়ি থেকে সড়কের ধুলোর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যেতে চায়।

বিভূতি বলে—অবশ্য, সে আশঙ্কার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

—কী বলছ তুমি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার শুদ্ধ-বিবাহের আনন্দ সামান্য একটা তিন-চার শো টাকার খরচকে এত ভয় করে কেন? কথা বলতে গিয়ে হাঁসফাঁস করতে থাকে নীরাজিতা।

হেসে ওঠে বিভূতি।—কোনও ভয় করি না। দশ-পনেরো জনকে কক্‌টেল দিতে আর খাওয়াতে তিন শো টাকা খরচ হয় হোক ; কন্ট্রাক্টর মূলচাঁদকে বলব, পুরো তিন হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

—তাতে কী হবে?

হো-হো করে হেসে ওঠে বিভূতি। তাতে মূলচাঁদ তখনই খুশি হয়ে তিন হাজার টাকা আমার হাতে তুলে দেবে, আর ধন্য হয়ে চলে যাবে। অর্থাৎ আমার নীট লাভ হবে দু হাজার সাত শো টাকা।

টু সিনি। এইবার সোজা সিনির সড়ক ধরে ছুটে চলেছে বিভূতির গাড়ি। দূরে ছোট ছোট অনেক আলোর ভিড় দেখা যায়। বোধ হয় বাবুদের কোয়ার্টার ; কিংবা অফিসারদের বাংলোয় আলো জ্বলছে।

সাদা ধবধবে একটা বাড়ির সামনের লনে আলোর কাছে এক-একটা ক্যাম্প-চেয়ারের উপর গড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গিনীর শরীর। জাঙিয়ার আকারের ছোট প্যাণ্ট, আর দেখতে কাঁচুলির চেয়েও ছোট আকারে নেটের ব্লাউজ গায়ে, কতকগুলি সাদা ধবধবে আলস্যের ফুল নেশাতুর হয়ে পড়ে আছে।

বিভূতি হাসে।—একটা মজার কথা বলি, শোন নীরা। ওই যে দেখছ, ওদের মত একটি

বস্তু একবার আমার হাত ধরতে এসেছিল ; কিন্তু তাকে দুটি কথায় এমনই অপমান করে দিয়েছিলাম যে, বিলিতি সেই মিস মহোদয়া এ দেশ ছেড়ে সোজা বিলেতে চলে গেল।

—শুনেছি, শুনেছি, শুনেছি—বলতে বলতে নীরাজিতার গলার স্বর যেন চেঁচিয়ে ওঠবার জন্য ছটফট করে ওঠে। বিভূতির মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে অদ্ভুত রকমের একটা জ্বলজ্বলে হাসি হাসতে থাকে নীরাজিতা।—তোমার এই গ্লোরির গল্প টাটানগরের মামির কাছে শুনেছি ; কলকাতাতে বউদির কাছে শুনেছি। রাজপোখরাতে ঘরভরা লোকদের কাছে বাবা জোরে জোরে চেঁচিয়ে এই গল্প বলেছেন, তাও শুনেছি।

বিভূতি হাসে।—শুনে তুমিও কি একটু...

—কী?

—আশ্চর্য হওনি?

নীরাজিতার গলার স্বরে যেন একটা ধোঁয়াটে উল্লাসের শব্দ ঠক করে জ্বলে ওঠে।—খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। আর সেই জন্যই মামাকে বলেছিলাম যে...

—কী?

নীরাজিতা হাসে।—বলেছিলাম, বিভূতিবাবুর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে দেওয়াতে পারেন, তবেই আমার বিয়ে হতে পারে। নইলে বিয়েই হবে না। পৃথিবীতে আর কাউকে আমি বিশ্বাসই করব না।

—কী আশ্চর্য, তোমার সেই অভিমানই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল, নীরা।

—জয় বলতে জয়। শেষ পর্যন্ত তুমিও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছ যে, নীরাজিতা আর যে ভুল করুক না কেন...

—হ্যাঁ নীরা, যখন কোনও সন্দেহ রইল না যে, নীরাজিতা আর যা ভুল করে থাকুক না কেন, সে ভুল করেনি নিশ্চয়, যে ভুল করলে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়, তখন...সত্যি কথাটা একটু বেহায়ার মত বলতে ইচ্ছে করছে নীরা, তখন তোমাকে মনে মনে বড় ভাল লেগে গেল। মনে হল, তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে বোধ হয়। কিন্তু...

—কী!

—কিন্তু ওভাবে এক নারীকে শুধু মনে মনে ভালবাসাও ঠিক উচিত হবে না বলে মনে হল। কে জানে, নীরাজিতাও তো পরস্ত্রী হয়ে যেতে পারে ; কার না কার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে নীরাজিতার। তাতে চিরকাল মনের ভিতরে এই লজ্জা থেকে যেত যে, আমি মনে মনে এক পরনারীর জন্য অনেক অনুরাগ পুষেছি। তাতে পৃথিবীতে কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে আমার বিবেকে বাধত। মনে হত, বেচারার প্রতি অন্যায় করছি। কিন্তু...

কথা শেষ না করেই চকিতে আর একবার নীরাজিতার বিস্মিত মুখটার দিকে তাকিয়ে বিভূতির চোখ দুটোও একটা নিখুঁত শুদ্ধতার গর্বে হেসে হেসে ঝকঝক করে।—কিন্তু আমার গর্ব ও আনন্দ এই যে, জীবনে প্রথম যাকে মনে মনে ভালবাসতে চেয়েছিলাম, তাকেই আমি বিয়ে করলাম। আমার চরিত্রের সম্পর্কে আমার একবিন্দুও অভিযোগ নেই, নীরা।

কী কঠোর শুদ্ধতার সাধনা। নিজের চরিত্রের সম্বন্ধেও বিভূতির মনে কোনও ক্ষমাময় দুর্বলতা নেই। বিভূতির এই শুদ্ধ পৌরুষের উপর কোনও চরিত্র-ঘাতক কলুষের ছায়াও পড়েনি কোনওদিন—গর্বিত হবারই কথা।

বিভূতির গাড়ি চমৎকার একটা উজ্জ্বলতার কাছে এসে পড়েছে। বিভূতির বাংলোর ফটকের কাছে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। চাপকান-পরা দুটি মানুষ। বোধ হয় বিভূতিরই চাপরাসি আর বেয়ারা।

বিভূতির গাড়ি থামে। পিছনে আরও একটা গাড়ির শব্দ প্রচণ্ড হর্ষের শিহর তুলে ছুটে আসছে শোনা যায়। হ্যাঁ, নীরাজিতা আর বিভূতির জীবনের শুদ্ধ ও শুভ মিলনের জন্য

রাজপোখরার অলক্তকের যত প্রীতি আর আশীর্বাদের বস্তুময় সম্ভার নিয়ে যে গাড়িটার আসবার কথা, সেই গাড়িটাও প্রায় এসে পড়েছে।

স্টিয়ারিং-এর চাকা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে একবার নীরাজিতার একটা হাত ধরে বিভূতি।—এসো, নীরা।

নীরাজিতার হাতটা যেন কেঁপে ওঠে। বিভূতির হাতটা কত ঠাণ্ডা। যেন একটা নিখুঁত লোহার আগ্রহ নীরাজিতার নরম হাতটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে।

খরসোয়ানের রাত্রি যখন একেবারে নীরব হয়ে যায়, আর বিভূতির এই চমৎকার চেহারার বাড়িটা মাঝরাতের চাঁদের আলো গায়ে জড়িয়ে ধবধব করে, তখন ইস্পাতের আলমারির একটি দেরাজ টেনে ব্যাঙ্কের জমার বইগুলি এক-এক করে খুলে ব্যালান্সের অঙ্কের সংখ্যাগুলির দিকে তাকায় আর মনে মনে হিসাব করে বিভূতি। এবং দেরাজ বন্ধ করেই মৃদুস্বরে ডাক দেয়—নীরা।

এতক্ষণ ধরে এই ঘরের ভিতরই একটা সোফার উপর বসে ছিল নীরাজিতা। কিন্তু জানে না বিভূতি, কখন তার ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে নীরাজিতা, এবং এখন কোন ঘরে কোথায় বসে আছে আর কী করছে, তাও কল্পনা করতে পারে না। ডাক দেবার পর সাড়া না শুনতে পেয়ে আবার ডাক দেয় বিভূতি—নীরা, কোথায় গেলে তুমি?

কী আশ্চর্য, নীরাজিতা কি ভুলেই গেল যে, খরসোয়ানের এই রাতটা আজ বিভূতি ও নীরাজিতার জীবনের সত্যিকারের প্রথম শুভরাত্রি হবার গৌরবে চিহ্নিত হয়ে যাবে? খাওয়ার পালা সারা হবার পরে, এই তো ঘণ্টা দুই আগে, বিভূতি একেবারে স্পষ্টভাষায় এবং চোখের চাহনিতে কোনও কুণ্ঠা না রেখে নীরাজিতার কানের কাছে ফিসফিস করে হেসেছে—আর বেশি দেরি হবে না, নীরা, কিন্তু তুমি ভুল করে ঘুমিয়ে পড়ো না। আমি শুধু ব্যাঙ্কের জমার বইগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই...

না, ঘুমিয়ে পড়েনি নীরাজিতা। জাগা চোখ দুটোকে অপলক করে নিয়ে এই ঘরের ভিতরই সোফার উপর চুপ করে বসেছিল ; এবং মাঝে মাঝে বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে কে জানে কি দেখবারও চেষ্টা করেছিল। তারপর সোফা থেকে উঠে আর সেণ্ট ও পাউডারে সুরভিত করা সেই সুন্দর চেহারার একটা ক্লান্ত ও বিস্মিত শোভাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পিছনের বারান্দার রেলিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খরসোয়ানের আকাশের চাঁদটাকে দেখতে নিশ্চয় খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে নীরাজিতার ; তা না হলে এই দু ঘণ্টা ধরে রেলিং-এর কাছে একই জায়গায় একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কেন, আর চোখ তুলে শুধু আকাশের দিকেই বা তাকিয়ে থাকে কেন নীরাজিতা?

নীরাজিতার চোখের দৃষ্টিই বা এত কঠোর রকমের শান্ত কেন? ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডা কেন? আঙুলের নতুন আংটিটা এত ঢিলে মনে হয় কেন? হাতের আঙুলগুলি কি হিমের ছোঁয়া লেগে সিঁটিয়ে গিয়েছে?

রুমাল দিয়ে গলার ঘাম মুছতে গিয়ে নীরাজিতার হাতটাও কেঁপেছে। আর, রাগ করে কপালটাকে টিপে ধরেছে নীরাজিতা। ছিঃ, এত ভয় কিসের? বুকটা মিছেমিছি এরকম টিপটিপ করে কেন?

—নীরা! তুমি এখানে এসে কী করছ?

বিভূতির ডাক শুনে চমকে ওঠে নীরাজিতা। বিভূতির মৃদু গলার স্বরে যেন একটা বিরক্ত বিস্ময়ের বাতাস ফিসফিস করে উঠেছে। ঠিকই তো, বিভূতির একটু বিরক্ত হবারই কথা। বিভূতিকে হঠাৎ একলা করে ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসে নিজেকেও কেন একলা করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীরাজিতা? নীরাজিতা কি জানে না, এই কিছুক্ষণ আগে বিভূতির

চোখের চাহনিটা কুণ্ঠাহীন হয়ে, কী বিপুল আশায় উৎফুল্ল হয়ে নীরাজিতাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল?

খরসোয়ানের এই নীরব রাতের আকাশের চাঁদ যে নীরাজিতার জীবনের এক পরম অঙ্গীকারের সঙ্কেত হয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—সময় হয়েছে, নীরাজিতা। আর অপেক্ষা করতে হবে না। যে বিভূতির চরিত্রের গৌরবকাহিনী শুনে নীরাজিতার বাইশ বছর বয়েসের শরীরটা শ্রদ্ধার আবেশে বিচলিত হয়ে মামার কাছে একেবারে বেহায়া হয়ে বলেই দিতেপেরেছিল যে, বিভূতিবাবুর সঙ্গে যদি হয়, তবে হয়ে যাক ; তা না হলে, এখন আর আমার বিয়ের কথা নিয়ে আপনাদের কোনও চেষ্টা আর কোনও চিন্তা করবার দরকার নেই।

খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সেই বিভূতি আজ নীরাজিতার শরীরের সেই শ্রদ্ধার আবেশ বরণ করবার জন্য নীরাজিতার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু...কী যেন বলতে চায় নীরাজিতা। সুরভিত মূর্তিটাকে হঠাৎ একটু কুঁকড়ে দিয়ে আর আঁচলটাকে দু পাক দিয়ে হাতে জড়িয়ে রেলিং-এর কাছ থেকে এক-পা পিছনে সরে যায়।

বিভূতি হাসে। খরসোয়ানের এই ভয়ানক শান্ত রাতের চাঁদটারই মত নীরব ও ধবধবে সাদা হাসি। নীরাজিতার কাছে এগিয়ে আসে বিভূতি, আর নীরাজিতাকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে।

—আঃ, নীরাজিতার বুকে একটা অদ্ভুত রকমের আতঙ্কের নিশ্বাস যেন ফুঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু বিভূতির বুকের যত অনুভবের পেশি আর স্নায়ুগুলি যে নীরাজিতার সেই ভীরু শরীরের আর্তনাদ শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। নীরাজিতার কানের কাছে ফিসফিস করে বিভূতি। —আমার নীরা যে এইরকম ভয় পাবে, শিউরে উঠবে আর হেজিটেট করবে, এ আমি জানতাম...আমি জানতাম...আমি...বলতে বলতে বিভূতির মুখের সেই শান্ত হাসি যেন উগ্র আগুনের আভার মত জ্বলতে থাকে। বিভূতির প্রাণ যেন ঠিক এই রকম একটি লজ্জিত, কুণ্ঠিত, আতঙ্কিত ও ঠাণ্ডা কোমলতার ছোঁয়া আশা করেছিল। এই রকম একটি অনিচ্ছা-ভীরু শরীর ; এক-পা পিছনে সরে যাওয়া একটি চকিত বিস্ময় ; শরীরের উপর এই রকম একটি চরিত্রময় আবরণের অনাহত শাসন বাঁচিয়ে রেখেছে যে নারী, সেই নারীর ভালবাসাকেই যে ভালবাসা বলে মনে করে বিভূতি। খুশি হয়েছে বিভূতি ; বিভূতির কল্পনা আজ নীরাজিতার শুদ্ধ শরীরের সব অনুভব আর লজ্জা আপন করে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বিভূতির হাত দুটো ধন্য হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নীরাজিতা যেন এরই মধ্যে হাঁপাতে শুরু করে দিয়েছে। বিভূতির দু হাতের এই বন্ধনের বেড়া থেকে একটু আলগা হবার জন্য মাঝে মাঝে ছটফট করে উঠেছে নীরাজিতা।

বিভূতি বলে—কী, নীরা?

—ছাড়ো, একটা কথা বলছি, শোনো।

—বলো।

—শরীরটা ভাল বোধ করছি না। ভাল লাগছে না।

বিভূতি হাসে।—ভয় করছে, নীরা?

—হ্যাঁ।

আরও দুরন্ত আগ্রহে নীরাজিতাকে বুকের উপর চেপে ধরে বিভূতি। ভয় করছে নীরাজিতার? কী সুন্দর ভয়। বিভূতির চোখ দুটো যেন এই রকম একটি ভয় ছিন্নভিন্ন করবার সৌভাগ্যে মত্ত হয়ে দপদপ করে জ্বলছে। নীরাজিতার ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডা! কী চমৎকার শীতলতা! বিভূতির নিশ্বাসের পিপাসা যেন ঠিক এই রকম একটি শীতলতাকে লুব্ধ দংশনে বিক্ষত করবার জন্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

—এসো, নীরা।—নীরাজিতার হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চরম আহ্বানের ভাষা ধ্বনিত

করতে গিয়ে বিভূতির গলার স্বর যেন আরও মুগ্ধ হয়ে কেঁপে ওঠে।

আর, নীরাজিতার সুরভিত চেহারাটা দ্বিধাহীন আত্মোৎসর্গের মত বিভূতির সেই আহ্বানের স্বরে যেন বন্দি হয়ে বিভূতির পাশে পাশে হেঁটে ঘরের ভিতরে চলে যায়।

এবং তারপর, খরসোয়ানের রাতের চাঁদ যখন দূরের পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি এসে ধুলো বাতাসের আবরণে ময়লা হয়ে যায়, এবং বিভূতির এই চমৎকার বাড়ির চেহারাটাও ঠিক আর ধবধব করে না, তখন বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর স্নানসারা শরীরটাকে নতুন করে সাজাতে গিয়ে কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাজিতা। ভেজা শাড়িটা যেন একটা রক্তাক্ত স্মৃতির জ্বালাময় লজ্জার কুণ্ডলীর মত গুটিয়ে রয়েছে। আলক্তকের মেয়ের আতঙ্কিত শরীরটার প্রত্যেক লজ্জা আর বেদনার্ত চমকগুলিকে পরমলোভ্য প্রসাদের মত আত্মসাৎ করতে গিয়ে কী প্রখর আনন্দে জ্বলজ্বল করেছে অলক্তকের মেয়ের স্বামী ওই বিভূতির চোখ দুটো। কিন্তু জ্বলছে কেন নীরাজিতার স্নানসারা ঠাণ্ডা শরীরটা? কী আশ্চর্য, শরীরটাতে এখনও ময়লার ছোঁয়া লেগে আছে বলে মনে হয়।

খরসোয়ানের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে আর মিশিয়ে দিয়ে নীরাজিতার প্রাণটাও হেসে উঠতে পেরেছে। পুরো তিনটে মাস পার হয়ে গেল, তবু রাজপোখরার অলক্তকের কাছে ফিরে গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবার জন্য নীরাজিতার প্রাণে যেন কোনও দাবিই নেই। শীতলবাবুর কাছ থেকে অনেক চিঠি এসেছে। কবে আসতে চাও নীরাজিতা? দিন ঠিক করে শুধু একটা চিঠি দিয়ো ; তোমাকে আনবার জন্য সেদিনই গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু অলক্তকের এ রকম এক একটা স্নেহাক্ত আহ্বানের ব্যাকুলতার স্বর শুনেও বিচলিত হয় না নীরাজিতার মন। চিঠির উত্তরে চিঠি দেয় নীরাজিতা—যাব, কিন্তু দেখি কবে যেতে পারি। ওর যে এখন খুব কাজের চাপ ; একটুও সময় নেই।

বউদির চিঠি এসেছে।--বিভূতিবাবুর না হয় সময় নেই, কিন্তু তোমার সময়ের অভাব কোথায়? বিভূতিবাবুর না হয় কাজের চাপ কমে গেলে আসবেন। কিন্তু তোমার একবার আসতে অসুবিধে কিসের?

বউদির চিঠির উত্তরে যেকথা লিখে জানিয়েছে, এবং আজও চিঠিতে লিখেছে নীরাজিতা, সেকথা বউদিকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। এবং বউদিও মন্তব্য করেছেন, এ রকমটি দেখিনি। দুটি দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি সহ্য করতে পারে না, এ যে একেবারে কপোত-কপোতীর প্রেম!

নীরাজিতার চিঠির বক্তব্য পাঠ করে অলক্তকের মানুষগুলি ঠিক দুঃখিত হতে পারেনি ; বরং মনে মনে একটু খুশিই হয়েছে। নীরাজিতা সত্যিই রাজপোখরাতে আসতে চায়, কিন্তু একলাটি আসতে চায় না। যেদিন আসবে, সেদিন দুজনে একসঙ্গেই আসবে। বিভূতির কাছছাড়া হয়ে দুটো দিনের অলক্তকের জীবনও সহ্য করতে কষ্ট হবে নীরাজিতার ; বেশ তো, আরও কিছুদিন দেরি করুক, তারপর দুজনে যেন একসঙ্গেই আসে।

অলক্তকের মানুষেরাও এই তিন মাসের মধ্যে কয়েকবার এসে নীরাজিতার খরসোয়ান-জীবনের হাসি আনন্দ আর তৃপ্তির ছবি দেখে গিয়েছে। সারাদিন বইপড়া আর ফুলের আদরের যত কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে নীরাজিতা। টবের ফুলের গাছগুলিকে দিনে তিন চার বার করে যত্ন করা ; সকাল সন্ধ্যা দু বেলা ফুল তুলে মনের মত করে তোড়া বাঁধা, আর সেগুলি ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা ; এই কাজ।

সন্ধ্যাবেলা যখন ঘরে ফেরে বিভূতি, তখন বিভূতিও দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়, এবং বিভূতির চোখের চাহনিতে সুন্দর একটি তৃপ্ত অহংকারের হাসিও জ্বলজ্বল করে! নীরাজিতা যেন বিভূতিরই জীবনের সান্ধ্য-অভ্যর্থনা হয়ে আর সুন্দর সাজে সেজে অপেক্ষায় রয়েছে। বিভূতি এসে চেয়ারের উপর বসে পড়তেই নীরাজিতা নিজের হাতে বেবি-টেবিলটাকে টেনে

নিয়ে এসে বিভূতির সামনে রাখে; টাটকা তোলা ফুলের তোড়া দিয়ে সাজানো একটা ফুলদানি টেবিলের উপর রেখে দিয়েই চলে যায় নীরাজিতা। তার পর চায়ের পট নিজের হাতে তুলে নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখে। তারপরেই বিভূতির পাশের চেয়ারে বসে পড়ে নীরাজিতা।

—রাজপোখরা থেকে কোনও চিঠি এসেছে?

—হ্যাঁ।

—কী লিখেছে?

—ওই একই কথা।

বিভূতি হাসে।—বেশ তো, দুদিনের জন্য একবার ঘুরে এসো না কেন, নীরা?

—না, যদি যাই তবে দুজনে একসঙ্গে যাব।

—বেশ তো, তবে চলো, কালই চলো।

চমকে ওঠে নীরাজিতা।—কাল! কেন? তোমার কি সময় আছে? ছুটি নিয়েছ নাকি?

—ইচ্ছে করলেই ছুটি পেতে পারি।

নীরাজিতার চোখের চাহনি হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায়; যেন নীরাজিতার কল্পনার একটা ছবি হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। বিভূতি যদি ছুটি পায়, তবে বিভূতির সঙ্গেই রাজপোখরাতে যাবে নীরাজিতা। এই তো নীরাজিতারই ইচ্ছার কথা। এতদিন এই কথাই বলেছে আর চিঠিতে লিখেছে নীরাজিতা। কিন্তু সেই ইচ্ছার পথ মুক্ত হয়ে যেতেই নীরাজিতার উৎসাহ যেন চমকে উঠে দু পা পিছনে সরে যেতে চাইছে। রাজপোখরাতে যেতে চায় না নীরাজিতা।

—কেন নীরা? হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলে কেন?

নীরাজিতা যেন আনমনা ভাবনার ঝোঁকে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—না, এখন গিয়ে কোনও লাভ নেই।

—লাভ নেই! তার মানে?

হেসে ওঠে নীরাজিতা।—তার মানে, এখন রাজপোখরার বাগানে পাকা আমের গন্ধ থমথম করে না। আম পাকতে এখনও দেরি আছে।

—তা হলে বলো, আর মাসখানেক পরে রাজপোখরাতে যেতে চাও?

—হ্যাঁ?...তা যেতে হবে বলে আশা করতে দোষ কী?

—কীরকম যেন এলোমেলো কথা বলছ নীরা?

চমকে ওঠে নীরাজিতা।—এলোমেলো কথা?

—হ্যাঁ; মনে হচ্ছে, যেন কারও ওপর রাগ করে কথা বলছ।

নীরাজিতা ঝংকার দিয়ে হেসে ওঠে।—সত্যি কথা। রাগ হচ্ছে নিজেরই ওপর।

—কেন নীরা?

—বাবা আর বউদিকে এই সামান্য একটা কথা লিখতে পারলাম না যে, হ্যাঁ, অমুক দিন রাজপোখরাতে যাব। তা ছাড়া...বাড়ির চিঠিগুলোও এমন একঘেয়ে কথায় ভরা যে...

—কী?

—রাজপোখরাতে যাবার জন্য মনে কোনও উৎসাহ জাগে না।

বিভূতি হাসে।—এর আসল রহস্য কী, সেটা আমি বুঝতে পারছি।

—কী?

—খরসোয়ানের এই বাড়ির জীবনকে তুমি বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছ।

নীরাজিতা মাথা হেঁট করে লাজুক হাসি লুকোতে চেষ্টা করে।

—থাক ওসব কথা; আর এক কাপ চা খাও।

এর পর খরসোয়ানের সন্ধ্যাটা যেন দু ভাগ হয়ে যায়। ভিতরের একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে ইস্পাতের আলমারি খোলে বিভূতি। অনেক কাগজপত্রের ফাইল আর ব্যাঙ্কের অনেকগুলি জমার বই বের করে নিয়ে অন্তত একটা ঘণ্টা ধরে একটা হিসাবের আনন্দে তন্ময় হয়ে থাকে। আর, নীরাজিতা আস্তে আস্তে বারান্দার উপর পায়চারি করে বেড়ায়। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায় আর রেলিং-এর উপর দু হাতের ভর রেখে যেন আকাশের ত ারা গুনে গুনে একটা অদ্ভুত হিসাবের কাজে প্রাণটাকে ব্যস্ত করে রাখে।

আর, বুকের ভিতরের একটা দুঃসহ রাগের জ্বালার সঙ্গে যেন সমস্ত নিশ্বাসের জোর দিয়ে লড়াই করতে থাকে নীরাজিতা। রাগ হয় নিজের উপর ; মিথ্যে নয় নীরাজিতার এই ধারণা। আর, কে জানে কেন, রাগ হয় অলক্তকের সেই ফটকটার উপর ; রাগ হয় পৃথিবীর একটা বাস্তব সত্যের ভয়ানক নিষ্ঠুরতার উপর। নিশীথ রায় নামে সেই মানুষটার চরিত্রে দোষ থাকে কেন? মানুষটাই নিষ্ঠুর। ওকে ক্ষমা করা যায় না।

ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় নীরাজিতা। এবং এই লজ্জার মধ্যে যেন ভয়ানক গোপন অপমানের দংশন আছে। সে লোকটার উপর আবার রাগ হয় কেন? নীরাজিতার কাছে এসে ক্ষমা চাইবার জন্য কোনও চেষ্টা করল না ; বলতে গেলে একটা মুহূর্তও অপেক্ষা করল না ; একেবারে নির্লজ্জ লোভের ডাকাতের মত যাকে সামনে পেল তাকেই—প্রতিভার মত মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে চলে গেল। প্রতিভা কি ওর ঘরের সুখের লোভটাকে এতদিনে হতাশ করে দিয়ে, সেই ভদ্রলোকের কাছে...কী যেন সেই ভদ্রলোকের নাম, বিলেত থেকে ফিরে এসে কলকাতায় এখন একটা হোটেল করেছে যে ভদ্রলোক? প্রতিভার কীর্তির কথা যার কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিল নিশীথ!

চলে গেলেই তো পারে প্রতিভা। কালিকাপুর মাইনস্-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের বাংলো বাড়িতে মিছে মায়ার খেলা জমাবার চেষ্টা না করে তার চরিত্রের সেই প্রাক্তন বান্ধবের কাছে চলে যেতে লজ্জা কেন? ঠিকানা কি জানা নেই? নিশীথ রায় নামে মানুষটাকে শান্তিতে থাকতে দিক না কেন প্রতিভা।

কী অদ্ভুত চিন্তা। চিন্তার রকম দেখে নিজের এই মনটাকেই ঘেন্না করতে ইচ্ছা করে। নিশীথ রায় নামে সেই ভদ্রলোকের জীবনের ভালমন্দের কথা ভেবে খরসোয়ানের এই সান্ধ্য-জীবনের আনন্দ নষ্ট করে কেন নীরাজিতা?

যার কথা ভাবা উচিত, যার জীবনের সঙ্গিনী হয়ে খরসোয়ানের এই তিনটি মাসের দিন ও রাতের সঙ্গে হেসে খেলে প্রাণটাকে মিশিয়ে দিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করছে নীরাজিতা, তার হিসাবের কাজ শেষ হতে মাঝে মাঝে রাত হয়ে যায়। তারপর খাওয়া ; এবং তারপর...

অসহ্য! নীরাজিতার জীবনটা যেন বাথরুমের একটা মিররের সামনে দাঁড়িয়ে, ভেজা তোয়ালে দিয়ে শরীরের সব ঘৃণা মুছে মুছেও শুদ্ধ হতে পারে না। মনে হয় বুকের ভিতরে কোণে কোণে ময়লা লেগে আছে।

বাথরুমের মিররটাই শুধু জানে, এক-এক দিন কেঁদে ফেলেছে নীরাজিতা। এবং নীরাজিতাও ওর চোখের জল দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। কেন? কিসের যন্ত্রণা? শুদ্ধচরিত্র স্বামীর ছোঁয়া বরণ করে কোনও নারীর গা ঘিনঘিন করে উঠতে পারে না ; তবে কেন অলক্তকের মেয়ের এই শাস্তি?

দেখতে পাওয়া যায়, একটু দূরে একটা পোড়া বস্তির ছাই আর কয়লা ছড়িয়ে পড়ে আছে। খরসোয়ানে এসে এই চমৎকার বাড়ির জীবনের সাতটা দিন পার হতে না হতে এমনই এক সন্ধ্যায় ওই বস্তিটাতে আগুন লেগেছিল। বস্তির বুকটা যেন হঠাৎ আতঙ্কে ছিঁড়ে গিয়ে ভয়ানক চিৎকার করে উঠেছিল। বস্তির লোকেরা হাঁড়ি ক্যানেস্তারা আর বালতি হাতে ছুটে এসেছিল।

জল চাই ; আগুন নেবাবার জন্য এই বাড়ির বাগানের ওই প্রকাণ্ড ইঁদারা থেকে জল দেবার জন্য ফটকের কাছে এসে ভিড় করে চেঁচিয়ে উঠেছিল বস্তির লোকেরা—পানি চাহিয়ে, সাহেব। ঘর জল যাতা হ্যায়, সাহেব। মেহেরবানি কিজিয়ে, সাহেব।

কিন্তু কী চমৎকার নির্বিকার বিভূতির সেই চোখের দৃষ্টি। বস্তির আর্তনাদ শুনে একটুও বিচলিত হয়নি বিভূতি।—হঠ্ যাও, গোলমাল মত্ করো।—শুধু একটি কথা বলে দিয়ে চুপ করে গিয়েছিল বিভূতি।

বিভূতির সেই নির্বিকার চোখের দিকে তাকিয়ে নীরাজিতাও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেছিল—ওদের জল নিতে দিলে কী ক্ষতি হত?

বিভূতি গম্ভীর হয়ে বলেছিল, কী লাভ হত?

—অন্তত দু-চারটে ঘরের আগুন নেবাতে পারা যেত।

—বুঝলাম, কিন্তু তাতে আমার কী লাভ?

নীরাজিতার কান দুটো একটা কঠোর বিস্ময়ের আঘাতে যেন কিছুক্ষণের জন্য বধির হয়ে গিয়েছিল।

নীরাজিতার এই বধিরতা যখন ভেঙেছিল তখন শুনতে পেয়েছিল, গুনগুন করে যেন আপন মনের একটা সুখের সুরে কথা বলছে বিভূতি—আমার অনেকদিনের ইচ্ছা এতদিনে সফল হল।

—তার মানে?

—ওই বস্তিটাকে দেখলেই আমার চোখ দুটো ঘিনঘিন করত।

—কারণ?

—কারণ, ওই বস্তিতে যারা থাকে তারা...তারা হলো কতকগুলো দুশ্চরিত্র মেয়েলোক। ওটা একটা নরকগোছের জায়গা।

উত্তর দেয়নি নীরাজিতা। শুধু বিভূতির সেই শান্ত স্তব্ধ ও পবিত্র চেহারাটার দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়েছিল। এবং মনে মনে যেন নিজেরই একটা ভুল আর্তনাদের লজ্জা সহ্য করেছিল। বিভূতির মত মানুষকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না নীরাজিতা, কিন্তু সেটা বিভূতির দোষ নয়। বিভূতি ভুল করছে, বিভূতির অন্যায় হয়েছে, এতটা ভাবতে সাহস করতে পারে না নীরাজিতা। ভদ্রলোক কারও চরিত্রের কলুষ সহ্য করতে পারে না ; এর জন্য ভদ্রলোক এইরকম একটা মমতাহীন কাণ্ড করে ফেলল। করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সত্যিই তো মমতাহীন নয়।

আজও খরসোয়ানের এই অন্ধকারময় শান্ত সন্ধ্যায় নীরাজিতার সুরভিত চেহারাটা বারান্দার নিভৃতে পায়চারি করে ঘুরে বেড়ায় আর মাঠের বাতাস মাঝে মাঝে হু-হু করে ছুটে আসে। নীরাজিতার বুকের ভিতরের একটা বোবা বাতাস যেন হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।—নিশীথ রায়ের বুকটা কি এই রকম শান্ত কঠোর ও নির্বিকার?

বিশ্বাস হয় না ; সে মানুষটার বুকটা দুর্বল নিশ্চয়। এই রকম একটা বস্তির কতকগুলি চরিত্রহীন প্রাণীর আর্তনাদ শুনে সে লোকটা বোধ হয় নিজেই জলের ক্যানেস্তারা হাতে নিয়ে...

আবার সে ভদ্রলোকের কথা চিন্তা করে কী বুঝতে চাইছে নীরাজিতা? একটা মমতাময় বুক থাকলেই মানুষ সচ্চরিত্র হয়ে যায় না।

এই তো, আজ প্রায় এক মাস হল কোনও একটা কোলিয়ারির এক কম্পাসবাবু এসেছিলেন। কম্পাসবাবুর মেয়ের বিয়ে ; কিন্তু বিয়ের সব খরচ যোগাবার মত টাকা নেই। এদিক-ওদিকের দু-চারটে মাইনস্-এর ভদ্রলোকেরা প্রত্যেক দশ-বিশ টাকা সাহায্য করেছেন। এখন, আর এক শো টাকা হলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যান কম্পাসবাবু।

বিভূতি আর নীরাজিতা যখন সকালবেলা ড্রইংরুমে বসে গল্প করছিল, তখন এলেন কম্পাসবাবু। এবং বেশ আশান্বিত একটা ভাব নিয়ে, চোখের দৃষ্টিটাকে অদ্ভুতভাবে ছলছলিয়ে এক শো টাকা সাহায্যের আবেদন শোনালেন। সব কথা শোনবার পর বিভূতি শুধু একটি কথা বলল—'সরি'।

—আজ্ঞে?—ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

বিভূতি শুধু মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয়, না, হবে না।

চলে গেলেন কম্পাসবাবু। এবং নীরাজিতা আবার বোধ হয় একটা দুঃসহ বিস্ময়ের বেদনা সহ্য করতে না পেরে প্রশ্ন করেছিল—ভদ্রলোককে কিছু টাকা দিলেই পারতে।

—তাতে লাভ?

নীরাজিতার গলার স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।—একটা অভাবের মানুষকে সাহায্য করা হল, এই লাভ।

—আমার টাকাগুলো চ্যারিটির ফাণ্ড নয়, নীরাজিতা।

কিছুক্ষণ আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকবার পর কেমন-যেন একটা আক্রোশের স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে নীরাজিতা।—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—হ্যাঁ।

—এই ভদ্রলোককে তুমি চেন?

—খুব চিনি।

—ভদ্রলোকের মেয়েটিকে চেন?

—অনেকবার দেখেছি। বেশ হাসিখুশি চেহারা, দেখতেও বেশ মেয়েটা।

—মেয়েটি কেমন?

—তার মানে?

—চরিত্র কেমন?

—নিমাইবাবু, শ্যামবাবু, ঈশ্বরীবাবু সকলেই তো বলেন, খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে।

—তার মানে, সত্যিকারের ভাল চরিত্রের মেয়ে।

—তাই তো।

—তা হলে, অন্তত একটা সচ্চরিত্রতার জন্য খুশি হয়ে মেয়েটির বিয়েতে তোমার এক শো টাকা সাহায্য করা উচিত ছিল না কি?

—তুমি কম্পাসবাবুর তরফে ওকালতি করছ বলে মনে হচ্ছে?

নীরাজিতা হঠাৎ বলে ফেলে—আমি তোমাকে বুঝতে চাইছি।

বিভূতির চোখে সূক্ষ্ম একটা ভ্রূকুটির ছায়া কেঁপে ওঠে।—আমাকে বুঝতে কি তোমার কিছু বাকি আছে?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—তবে বুঝতে চেষ্টা করো।

—সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা করছি, কম্পাসবাবুকে ওভাবে এক কথায় 'না' বলে ফিরিয়ে দিলে কেন?

—লোকটা ভয়ানক চালাক এবং অসৎ।

—কেন?

—লোকটার ছোট একটা বাড়ি আছে। লোকটা অনায়াসে বলতে পারত যে, আপনি দয়া করে বাড়িটা বন্ধক রেখে আমাকে কিছু টাকা দিন। তা হলে বুঝতাম যে, গরিব হলেও লোকটার মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যারা টাকা দান চায়, তারা মানুষ নয়।

—কিন্তু যারা টাকা দান করে, তারা তো অমানুষ নয়।

—আমার মতে তারাও অমানুষ।

নীরাজিতার চেহারাটা যেন নিশ্বাসহীন একটা স্তব্ধতার প্রতিমূর্তির মত বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবং বিভূতি হঠাৎ বিড়বিড় করে ওঠে।—আমি নিশীথ রায় নই, নীরা।

—তার মানে?

—মেয়েমানুষের দুঃখের কথা শুনলেই যে চরিত্রহীনের মেরুদণ্ড মায়ায় গলে যায়, আর পকেট খালি করে টাকা ঢালে, সে মানুষ আমি নই।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে হাসতে থাকে নীরাজিতা। খরসোয়ানের এই চমৎকার শুদ্ধতার জীবন, যে জীবন চাঁদের আলোতে ধবধব করে, সেই জীবনের ভার যেন অলক্তকের মেয়ের অদৃষ্টের উপর অনড় হয়ে বসে কড়কড় শব্দ করছে। অলক্তকের মেয়ের সহ্যের পাঁজরগুলি পটপট করে বাজছে। সেই ভয়ানক যন্ত্রণাকে প্রচণ্ড একটা ফাঁকির হাসি দিয়ে ভুলিয়ে দেবার জন্য শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নীরাজিতা।

বিভূতিও হাসে—এখন বুঝতে পেরেছ বোধ হয়।

—হ্যাঁ।

—তবে? তুমি মিছেমিছি তর্ক করলে আমার বেশ খারাপ লাগে, নীরা।

নীরাজিতা হাসে—আর তর্ক করব না।

আর তর্ক করেনি নীরাজিতা। কারণ আর কিছু বোঝবারও বোধ হয় বাকি নেই। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের এই বিভূতির জীবনে সোনারূপার কোনও বালাই নেই ; আছে শুধু একটি ঐশ্বর্য, পরশমানিকের মত যে ঐশ্বর্য সব ঐশর্যের সেরা—চরিত্র।

নীরাজিতার এই বিশ্বাসও মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়েছে। দেখেছে নীরাজিতা, বিভূতি নামে এই মানুষটির চরিত্রে যেন শানিত হীরার ধার আছে। তা না হলে, লিস্টারের বাড়িতে কক্‌টেল আর নাচের নিমন্ত্রণ পেয়েও সারাটা সন্ধ্যা নীরাজিতার কাছেই চুপ করে বসে থাকতে পারলে কেমন করে বিভূতি?

—না, নীরা ; ওসব হুল্লোড়ের মধ্যে যেতে একটুও ইচ্ছে করে না।

—কেন?

—কোথা থেকে তিনটে ধিঙ্গি-ধিঙ্গি মিস এসে ঠাঁই নিয়েছে লিস্টারের বাড়িতে। ওসবের ছায়ার কাছেও যেতে নেই।

—কেন?

—গেলে বিপদে পড়তে হবে। ধিঙ্গিগুলোর পেটে এক গেলাস হুইস্কি-সোডা পড়লেই আর রক্ষা নেই। হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দেবে।

বিভূতির কথাগুলিকে শ্রদ্ধা করবার জন্য যেন প্রাণপণে চেষ্টা করে নীরাজিতা। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে বিভূতির গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। নীরাজিতার মনটাও যেন ব্যাকুলভাবে কামনা করছে, বিভূতির কথাগুলি শুনতে শুনতে ভরে যাক না কেন মন।

ঠিক সেই সময় বাইরে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায় একটা মূর্তি ; এবং সেদিকে চোখ পড়লেই বুঝতে পারে নীরাজিতা, সেই কম্পাসবাবু এসেছেন।

—কী ব্যাপার? আবার কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন?

কম্পাসবাবুর হাতে একটা হাঁড়ি। হাসছেন কম্পাসবাবু। আজ মেয়ে-জামাই এসেছে, স্যার। তাই এই সামান্য...

—কী?

—জয়নগরের মোয়া। জামাই নিয়ে এসেছে। সবসুদ্ধ চার হাঁড়ি এনেছিল। নিমাইবাবুর বাড়িতে, শ্যামবাবু আর ঈশ্বরীবাবুর বাড়িতে এক এক হাঁড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছি ; আর এটি স্যার আপনার জন্য...

হো-হো করে হেসে ওঠে বিভূতি।—বেশ বেশ ; এনেছেন যখন, তখন রেখে যান।

বারান্দার মেঝের উপর হাঁড়িটাকে নামিয়ে রেখে এবং হাসিমুখে একটা নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন কম্পাসবাবু।

আর, নীরাজিতার চোখ দুটো যেন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। হাঁড়িটার দিকে নয়, বিভূতি নামে এই শুদ্ধচরিত্র মানুষের মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে নীরাজিতা।

বিভূতি হাসে—কম্পাসবাবুকে দেখে তুমি খুব চটে গিয়েছ বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তোমার মত মানুষকে কত সহজে ঘৃণা করতে পারে একটা সামান্য মানুষ।

—ঘৃণা?

—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কী? নইলে তোমাকে এক হাঁড়ি মোয়া দিয়ে যাবে কেন সেই মানুষ, যার মেয়ের বিয়েতে তুমি এক শো টাকাও দিতে পারলে না, আর মানুষটাকে এক কথায় হাঁকিয়ে বিদেয় করে দিলে?

বিভূতি হাসে—লোকটা আমাকে ঘৃণা করতে এসে যে এক হাঁড়ি মোয়া রেখে যেতে বাধ্য হল।

—খুব লাভ হল বোধ হয়?

—খুব না হোক, অন্তত পাঁচটা টাকা লাভ হল।

—তা হলে বল তোমার অপমানের ফি হল পাঁচ টাকা। যে কোনও মানুষ ইচ্ছে করলেই পাঁচ টাকা তোমার হাতে তুলে দিয়ে তোমার গায়ে...

আর বলতে পারে না নীরাজিতা। যে কথাটা নীরাজিতার মুখের কাছে চলে এসেছে, রুমাল দিয়ে চেপে যেন সেই কথাটাকে নীরব করে দেয়।

এবং সেদিনই খরসোয়ানের মাঝরাতের নীরবতার মধ্যে বাথরুমের মিররের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার থুতু ফেলে যেন বুকের ভিতরের একটা ঘৃণার উদ্‌গার শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল নীরাজিতা।

নীরা? নীরা?—আস্তে আস্তে হেঁটে আর মৃদুস্বরে ডাক দিতে দিতে এই সময় রোজই যেমন নীরাজিতার কাছে দাঁড়ায় বিভূতি, ঠিক সেভাবে নয়, যেন একটু ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে, হন্তদন্ত হয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসে বিভূতি। রোজই এই সময় চোখের চাহনি নিবিড় করে নিয়ে যেভাবে হাসে বিভূতি, আজ ঠিক সেভাবে নয়, যেন একটা অস্বস্তিকে কোনওমতে রুক্ষ হাসি দিয়ে হাসিয়ে নীরাজিতার কাছে এসে দাঁড়ায়। এই সময় নীরাজিতার হাত ধরতে গিয়ে বিভূতির হাতটা রোজই যেমন একটু নরম হয়ে যেতে চেষ্টা করে, আজ কিন্তু ঠিক তেমন করে নরম হয়ে যাবার চেষ্টা করে না। বরং বিভূতির হাতটা যেন সন্দেহে ও অভিযোগে বেশ একটু কঠিন হয়ে নীরাজিতার হাত ধরে—আমি এতটা ভাবতে পারিনি, নীরা!

আশ্চর্য হয় নীরাজিতা—কী?

—তুমি বাইরে এক রকম আর ভিতরে আর এক রকম, ছিঃ!

চমকে ওঠে নীরাজিতা।—এরকম অদ্ভুত সন্দেহের মানে?

—তোমাকে আমি কোনওদিন অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু আজ করতে হচ্ছে।

নীরাজিতার চোখ জ্বলে ওঠে—স্পষ্ট করে বলো, কিসের অবিশ্বাস?

বিভূতি গম্ভীর হয়।—দোষ করেও তোমার এত রাগ করে কথা বলা একটুও ভাল দেখায় না।

নীরাজিতা চেঁচিয়ে ওঠে—কিসের দোষ? চরিত্রের?

বিভূতি হেসে ফেলে।—ছিঃ, সে সন্দেহ থাকলে কি আজ তোমার হাত ধরে কথা বলতাম?

—সন্দেহ করলেই পারতে।

—সন্দেহ করব কেন? আমি ইডিয়ট নই। তা ছাড়া...

—কী?

নীরাজিতার কানের কাছে মুখ এগিয়ে ফিসফিস করে বিভূতি। আর নীরাজিতার শরীরটা যেন ঘৃণাক্ত ক্ষতের জ্বালায় থরথর করে কেঁপে ওঠে। খরসোয়ানের জীবনের সেই প্রথম রাতের আর্তনাদটা বুকের ভিতর গুমরে উঠেছে। বাথরুমের মিররটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। রক্তাক্ত বেদনার স্মৃতি লুকিয়ে রেখে ভেজা শাড়ির কুণ্ডলিটা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। নীরাজিতার বাইশ বছর বয়সের এই শরীরটার অনাহত চরিত্রনিষ্ঠার প্রমাণ পেয়ে কি উৎকট খুশির হাসি হেসেছিল অলক্তকের মেয়ের স্বামী।

বিভূতি বলে—সে কথা নয়। আমার অভিযোগ হল আমার সন্দেহ...তুমি আমার আলমারি খুলে ব্যাঙ্কের জমার বইগুলো নাড়াচাড়া করেছ আর দেখেছ।

—কেন এমন সন্দেহ হল?

—আলমারির চাবিটা যেখানে থাকে, আজ চাবিটাকে সেখানে পেলাম না।

—তুমি মনে করে দেখো, চাবিটা কোথায় রেখেছিলে।

—চাবিটা টেবিলের দেরাজে ছিল। কিন্তু চাবিটাকে বালিশের তলা থেকে পেলাম।

—তুমিই বালিশের তলায় চাবিটাকে রেখেছিলে। কিন্তু ভুলে গিয়েছ।

—না ; আমার ভুল হয় না।

বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে আর দু চোখের চাহনিকে যেন পুড়িয়ে পুড়িয়ে কথা বলে নীরাজিতা—তোমার ব্যাঙ্কের জমার বইগুলো যদি আমি দেখে থাকি তো দেখেছি। তাতে তোমার ক্ষতি কী?

—তাতে আমার লাভ কী? ওসব জিনিস তুমি ছুঁলে কি আমার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ডবল হয়ে যাবে?

—এতদিনে...এইবার বুঝলাম।

—কী বুঝলে?

নীরাজিতার চোখের চাহনি যেন ঠক ঠক করে কাঁপে। হাতের রুমালটাকে মুখর কাছে তুলে নিয়ে আস্তে একবার কামড়ে ধরে। তারপরেই হেসে ওঠে।—তুমি সচ্চরিত্র।

—ঠাট্টা করছ বলে মনে হচ্ছে।

—তোমার মত মানুষকে ঠাট্টা করব?

—ছিঃ!

নীরাজিতাকে আস্তে আস্তে বুকের কাছে টানে বিভূতি ; আর নীরাজিতাও বিভূতির কাঁধের উপর মাথাটা এলিয়ে দেয়, আর অদ্ভুতভাবে যেন ডুকরে ডুকরে হাসতে থাকে। বিভূতি বলে—রাজপোখরা থেকে চিঠি এসেছে।

—কে লিখেছে?

—তোমার বাবা।

—কী লিখেছে?

—সব ভাল খবর। একটা মজার খবরও আছে।

—কী?

—সেই চরিত্রহীন দম্পতি রাজপোখরাতে এসেছেন।

—কে? কে? কারা এসেছে?—ছটফট করে বিভূতির হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে নীরাজিতা।

—নিশীথ আর প্রতিভা। আধপাগলা বেকুব, সেই শিবদাস দত্ত একেবারে নির্লজ্জ হয়ে রোজই উৎসব করছে।

বিড়বিড় করে নীরাজিতা—জঘন্য। কী ভয়ানক দুঃসাহস!

—কী বললে নীরা?

—বেশ বুঝতে পারছি, বাবাকে অপমান করবার জন্য, চরিত্রহীনতার বড়াই দেখাবার জন্য ওরা রাজপোখরাতে এসেছে।

—ছেড়ে দাও ওদের কথা।

নীরাজিতা চেঁচিয়ে ওঠে—না, কখখনও না।

বিভূতি আশ্চর্য হয়—কী বললে?

—আমি কালই রাজপোখরায় যাব।

—কিন্তু আমার তো ছুটি নেওয়া সম্ভব হবে না, নীরা।

—তুমি ছুটি নিয়ে পরে এসো, আমি কালই চলে যাই।

—কিন্তু...

নীরাজিতা যেন উতলা হয়ে ভয়ানক এক প্রতিশোধের স্বপ্নের সঙ্গে কথা বলতে থাকে।—কিন্তু আবার কি? একবার অপমানিত হয়ে শিক্ষা হয়নি ; আবার এসেছে ; আমার সৌভাগ্যকে ঠাট্টা করতে এসেছে একটা...এইবার আরও ভাল শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে।

প্রতিভা বলে—বড় জোর দুটি দিন, তার বেশি দেরি হবে না।

নিশীথ হাসে—ভয় হয় ; শেষ পর্যন্ত সাত দিন করে ফেলবে।

—না, ইচ্ছে করে একটি দিনও দেরি করব না।

—কিন্তু এই দুটি দিনই বা আমি একা একা কেমন করে...।

—বই-টই পড়ে কোনওমতে দুটি দিন পার করে দাও, লক্ষ্মীটি।

নিশীথ আবার হাসে—আচ্ছা, তাই হবে। এসো তা হলে।

চাইবাসা যেতে হবে। প্রতিভার ছোট মাসিমা যিনি তিন বছর ধরে রোগশয্যায় পড়ে আছেন, জপের মালা হাতে নিয়ে আর খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে চরম অন্তিমের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলেন যিনি, তিনি আর মালা জপতে পারছেন না। খবর এসেছে, বুকটা এখনও টিপটিপ করছে। যে কোনও মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেতে পারে।

তাই চাইবাসা যাবার জন্য তৈরি হয়েছেন শিবদাস দত্ত। প্রতিভাও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে। মর-মর ছোট মাসিমাকে শেষ দেখা দেখে নিয়ে ফিরে আসবে।

কথা আছে, হরবংশবাবু তাঁর গাড়িটা পাঠাবেন। গাড়িটা এলেই রওনা হয়ে যাবেন শিবদাস দত্ত আর প্রতিভা। শিবদাস দত্তও নিশীথকে সান্ত্বনা দিয়েছেন—মাত্র দুটো দিন নিশীথ। আমি ইসমাইলবাবুকে বলে রেখেছি ; তাঁর পোলট্রি থেকে দুটো ভাল জাতের মুরগি পাঠিয়ে দেবেন। তুমি আমার কুকিং ডিক্সনারি দেখে নিজের পছন্দমত একটারান্না বেছে নিয়ে..হ্যাঁ, যদি গ্রেভি একটু ঘন করে নিতে চাও, তবে পাঁচ চামচ কাস্টার্ড পাউডার মিশিয়ে নিও।

কিন্তু ফটকের সামনে রাস্তার উপর যে গাড়িটা ছুটে এসে দাঁড়াল, যে গাড়ির শব্দ খুব জোরে একবার গরগর করেই থেমে গেল, সেটা হরবংশবাবুর গাড়ি নয়। শিবদাস দত্ত সে গাড়ির দিকে তাকিয়েও চিনতে পারেন না, কার গাড়ি!

কিন্তু নিশীথ চিনতে পারে, এবং নিশীথের চোখ দুটোও একটু আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে। গাড়িটা যে কালিকাপুর মাইনসের জনস্টনের গাড়ি।

গাড়ি থেকে প্রথমে যিনি নামলেন, তাঁকে খুব ভাল করেই চেনেন শিবদাস দত্ত। নিশীথও চিনতে পারে, তিনি হলেন এই লাক্ষানগর রাজপোখরারই মিসেস ফস্টার ; বিয়ের দিনে যিনি এই বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে এবং কত খুশি হয়ে নিশীথ আর প্রতিভাকে ব্লেসিং জানিয়েছিলেন।

কিন্তু মিসেস ফস্টারের পরেই গাড়ি থেকে নামলেন যে তরুণী, তাঁকে শিবদাস দত্ত চেনেন না। এক শাড়িপরা শ্বেতাঙ্গি তরুণী, ফরফর করছে তরুণীর সোনালি চুলের বব্।

নিশীথ কিন্তু তরুণীকে চিনতে পারে ; আরও আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে নিশীথের চোখ। প্রায় এক মাস ধরে কালিকাপুর জনস্টনেরের বাংলোর ছোট একটা কাচের গেলাস হাতে নিয়ে আরাম-চেয়ারের উপর যে নারীকে বসে থাকতে দেখেছে নিশীথ, সেই নারী।

কখনও গাউনপরা এবং কখনও ব্রিচেসপরা সেই নারীকে রোজই সন্ধ্যায় জনস্টনের সঙ্গে বেড়াতে কিংবা শিকারে যেতে দেখেছে নিশীথ।

সেই মূর্তিকে আজ শাড়ি-জড়ানো সাজে দেখতে পেয়েও তার মুখটাকে বেশ স্পষ্ট চিনতে পারা যায় ; এই তো সেই মুখ, যে মুখের রঙ কাচের গেলাসের চেরি-মদেরই মত সব সময় লাল টকটকে উচ্ছলতায় টলমল করতে দেখেছে নিশীথ। জানে না নিশীথ, কে এই আগন্তুক, জনস্টনের বাংলোতে এসে প্রায় পনেরো দিন ধরে যে ঠাঁই নিয়েছে। মাইনস্-এর লোকেরা বলে, বিলেত থেকে জনস্টনের এক বান্ধবী এসেছেন।

মিসেস ফস্টারের মুখ গম্ভীর। কিন্তু সে শ্বেতাঙ্গি তরুণীর মুখটা যেন চটুল হাসির একটা ফোয়ারার মুখ। মিসেস ফস্টারের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এবং বাড়ির বারান্দার উপরে উঠে শিবদাস দত্তের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে শ্বেতাঙ্গি তরুণী।--নমস্কার!

বেশ ভাল বাংলা বলতে পারে এই শ্বেতাঙ্গি তরুণী। এবং মিসেস ফস্টারই পরিচয় করিয়ে দেন--আমারই আত্মীয়ের, আমার এক কাজিন ব্রাদারের মেয়ে।

শ্বেতাঙ্গি হাসে--আমি লিজা মিটার ; আমি আপনার মত একজন খাঁটি বাঙালির পত্নী।

শিবদাস দত্ত বিব্রতভাবে হাসেন--শুনে বড় খুশি হলাম মা।

রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন মিসেস ফস্টার।--কিন্তু আমি ওর জঘন্য উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে চাই।

শিবদাস দত্ত অপ্রস্তুতের মত তাকান।--উপদ্রব?

--হ্যাঁ, অসহ্য উপদ্রব। সব সময় মদ খুঁজছে, টাকা চাইছে আর গেলাস ভাঙছে। সেই কারণে আপনার কাছে এসেছি মিস্টার দত্ত।

--আমি কী করতে পারি বলুন?

--আমাকে এক হাজার টাকা ধার দিন। টাকাটা ওর হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই। ও বলছে, এক হাজার টাকা হাতে পেলে চলে যাবে।

--আমি কিছু বুঝতে পারছি না মিসেস ফস্টার।

--এই দুরন্ত মেয়ে সিমলা চলে যেতে চায়। চলে যাক, এখনি চলে যাক। আমি আর ওকে এক মিনিটও এখানে থাকতে দিতে ইচ্ছুক নই।...প্লিজ মিস্টার দত্ত, আমাকে উদ্ধার করুন।

একটা চেয়ারের উপর ধপ করে বসে পড়ে লিজা মিটার ; আর পা দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে বার বার ঘরের ভেতরের একটা আলমারির দিকে তাকায়। জ্বলজ্বল করে লিজা মিটারের চোখ।

শিবদাস দত্ত উঠে দাঁড়ান ; বোধ হয় টাকা আনবার জন্য ঘরের ভিতরে যেতে চান। লিজা মিটার হঠাৎ মাথা দুলিয়ে, আর সোনালি চুলের বব্ কাঁপিয়ে শিবদাস দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে। আপনার সেলারে ভাল বস্তু আছে বলে মনে হয়।

—চুপ লিজা। গর্জন করে ওঠেন মিসেস ফস্টার।

লিজা মিটার মুখে রুমাল ছুঁইয়ে আরও জোরে শব্দ করে হাসতে থাকে। প্রতিভার মুখের দিকে আস্তে একটা শিথিল চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে নিশীথের মুখের দিকে তাকায়। আবার জ্বলজ্বল করে লিজা মিটারের চোখ।

উৎফুল্ল হয়ে হি-হি করে হেসে কথা বলে লিজা—আমার স্বামী আপনার মত বয়েসের মানুষ। বেচারা আমার ইচ্ছার ফ্রিডমে একটুও বাধা দেয় না। সেইজন্যেই আমি সুখী ; আমার জীবন অত্যন্ত সুখী জীবন।

মুখ ফিরিয়ে বাগানের ডালিয়ার দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে থাকে নিশীথ। প্রতিভা বারান্দা থেকে সরে গিয়ে সিঁড়ির তিন ধাপ নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মিসেস ফস্টার লজ্জিত ও বেদনার্ত মুখ নিয়ে এক হাতে কপাল টিপে আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

টাকা আনতে ঘরের ভিতর চলে যান শিবদাসবাবু। লিজা মিটার বলে—মাত্র চার মাস হল স্বামীর সঙ্গে ইণ্ডিয়াতে এসেছি। ক্যালকাটাতে এক মাস ছিলাম। বাস, তার পর আর নয়। স্বামীকে স্পষ্ট বলে দিলাম, ক্যালকাটার হোটেল নরকের চেয়েও খারাপ।

কেউ কোনও প্রশ্ন করছে না, কিন্তু লিজা মিটারের মুখ থেকে যেন একটা বৃত্তান্তের ফোয়ারা আপনি উথলে উঠছে। ইণ্ডিয়াতে আসবার পর থেকে কোথাও একটানা এক মাস থাকতে পারেনি লিজা মিটার। কলকাতার হোটেল ছেড়ে দিয়ে অল্প দিনের জন্য শিলং-এ গিয়েছিল লিজা। লিজার স্বামী বড় চমৎকার ভদ্রলোক, কোনও আপত্তি করেননি। বরং এক বন্ধুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে নিয়ে এসে লিজার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দমদম পর্যন্ত লিজার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন ; আর প্লেন ছাড়বার আগে লিজাকে বিদায় দিতে গিয়ে লিজাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরতেও চেয়েছিলেন ; কিন্তু...

শিলং-এর পর ডিব্রুগড়। মিস্টার ওয়ালটারের বাড়িতে পাঁচ দিনের অতিথির জীবন ; কী চমৎকার পাঁচটি উৎসবের দিন। তার পর চা-বাগান ; সেখানে সাত দিন। মিস্টার ডণ্ট, কী সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক। ডণ্টের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাতটি সকালের গল্‌ফ খেলার আনন্দ আজও ভুলতে পারেনি লিজা মিটার।

তারপর দার্জিলিং। তারপর ভাইজ্যাগ ও রাঁচি। এক এক জায়গা থেকে বন্ধুদের আমন্ত্রণ আসছেই, আর লিজা মিটারও সেই আমন্ত্রণের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য ছুটে যাচ্ছে।—প্রভাত-বেলার ঘুম-ভাঙা সুখী হংসীর মত আমি উড়ে বেড়াই। বলতে বলতে আবার হেসে ওঠে লিজা মিটার।

শিবদাস দত্ত ঘরের ভিতর থেকে এসে মিসেস ফস্টারের হাতে টাকা তুলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেয় লিজা মিটার। এবং মিসেস ফস্টারও লিজার হাতে টাকা ফেলে দিয়ে হাঁপ ছাড়েন।

টাকা হাতে পেয়েই উঠে দাঁড়ায় লিজা মিটার। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দিকে তাকায়। ছটফট করে কাঁপতে থাকে লিজা মিটারের জ্বলজ্বলে চোখ। আমার স্বামী, ভেরি ইনোসেণ্ট লাভিং স্বামী। বেচারা আমাকে ধরবার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। খবর পেয়েছি, আমার খোঁজে শিলং-এ গিয়েছিল ভদ্রলোক। তারপর একবার ডিব্রুগড় ঘুরে সোজা রাঁচিতে গিয়েছিল। আশঙ্কা হয়, আজ হয়ত কালিকাপুরে এসে গিয়েছে ভদ্রলোক।...কিন্তু বৃথা...ভদ্রলোক বৃথা হয়রান হচ্ছেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় লিজা মিটার। পর-মুহূর্তে প্রায় একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে আর সিঁড়ি ধরে তরতর করে নেমে যেতে থাকে। মিসেস ফস্টার আর-একবার জোরে হাঁপ ছাড়েন।

হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ায় লিজা। সোনালি চুলের বব্ দুলিয়ে আর অভিবাদনের ভঙ্গি

করে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায়।—বিদায় ; নমস্কার!

—আপনার স্বামীর নাম?

লিজা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—চমৎকার নাম। মিহিরকুমার মিটার।

চলে যায় লিজা। ফটকের কাছে এসে গাড়ির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে—সিধা চল খড়গপুর।

লিজা মিটারকে নিয়ে গাড়িটা শব্দ করে ফটকের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণের জন্য শিবদাস দত্তের বাড়ির বারান্দাটা যেন শব্দহারা হয়ে যায়।

প্রথম কথা বলেন মিসেস ফস্টার।—কী অপমান! কী অপমান! নির্লজ্জ মেয়েটা আমার খানসামাকে চড় মেরেছে, ওর সন্ধ্যাবেলার রাক্ষুসে পিপাসার জন্য হুইস্কি এনে দিতে পারেনি বলে।...যাক, আপনাকে হাজার ধন্যবাদ, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমি সাত দিনের মধ্যে আপনাকে টাকাটা দিয়ে যাব।

মিসেস ফস্টার বারান্দা থেকে নেমে ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। শিবদাসবাবুও মিসেস ফস্টারের সঙ্গে নানা সান্ত্বনার কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান। আর প্রতিভার মুখের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে নিশীথ রায়। ডালিয়ার বাগানের দিকে ও রকম ফ্যালফ্যাল করে ভীরুর মত তাকিয়ে আছে কেন প্রতিভা?

প্রতিভার কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে নিশীথ—কী হল প্রতিভা?

প্রতিভা মাথা নাড়ে—কিছু না।

—লিজা মিটারের অবস্থা দেখে মন খারাপ লাগছে বোধ হয়?

—না।

—তবে?

—মিহিরকুমার মিত্রের অবস্থার কথা ভেবে খারাপ লাগছে।

—কেন?

—ভদ্রলোককে আমি জানি।

—কীরকম ভদ্রলোক?

—সচ্চরিত্র।

চমকে ওঠে নিশীথ। প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে নিশীথের চোখের চাহনি উদাস হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাসের বাতাস হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে বুকের ভিতরে যেন গুমগুম শব্দ করে বেজে উঠল।

কথা বলতে গিয়ে নিশীথের ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় ; দাঁতে দাঁতে ঘষা লেগে শব্দ হয় যেন—এই মিহির মিত্রই বোধ হয়...

—হ্যাঁ।

কেঁপে ওঠে নিশীথের চোখ। কত সহজে জীবনের এক ভয়ানক অপমানের স্বীকৃতি শুনিয়ে দিল প্রতিভা। প্রতিভার এই মুখর দুঃসাহসের মূর্তিটিকে দেখতে ভয় করে, দেখতে ভাল লাগে না। মিহির মিত্রের অবস্থার কথা ভেবে শিবদাস দত্তের মেয়ের চোখে কী ভয়ানক ও কী নির্লজ্জ করুণা ছলছল করছে।

রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল! এতদিনে যেন গানটার অর্থ বুঝতে পারা যাচ্ছে। গানটা একটা ধিক্কার।

—বুঝলাম। বলতে গিয়ে নিশীথের গম্ভীর গলার স্বর যেন তপ্ত হয়ে ধকধক করে, বেচারা মিহির মিত্রের জন্য তোমার মায়া এখনও...।

—মিহির মিত্রের জন্য নয়।

—তবে কার জন্য?

—মানুষের জন্য।

—উঃ, মস্ত বড় দার্শনিকের মত কথা বলছি দেখছি।

প্রতিভার চোখ থরথর করে কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ জলে ভরে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে প্রতিভা।—আজ বোধ হয় আমাকে ঘেন্না করতে পারছ নিশীথ?

—কী বললে? হেসে ওঠে নিশীথ।

—কোনও মানুষ কোনকালের একটা ভুলের জন্য মিহির মিত্রের মত এত বড় শাস্তি পাবে, ভাবতে আমার একটুও ভাল লাগে না নিশীথ ; আমার সত্যি ভয় করে।

প্রতিভা নয়, মনে হয়, জীবনের রূপসাগরের একটা রহস্যের ঢেউ হঠাৎ উথলে উঠে কলস্বরে কথা বলছে। নিশীথের বুকের ভিতর একটা কাপুরুষ অহংকার যেন লজ্জা পেয়ে শিউরে উঠেছে।—প্রতিভা, ডাকতে গিয়ে প্রতিভার হাত ধরে ফেলে নিশীথ।

হেসে ফেলে নিশীথ ; আর, হঠাৎ যেন ছেলেমানুষের মত দুরন্ত আনন্দে চঞ্চল হয়ে প্রতিভাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায়।

ঘরের ভিতরে একটি বড় মিরর। তারই সামনে দাঁড়িয়ে নিশীথ আর প্রতিভা মিররের বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে থাকে প্রতিভা, নিশীথ রায়ের মুখটা কী সুন্দর পিপাসার আবেশে উৎসুক হয়ে প্রতিভার কপাল ছুঁয়ে রয়েছে। দেখতে থাকে নিশীথ, প্রতিভার হাত দুটো কী নিবিড় আগ্রহে নিশীথের গলা জড়িয়ে ধরেছে।

নিশীথ হাসে।—উঃ, আর একটু হলে পরীক্ষায় ফেল করে ফেলতাম প্রতিভা।

—থাক ওসব কথা। এখন দুটো দিন...

ফটকের কাছে আগন্তুক-গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা যায়। নিশীথ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে বলে—হরবংশবাবুর গাড়ি এসেছে বোধ হয়।

নিশীথের কপালে হাত বুলিয়ে প্রতিভাও বিমর্ষভাবে বলে।—শুধু দুটো দিন, লক্ষ্মীটি, মন খারাপ করো না।

নিশীথ হাসে—ইচ্ছে করলেই কি মন খারাপ বন্ধ করা যায়!

প্রতিভা হাসে—আমি একটা উপায় বলে দিতে পারি, যাতে মন খারাপ না হয়।

—বলো।

—এই দুটো দিন শুধু মনে করবে যে, আমি এই পাশের ঘরে বসে আছি।

শিবদাস দত্ত ডাক দেন—এইবার রওনা হতে হয় প্রতিভা।

আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন শীতল সরকার।—এ কী অদ্ভুত কথা বলছিস তুই? শিবদাস দত্তের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া তোর পক্ষে যে নিতান্ত একটা অপমান?

নীরাজিতা হাসে—অপমান না ছাই?

চমকে ওঠেন শীতল সরকার।—এখন যে ওবাড়িতে নিশীথ আছে।

—থাকুক না।

—আজ যে ওবাড়িতে শিবদাস দত্তও নেই, প্রতিভাও নেই। বাপমেয়েতে চাইবাসা চলে গিয়েছে ; প্রতিভার এক মর-মর মাসিমার সঙ্গে শেষ দেখা করে আসবার জন্য।

—শিবদাস দত্তের কাছে আমার কোনও কাজ নেই ; প্রতিভার কাছেও না।

—তবে?—এইবার আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠেন শীতল সরকার। এবং বড় বউদিও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।

—এ কী কাণ্ড, নীরাজিতা? তুমি আবার ওবাড়িতে যাবার জন্য, মিছে কেন...। বউদি যেন একটা উদ্বেগে বিব্রত হয়ে বার বার আপত্তি করতে থাকেন।

—কাজ আছে।

বউদি শিউরে ওঠেন।—কিন্তু বিভূতিবাবু যে আজই, আর কিছুক্ষণ পরে এসে পড়বেন।

—আসুক।

—কিন্তু নিশীথের কাছে তো তোমার কোনও কাজ থাকতে পারে না।

নীরাজিতা হাসে।—নিশীথবাবুর কাছে একটা কাজ আছে।

—ও রকম মানুষের কাছে তোমার কী কাজ থাকতে পারে?

নীরাজিতার ঠোঁট দুটো অদ্ভুত রকমের শক্ত হয়ে যেন একটা দুরন্ত আক্রোশের আবেগে কেঁপে ওঠে।—ক্ষমা চাইব।

—কী?—শীতল সরকারের আর্তনাদ যেন অলক্তকের সব অহংকারের শান্তি চূর্ণ করে দিয়ে কাঁপতে থাকে।

চলে যায় নীরাজিতা। অলক্তকের ফটক পার হয়ে হতভম্ব ভীত ও করুণ অলক্তকের ছায়া পিছনে ফেলে রেখে, ঝাউয়ের ছায়া পার হয়ে এবং ডালিয়া-বাগানের কিনারা ধরে হেঁটে হেঁটে শিবদাস দত্তের নীরব বাড়িটার বারান্দায় উঠে বাইরের ঘরের একটি চেয়ারের দিকে অপলক চোখ তুলে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাজিতা।

ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ, আর বোধ হয় ভিতরের ঘরের দিকে চলে যাবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নেয়।

নীরাজিতা হাসে।—আমি ভুল করে চলে আসিনি। জানি, কাকাবাবু বাড়িতে নেই, প্রতিভাও নেই। আমি ইচ্ছে করে তোমার কাছেই এসেছি।

নিশীথ আশ্চর্য হয়।—আমার কাছে?

—হ্যাঁ।

—বলো।

—হয় কাছে এসো, নয় কাছে যেতে বলো। তা না হলে কী করে বলি।

নিশীথের চোখের বিস্ময়ে এইবার যেন একটা রহস্যের ভয়ে ছমছম করতে থাকে।—আজ আর ও কথা তোমার বলা উচিত নয়।

—আজই যে বলবার সুযোগ পেলাম।

বারান্দা থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে আর এগিয়ে গিয়ে, এবং দরজার কাছে এসেই ঘরের ভিতরে যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়ে নীরাজিতা। চেয়ারের কাঁধটা ধরে আর নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।—ক্ষমা চাই নিশীথবাবু।

—তুমি ক্ষমা চাইছ কেন নীরাজিতা? আমি যে সত্যিই...লোকে যাকে বলে...

চেঁচিয়ে হেসে উঠতে গিয়েই কেঁদে ফেলে নীরাজিতা।—লোকে যাকে বলে চরিত্রহীন?

—হ্যাঁ।

চোখের উপর রুমাল চেপে ধরে বিড়বিড় করে নীরাজিতা—আপনার বন্ধু বিভূতিবাবু একেবারে নিখুঁত পবিত্র-চরিত্রের মানুষ।

—তা বইকি। বিভূতির শত্রুও বিভূতির চরিত্রের অপবাদ দেয় না।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু...

নিশীথের কাছে এগিয়ে এসে, আর নিশীথের প্রায় বুকের কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাজিতা। আর, নিশীথ যেন অসাড় পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নীরাজিতার সেই হেঁটমাথার সুন্দর খোঁপাটার দিকে অদ্ভুত এক মমতার চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে।

আস্তে আস্তে মাথা তোলে নীরাজিতা।—নিশীথবাবু!

—কী?

—সত্যিই বুঝতে পারলেন না? না, একটুও ইচ্ছে হয় না?

—ক্ষমা করো, নীরাজিতা।

—কেন?

—উচিত নয়।

নীরাজিতার মুখটা করুণ হয়ে হাসতে থাকে।—আমি ঠিক এই ভয় করেছিলাম, নিশীথবাবু।

—ভয়?

—হ্যাঁ ; ভয় হয়েছিল, আপনি সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু...

—কী?

—কী চমৎকার প্রতিশোধ!

শিবদাস দত্তের বাড়ির ফটকের সামনে রাস্তারই উপর দাঁড়িয়ে একটা মোটরগাড়ির হর্ন যেন রুষ্ট ধিক্কারের গর্জনের মত হাঁপ ছাড়ছে। ডালিয়া-বাগানের বাতাসের ভিতর দিয়ে ছুটে এসে সেই গর্জনের শিহর এই ঘরের নিরালার উপর আছড়ে পড়েছে।

হো-হো করে হেসে ওঠে নীরাজিতা।—বুঝতে পারছেন নিশীথবাবু?

—কী?

—হর্নের আওয়াজটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে না কি?

চমকে ওঠে নিশীথ। নীরাজিতা বলে—আপনার বন্ধুর গাড়ির হর্ন।

—কে? বিভূতি এসেছে?

—হ্যাঁ।

—তুমি ভুল করে বড় অন্যায় করলে, নীরাজিতা।

নীরাজিতা হাসে।—অন্যায়?

—হ্যাঁ, বিভূতি বেচারা হয়ত তোমাকে ভুল বুঝবে।

—কী ভুল বুঝবে?

—একটা বাজে ধারণা করতে পারে বিভূতি, তুমি যেন ইচ্ছে করে আমার কাছে কিছু আশা করে...

—ঠিকই ধারণা করবেন আপনার বন্ধু।

খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতির গাড়ির হর্ন উদ্দাম হয়ে বাজতে থাকে। নিশীথ বলে—চলো নীরাজিতা।

রুমাল দিয়ে কপালটাকে একবার মুছে নিয়েই নীরাজিতা বলে—চলো।

আর, ডালিয়া-বাগানের কিনারা দিয়ে নিশীথেরই পাশে পাশে হেঁটে ফটকের কাছে এসে হেসে ওঠে নীরাজিতা।—তুমি কখন এলে?

—এখনই ; তুমি এখানে কখন এলে?

—অনেকক্ষণ হল।

বিভূতির চোখের উপর যেন ধোঁয়াটে আগুনের ছায়া ভাসতে থাকে।—তারপর...?

—তুমি বলো।

—খরসোয়ানের বাড়িতে ফিরে যেতে চাও?

—নিশ্চয় চাই ; কিন্তু...

—কী?

—তার আগে দেখতে চাই, তুমি নিশীথবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়েছ।

—নীরাজিতা।—চিৎকার করতে গিয়ে বিভূতির গলার স্বর যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

নীরাজিতা হাসে।—ভেবে দেখো।

—নীরাজিতা।

—ভেবে দেখো।

কী ভয়ানক স্নিগ্ধ ও শান্ত হাসি হাসছে নীরাজিতা। এবং অলক্তকের খোলা ফটকটাও যেন বিভূতির সৌভাগ্যের, অহংকারের আর পবিত্র চরিত্রের দিকে তাকিয়ে একটা খোলা ঠাট্টার হাসি হাসছে।

স্টিয়ারিং-এর চাকার উপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে আনমনার মত কী যেন দেখতে থাকে বিভূতি। হাতের শক্ত মুঠোটা আলগা হয়ে যাচ্ছে। তার পরেই গাড়ি থেকে নেমে, আর সড়কের ঝাউয়ের ছায়ার একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

নিশীথের দিকে একটা অসহায় ও ভীরু চাহনি তুলে ডাক দেয় বিভূতি—একটা কথা শুনে যাও, নিশীথ।

খিলখিল করে হেসে যেন একটা মিষ্টি খুশির ধমক ছাড়ে নীরাজিতা।—তুমি নিশীথবাবুর কাছে এসে কথা বলো।

গল্প

কোন কথা না বলি

সকলেই জানেন, ওই বাড়িটা স্বামী-স্ত্রীর জীবনের বাড়ি। কিন্তু এরই মধ্যে একটা ঠাট্টার কথাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ওটা একটা ক্লাব-বাড়ি।

শহর নয়, ছোট একটি জনপদ, যার নাম পিটারপুরা। পিটার নামে এক ইংরাজ সাহেব প্রায় আশি বছর আগে এদিকের জঙ্গলের ভিতরে প্রথম কয়লা খনি চালু করেছিলেন। আজ এই অঞ্চলের এদিকে ওদিকে অনেক কয়লাখনি। আর পিটারপুরাও অনেক দোকানপাট নিয়ে ছোট একটি জনপদ।

এই পিটারপুরা ওভারসিয়ার জয়ন্তবাবুর বাড়িটাকেই ঠাট্টা করে ক্লাববাড়ি বলা হয়ে থাকে। সন্ধ্যা হতেই এবাড়ির বারান্দায় মস্ত বড় সতরঞ্চি পাতা হয়। খুব কড়া আলোর বাতি জ্বলে। কখনও তাস, কখনও দাবা, কখনও গ্রামোফোনের বাজনা। মাঝে মাঝে হারমোনিয়ামও বাজে, সেই সঙ্গে গান। জয়ন্তের পরিচিত আর আমন্ত্রিত মানুষের একটি ভিড় এবাড়ির বারান্দাতে যেন একটি উৎসব সৃষ্টি করে, আর চলে যায়। কোন সন্ধ্যায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। হ্যাঁ, শীতকালে মাঝে-মাঝে বাইরের ঘরের ভেতরেই এই উৎসবের যত হর্ষ আর মুখরতা আকুল হয়ে বাজতে থাকে।

এই সান্ধ্য আসরের আনন্দ আরও বিচিত্র, আরও রঙীন হয়, যখন জয়ন্তের স্ত্রী নীরজা নিজের হাতেই একটা ট্রে নিয়ে এই ঘরের ভিতরে বা এই বারান্দাতে এসে দাঁড়ায়। ট্রে থেকে এক এক করে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে নীরজা। তারপরেই চলে যায়।

কিন্তু যেতে গিয়েও, থমকে দাঁড়াতে হয়, কারণ কেউ একজন হয়তো বলে উঠেছে, আমার কিন্তু আর এক কাপ চা চাই, মিসেস রায়।

—আমার চায়ে আর একটু চিনি চাই।

—আমাকে আধ-কাপ গরম জল দেবেন।

—আমার এক টুকরো লেবু পেলে ভাল হতো।

তাসের খেলার ব্যস্ততা হঠাৎ থমকে গিয়ে এইভাবে নানা দাবির আবেদন হয়ে নীরজাকে ব্যস্ত করে দেয়। নীরজা তেমনই হেসে হেসে ভিতরে চলে যায়। আর, আবার এসে যার যত দাবির সামগ্রী এনে আর রেখে দিয়ে চলে যায়।

কেউ ডাকে বউদি, কেউ বলে মিসেস রায়, কেউ বা নীরজা রায় বলে ডাক দিতেই ভালবাসে। নয়ন গুপ্ত একদিন নীরজা বলেই ডাক দিয়ে ফেলেছিল।

সে ডাক শুনে কিন্তু নীরজার চোখে কোন বিরক্তির ভ্রূকুটি কেঁপে ওঠেনি, নীরজা শুধু চকিতে একবার নয়ন গুপ্তের দিকে তাকিয়েছিল, আর স্বচ্ছন্দে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলার সে আসর রঙীন হয়ে উঠবেই বা না কেন? নীরজা যখন ট্রে হাতে নিয়ে এই তাস, দাবা, হারমোনিয়াম আর গ্রামোফোনের আসরের কাছে এসে দাঁড়ায়, নীরজার রঙীন শাড়ির আঁচল যে সত্যিই লতিয়ে লতিয়ে দুলতে থাকে, নীরজার গলার হার চিকচিক করে, ঝিক-ঝিক করে কানফুলের পোখরাজ। আর, এক-এক সন্ধ্যায় সত্যিই নীরজার গায়ের শাড়ি থেকে সামান্য দু'-ফোঁটা সেন্টের হালকা সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়েও পড়ে।

ওভারসিয়ার জয়ন্ত খুবই মিশুক স্বভাবের মানুষ। নিতান্ত এক ঘণ্টার পরিচিত মানুষকেও বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ফেলতে পারে জয়ন্ত। আর সারাদিনের খাটুনির পর এই বারান্দার সান্ধ্য আসরের হইহই উল্লাস আর কলরব যেন জয়ন্তের জীবনের একটা সান্ত্বনা। জয়ন্ত নিজেই বলে, এরকম একটু আনন্দের হল্লা না থাকলে এই জঙ্গলের ভেতরে বেঁচে থাকবো কি করে?

কিন্তু এই পিটারপুরাতে আরও তো কত বাড়ি আছে, সে-সব বাড়িতে জয়ন্তের মতো ভদ্রলোকেরাই থাকে, আর তাঁরা বেঁচেও আছেন, যদিও সে-সব বাড়ির বারান্দাতে প্রতি সন্ধ্যায় এরকমের কোন বিচিত্র রঙীন উল্লাসের আসর বসে না। কিন্তু এটাও কোন যুক্তি নয়। যার মনে যেমন অভিরুচি, তার মন তেমনই তৃপ্তি দাবি করবে। জয়ন্তের প্রাণ যে-ভাবে বাঁচতে চায়, সেভাবেই তো বাঁচবে।

ঠাট্টাটা কিন্তু এই জন্য নয়। আর ওই ঠাট্টাটা ঠিক সহজ, সরল একটা ঠাট্টাও নয়। এ ঠাট্টার ভিতর যেন খুব সূক্ষ্ম একটা ভর্ৎসনা কথা বলছে। সন্ধ্যাবেলাতে একগাদা চেনা অচেনা আর আধ-চেনা মানুষকে নিয়ে অন্য কোথাও তাস-দাবার আসর বসালেই তো পারে জয়ন্ত। বাড়িতে কেন? জয়ন্তের বিচার-বুদ্ধি কিংবা কাণ্ডজ্ঞান যদি বেশ ঢিলে না হয়ে যেত, তবে নিশ্চয় বুঝতে পারতো জয়ন্ত, যে-বাড়িতে নীরজার মতো সুন্দরী স্ত্রী আছে, আর দ্বিতীয় কোন বয়স্ক বা বয়স্কা ব্যক্তি নেই, সে-বাড়িতে জয়ন্তের পক্ষে এরকম ভিড় ডেকে আনা উচিত নয়।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ছবি দেবী বলেন, ওভারসিয়ার জয়ন্তবাবু না হয় একটু কম বুদ্ধির মানুষ, কিন্তু নীরজা কি? নীরজার তো আপত্তি করা উচিত। নীরজার কি একটু ভয়ডরও নেই? কি আশ্চর্য, আপত্তি করা দূরে থাকুক, নীরজা নিজেই এই একগাদা পুরুষমানুষের আড্ডার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে আর হাসবে। খুব ভুল করছে নীরজা।

নীরজার কানেও কি এই সব মন্তব্য, সমালোচনা আর ঠাট্টার কোন কথা পৌঁছয় না? পৌঁছয় বইকি। কয়েকবার বেনামী চিঠিও এসেছে নীরজার নামে,--একটু সাবধান হবে। আপনার ভাল'র জন্যেই বলছি। জয়ন্তবাবু বেচারা অত্যন্ত ভাল মানুষ, কিন্তু অত্যন্ত বোকা মানুষ। উনি সরল বিশ্বাসে আর বন্ধুভাবে সবাইকে ডাকেন। কিন্তু যারা আপনার বাড়িতে গিয়ে ভিড় করে, তাদের অনেকেই বন্ধুভাবে যায় না, তারা সরল মানুষ নয়।

নীরজা কিন্তু বেনামী চিঠি পড়ে হেসে ফেলে। ঠিক কথাই লিখেছে বেনামী চিঠি। কিন্তু তবু তার মধ্যে একটি ভুল কথা লিখেছে। বুঝতে পারে না নীরজা, নীরজাকে কিসের সাবধান হতে এত অনুরোধ করছে এই চিঠি। নীরজা কি অসাবধান? কেউ কি কখনও দেখেছে যে, ওই সন্ধ্যার সময়টুকু ছাড়া আর কোন সময়ে কোন সরল বা অসরল উদ্দেশ্যের মানুষ জয়ন্তের বাড়িতে এসেছে আর তার সঙ্গে গল্প করছে নীরজা?

না, কেউ দেখেনি। শুধু একবার দেখা গিয়েছিল, নয়ন গুপ্ত তার মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটে এসে এক দুপুরবেলায় জয়ন্তের বাড়ির কাছে থামলো। জয়ন্ত বাড়িতে নেই।

নয়ন গুপ্ত ডাকে—আমি, নয়ন এসেছি। আপনি কোথায়?

জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় নীরজা।—উনি তো এখন বাড়ি নেই।

নয়ন—তা জানি, কিন্তু আপনি এখন কি করছেন?

নীরজা—সেলাই করছি।

নয়ন—আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল।

নীরজা—বলুন।

নয়ন—ওভাবে ঘরের ভিতরে জানালার কাছে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি এখানে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে কথা বলবো?

নীরজা—তাই বলুন না! অসুবিধের কি আছে?

নয়ন—তুমি সব বুঝেও এ কিরকম কথা...।

নীরজা হাসতে থাকে—আপনার, মনে হয়, অসুখ করেছে।

নয়ন—কে বললে?

নীরজা—বোধহয় মাথার গোলমাল হয়েছে।

নয়ন--কে বললে?

জানালাটাকে আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেয় নীরজা।

এরপর আর নয়ন গুপ্তকে অবশ্য জয়ন্তর বাড়ির সন্ধ্যার আসরেও কোনদিন দেখা যায়নি। কিন্তু দেখা গিয়েছে, রমেশ সরকার নামে নতুন একজন এসেছে। খুব ভাল গাইতে পারে রমেশ সরকার।

নয়ন গুপ্ত থাকে চার মাইল দূরের এক কয়লাখনির একটি কোয়ার্টারে। শুখরা কোলিয়ারির ওভারম্যান নয়ন গুপ্ত যখন দু'মাসের মধ্যে একটি সন্ধ্যাতেও এবাড়ির উল্লাসের আসরে দেখা দিল না, তখন জয়ন্ত নিজেই ব্যস্ত হয়ে খোঁজখবর নিয়েছিল, কেন আসে না নয়ন গুপ্ত। চন্দ্রপুরা স্টেশনে একদিন নয়ন গুপ্তর সঙ্গে জয়ন্তের হঠাৎ দেখাও হয়ে গিয়েছিল। নয়ন গুপ্ত বলে--পায়ে একটা ব্যথা, মোটরবাইক চালাতে অসুবিধে হয়। তাই আর আপনার ওখানে যাওয়া হয়ে ওঠে না, জয়ন্তবাবু!

শুনে দুঃখিত হয়েছে জয়ন্ত।—তা হলে আর কি বলি? তবু একদিন যদি কোনমতে যেতে পারেন, তবে খুব খুশি হব ; আর আপনিও রমেশ সরকারের গান শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। অদ্ভুত, অপূর্ব, চমৎকার গাইতে পারেন রমেশ সরকার।

রমেশ সরকার যেসব গান গেয়ে এই সন্ধ্যাবেলার আনন্দের আসরটিকে মুগ্ধ করে দেয়, তার সবই প্রেমের আকুলতার যত গান। আর কী আশ্চর্য, রমেশের গলার গান যখন মূর্ছনাময় একটা আবেশ ঘনিয়ে তুলেছে, ঠিক তখন চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে আসরের কাছে এসে দাঁড়ায় নীরজা। রমেশের গান যেন এই আবির্ভাবের সাড়া পেয়ে আরও মিষ্টি হয়ে যায়।

রমেশ সরকার থাকে পালুড়ি কোলিয়াড়িতে ; রেজিং কন্ট্রাক্টর রমেশ সরকার। নতুন কেনা একটা চকচকে মোটর গাড়িকে সেই পালুড়ি থেকে বারো মাইল রাস্তা ছুটিয়ে নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় এই বাড়িতে উপস্থিত হতে কোনদিন ভুল করে না রমেশ সরকার।

এই রমেশ সরকার একদিন হঠাৎ সকালবেলাতেই উপস্থিত হলো আর হাঁক দিল—আমি রমেশ।

জানালাতে দাঁড়িয়ে কথা বলে নীরজা—উনি চন্দ্রপুরা গিয়েছেন।

রমেশ হাসে—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে জয়ন্তবাবুর পথেই দেখা হয়েছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে কোনদিনও একটু ভাল করে কথা বলবার সুযোগ পেলাম না।

নীরজা হাসে—বলুন।

রমেশ--আপনি তো রোজই আমার গান শুনছেন। কিন্তু কিছু কি বুঝতে পেরেছেন?

নীরজা—আমি তো লেখাপড়া একটু জানি, বুঝবো না কেন?

রমেশ হাসে—না, বুঝতে পারেননি। গানগুলি সবই আমার রচনা।

নীরজা হাসে—এটা অবশ্য বুঝতে পারিনি।

রমেশ—কিন্তু বুঝতে তো পেরেছেন, কার জন্যে, কার কথা মনে করে এসব গান লিখেছি?

নীরজা—তা বুঝবো কেমন করে?

রমেশ—এখনও যদি সেটা না বুঝতে পেরে থাকেন, তবে বুঝবো, আমারই দুর্ভাগ্য।

নীরজা—কিন্তু আপনি বুঝিয়ে দিলেই তো বুঝে ফেলতে পারি।

রমেশের চোখের চাহনি জ্বলজ্বল করে—আপনারই জন্যে লিখেছি। এখন আপনি বলুন, ভুল করেছি কি? আপনি বলুন, শুনে ভাল লেগেছে আপনার?

নীরজা আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করে দেয়। রমেশের নতুন গাড়িও যেন সেই মুহূর্তে আতঙ্কিতের মতো ছটফটিয়ে ওঠে আর ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে যায়। আর, কোনদিনও জয়ন্তের বাড়ির এই সান্ধ্য-আসরে পালুড়ির রমেশ সরকারকে দেখতে পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত নিজেই একদিন নীরজাকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি কখনও ওদের কাউকে...তার মানে ভুল করে এমন কোন ব্যবহার...তার মানে অভদ্রতা বলে মনে হতে পারে, এমন ব্যবহার...।

নীরজা অদ্ভুতভাবে হাসে—পোকামাকড়ের সঙ্গে একটু অভদ্রতা করাই নিয়ম। তবু আমি...।

জয়ন্ত আশ্চর্য হয়—তুমি কি বলছো, বুঝতে পারছি না।

নীরজা হাসে—পোকামাকড়কে ঝাঁটা দিয়ে সরিয়ে দেওয়াই নিয়ম। তবু আমি সেটা করি না, করিওনি। ওরা নিজেরাই সরে যায়। তা ছাড়া...।

জয়ন্ত—কি?

নীরজা—পোকামাকড়কে আমি ভয়ও করি না।

জয়ন্ত লজ্জিতভাবে হাসে—এঃ, তুমি মানুষগুলোকে ভয়ানক বেশি তুচ্ছ করে কথা বলছো। আমার ভয় হয়, তুমি হয়তো একদিন অধীরবাবুকেও...।

চমকে ওঠে নীরজা। জয়ন্তের কথাটা যেন প্রচণ্ড একটা মিথ্যের চিৎকার। আজ পর্যন্ত এবাড়ির সন্ধ্যাবেলার হই-হল্লার বৈঠকে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে ওই একটি মানুষকে বলা যায় সত্যিকারের ভালমানুষ। অধীরকে তুচ্ছ করবার কিংবা অশ্রদ্ধা করবার কোন কথা উঠতেই পারে না। জয়ন্তের বাড়ির সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে রোজই আসে অধীর। আসরের একপাশে বেশ শান্ত হয়ে বসে থাকে, মাঝে মাঝে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজায়, চা খায়, আর চলে যায়।

এই অধীরই একমাত্র অভ্যাগত, যে একদিন বেশ কুণ্ঠিত আর লজ্জিত হয়ে, তবু বেশ হাসিমুখে আর শান্তস্বরে নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আপনি কেন কষ্ট করে আমাদের এই আজেবাজে গণ্ডগোলের কাছে আসেন? আপনার চাকরকে বলে দিন, যখন দরকার হবে, চা দিয়ে যাবে।

সার্ভেয়ার অধীর পিটারপুরা থেকে দুই মাইল দূরের পাত্রাতু কোলিয়ারীতে কাজ করে। তাস খেলতে, দাবা খেলতে, গান গাইতে একেবারেই জানে না অধীর। এমনি কি, চেঁচিয়ে হাসতেও পারে না। এমন মানুষ কেন যে এই হাসি-হল্লার আসরে এসে বসে থাকে, কিছু বোঝা যায় না।

জয়ন্তেরই অনুরোধ—আসতেই হবে অধীরবাবু।

অধীর—কিন্তু আমি তো আপনাদের বৈঠকে একটা সাইফার মাত্র, আমার দ্বারা তো আপনাদের কোন কাজ হবে না।

জয়ন্ত—তবু, ওই একটু বসেই থাকবেন। তাতেও আড্ডাটা জমে।

সাইফার হয়েই সান্ধ্য আসরের একপাশে বসে থাকে অধীর। শুধু হই-হল্লা যখন একটা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন কথা বলে—আঃ, আপনারা একটু আস্তে কথা বলুন।

একদিন এভাবে আপত্তি করতে গিয়ে অধীর এই উচ্ছল হাসি-মুখর আসরটাকে কিছুক্ষণের মতো বড় গম্ভীর করে দিয়েছিল। দু'চারজনের চোখে অপ্রসন্ন ভ্রূকুটিও শিউরে উঠেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য, জয়ন্ত বেশ একটু শক্ত স্বরে অধীরের কথার প্রতিবাদ করেছিল।—আপনি কিন্তু অকারণে এরকম একটা বাজে কথা বলে ফেললেন, অধীরবাবু।

মোটরকারের এজেন্ট শৈলেন চক্রবর্তী, দু'মাস তিনমাস পর পর পিটারপুরা ঘুরে যাওয়া তার কারবারেরই কাজের নিয়ম। সেই শৈলেন চক্রবর্তী বেশ চেঁচিয়ে এমন একটা ছড়া আবৃত্তি করেছে, যার ভাষার মধ্যে শালীনতার ছিটে-ফোঁটাও নেই।

অধীর বলে—এটা জঙ্গল নয় শৈলেনবাবু, ভদ্রলোকের বাড়ি। ওসব ছড়া এত চেঁচিয়ে বলতে আপনার একটুও লজ্জা হলো না?

শৈলেন চক্রবর্তী—আপনি কি মনে করেছেন যে, আমি সামান্য একটু ড্রিঙ্ক করেছি বলে একেবারে কমনসেন্স হারিয়ে ফেলেছি?

অধীর—তাই তো মনে হচ্ছে।

শৈলেন—মনে হচ্ছে, আপনি যেন কাউকে ফ্ল্যাটার করবার জন্যে এসব কথা বলছেন।

অধীর—হ্যাঁ।

অধীরের মতো শান্ত মেজাজের মানুষ কী ভয়ানক কঠোর স্বরে কথা বলতে পারে!

জয়ন্ত চেঁচিয়ে ওঠে।—না না, অধীরবাবুর কথায় আমি ফ্ল্যাটার্ড হবার মানুষ নই!

কিন্তু ঘরের ভিতরে মুখ টিপে হেসে ফেলে নীরজা। তখুনি আবার গম্ভীর হয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে।

একদিন ঘরের ভিতরে চুপ করে, আর, যেন মন-প্রাণ উৎকর্ণ করে দাঁড়িয়ে থাকে নীরজা। একটু আগেই ঘরের দরজার পর্দার এক ফাঁকে দেখতে পেয়েছে নীরজা, রেকর্ড বাছাই করছেন অধীরবাবু। কি গান বাজাতে চান অধীরবাবু? একগাদা রেকর্ডের ভিতর থেকে একটা দুটো ভাল গান বেছে নিতে এত দেরীই বা হচ্ছে কেন? আর বাছবারই বা কি আছে? আজ যে রেকর্ডের বাক্সটা ওখানে রয়েছে, তার মধ্যে সবই তো লয়লামজনুর প্রেমের গান।

রেকর্ড বাছতে বাছতে শেষে কি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন অধীরবাবু? দরজার পর্দার ফাঁকে আর একবার উঁকি দিয়ে দেখতে পায় নীরজা, চুপ করে আর হাত গুটিয়ে বসে আছেন অধীরবাবু।

এত কুণ্ঠা কেন? লয়লামজনুর প্রেমের একটা গানের রেকর্ড বাজিয়ে দিলে কি এই বাড়ির সন্ধ্যাবেলার আলো বাতাস একেবারে উতলা হয়ে যাবে? এত ভয়ই বা কিসের?

কিন্তু না। আশা করা বৃথা। অধীরবাবুর শুধু চোখ আছে, কিন্তু তাকাতে জানেন না। মন আছে, কিন্তু বুঝতে জানেন না।

এই তো এই কিছুক্ষণ আগে, অধীরবাবু যখন তাসের হল্লা থেকে একটু দূরে সরে বসে গ্রামাফোনে দম নিলেন, তখন নীরজা চাকর ফেলুকে বলেছে, ওখান থেকে সব রেকর্ড তুলে নিয়ে চলে এস।

ফেলুকে রেকর্ড তুলে আনতে দেখেই আশ্চর্য হয়েছে অধীর—রেকর্ডগুলো নিয়ে যাচ্ছ কেন?

ফেলু—মা বলেছে।

ওগুলি সবই, যত ভজন আর কীর্তন গানের রেকর্ড। রেকর্ডগুলিকে আলমারির মাথার উপর তুলে দিয়ে আবার ফেলুর হাত দিয়ে এই দশটা গানের রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছে নীরজা, লয়লামজনুর প্রেমের গানের রেকর্ড।

কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েই বা কি হলো? রেকর্ডগুলি বোবা জঞ্জালের মতো অধীরের চোখের সামনেই পড়ে রয়েছে। ঠিকই, সেদিন বেশ একটা মিথ্যে কথা বলেছিলেন অধীরবাবু ; একেবারে মিথ্যে, কাউকে ফ্ল্যাটার করার ইচ্ছে নেই এই অধীরবাবুর মনে।

কিন্তু ভুলে গেলেন কেমন করে অধীরবাবু, এরই মধ্যে তো অন্তত পাঁচটি দিন নীরজা যে এতগুলি মানুষের মধ্যে বেছে বেছে অধীরবাবুকেই ফ্ল্যাটার করেছে।—আপনাকে আর এক কাপ চা এনে দিই, অধীরবাবু?

আর কারও প্রাণে আরও এক পেয়ালা চায়ের পিপাসা আছে কিনা, একথা তো প্রশ্ন করে জানতে চায়নি নীরজা। শুধু ওই একজনেরই পিপাসার কথা জানতে চেয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটা গানের রেকর্ড বাজাতে এত কুণ্ঠা কেন অধীরবাবুর? প্রশ্নটা যেন নীরজার নিঃশ্বাসের মধ্যে ছটফট করতে থাকে।

না, আজ থাক। বরং কাল সন্ধ্যাবেলা যখন এই হল্লার আসর ভাঙবে, আর অধীরবাবু

যখন তাঁর সাইকেলের ল্যাম্পটাকে জ্বালাবার জন্যে জানালার কাছে এই অপরাজিতার বেড়াটার কাছে দাঁড়াবেন, তখন একবার নিজের মুখেই বলে দিলে হবে, একটা কথা বলবার আছে অধীরবাবু, কাল দুপুরে কিংবা বিকেলে কি একবার আসতে পারবেন?

অধীরকে কী কথা জিজ্ঞাসা করবে নীরজা? শুধু এই একটি কথা, আপনি আজ গানের একটা রেকর্ডও বাজালেন না কেন? লয়লামজনুর প্রেমের গানগুলি কী অপরাধ করেছে?

কিন্তু কেঁপে উঠেছে নীরজার শরীর। চোখ দুটো ভয় পেয়ে একেবারে পাথরের চোখের মতো নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। শাড়ির আঁচলটাকে শক্ত মুঠো করে ধরে নিয়ে মুখটাকে চেপে ধরে নীরজা ; যেন একটা কথাও শব্দ করে ফুটে উঠতে না পারে।

সন্ধ্যার আসর ভাঙে। একে একে চলে যাচ্ছে সবাই। অধীরও চলে যাবে। অপরাজিতার বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ল্যাম্পটা জ্বালতে থাকে অধীর।

জয়ন্তকে ডাক দেয় নীরজা—শোনো।

জয়ন্ত—বলো।

নীরজা—তুমি অধীরবাবুকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দাও।

জয়ন্ত—বলো, কি বলবো?

নীরজা—অধীরবাবু আর যেন এখানে না আসেন।

জয়ন্ত চমকে ওঠে।—ছিঃ, এরকম একটা অভদ্রতার কথা কি বলা যায়?

নীরজা—বলতে হবে।

জয়ন্ত—তুমি তো কোনদিনও কাউকে এভাবে তাড়িয়ে দেবার কথা বলনি? আজ হঠাৎ...।

নীরজা—কাউকে তাড়িয়ে দেবার দরকার হয়নি। তাই বলিনি।

জয়ন্ত—শেষে বেচারা এই অধীরবাবুকে তাড়িয়ে দেবার দরকার হলো!

নীরজা—হ্যাঁ।

জয়ন্ত—কেন?

নীরজা হাসে—সামান্য পোকামাকড় হলে তাড়িয়ে দেবার দরকার হতো না।

জয়ন্ত হাসে—তবে কি 'অধীরবাবু একটা অসামান্য বাঘ-সিংহ?

নীরজা—হ্যাঁ।

জয়ন্ত চিন্তিতভাবে বলে—সত্যি কি তুমি ভয় পেলে?

নীরজা—খুব ভয় পেয়েছি।

জয়ন্ত—কিন্তু বলবো কি করে? বলতে যে ভয়ানক লজ্জা করছে।

নীরজা ভ্রূকুটি করে তাকায়—লজ্জা করলে মরবে। যাও, দেরি করো না, এখনই গিয়ে বলে দাও।

ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে জয়ন্ত। এগিয়ে গিয়ে অপরাজিতার বেড়ার কাছে দাঁড়ায়। জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে শুনতে পায় নীরজা—উঃ, কত স্পষ্ট করে বলে দিল জয়ন্ত, আপনি আর এখানে আসবেন না, অধীরবাবু, প্লীজ।

দেখতে পায় নীরজা, কোন কথা না বলে চলে গেল অধীর।

তৃষিত মরু

তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, যাচ্ছেন কনখলে তাঁর আশ্রমে, অথচ একজনের অনুরোধের চাপে পড়ে মধুপুরেই ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। আর, নেমে পড়েই হেসে ফেললেন--এঃ, এরকম যে একটা ট্রেন-দুর্ঘটনায় পড়তে হতে পারে, সেটা তো কখনও মনে হয়নি, শিবনাথ। আগে মনে হলে, এই লাইনের ট্রেনে উঠতাম না।

প্রতি বছর সাগর-স্নানের পর কলকাতা থেকে কনখলের আশ্রমে ফিরে যাবার সময় স্বামী পূর্ণানন্দ গয়া লাইনের ট্রেন ধরেন। এই প্রথম, হয় ভুল করে নয় তাড়াতাড়িতে, এমন এক এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট কিনে ফেলেছিলেন, যে ট্রেন সীতারামপুর থেকে ঘুরে যায়। তারপর মধুপুর হয়ে চলে যায়।

শিবনাথও হাসেন--আপনার পক্ষে ট্রেন-দুর্ঘটনা হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে তো নয়। আমি তো বলবো, এটা আমার একটা হঠাৎ-সৌভাগ্যের ঘটনা।

অভাবিত একটা বিস্ময়, হঠাৎ দেখতে পাওয়া একটা সৌভাগ্যের ঘটনা বইকি। ট্রেনের কামরাতে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে শিবনাথ যেন তাঁর আধ-জাগা ঢুলু-ঢুলু চোখেই তিরিশ বছর আগের একটা চেনামুখের ছবি দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলেন। তারপর ভাল করে চোখ মেলে আর অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখেছিলেন, ওদিকের সীটের এক কোণে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। বেশ বয়স হয়েছে সন্ন্যাসীর, সত্তর না হোক অন্তত পঁয়ষট্টির কম নয়। গায়ে ঢিলে-ঢালা গেরুয়ারঙের আঙরাখা, তেমনি গেরুয়ারঙের একটি চাদর দিয়ে গলাটা জড়ানো, চোখে চশমা। খুব মন দিয়ে একটা বই পড়ছেন সন্ন্যাসী। মনে হয়, এ বয়সেও এই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিশক্তির জোর তেমন কিছু কমে যায়নি। তা না হলে, ট্রেনের এই ঝাঁকুনিতে আর এরকম মিটমিটে আলোতে বই পড়া সম্ভব হতো না। পাতার পর পাতা উলটিয়ে বই পড়ে চলেছেন সন্ন্যাসী।

উঠে গিয়ে একেবারে সন্ন্যাসীর সীটের মুখোমুখি সীটের উপর বসে শিবনাথ, এইবার তাঁর চোখ দুটোকে আরও বড়-বড় করে নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু আর কি চিনতে কোন অসুবিধে আছে? আর কি বেশি তাকিয়ে দেখবার কোন দরকার আছে?

বইটা বন্ধ করে রাখবার পর সন্ন্যাসীও শিবনাথের মুখের দিকে একবার তাকালেন। চোখ ফিরিয়ে নিয়েই তখুনি আর-একবার তাকালেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন।

যেন পাহাড়ের চূড়া তাকিয়ে আছে একটা পুকুরের জলের দিকে ; আর পুকুরের জল একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে। ওখানে ওই সীটে একজন বুড়ো সন্ন্যাসী মানুষ, আর এখানে এই সীটে একজন মাঝবয়সী কেরানী মানুষ। কাছাকাছি হয়েও দুজনের জীবনের মধ্যে যে দুস্তর দূরত্ব দিয়ে গড়া একটা কঠিন ব্যবধান। কেউ কারও আপন হতে পারে না।

কিন্তু শিবনাথ ভুলবেন কেমন করে, ইনি যে সেই মণিকাকা,--মণিনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি শিবনাথের ছেলেবেলার জীবনে আপনজনের চেয়েও বেশি আপন একজন ছিলেন। শিবনাথের বাবার পিসতুতো ভাই মণিনাথ, এই মণিকাকাই যে একদিন বলেছিলেন, ঘোড়া চড়তে শিখবি, শিবু? তাহলে পুজোর ছুটিতে রায়গঞ্জে চলে আসিস। আমার ছোট ঘোড়াটাকে তোর জন্যে ছেড়ে দেব। খুব শান্ত মেজাজের ঘোড়া, চমৎকার দুলকি চালে চলতে পারে।

কী না ছিল মণিকাকার! রায়গঞ্জে অত বড় দালান বাড়ি ছিল। দীঘি, পুষ্করিণী বাগান আর খামার, সবই ছিল। বাপের এক ছেলে মণিকাকা, এম. এ. পাস করেছিলেন, আইন পাস করেছিলেন। কিন্তু বিয়ে করেননি, যদিও মণিকাকার বিয়ে দেবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন মণিকাকার জ্ঞাতি-কাকার কেষ্টবাবু। মণিকাকার বিয়ের জন্যে চিন্তা করবার মতো

কাছাকাছি মানুষ তখন ওই একজনই ছিলেন, রায়গঞ্জে কেষ্টবাবু। মণিকাকার বাবা আর মা দুজনের কেউ তখন বেঁচে ছিলেন না।

শিবনাথের গাঁয়ের বাড়ির পুকুরটার একটা সুনাম ছিল ; এত বড় আর এত লালচে চেহারার মিরগেল এই জেলার কোন বড় দীঘিতে পাওয়া যায় না। রায়গঞ্জ থেকে বিরামপুর, কতই বা দূর? ঘোড়া চড়েই চলে আসতেন মণিকাকা আর, সেই বিখ্যাত পুকুরের মিরগেল ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন।

—না রে শিবু, দিনের বেলাতে মাছ ধরে কোন সুখ নেই। মাছ ধরবো রাত্রিবেলা। দেখবি, কেমন মজা হয়।

রাত্রিবেলা পুকুরের জলে ছিপ ফেলে বসে থাকতেন মণিকাকা। আর শিবনাথ বসে থাকতো তাঁর পাশে। ফাত্‌নার মাথায় একটা জোনাকিতে আঠা দিয়ে সেঁটে দিতেন মণিকাকা। আর বলতেন,—বসে বসে দেখ শিবু, আমি বিনা চারেই কত বড় মিরগেল তুলছি। চার ফেলে মাছ ধরা তো এমন কিছু বাহাদুরী ব্যাপার নয়।

শিবনাথকে সঙ্গে নিয়ে আর এক মস্ত একটা লগি হাতে নিয়ে যখন দুপুরবেলায় আমবাগানের ভিতর ঘুরে বেড়াতেন মণিকাকা, তখন তাঁর অমন ধবধবে ফর্সা মুখের রঙ যেন খুশি হয়ে আর লালচে হয়ে টুকটুক করতো। মনে আছে শিবনাথের, লগি তুলে উঁচু ডালের একটা পাকা আমের নাগাল না পেয়ে সেদিন কী কাণ্ড করেছিলেন মণিকাকা।—আমি গাছের গোড়ায় শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছি, শিবু। তুই আমার কাঁধের উপর চড়ে আর বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়া। তারপর লগি দিয়ে ঐ আমটাকে বেশ জোরে একটা খোঁচা দিবি। নে, ওঠ, উঠে পড়।

সেই মণিকাকা একদিন সবার চোখের নাগালের বাইরে চলে গেলেন। সবই শুনতে জানতে আর বুঝতে পেরেছিলেন সেদিনের সেই ছেলেমানুষ শিবনাথ। অনেক দূরে কোথায় যেন বেড়াতে বের হয়েছিলেন মণিকাকা। দু'মাস পরে রায়গঞ্জে ফিরে এলেন। তারপর মাত্র একটা মাস তাঁকে দেখতে পেয়েছিল রায়গঞ্জের মানুষ। সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে আর রায়গঞ্জ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন মণিকাকা। তার কিছুদিন পরেই বুঝতে পেরেছিলেন শিবনাথ, সেদিনের সেই ছেলেমানুষ শিবু, বিরামপুরের পুকুরে আর মিরগেল ধরতে আসবেন না মণিকাকা। একদিন রায়গঞ্জ থেকে বিরামপুরে ফিরে এসে এবাড়ি সে-বাড়ির সবাইর কাছে একটা আশ্চর্যের খবর জানালেন বাবা—সম্পত্তি বিক্রির সব টাকা কনখলের একটা আশ্রমকে দান করে দিয়েছে মণি, আর নিজেও সন্ন্যাসী হয়ে সেই আশ্রমেই আছে।

তিরিশ বছর আগে পনের বছর বয়সের চোখ দিয়ে দেখা একটি মানুষকে আজ দেখেই চিনতে পারা তো চারটি খানি স্মৃতিশক্তির কথা নয়। তবু যে চিনতে পেরেছেন শিবনাথ, সেটা শুধু স্মৃতির জোরে নয়। মণিকাকার একটা কানের নীচে নীলরঙের একটা আঁচিল ছিল। মণিকাকার ডান ভুরুর উপরে ছোট্ট একটা কাটা-দাগ ছিল। ঘোড়া থেকে একবার পড়ে গিয়ে মণিকাকার ডান ভুরুর উপরের কাছে ছুঁচলো একটা ইট-খোয়ার টুকরো বিঁধে গিয়েছিল। কিন্তু এই দুটো চিহ্ন না থাকলেই বা কি হতো? মণিকাকার চল্লিশ বছর বয়সের সেই মুখটা তো ভিন্ন রকমের কোন রূপ ধরে ফেলেনি। সেই টিকালো নাক, সেই বড়-বড় চোখ, আর সেই ধবধবে লালচে-ফর্সা রঙ, সবই আছে। সারা রাতের শিশিরে ভিজে গিয়ে ফুলের চেহারা যে-রকম হয়, মণিকাকার মুখের চেহারাতে শুধু সেরকমের একটা পরিবর্তন দেখা যায়। সবই ঠিক আছে, শুধু একটা স্নিগ্ধ শিথিলতার প্রলেপ পড়েছে।

কিন্তু সন্ন্যাসী মানুষের প্রায় সত্তর বছর বয়সের চোখ দুটো ও দৃষ্টির অদ্ভুত জোর আছে বলতে হবে। তা না হলে আজ এই ট্রেনের কামরাতে এত মিটমিটে একটা আলোর মধ্যে বসে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের শিবনাথের মুখের মধ্যে তিরিশ-বছর আগের দেখা একটা ছেলেমানুষের মুখটাকে চেনা-চেনা বলে সন্দেহ করলেন কি করে? আর বলবেনই বা কেন—

আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি?

চমকে ওঠেন শিবনাথ—দেখেছেন বই কি, কিন্তু মনে করতে পারছেন না বোধহয়।

—তা মনে করতে অসুবিধে হচ্ছে ঠিকই। আর...। হঠাৎ হেসে ফেললেন সন্ন্যাসী।—আর মনে করেই বা লাভ কি?

শিবনাথ চমকে ওঠেন।—কিন্তু আমি যে সবই মনে করতে পারছি। আমার ভুল হচ্ছে না বোধহয়!

—কি মনে করতে পারছেন?

শিবনাথের গলার স্বর কাঁপে।—আপনি যদি মণিকাকা হন, তবে আমি সেই শিবু, বিরামপুরের শিবনাথ।

চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। স্নিগ্ধভাবে হাসলেন, তারপর আবার হাতের বইটা খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

কী বই পড়ছেন সন্ন্যাসী? ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য। ট্রেনের থার্ড ক্লাসের এই কামরাতে মিটমিটে আলোতে বাক্স তোরঙ্গ পেটরা পুঁটলি ঝুড়ি-ঝোড়া-বস্তার এত কাছে, আর যাত্রীদের এত মুখরতার মাঝখানে কত শান্ত হয়ে বসে আছেন সন্ন্যাসী। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের মধ্যে যেন তাঁরও জীবনের সব ভাষ্য মিশিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু শিবনাথের চোখদুটো যেন মুগ্ধ হয়ে দেখছে, বিরামপুরের পুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছেন মণিকাকা। শিবনাথ ডাকেন—মণিকাকা!

চমকে উঠলেন, বোধহয় একটু অপ্রসন্নও হলেন সন্ন্যাসী। কিন্তু তারপরেই হাতের বইটা বন্ধ করে দিয়ে হাসলেন—ও নামে আমাকে এখন আর ডাকতে নেই।

শিবনাথ—আজ্ঞে, আমি যে আপনার নতুন নামটা জানি না।

—পূর্ণানন্দ।

শিবনাথ—আজ্ঞে, আমার পক্ষে আপনাকে এরকম শুধু একটা নাম ধরে ডাকা কি উচিত হবে? আমি যে আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আপনি যে আমার গুরুজন।

পূর্ণানন্দ আবার হাসেন।—এঃ, তুমি সত্যিই যে আমাকে বিপদে ফেললে। আমি কি তোমার সুবিধার জন্যে ট্রেনের এই শুধু কয়েক ঘণ্টার দরকারে সেই পুরনো নামটা ধরবো? তা হয় না শিবনাথ।

শিবনাথ কুণ্ঠিতভাবে বলেন—তা আপনি যদি আপত্তি করেন, তবে না হয় পুরনো নামে আর ডাকবো না, সাধুকাকা।

এইবার বেশ জোরে মাথা দুলিয়ে হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ।—এ নামটা মন্দ নয়। একটা কম্প্রোইজ। যাই হোক, কিন্তু,.তোমাকে তো জিজ্ঞাসা করবার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

হঠাৎ যেন বেশ কঠিন একটা ফাঁপরে পড়ে গেলেন পূর্ণানন্দ। সত্যিই তো, শিবনাথের কাছে আজ আর তাঁর বলবার মতো কী কথা থাকতে পারে? বিরামপুরের সেই আমবাগানে এখনও যদি সেই রোদ আর ছায়া থেকেও থাকে, তবু তাঁর মনের কাছে তো নেই। এসব রোদ আর ছায়া যে পূর্বজন্মের একটা জগতের মতো ক্ষণিকতার ছবি, কনখল আশ্রমের পূর্ণানন্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শিবনাথ বলেন—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ—যাচ্ছি কনখলে, আমার আশ্রমে।

শিবনাথ—কিন্তু মধুপুরে অন্তত একটি দিনও কি থেকে যেতে পারবেন না?

পূর্ণানন্দ—কেন? মধুপুরে আমার কি আছে?

শিবনাথ—আপনার কিছু নেই, সাধুকাকা। আমার আছে।

—কি আছে তোমার?

—সবই আছে। একটি বাড়ি আছে। স্ত্রী ছেলে-মেয়ে আছে। আমি এখন মধুপুরের স্কুলে মাস্টারি করি।

—বেশ তো, ওর মধ্যে আমাকে ডেকে লাভ কি?

—আপনার কোন লাভ নেই। আমাদের আছে।

—তোমাদেরই বা কি লাভ?

—আপনার গল্প যে সেদিনও ছেলে-মেয়েদের কাছে বলেছি। সেই লগি দিয়ে আম পাড়বার গল্প, ফাত্‌নাতে জোনাকি গেঁথে রাত্রিবেলা মিরগেল ধরবার গল্প, আপনার সেই ঘোড়া-চড়া আর বেহালা বাজাবার গল্প। আপনার বিদ্যের গল্প।

পূর্ণানন্দ এইবার একটু কুণ্ঠিতভাবে, যেন একটু লজ্জিতভাবে, হাসলেন—ওসব তোমার মণিকাকার গল্প। আমার গল্প নয়।

শিবনাথ—আজ্ঞে আমার কাছে তো আপনিই মণিকাকা।

পূর্ণানন্দ এইবার তার চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিলেন। গেরুয়া চাদরের একটা কোণ তুলে নিয়ে চোখ দুটো আর কপালটাকে আস্তে আস্তে মুছলেন। মনে হয় একটু চিন্তিত হয়েছেন। কিংবা, সত্যি একটু ভয় পেলেন নাকি পূর্ণানন্দ? পূর্ণানন্দের এই শান্ত প্রাণের ভিতরে কোথাও খুব গোপন হয়ে একটা অদ্ভুত নিঃশ্বাস বোধহয় ছটফট করছে। শিবনাথের কিন্তু মনে হয়, সাধুকাকার খুব তেষ্টা পেয়েছে। বুড়ো মানুষ সাধুকাকা, এতক্ষণ ধরে বই পড়ে পড়ে তাঁর জিভটা বোধহয় একটু শুকিয়ে গিয়েছে। শিবনাথ বলেন—জল খাবেন সাধুকাকা, ঠাণ্ডা জল!

—হ্যাঁ।

ট্রেনটা তখন একটা স্টেশনে থেমেই ছিল। কাজেই চেঁচিয়ে পানিপাঁড়েকে ডাক দিয়ে এক গেলাস জল যোগাড় করতে শিবনাথের কোন অসুবিধাও হয়নি। জল খেয়ে নিয়ে পূর্ণানন্দও পরিতৃপ্তভাবে আর আস্তে একটা হাঁপ ছাড়লেন।

শিবনাথ বলেন—বাড়ির সবাই আপনাকে দেখলে যে কত খুশি হবে, সেটা আর আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না, সাধুকাকা। আমার প্রার্থনা, মধুপুরে অন্তত একটি দিনের জন্য থেকে যান।

পূর্ণানন্দ এবার মুখ টিপে হাসেন—বুঝেছি শিবনাথ, তুমি আমাকে একটা রিপ-ভ্যান-উইংকল পেয়েছো। আমাকে দেখেই সবারই একটা মজার আশ্চর্য মনে হবে। তাই না?

শিবনাথ—না না না, কখ্‌খনো না। আপনার পায়ের ধুলো পেলে একটা ভাগ্যি মনে করবে সবাই। সত্যিই, একটা পুণ্যি ছিল নিশ্চয়, তা না হলে হঠাৎ এভাবে আপনার দেখা পেয়ে যাবে কেন?

এরপর আর মাত্র পনের মিনিট সময় লেগেছিল। মধুপুরে পৌঁছে গেল ট্রেন। বইটাকে ঝোলার ভিতরে রেখে দিলেন পূর্ণানন্দ। আর, শিবনাথ নিজেই ব্যস্ত হয়ে পূর্ণানন্দের কম্বলটাকে গুটিয়ে নিয়ে হাতে তুলেন নিলেন।

মধুপুরে স্কুলের মাস্টার শিবনাথের বাড়ি। সে বাড়ির চারদিকে ফণীমনসার বেড়া। আর, বারান্দাতে ওঠবার সিঁড়ির কাছে একটা লতানে গোলাপ বাঁশ বেয়ে টালির চালার উপর উঠেছে। বড় বড় হলদে গোলাপের পাপড়ি সিঁড়িব উপরেও ঝরে পড়েছে।

হলদে গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো সেই সিঁড়ির উপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন পূর্ণানন্দ। আর, শুনে শুনে চমকে ওঠেন, ঘরের ভিতরে ঢুকে কী ভয়ানক চিৎকার করে কথা বলছে শিবনাথ—শুনছো, শিগগির দেখবে এস, আমাদের সেই মণিকাকা এসেছেন। শুনছিস নীলি, শিগগির দেখবি চল, মণিকাকা এসেছেন।

বের হয়ে আসে প্রীতিকণা, শিবনাথের স্ত্রী, কোলে একটা বাচ্চা, যার নাম ডাকু। ব্যস্ত হয়ে মাথার কাপড় টানে প্রীতিকণা। বের হয়ে আসে নীলিমা, শিবনাথের মেয়ে, এবছরেও স্কুল ফাইন্যাল ফেল করে আবার মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছে। ছুটে এসে পূর্ণানন্দের মুখের দিকে তাকায় সাধু, শিবনাথের বড় ছেলে, পনের বছর বয়স, নীলিমার চেয়ে তিন বছরের ছোট।

সকলেই একসঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে আর হাত বাড়িয়ে পূর্ণানন্দকে প্রণাম করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই পূর্ণানন্দ চমকে ওঠেন, দু'পা পিছিয়ে গিয়ে সরে দাঁড়ান—না না, আমি কারও প্রণাম নিই না, এসব করলে আমি কিন্তু বেশ বিরক্ত হব শিবনাথ।

শিবনাথ—ঠিক আছে। বুঝেছি সাধুকাকা, আপনাকে আর বলতে হবে না। এই নীলি...এই শুনছো...তোমরা সরে যাও।

এরপর শিবনাথের বাড়ির বারান্দায় উঠে একটা বেতের মোড়ার উপর বসলেন পূর্ণানন্দ। ঝোলাটাকে নামিয়ে মেজের উপর রাখলেন। আর, বেশ শান্ত-গম্ভীর স্বরে একটা কথা বললেন—রাত্রিবেলা আমি কিন্তু মেপে চার মুঠো যবের ছাতু ছাড়া আর কিছু খাই না, মনে রেখ শিবনাথ।

শিবনাথ ব্যস্তভাবে বললেন—যে আজ্ঞে, আমাদের মধুপুরের বাজারে বেশ ভাল যবের ছাতু পাওয়া যায়। আমি এখনই কিনে আনছি।

মাত্র একটি দিন মধুপুরে থাকবেন। তারপর কনখল আশ্রমে চলে যাবেন পূর্ণানন্দ। শিবনাথের এই অনুরোধ যেন পূর্ণানন্দের পূর্বজন্মের জগৎটারই একটা করুণ মিনতির ক্ষণ-আহ্বান। অনিচ্ছা থাকলেও প্রত্যাখ্যান করেননি পূর্ণানন্দ।

কিন্তু এই একটি দিনের থাকা যেন একটা ঝড়ের মধ্যে থাকা। সে ঝড়ের এলোমেলো যত পীড়ন আঘাত আর উপদ্রব সহ্য করতে করতে যেন হয়রান হয়ে গেলেন, হাঁসফাঁস করলেন আর হাঁপিয়ে পড়লেন পূর্ণানন্দ।

সকালবেলাতে বাইরের বারান্দাতে যখন কম্বলটা পেতে নিয়ে বসলেন আর একটু স্বস্তি বোধ করলেন পূর্ণানন্দ, তখনই আবার একটা অস্বস্তিতে তাঁর এত শান্ত চোখদুটোও ছটফট করে ওঠে। পূর্ণানন্দ ডাকেন—শিবনাথ তুমি কোথায়? এদিকে একবার এস আর দেখে যাও।

স্বস্তি এই যে, ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি। শিবনাথের বাড়িটা ছেলেপুলের বাড়ি হয়েও খুব বেশি চেঁচামেচির বাড়ি নয়। ঘরের জানালাগুলিও বেশ বড় বড় ; ঘরে খুব হাওয়া ঢুকতে পারে। তা ছাড়া, এই ঘরটাও অন্য সব ঘরের লাগোয়া একটা ঘর নয় ; একটু দূরের ঘর। মাঝে বেশ চওড়া এক টুকরো জমি বেশ ভাল একটা ব্যবধান হয়ে পড়ে আছে। সে জমিতে শুধু উঁচু দুর্বাঘাস ছাড়া আর কিছু নেই। দেখতে অনেকটা কনখলের আশ্রমবাড়ির দক্ষিণ দিকের সেই ঘরের সামনের জমিটার মতো, যে ঘরের মেজেতে পূর্ণানন্দের বিছানার একটি সতরঞ্জি আর দুটো কম্বল পড়ে থাকে।

শেষ রাতে যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখনও পূর্ণানন্দ বেশ শান্তি আর বেশ স্বস্তি বোধ করছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তের সেই গভীর মৌন এখানেও বসে অনুভব করতে কোন অসুবিধে হয়নি। সত্যিই কোথাও কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। গাছের মাথায় একটা একটা পাখিও উসখুস করে সামান্য একটা শব্দও জাগিয়ে তোলেনি।

খোলা জানালার কাছে বসে পুবের আকাশে সূর্য উঠতেও দেখেছিলেন পূর্ণানন্দ। দেখতে কোন অসুবিধে হয়নি, কনখলের আশ্রমবাড়ির সেই ঘরের জানালার কাছে বসে যেমন দেখা যায়, প্রথমে কয়েকটা লাল রেখা ফুটে উঠলো আকাশে, তারপর, সত্যিই জবাকুসুমসংকাশম আভা ছড়িয়ে পড়লো। তারপর দেখতে দেখতে জ্যোতি ফুটে উঠলো।

কিন্তু তারপর থেকে বারান্দাতে এই বেতের মোড়ার উপর বসে থাকতে, কিংবা বই

পড়তে খুবই অসুবিধে বোধ করেছেন পূর্ণানন্দ। এ রকম করে এক-একটা বাধা দেখা দিতে থাকলে আনন্দগিরির টীকা একটু মন দিয়ে পড়বার আনন্দটুকু আর পাওয়া যাবে না।

একটি বাচ্চা ছেলে, এটি নিশ্চয় শিবনাথের সেই ছেলেটি, যাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শিবনাথের স্ত্রী ; সে বাচ্চাটা মাঝে মাঝে তড়বড় করে হামা দিয়ে বারান্দার ওদিকের কিনারার একেবারে কাছে চলে যাচ্ছে। বারান্দার নীচে ওখানে একগাদা ভাঙা টালির টুকরো পড়ে আছে। নিতান্ত কচি একটা বাচ্চা, ও কি করে বুঝবে যে, কোথায় ভয় আছে বা বিপদ আছে? ধুপ করে যদি পড়ে যায় বাচ্চাটা, তবে তো একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে। নাকে মুখে চোখে কিংবা মাথায় ভয়ানক চোট লাগবে ; চেঁচিয়ে কেঁদে উঠবে। সে একটা দুঃসহ অস্বস্তির উপদ্রব হয়ে পূর্ণানন্দের এই সকালবেলার মনের শান্তি নষ্ট করবে। পূর্ণানন্দ আবার ডাকেন—শিবনাথ শুনছো, এদিকে একবার এস। এই বাচ্চাটিকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

ঘরের ভিতর থেকে ব্যস্তভাবে বের হয়ে আসেন শিবনাথ। এসেই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—এই পাজি ছেলে! এই ডাকু! খবরদার!

বলতে বলতে আরও এগিয়ে এসে শিবনাথ ওই হামা-দেওয়া ডাকুর একটা ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে আর ঝুলিয়ে কাঁধের উপর তুলে নিলেন। পূর্ণানন্দের চোখ দুটো হঠাৎ একটু কুঁচকে যায়। পূর্ণানন্দ বলেন—আঃ, কী করছো শিবনাথ!

শিবনাথের স্ত্রী প্রীতিকণাও একবার এক পেয়ালা গরম চা হাতে নিয়ে পূর্ণানন্দর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই চা খেয়েছেন পূর্ণানন্দ। কিন্তু আবার কেন এসে সামনে দাঁড়ায় শিবনাথের স্ত্রী?

প্রীতিকণা বলেন—আপনাকে সামান্য একটু খাবার এনে দিই, সাধুকাকা।

—খাবার? এখন আবার খাবার কিসের? পূর্ণানন্দের গলার স্বরে বেশ স্পষ্ট একটা বিরক্ত ভাব ফুটে ওঠে। বেশ জোরে মাথা নেড়ে আপত্তি জানান পূর্ণানন্দ—এ সময়ে আমি কিছুই খাই না। আমার জন্যে দুপুরবেলাতে শুধু দু'মুঠো আতপ চালের ভাত আর একটু দুধ রেখে দিও, তাহলেই যথেষ্ট।

প্রীতিকণা চলে যেতেই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন শিবনাথ।—দেখুন তো, লুচি ভেজেছে আর আলু-পটোলের একটা ডালনাও তৈরি করে ফেলেছে প্রীতি। এখন আবার উল্টো চাপ দিচ্ছে।

পূর্ণানন্দ—কি হয়েছে?

শিবনাথ—এখন বলছে, সাধুকাকার জন্যে যে খাবার তৈরি করলাম, সে খাবার তো আর কাউকে খেতে দেওয়া চলবে না। ফেলে দেওয়াও খুব খারাপ হবে।

পূর্ণানন্দ আশ্চর্য হন—কি বলছো তুমি?

শিবনাথ হাসতে চেষ্টা করেন।—সাধু মানুষের প্রসাদ হবে বলে আশা করে যে-খাবার তৈরি করা হলো, সেটা তো এখন আর যাকে-তাকে দেওয়া চলবে না।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু আমি তো লুচি-টুচি আশা করিনি। তোমাদের অসুবিধে কোথায়?

শিবনাথ—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক কথা। প্রীতিরই একটা আশা ছিল যে...।

পূর্ণানন্দ বোধহয় আবার একটা বিরক্তভাব চাপতে চেষ্টা করেন।—তোমরা যদি আশা কর যে, আমার উপর একটা উপদ্রব করলে ভাল হয়, তবে তো আমাকে এখনই...।

—না না, কখ্খনো না সাধুকাকা। আপনি একটুও ভাববেন না। শিবনাথ যেন ক্ষমা চাইবার একটা আকুলতা নিয়ে কথা বলেন।—আমি এখনই নিজেই ওই খাবারকে আপনারই প্রসাদ মনে করে খেয়ে ফেলবো। প্রীতিও আর একটিও বাজে কথা বলতে পারবে না।

পূর্ণানন্দ এইবার হাসেন।—তোমাদের এই জায়গাটাকে আমি দেখবার আগেই সন্দেহ করে যতটা ভয় পেয়েছিলাম, ততটা ভয় করবার কিছু নেই।

শিবনাথ—হ্যাঁ, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—বোধহয় টাউন থেকে খুব কিছু দূরে নয় তোমার এই বাড়িটা?

শিবনাথ—আজ্ঞে না।

পূর্ণানন্দ—তবু বেশ নিরিবিলি বলে মনে হয়। তা ছাড়া হইহল্লা গোলমালও নেই বলে মনে হয়।

শিবনাথ—আজ্ঞে না, একটুও না।

পূর্ণানন্দ—তাই তো আমার বিশেষ কোন অসুবিধে হলো না। বুঝতেই তো পার, একটু নিরিবিলি জায়গা না হলে, একটা শান্ত নীরব পরিবেশ না থাকলে আমার মতো মানুষের পক্ষে স্বস্তিবোধ করা তো সম্ভব নয়।

শিবনাথ—খুব সত্যি কথা। কিন্তু সাধুকাকা...।

পূর্ণানন্দ—কি?

শিবনাথ—আপনি যদি আরও দুটো দিন থাকেন, তবে আরও বুঝতে পারবেন, এখানে আপনার কোন অসুবিধে নেই। আপনার একটুও অস্বস্তি বোধ করতে হবে না।

পূর্ণানন্দ হাসেন—ব্রিচ অব প্রমিস! এটা ভাল কথা নয় শিবনাথ। যা কথা হয়েছে, তাই হবে। আমি আজই সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা হব।

শিবনাথ একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসেন আর মাথা চুলকোতে থাকেন—তাহলে, তাহলে তো আমার আর কিছুই বলবার সাহস থাকে না।

দুপুরবেলাতে কুয়োতলার কাছে যখন স্নান করতে বসলেন পূর্ণানন্দ, তখন শিবনাথ আবার ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন।—আপনি চুপ করে বসুন সাধুকাকা, আমি এই বালতি করে আপনার গায়ে আস্তে আস্তে জল ঢেলে দিই।

পূর্ণানন্দ বলেন—তুমি যাও, শিবনাথ। বিরক্ত করো না।

একটা মগ হাতে তুলে নিয়ে বালতি থেকে জল তোলেন আর গায়ে ঢালেন পূর্ণানন্দ, আর মনে মনে সেই প্রিয় স্তোত্রটাও আবৃত্তি করেন।—ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা...।

দু' মুঠো আতপ চালের ভাত, আর একটু দুধ, পূর্ণানন্দের জীবনের দুপুরবেলার সেই সামান্য আহারের শান্তিটা আবার নষ্ট হয়ে যেত, যদি ঠিক সময়ে সাবধান না হতেন শিবনাথ। ভিতরের বারান্দার মেঝের উপরে একটা আসনে বসে সবেমাত্র ভাতের ছোট থালাটার দিকে তাকিয়েছেন পূর্ণানন্দ, তখুনি তাঁর চোখ দুটো চমকে উঠেই স্থির হয়ে যায়। ভাতের থালার দিকে যেন আর হাত এগিয়ে নিতে চান না পূর্ণানন্দ। আবার একটা অস্বস্তি যেন তাঁর এই হাতের উপর একটা ভার হয়ে চেপেছে। কারণ একটা পাখা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে শিবনাথের স্ত্রী প্রীতি।

কিন্তু শিবনাথ তখনি চোখের ইসারায় প্রীতিকে সরে যেতে বলেন। আর এদিকে এগিয়ে না এসে ঘরের ভিতরে চলে যায় প্রীতি। তারপর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায় আর চুপ করে দেখতে থাকে, দুধ-ভাত খাচ্ছেন সাধুকাকা। একটুও পরিপাটি করে খেতে জানেন না। ছোট্ট ছেলেমানুষের মতো কেমন যেন এলোমেলো করে কিছু ভাত দুধ দিয়ে মাখলেন আর খেলেন, কিছু ভাত এমনিই শুকনো-শুকনো খেলেন। বাটির তলায় থিতানো দুধটুকুও এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে তারপর মিছিমিছি আরও কয়েকটা চুমুক দিলেন।

শিবনাথ বলেন—আপনাব বোধহয় দুপুরে একটু ঘুমোবার অভ্যেস আছে সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ হাসেন—ঠিক অভ্যেস নয়, তবে শরীরের যেদিন যেমন অবস্থা হয়—হয় ঘুমিয়ে পড়ি, নয় জেগে বসে বই পড়ি। কিন্তু....।

শিবনাথ—বলুন।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু কোন হই-হল্লার উৎপাত থাকলে ঘুমিয়ে পড়াও হবে না, আর বই পড়াও অসম্ভব হয়ে উঠবে। কি করবো বলো? এটা যে আমার একটা অভ্যাস হয়ে উঠেছে। তিরিশটি বছর ধরে নিরিবিলি শান্তির মধ্যে থাকবার অভ্যেস।

শিবনাথ—হ্যাঁ সাধুকাকা। কিন্তু এখানেও কোন হই-হল্লা আপনাকে বিরক্ত করতে পারবে না। আমি তবে আছি কি করতে?

কিন্তু কি আশ্চর্য, যেন শিবনাথের এই প্রতিজ্ঞার কথাটাকে একেবারে মিথ্যে করে দেবার জন্যেই এই দুপুরে যত ফেরিওয়ালার হাঁকডাক ছুটে ছুটে আসছে। চাই গয়ালী থালা বাটি ঘটি! চাই মোটিয়া চাদর! চাই গুলাবছড়ি তিলকুট আওর দেওঘরকা পেড়া!

বার বার ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন শিবনাথ। ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়ান। ফিসফিস করে কথা বলে ফেরিওয়ালাকে বুঝিয়ে দেন, চেঁচিও না, ওদিকে যাও ; সাধুজীর শান্তির ঘুম নষ্ট করে দিও না।

পূর্ণানন্দ আজ দুপুরে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েননি। ঘরের জানালার কাছে চুপ করে বসে শুধু বই পড়েছেন। তবু মাঝে মাঝে দেখতে পেয়েছেন, শিবনাথ ঘর থেকে বের হয়ে আর ছুটে গিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়াচ্ছে, আর হাঁকমুখর যত ফেরিওলাকে নানা কথা বলে বলে নীরব করিয়ে দিচ্ছে, সরিয়েও দিচ্ছে।

বই পড়া বন্ধ করে ডাক দিলেন পূর্ণানন্দ—একবার এদিকে এসে শুনে যাও, শিবনাথ।

কে জানে কেন, শিবনাথের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পূর্ণানন্দ। তারপর বললেন—তুমি না বলেছিলে, তুমি এখানে একটা স্কুলের মাস্টার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সাধুকাকা।

—আজ কি তবে কাজ কামাই করলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি দরকার ছিল?

—দরকার ছিল বই কি। আমি স্কুলে যাই, আর এদিকে যত উপদ্রব এসে আপনাকে বিরক্ত করুক, তা কি কখনও হয়?

—না না, বিরক্ত হবার মতো তেমন কোন উপদ্রব তো দেখলাম না। একটা দিন তোমার এখানে আমার বেশ ভালই কাটলো।

—কিন্তু আমার যে এই একটা দিন কত ভাল কাটলো, সেটা আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না।

পূর্ণানন্দ হাসেন—তোমার আবার এত ভাল লাগবার কি আছে!

শিবনাথ—বলেন কি? আপনাকে যখনি দেখছি, তখনই মনে পড়ছে, এই তো আমাদের সেই মণিকাকা। মিরগেল ধরবার জন্যে রাত জেগে যাঁর সঙ্গে বসে পুকুরে ছিপ ফেলে...।

পূর্ণানন্দ—আঃ, তুমি আর ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটবে না শিবনাথ।

শিবনাথ—আমার কিন্তু একটু দুঃখ রয়ে গেল সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—কিসের দুঃখ?

শিবনাথ—আপনার তেমন কিছু যত্ন করতে পারলাম না। আপনিই আপত্তি করলেন বলে...।

পূর্ণানন্দ—থামো শিবনাথ। যত্নের কি আর বাকি রাখলে? আমিই বা আপত্তি করলাম কোথায়?

শিবনাথ—ওই যে, আপনার স্নানের সময় নিজের হাতে আপনার গায়ে একটু জল ঢেলে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আপত্তি করলেন। অথচ...।

পূর্ণানন্দ—কি?

শিবনাথ—আমার যে এখনও মনে আছে, আমিই তো এক দিন বাঁদরের মতো ধুলোমাখা পায়ে আপনার কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আর লগি নেড়ে আম পেড়েছিলাম।

পূর্ণানন্দ এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—এই কথা! তোমার কি ধারণা যে তোমার সেই ধুলোমাখা পায়ের দাগ আমার গায়ে এখনও লেগে আছে? তুমি কি আমার গায়ে জল ঢেলে দিয়ে সে দাগ ধুয়ে দিতে চাও?

হাসছেন সাধুকাকা, কিন্তু তাঁর মাথাটা যেন বড় বেশি কাঁপছে। শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে তাঁর চোখের চাহনিটা।

শিবনাথ—না সাধুকাকা, আমার মনে ওরকমের কোন বাজে ধারণা থাকতেই পারে না। জল ঢেলে দিয়েই কি সবকিছু ধুয়ে দেওয়া যেতে পারে? পারে না।

শিবনাথ যেন একটা বাচাল প্রতিধ্বনি। ভয়ানক অদ্ভুত কথা বলছে শিবনাথ। পূর্ণানন্দের দুই কান বোধহয় শিউরে উঠেছে। দুই চোখের চাহনিও শিথিল হয়ে গিয়েছে। পূর্ণানন্দের গলার স্বর ঘড় ঘড় করে।—এখন ক'টা বেজেছে, শিবনাথ?

শিবনাথ—চারটে বেজেছে বোধহয়। সাড়ে চারটের বেশি নয় নিশ্চয়।

পূর্ণানন্দ—তা হলে তো আমার রওনা হবার সময় হয়ে এল।

শিবনাথ—আজ্ঞে না, এখনও প্রায় আড়াই-ঘণ্টা বাকি। আপনার ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়।

পূর্ণানন্দ—ওই একই কথা। আর মাত্র দুই আড়াই ঘণ্টা।

শিবনাথ—আপনি কি যাবার আগেও একটু কিছু মুখে দেবেন না?

হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ—তুমি দেখছি, সত্যিই আমাকে খুব ভয়-ভয় করে কথা বলছো? মুখে দেবো বইকি। অন্তত এক পেয়ালা গরম চা তো খাব।

শিবনাথ—আর একটু...।

পূর্ণানন্দ—না শিবনাথ, লুচি-টুচি আমার সহ্য হবে না।

শিবনাথ—তাহলে একটু মুড়ি-টুড়ি...।

পূর্ণানন্দ—তোমাদের এখানে মুড়ি পাওয়া যায় নাকি?

শিবনাথ—খুব পাওয়া যায়। আরও মজার ব্যাপার, এখানকার মুড়ি ঠিক, আমাদের বিরামপুরের মুড়ির মতো খুব মিহি চালের মুড়ি, জুঁইকুঁড়ির মতো সাদা।

পূর্ণানন্দ—সে মুড়ির শেষ চেহারা তো তিরিশ বছর আগে দেখেছিলাম, তারপর আর নয়। তোমার মনে নেই যে, সেদিন...।

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন পূর্ণানন্দ। শিবনাথ বলেন—আমার নিশ্চয় মনে আছে।

পূর্ণানন্দ—মনে আছে কি, তোমাদের বাড়ির পুকুরঘাটে বসে একদিন বিকেলবেলা একটা ডালা ভরতি করে বিরামপুরের সেই মুড়ির সঙ্গে কচি শশার টুকরো মিশিয়ে...।

শিবনাথ—হ্যাঁ, মা এসে আবার একগাদা নারকেল বরফিও দিয়ে গেলেন। মনে আছে বইকি, ভুলবো কেন?

হঠাৎ যেন সাবধান হয়ে আর জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বিরামপুরের গল্পের সব মুড়ি উড়িয়ে দিলেন পূর্ণানন্দ। একবার চশমাটাকে খুলে নিয়ে হাত দিয়েই মুখটাকে মুছে নিলেন। তারপর বেশ নিবিড়-শান্ত স্বরে কনখল আশ্রমের কথা বলেন।—চমৎকার জায়গা। এমনই নিস্তব্ধ একটা জায়গা যে, নিজের মনের কথাগুলিরও যেন শব্দ শোনা যায়। অবশ্য তোমাদের এখানকার বিকেলবেলার মতো ওখানেও বিকেলবেলার পাখি ডাকে। তবে সে-পাখির ডাক শুনতে একেবারে অন্য রকমের লাগে। এখানেই তো শুনছি, ওই তো, ময়নার মতো দেখতে একটা পাখি তখন থেকে ডাকছে ; কিন্তু কই? এই ডাকে তো সেই সুর নেই!

চা নিয়ে আসে প্রীতিকণা। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা ডালা ভরতি করে মুড়ি। আর সেই

বাচ্চাটা, যার নাম ডাকু, সেটাও প্রীতিকণার পিছু পিছু হামা দিতে দিতে চলে আসে।

পূর্ণানন্দ যেন চমকে ওঠেন, আর বেশ একটু বিরক্তি-বিচলিত স্বরে কথা বলেন—আঃ, তুমি এটা কি করছো বউমা? মুড়ির ডালা রেখে দিয়ে বাচ্চাটাকে আগে একটু ধর ; কোলে নাও।

চায়ের পেয়ালা আর মুড়ির ডালা পূর্ণানন্দের কাছের জানালাটার তাকের উপর রেখে দিয়ে বাচ্চা ডাকুকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নেয় প্রীতিকণা।

চা খান পূর্ণানন্দ ; মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে ডালা থেকে মুড়ি তুলে নিয়েও খেতে থাকেন।

ডাকুকে কোলে নিয়ে প্রীতিকণাও পূর্ণানন্দের চোখের সামনে যেন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রীতিকণার মুখে অদ্ভুত এক খুশির হাসি। কে জানে কিসের খুশির এত হাসি!

পূর্ণানন্দও হঠাৎ হেসে ফেলেন।—আমি বলেছিলাম কিনা, শিবনাথ?

শিবনাথ—আজ্ঞে?

পূর্ণানন্দ—তোমার এখানে এলে আমাকে সবারও চোখে একটা রিপ ভ্যান উইংকল বলে বোধ হবে?

শিবনাথ—বলেছিলেন তো, কিন্তু কত ভুল কথা বলেছিলেন।

পূর্ণানন্দ—একটুও ভুল বলিনি। এই দেখ, বউমা কেমন করে তাকিয়ে আমার খাওয়া দেখছে।

শিবনাথ—প্রীতি আবার কি দেখবে? ও আর আপনার খাওয়ার কতটুকু দেখেছে? প্রীতি তখন ছিল কোথায় যে দেখবে?

এইবার প্রীতির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে শিবনাথ—তুমি তো দেখনি প্রীতি, এই মণিকাকা লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন রায়গঞ্জ থেকে ঘোড়া চড়ে আমাদের বিরামপুরের বাড়িতে আসতেন। আর, মা বাটি ভরতি করে ক্ষীরের পুলি এনে মণিকাকার পাতে ঢেলে দিতেন। এক বাটি, দু'বাটি, তিন বাটি ; মণিকাকা আর না করতেন না। মা শেষে ক্ষীরপুলির হাঁড়িটাকেই নিয়ে এসে মণিকাকার পাতের কাছে রেখে দিতেন।

প্রীতি বলে—কিন্তু সেই মণিকাকা আজ এ কী করছেন? শুধু দুটো মুড়ি চিবিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমার একটুও ভাল লাগছে না।

পূর্ণানন্দ—আহা, তুমিও এরকম একটা ভুল কথা বলে ফেললে, বউমা। আমি কি আজ সেই মানুষ, না আমার আজ সেই বয়স? তা-ছাড়া আমার মনেও কি আর সেই পুরনো জীবনের কোন লোভ-টোভ আছে?

সাধুকাকার এই কথার উপর তো আর প্রশ্ন চলে না। চুপ করে প্রীতিকণা। কিন্তু প্রীতিকণার এই নীরব মুখটা একটুও গম্ভীর নয়। প্রীতির সারা মুখে যেন অদ্ভুত এক খুশির হাসি থমথম করছে।

পূর্ণানন্দ বলেন—আমার খাওয়া হয়ে গেছে বউমা, তুমি এবার যাও। তোমার তো অনেক কাজটাজ আছে।

প্রীতি—কাজ-টাজ তো রোজই আছে, রোজ থাকবেও।

শিবনাথ—কিন্তু আপনাকে তো আর রোজ দেখতে পাবো না। এই তো, বড়জোর আর দেড় ঘণ্টা।

পূর্ণানন্দ হাসেন—যাই হোক, তুমি এখন এস, বউমা। আমি শিবনাথের কাছে শেষ বারের মতো আবোল-তাবোল আরও দুটো কথা শুনে নিই। কিন্তু তুমি আবার শিবনাথের মতো বলো না যেন, মনে একটা দুঃখ রয়ে গেল।

প্রীতি—না, বলবো না। আপনি তো আমাকে বউমা বলে ডেকেই ফেলেছেন।

এইবার প্রীতিরই মুখের দিকে তাকিয়ে পূর্ণানন্দ স্নিগ্ধ চোখ দুটো একেবারে উদাস হয়ে যায়। এ যেন আর-একটা বাচাল প্রতিধ্বনি! কনখলের তিরিশ বছরের আশ্রমিক এক সন্ন্যাসীর সতর্ক অন্তরাত্মা কোন্ মুহূর্তে যে অসতর্ক হয়েছে আর জব্দ হয়ে গিয়েছে, সেটা তো তিনি বুঝতেই পারেননি।

ছটফট করেন পূর্ণানন্দ।—না শিবনাথ, আর ঘরের ভিতর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। আমি বাইরের বারান্দায় বসি।

শিবনাথ—তাই ভাল।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু আর বসেই বা কি হবে? সময় তো হয়ে এলো। এখন রওনা হলেই বা মন্দ কি।

শিবনাথ—না সাধুকাকা, একটু অপেক্ষা করুন। সন্ধ্যার আলো না জ্বেলে আপনাকে চলে যেতে দিতে খুব খারাপ লাগবে।

বারান্দায় মোড়ার উপর চুপ করে একলা হয়ে বসে রইলেন পূর্ণানন্দ। ঘরের ভিতরের যত কাজ সামলাতে চলে গেল প্রীতি। আর, শিবনাথ চলে গেলেন কুয়োতলের কাছে, হয় জল তুলতে, নয় ঘাসের উপর মেলে-দেওয়া যত কাচা কাপড়-জামা তুলে আনতে!

কিন্তু পূর্ণানন্দ যেন হাঁসফাঁস করেন। এভাবে একটা বেতের মোড়ার উপর চুপ করে বসে থাকতে খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন পূর্ণানন্দ। সত্যিই তো, এ যে একটা শাস্তির মতো ব্যাপার। এই বাড়ির সন্ধ্যাদীপের একটা আশার কাছে বন্দীর মতো পড়ে থাকবার কোনো দরকার ছিল না। সে সন্ধ্যাদীপ সন্ধ্যাদীপ জ্বালবে তবে ছাড়া পাবেন পূর্ণানন্দ? শিবনাথের দাবিটা যে বড় বেশি সাহস করে বসে আছে।

বোধহয় বুঝতে পারেননি পূর্ণানন্দ, তাঁরই চোখের সামনে বিকেলের শেষ রোদের আভা কখন ফুরিয়ে গিয়েছে আর সন্ধ্যা দেখা দিয়েছে।

ভিতরের ঘরে হঠাৎ কে যেন একটা আলো জ্বেলে দিল। কী ভয়ানক চমকে উঠলেন পূর্ণানন্দ। এ আলো যে একটা সংকেত। শিবনাথের এই বাড়ির বারান্দা থেকে এইবার স্বচ্ছন্দে নেমে চলে যেতে পারবেন পূর্ণানন্দ। আর তাঁকে দেরি করিয়ে দিতে সাহস করবে না কোন বাধা।

ঘরের ভিতরে কারা যেন কথা বলছে। সে কলরবের কিছু ভাষা পূর্ণানন্দের কানের কাছেও ভেসে আসে। শিবনাথের বউ প্রীতি যতই আস্তে কথা বলুক না কেন, শুনতে পেয়েছেন পূর্ণানন্দ।—উনি আমার খুড়শ্বশুড়। আমি আগে কখনও দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম; কখনও ভাবতেই পারিনি যে, কোনদিন দেখতে পাব। উনি তো আর ঠিক এ-জগতের কেউ নন।

একজন মহিলার গলার স্বর বেশ স্পষ্ট করে প্রীতিকে আবার বুঝিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু মাত্র একটি দিন থেকেই চলে যাচ্ছেন কেন?

—কি করে বলি? আমরা তো খুব চেষ্টা করেছি, যাতে সাধুকাকার কোন অস্বস্তি না হয়। কাউকে চেঁচামেচি করতে, একটা টু শব্দ করতেও দিইনি। নীলি আর মাধুকে বলে দিয়েছি, তোরা আজ নেপুদের বাড়িতে গিয়ে পড়গে যা। এখানে এত চেঁচিয়ে পড়া চলবে না।

—তুমি নিজে একবার বলে দেখলে পার।

—আর বলবার সময় কোথায়? এখনি চলে যাবেন। যাবার সময় পিছু ডেকে কি ভাল হবে?

প্রতি বছর সাগর-স্নানে যাবার সময় ট্রেনের ভিড়ের মধ্যে বসেও কত রকমের ভাষায় কলরব শুনতে পান পূর্ণানন্দ। কিন্তু সেই শোনা তো পূর্ণানন্দের কানের কাছে এসেই শেষ হয়ে যায়। সে কলরবের আওয়াজ যত তীব্র হয়ে বেজে উঠুক না কেন, পূর্ণানন্দের মনের

ধারে-কাছে এসে সামান্য একটা ভাবনাও সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু শিবনাথের বাড়ির এই সন্ধ্যার এই চাপা-স্বরের ভাষা যেন ভিন জগতের একটা উপবনের ঝড়ের শব্দ ; পূর্ণানন্দের বুকের ভিতরে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছে।

কিন্তু বুঝতে পারল না পূর্ণানন্দ, শিবনাথের স্ত্রী মিছিমিছি এরকমের আক্ষেপ করে কেন? কনখল আশ্রমের এক বুড়ো সন্ন্যাসীকে পিছু ডেকে আরও দুটো দিন এখানে থামিয়ে রেখে দিয়ে এদের লাভ কি?

কিন্তু শিবনাথ আর শিবনাথের স্ত্রী, দুজনেই একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছে। পূর্ণানন্দ যেন মঙ্গলগ্রহের একটা মানুষ, এই মধুপুরের কাছে একটা ভয়ানক স্ট্রেঞ্জার! আশ্চর্য! তা না হলে এ ধারণা ওদের কেন হয় যে, ছেলেমেয়েদের পড়ার শব্দ শুনে পূর্ণানন্দ একেবারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠবেন?

পূর্ণানন্দ ডাক দিলেন—বউমা, তুমি কি একবার এদিকে আসতে পারবে?

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে প্রীতি—কি সাধুকাকা!

পূর্ণানন্দ—কাল যে আরও দুজনকে দেখলাম, তারা কোথায়?

প্রীতি—কারা?

পূর্ণানন্দ—তোমারই ছেলে আর মেয়ে বলে যাদের মনে হলো?

প্রীতি—হ্যাঁ, আমার মেয়ে নীলি আর ছেলে মাধু।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু কোথায় ওরা? বলতে গিয়ে পূর্ণানন্দের এই প্রায়-সত্তর বছর বয়সের গলার স্বরে যেন বেশ কঠোর একটা ধমক ফুটে ওঠে।

প্রীতি—ওদের ওদিকে সরিয়ে দিয়েছি।

পূর্ণানন্দ—বুঝেছি। আর এইমাত্র শুনেছিও, তুমি ঘরের ভিতরে একজন মহিলাকে যে-কথা বললে।

ভয় পায় প্রীতি—আমি কি ভুল করে কোন অন্যায় কথা বলে ফেলেছি, সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ—ভুল করেছ বইকি। নিশ্চয় অন্যায় করেছো। কে তোমাকে বললে যে, ওরা এখানে ঘরে বসে ওদের পড়া পড়লে আমার অস্বস্তি হবে?

নীরব হয়ে শুধু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি।

পূর্ণানন্দ—কোথায় ওরা?

প্রীতি—ডাকবো ওদের?

পূর্ণানন্দ—ডাকা তো আগেই উচিত ছিল। আমার কাছে ওদের একবার আসতে দেওয়া উচিত ছিল।

প্রীতি—আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি নীলিকে আর মাধুকে এখনই ডেকে পাঠাচ্ছি।

শিবনাথ একটা দৌড় দিয়ে এসে বারান্দায় উঠলেন—এঃ, সত্যিই যে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো।

পূর্ণানন্দ—বৃষ্টি? হঠাৎ বৃষ্টি? এ কী ব্যাপার? এখন বৃষ্টি হলে তো চলবে না? বলেই বা কি? আমাকে এখনই বের হতে হবে।

শিবনাথ—তা তো হবেই ; বেশি সময়ও তো আর নেই যে, অপেক্ষা করা চলবে।

প্রীতি—অন্তত আর আধ ঘণ্টা তো অপেক্ষা করতে হবে।

শিবনাথ—মোটেই না। আর অপেক্ষা করা চলবেই না। রঘু বললে, ছ'টা বেজেছে। এখনই হাঁটা দিলে আর খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও স্টেশনে পৌঁছতে অন্তত পঁচিশ মিনিট লাগবে।

প্রীতি—কিন্তু সাধুকাকা যে নীলিকে আর মাধুকে দেখবেন।

শিবনাথ—আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন—তা হলে কি করে হয়? রঘু যদি এখনই ওদের ডেকে আনতে যায়, তবে ওদের এসে পৌঁছতেও তো অন্তত চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে।—

আপনি একটা বুদ্ধি দিন সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—আর বুদ্ধি দিয়েছি? আমিই যে ভুল করে একটা ঝোঁকের মাথায় নির্বুদ্ধির কাণ্ডটা করে বসে আছি। যাক্...। বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন পূর্ণানন্দ—তোমাদের মনে যা ছিল, তাই হলো।

শিবনাথ—আজ্ঞে?

পূর্ণানন্দ—সাড়ে ছ'টার পর কি আর কোন ট্রেন নেই?

শিবনাথ—আছে, রাত্রি দশটায়।

পূর্ণানন্দ—তবে সেই ট্রেনেই যাব। এখন...এখন এক পেয়ালা গরম চা দাও দেখি, বউমা।

ঘরের ভিতরে চলে গেল প্রীতি। আর বাইরের গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন শিবনাথ—বৃষ্টিটা বোধহয় বন্ধ হয়েই গেল।

পূর্ণানন্দ হেসে ওঠেন—এখন তো বন্ধ হবেই। কাজ হাসিল হয়ে গেছে কিনা, পিছু ডেকে আমার যাত্রা দেরি করিয়ে দেবার জন্য যা যা দরকার ছিল, তার সব হলো। কিন্তু, আর পিছু ডেক না, শিবনাথ।

শিবনাথ—না সাধুকাকা, ইচ্ছে থাকলেও আর পিছু ডাকবো না।

পূর্ণানন্দ—তোমার তো ওই একটি মেয়ে আর দুটি ছেলে?

শিবনাথ—হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ—দেশের খবর-টবর বোধহয় কিছুই রাখ না!

—কিছু কিছু রাখি। আমাদের সেই দালানবাড়িটা অবশ্য আছে, কিন্তু ওটা আর আমাদের কেউ নয়।

—কেন?

—বাবার তো অনেক দেনা ছিল, তার উপর কঠিন অসুখের চিকিৎসায় জলের মতো টাকা খরচ করতেও হলো। বাড়িটা বিক্রি না করে দিয়ে কোন উপায় ছিল না।

—তা হলে তুমি এখন...।

—আমি এখানেই আছি, একরকম আছি, চলেই যাচ্ছে।

—চলে গেলেই হলো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাস্টারি করে যা পাই তাতে ডাল-ভাত কোনতে হয়ে যায় বটে। সেজন্য কোন ভাবনা করি না। তবে ওই একটা চিন্তা ; আমার নীলি তো বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বিয়ে দিতে হলে কিছু টাকার দরকার তো হবেই।

—বিয়ের চেষ্টা দেখছো তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশ ভাল দুটি পাত্রের খোঁজ পেয়েছিলাম! তার মধ্যে একটির সঙ্গে কোন কথাই চললো না। বড় বেশি দাবি। আর একটির সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে পাঁচ ভরি সোনার ব্যাপার নিয়ে সম্বন্ধ ভেঙে গেল।

—কিরকম?

—আমরা দশ ভরি পর্যন্ত রাজি হয়েছিলাম ; প্রীতি ওর বিয়েতে পাওয়া বার ভরির মধ্যে ওই দশ ভরিকে এখনও কোনমতে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু ওরা বললেন, পনের ভরির সোনার গহনা দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে না দিলে আত্মীয়-কুটুম্বদের কাছে ওঁদের অসম্মান হবে। কিন্তু আর পাঁচ ভরি সোনা দেবার মতো আমার সামর্থ্য ছিল না।

—এখন সামর্থ্য হয়েছে তো?

—আজ্ঞে না সাধুকাকা। কি করে হবে?

—তবে?

—তবে আর-একটি পাত্রের খোঁজ পেয়েছি। এদের সোনা নিয়ে দাবি-দাওয়ার ব্যাপার

নেই। এরা মেয়ে দেখেই খুশি হয়েছে। কিন্তু বলছে, বরযাত্রীর সংখ্যা কিছু বেশি হবে। সেটাও তো যেমন-তেমন খরচের ব্যাপার নয়, সাধুকাকা।

—কেন? তোমার যা সামর্থ্য তাই করবে। চা-সিঙাড়া খাইয়ে দেবে, বাস্‌।

—তা হয় না, সাধুকাকা। শেষে এই নিয়ে গণ্ডগোল বাধবে। অপমান হতে হবে।

—কিন্তু একটা উপায় তো করতে হবে। এই পাত্রকেও তো হাতছাড়া করা চলবে না।

—অগত্যা, কিছু ধার-কর্জের চেষ্টা দেখতে হবে।

—ধার-কর্জ? একি? এইতো ওরা এসেছে। কাছে এসো দেখি। তুমি বুঝি নীলিমা?

—হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ—আর তুমি বুঝি মাধু?

—হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ—বাস্‌, আর কোন কথা নয়। এখন দিদি আর ভাই দুজনে পড়তে বসে যাও। আমি তোমাদের পড়া শুনবো।

নীলিমা ঘরের ভেতর থেকে একটা মাদুর টেনে নিয়ে এসে বারান্দার মেজেতে পাতে। মাধু নিয়ে আসে একটা ল্যাম্প, তারপর দুজনেই বইয়ের দুটি স্তূপ হাতে তুলে নিয়ে এসে পড়তে বসে।

বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করে ঘুরে বেড়ান পূর্ণানন্দ।—বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়ে পড়, যেন আমি শুনতে পাই।

শিবনাথ—আপনার রাত্তিরের খাওয়া কি কালকেরই মতো শুধু চার মুঠো যবের ছাতু...।

পূর্ণানন্দ হাসেন—তোমাদের ইচ্ছেটা কি?

শিবনাথ—রুটি, একটু ডাল সেদ্ধ আর একটু পায়েস যদি করা হয় তবে...।

—হ্যাঁ, করো। তবে বউমাকে বলে দাও। পায়েস যেন বেশি মিষ্টি না হয়।

চলে গেলেন শিবনাথ। আর, পূর্ণানন্দ শুধু বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করেন। মাঝে মাঝে নীলি আর মাধুর কাছে এসে দাঁড়ান। নীলি চোখ তুলে পূর্ণানন্দর মুখের দিকে তাকায়। বড় বেশি কালো আর চকচকে দুটি চোখ।

পূর্ণানন্দ হাসেন—এখনই কি-যেন একটা কথা তুমি পড়লে নীলিমা? আর একবার পড় তো, শুনি।

নীলিমা—ভারতের ঋষিদের উপলব্ধির বাণী এই সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ এক দিন...।

পূর্ণানন্দ—তোমার বই একটু ভুল করেছে নীলিমা। ও কথাটা ভারতের কোন ঋষির বাণী নয়। ওটা হলো ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত ভিক্টর কুঁজা'র বাণী।

নীলিমা চোখ বড় বড় করে তাকায়—তাহলে আমি এখন কি করি সাধুদা?

পূর্ণানন্দ—আমি যা বললাম সেটা বইয়ের পাতার একপাশে লিখে রেখে দাও।

আবার পায়চারি করেন পূর্ণানন্দ ; আবার হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। মাধুর দিকে তাকিয়ে বলেন—কি বললে মাধু? উত্তমাশা অন্তরীপ?

মাধু—হ্যাঁ, সাধুদা।

পূর্ণানন্দ মাধুর কাছে এগিয়ে আসেন—তবে শোন, একটা গল্প বলি। পর্তুগীজ নাবিক যখন প্রথম ওই অন্তরীপ আবিষ্কার করেন, তখন জায়গাটাকে দেখে হতাশ হয়েছিলেন। সমুদ্রের অবস্থা খুব অশান্ত। তেমনি সব সময় ভয়ানক ঝড়। তাই অন্তরীপের নাম রাখা হলো, হতাশা অন্তরীপ। কিন্তু পতুর্গালের রাজা বললেন, না, ওর নাম হোক, উত্তমাশা অন্তরীপ। অশান্ত সমুদ্র দেখে হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

মাধু হাঁ করে, খুব আশ্চর্য হয়ে, আর যেন একটু মুগ্ধ হয়েও পূর্ণানন্দর মুখের কথাগুলি শুনতে থাকে। তারপরেই বই বন্ধ করে দেয়।—আপনি আর-একটা গল্প বলুন সাধুদা।

পূর্ণানন্দের মুখের হাসিটা এইবার যেন গলে পড়ে—এই সেরেছে! মাধুকে তো খুব চালাক বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু তখনি বেশ ক্লান্তভাবে মোড়ার উপর বসে পড়েন পূর্ণানন্দ।—আর গল্প বলা হবে না, মাধু, আর হবে না। আমি তোমাদের গল্প-বলা দাদু নই।...কিন্তু, ও শিবনাথ, তুমি কোথায়?

শিবনাথ আসতেই পূর্ণানন্দ যেন ছটফট করে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ান।—আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে শিবনাথ, রাত দশটার ট্রেনটাও বোধহয় ধরতে পারা যাবে না।

শিবনাথ—খুব পারা যাবে। এখনও একঘণ্টা সময় আছে।

পূর্ণানন্দ—থাকুক একঘণ্টা সময়। এখনই রওনা হয়ে যাওয়া ভাল।

ঘরের ভিতর থেকে প্রীতি যেন একটা উতলা-মূর্তি হয়ে বের হয়ে আসে ; আর বেশ রাগ করেই কথা বলে...এখনই যাব-যাব করলে চলবে না, সাধুকাকা। আমি এইমাত্র পায়েস চড়ালাম।

প্রীতির মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে পূর্ণানন্দর দুই চোখ যেন ভীরু ভীরু হয়ে শেষে একেবারে করুণ হয়ে যায়। বিড়-বিড় করে কথা বলেন পূর্ণানন্দ—আমারই ভুল হয়েছে, বউমা। তুমি কিছু মনে করো না।

কিন্তু পারলেন না পূর্ণানন্দ। শিবনাথের বাড়ির এক কঠোর অভিমানের ভর্ৎসনার কাছে যেন আরও অসহায় হয়ে পড়লেন। প্রীতিকণা বলে ওঠে—কিছু মনে না করে পারবো কেন সাধুকাকা? আমি এত দৌড়োদৌড়ি করে, তিনবার শ্যামবাবুর বাড়ি গিয়ে, ওঁদের চাকর রঘুকে গয়লাবাড়ি পাঠিয়ে দুধ যোগাড় করলাম, আর আপনি বলছেন...।

নীলিমা উঠে এসে পূর্ণানন্দর চোখের সামনে দাঁড়ায়—আপনি না খেয়ে যাবেন না, সাধুদা।

মাধু উঠে এসে পূর্ণানন্দর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ায়—ট্রেনেতে শেষে ক্ষিধের চোটে আপনার ঘুম হবে না, সাধুদা।

পূর্ণানন্দকে সত্যিই যে ভিন জগতের কতগুলি অদ্ভুত ছায়া ঘিরে ধরেছে। দেখতে ছায়া বটে, কিন্তু যেন লোহার মতো শক্ত ওদের কায়া। চলে যাবার আর সরে যাবার মতো একটা ফাঁক খুঁজে পাচ্ছেন না পূর্ণানন্দ। পূর্বজীবনের সব লোভ-টোভ তো কবেই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। তবে কেন, কিসের ভুলে শিবনাথের বাড়ির পায়েস খেতে চেয়ে ফেলেছে, এ কী ভয়ানক এক গোপনচর লোভ!

পূর্ণানন্দ বলেন—তবে আর কি বলবো? কিন্তু দেরি করিয়ে দিও না, বউমা! একটু তাড়াতাড়ি কর।

চলে যায় প্রীতি—খুব তাড়াতাড়ি করছি, সাধুকাকা। আপনি একটুও ভাববেন না।

নীলিমা আর মাধু আবার পড়তে বসে। মোড়াটাকে হাতে নিয়ে বারান্দার একেবারে ওদিকে চলে যান পূর্ণানন্দ। শিবনাথ বলেন—বলেন তো একটা মাদুর এনে পেতে দিই, সাধুকাকা। অন্তত কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিতে পারবেন।

পূর্ণানন্দ—না। আমি যে কথা বলছিলাম, হ্যাঁ, শেষে একটা ধার-কর্জ কি করতেই হবে?

শিবনাথ—নীলির বিয়ের কথা বলছেন?

পূর্ণানন্দ—তবে আর বলছি কি?

শিবনাথ—আজ্ঞে, টাকা ধার করা ছাড়া তো উপায় নেই। ব্যাঙ্ক থেকে ধার পাওয়া যেতে পারে, যদি আমার এই বাড়িটাকে বন্ধক রাখা হয়।

পূর্ণানন্দ—তবে তাই করো। লোকে তো কত বাজে কাজে ভিটে বাড়ি সম্পত্তি বেচে দেয় ; তুমি না হয় নীলির বিয়ের জন্যে বাড়িটাকে বাঁধা রাখলে!

শিবনাথ—আমিও তো তাই ভেবে রেখেছি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন বুদ্ধি দিতে পারেন কি, সাধুকাকা?

—বুদ্ধি দেব আমি? হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ।—আমার বুদ্ধি তো তিরিশ বছর আগে গঙ্গা-জলে ভেসে গিয়েছে, শিবনাথ।

আবার হাসতে গিয়ে পূর্ণানন্দর মাথাটা দুলে ওঠে ; আর গলার স্বর যেন কেঁপে কেঁপে দূরের ঢেউয়ের শব্দের মতো মিলিয়ে যায়।

কে জানে সামান্য একটু পায়েস তৈরি করতে গিয়ে কী কাণ্ড করছে প্রীতিকণা। রান্নাঘর থেকে এত ধোঁয়া বের হয়ে আসছে কেন? তবে কি দুটো উনান জ্বেলেছে প্রীতি? সাধুকাকার রুটি আর ডালসেদ্ধ কি এখনও হয়নি।

ডাকু জেগেছে! ওর কান্নার স্বর শোনা যায়। শিবনাথ বলেন—এই সেরেছে!

পূর্ণানন্দ—কি হলো?

শিবনাথ—একে তো এমনিতেই আপনার খাবার তৈরি করতে এত দেরি করে ফেলেছে প্রীতি, তার ওপর ডাকু জেগেছে। রক্ষে নেই। এখন দু'দিক সামলাতে গিয়ে প্রীতি শেষে একটা কাণ্ডই করবে বলে মনে হচ্ছে।

পূর্ণানন্দ—না না, আর যেন দেরি না হয় শিবনাথ। তুমি বরং ডাকুকে তুলে নিয়ে এসে এখানে বসো।

শিবনাথ—ওকে এখানে নিয়ে এলেও কি ওর কান্না থামবে? আপনার খুব অস্বস্তি হবে, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—হোক। বউমাকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে বলে দাও।

ঘরের ভিতরের বিছানা থেকে ডাকুকে কোলে করে তুলে নিয়ে এসে আবার ঠিক পূর্ণানন্দর সামনে এসে দাঁড়ায় শিবনাথ। ডাকুর কান্না শান্ত করতে চেষ্টা করে।

রান্নাঘরের ধোঁয়া, বাচ্চা ডাকুর কান্না, নীলি আর মাধুর পড়ার গলার স্বর, শিবনাথের গলায় ঘুমপাড়ানি গান, আর প্রীতিকণার ছটফটে ছায়াটার উঁকিঝুঁকি। পূর্ণানন্দ যেন একটা চমৎকার ক্ষণছলনার জগতের মধ্যে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, উনি কে? শ্যামবাবু নাকি? চমকে উঠলেন শিবনাথ। ঠিক, একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আগে আগে হেঁটে চলেছে শ্যামবাবুর অফিসের চাপরাশি, হাতে কাগজপত্রের ফাইল আর খাতা। পিছনে শ্যামবাবু। তবে কি সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে? সাড়ে ন'টার আগে তো কোনদিনই বাড়ি ফিরতে পারেন না শ্যামবাবু।

—আমার সন্দেহ হচ্ছে, সাধুকাকা, বোধহয় বেশ দেরিই হয়ে গেল। বেশ একটু ভয়ে-ভয়ে বলেন শিবনাথ।

পূর্ণানন্দ চমকে ওঠেন—ক'টা বেজেছে?

শিবনাথ—শ্যামবাবুকে বাড়ি ফিরতে দেখে মনে হচ্ছে, সাড়ে ন'টা হয়ে গিয়েছে।

পূর্ণানন্দ তাঁর দুই দুই চোখ টান করে শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর, কথা বলতে গিয়ে তাঁর এতক্ষণের ধৈর্য যেন বেশ রুক্ষ একটা গলার স্বর নিয়ে গরগর করে ওঠে—খুব অন্যায়। বউমা কি আমাকে সোনার বাটিতে করে সিংহীর দুধের পায়েস খাওয়াবে? এত দেরির কোন মানে হয়! ছিঃ!

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে প্রীতি।—সত্যি, দেরি হয়ে গেল। আর একটু দেরি হবে। কিন্তু ইচ্ছে করে দেরি করছি না, সাধুকাকা। আপনি রাগ করবেন না।

পূর্ণানন্দ—অনিচ্ছা করেও কি এত দেরি হতে পারে?

শিবনাথের দিকে তাকিয়ে প্রীতি আক্ষেপের স্বরে একটা অদ্ভুত কথা বলেন—গয়লাবাড়ি থেকে রঘুয়া যে দুধ এনে দিল, সেটা জ্বাল দেওয়া মাত্র কেটে গেল।

শিবনাথ—অ্যাঁ! সে কি?

প্রীতি—কাজেই, ঘরের বাটিতে যেটুকু দুধ ছিল, এখন তাই দিয়ে...।

পূর্ণানন্দর চোখে ভয়ানক দুরন্ত একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।--কি বললে বউমা? ঘরের বাটির দুধ মানে কি? সেটা তো এই বাচ্চাটার জন্য তুলে রাখা দুধ। নয় কি? সত্যি করে বলো।

প্রীতি--হ্যাঁ, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ--তোমাদের সঙ্গে আমার আর একটা কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না, বউমা। মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে একটা মহাপুরুষ ঠাউরেছো। আমি বুঝতে পারিনি যে, বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে তোমরা আমাকে শেষে এরকম একটা অপমান করবে। তোমাদের এখানে আর জলস্পর্শ করতেও আমার ইচ্ছে নেই।... হ্যাঁ, শিবনাথ? ট্রেনের সময় আছে কি নেই, ঠিক করে বলো?

শিবনাথ--এই ট্রেনের সময় আর নেই, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ--তবে কোন্ ট্রেনের সময় আছে?

শিবনাথ--ভোরের ট্রেন। ভোর পাঁচটার ট্রেন।

পূর্ণানন্দ--তা হলে, আমি চলি।

প্রীতিকণা প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠে--সাধুকাকা!

শিবনাথ ডাকেন--সাধুকাকা!

নীলি আর মাধু উঠে এসে ডাক দেয়।--সাধুদা!

পূর্ণানন্দ--কি বলতে চাও, তোমরা!

প্রীতি--আপনি খেয়ে-দেয়ে, আর এই রাতটার মতো এখানে কোনমতে...

শিবনাথ--একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দিন, সাধুকাকা। তারপর...।

পূর্ণানন্দ--আমার খাওয়া-দাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। তোমার ওই পায়েস আমি মুখে দেব না, বউমা।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি। কেঁদে ফেলবে নাকি প্রীতি? তা না হলে ওরকম ছটফট করে কাঁপছে কেন প্রীতির চোখের তারা দুটো?

পূর্ণানন্দের গলার স্বরের রুক্ষ কঠোরতা হঠাৎ যেন চুপসে যায়--পায়েস কি তৈরি হয়েছে, বউমা?

--হয়েছে। আপনার রুটি আর ডালসেদ্ধও হয়ে গিয়েছে।

--তবে নিয়ে এস। হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ।

এই বারান্দাতেই মাদুরের উপরে যেন মন-প্রাণ-শরীরের সব জোর নিয়ে আর শক্ত হয়ে বসেন পূর্ণানন্দ। রুটির টুকরো দিয়ে মুড়ে মুড়ে ডাল সেদ্ধ খেতে থাকেন।

পূর্ণানন্দ যা বলে দিলেন, তাই করে প্রীতি। পূর্ণানন্দর সামনের থালাতে দু'চামচ পায়েস তুলে দেয় প্রীতি। আর পূর্ণানন্দর পাশেই মাদুরের উপর ডাকুকে বসিয়ে রেখে, ডাকুর মুখে একটু-একটু করে পায়েস তুলে দেয়।

পূর্ণানন্দ বলেন--কই নীলি, কই মাধু, তোরাও আয়। ওদেরও একটু একটু দাও, বউমা।

জল খেয়ে, হাত ধুয়ে তারপর একটা হাঁফ ছেড়ে উঠে পড়লেন পূর্ণানন্দ--ব্যস্, আর কিন্তু আমি একটিও কথা বলবো না। তোমরা আমাকে আর একটিও কথা বলবে না। না, আর...।

কি-যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন পূর্ণানন্দ। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেই ফেললেন। --আর কেউ যেন আমার কাছে আসে না।

লণ্ঠনটা নিজেই হাতে তুলে নিলেন পূর্ণানন্দ। আস্তে আস্তে হেঁটে একটু দূরের সেই ঘরের দিকে চলে গেলেন, যে-ঘরের নিভৃতে একলা হয়ে থেকে মধুপুরের এই রাত্রির মুহূর্তগুলিকে শুধু জেগে জেগে ক্ষয় করে দিতে হবে। আর ঘুমোতে চান না পূর্ণানন্দ। ভোরের ট্রেন ফেল করলে যে মাথার উপরের ওই আকাশে একটা ঠাট্টার অট্টহাসির ঝড় ছুটে চলে যাবে।

ঘুমোতে পারেন না পূর্ণানন্দ। ঘুমোবার জন্য পূর্ণানন্দের চোখে কোন চেষ্টাও নেই। ঘরের বাইরে লণ্ঠনটাকে রেখে দিয়ে, ঘরের ভিতরের মেজেতে কম্বলের উপর চুপ করে বসে থাকেন পূর্ণানন্দ। যেন শেষ ধ্যান সেরে নিচ্ছেন পূর্ণানন্দ।

তখনো ভোর হয়নি। মধুপুরের আকাশের কোন তারা নিবেও যায়নি। উঠে পড়লেন পূর্ণানন্দ। কম্বল গুটিয়ে নিলেন। ঝোলাটাকে হাতে তুলে নিলেন। শব্দহীন অন্তর্ধানের একটা ব্যস্ত ছায়ার মতো এগিয়ে চললেন। কিন্তু শিবনাথের বাড়ির বারান্দার সিঁড়ির পাশে সেই লতানে গোলাপের কাছে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। কি আশ্চর্য, এই শেষরাতেও সিঁড়ির উপর হলদে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে।

পূর্ণানন্দর শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। শুধু চোখ দুটো নয়, মনটাও যেন ছটফট করছে। এভাবে একলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে যেন দুঃসহ একটা অস্বস্তি বোধ করছেন পূর্ণানন্দ।

পূর্ণানন্দ ডাকেন।--শিবনাথ, আমি চললাম।

শিবনাথ নিশ্চয় জেগেই ছিলেন। তা না হলে পূর্ণাননন্দর এক ডাকে সাড়া দিয়ে চলে আসবেন কেন শিবনাথ--তা হলে, সত্যিই চললেন সাধুকাকা!

পূর্ণানন্দ--হ্যাঁ শিবু, সত্যিই যাচ্ছি।

শিবনাথ--হ্যাঁ, আমিও নিশ্চয় আপনার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাব ; আপনার আপত্তি নেই তো সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ--না। সেইজন্যেই তো তোমাকে ডাকলাম।

শিবনাথ--চলুন তবে।

পূর্ণানন্দ তবু দাঁড়িয়ে থাকেন।--হ্যাঁ, চল। কিন্তু ওরা সব কোথায়? ওদের একবার ডাক। তা না হলে যাই কি করে?

শিবনাথের ডাক শুনেই চলে আসে প্রীতি। প্রীতির কোলে ডাকু, সেটাও জেগেই আছে।

চলে আসে নীলি আর মাধু। নীলি ওর দুই কালোচোখ বড় করে পূর্ণানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ; আর মাধু ভাল করে তাকাবার জন্যে হাত তুলে ওর ঘুমকাতর দুই চোখ ঘষতে থাকে।

পূর্ণানন্দ বলেন--ডাকুর কিন্তু খুব ঠাণ্ডা লেগেছে, বউমা। অনেকবার ওকে হাঁচতে দেখেছি। তুমি বুঝতে পেরেছো কিনা জানি না। সরষের তেল গরম করে ওর দুই পায়ের তলায় খুব ভাল করে ঘষে দিও।

প্রীতি বলে--দেবো।

নীলিমার মুখের দিকে তাকান পূর্ণানন্দ--নীলি ইংরেজিতে একটু কাঁচা আছে, শিবনাথ। তুমি নিজে ওকে একটু দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিও।

শিবনাথ--তা দেবো।

পূর্ণানন্দ হাসেন--মাধুর উত্তমাশা অন্তরীপও কেমন গোলমেলে মনে হলো। মুখস্ত করে কিন্তু মনে থাকে না বোধহয়। তুমি একটু মন দিয়ে ভূগোল পড়বে, মাধু। কেমন?

মাধু--হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ--হ্যাঁ, চল শিবনাথ।

রওনা হলেন পূর্ণানন্দ। রাস্তার উপরে এসেই দুই চোখ তুলে একবার আকাশের চেহারাটা দেখে নিলেন। শিবনাথ বলেন--এই তো...যাকে বলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত, তাই না সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ--হুঁ।

শিবনাথ--এ সময়ে আমাদের মধুপুরের আকাশটাও বেশ চমৎকার শান্ত পবিত্র...।

পূর্ণানন্দ হাসেন--থাম শিবনাথ। এরকম পবিত্র শান্ত আকাশ আমি অনেক দেখেছি। চোখ

বন্ধ করেও দেখেছি। কিন্তু...।

শিবনাথ—আজ্ঞে।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু নীলির বিয়েতে যেন কোন গণ্ডগোল না হয়, শিবু। বিশেষ করে বরযাত্রীদের খাওয়ার কোন ত্রুটি যেন না হয়। সরু চামরমণি চালের পোলাও, দু'রকমের ডাল, একরকমের ভাজা হলেই চলবে ; কিন্তু মিষ্টি হরেকরকমের হলেই খুব চমৎকার হবে।

কথা থামিয়ে রেখে আস্তে একটা হাঁপ ছাড়েন পূর্ণানন্দ। তারপর হাতের ঝোলাটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে কথা বলেন—তোমার বাড়ির পুবদিকে ওই যে ঘেসো জমিটা, ওখানেই ছোট একটা সামিয়ানা টানিয়ে লোকজনের বসবার জায়গা করে দিও।...কিন্তু...কিন্তু ভোর যে হয়ে এল, শিবু। একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চল।

ব্রততী

সকলেই জানেন, মিসেস সেনের মতো একজন বড় দিদিমণি ছিলেন বলেই এই মেয়ে-স্কুলের এত উন্নতি হয়েছে। আট বছরের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা আটগুণ বেড়ে গিয়েছে। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট শৈলেশবাবু এখন ভাবছেন, আর একটু চেষ্টা করলে, আর চারটে নতুন ঘর তুলে ফেলতে পারলে, আরও ভাল হয়। তখন সরকারের গ্র্যান্ট আরও বেশি করে পাওয়া যাবে। হাই স্কুল হবার মতো আরও দুটো ক্লাশ বাড়িয়ে ফেলতে পারা যাবে।

বড় দিদিমণি মীরা সেন এখন কিন্তু এই মেয়ে-স্কুলের কেউ নন। একটানা আট বছর ধরে কাজ করবার পর আজ তিনি সরে গিয়েছেন।

না, ঠিক অবসর গ্রহণের ব্যাপার নয়। মীরা দিদিমণি রিটায়ার করেননি। তিনি শুধু কাজ ছেড়ে দিয়ে সরে গিয়েছেন। কিন্তু সকলেই জানেন, মীরা সেন এখনও এই মেয়ে-স্কুলের সব খবর রাখেন। উন্নতির খবর শুনলে খুশি হন। কোন অসুবিধার, কিংবা কোন নিন্দার কথা শুনলে দুঃখিত হন।

এই তো সেদিন, শুনতে পেয়েছিলেন মীরা সেন, ইনস্পেকট্রেস এসে ইংরেজীর টিচার লতিকাকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। ছাত্রীরা ইংরেজীতে খুবই কাঁচা, কোন ছাত্রীই ছত্রিশের বেশি নম্বর তুলতে পারেনি। খবর শুনে, বেশি দুঃখিত হয়ে, লতিকাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন মীরা সেন। কিন্তু যায়নি লতিকা।

না যাবার কারণ এই নয় যে, মীরা সেনের সম্পর্কে লতিকার মনে কোন তুচ্ছতার ভাব আছে। শুধু লতিকা নয়, টিচারদের সকলেই স্বীকার করে মীরাদির মতো খেটে পড়াবার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু স্কুলের জন্য এত খাটতে গিয়েই তো মীরাদি তাঁর নিজের জীবনের এমন ভয়ানক একটা ক্ষতি ডেকে নিয়ে এসেছেন।

মীরা সেন এখন এই মেয়ে-স্কুল থেকে প্রায় এক মাইল দূরের এক হাসপাতালের যক্ষ্মা-ওয়ার্ডে থাকেন। স্কুলের সেই বাগান আজও আছে, সে বাগানের সব ফুল গাছে মীরাদি নিজের হাতে জল ঢালতেন। মীরাদির আদরের রঙ্গন আজও স্কুলের বাগান ভরে ফুটে থাকে ; বাগানের রোদও যেন লালচে হয়ে হাসতে থাকে।

যক্ষ্মা-ওয়ার্ডে মীরাদির ঘরের সামনে এক টুকরো ঘেসো জমি। ঘাসের ছোট ছোট সাদাটে আর নীলচে ফুলের উপর মৌমাছি বেড়ায়। তার পরেই মেহেদির বেড়া। হাসপাতালের মালী মেদেহির এই বেড়াকে ছেঁটে-কেটে বেশ পরিচ্ছন্ন করে রাখে। বেড়ার উপর বসে দুপুরের বুলবুল বেশ চমৎকার শিষ দেয়।

কতই বা বয়স মীরাদির? সেক্রেটারি শৈলেশবাবুর স্ত্রী মনোরমা আর মীরা যেন, দু'জনেই ভাগলপুরের মেয়ে ; দুজনেই এক স্কুলের এক ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন। মনোরমার বয়স এখন যদি পঁয়ত্রিশ হয়, তবে মীরা সেনের তেত্রিশের বেশি হতে পারে না।

শৈলেশবাবু মাঝে মাঝে বেশ একটু অনুযোগের সুরে কথাটা বলেন বলেই মনোরমা, সেই সঙ্গে আরও কেউ-কেউ, মীরা সেনকে একবার দেখে আসবার জন্যে হাসপাতালে যক্ষ্মা-ওয়ার্ডে যান। কিছু ফল, কিছু ফুল, দুতিনটে গল্পের বইও তাঁরা নিয়ে যান।

শৈলেশবাবু বলেন—কী আশ্চর্য, মহিলা একেবারে একা-একা অসহায়ের মতো যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের একটা ঘরে পড়ে রয়েছেন। তোমাদের কি মাঝে মাঝে মহিলাকে একটু দেখে আসা উচিত নয়? আমাদের মেয়ে-স্কুলের জন্যেও যিনি এত খাটলেন, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের কর্তব্য আছে তো?

শৈলেশবাববু স্ত্রী মনোরমা, তাঁর সঙ্গে বেনুর কাকিমা সুনন্দা, দুজনেই গিয়েছেন। দুজনেই দেখে খুশি হয়েছেন, আর বেশ একটুও আশ্চর্য হয়েছেন। মীরা সেন বেশ হেসে হেসে কথা বলছেন—না ভাই মনো, আমার কখনও মনে হয় না যে, আমি একা।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করেন—মিস্টার সেনের চিঠি পেয়েছেন?

মীরা—না।

মনোরমা—তবে?

মীরা সেনের সাদাটে শীর্ণ ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটা পরাভবহীন গর্বের হাসি ঝির ঝির করে কাঁপতে থাকে।—তাতে কী এসে যায়? সে তো আছেই। কাছে না হোক কোথাও তো আছে। তাহলেই হলো।

মনোরমা জানেন না, সুনন্দাও জানেন না, মীরার স্বামী এখন কোথায় আছেন! কিন্তু মীরাও কি জানে? না, মীরাও জানে না। দু'বছর আগে মীরার স্বামী একবার এসেছিলেন, এসে এই শহরের একটা হোস্টেলে উঠেছিলেন! রোজই একবার স্কুল-বাড়িতে গিয়ে মীরার সঙ্গে দেখা করতেন। মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন, বাগানের রঙ্গনের একটা কুঞ্জের কাছে দাঁড়িয়ে মীরা ওর স্বামী সুধাকর সেনের সঙ্গে গল্প করছে।

কিন্তু এ কেমন সম্পর্ক? এক বছর পরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু স্বামী ভদ্রলোক যে স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

মনোরমার কাছে কথাটা গোপন রাখেনি মীরা সেন।—তোমার কাছে লুকোতে চাই না মনো। ডাক্তার সন্দেহ করেছে, আমার বুকে যক্ষ্মার দোষ লেগেছে। তাই আমি ইচ্ছে করেই ওর কাছ থেকে সরে এসে এই স্কুলের কাজ নিয়েছি।

—কেন?

—ওর ক্ষতি হোক, এটা আমি চাই না। ওর কাছে থাকলে, আমার এই ভয়ানক রোগের ছোঁয়াচ ওকে স্পর্শ করে ফেলতে পারে। পারে না কি? তুমিই বলো, স্ত্রী হয়ে স্বামীর এমন ক্ষতি কি কেউ করতে পারে?

—মিস্টার সেন কি বলেন?

—উনি তো প্রথমে খুবই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমি আমার জেদ ছাড়িনি।

—কিন্তু এরপর...।

মনোরমা তাঁর মনের কথাটা ঠিক স্পষ্ট করে বলতে না পেরে আমতা-আমতা করেন। মীরা সেন তখুনি হেসে ফেলেন। —বুঝেছি কি বলতে চাইছো!

—কি?

—তুমি বলতে চাও, মিস্টার সেন কি চিরকাল এভাবে একা হয়ে পড়ে থাকবেন?

সুনন্দা বলেন—সেটা কি একটা কথা নয়?

মীরা সেন--খুব ঠিক কথা। কিন্তু আমি তাকে বলেছি, তুমি বিয়ে করো, একা থেকো না।

মনোরমা—মিস্টার সেন কি বললেন?

মীরা—বললেন, না, কখ্‌খনো না।

কিন্তু এহেন প্রতিজ্ঞার মিস্টার সেন এই চার বছরের মধ্যে একবারও আর মীরাকে দেখতে আসেননি। মীরাও বলতে পারে না, কেন আসেননি। মীরা জানেও না, মিস্টার সেন এখন কোথায় আছেন।

এস. ডি. ও. মহীতোষবাবু খুব সুপারিশ করেছিলেন, আর শৈলেশবাবুও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, তাই হাসপাতালের যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের একটি কেবিন ফ্রী পেয়ে গিয়েছেন মীরা সেন। তা ছাড়া স্কুল কমিটি মাসিক পনেরো টাকা সাহায্য দিয়ে থাকেন। মীরা সেনের জীবন আর রোগজীর্ণ রক্তহীন শরীরটা তাই একটা আশ্রয় পেয়ে গিয়েছে। মীরা সেন বলেন, ভাল আছি। ডাক্তার এসে যখন মীরা সেনের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে আতঙ্কিতের মতো তাকান, তখনও মীরা সেন বলেন, আমি ভাল আছি।

ডাক্তার—কিন্তু আপনার এই অবস্থায় এখানে এভাবে একা-একা পড়ে থাকা...

মীরা সেন হাসতে চেষ্টা করেন।—আমি তো নিজেকে একা মনে করি না, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার—না, আমি বলছিলাম, আপনার স্বামী যদি এখন একবার এসে...।

মীরা সেন—না এলেই বা কি? তবু আমি মনে করবো না, আমি একা হয়ে গিয়েছি।

২

যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের সামনে এক টুকরো ঘেসো জমির উপর ফড়িং উড়ে বেড়ায়। মেহেদি গাছের বেড়ার ওদিকেও বেশ বড় একটা ঘেসো জমি। সেখানে দু'সারি ঘরও আছে ; পুরুষদের যক্ষ্মা-ওয়ার্ড।

গির্জাটাও বেশি দূরে নয়। মীরা সেনের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলাতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, গির্জার ঘরের ভিতরে পুলপিটের উপর বড় বড় মোমবাতি জ্বলছে।

কিন্তু গির্জার গা ঘেঁষে ওই যে ছোট বড় যত সমাধির আঙিনা, সেটা না থাকলেই ভাল ছিল। শুধু সন্ধ্যাবেলাতেই নয়, দুপুরেও ওই নীরব সমাধিভূমির সারি সারি যত গম্ভীর ক্রশগুলি চোখে পড়লে চোখের দৃষ্টিটা যেন ছমছম করতে থাকে। সমাধির আঙিনাটা যেন গম্ভীর হয়ে এই যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনেকদিন পর আজ আবার এসেছেন মনোরমা আর সুনন্দা। শৈলেশবাবুকে খবর দিয়েছিলেন ডাক্তার, মীরা সেনের অবস্থা ভাল নয়। লক্ষণ খুব খারাপ।

মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই জানেন, এরই মধ্যে একটা ঘটনার খবর পেয়ে গিয়েছে মীরা। মীরা যা চেয়েছিল, তাই হয়েছে। কাজেই মীরার পক্ষে অভিযোগ করবার কিছু নেই।

মীরার স্বামী সুধাকর সেন বিয়ে করেছেন! ভাগলপুরের প্রতাপবাবুর চিঠিতে জানতে পারা গিয়েছে, তিনি মীরাকেও এখবর জানিয়ে দিয়েছেন।

সুধাকর সেন এখন রেলওয়ে চাকরি করছেন। নতুন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দানাপুরে থাকেন।

একটা কথা না লিখলে ভালই করতেন প্রতাপবাবু। স্টেশন মাস্টার মল্লিকবাবুর মেয়ে নমিতার সঙ্গে সুধাকরের চেনা-শোনা হয়েছিল। একবছর ধরে মেলামেশার পর বিয়ে হয়েছে। ভালই হয়েছে। কিন্তু এসব কথা মীরাকে না জানালেই ভাল করতেন প্রতাপবাবু।

আজ তাই সন্দেহ করছেন মনোরমা আর সুনন্দা, এসব খবর জানতে পেরেছে বলেই হয়তো মীরার অসুখ হঠাৎ এত খারাপের দিকে এগিয়েছে। যতই মনের জোর থাকুক, আর যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করুক, এ খবর শুনে দুঃখিত না হয়ে পারবে কেন মীরা? আজ কি ঠিক আগের মতো হেসে-হেসে বলতে পারবে মীরা, আমি একা নই?

স্বামী দূরে ছিল, তবু তো ছিল। মীরারই স্বামী সুধাকর, আর কারও স্বামী নয়। কিন্তু আজ যে সত্যিই একা হয়ে গিয়েছে মীরা। চার বছর ধরে স্ত্রীকে দেখতে যে স্বামী এল না, সে আজ অন্য নারীর স্বামী হবার পর মীরাকে মনে রেখেছে কিনা সন্দেহ।

কি আশ্চর্য, মনোরমা আর সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন মীরা সেন। মীরার চোখের কোটরের হাড় ঠেলে উঠেছে, কিন্তু চোখে কাজল দিতে ভুলে যায়নি মীরা। সত্যিই, মীরার চোখ দুটো দেখতে খুব সুন্দর। দুই হাতে দু'গাছা করে নীল কাঁচের মোটা চুড়ি। হাতের আঙ্গুলগুলি শুকিয়ে গিয়েছে, তবু কত নরম বলে মনে হয়। ভাঙা গাল, চিবুকটা চুপসে গিয়েছে। তবু মীরার মুখটা কত সুন্দর দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, বুঝতে পারা যায়, মুখটাকে যেন সাবান-জল দিয়ে ঘষা-মাজা করেছে মীরা। খোঁপার মধ্যে একটা সাদা ফুলও গোঁজা রয়েছে। গলার নালীটা ধুকধুক করে কাঁপছে ; কিন্তু চোখে পড়েছে মনোরমার, মীরার গলায় পাউডারের গুঁড়ো লেগে রয়েছে।

মীরা সেন বলেন—বুঝেছি, তোমরা খবরটা শুনেছ।

মনোরমা—হ্যাঁ।

মীরা—ভালই হলো।

সুনন্দা বলেন—আপনি কি তাই মনে করেন?

মীরা—নিশ্চয়। আমার মতো একটা মিথ্যে মানুষের জন্যে মায়া করে সে যদি চিরকাল একা-একা পড়ে থাকতো, তবে সেটা কি ভাল হতো?

মনোরমা—তুমি তাহলে...।

মীরা—আমি খুশি হয়েছি। আমি নিজেকে একটুও একা মনে করি না। যেখানেই থাকুক আর যার সঙ্গেই থাকুক, সে মানুষটা ভাল থাকলেই হলো।

ঘেসো জমির ওপারে মেহেদির বেড়ার কাছে পায়রার দল হুটোপুটি করছে। চমকে ওঠে মীরা সেনের চোখ। গলা টান করে তাকিয়ে থাকেন মীরা সেন।

মেহেদির বেড়ার ওদিকে দাঁড়িয়ে কে-যেন একজন তাঁর ঠোঙ্গা থেকে ছোলা তুলে তুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আর লোভী পায়রার দল হুটোপুটি করে খুঁটে খুঁটে ছোলা খাচ্ছে।

জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, গলায় কম্ফোর্টার জড়ানো, পরনে ফ্লানেলের পায়জামা, চোখে চশমা এক ভদ্রলোক মেহেদির বেড়ার ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।

কোন সন্দেহ নেই, ভদ্রলোক পুরুষ যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের একটি মানুষ।

মীরা সেনই বলে ওঠেন—ওই ভদ্রলোকের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ।

মনোরমা—কি বললে?

মীরা সেন—জমাদারনীর কাছে শুনেছি ওই ভদ্রলোক সপ্তাহে অন্তত তিন দিন রক্ত বমি করেন।

সুনন্দা—কে ভদ্রলোক? বাড়ি কোথায়?

মীরা সেন—তা জানি না। তবে রোজই দেখতে পাই, কখনও সকালবেলা, কখনও বা সন্ধ্যাবেলা ওই বেড়ার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর পায়রাকে ছোলা খাওয়াচ্ছেন।

মনোরমা আর সুনন্দা, দুজনেরই চোখের দৃষ্টি করুণ হয়ে ওঠে। সত্যিই তো, ভদ্রলোক যেন এই পৃথিবীর সব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শেষবারের মতো একটা মায়ার খেলা খেলে নিচ্ছেন।

মীরা সেন বলেন—ভদ্রলোক ছবি আঁকতে জানেন। এক-একদিন ওই মাঠের ওপর চেয়ারে বসে আর ছবি আঁকার সরঞ্জাম হাতের কাছে নিয়ে...

মনোরমা—গির্জার ছবি আঁকেন?

মীরা হাসেন—না।

সুনন্দা—হাসপাতালের ছবি?

মীরা—না।

মনোরমা—গাছপালার? পায়রার? আকাশের ছবি?

মীরা—না।

সুনন্দা—তবে?

মীরা—কে জানে কিসের ছবি আঁকেন, বুঝতে পারি না। আমি শুধু চুপ করে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি।

মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই এইবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলেন—আজ তাহলে চলি!

মীরা—হ্যাঁ এস, কিন্তু একটা মজার কথা কি জানো?

মনোরমা—কি?

মীরা—আমার মনে হয়, ওই ভদ্রলোক শেষ হবার আগে আমিই শেষ হয়ে যাব।

মীরা সেনের চোখের তারা ঝিকঝিক করছে। মনোরমা বলেন—চলি।

৩

পয়লা বৈশাখ। বৎসরের প্রথম দিন। শৈলেশবাবু বলেছেন, যাও মনো, মহিলাকে আজকের দিনে কিছু ফুল দিয়ে আর দুটো ভাল কথা বলে এস। যত হোক, আমাদের স্কুলটার জন্যেই তো উনি এত খেটেছিলেন।

তাই এসেছেন মনোরমা। এসেছেন সুনন্দা। মনোরমার হাতে ফুল। সুনন্দার হাতে সন্দেশের প্যাকেট আর ফলের ঠোঙা।

বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। মেহেদির বেড়ার ছায়ার উপরে পায়রার দল নিঝুম হয়ে বসে আছে। পায়রাদের এত মায়া করে ছোলা খাওয়ানোর পুরুষ যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের যে ভদ্রলোক, তিনি এখনও আসেননি।

মীরা সেনের ঘরের দরজা ভেজানো। দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে উঁকি দিলেন মনোরমা। ডাকও দিলেন—মীরা।

কিন্তু সাড়া দিলেন না মীরা সেন। বিছানার মাঝখানে একটা বালিশকে রেখে, সেই বালিশটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে বিছানার উপর নিথর হয়ে পড়ে আছেন মীরা সেন।

কি আশ্চর্য, মীরার হাতের সেই নীল কাঁচের চারটে চুড়ির মধ্যে তিনটেই ভেঙে গিয়েছে। ভাঙা চুড়ির টুকরোগুলি বিছানার উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। খোঁপা ভেঙে রুক্ষ চুলের ভার এলিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, রোদের কষ্টে অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করেছে মীরা। তাই এখন অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

—মীরা!

ডাক শুনে বিছানার উপর উঠে বসেন মীরা সেন।

দেখেই বুঝতে পারা যায়, মীরা সেন তাঁর ভেজা চোখ দুটোকে বিছানাতে বেশ ভাল করে ঘষে ঘষে শুকনো করে দিয়েছে।

—কি হলো মীরা? শরীর খারাপ? খুব কষ্ট হচ্ছে?

মনোরমার প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়েন মীরা সেন।—না। ভালই আছি।

সুনন্দা বলেন—এবার আপনার খবর বলুন।

মীরা—একটা খবর আছে।

মনোরমা—কি?

মীরা—সেই ভদ্রলোক আর নেই।

চমকে ওঠেন মনোরমা আর সুনন্দা।—অ্যাঁ, কে? পায়রাগুলোকে ছোলা খাওয়াতেন যে ভদ্রলোক?

মীরা—হ্যাঁ। ওই শুনুন, গির্জার ঘণ্টা বাজছে।

মনোরমা—হ্যাঁ, শুনছি। কিন্তু—।

মীরা—বুঝলে না? ওই ভদ্রলোক খ্রীস্টান মানুষ। এই তো, মাত্র এক ঘণ্টা হলো, এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, পুরুষ-ওয়ার্ডের গেট দিয়ে কফিনের গাড়িটা চলে গেল।

সুনন্দা—কোথায় গেল?

মীরা—প্রথমে গির্জাতে, তারপরে ওই সমাধির আঙিনাতে।

মনোরমা জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।—এই তো মানুষের জীবন! আচ্ছা, আজ আমরা এখন চলি, মীরা! কেমন?

মীরা সেন—এস।

দরজার দিকে এগিয়ে যান মনোরমা আর সুনন্দা, কিন্তু চমকে ওঠেন, থমকে দাঁড়ান, পিছন ফিরে তাকান, মীরা সেনের ধুকপুকে বুকের একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস যেন ডুকরে উঠেছে।

—কি হলো মীরা? ওরকম করছো কেন? মীরা সেনের কাছে এসে প্রশ্ন করেন মনোরমা।

মীরা সেন বলেন—সত্যি মনো, বড্ড একা-একা বোধ করছি। একটুও ভাল লাগছে না।

মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই মীরা সেনের সেই শীর্ণ সাদাটে করুণ মুখটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপরই বলেন—আমরা এবার যাই।

রূপনগর

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেলেন 'ফুলের রাণী'।

আর যাঁরা প্রতিযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় আর চতুর্থ পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে, উৎসবের সাজে সাঁওতাল মেয়ে, কাঁখে গাগরি রাজস্থানী বধূ, আর ঐতিহাসিক মোগল হারেমের এক সুন্দরী।

চমৎকার সাজ, একেবারে নিখুঁত সাজ। ছদ্মবেশের এইসব রূপের কাছে একেবারে খাঁটি ও অকৃত্রিম রূপও হার মেনেছে। রঙিন রেশমী কাপড়, জরির ঝালর, ফুলের স্তবক আর তীব্র বিজলী বাতির মালা দিয়ে সাজানো ওই মঞ্চের উপর যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা হলো ফ্যান্সি ড্রেসের আসর। ছদ্মসাজে বিচিত্ররূপিণী হয়ে যাঁরা এখন ওই আসরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা কোন বিচিত্র সংসারের মানবিকা নন। তাঁরা রায়গড় নামে এই ছোট জনপদের যত অফিসারের গৃহিণী আর দুহিতা। কিন্তু কার সাধ্যি আছে, দশ মিনিট ধরে তাকিয়ে থেকেও বলে দিতে পারে, কে মিসেস কাপুর, কে শ্রীমতী মনিকা দাশগুপ্ত, কে মিস নিয়োগী, আর, কে-ই বা গীতা, চন্দ্রা ও জাহানারা?

যাঁরা এই প্রতিযোগিতা বিচার করে নম্বর দিলেন, তাঁরাও কি কাউকে চিনতে পেরেছেন? না, মিস্টার কাপুরও চিনতে পারেননি যে, তাঁরই গৃহিণী, যাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তিনিই এখন ওই মঞ্চে ঐতিহাসিক মোগল হারেমের এক তরুণী সুন্দরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বুড়ো মানুষ খোসলা সাহেবও চিনতে পারলেন না যে, তাঁরই নাতনী গীতা, যার বয়স ষোল বছর পার হয়নি, সে এখন এই বিচিত্র সাজের আসরে থুড়থুড়ি এক সন্ন্যাসিনী বুড়ি

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর মালা জপছে। খোসলাসাহেব চোখ টান করে বলে উঠলেন, বুঝেছি, নিশ্চয় চন্দ্রাকি দাদী এই সন্ন্যাসিনী সেজেছেন।

তিন বছর আগে এই রায়গড়ের এখানে মানুষের কোন বসতি ছিল না। ছিল শুধু জওয়ার ভুট্টা আর অড়হরের ক্ষেত। আর, খেজুরের জঙ্গল। কৃষির যন্ত্রপাতি তৈয়ারির একটি কারখানা, আর ট্র্যাক্টর ট্রেনিং-এর একটি কেন্দ্র স্থাপন করে সরকার এখানে দেড় কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছেন বলেই পুরনো গেঁয়ো রায়গড় এখন একটি আধুনিক জনপদে পরিণত হয়েছে। চীফ এঞ্জিনিয়ার খোসলা সাহেব ডাক বিভাগের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছেন, পোস্ট অফিসের নাম রায়গড় না রেখে রূপনগর করা হোক। অফিসারদের সকলেরই ইচ্ছে, এই ছোট্ট কারখানা শহরটির নাম রূপনগর হোক। আগ্রা রোড ধরে সেকেলে ইতিহাসের সুন্দর বিলাসপুর সেই মাণ্ডু যাবার পথে এই নতুন কারখানা শহরটিকে দেখতে পাওয়া যায়। রুক্ষ বিন্ধ্যগিরির মাথার উপরে যখন কালো মেঘ আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে ওঠে, সন্ধ্যার আঁধার নিবিড় হয়, আর বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়তে থাকে, তখন এই শহরের শত শত বিজলী বাতির আলোও যেন ধারাস্নানের আনন্দে গলে গিয়ে হাসতে থাকে। তখন সত্যিই যে শহরটিকে একটি অবাস্তব জগতের রূপনগর বলে মনে হয়।

তবু নিতান্ত বাস্তব ধুলো মাটি আর পাহাড়ের শহর। কারখানার ফার্নেস ধক-ধক করে তাপের জ্বালায় জ্বলে, লোহা গলে। যন্ত্রের অস্ত্রে লোহার চাপ কেটে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, কঠিন লোহার আর্তনাদও বড় অদ্ভুত হয়ে বাজে। তার উপরে আছে, ওদিকের ট্রাক্টরের কঠোর স্বরের হর্ষনাদ।

এরই মধ্যে দেখা যায়, অফিসারদের বাংলোর ফটকে রঙিন বুগেনভিলিয়া দুলছে, আর একটু দূরে খেজুরবনের নিরালাতে ট্রানজিস্টর রেডিওতে গজলগান উৎসারিত হয়ে ঝর্ণার জলের শব্দের সঙ্গে ছুটোছুটি করছে। বোধহয় গীতা আর ওর দুই ভাই এই রেডিও বাজিয়ে ওখানে ছুটোছুটি করছে।

অফিসারদের কাজের জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে অবসর থাকে, সে অবসর বেশ ভাল করে সার্থক করে নেবার একটা ব্যবস্থা তাঁরা নিজেরাই করে নিয়েছেন। মাণ্ডু বেড়াতে যাওয়া, খেজুরবনে পিকনিক আর বছরে তিনবার এই ফ্যান্সি ড্রেসের আসর।

পুরনো মাণ্ডু আজ একেবারে নীরব হয়ে তার যত মহল চবুতরা আর টলমলে জলের বউলি নিয়ে নিরালার সমাধির মতো পড়ে আছে, তবু দেখতে কত সুন্দর। পাথরের হিন্দোলা মহল সত্যই যেন দুলছে বলে মনে হয়। চম্পা বউলির জল মাথায় ছিটিয়ে গীতা কলকল করে হেসে ওঠে, সত্যিই যে এই জলে চাঁপা ফুলের গন্ধ!

সত্যিই কি মাণ্ডুর সেই সুন্দরী নারী, বাজবাহাদুরের প্রেমের নায়িকা সেই রাজপুতানী রূপমতীর খোঁপার চাঁপার গন্ধ এই জলে আজও মিশে আছে? এই বউলির জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন রূপমতী। আর, ওই তো রূপমতীর চবুতরা। এখানে দাঁড়িয়ে আজও দেখা যায়, রূপমতী যেমন দেখতেন, নীচের সবুজ সমতলের বুকের উপর দিয়ে নর্মদার প্রবাহ রূপোর অজগরের মতো এঁকেবেঁকে গড়িয়ে গিয়েছে।

রূপমতীর গল্পটি বড় চমৎকার, বেশ মিষ্টি করুণ গল্প। রূপমতী নামটিও বেশ। অফিসারেরা তাই বোধহয়, গেঁয়ো রায়গড়ের এই কারখানা শহরটিকেও রূপনগর নাম দিয়ে একটু শখের ঐতিহাসিকতা করতে চাইছেন। কে জানে জলে ডুবে মরণ-বরণ-করা রাজপুতানী সুন্দরী সেই রূপমতী আর রাতের বৃষ্টির জলে ভেজা এই রায়গড়ের মধ্যে রূপের কী মিল থাকতে পারে!

ফ্যান্সি ড্রেসের প্রতিযোগিতা এই নতুন রায়গড়ের জীবনে, তার মানে রূপনগরের জীবনে একটি বিপুল খুশির উৎসব! এই উৎসবের হর্ষ সবচেয়ে বেশি মত্ত হয়ে ওঠে তখন, যখন

মিসেস খোসলা একে একে নামগুলি ঘোষণা করতে থাকেন। অর্থাৎ, ছদ্মবেশিনীদের পরিচয় প্রকাশ করে দেন।

প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে, সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে ফুলের রাণী! মিসেস খোসলা আসরের এক পাশে দাঁড়িয়ে নাম ঘোষণা করে দিলেন—চন্দ্রা নিয়োগী, ফুলের রাণী, ফার্স্ট!

হাততালি বাজে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হই-হই করে লাফিয়ে ওঠে। কাপুর সাহের ঘাড় দুলিয়ে হাসতে থাকেন। ডাক্তার দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে ওঠেন—ওয়াণ্ডারফুল!

দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থের নামও ঘোষণা করা হয়ে যায়। সবই যেন এক-একটি বিস্ময়ের ঘোষণা। সভার মানুষ সকলেই খুশি হয়ে বলতে থাকেন—চমৎকার, চমৎকার!

কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, সবচেয়ে চমৎকার হলো ওই ফুলের রাণী। এবং সত্যিই একটি অভাবিত বিস্ময়। এই রূপনগরের অফিসারদের ঘরে ঘরে এত সুন্দরী মেয়ে থাকতে চন্দ্রা নিয়োগী ফুলের রাণী সাজতে সাহস করেছে! আর, সেই সাহসের জয়ও হয়েছে। এই ফুলের রাণীর রূপের কাছে মোগল হারেমের সুন্দরীর রূপও সেকেণ্ড হয়ে গিয়েছে।

অথচ চন্দ্রা নিয়োগী দেখতে একটুও সুন্দর নয়। স্টোরবাবু বলাই নিয়োগীর মেয়ে চন্দ্রা দেখতে বেশ কালো, কপালটাও বেশ চাপা, আর নাকের গড়নও বেশ মোটা। মিসেস খোসলা চন্দ্রাকে খুব বেশি ভালোবাসেন বলেই একটা কথা বলেন—চন্দ্রার মুখের হাসিটি কিন্তু খুব সুন্দর।

এ কথার সরল অর্থ এই যে, চন্দ্রা মোটেই সুন্দর নয়। এই সত্য চন্দ্রাও যে বুঝতে পারে না, তা নয়। কিন্তু সেজন্যে চন্দ্রার জীবনে যেন কোন দুর্ভাবনা নেই।

অথচ আর সকলেই ভাবছেন। ভাবছেন চন্দ্রার বাবা আর মা। ভাবছেন চন্দ্রার মামার বাড়ির মানুষগুলি। এমন কি এই রূপনগরের মিসেস খোসলাও ভাবেন, চন্দ্রাকে পছন্দ করে বিয়ে করবে, এমন কোন ভাল পাত্র কি সত্যই পাওয়া যাবে?

কলকাতায় মামাবাড়িতে থেকে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেয়েও সে সুযোগ ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছে চন্দ্রা। আই. এ. পরীক্ষাটাও দিল না। তা ছাড়া, কলকাতায় থাকলে চন্দ্রার জন্যে পাত্রের খোঁজ নেওয়া, পাত্রপক্ষকে মেয়ে দেখানো, সবই আগের মতো চলতে পারতো। কিন্তু চন্দ্রা মেয়েটা নিজেই যেন হঠাৎ অশান্ত হয়ে, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে, বড়মামার কথা অগ্রাহ্য করে এই রূপনগরে চলে এল। চন্দ্রার মা-র কাছে বড়মামী চিঠি লিখেছিলেন, চন্দ্রা কেন যে এভাবে ছটফটিয়ে পালিয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না।

সত্যিই, বড়মামীর মনে হয়েছিল, মেয়েটা যেন কলকাতার জীবনের মধ্যে একটা দুঃসহ শাস্তি কিংবা ভয় দেখতে পেয়ে ওভাবে ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ একদিন রূপনগরে চলে গেল। মানুষ এভাবে কোথাও চলে যায় না, পালিয়ে যায়।

প্রায় দু'বছর হয়েছে রূপনগরে আছে চন্দ্রা। এখানে এসে বিন্ধ্যগিরির মাথার উপরে মেঘের ঘটা দেখে কলকাতার আকাশের কোন মেঘের কথা এই মেয়ের মনে পড়ে কি! চন্দ্রার বাবা আর মা দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছেন, কলকাতায় যাবার জন্যে চন্দ্রার মনে কোন আগ্রহ নেই।

তাঁরা আশ্চর্য হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বুঝতেও পেরেছেন, কেন এই রূপনগরের আলো-ছায়ার সঙ্গে মনে-প্রাণে মিশে গিয়েছে চন্দ্রা। প্রথম একটু সন্দেহ হয়ে ছিল, কিন্তু পরে বুঝে নিতে আর কোন অসুবিধে ছিল না, কেন চন্দ্রার মনে কলকাতাতে ফিরে যাবার কোন চাড় নেই। আজ শুধু চন্দ্রার বাবা আর মা নন, মিসেস খোসলাও জানেন, এমন কি ওই গীতাও জানে, তাছাড়া ডাক্তার দাশগুপ্ত আর কাপুর সাহেবও জানেন, চন্দ্রা কেন কলকাতায় ফিরে যেতে চায় না।

এখানে আসবার ঠিক এক মাস পরে কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিল চন্দ্রা।

রওনা হবার দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেল না চন্দ্রা। মিসেস খোসলা জানেন, ওই ছোকরা বাঙালী এঞ্জিনিয়ার অরুণ মজুমদার এখানে সার্ভিস নিয়ে যেদিন এল, ঠিক সেদিনই চন্দ্রা বলেছিল—আমার বোধহয় এখন কলকাতা যাওয়া হবে না।

গীতা খোসলা কতবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছে, নিয়োগীবাবুর বাংলোর দিকে তাকিয়েছে, আর মুখ টিপে টিপে হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। দেখতে পেয়েছে গীতা, অরুণ মজুমদার ওদিক থেকে আসছেন, আর চন্দ্রাদি বাড়ির বারান্দায় রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

অরুণ মজুমদার বলে—কেমন আছেন?

চন্দ্রা হাসে—ভাল।

অরুণ মজুমদার—কি করছেন?

চন্দ্রা আবার হাসে—কিছু না।

অরুণ মজুমদারও হেসে ফেলেন—ভাল।

চলে যান অরুণ মজুমদার। গীতা খোসলা ছুটে এসে চন্দ্রার কাছে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।—আমি বাংলা বুঝি চন্দ্রাদি।

বুঝতে কি আর সত্যিই কিছু বাকি আছে? চন্দ্রা নিয়োগীর মুখের হাসিটি খুব সুন্দর, মিসেস খোসলার কথাটা বোধহয় খুবই বিশ্বাস করে চন্দ্রা। তা না হলে, রোজই সকাল বিকেল ও সন্ধ্যায় এমন একটি সুস্মিত অভ্যর্থনার মূর্তি হয়ে আর বারান্দার রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে অরুণ মজুমদারের যাওয়া-আসার পথের উপর চোখ রাখবে কেন চন্দ্রা?

নিশ্চয় আশা করে চন্দ্রা, এই অভ্যর্থনা একদিন সফল হবে। সত্যিই একদিন থমকে দাঁড়াবেন অরুণ মজুমদার, আর, ওই দুটি কথার সঙ্গে অন্য কোন কথাও বলে ফেলবেন।

মিসেস খোসলার কাছে দুঃখ করে অনেক কথা বলেছেন চন্দ্রার মা—হলে তো ভালই হতো। আমার মেয়ে শুধু দেখতে কালো, তাছাড়া আর তো কোন খুঁত নেই। অরুণ মজুমদার আমার মেয়েকে বিয়ে করলে নিশ্চয় সুখী হতেন।

মিসেস খোসলা বলেন—নিশ্চয়, আমিও এই কথা একশোবার বলবো। কিন্তু কথা হলো, একজনের আশাতে তো কিছু হবে না। মজুমদারও যদি আশা করতো যে...।

ডাক্তার দাশগুপ্ত একদিন কাপুর সাহেবকে বলেছেন—আমি মজুমদারের কাকাকে চিঠি লিখেছিলাম। কাকা জবাব দিয়েছেন, হ্যাঁ, মেয়ে যদি সুন্দর হয় তবে বিয়ের কথা তুলতে পারি। কিন্তু আমাদের চন্দ্রা তো...।

মিস্টার কাপুর বলেন—আমিও একদিন মজুমদারকে একটু বাজিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি। মনে হলো, চন্দ্রার জন্য মজুমদারের মনে কোন ইচ্ছে-টিচ্ছে নেই।

সেজন্যে মজুমদারকে দোষ দেওয়া যায় না। এখানে এসে অন্তত দশবার মাণ্ডু বেড়াতে গিয়েছেন অরুণ মজুমদার। রূপমতীর প্রেমের গল্পও শুনেছেন। রূপমতীর খোঁপার ফুলের গন্ধ আজও চম্পা-বউলির জলে ভাসছে, সেই ইতিহাসের দেশে এসে চন্দ্রা নিয়োগীর মতো মেয়ের মুখে রূপ দেখতে পাওয়া কঠিন বইকি। অসম্ভবও বলা যায়।

তাই অরুণ মজুমদারকেও বিস্মিত হতে হয়েছে, মিসেস খোসলা যখন নাম ঘোষণা করলেন—চন্দ্রা নিয়োগী, ফুলের রাণী, ফার্স্ট।

সত্যি কথা ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে ওই ফুলের রাণীর দিকে তাকিয়ে অরুণ মজুমদারের মনে রাজপুতানী সুন্দরী রূপমতীর কথাই বার বার মনে পড়েছে। মস্ত বড় একটা পদ্মস্তবকের গায়ে চিবুক ছুঁইয়ে বসে আছে ফুলের রাণী। অসম্ভব নয়, রাজপুতানী রূপমতীও হ্রদের জলে স্নান করতে নেমে ঠিক এভাবে ফোটা পদ্মফুলের গায়ে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। কী অদ্ভুত হাসি, আর চোখের পাতার মধ্যে কী নিবিড় স্বপ্নালুতার আবেশ। অরুণ মজুমদার

নিজেও ফুলের রাণীকে দশের মধ্যে দশ নম্বর দিয়েছেন।

কিন্তু এতক্ষণে জানতে পারা গেল, এ এক নিদারুণ ছলনা। স্টোরবাবু বলাই নিয়োগীর মেয়ে চন্দ্রা নিয়োগীই হলেন এই ফুলের রাণী।

এই দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম নয়, আরও কয়েকবার ঠিক এভাবেই চন্দ্রা নিয়োগীর নিখুঁত ছদ্মবেশের আর রূপ-ছলনার কীর্তি দেখতে পেয়েছেন অরুণ মজুমদার। বিস্মিত হয়েছেন, প্রশংসা করেছেন অরুণ মজুমদারও। সেবার তপোবনের শকুন্তলা হয়ে ফার্স্ট প্রাইজ নিয়েছিল যে, সে এই চন্দ্রা নিয়োগী। আর একবার অজন্তার পুরনারী হয়ে এই চন্দ্রা নিয়োগীই প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছিল। চন্দ্রা যেন রূপসী সাজতেই পছন্দ করে। আর কি আশ্চর্য, দেখতে একটুও ভাল নয় এমন একটা মেয়ে নিজেকে কী নিখুঁত রূপসীই না করে তুলতে পারে!

কিন্তু ওতে কি আসে যায়? অরুণ মজুমদার খুশি হয়ে যাকে বেশি নম্বর দেন, সে তো একটা মিথ্যার সুন্দরসাজ। অরুণ মজুমদার তাঁর কারখানা আর অফিস যাবার পথে রোজ যাকে দেখতে পান, সে মেয়ে হলো স্টোরবাবুর মেয়ে চন্দ্রা ; বেশ কালো, কপালটা বেশ চাপা, আর নাকটাও বেশ একটু মোটা।

বুঝতে কি আর কোন অসুবিধে আছে, ওরকমের নকল রূপসীপনা করে কার চোখে রঙ ধরিয়ে দিতে চাইছে চন্দ্রা?

সত্যি কথা, অরুণ মজুমদার মনে মনে বেশ একটু বিরক্তও হয়েছেন, কারণ চন্দ্রা নিয়োগীর চোখের ভাষাটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। বুঝবার যেটুকু বাকি ছিল, সেটা ডাক্তার দাশগুপ্ত আর মিস্টার খোসলার ভালমানুষী কথাবার্তার রকম-সকম দেখেই বুঝে নিতে পারা গিয়েছে।

গীতার শাসনের হুমকি দেখে চন্দ্রা নিয়োগী সাবধান হয় না। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই দেখা গেল, অরুণ মজুমদার খুব সাবধান হয়ে গিয়েছেন। দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রা নিয়োগী, অরুণ মজুমদার পথ হেঁটে চলে যান। কিন্তু আর ভদ্রতা করে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না। এমন কি চন্দ্রার দিকে তাকাতেও কুণ্ঠা বোধ করেন অরুণ মজুমদার। বোধহয় বুঝিয়ে দিতে চান অরুণ মজুমদার, যা কখনো হবে না, যেটা সম্ভব নয়, সেটার জন্য মিথ্যে একটা গল্প সৃষ্টি করে লাভ নেই। অরুণ মজুমদার রূপনগরে এসে একটু স্বস্তিতে থাকতে চান।

কাপুর সাহেব একদিন অরুণ মজুমদারের সঙ্গে কথায় কথায় বেশ একটু স্পষ্ট করে বলেই ফেললেন—আমাদের নিয়োগীবাবুর মেয়ে চন্দ্রা সত্যিই খুব ভাল মেয়ে।

অরুণ মজুমদার হাসেন—নিশ্চয়।

কাপুর সাহেব বলেন—আপনি তো ব্যাচিলর মানুষ।

অরুণ মজুমদার—হ্যাঁ।

কাপুর সাহেব—তবে বলুন।

হাসতে চেষ্টা করেন অরুণ মজুমদার, কিন্তু হাসতে পারেন না। বরং একটা ক্ষুব্ধ আপত্তির স্বর বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—ফ্যান্সি ড্রেস তো একটা আনরিয়্যালিটি ; তাকে হাততালি দিয়ে খুশি করা যায়, ভাল নম্বর দেওয়া যায়। কিন্তু...।

২

অরুণ মজুমদার যদি চোখ তুলে তাকাতেন তবে দেখতে পেতেন যে, স্টোরবাবু বলাই নিয়োগীর বাড়ির বারান্দার কাছে শুধু একা বুগেনভিলিয়া দুলছে, তার কাছে চন্দ্রা নিয়োগীর ছায়াটাও নেই। তাকান না, তাই বুঝতে পারেন না, চন্দ্রা নিয়োগী ওখানে আর দাঁড়িয়ে থাকে না। পুরো দু'টি মাস পার হয়ে গিয়েছে, চন্দ্রাকে এ বাড়ির বারান্দায় কোন সকালে বিকালে

বা সন্ধ্যায় পায়চারি করতে গীতাও দেখতে পায়নি। গীতারও সন্দেহ হয়েছে, কি-যেন ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

চোখেও দেখতে পেয়েছে গীতা, চন্দ্রাদি যেন একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে। চন্দ্রাদির মুখে সেই হাসিটাই আছে, কিন্তু চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের উদাস হয়ে কোন্ দিকে যেন তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বেশ চিকচিকও করে।

অরুণ মজুমদার কিন্তু এ পথে হাঁটতে গিয়ে বেশ একটু সাবধান হয়ে চলেন। নিয়োগীবাবুর বাড়ির এই বারান্দা কিংবা জানালার দিকে ভুলেও তাকান না। ওখানে সত্যিই কেউ নেই, কিন্তু অরুণ মজুমদার মনে করেন, সত্যিই কেউ একজন বড়-বড় দুটো অপলক চোখ তুলে অরুণ মজুমদারকে যেন একটা পিপাসা দিয়ে গ্রাস করবার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

একদিন গীতা খোসলার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল, তাই তাকাতে হলো। এই গীতা মেয়েটার চোখে সব-সময় যেন একটা ধূর্ততার মতলব হাসছে। গীতাই হঠাৎ বলে উঠল-- ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন অরুণদা, কী চমৎকার বুগেনভিলিয়া ফুটেছে।

তাকিয়ে দেখলেন অরুণ মজুমদার। হ্যাঁ, সত্যিই ফুলের ভারে বেগুনি বুগেনভিলিয়ার ডাল নুয়ে নুয়ে দুলছে।

কথাটা বলেই চলে গিয়েছে গীতা। কিন্তু অরুণ মজুমদার তবু এক মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন আর দেখলেন, শুধু বুগেনভিলিয়া, আর কেউ সেখানে নেই। চমকে ওঠেননি, কিন্তু একটু আশ্চর্য হলেন অরুণ মজুমদার। নিয়োগীবাবুর বারান্দাটা যে সত্যিই শূন্য হয়ে গিয়েছে।

তারপর রোজই ; একবার না একবার তাকিয়ে দেখতেই হয়, কেউ ওখানে আছে কিনা। শুধু একা বুগেনভিলিয়া, কিংবা তার সঙ্গে একটা মেয়ের মূর্তি!

না, পুরো একটি মাস পার হতে চললো, তবু আর কোন মুহূর্তে ওই বারান্দায়, কিংবা জানালায়, অথবা ফটকের কাছে চন্দ্রা নিয়োগীকে দেখতে পেলেন না অরুণ মজুমদার।

একদিন মাণ্ডুর পুরনো রাজপ্রাসাদ জাহাজ-মহলে এসে অফিসারের দল আর তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দল একটা চায়ের মজলিস করে আর হৈ-হৈ করে চলে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, চন্দ্রা নিয়োগী আসেনি।

আরও অদ্ভুত কাণ্ড, এবারের ফ্যান্সি ড্রেসের প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হলেন এক কাশ্মীরি মেয়ে-মাঝি, অর্থাৎ অহল্যা নিগম, সার্ভেয়ার বিজয় নিগমের স্ত্রী।

ছদ্মরূপের প্রতিযোগিনীদের নাম ঘোষণা করলেন মিসেস খোসলা। তাই বুঝতে পারা গেল, চন্দ্রা নিয়োগী নেই। এই প্রথম, চন্দ্রা নিয়োগী এই ছদ্মরূপের আসর থেকে দূরে সরে গিয়ে কোথায় যেন নিজেকে একেবারে একলা করে রেখে দিয়েছে।

রূপমতীর গল্পটা বেঁচেই আছে ; নতুন রূপনগরও আছে। সবই আছে। বিন্ধ্যগিরির মাথার কালো মেঘ আর দূরের নর্দমার আঁকাবাঁকা প্রবাহের সাদা রেখাটি, সবই ঠিক আছে। কিন্তু অরুণ মজুমদারের মনে তবু একটা অস্বস্তি ; চন্দ্রা নিয়োগীর মতো মেয়ে এত অন্যরকম হয়ে যায় কেমন করে?

দেখতে পেয়েছে গীতা খোসলা, আর আড়ালে মুখ টিপে হেসেছে, অরুণ মজুমদার আজকাল এই পথ দিয়ে যাবার সময় বড়ই আস্তে আস্তে হাঁটেন। বার বার নিয়োগীবাবুর বাড়ির বারান্দার দিকে তাকান। আর, তাকাতে গিয়ে যেন অনেকদিনের চেনা একজনের মুখ দেখবার একটা আশা ভদ্রলোকের চোখে ছটফট করে।

ব্যর্থ আশা। কোনদিনও চন্দ্রা নিয়োগীকে দেখতে পান না অরুণ মজুদার। কম দিন তো নয়, ন'টা মাস পার হয়ে গিয়েছে, রূপনগরের প্রায় সবারই সঙ্গে কতবার দেখা হয়েছে। কিন্তু ওই একজন, শুধু একা চন্দ্রা নিয়োগী নামে একটা মেয়েকে দেখতে পেলেন না অরুণ

মজুমদার।

রূপমতী নয়, ঠিক তার উল্টো, নিয়োগীবাবুর পঁচিশ বছর বয়সের এই কালো মেয়ে এইবার যেন জীবন দিয়ে রূপমতীর গল্পের মতো একটা গল্প হয়ে উঠতে চাইছে। রূপমতী জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল, আর চন্দ্রা নিয়োগী নামে এই মেয়ে যেন আড়ালে লুকিয়ে থেকে মিথ্যে হয়ে যেতে চাইছে। অরুণ মজুমদার এই পথে যাবার সময় বার বার তাকিয়ে দেখেন, সত্যিই কি চন্দ্রা আজও ওখানে নেই?

একদিন, সেদিন কোথা থেকে একটা ঝড়ের হাওয়া এসে রূপনগরের যত বুগেনভিলিয়ার ডালপালাকে উতলা করে দিল। ওয়ার্কশপ থেকে নিজের বাংলোতে ফিরছেন অরুণ মজুমদার।

সন্ধ্যা এখনও হয়নি, তবু নিয়োগীবাবুর বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। আর, ঘরের দরজায় একটা রঙিন রেশমী কাপড়ের পর্দা খুশি পতাকার মতো ফুরফুর করে উড়ছে।

চমকে উঠলেন অরুণ মজুমদার। ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে টেবিলের ফুলদানিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কে? ও কি চন্দ্রা নিয়োগী? হতেই পারে না। অসম্ভব। নকল রূপমতী সাজতে পারে, ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে দাঁড়িয়ে নকল রূপসীপনা দিয়ে চমৎকার ছলনা জাগিয়ে তুলতে পারে, সে মেয়ে এ-রকমের একটা সাদা-সিধা সাজে এমন গরবিনীর মতো বসে আছে কেন?

কিন্তু বুঝতে অসুবিধে নেই, সত্যিই সে চন্দ্রা নিয়োগী। ঘাড়ের উপর রুক্ষ চুলের রাশ এলিয়ে দিয়েছে, কুমকুমের একটা টিপ পরেছে। শাড়িটা রঙিন নয়, গায়ের জামাটাও একেবারে ধবধবে সাদা. আর, চিকচিক করছে কালো চোখ দুটো। কী ভয়ানক ফ্যান্সি সাজ!

বুঝতে পারেন না অরুণ মজুমদার, বুকের ভেতরটা কেন দুরুদুরু করছে। চন্দ্রা নিয়োগীকে আজ এত অদ্ভুত রকমের সুন্দর, আর অদ্ভুত রকমের নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে কেন?

কোথা থেকে ছুটে এসে অরুণ মজুমদারের দিকে তাকিয়ে আর দু'হাত দিয়ে মুখ চেপে হাসতে থাকে গীতা খোসলা।

অরুণ মজুমদার বলেন—কি হলো? হাসছো কেন গীতা?

গীতা বলে—কি দেখছেন?

অরুণ—মিস নিয়োগী বসে রয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

গীতা—হ্যাঁ। কিন্তু...।

অরুণ মজুমদার—কি?

গীতা—ফ্যান্সি ড্রেস নয়।

অরুণ মজুমদার হাসতে চেষ্টা করেন।—তবে কি?

গীতা—কলকাতা থেকে দু'জন বাঙালীবাবু এসেছেন, রেস্টহাউসে আছেন।

—কেন?

—চন্দ্রাদিকে দেখতে এসেছেন।

—কেন?

—চন্দ্রাদির বিয়ের কথা চলছে!

—কেন? অরুণ মজুমদারের প্রশ্নটা যেন নিদারুণ একটা আর্তনাদ হয়ে বেজে ওঠে।

গীতা বলে—আমি কেমন করে বলি? আপনি বুঝে দেখুন।

অরুণ মজুমদারের নিঃশ্বাসের বাতাসও যেন জ্বলতে শুরু করেছে। গীতা খোসলাকেই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন অরুণ মজুমদার।—কি ভেবেছেন তোমার চন্দ্রাদি? উনি সত্যিই একটি রূপমতী?

গীতা বলে—সে কথা চন্দ্রাদিকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন?

—নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব। জিজ্ঞাসা করবার অধিকার আমার আছে। বলতে বলতে এগিয়ে যান, নিয়োগীবাবুর বাড়ির বারান্দার সেই বুগেনভিলিয়ার ছাপা পার হয়ে একেবারে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন ; তারপর সত্যিই একেবারে চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে কথা বলে ফেলেন অরুণ মজুমদার।

—আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম বলে তুমিও আমাকে ভুল বুঝবে কেন?

চন্দ্রা মাথা হেঁট করে হাসে—না, ভুল বুঝিনি।

অরুণ মজুদার—তবে এই যে শুনলাম, কলকাতা থেকে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, রেস্টহাউসে আছেন ; তোমাকে ওরা দেখবেন।

চমকে ওঠে চন্দ্রা—কে বললে?

—গীতা।

—তবে গীতাকেই জিজ্ঞেস করুন, কেন এ রকম একটু মিথ্যে কথা বলল।

কিন্তু কোথায় গীতা? গীতা তখন সার্ভেয়ার বিজয় নিগমের বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে অহল্যার সঙ্গে গল্প করছে আর মুখ টিপে হাসছে।

ভাট তিলক রায়

ভাট তিলক রায়ের কথা আমরা এখনো ভুলে যাইনি। তাকে আমরা ভাল করে চিনতাম, তার মুখে অনেক গান শুনেছি। মাঝে কিছুদিন সে বহুরূপীর পেশা ধরেছিল। সে সময়ের একটা ঘটনা আজও মনে পড়ে। গয়লানী সেজে তিলক রায় ব্রজবাবুর বাড়ির বারান্দায় এক হাঁড়ি দই নিয়ে এসে বসেছিল, আমরা পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে জটলা করে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। ব্রজবাবুর মত গম্ভীর রাশভারী মানুষের কাছে এত বড় একটা ফস্টি নিয়ে তিলক রায় কোন্ সাহসে এসে দাঁড়িয়েছে? কিন্তু ব্রজবাবু গম্ভীরভাবে দরদস্তুর করলেন, দই চেখে দেখলেন, তারপর এক সের দই কিনলেন। দামটা হাতে নিয়েই সেই কৃত্রিম গয়লানী এক টানে তার মাথার পরচুলা আর নাকের নথ ফেলে দিয়ে তিলক রায়ের মূর্তিতে দেখা দিল। হাত পেতে বকশিশ চাইলো। ব্রজবাবু হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা প্রচণ্ড খুশির উচ্ছ্বাসে তাঁর জমাট গাম্ভীর্য ধুলো হয়ে উড়ে গেল। একটি দশ টাকার নোট তিলক রায়ের হাতে ফেলে দিলেন।

বিষুয়া পরবের সময় ভাট তিলক রায় গেরুয়া পাগড়ি পরে কালীবাড়ির চত্বরে এসে বসতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু ছড়া কেটে আর গান গেয়ে পার করে দিত তিলক রায়। গানের ভাষাটাও ছিল অদ্ভুত—না ভাখা না ঠেট হিন্দী, না খাড়ি বোলি, না বাংলা, না মগহি। মনে হতো ঐ সব ভাষা মিলিয়ে যেন তিলক নিজস্ব একটা ভাষা তৈরি করে নিয়েছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটি মুণ্ডারী কুরুম্ কারুমও থাকতো। আজ তিলক রায় বেঁচে থাকলে তার কাছে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করার মতো একটা উপাদান পাওয়া যেত। এমনও হতে পারে, তিলক রায়ই আমাদের দেশের সেই অখ্যাত মনস্বী, যে প্রথম এই বহুবচনাবৃত ভারতের উপযোগী একটা এস্পারান্টো তৈরি করেছিল, কিন্তু কেউ জানতে পারলো না। তিলক যখন মাঝে মাঝে কাঁচা হিন্দী ও বাংলা মিলিয়ে তার গাথাগুলির ভাষ্য করে আমাদের বোঝাতো, তখন আমরা সবই বুঝতে পারতাম আর মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

ভাট তিলক রায়ের গানের মধ্যে কী না ছিল? বুন্‌ডুটুক্‌কুরু গুহার রাজার ছেলে মুলুটুংলা এক হরিণীর প্রেমে পড়ে সারা অরণ্য ঢুঁড়ে ফিরছে--চোখে ঘুম নেই, মুখে জল নেই। দূর্বা

ঘাসের পোশাক গায়ে দিয়ে নদীর ধারে চুপ করে শুয়ে থাকে—যদি ভুলে ভুলে সেই ছলনাসুন্দরী হরিণী একবার কাছে চলে আসে। রাজা হাতির দাঁতের কুড়ুল নিয়ে সদলবলে বের হয়েছেন। হয় সে হরিণী, নয় এই উদ্‌ভ্রান্ত কুপুত্র—দু'জনের একজনকে পেলেই হবে—নিজের হাতে সংহার না করে তিনি আর শান্ত হবেন না।

ভাট তিলক রায়ের গানের এই রূপকথার আস্বাদ আমাদের তখন কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি করে দিত। তিলকের গানের সেই চরম অবাস্তব কত সত্য বলে মনে হতো। তার মধ্যে ভেবে দেখবার মতো কোন প্রশ্নই থাকতো না। তিলকের গান আর ছড়ার প্রতিটি পদের সঙ্গে আমাদের বিস্ময় এক ইন্দ্রজালের জঙ্গলে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতো। আমরাও যেন মনে মনে ঘাসের পোশাক পরে সঙ্গে সঙ্গে নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকতাম, কতক্ষণে সেই হরিণী এসে পৌঁছয়। বুন্‌ড়ুটুক্‌কুরু কথাগুলি এক একটি টোকা দিয়ে আমাদের বোধরাজ্যের কুয়াসার মধ্যে যেন ছোট ছোট এক-একটি সূর্য জ্বালিয়ে দিত।

আজ বড় হয়ে ভাট তিলক রায়ের রূপকথার একটা অর্থ বুঝতে পারি। বিস্ময় আরো বেড়ে যায়। তিলক রায় কি সেই প্রাগৈতিহাসিক বেদের শ্রুতিধর, যখন মানুষ আর পশু একই অরণ্যের জঠরে প্রতিবেশীর মতো থাকতো? তিলক কি সেই পুরাকল্পের মানুষের সংসারে প্রথম বিজাতীয় এই প্রণয়ের কাহিনীটি শুনিয়েছিল? বুন্‌ড়ুটুক্‌করু গুহার যুবরাজ মুলুটুংলা কি সে যুগের ওথেলো আর সেই শৃঙ্গবতী হরিণী কি তার ডেসডেমোনা? আজ অবশ্য অনেক মাথা ঘামিয়ে—এথ্‌নোলজী আর সাইকো-এনালিসিসের প্রয়োগ বিয়োগ করে এই তত্ত্বটা বুঝে খুশি হচ্ছি। কিন্তু প্রথম যখন শুনেছিলাম, তখন ভাট তিলক রায় ছিল হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা আর আমরা ছিলাম ছেলের দল।

আমাদের মুগ্ধাবস্থা হঠাৎ চম্‌কে উঠতো। তিলক অন্য একটা গাথা গাইতে শুরু করে দিত। এটা আবার অন্য ধরনের। এই গাথার কথা কাহিনী ও সুরে সেই নিশির ডাকের মতো আহ্বান ছিল না। কথাগুলি আমাদের হাতে হাতে যেন এক একটি তলোয়ার ধরিতে দিত।—কার্নাইল ডালটন সাহেবের পল্টন পালামৌ কেল্লা ঘিরে ধরেছে। মুহুর্মুহু তোপ পড়ছে। ফটকের মুখে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। এক একটা শওয়ারের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে ফটকের ওপর। কালো কালো কোল তীরন্দাজ আর তলোয়াররাজ রাজপুতেরা দলে দলে ফটকের মুখে রুখে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ হটবে না। খাড়া দাঁড়িয়ে লড়ছে আর মরছে।

মিউটিনির সর্দার রাজার খুড়ো। থুড়থুড়ে বুড়ো। ফটক সামলাতে যখন আর কেউ নেই, কার্নাইল ডালটন যখন পল্টন নিয়ে কেল্লায় ঢুকতে চলেছে, ঠিক সেই সময় সমস্ত কেল্লাটা যেন শেষ বারের মতো হুঙ্কার ছাড়লো। দেখা গেল, এক আশি বছরের লোলচর্ম বুড়ো রাজপুত তার মাথার পাগড়িটাকে ঢালের মতো এক হাতে তুলে আর এক হাতে তলোয়ার ঘুরিয়ে মত্ত সিংহের মতো যেন কেশর ফুলিয়ে, নাচতে নাচতে, হুঙ্কার দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষণিকের জন্য যেন একটা মৃত্যুর হোলি খেলে নিয়ে রাজার খুড়ো, থুড়থুড়ে বুড়ো, সেইখানে ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে রইলো।

ভাট তিলক রায় মারা গেছে অনেকদিন। আজ মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে যেন ইতিহাসের প্রেতাত্মাটি সরে গেছে। যুগে যুগে কত ঘটনা দেখা দিয়েছে, শেষ হয়ে গেছে। আধুনিক মানুষ আমরা, ইতিহাসের জীব হয়েও আমরা তার খপ্পরে থাকি না। আমরা বদলে যাই। আজ যে ব্যথায় আমরা কাঁদছি, কাল তা শুধু স্মৃতি হয়ে যায়, পরশু সেই স্মৃতি হয়তো আমাদের শুধু হাসাতে থাকে।

কিন্তু ভাট তিলক ছিল যেন এক নিদ্রাহীন যখ। অতীতের যত পাপ-তাপ, আনন্দ-বিষাদ, প্রেম প্রণয় ও লজ্জা, শত্রুতা প্রতিহিংসা ও প্রতিজ্ঞাকে সতর্ক পাহারায় সে আগ্‌লে ছিল। যা বিস্মরণীয়, তাকে সে ভুলতে দেয়নি। যা ক্ষমার্হ, আজও সে তাকে ক্ষমার যোগ্য হতে

দেয়নি। যে গ্লানি আমরা ভুলে গেছি, সেই গ্লানিকে তিলক বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেই কবেকার সভ্যতার হরিণী-প্রেমবিধুর বনবাসের লজ্জা আর এই সেদিনের কার্নাইল ডালটনের হাতে রাজপুত বিদ্রোহীর চরম শাস্তির জ্বালা--তিলক রায় এক মৃত যুগের শবাধার থেকে প্রেতের মতো উঁকি দিয়ে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিত।

আমরা আর একটু বড় হয়েছি তখন, শুনতে পেলাম তিলক রায় শহর ছেড়ে দেশে চলে গেছে। আমরা শুনেছিলাম লাল্‌কি নদীর ওপর একটা প্রকাণ্ড বাঁধ তৈরি হচ্ছে, নিমিয়াঘাটের কাছে। তিলক রায়ের বাড়ি নিমিয়াঘাট থেকে কিছু দূরে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে গেলে মাত্র আধ ঘণ্টার সফর।

কলকাতার একটা কোম্পানী জ্যাকব এণ্ড জ্যাকব, সেই বাঁধটার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। জায়গাটার জরিপ হয়ে গেছে। মালপত্র আসছে, কুলি কারিগর আর ইঞ্জিনিয়ারেরা আসছে। তিলক রায়ের মনের মধ্যে সজীব ইতিহাসের প্রেতটা বোধহয় সতর্ক হয়ে উঠলো। বহুরূপীর পেশা ছেড়ে দিল তিলক। শহরে ছড়া গাইতে আর আসে না, নিমিয়াঘাটের আশেপাশে যত গাঁ আছে, সব জনপদের কানে কানে তিলক এক সাবধান বাণী শুনিয়ে বেড়াতে লাগলো।-- ভয়ঙ্কর একটা অমঙ্গল আসছে, সময় থাকতে একটা বিহিত ব্যবস্থা করা চাই। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরি করতে যারা এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য কি? বাঁধ তৈরি কি এমনিতেই হয়, লাল্‌কি নদীর ঢল সাম্‌লাবে সিমেন্ট আর লোহার কয়েকটা দরজা! কেউ বিশ্বাস করো না। একশোটি নরবলি না দিলে লাল্‌কি নদী কখনই তুষ্ট হবে না। ছেলেধরার দল ঘুরছে, বাঁধ কোম্পানি টাকার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর একদিন মাঝরাত্রে হাত-পা বেঁধে বলি দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। ঐ যে একটা নতুন থাম তৈরি করেছে, ঐখানেই বলি দেওয়া হয়। বলির আগে আফিং খাইয়ে দেয়, কেউ বুঝতেও পারে না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কি পরিণাম হবে।

নতুন নতুন ছড়া বেঁধে তিলক রায় তার বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগল।--ইঞ্জিন এসেছে, কত রকমের কলকজ্জা আসছে। কিন্তু কী সাধ্য আছে তাদের লাল্‌কি নদীর ঢল বেঁধে দেবে? আগে নরবলি হবে, তবেই কল চলবে। তা ছাড়া আর কোন পথ নেই। অতএব সব গাঁয়ের মানুষ হুঁশিয়ার হয়ে যাও। কেউ কুলির খাতায় নাম লিখিও না, সোনার মোহর মজুরি দিলেও না।

এসব খবর আমরা তিলকের মুখেই শুনেছিলাম। বিষুয়া পরবের দিন একবার শহরে আসতো তিলক। তিলকের চেহারাটাও কেমন পাগ্‌লা গোছের হয়ে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিটাও যেন একটা সংশয়ে উদ্বেল হয়ে থাকতো। চুপি চুপি বলতো--ভয়ানক কাণ্ড হচ্ছে খোকাবাবু। নিমিয়াঘাটে লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরি হচ্ছে। কখন যে গরীবের প্রাণটা চলে যায় ঠিক নেই!

আমরা বলতাম--কেন?

তিলক--এক একটি থাম উঠছে, আর পাঁচটা মানুষের প্রাণ যাচ্ছে।

আমরা--কেন?

তিলক--নরবলি দিতে হচ্ছে, নইলে মাটিতে থাম ধরবে কেন? লাল্‌কি নদীর রাগ কি এমনিতেই শান্ত হবে?

তিলক একটা ছড়া গেয়ে শোনালো। এই গাথা সে কোন উত্তরাধিকার হিসাবে পায়নি, এটা তার নিজেরই রচনা। তিলক রায়ের গাথার ঝুলিতে যুগ-যুগান্তের ক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে আছে। এইবার নতুন একটা ক্ষোভ তার সঙ্গে যোগ হলো।

আমরা গল্প শুনেছিলাম, গ্রাণ্ড কর্ড লাইন যখন তৈরি হয়, তখন কিছু দিন হাতির উপদ্রবে

ট্রাফিক ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। হাতিরা তাদের জঙ্গলে এই কলকজ্জার অনধিকার প্রবেশ ভাল মনে গ্রহণ করেনি। তারা দল বেঁধে লাইনের ওপর বসে থাকতো, কখনো বা এসে শুঁড় দিয়ে লাইন উপড়ে ফেলে দিত।

তিলক ভাট যখন তার সেই বড় বড় চোখ কুঁচকে আমাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল, তখন আমাদের এই হাতিদের রাগের গল্পটা একবার মনে পড়েছিল। তিলক রায়ের চোখে যেন সেই রকম একটা আক্রোশ।

তার কিছুদিন পরে আমরা শুনে শিউরে উঠলাম, নিমিয়াঘাটের কাছে কোন্ একটা গাঁয়ে তিনটে ছেলে-ধরাকে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কারা মেরে ফেলেছে। একটা পুলিশ ফৌজ নিয়ে এস-পি সেই দিনই নিমিয়াঘাট রওনা হয়ে গেলেন।

তার দু'দিন পরে শুনলাম ছেলেধরা নয়, তিনটে কুলি-রিক্রুটারকে মেরেছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সদরে আনা হয়েছে। আমাদের অনেকেরই কেমন একটা বিশ্বাস ও আশঙ্কা ছিল—এই প্রতিহিংসার ষড়যন্ত্রে তিলক রায়ও থাকতে পারে। তাই স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা সেসন জজের আদালতের ভিড়ের মধ্যে এসে ভিড়ে পড়তাম। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতাম, আসামীদের মধ্যে তিলক আছে কি না। না, তিলক রায় নেই। চার-পাঁচজন গাঁয়ের লোক তারা, তাদের কাউকে আমরা চিনি না।

তিলক রায়কে আসামীদের মধ্যে দেখতে না পেয়ে আমাদের একটা উদ্বেগ শান্ত হতো, একটু খুশি হতাম। কিন্তু ঘটনাটা আবার একটু কেমন পান্‌সে হয়ে যেত আমাদের কাছে। এর মধ্যে তিলক রায় থাকলেই যেন ভাল হতো। হিরো হিসাবে তিলক রায় কিছুক্ষণের জন্য আমাদের কাছে একটু খাটো হয়ে যেত।

আরও বড় হয়েছি। তিলক রায়কে আরও কয়েকবার দেখেছি। তখন লাল্‌কি নদীর বাঁধ রচনার মধ্যপর্ব আরম্ভ হয়েছে। বড়মামার সঙ্গে নিমিয়াঘাটের অফিস কোয়ার্টারে থাকি। সারাদিন ঘুরে ফিরে বাঁধের কাজ দেখতাম। স্মৃতি থেকে সেদিনের অনুভবের কিছুটা, আর আজকের বিচার দিয়ে তার পরিশিষ্টের কিছুটা বলতে পারা যায়।

তিলক রায়ের বাণী ব্যর্থ হয়নি। নিমিয়াঘাটের কাছাকাছি কোন গাঁ থেকে কোন কুলি তখনো এই বাঁধ তৈরির কাজে খাটতে আসেনি। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তখনো তাদের কাছে শত্রু হয়ে আছে। কিন্তু তিলক রায় আসে মাঝে মাঝে। গুপ্তচরের মতো যেন সে ছদ্মবেশে বাঁধের কীর্তি দেখে যায়। দেশী মজুর কেউ নেই, সবই ছত্রিশগড় থেকে এসেছে। কেরানীরা সবাই বাঙালী। ইঞ্জিনীয়ারেরা বেশির ভাগ সাহেব। মিস্ত্রী আছে সব জাতের লোক—পাঞ্জাবী পাঠান আর চাটগেঁয়ে। তিলক রায় সবার সঙ্গে খাতির জমায়, নানারকম প্রশ্ন করে। তার সন্দেহ দূর হয় কিনা বোঝা যায় না। এমনি করেই মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা দেয় তিলক—তারপর আবার চলে যায়।

আমাকে একদিন দেখতে পেয়ে চিনতে পারলো তিলক। তিলক খুশি হয়ে ও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।—আপনি এখানে কেন দাদাবাবু?

—বড়মামা এখানে আছে যে।

—আপনার বড়মামা? তিলক চিন্তিতভাবে তার স্মৃতি হাতড়ে বড়মামার পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো।

আমিই সাহায্য করলাম। লালকুঠির জিতেনবাবুকে মনে নেই, তিনিই আমার বড়মামা।

তিলক খুশি হয়ে উঠলো।—ওঃ হো, চিনতে পেরেছি। চলুন দাদাবাবু, তাঁকে একটা আদাব জানিয়ে আসি।

বড়মামাকে অভিবাবদন জানিয়ে তিলক রায় মেজের ওপর বসে পড়লো। তারপর বললো—একটা কথা আমার মতো বোকাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন বড়বাবু, এই বাঁধ তৈরি হয়ে কি হবে? কারও কোন ভাল হবে কি?

উত্তরে বড়মামা যা বললেন, তাতে তিলক শুধু হাঁ করে রইল, যেন গিলতে পারছে না কিছু।

—বলিস কি তিলক? দশ বছর পরে নিমিয়াঘাটকে আর চিনতে পারবি? এখান থেকে চারটে পাকা সড়ক বের হবে—চোস্ত ম্যাকাডাম করা সড়ক। মীটার-গেজ রেললাইন বসবে। এরই মধ্যে সিমেন্টের কারখানা খোলার বন্দোবস্ত শুরু হয়ে গেছে। বাঁধটা একবার শেষ হয়ে নিক তো, তখন বিরাট একটা পাওয়ার স্টেশন হবে এখানে। তিনটে জেনারেটর বসবে, সঙ্গে এক জোড়া টার্বাইন। ছেষট্টি হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ ছুটে যাবে এখান থেকে দশ মাইল পর্যন্ত—ডবল সার্কিট ট্রাঙ্ক লাইন ধরে।

বড়মামার কথার মধ্যে ভবিষ্যতের এক সুখী ও সম্পন্ন উপনিবেশের বিচিত্র মূর্তি ফুটে উঠেছিল। তিনি আরও জাঁকালো করে শুনিয়ে দিলেন।—কত কারখানা খুলে যাবে দেখবি। বাঁশের জঙ্গল পড়ে রয়েছে, কাগজের মিল বসবে। একটা কাঁচের কারখানা খুলবে—এই যে পড়ে রয়েছে টন টন সাদা বেলে পাথরের ধুলো, এসব তখন গলে গিয়ে স্ফটিক হয়ে যাবে রে তিলক।

আমরা ছেলেবেলায় যেভাবে সম্মোহিতের মতো তিলক রায়ের গান শুনতাম, তিলক নিজেই আজ যেন সেইরকম একটা কিশোর কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে বড়মামার কথাগুলি শুনছিল। মনে হচ্ছিল, বড়মামাই একজন ভাট, তিলক একজন শ্রোতা মাত্র। আধুনিক যুগের এক ভাটের মুখে ভবিষ্যতের কথা শুনছে স্বয়ং তিলক। তবুও তিলকের মুখে একটা বেদনার্ত ছায়া পড়েছিল যেন। ইতিহাসের প্রেতটা যেন ভবিষ্যতের এই ঔদ্ধত্য দেখে মনের দুঃখে মুসড়ে পড়ছে। তিলক চলে গেল।

তিলক আবার একদিন এল। জ্যাকব এণ্ড জ্যাকবের নিমিয়াঘাট ব্যারেজ কনস্ট্রাকশনের একটা প্রস্পেক্টাস হাতে নিয়ে বড়মামা তিলক রায়কে নানা তথ্য পড়ে পড়ে শোনালেন। তিলক কি বুঝলো তা সেই জানে। বড়মামা পড়ছিলেন নিজের আগ্রহের আবেগে। নিজেকে উৎফুল্ল করার জন্যই যেন তিনি নতুন ধরনের একটা লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছিলেন। কারণ আছে, বড়মামা কিছু শেয়ার কিনেছেন।

আজ তিলককে দেখে কেমন একটু শান্ত মনে হলো। সমস্ত শক্তি দিয়ে তার সব রোষ সংযত করে লাল্‌কি নদীর বাঁধকে যেন সে একটু সুনজরে দেখবার চেষ্টা করছে।

তারপরেই একদিন তিলক রায় এল। সেদিন সে আর একা নয়। শ'চারেক গাঁয়ের কুর্মি আর জোলা তার সঙ্গে এসেছে। সবাই সুবাধ্য ছেলের মতো কুলি আফিসের সামনে দাঁড়িয়ে নাম লেখালো। নম্বরের চাক্‌তি আর কোদাল হাতে নিয়ে দল বেঁধে নতুন একটা মাটির ধাওড়াতে গিয়ে সবাই উঠলো। আগামীকাল থেকেই ওদের কাজ শুরু হবে। শুধু আজকের দিনটা ওরা জিরিয়ে নিচ্ছে। শুকনো পাতা পুড়িয়ে বড় বড় হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে ওরা খেল। তখনো ওদের মনের সন্দিগ্ধ ভাবটা বোধহয় একেবারে কেটে যায়নি। এই নতুন ঘরের সুখ আজ ওরা অস্বীকার করতে পারছে না ; তবু চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন যেন ঘনিয়ে আছে—এই সুখ সইবে তো?

লাল্‌কি নদীর বাঁধটা সত্যিই একটা কীর্তি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম উঁচু উঁচু ক্রেনগুলির মাথার ওপর রোদ পড়েছে। যেন বিশ্বকর্মার কিরীট। ছোট ছোট ক্রেনগুলি নিত্যন্ত অবলীলায় ছোঁ মেরে এক-একটা কংক্রীটের চাঙ্গড় তুলে নিচ্ছে

—পরমুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে লাইনের ওপর স্তরে স্তরে। একটা প্যাডেল টাগ, একটা ড্রেজার আর একটা এক্সক্যাভেটার নদীর ওপর পড়ে উৎখাতকেলির আনন্দে অস্থির। হাজার টন জল মাটি আর পাথর উপড়ে ফেলছে। ডবল সিলিণ্ডার ডিজেল ইঞ্জিনগুলি যেন দর্পভরে আত্মহারা। পিনিয়নগুলির মুখে একটা শাণিত দস্তুর হাসি। সমস্ত যন্ত্রযূথ যেন হাসছে।

ইঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ার আর সার্ভেয়ারের সংখ্যাই হবে একশোর ওপর। তাছাড়া ফিটার টার্নার লেদমিস্ত্রী, ওস্তাগর, বয়লারম্যান, ইঞ্জিন ড্রাইভার আর কুলিমজুর সব নিয়ে হবে হাজারের ওপর। দূর ছত্রিশগড় থেকে এসেছে রোগা রোগা পুরুষ কুলি আর বেঁটে মজবুত চেহারার মেয়ে কুলি।

নিমিয়াঘাটের এই বেলেমাটির তেপান্তরে লাল্‌কি নদীর ধারে এক বিরাট বাহিনী যেন এসে ছাউনী ফেলেছে। প্রতিদিন ভোর থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। পরেশনাথের ডাকবাংলোতে বসে নীচের দিকে তাকালে এই কুয়াশায় ঢাকা জনপদ অল্প অল্প দেখা যায়—নিঃশব্দ ষড়যন্ত্রের মতো যেন গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে ; কার বিরুদ্ধে যেন সংগ্রাম ঘোষণা করেছে।

সত্যি কথা, এও এক সংগ্রাম, জল পাথর আর মাটির জড়ত্বের বিরুদ্ধে। লাল্‌কি নদীর চওড়া খাত ধরে প্রতি মুহূর্তে এক বেগময় সলিলসম্ভার গড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পাশেই বসে শুক্‌নো নিমিয়াঘাট যেন তৃষ্ণায় ধুঁকছে। সারা দুপুর ধরে এক নিদারুণ প্রদাহে চিক্‌চিক্‌ করে পুড়তে থাকে নিমিয়াঘাটের বেলেমাটির পরমাণু। কত শত বছর পার হয়ে গেছে কে জানে, শ্যাম বনভূমির শেষ অঙ্কুরটি এইখানে জলবাতাসের অনুদার চক্রান্তে মরে গেছে।

মানুষের বুদ্ধি আজ বুঝতে পেরেছে—আবাদ করলে ফলতো সোনা। নিমিয়াঘাটকে আর পতিত করে রাখা উচিত নয়। লাল্‌কি নদীর খামখেয়াল শান্ত করে দিতে হবে—এক হাজার ফুট লম্বা এক সুকঠিন কংক্রীটের বাঁধ দিয়ে। পনেরটি খিলান করা স্প্যান, প্রত্যেকটির সঙ্গে পঞ্চাশ টনের গেট ফিট করতে হবে। মৌসুমী বৃষ্টি এই লাল্‌কি নদীকে প্রতি বছর ফাঁপিয়ে তোলে, ফাল্গুনে হাজার মাইল দূরের হিমগিরির বরফগলা জল গড়িয়ে আসে কিন্তু সবই বৃথা হয়। এক অন্ধ বেগ সব জলভার লুটে নিয়ে চলে যায়, নিমিয়াঘাটের ডাঙ্গা তার এক কণা প্রসাদ পায় না। তাই গড়ে উঠছে বাঁধ—আট কোটি টাকার স্কীম। দেশবিদেশের মহাজনের সাত দিনে সাগ্রহে সব ডিবেঞ্চার লুটে নিয়ে গেছে।

এখান থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, কম করে, সাতটা খাল। জরিপ করা হয়ে গেছে, ভূস্তর ফুটো করে অন্তঃসলিলের রহস্য জানা হয়ে গেছে। এই খাল দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলভার চলে যাবে দিকে দিকে—উর্বরতার অর্ঘ্য নিয়ে। রুক্ষ নিমিয়াঘাট সবুজ হয়ে উঠবে। তাই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেন এক সুমহিম সংগ্রামের আয়োজনে এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এইখানে। যুদ্ধ হবে পদার্থজগতের বিরুদ্ধে—সমস্ত নিসর্গের ঔদ্ধত্যকে পরাজিত করে বুদ্ধির দাস করে রাখতে।

এরই মধ্যে বেনেদের জুয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে নয়, দূর কলকাতা ও লণ্ডনের এক একটি দালালী হৌসে নিমিয়াঘাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফাট্‌কা শুরু হয়ে গেছে। বেতারে খবর বিলি হয়—কাজ কত দূর এগিয়েছে। শেয়ার নিয়ে হানাহানি চলে। নতুন এক ঘোড়দৌড়ের জুয়ার আস্বাদে নিখিল বিশ্ব দালালী মস্তিষ্কে নেশা জমে এসেছে।

স্ট্রাইক আরম্ভ হয়েছে। নিমিয়াঘাটের এই সুন্দর ইষ্টাপূর্ত রূপ হঠাৎ বীভৎস হয়ে গেছে সংগ্রামের সেই বুদ্ধির ঐক্য ঘুচে গেছে, দীপ্তি নিভে গেছে। এক আত্মবিচ্ছেদের বিষে শিবিরের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। শুনলাম, কন্ট্রাক্টর জ্যাকব এণ্ড জ্যাকবের ক'জন অফিসার গোটা দশেক ইঞ্জিনিয়ার আর বড়মামা ছাড়া সবাই ধর্মঘট করেছে। দশদিন থেকে কাজ বন্ধ।

সেদিনের ঘটনাগুলি আজও খুব স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ে। দশদিন ধরে সেই ময়দানবের পুরী যেন নিঝুম হয়ে রইল। চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে মাঠের উপর একটা গুর্খা ফৌজ ডেরা নিয়েছে। সাহেবের ফুলবাগানে রোজ একটা জটলা দেখা যায়। তার মধ্যে অফিসারেরা আছে, কয়েকজন মিস্ত্রী, ট্যান্ডেল আর সর্দারও আছে। বোধহয় মীমাংসার জন্য একটা বৈঠক বসে সেখানে।

বড়মামার কাছে শুনতাম, স্ট্রাইক তাড়াতাড়ি না মিটলে একটা ভয়ানক ব্যাপার হবে। আর মিলিটারী নাকি আসছে। নতুন লোক যোগাড়ের জন্য রিক্রুটারেরা বেরিয়েছে। কী বেয়াদব আর বেইমান এই মজুর মিস্ত্রী আর কেরানীগুলি! এমন ঠেঙ্গানি দিয়ে হাত পা ভেঙে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোথাও যেন আর রোজগার করবার আশা না থাকে, এখানে তো নয়ই।

কলকাতার কয়েকটা খবরের কাগজকে বড়মামা গালাগালি দিলেন। এই স্ট্রাইকের খবরটা তারা এরই মধ্যে রটিয়ে দিয়েছে। শেয়ারগুলির উঠতি ভ্যালু এরই মধ্যে ইনডিফারেন্ট হয়ে পড়েছে। এর পর নামতে আরম্ভ করবে। আমারও মনে হতো, এই স্ট্রাইক একটা বড় বেশি গোঁয়ার্তুমি। সামান্য কয়েক আনা মজুরির রেটের দাবী গ্রাহ্য হয়নি বলেই একেবারে কাজটা নষ্ট করে দিতে হবে, এ কী রকম ব্যবহার? একটু কৃতজ্ঞতা নেই? এক-এক সময় ভাবতে খুবই খারাপ লাগতো, এত বড় একটা কীর্তি অসমাপ্ত থেকে যাবে। এত বড় একটা উন্নতির স্কীম এইখানে এই জঙ্গলের মাঝখানে জল বালি আর পাথরের ওপর মরচে পড়ে থাকবে। কোনারকের মন্দির দেখেছি—একটা অসম্পূর্ণতার ব্যথার সেই মন্দিরের গায়ে ফাটল ধরে আছে। কিন্তু সেটা খুব বেশি দুঃখ দেয় না। কোনারকের স্থাপত্যগরিমা যৌবন পর্যন্ত উঠেছিল, তার পরেই কোন্ এক দুর্ভাগ্যে শুধু তার রূপসজ্জা পূর্ণ করার সময়টুকু আর হয়নি। ভগ্নস্তূপও কত দেখেছি, গোয়ালিয়রের প্রান্তরে উজ্জয়িনীর গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে, কাঁটার ঝোপে ছেয়ে গেছে। দেখে তবু খুব বেশি দুঃখ হয় না। এক বৃদ্ধের কঙ্কালের মতো মনে হয়—জীবনের সব ভোগের মুহূর্ত পার হয়ে আয়ুক্রমের শেষ পরিচ্ছদে পৌঁছে তার মৃত্যু হয়েছে। এমন কিছু শোকাবহ ব্যাপার নয়। কিন্তু নিমিয়াঘাট ব্যারের লাল্‌কি নদীর বাঁধ যদি আজ নষ্ট হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতের কোন সার্ভেয়ার সত্যিই দুঃখে চমকে উঠবে—এক বিরাট কীর্তির শিশুদেহের এই চূর্ণাস্থি দেখে। অভিশাপ দেবে অতীতের এই মূঢ়দের যারা এই বাঁধকে অকালে হত্যা করলো—এই স্ট্রাইকওয়ালা মজুরদের।

স্ট্রাইকটা আমারও ভাল লাগছিল না। একটা দুর্বুদ্ধির চক্রান্ত বলেই মনে হতো। তারপর সত্যি করে একদিন আমিও বড়মামার মতো একটা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন ছটফট করে উঠলাম। কারণ, যে-দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্ষমার অবকাশ রইল না। হোক না মজুর আর কেরানী, যতই গরীবই হোক না কেন—ওদের বুদ্ধিতে পাপ ঢুকেছে। দেখলাম দুটো গার্ড তিলক রায়কে কাঁধে তুলে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে নিয়ে এল। তিলকের গায়ের জামাকাপড় সব রক্তে ভিজে গেছে—মাথায় একটা পটি বাঁধা। ধর্মঘটীরাই তিলককে মেরেছে। এই সর্ববিভাগীয় ধর্মঘটে শুধু তিলক রায়ের কুলির দল যোগ দেয়নি। যোগ দেবে কেন? তিলক রায়ের দল খুশিই ছিল। দিন ছ'আনা হিসাবে তারা হপ্তা পায়, মেঠাই কাপড় কেনে, দৌড়ে দৌড়ে ঘন ঘন বাড়ি যায়, ছেলেমেয়েদের দেখে আসে। বাড়ি থেকে পুঁটুলি বেঁধে চিঁড়ে নিয়ে আসে। কাজ করতে করতে যখন একটু জিরিয়ে নেবার ইচ্ছা হয়, তখনি শালপাতা ভেঙে ঠোঙা তৈরি করে নেয়। লাল্‌কি নদীর বালি খুঁড়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল বার করে। খেতে খেতে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির তোয়াজে ওরা নিজেরাও যেন চিঁড়ের মতো ভিজে যায়। তিলক রায়ের দল এই মজুরির দাবির লড়াইয়ে সামিল হয়নি। সিটি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঠিক নিয়ম মতো কোদাল নিয়ে কাজে নেমে পড়ে।

কোম্পানীর গার্ডেরা আর একটি লোককে ধরে নিয়ে এল। একে আমরা আগে কখনে দেখিনি। ভদ্রলোকের ছেলে, বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না, চোখে চশমা আছে, গায়ে খদ্দরের চাদর।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার বললেন—তুমি কে হে জেন্টেলম্যান? কোত্থেকে এসেছ?

যুবকটি উত্তর দিল—আমি ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমার পেশা। এখানে আমার বহু পেসেন্ট আছে।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার—আমাদের এখানে বুঝি ডাক্তার নেই? তুমি এখানে ট্রেসপাস করতে এসেছ কেন?

যুবক—আপনি চীপ জ্যাস্টিস্ নন যে আমার বিচার করতে আরম্ভ করেছেন। আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তবে পুলিশে খবর দিন। আদালতেই বিচার হবে আমি ট্রেসপাস করেছি কিনা।

চীফ ইঞ্চিনিয়ার একটা বেত দেখিয়ে বললেন—আপাততঃ এইটাই হলো আদালত এখানে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার কর আর কখনো আমার এলাকায় ঢুকবে না।

যুবক—আমার রোগী দেখতে আমি আসবই।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার—অল রাইট।

ডাক্তারকে গার্ডেরা ধরে কোথায় নিয়ে গেল বুঝলাম না। সমস্তদিন একটা আশঙ্কায় গায়ে কাঁটা দিতে লাগলো। সন্ধ্যাবেলা বড়মামাকে বললাম—কি ব্যাপার বড়মামা?

বড়মামা—ওই ছেলেটাই এই স্ট্রাইকটা করিয়েছে।

রাত্রিবেলা একটা গণ্ডগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বড়মামাকে একটা চাপরাশি ডাকতে এল। মজুরেরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলো ঘিরে ফেলছে। ইঁট আর পাথর ছুঁড়ছে থেকে থেকে সেই ক্ষিপ্ত জনতা হুঙ্কার ছাড়ছে—ডাক্তারবাবুকো ছোড়্দো।

বড়মামা গিয়ে চিৎকার করে জনতাকে আশ্বাস দিলেন—ডাক্তারবাবু আমার কাছে আছে ভাল আছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বিশ্বাস করো।

মাঠের দিক থেকে গুর্খা ফৌজের বিউগলের শব্দ শোনা গেল। বড়মামা হাতজোড় করে জনতাকে বললেন—ডাক্তারবাবুর জন্য আমি তোমাদের কাছে জামিন রইলাম। আমার কথা শোন, এখনি সরে পড় সব।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর ফটকটা আর কয়েকটা ফুলের টব ভেঙে দিয়ে ধর্মঘটী জনতা একটু মনের ঝাল মিটিয়ে সরে গেল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত একটা মানসিক উত্তেজনায় ঘুম আসেনি। সকালবেলা উঠতে একটু দেরি হলো। একটা খবর শুনেই কিন্তু মনটা হাল্কা হয়ে গেল। স্ট্রাইক মিটে গেছে। বড়মামা সালিশী করে সব নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। চার আনা নয়, মজুরির রেট দু'আনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তিনি আর কখনো এদিকে আসবেন না। ধর্মঘটি মজুরদের আর একটা দাবি স্বীকৃত হয়েছে—তিলক রায়ের কুলির দল নতুন রেটে মজুরি পেতে পারবে না। যা আগে পাচ্ছিল, তারা তাই পাবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার এই সর্ত মেনে নিয়েছেন।

তিলক রায় লোকটা আর তার ভাগ্যটা চিরকালই হেঁয়ালির মতো। এইখানে একটু দুঃখ রয়ে গেল। আমাদেরই ছেলেবেলার ভাট তিলক রায়। ওর মনের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তা ছিল। তাই বড়মামার ব্যবস্থাটা ন্যায়োচিত মনে হলো না। বড়মামা আমার আপত্তি শুনে হেসে ফেললেন—তিলকটা একটা গবেট, ঠিক হয়েছে।

বাঁধের কাজ জোরে এগিয়ে চলেছে। বর্ষার আগেই পিলারের কাজ শেষ করে ফেলতে

হবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শুনলাম, নতুন একটা এক্সক্যাভেটার এসেছে। বড়মামা খুব প্রসন্ন, শেয়ারের দাম চড়েছে।

ক'দিন পরেই তিলক রায় এসে মুখভার করে বললো—বড়বাবু, আমাদের সবাইকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বড়মামা—হ্যাঁ, আর তোমাদের দরকার নেই। নতুন মেশিনটা এসে গেছে, এখন ফালতু লোক ছেঁটে ফেলতে হবে।

তিলক—আমরা তো মাত্র এই ক'টি দেশী কুলি। সবারই কাজ রইল, শুধু আমাদের থাকবে না কেন বড়বাবু?

বড়মামা—ওরে বাবা, তোর মতো চার হাজার গেঁয়ো কুলির কাজ করে দেবে ঐ একটা এক্সক্যাভেটার। তারপর তোদের কত রকম মরজি আছে, স্ট্রাইক করবি, ঘুমোবি, ছুটি চাইবি। কিন্তু এক্সক্যাভেটার তা করে না। তাকে বিশ্বাস করা যায়। তোদের করা যায় না। যতদিন দরকার ছিল, ততদিন ছিলি। এইবার তোদের ছুটি।

তিলক—আমরা তো কখনো স্ট্রাইক করি নাই বড়বাবু।

বড়মামা—করতে পারিস তো। হঠাৎ মতিচ্ছন্ন হতে কতক্ষণ?

তিলক রায়কে দেখতাম, সমস্ত দিন ছুটাছুটি করে বেড়ায়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর বাইরে বটগাছটার ছায়ায় সকাল বিকেল বসে থাকতো তিলক। বড় সাহেবের কাছে একবার ধর্না দেবে—এই তার উদ্দেশ্য।

আর একদিন এসে তিলক বড়মামার কাছে প্রায় কেঁদে পড়লো—বড়বাবু আজ আমাদের চাক্‌তি আর কোদাল কেড়ে নিয়ে গেল।

বড়মামা—মিছামিছি পড়ে আছিস্ কেন তোরা? কতবার তো তোকে বলেছি এইবার তোদের চলে যাওয়া উচিত। যা ঘরে গিয়ে ক্ষেতখামার দেখ। একদিন তো যেতেই হতো।

তিলক—বিনা দোষে কোম্পানী আমাদের সর্বনাশ করে দিল বড়বাবু।

বড়মামা—কি বলছিস তিলক? তোরাই তো ভবিষ্যতের রাজা। এই খালগুলি দিয়ে যখন জল ছুটতে আরম্ভ করবে, তখন তোদের জমির দাম কোথায় গিয়ে উঠবে, ভাবতে পারিস? তোদের মাটিকে কোম্পানী যে সোনা করে দিল রে মূর্খ।

তিলক মাত্র আর একদিন এসেছিল। সেদিন ধাওড়া খালি করে দেবার জন্য ওদের ওপর অর্ডার হয়েছে। জোলা কুলিরা প্রায় সবাই তখনই এলাকা ছেড়ে গাঁয়ের পথে মেলা দিয়েছে। কুর্মিরা কিছু কিছু রয়ে গেছে। ধাওড়ার সামনে একটা পাকুড়গাছের তলায় একটা পাঁঠা বলি দিল কুর্মিরা। মাংস রাঁধলো, হাঁড়ি ভরে ভরে পচাই মদ কিনে আনলো। দুপুর থেকেই মাদল পিটিয়ে বিদায় উৎসবকে মাতিয়ে তুললো।

রাত্রিবেলা গার্ডদের চিৎকার দৌড়োদৌড়ি আর জলস্রোতের শব্দে আবার একটা অতিপ্রাকৃত কোন কাণ্ড ঘটেছে মনে হলো। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন। জেগে বসে আছি। প্রায় শেষ রাত্রে বড়মামা ফিরলেন।

বড়মামা বললেন—তিলক রায় খতম।

—কি হলো?

বারুদ দিয়ে একটা পিলার ব্লো করে দিয়েছে তিলক। বাঁধের একটা সাইডে ভয়ানক জলের চোট এসে লাগছে। আজ সারা রাত কাজ হবে।

—তিলক কোথায়?

—মরে পড়ে আছে, একেবারে থেঁতলে গেছে।

ভাট তিলক রায়ের জীবনী এইখানে শেষ। ভারতবর্ষের ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেশেন সম্পর্কে

প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, আজ এতদিন পরে তিলক রায়ের কথা প্রথমে মনে পড়ে গেল। ভাট তিলক যেন সত্যিই ইতিহাসের প্রেতের মতো। যখের মতো অতীতের যত অভিমান পাহারা দিত। বহুরূপী হয়ে সে আমাদের বর্তমানকে ব্যঙ্গ করতো। ভবিষ্যতকে সে সইতে পারলো না। তার সংশয়টাকে শেষ পর্যন্ত সে চরম সত্য বলে জেনে গেল। তিলক রায় যেন সেই প্রচণ্ড বন্য আত্মা—ক্যাপিটাল আর ইণ্ডাস্ট্রির কলের মারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করে যে ফুরিয়ে গেল।

মধুরেণ সমাপয়েৎ

জায়গাটার নাম যোগিবন। এখানে কোন যোগী মানুষ অবশ্য নেই, কিন্তু বন আছে অনেক। কোনকালে হয়তো কোন যোগী এখানে ছিলেন। কিন্তু কেমন করে যে ছিলেন, সেটা কল্পনা করেও বুঝতে চেষ্টা না করাই ভাল। আজও এখানে কোন মানুষ রাত্রিকালে কোন গাছের তলায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করবে না। জঙ্গলের ভালুক সন্ধ্যা হতেই রেল লাইনের সিগন্যালের খুঁটির কাছে চুপ করে বসে থাকে। ডাক-বাংলোর হাতার সূর্যমুখীর ঝোপের কাছ থেকে একজোড়া জ্বলন্ত সবুজ চোখ হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। এই যোগিবনে এখন বহু অযোগী মানুষের গৃহ ও গৃহস্থালী আছে ; জঙ্গলের গা ঘেঁষে একটা বস্তিও আছে। সে বস্তিতে সন্ধ্যাবেলা মাদলও বাজে ; আর এখানে-ওখানে ছোট ছোট বাড়িতে জাগন্ত জীবনের প্রদীপও জ্বলে। মাটির দেয়াল আর খাপরার চালা, ছোট ছোট বাড়ি। কিন্তু সেজন্য এই যোগিবনের চারদিকের ভয়ানক বন্যতা একটুও বিচলিত হয় না। রাতের নেকড়ে একেবারে ঘরের দুয়ারের কাছে এসে বসে থাকে। আখের ক্ষেতের কাছে যেখানে কুঁয়োর জল একটা গর্তের মধ্যে দু'চারটে রোগা ব্যাঙ নিয়ে ছুপছুপ করে, একটা রাত হলেই সেখানে হায়নার তেষ্টার জিভ চক্ চক্ শব্দ করে জল খায়।

হ্যাঁ, ছোট ছোট পাহাড়গুলিকে যোগী বলেই মনে হয়। যেমন দুপুরে তেমনই বিকালে ও সন্ধ্যায়, আর চাঁদের আলো থাকলে রাতের বেলাতেও এইসব ছোট-ছোট পাহাড়ের দিকে চোখ পড়লে মনে হবে, ভয়ানক কঠোর ও অবিচল এক-একজন যোগী বসে রয়েছেন।

এই নিদারুণ বন্যতার বুকের ভিতরেও কিন্তু মানুষের কাজ চলতে থাকে। সকাল থেকে বিকেল, ব্যস, তারপর আর নয়। জঙ্গলের ভিতরে পাথরের খাদের কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটায় পাথর-কাটা জংলী কুলীর দল। পালা করে জাগে, আর পালা করে ঘুমোয়। জঙ্গলের বাঁশ কাটবার জন্যে যে ঠিকেদার তার মোটর ট্রাক আর লোকজন নিয়ে সকালবেলাতে জঙ্গলে ঢোকে, সেও সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। রেলের সাইডিং-এর কাছে বাঁশের টাল নামিয়ে দিয়ে ঠিকেদারের মোটর ট্রাক তিরপল মুড়ি দিয়ে সারা রাত পড়ে থাকে। সে তিরপলের গায়ে রাতের নেকড়ের নখের আঁচড়ের শব্দ শুনে আশপাশের দশটা ট্রাকের মানুষ হল্লা করে নেকড়ে তাড়ায়।

এহেন যোগিবনে গৃহ গৃহস্থালী নিয়ে একজন নিতান্ত বাঙালী ভদ্রলোকও থাকেন, যাঁর নাম বিজয় বসু। এক পাথর সাপ্লাই কোম্পানীর চালানবাবু হলেন এই বিজয় বসু। কোম্পানীর হেডঅফিস কলকাতায়। ছ'মাসে ন'মাসে হেডঅফিস থেকে কোন একজন সুপারভাইজর আসেন। চালানবাবুর কাজের রকমসকম দেখে আর পাথরকাটার কাজের অসুবিধের কথা জেনে নিয়ে আবার কলকাতাতে ফিরে যান।

স্টেশনে গিয়ে ওয়াগনের বন্দোবস্ত করা, সাইডিং-এ ঘুরে ঘুরে ওয়াগনের পাথর

বোঝাইয়ের কাজ শুধু একবার চোখে দেখে নেওয়া, আর ঠিকাদারের খাতাতে হিসেবের অংকগুলিকে একবার পরীক্ষা করে নিয়ে সই দেওয়া ; এ ছাড়া চালানবাবুর চাকরিতে আর কোন দায়িত্বের ঝঞ্ঝাট নেই। তাই চালানবাবু বিজয় বসু অনায়াসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একজন নতুন আগন্তুকের সঙ্গে পুরো একটি ঘণ্টা গল্প করতে পারেন। ডাকবাংলোতে গিয়ে নতুন অভ্যাগতের পরিচয় জানতে পারেন। সুবিধে বুঝলে দু'এক ঘণ্টা গল্পও করে নেন। দিনে একবার ট্রেন আসে আর চলে যায়, এহেন স্টেশনে নতুন আগন্তুকের ভিড় নেই। যারা আসে, তাদের বেশির ভাগই কাছাকাছি দশ বারোটা জংলী গাঁয়ের মানুষ। তাদের হাতে তীর-ধনুক, কাঁধে একটা পুঁটলি, তার ভিতরে হয়তো এক-আধসের নুন আছে আর আছে কিছু শুকনো মহুয়া ফল। ট্রেন এলেই বিজয় বসুর চোখের দৃষ্টিটা একটা বেশী উৎসুক হয়ে ছটফট করে দেখতে চেষ্টা করে, কোন বাঙালী ভদ্রলোক এলেন কিনা।

ক্বচিৎ কখনও বাঙালী ভদ্রলোক আগন্তুকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর বিজয় বসুও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। নিজেই এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করেন। তারপর বিজয় বসু তাঁর আসল ইচ্ছার কথাটা বেশ জোর করে বলে দেন।—তা কী হয়, আপনি ডাকবাংলোতে থাকবেন কেন? এখানে আমার বাড়ি থাকতে কোন বাঙালী ভদ্রলোক ডাকবাংলোর অতিথি হবেন, এটা কী ভাল দেখায়?

আগন্তুক ভদ্রলোক অনেক আপত্তি করেও শেষপর্যন্ত বিজয় বসুর অনুরোধের কাছে নতি স্বীকার না করে পারেন না। আগন্তুক ভদ্রলোক যে দুটো-তিনটে দিন বিজয় বসুর বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকেন, সেই দুটো-তিনটে দিন যেন বিজয় বসুর বাড়ির জীবনের একটা উৎসব। বাড়ির সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বিজয় বসুর স্ত্রী শোভনা বসু কাঁচা পেঁপের ডালনা রাঁধেন। বিজয় বসু খোঁজ করেন, জঙ্গলের নালার জল থেকে অন্তত কিছু কুচো মাছ কাউকে দিয়ে ধরিয়ে আনতে পারা যায় কি না। বিজয় বসুর বড় মেয়ে টুলি, যার বয়স দশ বছর, সে'ও আগন্তুক ভদ্রলোকের কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসে আর জিজ্ঞেস করে—সুপুরি খাবেন?

আজ ট্রেন থেকে যিনি নামলেন, যাঁর নাম বি দত্ত, তিনি কিন্তু কিছুতেই বিজয়বাবুর অতিথি হতে রাজি হলেন না। ইনি বিজয়বাবুর কাছে আজ অবশ্য একজন অপ্রত্যাশিত হঠাৎ-আবির্ভাব নন। ইনি ওই পাথর কোম্পানীর কলকাতা অফিস থেকে আসছেন। ইনি হলেন, সুপারভাইজর বি দত্ত।

উপরওয়ালা মানুষ যেভাবে খুশি হয়ে কথা বলেন, দত্তবাবুও ঠিক সেই ভাবে খুশি হয়ে বিজয়বাবুকে জানিয়ে দিলেন—ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ডাকবাংলোতেই থাকবো।

বিজয়বাবু—আমার ওখানে থাকলে আপনার খুব বেশি অসুবিধে হবে না স্যার।

দত্তবাবু—হবে। আপনি বোধহয় সেটা বুঝতে পারছেন না।

বিজয়বাবু—কিন্তু ডাকবাংলোর খাওয়া-দাওয়া, অদ্ভুত রান্না, আর খানসামাটার কাণ্ড ; ওসব কি আপনার সহ্য হবে?

—হবে।

—খানসামাটা কিন্তু কানে শুনতে পায় না স্যার।

হেসে ফেলেন দত্তবাবু—আমি তো এখানে গান গাইতে আসিনি যে, ভাল কানওয়ালা একটা খানসামা দরকার হবে। দু'বেলা মুরগী ভাত করে দেবে, ব্যস, তাহলেই হয়ে গেল।

—এটা অবিশ্যি ঠিক বলেছেন স্যার ; আমার ওখানে মুরগী-ভাতের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন।

—তবে আর এত পীড়াপীড়ি করছেন কেন?

—আমাদের খুব ভাল লাগতো, সেই জন্যেই আপনাকে অনুরোধ করে বিরক্ত করছি।

—থাক এসব কথা। আপনি খাতাপত্র নিয়ে ডাকবাংলোতে কখন আসছেন?

—যখনই আসতে বলবেন।

—আজ রাত্রিতে আসুন।

—রাত্রিতে হবে না স্যার। এখানে সন্ধ্যা হলেই নেকড়ে ঘুরে বেড়ায়, আর, একটু রাত হলে আরও বড় জিনিস ঘুরঘুর করে।

হেসে ফেলেন দত্তবাবু।—তাহলে আজ বিকালেই আসুন।

বিজয়বাবু—যে আজ্ঞে।

সুপারভাইজর বি দত্ত দেরি না করে ডাকবাংলোর রাস্তায় এগিয়ে গেলেন ; আর বিজয় বসু চলে গেলেন তাঁর নিজের বাড়ির দিকে, স্টেশন থেকে সামান্য একটু দূরে ; পেঁপে গাছের একটা ভিড়ের কাছে যে বাড়ির খাপরার চালার উপর এখন একটা পাহাড়ী ময়না বসে রয়েছে।

২

মুরগী ভাত খেয়ে নিয়ে, ডাকবাংলার ঘরের একটা জানলার কাছে বসে যোগিবনের চারদিকের ভয়ানক বন্যতার রূপ দেখতে থাকেন দত্তবাবু। বন্দুকটা নিয়ে এলেই ভাল হতো। এই যে রাস্তাটা, এটাও যেন একটা অদ্ভুত বন্যতা। এই দুপুরেও একেবারে জনহীন।

চমকে ওঠে দত্তবাবুর দুই চোখ। একটা বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে আর আস্তে আস্তে হেঁটে স্টেশনের দিকে চলে যাচ্ছেন যে মহিলা, সে যে একজন খাঁটি বাঙালী মহিলা। বাঙালী মহিলা না হলে কি কোন মহিলা ঠিক ওভাবে শাড়ি পরে? মহিলার হাতে কয়েকটা চিঠি। বুঝতে অসুবিধে নেই, স্টেশনের ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলবার জন্যে মহিলা তাঁর মেয়ের হাত ধরে, আর যেন শীতের দুপুরের রোদে একটু বেড়িয়ে নেবার আনন্দ নিতে এখন বের হয়েছেন। এখানে তো সন্ধ্যা হলেই নেকড়ে ঘোরে ; তাই বোধহয় দুপুরে বিকেলে বেড়িয়ে নেওয়া এখানকার নিয়ম।

মহিলা হেসে হেসে তাঁর মেয়েকে কী যেন বলছেন। এইবার মহিলার মুখটাকে একেবারে স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সুপারভাইজার দত্তবাবুর দুই চোখ এইবার যেন দুঃসহ একটা বিস্ময়ের ঝড়ের মধ্যে পড়ে ছটফট করতে থাকে, সত্যিই কি শোভনা? এই পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে শোভনা শেষে এই ভয়ানক বন্যতার যোগিবনে এসে ঠাঁই পেয়েছে?

দত্তবাবুর দুই চোখ যেন পনের বছর আগের চোখ হয়ে এক পরিচিতার মুখ দেখছে। হ্যাঁ, সেই শোভনা, যার পনের বছর আগের সেই প্রাণটা এই বিলাস দত্তের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। রাঁচিতে বিলাস দত্তের বাড়ি যে-পাড়াতে, সেই পাড়াতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন যে প্রতুল ঘোষ, তাঁরই মেয়ে শোভনা। মাড়োয়াড়ীর কাপড়ের দোকানের কেরানী প্রতুল ঘোষের মেয়ে শোভনা সেদিন বিলাস দত্তের কাছ থেকে যেন একটা সান্ত্বনার কথা শোনবার জন্যে মরিয়া হয়ে কত কাণ্ডই না করেছিল। বিলাসের বাড়িতে নিজেই গিয়ে বিলাসের বোনের হাতে উপহার দিয়ে এসেছে শোভনা, নিজের হাতে রঙীন সুতোর কাজ করা একটা টেবিল ক্লথ। বিলাসের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কা'কে লক্ষ্য করে এই উপহার দিয়ে গেল শোভনা। যখন-তখন এসেছে শোভনা ; বিলাসের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলেছে, কেমন আছেন? নিজের হাতের তৈরী খাবার কতবার নিয়ে এসেছে ; কখনও ঢাকাই পরোটা, কখনও নারকেলপুলি। বিলাসের জন্মদিনে মস্ত বড় একটা ফুলের তোড়াও পাঠিয়েছিল শোভনা। আজও মনে পড়ে বিলাস দত্তের, শোভনার সেই বারবার ছটফটে যাওয়া-আসা আর উপহারের রকম দেখে বিলাসের বাড়ির সকলেই একটু চিন্তিত হয়েছিল। শোভনা নিশ্চয় জানে না যে, বিলাসের বিয়ে একরকম ঠিক হয়েই আছে। আর বিলাসও একরকম ধরেই নিয়েছে যে, পাটনার ডাক্তার জনার্দনবাবুর মেয়ে রেবার সঙ্গে

বিলাসের বিয়ে হবে। পুরো একটা বছর বিলাসের জন্য মনেপ্রাণে একা আশা জাগিয়ে রেখে, তারপর নিরস্ত হয়েছিল শোভনা। কে জানে কেন হঠাৎ দমে গেল শোভনা। বিলাসদের বাড়িতে ছ'মাসের মধ্যেও যখন শোভনাকে আসতে না দেখে খোঁজ নিয়েছিল বিলাসের বোন সুজয়া, তখন জানতে পেরে একটু আশ্চর্য হয়েছিল, যেমন সুজয়া তেমনি বিলাস, মাত্র এক সপ্তাহ হলো শোভনারা চলে গিয়েছে।

রাস্তাতে আর সেই ছবি নেই। শোভনা তার মেয়ের হাত ধরে স্টেশন থেকে আবার কোন্ পথে চলে গেল কে জানে? কিন্তু ও কী সত্যিই শোভনা?

খাতাপত্র হাতে নিয়ে ডাকবাংলোর বারান্দাতে এসে দাঁড়িয়েছেন বিজয় বসু।

—আমি এসেছি স্যার।

—আসুন। আচ্ছা একটা কথা। আপনি বিয়ে করেছেন কোথায়?

বিজয় বসু—চন্দননগরে।

চমকে উঠলেন দত্তবাবু, তবু হাসেন—শুধু চন্দননগর বললেই তো সব বলা হলো না।

বিজয়বাবু—আমার শ্বশুর মশাইয়ের নাম প্রতুল ঘোষ। উনি চিরকাল বাইরে বাইরে, ধানবাদ, রাঁচি, টাটানগরে কাজ করে শেষে চন্দননগরে এসে দেহরক্ষা করলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন দত্তবাবু। একটা খাতা হাতে তুলে নিয়ে আনমনার মত জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিজয়বাবু—আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে তো স্যার?

দত্তবাবু হাসেন—হ্যাঁ, হয়েছে, কিন্তু খুব শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।

—আজ্ঞে?

—এ মুরগী তো মুরগী নয়, যেন শকুন। যেমন চিমসে, তেমনই শক্ত। দাঁতে ছেঁড়ে কার সাধ্যি?

—এঃ, তা হলে তো খুব দুঃখের ব্যাপার হলো।

—তার উপর ঝাল, শুকনো লংকা গুলে দিয়েছে।

—সর্বনাশ!

—তা ছাড়া, আপনাদের ডাকবাংলোর এই নেয়ারের খাট তো খাট নয়, ছারপোকার কলোনি। জিরোবার জন্য একটু শুয়েছিলাম মশাই, কিন্তু এক মিনিট পরেই লাফিয়ে উঠতে হলো। শোয়া তো নয়, একেবারে ভীষ্মের শরশয্যা।

বিজয়বাবু আবার আক্ষেপ করেন।—এঃ, আপনার তো এখানে তাহলে খুবই কষ্ট হচ্ছে। কী করে আরও দুটো দিন কাটাবেন?

দত্তবাবু—তাই তো ভাবছি। তার ওপর আপনি আবার যে-ভয় দেখিয়ে রেখেছেন।

—আজ্ঞে? কিসের ভয় দেখালাম!

—ওই যে বললেন, সন্ধ্যা হতেই যত নেকড়ে-টেকড়ে আর রাত হতেই আরও বড় জিনিস...।

বিজয়বাবু হাসেন—কিন্তু ডাকবাংলোর ঘর-দরজা তো সবই পাকা আর মজবুত ; ভয় করবার কিছু নেই।

দত্তবাবু—তার ওপর একটা সমস্যা হচ্ছে, এই বধির খানসামা। চেঁচিয়ে ডাকলেও কোন সাড়া দেয় না। চেয়েছিলাম একটু গরম জল ; দিয়ে গেল একটা লেবু আর কুচানো পেঁয়াজ।

বিজয়বাবু হাসেন—আপনি তাহলে একটা বিপদেই পড়েছেন, দেখছি।

দত্তবাবু—আরও দেখুন, এই ডাকবাংলাতে এখন একটিও গেস্ট নেই। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে যে এক-আধ ঘণ্টা মনের সুখে গল্প করবো, তারও উপায় নেই। নাঃ, ভাবছি আপনার ওখানেই চলে যাব, বিজয়বাবু।

বিজয়বাবু—আমাকে বড় লজ্জায় ফেললেন ; আমার বাড়ির বাইরের ঘরে তো এখন আপনার জন্যে সামান্য একটু স্থান করে দেবারও উপায় নেই। আজ স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের তিন শ্যালিকা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচটি ছেলেমেয়েও আছে। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে বলতে গেলে শুধু একটা ঘর ; কাজেই মাস্টারমশাইয়ের কুটুম্বিনীদের আজ আমারই বাড়ির বাইরের ঘরে থাকতে হবে।

দত্তবাবু এবার বেশ একটু চিন্তিতভাবে কথা বলেন—এখানে আমার খাওয়া-দাওয়ারও তো খুব অসুবিধে হচ্ছে। দরকার নেই মশাই মুরগী-ভাত, আপনি আমাকে একটু ডাল-ভাত খাওয়ান। এখানে বাঙালীর বাড়ির একটু সুক্তো ঘণ্ট আর ছেঁচকি খেতে পেলে ধন্য হয়ে যাব।

বিজয়বাবু—নিশ্চয় নিশ্চয়। কাল দুপুরবেলাটা তাহলে আমার ওখানেই ডাল-ভাত খাবেন।

দত্তবাবু—খাতাপত্র আজ থাকুক। এখন আর হিসেব করতে মন চাইছে না। আপনি বরং বাড়ি যান। আর, আমি এখানেই...কী আর করবো, চুপ করে যোগীর মত বসে থাকি।

চলে যাচ্ছিলেন বিজয়বাবু, কিন্তু দত্তবাবু ডাকলেন—শুনছেন!

বিজয়বাবু—কী?

দত্তবাবু—আপনি বোধহয় শুধু জানেন যে, আমি হলাম বি দত্ত। আমার পুরো নামটা জানেন কি?

বিজয়বাবু—না।

দত্তবাবু—আমার নাম বিলাস দত্ত।

বিজয়বাবু হাসেন—আমার কাছে বি দত্ত যা, বিলাস দত্তও তা। আমি তো ভুলতে পারি না যে, আপনি আমাদের সুপারভাইজর। আপনাকে তো আমি নাম ধরে ডাকতে পারি না, স্যার।

দত্তবাবু হাসেন—ঠিক কথা। আমি বলছি এই কারণে যে, কেউ হয়তো হঠাৎ আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, বি দত্তের পুরো নামটা কী?

বিজয়বাবু—আচ্ছা, আমি এখন চলি। কাল দুপুরে আমিই এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।

৩

বিজয় বসুর বাইরের ঘর। স্টেশন মাস্টারের কুটুম্বিনীরা, যাঁরা কাল রাতে এ-ঘরে ছিলেন, তাঁরা চলে গিয়েছেন। আজ এখন এই ঘরটি একটি পরিচ্ছন্ন অভ্যর্থনার ঘর। একটি তক্তপোষের উপর নতুন সতরঞ্চি পাতা। ছোট একটা টেবিল, তার উপরে রঙীন সুতোর কাজ করা একটা সাটিন কাপড়ের ঢাকা। টেবিলের উপর চীনেমাটির একটা ফুলদানি, তার মধ্যে টাটকা ফুলের একটা গুচ্ছ।

ঘরে ঢুকেই বেশ প্রসন্নভাবে হাসতে থাকেন সুপারভাইজর বিলাস দত্ত—বাঃ, চমৎকার ফুল।

বিলাস দত্তের চোখে যেন পনের বছর আগের এক অভ্যর্থনার বিস্ময় চিকচিক করে হাসতে থাকে। সে অভ্যর্থনা এখনও যে সত্যিই টাটকা ফুলের গুচ্ছ হয়ে বিলাস দত্তের চোখের সামনেই এসেছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকেন, আর ভাবতে গিয়ে ফুলদানির গায়ে হাত বোলাতে থাকেন বিলাস দত্ত ; শোভনা যে সত্যিই আজও তার পনের বছর আগের আশার মানুষটাকে ভুলে যেতে পারেনি।

ঘরের দরজার দিকে তাকালেন বিলাস দত্ত। আজ কী কথা বলবে শোভনা, যখন এই দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে আর বিলাস দত্তকে দেখতে পাবে? সেই শোভনা, যে প্রতি মাসে অন্তত তিনবার বিলাস দত্তের রাঁচির বাড়িতে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর

জিজ্ঞেস করেছে, কেমন আছেন? আজও শোভনার এই জিজ্ঞাসার জবাবে বলে দিতে পারবেন বিলাস দত্ত, আমি ভাল আছি, কিন্তু তুমি কেমন আছ, শোভনা?

কিন্তু অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। বাড়ির ভিতরে শুধু বিজয়বাবুর হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। শোভনা কি এখনও জানতেই পারেনি যে, সেই বিলাস দত্ত এখন এই ঘরে বসে রয়েছে। শোভনা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে, তার পনের বছর আগের একজন ভালবাসার মানুষ আজ এতদিন পরে এই জঙ্গলে ঘেরা যোগিবনে এসে তারই সমাদরের অতিথি হবে?

ঘরে ঢুকলেন বিজয়বাবু—আর দেরি নেই, স্যার। হঠাৎ দুটো বেগুন পেয়ে গিয়েছি, তাই বললাম, ভাজা করে দাও। ভাজা হয়েও গিয়েছে।

বিলাস দত্ত—ভাজা-টাজা না হলেও চলতো। আমিও ভাজার অপেক্ষায় বসে সময় নষ্ট না করে, দুটো কথা বলে সময় নষ্ট করতেই ভালবাসি। কিন্তু কেউ তো এখনও...।

বিজয়বাবু—আজ্ঞে?

বিলাস দত্ত—আপনার গৃহিণী নিশ্চয় সেকেলে ধরনের মানুষ নন।

বিজয়বাবু—ঠিক উল্টো। বড় বেশি একেলে। কোন লজ্জা-টজ্জার ধার ধারে না। মাঝে মাঝে আমার সাইকেলটা নিয়ে নিজেই চালিয়ে স্টেশনে চলে যায় আর ডাকের চিঠি ফেলে দিয়ে আসে।

বিলাস দত্তের চোখের তারা চমকে ওঠে আর ছটফট করে।—বলেন কি? যাই হোক্, গৃহিণীকে এখন বলুন, আমি দুটো ডাল-ভাত খেয়ে নিয়ে সরে পড়তে চাই। ভাজা না হলেও চলবে।

বিজয়বাবু হাসেন—বেগুন ভাজবে আমার মেয়ে টুলি। গৃহিণী এখন স্টেশনমাস্টারের বাড়িতে তাঁর একদিনের চেনা বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করতে ব্যস্ত রয়েছেন।

—হ্যাঁ? উনি এখন বাড়িতে নেই?

—না।

—উনি কি জানেন না যে, আজ একজন অতিথি তাঁর বাড়িতে আসবেন?

—জানেন বইকি। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের কুটুম্বিনীরা আজই চলে যাবেন। তাই তাদের সঙ্গে শেষ গল্প করে নিতে চলে গেলেন।

—উনি কি জানেন না যে, বি দত্ত মানে বিলাস দত্ত?

—জানেন বইকি। আমিই তো বলে দিয়েছি।

বিলাস দত্ত আবার হঠাৎ আনমনার মত টেবিলের ফুলদানির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একটা কথা যেন তাঁর মনের হঠাৎ-আকুলতার ভাষার মত মুখ থেকে বের হয়েই পড়ে। উনি ঘরে না থাকলেও সব ব্যবস্থা বেশ ভালমত করে রেখে দিয়েছেন. দেখছি।

বিজয়বাবু—আজ্ঞে, কী বললেন?

বিলাস দত্ত—টাটকা ফুলের তোড়াকে সাজিয়েছেন ভাল। ফুল আর পাতা এভাবে কায়দা করে মিশিয়ে দিয়ে...।

বিজয়বাবু—ফুলের তোড়া আমিই বেঁধেছি। এটা আমার পুরনো অভ্যেস।

বিলাস দত্তের চোখ দুটো হঠাৎ কুঁচকে যায়—তাই নাকি? কিন্তু এই টেবিল ক্লথের রঙিন সুতোর কাজ তো আপনার হাতের কাজ নয়। এটা নিশ্চয় আপনার স্ত্রীর হাতের একটা চমৎকার কাজ।

বিজয়বাবু—না না না, এটা আমার বাড়ির জিনিসই নয়। এটা স্টেশনমাস্টারের বাড়ি থেকে আমি আনিয়েছি।

বিলাস দত্ত—কেন? আপনার বাড়িতে কি কোন টেবিল ক্লথ নেই?

বিজয়বাবু—অনেক অনেক আছে। কিন্তু গৃহিণীই বললেন, স্টেশনমাস্টারের বাড়ি থেকে

একটা টেবিল ক্লথ আনিয়ে নাও।

গম্ভীর হয়ে গেলেন সুপারভাইজার বিলাস দত্ত। খুব গম্ভীর। যোগিবনের জঙ্গলের বাতাসে সত্যিই ভয়ানক বন্যতা আছে ; এখানে এসে চাঁপা ফুলও বোধহয় ধুতরাফুল হয়ে যায়।

বিজয়বাবু ডাকলেন—হরিরাম, জলদি কর।

আদুড়ে গা আর একটা আধময়লা খাটো ধুতি পরা, চাকর হরিরাম এসে ঘরে ঢোকে। আসন পাতে আর এক গেলাস জল রেখে যায়।

—বসুন স্যার। বিলাস দত্তকে খেতে বসতে ইঙ্গিত করেই চলে যান বিজয়বাবু আর তখনই নিজেই ভাতের থালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। ভাতের থালা আসনের সামনে রেখে দিয়ে বিজয়বাবু আবার একটা থালায় চারটে বাটি নিয়ে ফিরে আসেন। ডাল, পেঁপের ডালনা, বেগুন ভাজা আর আলুর দম।

খেতে বসেন আর খেতেও থাকেন বিলাস দত্ত। কিন্তু খেতে গিয়ে অদ্ভুত রকমের এক-একটা ভুল করতে থাকেন। গরম ডালের বাটিতে মিছিমিছি হাতটাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। জ্বলছে হাতটা। আলুর দম পাতে ঢেলে তার উপর একটা বেগুন ভাজাকে চটকে দিলেন। এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে তিনবার জল খান বিলাস দত্ত।

বিজয়বাবু হাসেন—পেঁপের ডালনাটা ফেলে দেবেন না, স্যার। খেয়ে দেখুন, আপনার ভালই লাগবে মনে হয়। ঘি-ফোড়ন দিয়ে ডালনা করা হয়েছে, খাঁটি গাওয়া ঘি।

বিলাস দত্ত—আপনার স্ত্রী রান্নার হাত তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে।

—না না, আজ সবই হরিরাম রেঁধেছে। আমার স্ত্রী এরকমের একটা আধা-জংলী চাকরকেও বাঙালী রান্না শিখিয়ে ছেড়েছে। বলতে বলতে শেষে হেসেই ফেললেন বিজয় বসু।

বিলাস দত্তের হাত কাঁপে ; দুপুরবেলার এমন চনমনে ক্ষুধার মুখটাও যেন বিস্বাদে ভরে যায়। তবু খেতে থাকেন বিলাস দত্ত।

বিজয়বাবু শেষে আরও একবার উঠে গিয়ে এক বাটি পায়েস নিয়ে আসেন আর বিলাস দত্তের হাতের কাছে রেখে দিয়ে, আর খুবই বিনীতভাবে কথা বলেন—এই বার মধুরেণ সমাপয়েৎ। আমার স্ত্রী অবিশ্যি...।

হেসে ওঠে বিলাস দত্তের দুই চোখ—তাই বলুন, আর কিছু করতে না পেরে অতিথির জন্য যে এই পায়েসটুকু নিজের হাতে তৈরী করতে পেরেছেন আপনার স্ত্রী, সেটাই যথেষ্ট।

বিজয়বাবু—আজ্ঞে না, এই পায়েস স্টেশনমাস্টারের স্ত্রী আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক ডেক্‌চি পায়েস, স্যার।

সামান্য একটু পায়েস মুখে দিয়েই উঠে পড়লেন বিলাস দত্ত। তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে নিলেন। তারপর আর ঘরের ভিতরের তক্তপোষের উপরও বসলেন না।

বাইরে এসে দাঁড়িয়েই ডাক দেন বিলাস দত্ত—আমি চলি।

বিজয়বাবু ছুটে আসেন—এখনই যাবেন?

বিলাস দত্ত—হ্যাঁ।

বিজয়বাবু—আপনার বেশ কষ্ট হলো, স্যার।

বিলাস দত্তের চোখ দুটো কেঁপে ওঠে ; মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া মানুষ মাথা তুলতে চাইলে তার চোখ দুটো যেমন করুণ হয়ে কাঁপে আর জ্বলে। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন বিলাস দত্ত—হ্যাঁ, বেশ কষ্ট হয়েছে। আমি এখন চলি।

মা হিংসীঃ

'অজস্র প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, আসামী গিরধারী গোপ বহুদিন আগে থেকেই হিংস্র হয়ে উঠছিল। বর্তমান মামলা আসামীর সেই বিকৃত জীবন ও স্বভাবের চরম পরিণাম। পৃথিবীতে পত্নীনির্যাতন নামে এক ধরনের লোক দেখা যায়, আসামী গিরধারী বোধহয় নিষ্ঠুরতায় সেই অপমানবদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অন্যতম। প্রতিদিন ও প্রতিকথায় সে তার স্ত্রীকে অকথ্য প্রহার অত্যাচার ও নির্যাতন করত।'

চারজন অ্যাসেসর অবিচল আগ্রহ নিয়ে ছোট ছোট বিষণ্ন পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিল, আর দায়রা জজের রায় শুনছিল।

রায় পড়তে পড়তে দুতিন মিনিট পর পর দায়রা জজ যেন ঢোঁক গিলবার জন্য থেমে যাচ্ছিলেন। রুদ্ধ শ্বাসবায়ু মুক্ত করে দিয়ে নতুন বাতাসে দম ভরে নিচ্ছিলেন।

একটা শব্দহীন ভিড় আদালতকক্ষে জমাট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাণের ধুকপুক শব্দগুলি যেন প্রত্যেকের বুকের কোটরে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। প্রত্যেকের নিঃশ্বাস থেকে, প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি থেকে কিছুক্ষণের জন্য সকল চঞ্চলতা যেন নির্বাসিত, যেন একটু নড়ে উঠলেই এই মুহূর্তের শোকাক্রান্ত ছন্দের লয় ক্ষুণ্ন হবে। শুধু ব্যস্ত ছিল পাংখাকুলিটা, মেঝের উপর প্রায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে, যেন আক্রোশের সঙ্গে অবিরাম পাখার দড়ি টানছিল। এজলাসের মাথার উপর পাখার ঝালর একঘেয়ে শব্দ করে চলেছে—ঝট্পট্ ঝট্পট্ ঝট্পট্। আজকের কাহিনীর সকল যন্ত্রণাকে যেন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে চায় ঐ পাখা।

এক-একটা বিরামের পর, রায় পড়তে গিয়ে দায়রা জজের গলাটা অস্পষ্টভাবে ঘড়ঘড় করে, পরমুহূর্তেই বেশ স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে।

'আসামী গিরধারী গোপের এই হিংস্রতার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। আসামী ইচ্ছা করেই নিজেকে হিংস্র করেছিল, বেশ ভেবে-চিন্তে সে এই পথ ধরেছিল, তার মনের ভিতর একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। আসামী গিরধারী তার প্রতিবেশী সহদেব গোপের তরুণী পত্নী শনিচরীর প্রতি আকৃষ্ঠ ছিল। হাবেভাবে ইঙ্গিতে এবং স্পষ্ট ভাষায় সে বহুবার শনিচরীর প্রতি প্রণয় প্রস্তাব করেছে। গিরধারীর ধারণা হয় যে, তার নিজ বিবাহিত পত্নী রাধিয়া যতদিন তার ঘরে আছে, ততদিন শনিচরীর প্রতি তার ঐ অভিলাষ সফল হবার আশা নেই। রাধিয়া তার পথের কাঁটা। রাধিয়ার উপর আসামীর সকল অত্যাচারের রহস্য হলো, পথের কাঁটাকে সে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।'

'আসামী বলেছে যে, সে তার স্ত্রী রাধিয়ার চরিত্রে সন্দেহ করত। আসামীর সব সময় আশঙ্কা ছিল যে, রাধিয়া তাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টায় আছে। সেই হেতু আসামী তাকে মারধর করেছে, তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। আসামীর স্ত্রী রাধিয়া জেরার উত্তরে বলেছে যে, আসামী তাকে কখনো মারধর করেনি। এই দুই উক্তিই অবিশ্বাস্য।'

মুখ তুলে তাকাল গিরধারী। কাঠের খাঁচার মতো আসামীর ডক, তার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে সম্মুখের ঘটনার স্পর্শ থেকে নিজেকে আড়াল করে আর চুপ করে বসেছিল গিরধারী গোপ! জজ সাহেবের বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে একমাত্র ওরই যেন এতক্ষণ কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়েছে গিরধারী। ওর দুচোখে একটা অদ্ভুত রকমের কৌতূহল ফুটে উঠেছে। ওর সমগ্র জীবনের এলোমেলো অর্থহীন ও ভাঙাছেঁড়া ভাষাগুলি সুন্দর একটা কাহিনী হয়ে গিয়েছে। হোক না ইংরাজী ভাষা, প্রত্যেকটি ধ্বনিতে একটা নতুনত্ব আছে। রাধিয়া। রাধিয়া। জজসাহেব উচ্চারণ করছেন, এই নামটার কোন ইংরাজী করা যায় না। ঐ

নামটাকে বদলানো যায় না।

'শেষ পর্যন্ত রাধিয়া টিকে থাকতে পারেনি। আসামীর হাতে নিগ্রহ অসহ্য হওয়ায় সে বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর এক মাসের মধ্যে ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরে যায়।

'আসামীর প্রস্তাবে শনিচরী রাজী হয়নি। গত অক্টোবরের পয়লা তারিখে, ভোরবেলায় কুয়াশার মধ্যে শনিচরী জল আনবার জন্য কলসী হাতে গ্রামের বড় ইঁদারার দিকে চলেছিল। পথের পাশে আখের ক্ষেতের ভিতর আসামী গিরধারী একটা হেসো নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। ঠিক হিংস্র প্যান্থারের মত গিরধারী আখের ক্ষেত থেকে লাফ দিয়ে বের হয়, শনিচরীর গলার উপর তিনটি পোঁচ দেয়। শনিচরী সেইখানে দাঁড়িয়ে একবার চিৎকার করে, তারপরেই প্রাণহীন হয়ে পড়ে যায়।

'গিরধারী গোপ যখন এই কাজ করছিল, গ্রামের তিনজন চাষী তাকে দেখতে পায় ও চিনতে পারে। আসামী পালিয়ে গিয়ে ফেরার হয়। পাঁচদিন পরে কাটিহার বাজারে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

'আসামী তিনবার অপরাধ স্বীকার করেছে, তিনবার অপরাধ অস্বীকার করেছে। সকল সাক্ষ্য প্রমাণ ও তদন্তের হিসাব নিলে এ বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় থাকে না এবং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, গিরধারী গোপ শনিচরীকে বেশ একটা মতলব করে আর প্রতিহিংসাবশে খুন করেছে।

'এক্ষেত্রে আসামীর প্রতি সুবিচার করার জন্য আমি তাকে চরম দণ্ড—প্রাণদণ্ড দিলাম।'

ঝটপট, ঝটপট, ঝটপট—ঝালর-লাগানো প্রকাণ্ড পাখাটা সশব্দে দুলতে থাকে। আদালত-ঘরে আর কোন শব্দ ছিল না। জনতা শুধু নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছিল গিরধারী গোপের মূর্তিটার দিকে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, রোগা চেহারার গিরধারী। চোখের কোল দুটো কালো, যেন বেশ মোটা সুর্মা লেপে দেওয়া হয়েছে। দু'হাতে হাঁটু দুটোকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে পা দোলাচ্ছিল গিরধারী।

জজসাহেবের গলা ঘড়ঘড় করে উঠল, হিন্দী ভাষায় বললেন—'আসামী গিরধারী গোপ, তোমার অপরাধ সবুদ হয়েছে, তুমি মুসাম্মত শনিচরীকে খুন করেছ। মহামান্য সরকারের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার নির্দেশ-মতো আমি তোমাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। তোমাকে দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তোমার প্রাণ শেষ হয়ে যায়।'

—বহুৎ আচ্ছা!

গিরধারী উত্তর দিল। শানিত বিদ্রূপের হিংসামাখা একটা ক্ষুদ্র প্রতিধ্বনি যেন আদালত-ঘরের স্তব্ধতাকে খান্‌খান্‌ করে দিল। ডকের চারদিকে পুলিশেরা উঠে দাঁড়াল। উকিল-মোক্তারের দল একে একে আসন ছেড়ে বাইরে চলে গেল। জনতা টলমল করে একবার ডকের দিকে কৌতূহলের আবেগে ঝুঁকে পড়ল। পুলিশ বাধা দিয়ে জনতা সরিয়ে দিতে থাকে—আগে চলো! আগে চলো! রাস্তা ছাড়ো, খবরদার!

কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া, গিরধারী গোপ আদালত-ঘর ছেড়ে হেঁটে চলল। তার আগুপিছু দু'দিকে প্রহরী। দু'পাশে তিন-তিনজন করে বন্দুকধারী পুলিশ। গিরধারীর প্রতিটি পদক্ষেপ শান্ত ও নির্ভুল। কিন্তু প্রহরীদের উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার সীমা ছিল না। আদালতের সিঁড়ি থেকে অপেক্ষমান হাজতগামী পুলিশ-লরিটা পর্যন্ত বড়জোর দেড়শো গজ পথ। এইটুকু পথ পার হতে হবে, তবু হাবিলদার তিনবার অ্যাটেনশন আর দশবার লেফ্‌ট রাইট হাঁক দেয়। ধুপধাপ বুট ঠোকাঠুকি চলে। তবু এতদিনের প্যারেডে অভ্যস্ত পায়ের কদম বার বার ভুল হয়ে যায়। এদিকে দু'জন পুলিশ হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যায় তো ওদিকে একজন হোঁচট খেয়ে পিছনে পড়ে থাকে।

গিরধারীর কোমরের দড়ির একপ্রান্ত শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে এমন জোয়ান চেহারার

সিপাহীটাও হাঁপাতে থাকে। হাবিলদারের হাতের ছড়ির ইঙ্গিতের তালে তালে বন্দুকধারীরা শরীর দুলিয়ে এক ঢঙে কদম ফেলবার চেষ্টা করে। স্বেদাক্ত কপালের রগ দপদপ করে কাঁপে। বড় বেশি উৎকণ্ঠা, বড় বেশি উদ্বেগ, ভয়ানক রকমের দায়িত্ব। সাধারণ আসামী নয়। এক জঘন্য খুনের আসামী, তার পরমায়ু নিলামে বিকিয়ে গিয়েছে আজ। তাই তার আজ এত দাম। তাই এত সাবধানতা। রোগা গিরধারী গোপের ছোট ফুসফুসটাকে লোহার আবরণ দিয়ে ঘিরে নিয়ে যেতে পারলেই ভাল ছিল। ওর গায়ে যেন এককণা ধুলো না লাগে, ওর কানে যেন পাখির ডাকের শব্দ না পৌঁছয়। কে জানে কোথা থেকে কোন্ ফাঁকে কোন্ বে-আইনী সূর্যের রক্তমাখা আলোক ওর চোখের দৃষ্টিকে উতলা করে দেবে? হয়তো থমকে দাঁড়াবে, আকাশের দিকে তাকাবে, নড়তে চাইবে না। গিরধারীর জীবনে আজ এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ অবান্তর হয়ে গিয়েছে। আলগোছে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে গিরধারীকে। ফাঁসির আসামীর বুক যেন আনন্দে দুলে না ওঠে, ছিঁড়ে যেতে পারে। যেন চমকে না ওঠে—ফেটে পড়তে পারে। তাহলে এতবড় মামলার ঘটা, আইনদুরস্ত পৃথিবীর এত বন্দোবস্ত, সব ভেস্তে যাবে। কোন রোগীকে, কোন মুমূর্ষুকে, কোন আহতকে এক সতর্ক সমাদরে কোনদিন তারা বহন করেনি।

পুলিশ-লরির ভিতর পা দিয়েই গিরধারী একবার বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। কাউকে যেন সে খুঁজছে।

হাবিলদার ব্যস্তভাবে বলল—ইঁহু, বসে পড়। দেখবার মতো কিছু নেই।

গিরধারী হেসে ফেলল—আপনি ঠিক বলেছেন হাবিলদার সাহেব। আর দেখবার কিছু নেই, কেউ আসেনি।

আদালত এলাকার সীমা ছাড়িয়ে পুলিশ-লরি দ্রুতবেগে দৌড়ে চলেছে। প্রহরীরা যেন একটু স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। আসামী লোক ভাল। কোন দৌরাত্ম্য করল না। আসামী একেবারেই ছিঁচকাঁদুনে নয়, একবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল না, হা-হুতাশ করল না। এই ধরনের আসামীর হেপাজত নিয়ে বেশ ভাল লাগে। কোন হাঙ্গামা সইতে হয় না।

মাথার পাগড়ি খুলে পাশে রাখল সিপাহীরা। কপালের ঘাম মুছল। গিরধারীর দিকে একটু করুণাভরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তারা বার বার তাকিয়ে দেখতে থাকে। মনে হচ্ছে, লোকটার প্রাণ বেশ পোক্ত ধাতুতে তৈরী, একটুও ঘাবড়ায়নি।

অর্জুন সিং বলে—শেষ পর্যন্ত এই রকম দেমাক নিয়ে টিকতে পারলে ভাল। কোন কষ্ট পাবে না।

হাবিলদার সন্দিগ্ধভাবে উত্তর দেয়—হুঁ।

ভগীরথ পাণ্ডে হাতের চেটোয় এক-টিপ খৈনি নিয়ে জোরে জোরে টিপতে আরম্ভ করে। আলোচনায় যোগ দেয়—হ্যাঁ, আর ঘাবড়ে গিয়েই বা লাভ কি? জোরসে রাম নাম কর, আর শখসে ঝুলে পড়। ভয় করবার কিছু নেই।

ঠোঁট কুঁচকে গিরধারী আর একবার হাসল। সিপাহীদের দিকে তাকিয়ে যেন একটু তাচ্ছিল্য করেই বলল—আপনারা কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন? মনে হচ্ছে, আপনারাই ঘাবড়ে গিয়েছেন। বড় বেশি প্রেম দেখাচ্ছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি ফাঁসি যাব না।

সিপাহীরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে শুকনো মুখে হাসতে থাকে—মাপ কর ভাইয়া। বেশ, তোমার কথাই ঠিক। তোমার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছা নেই আমাদের।

হাবিলদার গিরধারীর মুখের দিকে তীব্র একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইল। তারপরেই পাশের সিপাহীরা কানের কাছে ফিস্ফিস্ করে বলল—দেখছ, ওষুধ ধরে গিয়েছে। এরই মধ্যে মাথার গোলমাল শুরু হলো। হতেই হবে, মানুষ তো আর লোহার তৈরী নয়।

কনস্টেবল সাকির আলি বলে—বোধহয় আপীল করবে বলে ঠিক করেছে।

হাবিলদার ঠাট্টা করে—হুঁ, আপীল করবে! ওর সংসার বিক্রী করলে দশটা টাকাও হবে না। এক নম্বরের দরিদ্র, আপীল করবে কোথা থেকে?

অর্জুন সিং—তবে ও কি বলতে চায়?

হাবিলদার—বলতে চায় ওর মাথা আর মুণ্ডু। বুদ্ধি বিগড়ে যাচ্ছে, আর কদিনেরই মধ্যেই...।

গিরধারী হঠাৎ এক-টিপ খৈনি চায়। হাবিলদার একটু দয়ার্দ্রস্বরে আপত্তি জানায়—মাপ কর ভাইয়া।

গিরধারী আবার ঠাট্টা করে—দিয়ে ফেলুন সিপাহীজি, আমি এখনি মরছি না। কোন ভয় নেই আপনাদের, হাজত পর্যন্ত বেঁচে বেঁচে পৌঁছে যাব। আপনাদের মাথার পাথর নেমে যাবে।

সিপাহীরা সবাই চুপ করে থাকে। হাবিলদার বলে—আমাদের কাছে মেহেরবানি করে কিছু চেয়ো না গিরধারী। এই তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে হাজতে পৌঁছে যাবে। জেলরবাবুর কাছে আরজি ক'রো, যা চাইবে সব পাবে।

গিরধারী একটা অহঙ্কারের সুরে উত্তর দেয়—আমি কিছুই চাইব না। কিছু দরকার নেই আমার। আমি সব পেয়ে গিয়েছি। বড় খুশি লাগছে সিপাহীজি।

প্রহরী পুলিশদের মধ্যে কানাকানি আলোচনা হয়—এতে টনটনে জ্ঞান ভাল নয়। এরাই শেষপর্যন্ত বেশি ভেঙে পড়ে। এখন তো শুধু জেদের জোরে ফরফর করছে, লম্বা লম্বা ঝুলি ঝাড়ছে। আর দুটো দিন পার হোক, অন্ধ মোষের মতো গরাদে মাথা ঠুকবে আর গোঁ গোঁ করবে। ফাঁসির শাস্তি, এ কি ঠাট্টার কথা রে ভাই!

গিরধারী বলে—আমি সব শুনতে পাচ্ছি সিপাহীজি। যত খুশি আফসোস করুন আপনারা কিন্তু আমি জানি, আমার ফাঁসি হবে না।

গিরধারীর কথাবার্তায় পাগলামির কোন আভাস নেই। কিন্তু এত জোর গলায় সে যে কথা বলছে, সেটা প্রলাপ ছাড় আর কি হতে পারে? প্রহরীদের সংশয় আর কৌতূহল একসঙ্গে মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছিল। কোথা থেকে এই বিশ্বাস পেল গিরধারী?

মোটরলরি একটা চক পার হয়ে বাঁদিকে মোড় ঘুরল। মুখ ঘুরিয়ে ডানদিকের পথের দিকে যেন একটা তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে গিরধারী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। লাল কাঁকরের একটা কাঁচাসড়ক চলে গিয়েছে এঁকেবেঁকে, দুপাশে আম শাল আর তেঁতুলের ছায়া নিয়ে অবাধ অবারিত মাঠের বুকের উপর দিয়ে সড়কটা ডাইনে বাঁয়ে এক-একটা ছোট ছোট গ্রাম ছুঁয়ে দিগ্বলয়ের কোণে গিয়ে যেন মিলিয়ে গিয়েছে।

গিরধারী জিজ্ঞাসা করল—এই রাস্তা কোন্‌দিকে গিয়েছে হাবিলদার সাহেব?

হাবিলদার—অনেক দূর গিয়েছে। রফিনগরের বাজার ছাড়িয়ে, বাবুঘাট থানা পার হয়ে একেবারে মুঙ্গের জেলায় গিয়ে পড়েছে। কেন বল তো?

গিরধারী—মিঠাপুর গাঁ এই পথে পড়ে?

হাবিলদার—হ্যাঁ। কিন্তু মিঠাপুরের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

গিরধারী—আমার শ্বশুরবাড়ি ঐ গাঁয়ে।

প্রহরীর দল চাপাস্বরে একসঙ্গে আফসোস করে—আর তোমার শ্বশুরবাড়ি!

গিরধারী মুখ ঘুরিয়ে আবার মিঠাপুরে কাঁচাসড়কের দিকে স্থির দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে পুলিশদের কোন মন্তব্য বোধহয় কানে শুনতে পাচ্ছে না গিরধারী। দূরের সর্পিল পথের মাটির সঙ্গে গিরধারীর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছে। ওর চোখ-মুখে সেই রকম একটা মুগ্ধ আবেশ থমথম করছিল।

আবার সোজা হয়ে বসতেই অর্জুন সিং প্রশ্ন করল—সত্যি কথা বল তো গিরধারী

মেয়েটাকে তুমি খুন করেছিলে?

গিরধারী—হ্যাঁ, আমি আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, একদিন সব দেনা-পাওনার হিসাব নেব। যেদিন সুবিধা পেলাম, হিসাব নিয়ে নিলাম।

হাবিলদার—বড় ভুল করেছিলে গিরধারী।

গিরধারী যেন ভুল বুঝতে পেরেছে, তেমনি অনুশোচনার সুরে জবাব দিল—হ্যাঁ, হাবিলদার সাহেব, রাত্রিবেলা একটু নিরালা জায়গাতে কাজ খতম করা উচিত ছিল, কিন্তু সকাল হয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরেও মনের রাগকে বোঝাতে পারলাম না। লোকে দেখে ফেলল। নইলে...।

খুন করেছে, তার জন্য কোন অনুতাপ নেই গিরধারীর মনে। এবিষয়ে সে নিজেকে আজও নির্ভুল মনে করে। শুধু ভুল, সে ধরা পড়ে গিয়েছে। অপরাধীর দীনতা লজ্জা ও মর্মপীড়ার কোন চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় না গিরধারীর কথায়।

সাকির আলি আশ্চর্য হয়ে বলে—আমি বাস্তবিক এই কথা ভেবে আশ্চর্য হই, আজ পর্যন্ত কোন ফাঁসির আসামীকে তার কসুরের জন্য দুঃখ করতে দেখলাম না।

হাবিলদার—আর দুঃখ করার মতো মন ওদের থাকে না ভাই। নিজের কসুরের কথা ওরা একদম ভুলে যায়।

অর্জুন সিং বলে—ফাঁসির হুকুম না হলে, মানুষের মতো মনটা তবু থাকে। নিজেকে পাপী বলে বুঝতে পারে, এক-আধটুকু আফসোস করেও। কিন্তু...।

হাবিলদার একটু সম্ভ্রম ও সঙ্কোচে আমতা-আমতা করে বলে—একটা প্রশ্ন করব গিরধারী, মাপ করো ভাই।

গিরধারী—বলুন।

হাবিলদার—তোমার জেনানা রাধিয়া কি সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

গিরধারীর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, শান্তভাবে বলল—সে খবর সে জানে আর আমি জানি। আপনাদের শুনে কি লাভ?

হাবিলদার তীক্ষ্ণ মেজাজে বেশ চড়া গলায় বিদ্রূপ করে—আরে তুমি তো দুনিয়াকে সে খবর শুনিয়ে দিয়েছ। নিজেই আদালতে আর পুলিশের কাছে বলেছ...।

গিরধারীর মুখটা অসহায়ের মত করুণ ও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। অনুনয়ের সুরে প্রশ্ন করে—হ্যাঁ, মেহেরবানি করে বলুন তো হাবিলদারসাহেব, আমি কি বলেছি। আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

হাবিলদার—তুমি বলেছ যে, তোমার জেনানা রাধিয়া তোমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করত।

কথাগুলিকে যেন মনের সব আগ্রহ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছিল গিরধারী। শুনতে শুনতে সারা মুখে বিচিত্র এক পরিতৃপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। নৌকার ঘুমন্ত যাত্রী হঠাৎ জেগে উঠে ঘাটের মাটি নিকটে দেখতে পায়, সফল ভরসার আনন্দে দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়, গিরধারীর দৃষ্টিটা যেন সেই রকমের। এক প্রচণ্ড অন্ধকারের স্রোতের টানে অবধারিত অন্তিমের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে গিরধারীকে, কিন্তু গিরধারীর মনে কোন শঙ্কা নেই, তার হাতের মুঠোয় যেন একটা শক্ত কাছি অবলম্বন রয়েছে, দূর তটভূমির হৃদয়ের এক কঠিন আশ্বাসের সঙ্গে বাঁধা। মাঠের পর মাঠ পার হয়ে আরও দূরে, মুঙ্গের রোডের একপাশে মিঠাপুর গ্রাম। গিরধারীকে ফাঁসির অপমান ও বেদনা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, মিঠাপুরের এক মাটির ঘরের নিভৃতে একটা বুকভরা আকুলতা এখন প্রস্তুত হচ্ছে, উপায় খুঁজে বের করছে। সব বুঝতে পেরেছে রাধিয়া, এতখানি বুদ্ধি তার আছে।

সাকির আলি প্রশ্ন করে—বল গিরধারী, কথাটা কি সত্য?

গিরধারী প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে। ঘোর মিথ্যার আবরণ দিয়ে ঢাকা এ কথার অর্থটা কি ধরা পড়ে গেল? সামলে নিয়ে বেশ শান্তভাবে গিরধারী উত্তর দেয়—সত্য না মিথ্যা, সে খবর আমি জানি আর সে জানে।

হাবিলদার মন্তব্য করে—এটা কিন্তু একেবারে মিথ্যা কথা বলেছ গিরধারী। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য জঘন্য একটা মিথ্যা কথা বললে, কিন্তু কোন লাভ হলো না। না বাঁচল নিজের প্রাণ, না রইল নিজের স্ত্রীর ইজ্জত।

অর্জুন সিং কর্কশস্বরে বলে—একবার ভেবে দেখলে না, কি ভাবল তোমার বউ। বেচারী নিজের কানে তোমার ঐ কথা শুনেছে।

অনুযোগ আর ধিক্কার শুনে গিরধারী একটুও কুণ্ঠিত হয় না, তার চেহারার উৎফুল্লতা যেন নতুন বিশ্বাসে আরও সজীব হয়ে ওঠে। মনের ভিতর আদালতঘরের ছবিটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পায় গিরধারী। কালো কালো নরমুণ্ড তাকে ঘিরে ধরে রয়েছে। জজ আর উকিলেরা প্রশ্ন করছে। প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল গিরধারী—রাধিয়া আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করত। আমি জানি একদিন না একদিন সে নিশ্চয় আমাকে বিষ খাওয়াবে। আমি তাই...।

আদালত-ঘরের এক কোণে আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে বদরি চাচার পাশে চুপ করে বসেছিল রাধিয়া। হঠাৎ গিরধারীর এই অদ্ভুত প্রলাপ শুনতে পেল রাধিয়া। চোখ তুলে তাকাল গিরধারীর ধূর্ত মূর্তিটার দিকে। কয়েকটি মুহূর্তের মতো গিরধারীর চোখের তারা দুটো রাধিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কে-জানে কিসের আবেদন জানাবার জন্য স্থির হয়ে রইল।

সব বুঝতে পারে রাধিয়া, গিরধারীর শেষ কামনার নিবিড় আগ্রহ ঐ প্রলাপের আড়ালে কিসের স্পষ্ট ইশারা জানিয়ে দিচ্ছে। রাধিয়ার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি একবার শব্দ করে বেজে ওঠে। শুনতে পায় গিরধারী। বুঝতে পারে গিরধারী, তাহলে বুঝতে পেরেছে রাধিয়া। গিরধারীর সকল উদ্বেগ এক সাফল্যের গর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যায়। ফাঁসির মৃত্যুর অসম্মান থেকে গিরধারীর অন্তরাত্মা উদ্ধার পাবার জন্য রাধিযারই কাছে আপীল জানাচ্ছে, আবছা ভাষার সেই অর্থ পৃথিবী ধরতে না পারুক, রাধিয়া নিশ্চয় ধরেছে।

জেলের ফটক দেখা যায়। বুড়োবটের ছায়ায় ফটকের দাঁতগুলি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। উপরে বটের পাতার আড়ালে শত শত বাদুড় ঝুলছে। নীচে বন্দুক কাঁধে পায়চারি করছে সান্ত্রী। ফটকের পাশে একটা কাঠের ত্রিভুজের মধ্যে পিতলের ঘণ্টা ঝুলছে।

মোটরলরি ক্রমে মন্থর হয়ে ফটকের সামনে এসে একেবারে থেমে গেল। ঝটপট মাথায় পাগড়ি গুঁজে, লাঠি খাতা বন্দুক আর গিরধারীকে নিয়ে প্রহরীরা লরি থেকে বুড়োবটের ছায়ায় দাঁড়াল।

অর্জুন সিং-এর মনটা একটু করুণাপ্রবণ। গিরধারীর পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল--আর সময় নেই গিরধারী। এইবার আমাদের হেপাজত ছেড়ে তোমাকে ভিতরে ঢুকে পড়তে হবে। ধরিত্রীকে প্রণাম করে নাও।

গিরধারী বিস্মিতভাবে অর্জুন সিংয়ের দিকে তাকাল। অর্জুন সিং বলল--সবাই করে ভাইয়া। নাও, তাড়াতাড়ি একটু ধুলো কপালে ছুঁইয়ে নাও। আর সুযোগ পাবে না।

ফটকের ছোট দরজাটা তখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে খুলছে, গিরধারীর জীবনের রথ এসে পথের শেষে পৌঁছে গিয়েছে। গিরধারীর জীবনে আর উল্টোরথের আশা নেই। পিছনের দুনিয়ার মাটি সরে যাবে এই মুহূর্তে। আর সামনে, ঐ লোহার গরাদের ওপারে প্রণাম করার মতো মাটি আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু অর্জুন সিং দুঃখিত হয়ে দেখছিল, গিরধারী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাবিলদার বললো--চল।

চললো, গিরধারী, ফটক পার হয়ে অন্য পৃথিবীর বুকের ভিতর গিয়ে ঠাঁই নিল।

সিপাহীরা ভিতর থেকে ফিরে এসে যখন আবার ফটকের কাছে দাঁড়াল, ঢং ঢং করে বাজল পাঁচটা ঘণ্টা। বুড়োবটের ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তখন। পুলিশলরির ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছিল। ফটকের মুখ থেকে বের হয়ে প্রহরীর দল অলসভাবে আবার লরির ভিতর একে একে উঠে বসল—হাবিলদার, অর্জুন সিং, সাকির আলি ও আর সবাই। শুধু গিরধারী নেই, জ্যান্ত গিরধারীর প্রাণ জেলরের কাছে জমা দিয়ে শুধু রসিদ নিয়ে ফিরে চললো প্রহরীর দল।

মোটরলরিটা আচমকা একবার বাম্প করে দ্রুত দৌড়ে চলে গেল।

পাঁচ হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া নিরেট পাথর আর কংক্রিটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি খুপরির মধ্যে ভাগলপুরী কম্বলের উপর শুয়ে সে রাত্রে গিরধারী কি স্বপ্ন দেখেছিল, তা কেউ জানে না। কিন্তু সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জেলের প্রত্যেক কর্মচারী, ওয়ার্ডার, সান্ত্রী আর কয়েদী বুঝতে পারল—এক অতি দুর্দান্ত ফাঁসির-আসামী এসেছে। জেলর থেকে আরম্ভ করে ওয়ার্ডার সান্ত্রী আর ডাক্তার, সবাইকে যা-খুশি টিটকারী দিয়েছে আর গালাগালি করেছে। একেবারে বেপরোয়া আসামী। মেথরের সঙ্গে রসিকতা করে শালা সম্পর্ক পাতিয়েছে। স্থূলাকার সান্ত্রী পাঁড়েজীকে একটা নতুন নাম দিয়েছে—বীর বুকোদর।

তাঁতঘরের কয়েদীরা কাজ করতে তখনো শুনতে পাচ্ছিল, সেলের মধ্যে ফাঁসির আসামী গিরধারী গলা খুলে গান গাইছে—নজরিয়া লুভায় লিয়ে যায়, মন তিরছি! হাঁরে মন তিরছি!

কে জানে কিসের স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে আছে গিরধারী। সারাদিন গোলমাল করে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে—কোন্ শালা আমার ফাঁসি দেবে দেখব।

আবার বিদ্রূপ করে বলতে থাকে—আহা! কত শখ! দড়িতে ঝুলিয়ে মারবে! পাগলা কুত্তা পেয়েছে, না?

প্রতিদিন খাবার নিয়ে হাঙ্গামা করে গিরধারী। একগ্রাস ভাত মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দেয়।

সন্ধ্যা হতেই চেঁচামেচি আরম্ভ করে—মশারি চাই। উঃ কী ভয়ানক মশা। যেমন জেলের লোকগুলি তেমনি মশাগুলি।

সান্ত্রী পাঁড়েজী মেজাজের ধৈর্য কষ্ট করে অটুট রাখে। শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে—এই রকম গোলমাল করো না, সব পাবে। ঘুমোও ঘুমোও।

আরও কিছুক্ষণ। দাপাদাপি করে একটু শান্ত হয় গিরধারী, ঝিমোতে থাকে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। গরাদের বাইরে পাঁড়েজীর একটানা পাহারা ও বুটের শব্দ অন্ধকারে মচমচ করে। ঘণ্টা বাজে। পাহারা বদল হয়। ঘুমন্ত গিরধারীর বুকের প্রতিটি স্পন্দনকে সযত্নে পাহারা দেবার জন্য নতুন সান্ত্রী আসে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসে গিরধারী। জিজ্ঞাসা করে—কত রাত হলো?

—এগারোটা। চুপ করে ঘুমোও। সান্ত্রী দিলবর মিঞা উত্তর দেয়।

গিরধারী তবু জেগে জেগে কিছুক্ষণ উসখুস করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে। সমস্ত পৃথিবীর জীবনযন্ত্রের ছন্দের সঙ্গে নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে তাল রেখে সেই রাতের কোটি কোটি মানুষের মতো ঘুমোতে থাকে গিরধারী।

দু' মিনিট পরেই জেগে ওঠে গিরধারী, সান্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে—খুব ভালো ঘুম হলো সিপাহীজি! আঃ!

দিল্‌বর মিঞা বলে—আবার ঘুমোও।

গিরধারী বিরক্ত হয়ে বলে—আর কত ঘুমোব সিপাহীজি!

হাইকোর্টের সহি নিয়ে লাল চিঠি এসে গিয়েচে। ওয়ার্ডার আর সান্ত্রীরা সকলেই সে খবর

রাখে। গিরধারীর আয়ুর মুহূর্তগুলি এইবার হিসাব করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এইবার চলে যেতে হবে।

ব্যারাকের রসুইঘরে রান্না করতে করতে ওয়ার্ডারেরা আলোচনা করে—দুদিন থেকে গিরধারী গোপ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আরও ঠাণ্ডা হওয়া এখনো বাকি আছে। এখনো কিছু কিছু ইয়ার্কি করে।

—এখনো ওর বিশ্বাস যে ওর ফাঁসি হবে না।

—তাই ভাল, তাই ভাল। ঐ বিশ্বাস নিয়েই বাকি ক'টা দিন পার করে দিক্।

—যাই বল, গিরধারী গোপ কিন্তু বড় শক্ত খুনী। এদের যাওয়াই ভাল।

—আরে নেহি ভাই, তাতে কোন লাভ হয় না।

—সব খুনীর যদি ফাঁসি হতো, তবে নাহয় বলা যেত, একটা নিয়ম আছে!

—যারা খুন করে ধরা পড়ে, তাদেরই শুধু ফাঁসি হয়।

—ভেজাল খাবার খাইয়ে কত লোককে খুন করা হচ্ছে, তাদের তো কই ফাঁসি হয় না!

—উল্টো তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়।

—গাঁজা আফিম খেতে কত লোক রক্ত শুকিয়ে মরে যায়। কই, কেই তো বাধা দেয় না, বিচার করে না?

—কত লোকে ফুর্তি করে মোটরগাড়ি চালিয়ে কত লোক মারে।

—কিন্তু জেনেশুনে তো মারে না ভাই, ভুল করে মারে!

—আরে হাঁ হাঁ। সব খুনই ভুল করে হয়। মেজাজের ভুল।

সান্ত্রী পাঁড়েজী পাহারায় এসে দেখল, ধীরস্থির হয়ে বসে আছে গিরধারী। এই রকম দৃশ্যই পাঁড়েজী আশা করছিল। মৃত্যুর ফাঁদে পড়ে প্রত্যেক অভিশপ্ত প্রাণ প্রথম কয়েকটা দিন যেন দুরন্ত হয়ে ওঠে আর বিদ্রোহ করে। তারপরেই ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে। শত আশ্বাসে ও প্রেরণায় তখন তাকে আর ঠেলে তুলতে পারা যায় না।

পাঁড়েজী বললো—লাল চিঠি তো এসে গিয়েছে গিরধারী।

গিরিধারী—হাঁ, পাঁড়েজী।

পাঁড়েজী—বাস্, ভয় করবার কিছু নেই। প্রেমসে রাম নাম কর।

গিরধারী শান্তভাবে উত্তর দিল—আপনি সান্ত্বনা দেবেন না পাঁড়েজী, আমার ফাঁসি হবে না।

সান্ত্রী পাঁড়েজি চুপ করে। এখনো মুক্তির স্বপ্ন দেখছে গিরধারী। সব দিকে এত টনটনে জ্ঞান, শুধু একটি ক্ষেত্রে গিরধারী একেবারে অপোগণ্ড শিশুর মতো বোকা। এর কোন কারণ খুঁজে পায় না পাঁড়েজি। হয়তো মাথার দোষ দেখা দিয়েছে গিরধারীর।

গিরধারী বলে—আমাকে এক টুকরো খড়ি যোগাড় করে দিতে পারেন পাঁড়েজি!

পাঁড়েজি—কেন?

গিরধারী—ছবি আঁকব।

পাঁড়েজি—জেলরবাবুকে বলব।

গিরধারী—জেলের গরুগুলি এত রোগা কেন পাঁড়েজি?

পাঁড়েজি—আমি জানি না।

গিরধারী—নিশ্চয় ভাল করে খাওয়ানো হয় না।

পাঁড়েজি—জানি না, আমি গয়লা নই।

গিরধারী—দলরবাবু আসুক, আচ্ছা ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দিতে হবে।।

দুনিয়ার শখ আবদার দয়া আর মায়াগুলির জন্য গিরধারীর মনে যেন আরও বেশি করে একটা অদ্ভুত গরজ জেগে উঠেছে। আশ্চর্য হয় সান্ত্রী পাঁড়েজি।

গিরধারী আর গান গায় না। শুধু বার বার প্রশ্ন করে—কটা বেজেছে সিপাহীজি? আজ কত তারিখ?

এক-এক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঝুম হয়ে থাকে গিরধারী, তার অন্তর্লোকের পথে যেন কারও পায়ের শব্দ শুনছে। সে আসছে, সে এতক্ষণে নিশ্চয়ই রওনা হয়ে গিয়েছে। আর কি দেরি করতে পারে সে। মিঠাপুর থেকে লাল কাঁকরের সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে শান্তিময় মৃত্যুর উপঢৌকন নিয়ে রাধিয়া আসবেই। তার ইশারা বুঝতে কি ভুল করবে রাধিয়া?

না, না, খুব চালাক মেয়ে রাধিয়া। জীবনের সব কাজে রাধিয়া গিরধারীকে সাহায্য করেছে, আজ করবে না কেন?

শুধু একটা কাজে কোন সাহায্য করতে পারেনি রাধিয়া। কোন্ স্ত্রী-ই বা স্বামীর সেই পাগলামীতে সাহায্য করতে পারে! রাধিয়াও পারেনি কিন্তু রাধিয়ার জীবনের সেই একটিমাত্র অভিশাপকে গিরধারী হেঁসো দিয়ে নির্মূল করে দিয়েছে। তবে আর কেন? এখন তো পথে আর কোন কাঁটা নেই, স্বচ্ছন্দে রাধিয়া চলে আসতে পারে।

গিরধারীর বিশ্বাস একটুও বিচলিত হয় না। রাধিয়া ঠিক সময়-মতো পৌঁছে যাবে। ফাঁসির মৃত্যু থেকে রাধিয়া তাকে মুক্তি দেবে নিশ্চয়।

কিন্তু গিরধারীর স্বপ্ন বোধহয় মিথ্যে হতে চলল। জেলর ও ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন সেলের কাছে। গিরধারীর ওজন নেওয়া হলো।

গিরধারী কোন প্রশ্ন করার আগেই জেলর জানিয়ে দিলেন—কাল তোমার ফাঁসির দিন, গিরধারী গোপ।

গিরধারী চুপ করে রইল।

জেলর বললেন—যা খেতে-টেতে চাও বল, সব মিলেগা।

গিরধারী জবাব দিল—কিছু না।

সেলের দরজা বন্ধ হলো।

দুপুর পর্যন্ত সেলের মেজের উপর গিরধারীর শীর্ণ মূর্তিটা কুঁকড়ে পড়ে থাকে। দেয়াল মেজে ছাত, সব নিরেট, কোথাও একটা ফুটো নেই যে সাপ হয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। কয়েদীদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে বোধহয়, কাকের ঝাঁক এঁটো খাওয়ার জন্য কলরব করে উড়ে বেড়াচ্ছে বাইরে—শব্দ শোনা যায়।

হঠাৎ যেন নিজের বুকের কাছেই একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে গিরধারী। সেলের দরজা খুলে দিলবর মিঞা এসে খবর দিল—মোলাকাতে চল। তোমার জেনানা এসেছে।

না, স্বপ্ন মিথ্যা হয়নি। এক লাফে উঠে দাঁড়াল গিরধারী। মেজের উপর কম্বলটাকে এক লাথি মেরে পিছনে সরিয়ে দিল। গিরধারী যেন এই কারাগারের সব বন্ধন ছিন্ন করে চলেছে। আর এখানে ফিরে আসতে হবে না।

অফিস ঘরের পাশে, একটা গরাদের ওপারে এসে বসল গিরধারী। একজন ওয়ার্ডারের সঙ্গে রাধিয়া ঢুকল অফিস-ঘরে।

এক দৌড়ে এসে গরাদের উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল রাধিয়া। মেজের উপর জোরে মাথা ঠুকে ঢিপ করে একটা প্রণামও করল।

ফুঁপিয়ে কাঁদছিল রাধিয়া। চরম বেদনা ও হতাশার একটা প্রতিধ্বনি যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। রাধিয়া বলে—ছিনিয়ে নিলে গো। তোমার খাবার ছিনিয়ে নিলে।

অতি নগণ্য কয়েকটা খাবার জিনিস। একটুখানি গুড়ের হালুয়া আর একটা পেঁড়া পাতায় মুড়ে নিয়ে এসেছিল রাধিয়া। কিন্তু স্বামীকে নিজের হাতের খাবার খাওয়াবার সেই শেষ সাধও সফল হলো না। ফটকের সান্ত্রীর কাছে সেই খাবার জমা রেখে আসতে হয়েছে।

জেলর রাধিয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—এর জন্য এত কান্না কেন? আরও ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তুমিই নাম কর, কি খাওয়াতে চাও। রসগোল্লা জিলিপী গজা—

গিরধারী তাকিয়ে থাকে অদ্ভুতভাবে। একটা মৃত মানুষের চোখের কোটর দুটো যেন হাঁ করে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে কোন অর্থ নেই, ভাষা নেই, আবেগ নেই, জ্যোতি নেই। আজ এতদিনে সত্যিকারের ফাঁসির হুকুম শুনতে পেয়েছে গিরধারী। রাধিয়ার নিজের হাতের তৈরী মধুর মৃত্যুর উপহার হাতের নাগালে পৌঁছল না। গিরধারীর মেরুদণ্ডটা কাঁপছে, বেঁকে যাচ্ছে, কট্‌কট্ করে বাজছে, যেন জীবনকাঠি ভাঙছে।

ভয়ার্ত ছোট ছেলের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল গিরধারী।—বাঁচাও রে বাবা! বাঁচিয়ে দে রে বাবা!

সবাইকে আশ্চর্য করল গিরধারী। অদ্ভুত। গিরধারীর মতো এত শক্ত আসামী হঠাৎ এভাবে ভেঙে পড়ে কেন?

কেরানীবাবু ঘড়ি দেখলেন। মোলাকাতের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। দু'জন ওয়ার্ডার রাধিয়াকে হাত ধরে টেনে ফটকের বাইরে নিয়ে গেল।

সেই সন্ধ্যায় জেলের সমস্ত কয়েদী আশ্চর্য হয়ে শুনল, ফাঁসীর আসামী গিরধারীর ব্যাকুল চিৎকার আর কান্নার শব্দ। বধ্যভূমির গন্ধ পেয়ে একটা পশু যেন আর্তনাদ করছে।

সন্ধ্যা শেষ হয়। সান্ত্রী পাঁড়েজি পাহারায় আসেন। কান্না থামিয়ে গিরধারী কম্বলের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।

রাত্রি আর অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে ওঠে। সব নম্বর বন্ধ হলো। দেখা যায়, কলঘর থেকে একটু দূরে খোলা মাঠের উপর নতুন একটা বাতি জ্বলছে। ফাঁসির তক্তা পাহারা দিচ্ছে সান্ত্রী ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

দড়ি পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে। তিন মণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়ির শক্তি টেস্ট করা হয়েছে। পোষা আজগরের মতো চর্বি-মাখানো দড়িটা এখন গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে আছে অফিস ঘরের একটা সিন্দুকে তালাবন্ধ হয়ে।

আর একটা নম্বরের কুঠুরিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে জহ্লাদ বংশী দোসাদ। ফাঁসি প্রতি পাঁচ টাকা উপহার। আজ রাত শেষ হয়ে সকাল হলেই বংশী দোসাদের রোজগারের হিসাবে পাঁচ টাকা জমা হবে, ঘাতকতার মজুরি।

জেলখানার মাথার উপরে অন্ধকারে বুড়ো বটের পাতার ভিড় ছেড়ে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক উড়ছে। টর্চ হাতে নিয়ে জেলর হাবিলদার আর সান্ত্রী রাউণ্ড দিয়ে গেলেন সব ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রত্যেকটি নম্বর নিঝুম। তাঁতখানা, কলঘর, ঘানি—তারপর বাঁ দিকে ঘুরে ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে সেলের কাছে এসে সবাই দাঁড়াল।

সেলের দরজা খুলে যায়।

শ্রান্ত ক্লান্ত গিরধারী উঠে বসে, একটা সেলামও জানায়।

জেলর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ? ঘুম হয়েছে?

গিরধারী—হ্যাঁ বাবু।

জেলর—তবিয়ৎ ভাল আছে?

গিরধারী—হ্যাঁ বাবু।

জেলর—খেয়েছ?

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—বেশ বেশ। এখনও অনেক রাত আছে, ঘুমোও।

জেলরবাবু চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই আর একবার দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কিছু বলবার আছে?

গিরধারী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—না।

জেলরবাবু চলে যাচ্ছিলেন। গিরধারী ডাকল—বাবু!

জেলর—কি?

গিরধারী—রোজ রাত্রিবেলা বাইরে গান হয় শুনতে পাই। কে গায়।

জেলর অপ্রস্তুতভাবে বলেন—আমার মেয়েরা গান গায়।

গিরধারী—কিন্তু আজ কেন দিদিদের গান শুনতে পেলাম না।

জেলর যেন তাঁর মনের মধ্যেই কিছুক্ষণের জন্য ছটফট করেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর, কোন কথা না বলে বের হয়ে গেলেন। বন্ধ হলো সেলের দরজা। সেলের সামনে ডবল সান্ত্রীর পাহারা অন্ধকার আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

আর নিঃশব্দে বসে রইল গিরধারী।

সান্ত্রী পাঁড়েজি বলে—ঘুমোবার চেষ্টা কর গিরধারী।

গিরধারী বলে—কিছু তুলসীবচন শোনাতে পারেন পাঁড়েজি?

পাঁড়েজি—রাম নাম কর গিরধারী। তুলসীবচনের সার হলো রাম নাম। কোন ভয় নেই।

—সীতারাম! সীতারাম। নিঃশ্বাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে নাম উচ্চারণ করতে থাকে গিরধারী।

ভোরের আবছা অন্ধকারে জেল কম্পাউণ্ডের বাইরে সড়কের উপর গাছতালয় চুপ করে বসে ছিল রাধিয়া। একটা কুপিতা নিশাচরীর মূর্তি যেন সময় গুনতে গুনতে ভোর করে ফেলেছে, আর পালিয়ে যেতে পারেনি। রাধিয়ার কাপড় ধুলোয় লাল হয়ে গিয়েছে। রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলো হয়ে আছে। সারা রাত যেন জেলখানার প্রত্যেকটি শব্দ উৎকর্ণ হয়ে পাহারা দিয়েছে রাধিয়া, চোখের পলক ফেলেনি। চোখ দুটো ফুলে লালা হয়ে আছে। রাধিয়ার আঁচলে কয়েকটি কড়ি আর খই পুঁটলি করে বাঁধা। পাশে একটা মাটির কলসী, জলে ভরা।

ফটকের আলো গিভে গেল। জেলখানার মাঝখানে একটা গাছের মাথাা সারারাত যে নতুন আলোর ছটা লেগেছিল, সে আলোও নিভেছে, রাধিয়া দেখতে পায়।

ফটকের ভিতর দিয়ে লোক আসা-যাওয়া করছে। ভোরের কাকের দল শব্দ করে পূব আকাশের দিকে ছুটছে।

—সীতারাম! সীতারাম! সীতারাম! মানুষের বুক থেকে একটা আর্ত মন্ত্রের শব্দ ছিটকে বের হয়ে জেলখানার বাতাসে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। শুনতে পায় রাধিয়া।

জলের কলসী হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রাধিয়া। তারপরেই ফটকের দিকে এগিয়ে চললো।

সীতারাম! সীতারাম! সীতারা...।

এক অদৃশ্য সেতারের তার হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। হুম্‌ম্‌—হ্যাঁচকা টানে একটা ভাষাহীন বোবা যন্ত্রণা যেন নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর বুকের ভিতর ঢুকে পড়ল। শুনতে পায় আর বুঝতে পারে রাধিয়া।

ফটকের কাছে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল লাশ নিয়ে যাবার জন্য। রাধিয়া ফটকের কাছে এসে দাঁড়াতেই সান্ত্রী বলল—বসো, চুপ করে বসো, লাশ আসছে।

লাশ এল, কম্বলে জড়ানো গিরধারী।

রাধিয়া বললো—কম্বল সরাও। আমি ওকে একবার দেখব।

ডোমেরা কম্বলের ঢাকা সরিয়ে দিতেই চমকে কপালে হাত দিয়ে এক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রাধিয়া। গিরধারীর আধ হাত লম্বা জিভ আর দড়ির মতো লিক্‌লিকে গলাটার দিকে রাধিয়া তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো জোরে জোরে ঘষে নিয়ে ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে আস্তে আস্তে বলতে থাকে রাধিয়া—মাপ কর, তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না, মাপ কর।

তারপর চারদিকে তাকায় রাধিয়া। যেন সমস্ত পৃথিবীকেই ধিক্কার দেবার জন্যে চেঁচিয়ে উঠল রাধিয়া—ছি ছি, হায় হায়, ফাঁসিওয়ালারা কী ভয়ানক শয়তান গো! এ কি চেহারা করে দিয়েছে গো! এর চেয়ে আমার বিষের হালুয়া যে ঢের ভাল ছিল গো।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললো রাধিয়া।

--কি বলছে? কি বলছে? ওয়ার্ডারেরা একে একে সবাই এসে রাধিয়াকে ঘিরে দাঁড়াল।

এক আছাড় দিয়ে জলের কলসীটা ফটকের সামনে ফাটিয়ে দিল রাধিয়া। আঁচল থেকে কড়ি আর খই বের করে গিরধারীর লাশের উপর ছিটিয়ে দিল।

শেষ ব্রত সাঙ্গ হয়েছে রাধিয়ার। রাধিয়া আর ফিরে তাকাল না। ওয়ার্ডারদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলে যায় রাধিয়া।

ওয়ার্ডারেরা দৌড়ে এসে রাধিয়াকে ঘিরে ধরে—দাঁড়াও, পালিয়ো না।

রুষ্টা বাঘিনীর মতো হিংস্র দৃষ্টি তুলে রাধিয়া তাকায়। প্রশ্ন করে—কেন?

ওয়ার্ডার বলে—তোমাকে পুলিশের হাতে দিতে হবে।

রাধিয়া—কি দোষ করলাম?

ওয়ার্ডার—তুমি তোমার স্বামীকে বিষ খাওয়াতে এসেছিলে।

রাধিয়া চিৎকার করে কাঁদতে থাকে—তাতে তোদের কি রে? আমি তো আমার স্বামীকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে এসেছিলাম রে!

পরিপূর্ণা

রাত দশটারও বেশি হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। ক্লান্ত বাড়িটার মেজাজও যেন ক্লান্ত হয়েছে। সুলতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বর-বউ বাসরঘরে গিয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার হুল্লোড়ও আর নেই। নিমন্ত্রিতদের প্রায় সবাই চলে গিয়েছে। যারা আছে তারা পাড়ারই লোক।

এখন শুধু সামিয়ানার নীচে এলোমেলো করে ছড়ানো খালি চেয়ারগুলির ওপরে এলোমেলো বসে গল্প করছে ওরা, যারা বিয়েবাড়ির কাজে খেটেখুটে ক্লান্ত হয়েছে। ওরা সবাই সুলতার দাদার বন্ধু। এদিকে বেশ একটু তফাতে চেয়ারে বসে আনমনা হয়েও মাঝে মাঝে ওদেরই নানান গল্পের নানা কথা শুনছিল কুমুদ রায়।

বাসর-ঘরের দিক থেকে খল-খল আর খিল-খিল হাসির শব্দ যেন বসন্তকালের মিষ্টি তুফানী হাওয়ার শব্দের মতো মাঝে মাঝে ভেসে আসে। ওরা বলে—ঐ শোন, এখানেও আবার বোধহয় সেই রকমের কাণ্ড করছে জয়ন্তী সেন।

জয়ন্তী সেন? নামটা শুনেই চমকে ওঠে কুমুদ রায়। জয়ন্তী সেনের নাম শুনে কুমুদ রায়ের পক্ষে একটু চমকে ওঠবারই কথা। কিন্তু এরা যে জয়ন্তী সেনের কথা বলছে, সে কি সেই জয়ন্তী সেন, যাকে কুমুদ সেই ভয়ঙ্কর দাঙ্গার সময় মানিকতলার পথে একা দেখতে পেয়ে আর অভয় দিয়ে নিরাপদে এই ঢাকুরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেল?

সে জয়ন্তী সেনের সঙ্গে এখনও মাঝে মাঝে কুমুদের দেখা হয়। ঠিকই, পথে মুখোমুখি হলেও সেই আগের মত অত হাসিখুশি হয়ে আর আলাপ করে না জয়ন্তী। কিন্তু একেবারে বোবাটি হয়ে পাশ পাটিয়ে চলেও যায় না। কম কথা বললেও কথা বলে। শুকনো হাসি হলেও একটু হাসে। সেদিন সন্ধ্যায় গড়িয়াহাটার মোড়ে ফুটপাথের ওপর বিছানো এক খোলা

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রজনীগন্ধার দর করছিল জয়ন্তী। অফিস থেকে ফেরার পথে কুমুদ সেই সময়ে ট্রাম থেকে নেমে মোড়ের কাছে দাঁড়ালো। কুমুদের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো জয়ন্তী। যেন লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠা। ভয় পেয়েও হতে পারে। কিন্তু কিসের ভয় আর কিসের লজ্জা? বরং কুমুদেরই পক্ষে লজ্জিত হওয়া উচিত। একদিন এসে শুধু একটু চা খেয়ে যাবার জন্য কুমুদকে অনুরোধ করেছিল জয়ন্তী। আজ যাব কাল যাব করতে করতে তিন বছরের মধ্যেও একবার গিয়ে জয়ন্তীদের বাড়ির এক কাপ চা খেয়ে আসবারও সময় হলো না। কে জানে কি মনে করলো জয়ন্তী!

সব ঘটনার ইতিহাস এত স্পষ্ট মনে পড়ে, সময়ে-অসময়ে হঠাৎ মনেও পড়ে যায়, তবু কি আশ্চর্য, আর একবার এসে চা খেয়ে যাওয়ার জন্য জয়ন্তীর সেই আগ্রহভরা একটা অনুরোধের দাবী আজও রক্ষা করতে পারা গেল না কেন? সময়ের অভাব তো নেই। বেশ তো মাসে অন্তত একবার সিনেমা হাউসে গিয়ে বাজে ছবি দেখবারও সময় পাওয়া যায়। অথচ যে মেয়েকে একেবারে ভুলে যাওয়া আজও সম্ভব হলো না, এমন কি হঠাৎ অকারণেই এক একবার দেখতে বড় ইচ্ছা করে, সেই মেয়ের একটা অনুরোধ তুচ্ছ হয়ে গেল কেমন করে? সেই অনুরোধটাকেই কি খুব ভয় করে কুমুদ রায়?

এই ত্রিশ বছর বয়সের জীবনে অনেক মুখ থেকে চা খাওয়ার জন্য অনুরোধ শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে কুমুদ রায়ের। সেই সব মুখের অনেকগুলিই তো জয়ন্তীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। কিন্তু সামান্য চা খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধের রূপটা যে কত সুন্দর হতে পারে, সেই সত্য জীবনে মাত্র একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মাত্র একটি দিনই অনুভব করতে পেরেছিল কুমুদ রায়।

কলকাতা শহরের চারদিক জুড়ে আর শহরের ভিতরেও তখন এখানে-ওখানে খুনিয়ারা দাঙ্গার মাতামাতি আর পাড়া-পোড়ানো আগুনের জ্বালা জ্বলছে। পথ চলা নিষেধ করে দিয়ে যখন-তখন কার্ফু জারি করছে পুলিশ। শ্যামবাজারের মামারবাড়ি থেকে বের হয়ে বাস ধরবার আশায় এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে যখন মানিকতলার মোড়ের আগুন দেখতে পেয়ে ভয়ে থরথর করে উঠেছে জয়ন্তীর সারা শরীর, ঠিক সেই সময়েই পথের ওপর পিছন থেকে কে যেন ডাকে—আপনি এই হাঙ্গামার মধ্যে ওদিকে কোথায় চলেছেন?

যেন ভয়-ভাঙানো দৈবের ডাক। চমকে মুখ ফিরিয়ে, আর ঢাকুরিয়ারই কুমুদ রায়কে দেখতে পেয়ে জয়ন্তীর দু'চোখের ভয়ের ঘোর কেটে যায়। জয়ন্তী বলে—আমি ঢাকুরিয়া যেতে চাই, কুমুদবাবু।

কুমুদ বলে—আমার সঙ্গে চলুন, আমিও ঢাকুরিয়া যাচ্ছি।

ঢাকুরিয়ার আর পাঁচজনের মত জয়ন্তীও কুমুদকে চেনে। হরিশ রায়ের ছেলে কুমুদ রায়, যাদের বাগানে প্রতি বছর সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ঘটা সাত দিন পর্যন্ত চলে। ঐ সার্বজনীন আনন্দের অর্ধেক খরচ হরিশবাবু দিয়ে থাকেন। দেবেনই বা না কেন? খুব বড়লোক অবশ্য নন। কুমুদের চাকরিটাও ভাল, মস্ত বড় এক জুট মিলের ওয়েলফেয়ার অফিসার। এখনও বিয়ে হয়নি কুমুদের। পাড়ার লোক মনে করে, নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে। প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার বোধহয়, যার জন্য কুমুদ আজও বিয়ে না করে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

ঢাকুরিয়ার আর পাঁচজনের মত কুমুদও জয়ন্তীকে চেনে। কোন এক প্রেসে প্রুফ-রীডারের কাজ করেন বিলাসবাবু, তাঁরই মেয়ে জয়ন্তী। কে জানে কত মাইনে পান বিলাসবাবু! ওভারটাইম খেটে মাইনের পরও কিছু আয় হয়। তাতে শুধু দিন চলে যায়, কিন্তু জীবন বোধহয় চলে না। অনেকগুলি ছেলেপিলে, কোনটিকেই আজ পর্যন্ত স্কুলে পড়াতে পারলেন না। শুধু ঐ জয়ন্তী, দেনাটেনা করেও জয়ন্তীকে কলেজ পর্যন্ত, অর্থাৎ ঐ আই-এ'র ফার্স্টইয়ার পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন ; তারপর আর নয়। অনেকেই জানে, এবং কার কাছ থেকে

যেন কুমুদও কথাটা শুনেছিল, দেশের বাড়ি বেচে দিয়ে মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা মজুত করে রেখেছেন বিলাসবাবু। কিন্তু কই? আজও তো বিয়ে হলো না জয়ন্তীর। তবে কি টাকাগুলো সব ফুলুরি খেয়েই ফুঁকে দিলেন বিলাসবাবু? পাড়ার লোকে জানে, সকালবেলা শুধু দু'আনার ফুলুরি খেয়ে চাকরি করতে বের হয়ে যান প্রুফ-রীডার বিলাসবাবু।

রাস্তার এই ফুটপাথে কার্ফ্যু, ঐ ফুটপাথে কার্ফ্যু নেই। বেশ হিসাব করে পথ চলতে হয়। একটা দোকানের সামনে দুটো লাশ পড়ে আছে, ভয়ঙ্কর হুল্লোড় তুলে একদল লোক দোকান ভাঙছে। শিউরে ওঠে জয়ন্তী। ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। এক হাত বাড়িয়ে খপ করে জয়ন্তীর একটা হাত ধরে ফেলে কুমুদ—ভয় পাবেন না, তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন।

যেন কতদিনের চেনা বন্ধু আর বান্ধবী। জয়ন্তীর হাতটা পরম নির্ভয় আর নিরাপদ হয়ে কুমুদের হাতের মুঠোয় বাঁধা পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি হাঁটে আর হাঁপায় জয়ন্তী, আর হঠাৎ কেমন যেন আক্ষেপের মত স্বরে বলে ওঠে—উঃ, আপনি আমার চেয়ে কত বড়, তবু আমাকে আপনি করে বলছেন কেন?

কুমুদ হাসে! হাওড়ার ব্রীজের মুখে এসে পৌঁছতেই কুমুদ বলে—হাঁটতে তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে জয়ন্তী, একটা ট্যাক্সি ডাকি, কেমন?

ট্যাক্সিওয়ালা বলে—ঢাকুরিয়া যেতে একশো টাকা—

মুখ কালো করে জয়ন্তী বলে-এত টাকা দিতে পারবো না কুমুদবাবু। হেঁটেই চলুন।

কুমুদ—ট্যাক্সিভাড়া আমি দেব।

চেঁচিয়ে ওঠে জয়ন্তী—না, না, না, ছিঃ, আমার একটু কষ্টের জন্যে একশো টাকা খরচ হবে, কি যে বলেন আপনি!

, বিকেলও পার হয়ে গিয়েছে। ঢাকুরিয়া পৌঁছতে হলো সন্ধ্যা। অর্ধেক আস্ত আর অর্ধেক ভাঙা, কলাগাছ ঘেরা একটা বাড়ি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছেড়ে কুমুদ হেসে হেসে বলে—বাড়ির মেয়ে এইবার বাড়িতে যান, আমি চলি।

কোন কথা বলে না জয়ন্তী। এতক্ষণের এত ভয়, উদ্বেগ, পথচলার কষ্ট আর আতঙ্ক, তবু যেন কিসের ছোঁয়ায় সবই স্নিগ্ধ ও মধুর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সব যেন শূন্য হয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে কুমুদ রায়। তাকে আর একটা মিনিটও এখানে থামিয়ে রাখাবার কোন অর্থ হয় না। কুমুদ রায় জয়ন্তী সেনের কেউ নয়।

কুমুদ বলে—কি? কথা বলছো না কেন?

জয়ন্তী—একটু রেস্ট নিয়ে তারপর যদি যেতেন...।

কুমুদ—না, আমার জন্যেও বাড়ির সবাই বোধহয় এতক্ষণে দুশ্চিন্তায় ছটপট করছে, যাই সশরীরে দেখা দিয়ে তাদের নিশ্চিন্ত করে দিই।

জয়ন্তী—কিন্তু...

জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হয় কুমুদ। কিন্তু কি? এর মধ্যে আর কিন্তু থাকবার তো কথা নেই। হঠাৎ পথের আলাপ, কয়েক ঘন্টা শুধু একসঙ্গে পথ চলার পালা এই তো এখানে এসে শেষ হয়ে গেল। আর এখানে আসবার কোন দরকার কোন দিন হবে না। কিন্তু কি বলতে চায় জয়ন্তী?

জয়ন্তী বলে—কিন্তু আপনি তো আর কোন দিনও এখানে আসবেন না।

কুমুদ বলে—তা, তা, আসতে পারি হয়তো; কিন্তু কেন, কিসের জন্যে?

জয়ন্তী বলে-একদিন এসে চা খেয়ে যাবেন।

বলতে বলতে কেঁপে হাঁপিয়ে কেমনতর হয়ে যায় জয়ন্তীর শরীরটা। চোখ দুটো যেন নতুন করে ভয় পেয়ে শিউরে উঠছে। সারা মুখে যেন চলকে ওঠা রক্তের এক ঝলক আভা ছড়িয়ে পড়েছে। হাসতে চেষ্টা করছে জয়ন্তী, কিন্তু ভীরু চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠেছে।

দেখতে অদ্ভুত, বেশ তো সুন্দর—রোদ-বৃষ্টি খেলার মত একটা ছবি। জয়ন্তীর মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কুমুদ। মনে হয়, এই অনুরোধের ডাকে আর একবার আসাই উচিত। এলে ক্ষতি কি?

কুমুদ বলে—আসবো বই কি।

চলে গেল কুমুদ—তারপর আরও কতবার জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখা হতেই অপ্রস্তুত হয়ে কুমুদ বলে—মনে আছে জয়ন্তী। যাব, একদিন যাব, নিশ্চয়। কাজের ফাঁকে একটু সময় পেলেই যাব।

জয়ন্তীর একটা উত্তর শুনে একদিন সত্যিই লজ্জা পেয়েছিল কুমুদ—সত্যিই কি আপনার কোনদিন সময় হবে?

যেন জয়ন্তীর জীবনের ছোট একটা আশাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সন্দেহ দেখা দিয়েছে জয়ন্তীর মনে। কিসের সন্দেহ? কলাগাছে ঘেরা একটা অর্ধেক আস্ত আর অর্ধেক ভাঙা বাড়ির আহ্বানকে এমন কিছু দামী বস্তু বলে মনে করে না চারশো' টাকা মাইনের ওয়েলফেয়ার অফিসার, জয়ন্তী কি সত্যিই এইরকম একটা সন্দেহ করে বসলো?

কিন্তু কুমুদ জানে, নিজের মনের কাছে তো ফাঁকি দিয়ে কোন লাভ নেই, অনেকবার যেতে ইচ্ছা করেছে। কিন্তু ভয় ; গেলে কি জয়ন্তীর কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না? একবার যাবার পর যদি বার বার যেতে হয়, যদি জয়ন্তী ভুল করে মনে করে ফেলে যে কুমুদ তাকে দেখবার জন্যই আসছে? না যাওয়াই ভাল। যাওয়াও আর হয়নি। কি ভাবলো, কি মনে করলো জয়ন্তী, তা জয়ন্তীই জানে।

কিন্তু ওরা কি সেই জয়ন্তী সেনের কথা বলছে? ভাল করে শুনতে আর বুঝতে চেষ্টা করে কুমুদ।

হ্যাঁ, সেই জয়ন্তী সেনের কথাই ওরা বলছে। বিলাসবাবুর মেয়ে জয়ন্তী। কিন্তু এ কিরকম অদ্ভুত, ভয়ানক, বেহায়া, নির্লজ্জ জয়ন্তীর কথা!

বাসর-ঘরের দিক থেকে খিলখিল হাসির উচ্ছ্বসিত শব্দ আবার ভেসে আসে। ওরা বলে—হ্যাঁ, ব্যাপারটা হাস্যকর হলেও একটা ট্রাজেডি। মেয়েটার আজও বিয়ে হোল না, কোনদিন হবেও না, কোন ভরসা নেই, তাই তো এরকম হন্যে হয়ে পরের বাসর-ঘরে ঢুকে...

—এই নিয়ে বার বার তিনবার দেখা গেল। একবার নিতাই-এর বোন সুধার বিয়েতে দেখেছি, আর দু'বার শ্যামলবাবুর দুই মেয়ে নিভা আর শোভার বিয়েতে। বাসর-ঘরে ঢুকে বরের সঙ্গে সে যে কি ঢলাঢলি, কাণ্ড দেখে আর সব মেয়ে লজ্জা পেয়ে ঘর ছেড়ে চলেই গেল।

—বাস্তবিক, জয়ন্তী সেনের বাহাদুরী আছে বলতে হবে। বাসর-ঘরের আমোদ জমাতে ওরকম ওস্তাদ মেয়ে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। কিন্তু একটু মাত্রা ছাড়া ; চিরুণী হাতে নিয়ে শোভার বরের, সেই গোবেচারা ভদ্রলোকের পাট-করা-চুলের টেড়ি পালটে দিয়ে দিব্যি চেঁচিয়ে উঠল জয়ন্তী সেন—এইবার ভাল করে দেখ শোভা, বর পছন্দ হয় কিনা।

শোভার মাসিমা একটু রাগ করেছিলেন—দেখিস বরের কোলের ওপর যেন বসে পড়িস না জয়ন্তী।

হেসে চেঁচিয়ে ওঠে জয়ন্তী—তাতে কি আর ক্ষতিটা হবে মাসিমা? শোভা একটা বেশ ভাল সতীন পেয়ে যাবে।

দুর ছাই, কি যে বলে জয়ন্তীটা! মেয়েরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিস-ফিস করে ওঠে।

সুধার বিয়ের সময় বাসর-ঘরে বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডুয়েট গেয়েছিল জয়ন্তী, গানটাও আবার একটা বেহায়া প্রেমের গান। তাও ভাল ছিল, কিন্তু যখন বরকে অবিরত চিমটি কেটে অস্থির করে তুললো জয়ন্তী, তখন অমন মুখচোরা মেয়ে সুধাও চুপ করে

থাকতে পারেনি।

—কি বললে সুধা?

—সুধা বললে, এবার একটু থাম তো জয়ন্তী। তোর চিমটিগুলো গুড়মাখানো নয়।

—জয়ন্তী কি বললে?

জয়ন্তী বেপরোয়া হেসে চেঁচিয়ে উঠলো, নিশ্চয়ই গুড় মাখানো, জিজ্ঞেস করে দেখ তোর বরকে!

বাসর ঘরের দিক থেকে আর খিলখিল হাসির স্বর অনেকক্ষণ হলো ভেসে আসে না। বাসর-ঘরটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল কেন?

শুনতে পায় কুমুদ, ওরা তখন বলছে—এ একটা ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কারও বাসর-ঘরের দরজায় জয়ন্তীকে দেখলেই সবাই একটু ঘাবড়ে যায়। হলোই বা বাসর-ঘর, একটা অবিবাহিত বয়স্ক মেয়ে পরের বর নিয়ে এরকম ঘাঁটাঘাঁটি করবে, কনে আর কনের বাড়ির লোকেরা পছন্দ করবে কেন? তাই সকলে সাবধান হয়ে গিয়েছে। সুলতার বৌদি বলেছেন, এ-বাড়িতে জয়ন্তীর ওসব বিশ্রী ফষ্টি-নষ্টি চলবে না। বাড়াবাড়ি করে তো থামিয়ে দেওয়া হবে।

আর নয়, উঠে দাঁড়ায় কুমুদ রায়। এতক্ষণ ধরে যেন এক ভয়ানক জুয়াচুরির কাহিনী শুনছিল কুমুদ রায়। যেন একটা স্বপ্নের ফুল হঠাৎ কয়লা হয়ে ঝরে পড়ছে। সেই শান্ত আর লাজুক আর চোখ ছলছল জয়ন্তী সেন একটা নিষ্ঠুর মিথ্যা! যাক্, খুব ভাল হয়েছে, ঐ গিল্টি-করা চরিত্রের মেয়ের একটা অনুরোধের জালে ধরা পড়েনি কুমুদ রায়।

চলেই যাচ্ছিল কুমুদ রায়, কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। বিয়ে বাড়ির ভিতরে হঠাৎ কেমন যেন একটা গভীর ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। যারা সামিয়ানার নীচে বসে গল্প করছিল, তারাও হঠাৎ চমকে উঠে ভিতরে চলে গেল। শুনতে পায় কুমুদ, একটা হাসি-হাসি কথা কাটাকাটি যেন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। সুলতার বৌদি জয়ন্তীর হাত ধরে হাসতে হাসতে আসছেন। বৌদির মুখের হাসিটিও কেমন যেন, বেশ চতুর অথচ বেশ শক্ত।

বৌদি বলেন—অনেক করেছ ভাই জয়ন্তী, আর কেন? নিজের বরের জন্যে একটু রাখ, সব ফুরিয়ে দিচ্ছ কেন?

জয়ন্তী হাসে, কেমন যেন জ্বলন্ত সেই হাসি।—একটুও ফুরিয়ে দিইনি বৌদি, সব জমা আছে।

বৌদি হাসেন—খুব ভাল কথা। তা এখন অনেক রাত তো হলো, বাড়ি যেতে চাও তো একটা গাড়ি ডেকে দিই।

জয়ন্তী হাসে—হাত ধরে গল্প করতে করতে যখন গেট পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন তখন বাড়ি না যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

ঠিক হয়েছে, এই রকমই অপমান ঐ মেয়ের জীবনের উপযুক্ত উপহার। সামিয়ানার নীচে এক কোণে দাঁড়িয়ে জয়ন্তীর মুখটার দিকে তাকিয়ে দুঃসহ ঘৃণায় জ্বলে ওঠে কুমুদ রায়ের চোখ।

কুমুদকে দেখতে পেয়েছে জয়ন্তী। চমকে ওঠে জয়ন্তী, তার পরেই যেন গেটের বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিশে যাবার জন্যে ছুটে চলে যায়।

আর কুমুদ রায়ও যেন সেই মুহূর্তে তার ঘৃণার জ্বালা শান্ত করার জন্য বাইরের বাতাস পাওয়ার আশা ছুটে বের হয়ে যায়।

কিন্তু শান্ত হয় না সেই ঘৃণার জ্বালা! পথের আলো-অন্ধকাব আর বাতাস সবই যেন তেতে রয়েছে। তার চোখের সম্মুখ দিয়ে ছায়ামূর্তির মত হন্‌হন্ করে হেঁটে চলে যাচ্ছে যে, সেই তো সেই জয়ন্তী সেন।—জয়ন্তী! হঠাৎ ডেকে ওঠে কুমুদ।

জয়ন্তী দাঁড়ায়। কুমুদ কাছে এগিয়ে এসে বলে—ইচ্ছে ছিল না, তবু একটা কথা না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারছি না।

জয়ন্তী বলে—বলুন।

—তোমার এ দশা হলো কেন?

—কি?

—এই যে, যার জন্যে সুলতার বৌদি আজ তোমাকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

জয়ন্তী হাসে—মানুষের বাসর-ঘরে ঢুকে বেহায়ার মত হৈ-হৈ করি বলে!

কুমুদ—অ্যাঁ?

জয়ন্তী আরও হাসে—একটু থিয়েটার করি কিন্তু তাতেই ওরা ভয় পেয়ে যায়। ভয় পাইয়ে মজা দেখি, এই মাত্র। আপনি কি মনে করেন যে...।

কুমুদ চেঁচিয়ে ওঠে।—জঘন্য থিয়েটার। ওগুলো তোমার মনের একটা লোভের খেলা।

জয়ন্তীর অমন কালো চোখের নরম ভুরুও বেঁকে শক্ত হয়ে ওঠে।—হয়তো তাই, তাতে আপনার কি?

হঠাৎ মুষড়ে পড়ে কুমুদ রায়ের যত রাগী অহঙ্কার। বড় শক্ত প্রশ্ন করেছে জয়ন্তী, প্রশ্নটা যেন কুমুদ রায়ের গলায় বিঁধেছে ; উত্তর দিতে পারে না কুমুদ।

জয়ন্তীর হাসিটা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।—যদি বিলাসবাবুর মেয়ে না হয়ে ধরুন আপনারই বাড়ির মেয়ে ঐ থিয়েটার করতো, তবে আপনারা তাকে কি বলতেন বলুন তো?

কুমুদ—কি বলতাম?

জয়ন্তী—বলতেন, কী সুন্দর মিশুকে মেয়ে!

আর একটা আঘাত যেন এই পৃথিবীর সব অহঙ্কেরে ভদ্রতার মাথায় ভয়ানক এক ঠাট্টার আঘাত করেছে জয়ন্তী। বিব্রতভাবে কুমুদ বলে—তা নয় বোধহয়।

আর কোন কথা না বলে চলতে শুরু করে জয়ন্তী। কুমুদ বলে—একটা কথা শোন। তুমি বোধহয় আমার ওপর রাগ করে আছ।

জয়ন্তী আশ্চর্য হয়—আপনার ওপর রাগ করবো কেন?

কুমুদ—তোমার সেই নেমন্তন্ন আজ পর্যন্ত...।

হেসে ফেলে জয়ন্তী—আপনি আমাকে খুবই ভুল বুঝেছেন কুমুদবাবু। আপনার ওপর রাগ করবো কোন্ সাহসে? আপনি এলে খুবই খুশি হতাম কিন্তু আসতে পারেননি বলেও কোনও দুঃখ নেই।

কুমুদের মনের বিরাট একটা বিশ্বাসের পাহাড়কে যেন অবাধে একটা টোকা দিয়ে অনায়াসে ভেঙে চূর্ণ করে দিচ্ছে জয়ন্তী। জয়ন্তীর মনে তাহলে কোন দুঃখ নেই, কুমুদের জন্য কোন মুহূর্তেও পথের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করেনি। কোন আশা করেনি জয়ন্তী, একটুও ব্যাকুল হয়নি জয়ন্তী। এই তিন বছরের হৃদয়টারও সবই তাহলে শূন্য।

বোধহয় এই শূন্যতার বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে কুমুদের গলার স্বরটা তপ্ত হয়ে বিদ্রূপ করে—বাঃ!

আবার আশ্চর্য হয় জয়ন্তী। কুমুদের চোখ দুটো ছটফট করছে। কি কঠোর এই দৃষ্টির ভঙ্গী, যেন শত্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কুমুদ রায়।

জয়ন্তী বলে—আমি যাই।

কুমুদের গলার ভিতর থেকে যেন একটা বদ্ধ আক্রোশ খান্‌খান্ হয়ে ফেটে পড়ে—তোমাকে খুবই ভুল বুঝেছিলাম জয়ন্তী। ঠিকই বলেছেন সুলতার বৌদি, তোমার সবই ফুরিয়ে গিয়েছে। পরের বাসর-ঘরে ঢুকে থিয়েটার করে করে সবই ফুরিয়ে দিয়েছ।

জয়ন্তী—কিছুই ফুরিয়ে যায়নি, সব জমা আছে! যার চোখ নেই সে-ই শুধু দেখতে পায়

না।

বলতে বলতে জয়ন্তীর দু'চোখে যেন অদ্ভুত এক জ্বালা ঠিকরে ওঠে ; তারপরেই একেবারে গলে যায়। শিশিরমাখা কালো পাথরের মত চিকচিক করে জয়ন্তীর জলভরা কালো চোখ।

আর ভাবতে পারেনি, বোধহয় হাতটাকে সামলাতেও পারেনি কুমুদ। জয়ন্তীর একটা হাত হঠাৎ শক্ত করে ধরে ফেলে কুমুদ—তোমাকে একটুও ভুল বুঝিনি।

জয়ন্তী—তাহলে একদিনের জন্যেও আসতে পারেননি কেন? বিলাসবাবুর মেয়ে ভালবেসে ফেলবে, সেই ভয়ে?

কুমুদ হাসে—না। বিলাসবাবুর মেয়েকে ভালবেসে ফেলবো, শুধু এই ভয়ে।

জয়ন্তী—আজ ভয় করছে না?

কুমুদ—ভয় করছে, যদি এখনি হাত ছাড়িয়ে নাও।...চল, তোমার বাড়ি পর্যন্ত যাই।

এটা একটা আশ্চর্য বিয়ে ; সেই বিয়ের বাসর-ঘরে কি যে আশ্চর্য ব্যাপার হবে, ভেবে কূল পায় না অনেকেই। একে তো জয়ন্তীর মত ঢলানি মেয়ের বিয়ে, তায় কুমুদের মত বর। কলাগাছে ঘেরা অর্ধেক আস্ত আর অর্ধেক ভাঙা বাড়ির এক উৎসবের রাতে বাসর-ঘরের ভিতরে আর কাছে এসে যারা ভিড় করলো, তাদের মধ্যে বেশি চঞ্চল হয়ে উঠলো সুলতা, শোভা, নিভা আর সুধা, সেই সঙ্গে সুলতার বৌদিও। কুমুদের সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়ে, জয়ন্তীর সৌভাগ্যের বাহবা দিতে হয়। বড় বেশি আশ্চর্য হয়ে বাহবা দিয়েছে সবাই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হওয়া এখনও বাকি আছে। এই তো সবেমাত্র বাসর-ঘরে ঢুকেছে বর আর কনে। সুলতার বৌদি অনেকেরই কানে কানে ফিসফিস করে বলেন—কাউকে কিছু বলতে-কইতে হবে না। তোমরা শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ।

কি দেখবো বৌদি?

—জয়ন্তীর ঢলানি। পরের বরকে কাছে পেয়ে যে মেয়ে ঢলে পড়ে, নিজের বরকে নিয়ে সে আজ কি কাণ্ডটা করে একবার দেখ! বিনা টিকেটের তামাশা দু'চোখ ভরে দেখে নিয়ে তারপর যে যার বাড়ি চলে যেও।

কথা শেষ করেই বৌদি আবার ফিসফিস করেন—ও কি, ও আবার কোন ঢঙ। লজ্জায় মরে যাই ব্যাপার দেখছি!

হ্যাঁ, সেই জয়ন্তী সেনই বাসর-ঘরের এক কোণে মাথা হেঁট করে বসে আছে। পায়ের নখটুকুও দেখা যায় না। বেনারসীর সাজে বন্দিনী হয়ে যেন একটা নীরব ও নিথর ছবি বসে আছে। আঁচলটাও খুঁটছে না জয়ন্তী, হাত দুটোও দেখা যায় না। বোঝা যায় না, কি আছে হাতে। ব্রেসলেট না কঙ্কন? ক'গাছি চুড়ি, ক'ভরির চুড়ি?

কিন্তু আর কতক্ষণ? সবাই যে আশায় আশায় আর দাঁড়িয়ে বসে ক্লান্ত হয়ে গেল।

বৌদি বলেন—বরের সঙ্গে একটা রঙ্গের কথা কও জয়ন্তী, আমরা শুনে ধন্যি হয়ে যাই।

জয়ন্তী—আপনিই বলুন।

বৌদি—আমি কি করে বলি জয়ন্তী? তোমার কাছ থেকে যদি সে আর্ট রপ্ত করে নিতাম, তবে হয়তো বলতে পারতাম।

নিভা, সুধা, সুলতা আর শোভা খিলখিল করে হেসে ওঠে। জয়ন্তীর অচঞ্চল চেহারাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বৌদি সকলের কানের কাছে ফিসফিস করেন—চল, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

ঘর ছেড়ে চলে গেল সকলেই।

ঘরের বাইরে এসে নিভা বলে—জয়ন্তী এমন গম্ভীর হয়ে গেল কেন বৌদি?

বৌদি একটু চড়া গলায় অথচ বেশ মিষ্টি করে কটকটিয়ে উত্তর দেন—গম্ভীর নয়, গম্ভীর নয়। ও-রকমই হয়. বেহায়ার মত সবই আগে আগে পরের বাসরঘরে ফুরিয়ে দিলে..।

হাসি সামলাতে গিয়ে কথা শেষ করতে পারেন না বৌদি এবং হাসি সামলেই বলে ওঠেন—দুর ছাই, এখনও যে খাওয়া-দাওয়া বাকি আছে ; অথচ রাত বোধহয় দশটারও বেশি হয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সারতেও বেশ দেরী হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, বাড়ি যাবার জন্য যার সবচেয়ে বেশি তাড়া, তিনিই একটু দেরী করলেন। এবং নিভা, শোভা ও সুলতাকে আশ্চর্য করে দিয়ে তিনিই বাসর-ঘরের বন্ধ দরজার কাছে এসে ঘুরঘুর করতে লাগলেন। যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন বৌদি। বন্ধ জানালার একটা ফাঁক।

সুলতা বলে—আঃ, কি করছো বৌদি! এমন কি আর নতুন ব্যাপার ধেখবে?

বৌদি ফিসফিস করেন—ভাবতে দুঃখ হয়, পরের বাসর-ঘরে লোভীর মত সব ফুরিয়ে দিলে, নিজের বরকে কাছে পেয়েও কি দিয়ে...।

বলতে বলতে জানালার ফাঁকে চোখ রেখে চুপ করে গেলেন বৌদি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, বিশ মিনিট, নড়বার নাম করেন না বৌদি।

সুলতা ডাকে—আঃ, এতক্ষণ ধরে দেখবার কি আছে, চলে এস বৌদি।

কিন্তু বৌদির চোখটা যেন জানালার ফাঁকে সেঁটে গিয়েছে। শোভা দু'বার বৌদির আঁচল ধরে টেনেছে, তবুও বৌদির হুঁস হয় না। সুধা একবার পিঠে চিমটি কাটে, বৌদির কঠিন শরীরটা একটুও কাঁপে না।

—ভোর করে দেবে না কি বৌদি! সুলতা যখন বৌদির হাত ধরে জোর করে একটা টান দেয়, তখন যেন হুঁস ফিরে পেয়ে, কিন্তু যেন একটু হাঁপাতে হাঁপাতে জানালার কাছ থেকে সরে আসেন বৌদি।—উঃ।

নিভা বলে—কি বৌদি?

বৌদি বলেন—কী মেয়ে রে বাবা! এমনটি আর কোথাও দেখিনি, কখনও শুনিনি।

শোভা—খুব ঢলেছে বুঝি?

বৌদি—ঢলা তো দুটিখানি কথা।

সুধা হাসে—তাহলে গলে গিয়েছে বলুন।

বৌদি—সেটাও তো দুটিখানি কথা।

সুলতা—তবে আবার কি কথা? কি করছে জয়ন্তী?

বৌদি—সে কথা আর বলা যায় না। একেবারে উপচে পড়ছে।

শক থেরাপি

ওয়াটকিনস্ মূরের ছেলে বেসিল মূর পাগল।

বুড়ো ওয়াটকিনস্ মুর ইণ্ডিয়ান আর্মিতে অফিসার ছিলেন। অবসর নিয়ে এখন থাকেন ছোটনাগপুরের এই শহরটিতে। খাস শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা পাহাড়ে টিবির ওপর ইউক্যালিপ্‌টাসে ঘেরা তাঁর বাংলো। নাম—দি রিট্রিট।

এই খাপছাড়া জায়গাটা বুড়ো মূরের এত পছন্দ কেন? এ সম্বন্ধে বুড়োর একটা বাঁধা বক্তব্য ছিল, যা তিনি এই পর্যন্ত সহস্রাধিক দেশী বিদেশী ভদ্রলোককে শুনিয়েছেন।

—এ বাংলোটা ঠিক আমাদের শায়ারের ক্যাসেলের মতো। আমরা ইয়র্কশায়ারের লোক, যারা গ্যালান্ট্রির জন্য বিখ্যাত। তা ছাড়া আমরা, দি মুরস্ অব ইয়র্কশায়ার, আমরা হলাম নীলরক্ত ব্রিটন। আজ দুশো বছর ধরে আমরা ওই একই গ্র্যাণ্ড ওল্ড ক্যাসেলে বাস করে আসছি। আজ শিভাল্‌রীর টর্চ নিভে গেছে, তাই আমরা গরীব। যত জেলে হয়েছে অফিসার, ডিঙ্গি নিয়ে ছুটোছুটি করাই নাকি বীরত্ব! ওদেরই মাইনে বেশি।

...কিন্তু ও-কাজ আমাদের ধাতে সয় না। অকৃতজ্ঞরা আজ ভুলে গেছে যে, ফরাসী ব্যারনদের হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে আমরা একদিন ডেলের মাটিতে সার দিয়েছিলাম! আজ আমাদেরই মাইনে কম।

...বিদেশ, এমন কি, কলোনিগুলিকেও আমি ঘৃণা করি। শায়ার আমাকে ডাকছে। শেষ বয়সে আমি পেতে চাই সে বাতাস, যে বাতাসে নাইট টেম্পলারদের, আমার বাইশ পুরুষের নিঃশ্বাস মিশে আছে। এবার দেশে যাব।

...কিন্তু বড় কম পেনসন। আমার ছেলে বেসিল আসছে। তাকে আর্মি-সার্ভিসে একটা কাজে লাগিয়ে দিয়ে তারপর যাবার আগে ওর বিয়েটাও দেখে যেতে চাই।

সেই বেসিল এসেছে। একটা সাড়া পড়ে গেছে বিলিতী গিন্নী মহলে।

মিসেস ওয়াল্টার মুসৌরীতে মেয়ের কাছে তার করলেন। স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এল ক্লারা। কার্সিয়াং থেকে মিসেস স্টোকস্ আনালেন সিলভিকে। উটি থেকে চলে এল মিসেস লেন-এর মেয়ে আনা।

শহরের সাধারণ লোকেরাও চিনে ফেললো বেসিলকে। বড় ভালো হকি খেলোয়াড়। এবারে টুর্নামেন্টে ওই একা যজ্ঞের ঘোড়ার মতো দশদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একা এগারজনের খেলা খেলে দিয়েছে। তাই এবার ট্রফি পেল একাদশ প্যান্থার, ইওরোপীয়ান দল।

কিন্তু এ কদিনের মধ্যেই বুড়ো মূর দশবার রুমালে চোখের জল মুছেছেন। রাত জেগে প্রার্থনা করেছেন দুদিন।—আমার সম্মান, আমার রুটি, এই বয়সে, ও লর্ড, যেন ধূলো হয়ে না যায়।

বুড়ো মূর বুঝেছেন, বেসিল পাগল। এ কথাটা এখনও অন্যত্র রাষ্ট্র হয়নি।

সেদিন প্রাতরুত্থানের পর পাইপ ধরিয়ে বাগানে পায়চারি করতে বেরিয়ে এলেন বুড়ো মূর। একটা দৃশ্য দেখে হতবাক্ হয়ে থমকে রইলেন কিছুক্ষণ। বেসিল বাংলার মেথরানীকে সসম্ভ্রমে একটা সিগারেট সাধছে।

রাগে রাজমাক ব্রিগেডের ত্রিশ বছরের ঝানু খুনিয়ার অফিসার ওয়াটকিনস্ মূরের চোখে সকালবেলার সূর্য নিবে এল। দিশেহারা হয়ে দুবার বেল্ট হাতড়ে রিভলভার খুঁজলেন, একবার ফুলের টবটা তুললেন, তারপর সামলে নিয়ে গলা দিয়েই তোপ দাগলেন—বেসিল!

বেসিল এগিয়ে এল হাসিমুখে—গুডমর্ণিং, ড্যাড।

—এস আমার সঙ্গে।

বুড়ো মূর বেসিলকে যেন বধ্যভূমির দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এলেন ড্রইংরুমে। বেসিলকে একটা কৌচের ওপর বসিয়ে প্রশ্ন করলেন—তুমি কি জান যে তুমি একটা পাগল?

—না। তোমার অসুখ করেছে ড্যাড। চোখ বড় লাল!

—চুপ! তুমি ভালো হতে চাও?

—নিশ্চয়।

—তবে এসব গর্হিত কাজ খবরদার করবে না—আজ সন্ধ্যায় ওয়াল্টারের বাড়িতে চায়ে উপস্থিত থাকবে।

—আচ্ছা।

—খাঁটি ব্রিটনের মতো ব্যবহার করবে।

—নিশ্চয়!

ওয়াল্টারের বাড়িতে চায়ের আসরে নিমন্ত্রিতেরা বসে আছে। স্টোকস্ আর লেন গিন্নীও আছেন। মোহিনী সাজে সেজে বসে আছে ক্লারা, আনা ও সিলভি। প্রধান অতিথি বেসিল এখনো আসেনি। কিন্তু সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

বুড়ো মুর প্রমাদ গুনলেন মনে মনে। অপরাধীর মতো বললেন—আমি তো তাকে দেখে এসেছি পার্টিতে আসবার জন্যে পোশাক চড়াচ্ছে। বোধ হয় এসে পড়বে এখনি।

নীল শার্ট, লাল কোর্ট আর হলদে ট্রাউজার পরে, একটা মাউথ অর্গান বাজাতে বাজাতে আসরে আবির্ভূত হলো বেসিল। মরমে মরে গিয়ে বুড়ো মুর অস্ফুট আর্তনাদ করলেন—হেভেনস্!

ক্লারা, আনা ও সিলভি আতঙ্কে শিউরে উঠে আর চেয়ার ছেড়ে বুড়ীদের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বুড়ো মুর বুকে সাহস বেঁধে বললেন—তুমি ভুল করেছ বেসিল, এটা ফ্র্যান্সি ড্রেসের আসর নয়!

মিসেস ওয়াল্টার—এটা ক্লাউনদের ক্লাব নয়।

মিসেস স্টোকস্—এটা জিপসিদের আড্ডা নয়।

মিসেস লেন—এটা সোসাইটি।

সকলের এই আপত্তি বিক্ষোভ আর প্রশ্নের উত্তরে গালভরা হাসি হেসে বেসিল জানাল--তোমাদের সবারই খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না?

ক্লারা, আনা ও সিলভি একসঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেল। উঁচু-হিল জুতোর দ্রুত ঠকঠকিতে তরুণীহিয়ার নিদারুণ ধিক্কার বেজে উঠল।

ছাগলের মতো একটা লাফ দিয়ে বেসিলও চললো তরুণীদের অনুসরণ করে। সিঁড়ির কাছে শোনা গেল সুতীব্র চিলের ডাকের মতো তরুণীদের ভয়ার্ত চিৎকার। তারা সংজ্ঞা হারাবার উপক্রম করল।

নিমন্ত্রিতেরা দৌড়ে এলো। বুড়ো মুর গিয়ে খিমচে ধরলেন বেসিলের কোটের কলার। পাইপটা দিয়ে খট্ করে বেসিলের মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন—ভুলে যাচ্ছ?

বুড়ীরা ততক্ষণে সপ্তমে গলা চড়িয়ে কোলাহল তুলেছে। ওয়াল্টার গিন্নী রুমাল দিয়ে ক্লারাকে হাওয়া করতে করতে কটুকণ্ঠে ধমকে উঠলেন—শীগগির তোমার জিপসি ছোঁড়াকে সরিয়ে নিয়ে যাও মিস্টার মুর, অভদ্রতার সীমা আছে।

বুড়ো মুর বেসিলকে শক্ত করেই ধরে ছিলেন। এইবার একটি ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—চল শুয়োর ঘরে। দেখাচ্ছি মজা!

যেতে যেতে বুড়ীদের দিকে বিষদৃষ্টি হেনে ওয়াটকিনস্ বললেন—জিপসি? মুর ফ্যামিলির ছেলে জিপসি? ইউ ওয়াল্টার্স এণ্ড স্টোকস্ এণ্ড লেনস...।

করিডোরের প্রান্তে পৌঁছে আর একবার পেছনে তাকিয়ে বুড়ো মুর নিম্নস্বরে গালাগালিটা দিয়েই ফেললেন—হাফকাস্ট মংগ্রেল্স্!

বেসিল হো হো করে হেসে বললো—ঠিক বলেছ ড্যাড। যত সব পাগল!

বুড়ো মুরের সত্যই দুঃখের দিন আরম্ভ হয়েছে। বেসিলের উন্মত্ততা বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। বুড়োর সকল যুক্তি অনুনয় মিষ্টিকথা, সব নিষ্ফল হয়েছে।

বেসিল সমস্তক্ষণ ঘরের বাইরে থাকে। দিগ্বিজয়ীর উৎসাহ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে

ঘাটে। বুড়ো মুর সমস্তক্ষণ বন্দী হয়ে পড়ে থাকেন বাংলোর ভেতর। সোসাইটিতে আর মুখ দেখাবার দুঃসাহস নেই তাঁর। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে অহর্নিশ ভর্ৎসনার বিরাম নেই। বেয়ারা খানসামার মুখে বেসিলের প্রাত্যহিক কীর্তিকলাপের খবর কানে আসে। বুড়ো মনের স্থৈর্য হারাতে বসেছে।

কিন্তু রেভারেণ্ড জ্যাক প্রায়ই আসেন। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—আশা ছেড় না, মিস্টার মূর। আমি বলছি, প্রডিগাল বেসিল একদিন ফিরে আসবে সুপথে।

সোসাইটিতে সকলে একবাক্যে ঘোষণা করেছে—পাগল না আরও কিছু! গভীর জলের মাছ, বদমাস।

এ-বছরেও বেসিল হকি-টুর্নামেণ্টে খেলতে নেমেছে, কিন্তু তরুণ সমিতির পক্ষে। জয়ী হলো তরুণ সমিতি। হেরে গেল ইওরোপীয়ান একাদশ প্যান্থার। সোসাইটিতে বুড়ো মুরের উদ্দেশ্যে অভিশাপের বর্ষণ হয়ে গেল এক পশলা।

বেসিল ভিড়েছে তরুণ সমিতির সঙ্গে। তরুণ সমিতি নিজেকে ধন্য মনে করল এই শ্বেতদ্বীপবাসী খেলোয়াড়ের সাহচর্য লাভ করে। সেক্রেটারি ধীরেন উকিলের বাড়িতে ভোজের ব্যবস্থা করে বেসিলের সংবর্ধনা করা হলো।

বেসিল খিচুড়ি খাচ্ছে গোগ্রাসে। ধীরেনের জেঠামশায় রিটায়ার্ড সাবজজ, শ্রদ্ধাপ্লুত চক্ষে দেখছেন এ দৃশ্য। বললেন—মাঝে মাঝে এ রকম এক-আধটা মহাপ্রাণ ইংরেজ দেখা যায়। আমি চটকলের এক সাহেবকে জানতাম, বেচারা কত ভক্তি করে সত্যনারায়ণের সিন্নি খেতো।

জেঠামশাই বেসিলের সঙ্গে আলাপ করে বললেন—আর্মিতে, না হয় আই পি. এস-এ ঢুকে পড় মিস্টার মুর। অফিসার না হলে কি তোমার মতো ইংরেজকে শোভা পায়?

বেসিল সরোজের কানে কানে জিজ্ঞাসা করল—ভদ্রলোকের মাথায় কোন দোষ আছে নাকি?

—আরে না, উনি হলেন ধীরেনের আঙ্কল।

বেসিল হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অভ্যাগত কত ভদ্রলোক কত কুশল প্রশ্ন করছেন, কিন্তু বেসিল সাড়া দিচ্ছে না। সে তখন শুধু ঘাড়টা মোরগের মতো কাত করে ঘন ঘন চোখ তুলে তাকাচ্ছে ওপরে দোতলার জানালার দিকে, যেখানে ধীরেনের স্ত্রী, বোন, ভাইঝি এবং আরও পাঁচ ছটি কৌতূহলী তরুণীর মাথার জটলা।

এই অস্বস্তিকর দৃশ্যটা ভোজনরত তরুণ সমিতির সভ্যেরা সকলেই দেখল। ধীরেন গম্ভীর হয়ে খেয়ে চললো তাড়াতাড়ি।

জানালার দিকে তাকিয়ে বেসিল ছাড়ল তীব্র কর্ণভেদী একটা শিস।

কড়া মেজাজের লোক সরোজ। ভোজনান্তে বাইরে গিয়ে চেপে ধরল বেসিলকে—তুমি লেডিদের দিকে অমন অভদ্রের মতো তাকাচ্ছিলে কেন?

—লেডি? বেসিল আশ্চর্য হলো।

—হ্যাঁ, ঐ জানালার দিকে?

বেসিল একগাল হেসে গলার স্বর নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললো—মেয়েগুলো অমন বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছিল কেন বলো তো? উদ্দেশ্য কি?

—আবার বলে মেয়েগুলো! বাড়ির ঐ লেডিদের কথাই তো বলছি।

মুখ কাঁচুমাচু করে মাথার টুপিটা বুকে ঠেকিয়ে বেসিল বললো—দোষ হয়েছে, মাপ কর। লেডিদের ডাক একবার, মাপ চেয়ে নি।

—না, থাক্।

—আমার অনুরোধ, ডাক একবার।

—আঃ, চুপ করো। তুমি জান না তাই বলছ। হিন্দু লেডিরা পরপুরুষের সামনে আসে না।

বেসিল আবার আশ্চর্য হয়ে কথাটার মর্ম গ্রহণ করবার চেষ্টা করল।—পরপুরুষের সামনে আসে না? ওরা তা হলে বিয়ে করে কাকে?

সরোজ বেসিলের অবোধ্য খাঁটি বাংলায় শুধু একটা গালাগালি দিয়ে চুপ করে গেল।

বেসিলের এই বেয়াড়াপনার জন্য সকলের মনে যে একটু তিক্ততার সূচনা করছিল, কতকগুলো কারণে তা মুছে এল ক্রমশ। বড় সাদাসিধে এই সাহেবটা। খাওয়াতে ও খরচ করতে উদার! ক্লাবে মোটা চাঁদা দেয়, শিকারে ঘোরার যত পেট্রলের খরচও একাই বহন করে। ফ্যাকাসে বাঙালী ছেলের মনে যতটুকু দেমাক থাকার কথা, এই খাঁটি সাদাচামড়া সাহেবের মনে তাও নেই! মেমসাহেবরা একে পাগল অপবাদ দেবে না কেন? নইলে ওদের আভিজাত্যের পায়া ভারি থাকে কি করে?

সরোজের বাড়িতে সরস্বতী পুজোর ধুম। অনাহূত বেসিল নিজেই পৌঁছে গেল। সরস্বতী মূর্তির দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে।

ধর্মশীল সরোজ ক্ষুব্ধ হলো মনে মনে। প্রকাশ্যে বললো—তুমি এসেছ? যাক্ ভালোই। তবে জুতো পায়ে অতটা এগিয়ে যেও না।

বেসিল বললো—দেখছি তোমাদের আইডল। বেশ মেয়েটি, আমার বড় পছন্দ হয়।

বেসিলকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সরোজ বুঝিয়ে দিল—খুব ভেবে-চিন্তে কথা বলবে। কখ্খনো কারো ধর্ম নিয়ে ফষ্টি করবে না। কোন হিন্দু তা সহ্য করে না।

বেসিল সঙ্গে সঙ্গে সবিনয় মাপ চাইল—আচ্ছা, কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছি।...তোমাদের আইডল আমার পছন্দ হয় না। হলো তো?

তরুণ সমিতির থিয়েটার হবে। সবচেয়ে বেশি চাঁদা দিল আর পরিশ্রম করল বেসিল। স্টেজ বাঁধবার ব্যাপারে একাই দশটা কুলির কাজ করে দিল। দুপুরে বসে বসে গ্যাসবাতিগুলো বেসিলই ঘষে মেজে পরিষ্কার করে রেখে গেল।

গ্রীণরুমে সবে আলো জ্বলেছে। হুমড়ি দিয়ে ঢুকল বেসিল—হিরোইন কই?

বীরেন ও রেবতী তখন দাড়ি কামানো আরম্ভ করেছে মাত্র! বেসিলের ব্যস্ত জিজ্ঞসার জবাব দিল সরোজ—ঐ যে ওরা। এখনো ড্রেস করেনি।

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল বেসিল। তারপর অত্যন্ত বিশ্রীভাবে মুখ ভেংচে বললো—পাগলামি পেয়েছে ইডিয়টস্? দাঁড়াও।

পটপট করে সবকটা গ্যাসবাতি নিবিয়ে দিয়ে বেসিল সরে পড়ল। সরোজ প্রতিজ্ঞা করল —এর প্রতিফল বুঝিয়ে দেব ব্যাটাকে। সেবার মাপ চাইতে ছেড়ে দিয়েছি। আবার বেয়াড়াপনা শুরু করেছে!

তরুণ সমিতির ভুল ভাঙছে ক্রমশ। ধীরেন হয়েছে সবচেয়ে অতিষ্ঠ। রাত-বেরাতে গিয়ে বেসিল ডাকাডাকি করে। কখনো আবার নিঃশব্দে এসে বাগানের ফুলগাছের আড়ালে চোরের মতো বসে থাকে। অনেক বোঝানো হয়েছে, কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করছে না। জেঠামশায় ধীরেনকে শাসিয়েছেন—ঐ রূপী বাঁদর যদি আবার বাড়ি চড়ে হল্লা করে, তবে ওকে এবং তোমাকেও খড়ম পেটা করব।

তবুও বেসিল মাঝরাত্রে ধীরেনকে ডাকতে এলো। জেঠামশায় একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য বেরিয়ে এলেন।

বেসিল জেঠামশায়কে দেখেই কুশল জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছ সিক ডগ?

ধীরেনও এলো। জেঠামশায় ক্রোধান্ধ হয়ে বললেন—এটা একের নম্বরের হারামজাদা হে ধীরেন। এই মাত্র কি বলেছে শুনেছ?

বেসিল পকেট থেকে বার করল একটা বোতল আর ছোট একটা গেলাস। হুঙ্কার দিয়ে

উঠলেন জেঠামশায়—এই খবরদার। মদ্য-টদ্য খেতে হয় স্টেশনের পায়াখানায় বসে খেগে যা। ওঠ এখান থেকে।

অবিচলিত বেসিল বলে—চটো কেন আঙ্কল? একে বলে হোলি ওয়াটার ; ধীরেনও খুব রেলিশ করে।

ধীরেনের মুখের দিকে জ্বলন্ত চক্ষুপিণ্ড দুটি তুলে জেঠামশায় তাকিয়ে রইলেন।

এতদিনে তরুণ সমিতি বুঝেছে যে বেসিল আসলে পাগল নয়, ও অন্য কিছু। পেটে পেটে সূক্ষ্ম একটা উদ্দেশ্য খেলছে। ওর সঙ্গ আর কোন ভদ্রলোকের পক্ষে নিরাপদ নয়। ধর্মে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করছে।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বাঁচাতে তৎপর হয়ে উঠল। তরুণ সমিতি আর বেসিলের অন্তরঙ্গতায় ভাঙন ধরল এতদিনে।

এবারের হকি-টুর্নামেন্টে বেসিল খেললো বাহাদুর ক্লাবের পক্ষে। বাহাদুর কিলাব. বিড়িওয়ালা অক্ষয় যার সিকটারী, লতিফ মিস্ত্রি যার মানিজার, সবজিওয়ালা প্রাণকুমার যার পিসিডেন। এ ক্লাবের খেলোয়াড়ের বেশির ভাগই মোটরবাসের খালাসী।

উন্নাসিক উষ্মায় ভদ্রলোকেরা মন্তব্য করলেন—ইস্, অধঃপতন দেখি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। সকলে লজ্জিত হলেন এই কথাটা ভেবে, একদিন এই নিকৃষ্ট রুচির লোকটাকেই তাঁদের ক্লাবে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন তাঁরা।

বেসিলের অধঃপতন হয়েছে, কথাটা মিথ্যে নয়। কোন আপত্তি ওর গতিরোধ করতে পারছে না। যেন অজস্র মূঢ়তার অণু-পরমাণু দিয়ে সে গড়ে তুলেছে নিজের এক বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড। তাই একটা বিজাগতিক আহ্লাদে মজে আছে ওর সমস্ত সত্তা। অপ্রমেয় উৎসাহে অদ্ভুত ক্ষুরধার নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারের মাটি কেটে কেটে নীচে নেমে চলেছে সে। কোথায় যে পাগলের কোহিনূর লুকিয়ে আছে তা সে-ই জানে।

বেসিলকে দেখা যায় খুব ভোরে হরিপদর রেস্টুরেন্টে বসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে চা ও সিঙ্গাড়া। পকেট হাতড়ালে দু চারটে বিড়িও পাওয়া যায় আজকাল। দুপুরে লতিফের আড্ডায় বসে তবলা পেটাপেটি করে। বিকেলে অক্ষয়ের বিড়ির দোকানে বেঞ্চের ওপর শুয়ে শুয়ে গ্রামাফোনের বাজনা শোনে। তালে তালে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মিঠে শিস দেয়।

অপরিচিত কেউ এমন দীনহীন সাহেবকে দেখে মাঝে মাঝে দয়ার্দ্র ভাষায় প্রশ্ন করে—তোমার বাড়ি কোথায় সাহেব? বেসিল গম্ভীরভাবে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়—বেনারস।

সমস্ত দিন যেখানেই থাক, সন্ধে হলে বেসিল ঠিক পৌঁছে যায় প্রাণকুমারের বাড়ি। তার সান্ধ্য আড্ডা এইখানে।

কলকাতা থেকে গুণ্ডা-আইনে তাড়া খেয়ে প্রাণকুমার এখানে এসে সবজির দোকান করেছে। সপরিবারে ভালো মানুষের মতো দিনযাপন করে আজকাল। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও ছেলে, অর্থাৎ চম্পা আর কেষ্ট।

প্রথম দিন প্রাণকুমারের বাড়ির দাওয়ায় চাটাইয়ের ওপর বসল দুই বন্ধুতে। কুলুঙ্গি থেকে প্রাণকুমার নামাল ধেনো মদের বোতল। কপাটের ফাঁকে উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চম্পা বিস্মিত হয়ে বার বার দেখল বেসিলকে, ভিন্ন গ্রহের জীব আজকের এই নতুন অতিথিকে বেসিলও যেন থেকে থেকে চমকে উঠল অদৃশ্য কাঁচের চুড়ির ঠুন্‌কো হাসির শব্দে। আধ-ভেজান কপাট লক্ষ্য করে ছুটে গেল তার শর-বৎ দৃষ্টি, বার বার।

পানীয় নিঃশেষ হতে প্রাণকুমার ডাকল—এবার খাবার দিয়ে দাও।

চম্পা পর্দানশীন নয়। পরপুরুষের সামনে বের হতে লজ্জা বোধ করবে, চম্পা সে জাতের বা সে সমাজের মেয়ে নয়। আগে ঠিক এখানেই দাওয়ার ওপর বসত জুয়ার আড্ডা বখরা নিয়ে যখন হাতাহাতির যোগাড় হতো তখন চম্পা এসে প্রাণকুমারকে ঠেলে নিয়ে ঘরে

বন্ধ করত। আর, ঝাঁটা হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই সব জুয়াড়ী সরে পড়ত একে একে।

আজ ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে চম্পা ঘেমে উঠল। লজ্জা করছে তার। নিজেরই কাছে এ লজ্জা ধরা পড়ে গেল ; চম্পা আরও লজ্জিত হলো।

আবার ডাকে প্রাণকুমার—খাবার দাও শীগগির। অগত্যা আসতে হলো চম্পাকে। দুটো থালায় করে রুটি-তরকারি বয়ে নিয়ে সসঙ্কোচে চম্পা বেরিয়ে আসতেই বেসিল ব্যস্ত হয়ে টুপি হাতে উঠে দাঁড়াল। প্রাণকুমার বললো—থাক্ হয়েছে, তুমি বসো। বেশি কায়দা করতে হবে না।

বেসিল পর পর তিনটে গান শোনাল। চম্পা ঘরের ভেতর লুটিয়ে পড়তে লাগল হেসে হেসে।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে বেসিল দেখল মূর তখনো বাগানে একটা সোফায় নিঝুম হয়ে মুষড়ে পড়ে আছে। বুড়োর হাঁটুতে হাত রেখে বেসিল ডাকল—ড্যাড!

—কে, বেসিল!

—সুসংবাদ ড্যাড। আজ একজন ইণ্ডিয়ান লেডির সঙ্গে পরিচয় হলো।

দু চোখ বিস্ফারিত করলেন বুড়ো মূর—সর্বনাশ! ভুল করছ ডিয়ার বয়, মস্ত ভুল করেছ। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে লেডি হয় না। তুমি শয়তানের ছায়া দেখেছ।

বেসিল ওঠবার উপক্রম করতেই বুড়ো মূর খুব মিষ্টি করে বললেন—শোন বেসিল, কথা আছে। আর্মি হেড-কোয়ার্টার থেকে তোমার কাজের চিঠি এসেছে। বলো, কি উত্তর দিই?

—লিখে দাও, বেসিল মূর একজন পাগল।

—দূর হও। দূর হও।

—দুঃখ করো না ড্যাড। আমি ভেবে দেখেছি, আমি একজন পাগল।

প্রাণকুমারের বাড়ির সান্ধ্য আড্ডাই এখন বেসিলের সমস্ত দিনের ধ্যান। প্রাণকুমারও ওকে অবাধ প্রশ্রয় দিয়েছে। এখানে ওখানে দু'চারটে নিন্দের কথাও যে ওঠেনি, তা নয়। তবুও।

নেশায় যখন প্রাণকুমার ঢলে আসে, বেসিলের চোখে তখন রঙ লাগে শুধু। হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে কেষ্টকে ডাকতে থাকে বেসিল—কিসটো কিসটো।

চম্পা অগত্যা বেরিয়ে এসে বলে—চেঁচিও না, আমার নিন্দে হয় জান?

—আচ্ছা বেশ। কিসটোকে পাঠিয়ে দাও, ওকে আদর করব।

—না, এখন বাড়ি যাও। রাত হয়েছে।

এমনি এক বৈঠকে, প্রাণকুমারের নেশার জোর সেদিন একটু মাত্রার বাইরে। বললো—এ জীবন আর ভালো লাগে না। আমি মরব।

বেসিল বললো—তুমি নির্ভয়ে মর। তোমার বউছেলের চার্জ নেব আমি।

—শালা মনহুঁস! প্রাণকুমার খালি বোতলটা তুলে নিয়ে বেসিলের কানের ওপর জমিয়ে দিল প্রচণ্ড এক আঘাত। দুহাতে মাথা চেপে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বেসিল। চম্পা বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে এসে প্রাণকুমারের হাত থেকে কেড়ে নিল বোতলটা। বললো—কালাপানি যাবার শখ হয়েছে?

বেসিলের কোটের আস্তিন থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। চম্পা ডাকল—সাহেব! বেসিল সাড়া দিল না কোন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল চম্পা। তারপর সোনালী চুলে ভরা বেসিলের মাথায় হাতটা রেখে আস্তে আস্তে আবার ডাকল—বেসিল? সাহেব?

অর্ধনিমীলিত চোখে প্রাণকুমার আবার তর্জন করে বোতলটা তুলবার চেষ্টা করল—অ্যাঁ, চোখের সামনেই...

হঠাৎ বেসিল উঠে বললো—মাপ করো। আমি আর কখনো ওকথা বলব না। গুড বাই!

পরদিন প্রাতে বেসিলকে শহরে দেখল না কেউ। খবরাখবরে সকলেই জানল, কী ব্যাপার। অক্ষয়, লতিফ আরো অনেকেই মারমূর্তি হয়ে প্রাণকুমারকে চেপে ধরল—একটু ক্ষ্যাপাটে বলেই ওকে তুমি কসাইয়ের মতো মারবে? ওরই পয়সায় ঘটি ঘটি মদ গিলছ রোজ, লজ্জা করে না? বাঘ না হয় তার পরিচয় ভুলে ভেড়ার দলে মিশেছে? তা বলে তাকে গুঁতোতে হবে?

চম্পা স্পষ্ট করে জানাল প্রাণকুমারকে—কিছু শুনব না ; যাও, বেসিলকে নিয়ে এস। নিশ্চয় জখম হয়ে ও কোথায় পড়ে আছে। ঐ জখম তোমাকেই ভালো করতে হবে।

একজন কনেস্টবল সঙ্গে নিয়ে পুলিস ইন্সপেক্টর এলেন—বুড়ো মুর সাহেবের ছেলেকে মেরেছ তুমি? গুণ্ডামি করে সরে যাবে মনে করেছ? ইন্সপেক্টর প্রাণকুমারের একটা কান মুঠো করে চেপে ধরলেন।

মাথায় পটিবাঁধা বেসিল সাইকেল থেকে হঠাৎ এসে নামল। সটান এসে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে?

—আমি রায় বাহাদুর মহেশ্বরীপ্রসাদ সিং, ইন্সপেক্টর অব পুলিস।

—লুক হিয়ার পুলিসম্যান। তুমি যদি আমার কোন ব্যাপারে নাক ঢোকাতে আস, তা হলে সে নাক আমি এইরকম সমতল করে দেব। বেসিল পা তুলে তার জুতোর সোলটা দেখিয়ে দিল।

পুলিস ইন্সপেক্টর চাপা রাগে ফুলে ফুলে বললেন—বেশ, তোমার বাবার অনুরোধ মতো আমি ভালো করতে এসেছিলাম। এবার তাঁকে গিয়েই সব বলছি।

—হ্যাঁ, যাও।

এদিকে ওদিকে বেসিলের আর ভ্রূক্ষেপ নেই। সোজা দাওয়ায় উঠে ডাকল—কিসটো! কিসটো! কপাটের ফাঁকে দেখা দিল চুড়িপরা হাত আর শাড়ির আঁচল।

লতিফ মুখ টিপে হাসল। সকলকে উদ্দেশ করে বললো—চলো ইয়ার! আমরা বৃথা কেন আর এখানে।

অক্ষয় বললো—হ্যাঁ চলো। এ বিলিতি শরবত বাবা। বড্ডো সুগার!

প্রাণকুমারের পরিবর্তন এসেছে। ঘর-সংসার থেকে সে বেশ একটু আলগা হয়ে থাকছে যেন। বেসিলের মাথা ফাটানোর পর থেকে নিরন্তর একটা অনুশোচনা তাকে বড় নরম করে দিয়েছে। কোন ব্যাপারে আজকাল প্রতিবাদ তো করেই না, এমনিতেও কথা বলে না।

চম্পারও পরিবর্তন কিছু কম নয়। সন্ধ্যে হবার আগেই প্রত্যহ তার প্রসাধনের ব্যস্ততা বেড়ে উঠেছে অনেক। এক ছাঁদে দুটো দিন আর খোঁপা বাঁধে না। রকম-সকম দেখে প্রাণকুমার দু-একবার ঠাট্টা করেছে—কী ব্যাপার? মেমদের ভাত মারবে না কি?

সেদিন এদিকের আকাশে ধীবে মিইয়ে এলো গোধূলির ছটা। ওদিকে ঝাউবনের মাথার ওপর জাঁকিয়ে ভেসে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ। তিন শো চৌষট্টি দিনের সব হিসেব ভুল করার লগ্ন এলো ঘনিয়ে। আজকের এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে প্রগল্‌ভ বেদনায় অস্থির হয়ে উঠবে নরনারীর স্নায়ু। আজ হোলি উৎসব।

চকবাজারে আবীরের ঝড় উঠেছে। উদ্দাম ঢোলকের বাদ্য, চিৎকার, নাচ, খিস্তি, গান আর কুঙ্কুম-পটকার মার চলেছে সেখানে। পিচকারি যুদ্ধে চকের পথটাও রঙে রঙে বিচিত্রিত।

মাতালের বমির উপদ্রবে ড্রেনের ব্যাংগুলো সড়কে উঠে পড়েছে।

শ'পাঁচেক উৎসাহী দর্শক বৃত্তাকারে ঘিরে ডোমেদের সঙ দেখছে। তারই মাঝখানে গাধার পিঠে চড়ে পাগলা বেসিল, মাথায় টোপরের মতো একটা বিস্কুটের টিন। ডোম ছেলেরা বিকট উল্লাসে চিৎকার করে বেসিলের গায়ে ছুঁড়ে মারছে মুঠো মুঠো ফাগ। বেসিলও অনুপ্রাণিত হয়ে গাধার পেটে লাথি মেরে চক্কর দিচ্ছে বোঁ-বোঁ করে। মাঝে মাঝে বোতল উপুড় করে মুখের ভিতরে ঢেলে নিচ্ছে ধেনো মদের এক একটা তরল উচ্ছলতা, আর কড়কড় করে চকোলেট চিবিয়ে চলেছে।

চম্পা আজ দুপুর থেকে ঘরে বসে রান্না করেছে নানারকম সুখাদ্য। আজ ঘরের বাইরে একটু উঁকি দিয়ে দেখবারও উপায় নেই। সেই মুহূর্তে পথের ভিড় থেকে হাজার হাজার গলায় গর্জে উঠবে দুরন্ত খেউড়ের উল্লাস।

চম্পা আজ পরেছে উৎসবের বেশ। ডুরে শাড়ি আর জরদা রঙের ঝুলা, তার ওপর রূপোর আভরণ। কোমরে ছড়িয়ে দিয়েছে চওড়া বিছুয়া, হাতে বাজু আর কঙ্কন, গলায় হাঁসুলি আর দু-পায়ে ঘুঙুরদার ছড়া। সুর্মা টেনে চোখের টানা বাড়িয়েছে চিত্রা হরিণীর মতো।

চম্পা জানে প্রাণকুমার আজ আসবে না। কোন বছরই হোলির দিনে সে আসে না। দুটো দিন সে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়।

—কিন্তু চম্পা আজ ভাবছে—বেসিল আজ যদি আসে!

দাওয়ার ওপর মচমচ জুতোর আওয়াজ। এক মুঠো ফাগ নিয়ে বেসিল এসে দাঁড়াল।

—চম্পা!

ডাক শুনে ঘরের ভেতর শিউরে উঠল চম্পা। বেসিল আজ চম্পাকেই নাম ধরে ডাকছে, অন্যদিন ডাকে কেষ্টকে।

—আজ হোলি হ্যায় চম্পা!

বাইরে আসতো হলো চম্পাকে। বেসিল হাতের ফাগ নিয়ে লেপে দিল চম্পার মুখে। আঁচলে চোখমুখ মুছে একটু সুস্থির হয়ে চম্পা দাঁড়িয়ে রইল।

নেশায় তরল চোখের তারা দুটো তুলে চম্পার দিকে তাকিয়ে বেসিল বলে—চম্পা!

—কি বেসিল?

—তোমায় আজ একটা কথা বলব।

ভয় পেয়েছে চম্পা। কিন্তু পালিয়ে যেতেও অক্ষম, পা দুটো অচল অনড় হয়ে গেছে। একটু ভেবে নিয়ে চম্পা শেষে হাতজোড় করল। মিনতি করে বললো—না, বলো না।

—উপায় নেই। আমি বলবই।

—না, বলো না বেসিল।

মাথাটা থেকে-থেকে ঝুঁকে পড়ছে সামনে। কপালটা এক হাতে টিপে ধরে বেসিল তবু দাঁড়িয়ে আছে। চম্পা কপালের ঘাম আর চোখের কোণ দুটো আঁচলে মুছে নিয়ে যেন দম ছেড়ে নিল। বললো—আচ্ছা, আর একদিন বলো।

—গুডনাইট! বেসিল শিস বাজিয়ে সটান চলে এসে একটা রিক্সার ওপর বসল তালগোল পাকিয়ে. চলো, দি রিট্রিট! গান ধরল গলা খুলে—দেয়ার ওয়াজ এ গ্রীন হিল ফার অ্যাওয়ে...।

উৎসবের প্রমত্ততা শেষ হলে অবসাদ আসে। চম্পার এলো জ্বর, শুধু জ্বর। প্রথম দিন থেকেই বেহুঁস। প্রাণকুমার চিকিৎসার ত্রুটি করল না। চম্পারই উৎসব দিনের আভরণগুলো একে একে বিক্রি করে ডাক্তার আর ওষুধের খরচ যোগানো হলো, ক্রমাগত সাতদিন ধরে।

হকি ম্যাচ থেকে ফিরে এসে বেসিল দেখল সিভিল সার্জন মিত্র সাহেব চম্পাকে দেখে চলে যাচ্ছেন। পথরোধ করে দাঁড়াল বেসিল—কি সার্জন? কার ট্রিটমেন্ট করছ? রোগীর, না

তোমার মানিব্যাগের?

—কি বললে? আমার ট্রিটমেন্টের কমপ্লেন করছ? তোমার সাহস তো খুব!

—সেই তো আমার দুঃখ। তোমাকে জেলে দেওয়া উচিত, তা না করে শুধু কমপ্লেন করতে হচ্ছে।

—ভালো করে কথা বল মিস্টার মূর। আমরা শুধু ভালো ট্রিটমেন্ট করতে পারি। ভালো করা ভগবানের হাত।

বেসিল চট্ করে মাথার টুপিটা খুলে ভিক্ষাপাত্রের মতো মিত্র সাহেবের সামনে তুলে ধরে বললো—যা ফী নিয়েছ ফেরত দাও। প্লীজ। ওগুলো ভগবানকেই দেব।

প্রাণকুমার এসে বেসিলকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যেতে যেতে বেসিল আরও দুচারটে কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল—আমার উপদেশ শোন সার্জন। শুয়োরের হাসপাতালে কাজ নাও। ওরা কমপ্লেন করে না।

প্রাণকুমারকে বেসিল বোঝালো—এদের ভরসা ছাড়, এরা বড় বুদ্ধিমান। আমি নিয়ে আসছি একজন অ্যাপথিকারী। ওদের বুদ্ধি কম, তাই সর্বনাশও করে কম।

সন্ধের অন্ধকারে বেসিল শহরের সব অলিগলি ঘুরে বেড়ালো। ইংরাজীতে লেখা একটা বিবর্ণ সাইনবোর্ড খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিয়ে সে বাড়িটার বারান্দায় উঠে ডাকল—কবিরাজা!

কেরোসিনের ডিবি হাতে অতি সন্তপর্ণে বেরিয়ে এল লাটু কবিরাজ। বেসিলকে দেখে পাঁশুটে হয়ে গেল তার মুখের রঙ। বললো—আমি তো সঞ্জীবনী রাখি না সাহেব।

—জ্বর ভালো করতে পার? ভাল ফী দেব!

ধড়ে প্রাণ এল লাটুর।—জ্বর? আমার খলের আওয়াজে জ্বর পালায়।

—একদিনে পারবে?

—এক ঘণ্টায় পারব। তবে ঐ যা বললে! ভালো ফী চাই।

—আচ্ছা এস।

—নাড়ি দেখবার জন্যে কিন্তু এক্সট্রা ছ'আনা লাগবে।

—বেশ, পাবে।

—আর, মোক্ষম ওষুধ চাও তো সাত আনা লাগবে বলে দিচ্ছি।

—হ্যাঁ পাবে। শীগগির চলো ম্যান।

লাটু তবুও বলে রইল। আমতা আমতা করে দুবার মাথা চুলকে বিনীত ভাবে বললো—সাহেব, আদ্দেক অ্যাডভান্স কর মাইরী!

—হোয়াট ম্যাডনেস্! বেসিল লাটুর হাতে একটা সিকি ধরিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে একরকম দৌড়ে দৌড়ে পৌঁছল প্রাণকুমারের বাড়ি। চম্পার তখন আর জ্বর নেই ; হিম হয়ে এসেছে হাত পা। হেঁচকি আরম্ভ হয়েছে।

আজ বেসিলের সান্ধ্য জীবনটা কাটল আবগারী দোকানে। প্রচুর মদ খেয়ে এসে শুয়ে রইল প্রাণকুমারের সবজির দোকানে, বেগুনের ঝুড়িগুলোর ওপর। গভীর রাতে পথে যেতে অনেকেই শুনলো পাগলা বেসিলের কাতরানি। যে শোনে সে-ই বলে—উঃ, সাহেবটা আজ ভয়ানক বেহেড হয়েছে।

ভোরে সূর্য ওঠার আগেই চম্পাকে খাটিয়ায় তুলে নিয়ে শ্মশানযাত্রী কুটুমেরা চলেছে। কেষ্টকে কোলে করে সঙ্গে চলেছে প্রাণকুমার। পেছনে বাহাদুর ক্লাবের বিমর্ষ সভ্যবৃন্দ—লতিফ, অক্ষয়, আরও অনেকে। সবার পিছনে হকিস্টিক কাঁধে, একটা লম্বা খড় দাঁতে চেপে, হেঁটে চলেছে বেসিল।

ক্ষীরগাঁও নদী, একফালি ঝিকঝিকে লঘু জলের স্রোত ; চওড়া বালির চড়া। তারই উপর

এক জায়গায় চিতা সাজানো হয়েছে। মড়িপোড়া বামুনেরা একটা আগুনের কুণ্ড রচনা করেছে, চন্দনকাঠ কাটছে কুচো কুচো করে। দূরে বালির ঢিপির উপর বসে আছে অক্ষয়, লতিফ আর বেসিল, অনাত্মীয় শ্মশানবন্ধুর দল।

চম্পাকে খাটিয়া থেকে নামিয়ে স্রোতের ওপর শোয়ানো হলো শবস্নানের জন্য। একটু গভীরজলে নিয়ে বারকয়েক চুবিয়ে বালির চড়ার ওপর রাখা হলো।

কে একজন বললো—হাতের চুড়িগুলো রাখতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে একজন একটা পাথর দিয়ে চম্পার কব্জি দুটো পিটিয়ে পিটিয়ে রুপোর চুড়ি দু-গাছি খুলে নিল।

পুরুত মিসিরজি বললেন—এবার ঘি লেপে দাও সর্বাঙ্গে।

প্রাণকুমার এক থাবা ঘি নিয়ে মাখাতে লাগল চম্পার পায়ে বুকে মাথায়। মিসিরজি বললেন—মাখো মাখো, এসব কাজ একটু শক্ত হৃদয়ে করতে হয়। আত্মা যখন চলে যায় তখন আর কী থাকে—মিট্রিকা পুত্‌লা। এতে আবার লজ্জা!

হকি-স্টিকটাকে শক্ত মুঠোয় ধরে ততক্ষণে বেসিল উঠে দাঁড়িয়েছে। বাতাসে ফর্‌ফর্‌ করে উড়ছে ওর গলার লালরঙা টাই।

লতিফ বললো—বসো বেসিল। বসে বসে দেখ।

—না, বসব না। টেরিবল্‌। ওরা রোস্ট করবে এখনি।

মিসিরজি মন্ত্র পড়ছেন—ওঁ দেবাশ্চাগ্নি মুখা সর্বে হুতাশনং গৃহীত্বা...।

প্রাণকুমার ঘি মাখিয়ে চলেছে। বালিমাখা চম্পার মাথাটা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে শাস্ত্রাচারের দাপটে। এলো চুলে লেগে আছে শ্যাওলার একটা চাপড়া। ভিজে ডুরে শাড়ি শ্লথ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে বালির ওপর।

হঠাৎ একটা পোড়া ইট ভীমবেগে মিসিরজির বুকে এসে আঘাত করল—বাপ রে বাপ! মিসিরজি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

লতিফ আর অক্ষয় চেঁচালো—ধর ধর, পাকড়ো।

—ইউ ক্যানিবাল্‌স্‌। বেসিল হকিস্টিক হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্মশানবন্ধু জনতার উপর। প্রাণকুমার এসে চেপে ধরল বেসিলের চুলের ঝুঁটি।

বেসিল আজ আর কাউকে চিনতে পারছে না যেন। থরথর করে কাঁপছে ওর চোয়ালের হাড়। নীল চোখ দুটো তেতে জ্বলছে স্পিরিটস্টোভের স্থির শিখার মতো। লালমুখের কুঞ্চিত মাংসের রেখায় রেখায় যেন একটা ভয়ানক প্রতিহিংসা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শ্মশানকুটুমরা ততক্ষণে কুড়িয়ে নিয়েছে এক একটা বাঁশ। দু মিনিটের মারেই বেসিলের হকিস্টিক খসে পড়ল হাত থেকে। লতিফেরা এসে ওকে একরকম হেঁচড়ে নিয়ে চলে গেল। পরিশ্রান্ত অক্ষয় হাঁক ছেড়ে বললো—উঃ, বিলিতি পাগল ; ভূতের চেয়েও সাংঘাতিক।

শ্মশান থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে লতিফ বেসিলকে ছেড়ে দিয়ে বললো—এবার বাড়ি যাও, বেসিল।

ক্ষীরগাঁও নদীর সর্পিল বালুরেখা ধরে বেসিল এগিয়ে চললো। দুপুরের সূর্য তেতে উঠেছে। কাকের দল নেমেছে স্রোতের জলে পাখা ধুতে। বালিয়াড়ির মরা গুগলি-শামুক মাড়িয়ে বেসিল চলে যাচ্ছে। সামনে পাহাড়তলীর চড়াই, পেছনে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত ; অদূরে ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় নিঝুম, দি রিট্রিট।

এখানে দেখবার কেউ নেই। বেসিল শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। বিকেল শেষ হলো, রোদ পড়ে সন্ধে হলো। ঘুঘুর দল আশেপাশে ধানের শীষ খেয়ে চলে গেল। বেসিল টের পেল না কিছুই।

ঘুম ভেঙে বেসিল প্রথম চোখ মেলতেই চমকে ওঠে। মনে হয়, ওই তো, সামনেই তো সেই ক্যাসেলের পিনাকেল ; পাশে বড় একটা তারা উঠেছে। পেছনের অন্ধকারে, দিগন্ত-

জোড়া মুরল্যাণ্ডের বুকে যেন পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা থমকে রয়েছে। একটা লার্ক ডেকে ডেকে উড়ে চলে গেল দূর হিলক-এর দিকে। এগিয়ে চললো বেসিল।

যেন মাচান করা আঙুরের ইয়ার্ড বাঁয়ে রেখে, মাঠভরা ডেইজি মাড়িয়ে বেসিল আজ এগিয়ে চলেছে। আজ বাতাসে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে এপ্রিল দিনের অর্কিডের মৃদু সুগন্ধ। মনে হয় বেসিলের, তার পায়ের শব্দ শুনে অলিভগ্রোভের অন্ধকার থেকে এক ঝাঁক ম্যাগপাই উড়ে পালিয়ে গেল। জীর্ণ অ্যাবির ইট পাথরের স্তূপ থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝির ডাক।

এবার বেসিল পৌঁছেছে ডাইকের কাছে। পুরনো সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে শুনল, বহু দূরের ঝর্ণার জলধারার গানের মতো কাউন্টি চার্চের অর্কেস্ট্রা। মানেই বেলে পাথরের র্যাম্পার্ট, তারপর ফটক। নিরেট শতাব্দীর বাসা ঐ ক্যাসেল। যেন পিতামহের স্নেহ চোখে নিয়ে বেসিলের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে।

বেসিল বেশ বুঝল, তার ধমনী থেকে আজ নেমে গেছে একটা বিষের ভার। নতুন রকম লাগছে আজকের নিঃশ্বাস।

আবিষ্কার

অতসী আজ একা। সিনেমা হাউসের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অতসী, কেউ আজ আর তার সঙ্গে নেই।

এটা একটা নতুন দৃশ্য বটে। এই সিনেমা হাউসের গেটের কাছে অতসীকে কোন দিন একা এসে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। একা চলে যেতেও দেখা যায়নি। কেউ না কেউ তার সঙ্গী হয়ে আসে, এবং কারও না কারও সঙ্গিনী হয়ে অতসী চলে যায়।

এখানে স্টেশন আর বাজার ; তারই মধ্যে একটি সিনেমা হাউস। অনেক আলো জ্বলে এখানে, এবং মানুষের মুখের অনেক কলরব রাত দুটো পর্যন্ত এই জায়গাটার মুখরতা জাগিয়ে রাখে। কিন্তু এর পরেই যে মাইল খানিক লম্বা পথ, সেটা সন্ধ্যা হতেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। পথের দুপাশে শুধু খোলা মাঠের বুকে বাতাস হু-হু করে, আর সিরসির করে কাশের বন!

পথটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে অবশ্য সন্ধ্যা হতেই বিজলী বাতির চমক জাগে। নতুন একটা কাগজের মিল। হরেক রকমের বাংলো আর একই রকমের সারি সারি কোয়ার্টার। যেমন অফিসারদের বাংলো বাড়ির ফটকে, তেমনি কেরানী, কর্মী আর মজদুরদের কোয়ার্টারের আঙিনায় আলোর মেলা জেগে থাকে, সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত। অতসীর চোখের সামনে এখনকার সমস্যা শুধু এই যে, অন্ধকারে ভরা ঐ পথটা একা একা পার হয়ে যেতে সাহস হয় না। অতসীর মতো বয়সের কোন মেয়ের পক্ষে এরকম সাহস করা উচিতও নয়। এই বয়সটাও সঙ্গীহীন হয়ে থাকার বয়স নয়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অতসী। মিলের স্টোরবাবু প্রতুল বিশ্বাসের মেয়ে অতসী বিশ্বাস। শীতের সন্ধ্যা শেষ হয়েছে, রাতটা কুয়াশার ঘোরে ঘন হয়ে উঠেছে। সিনেমা হাউসের গেটের কাছে যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে অতসী। চারদিকের কলরবও একটু মৃদু হয়ে এসেছে। অতসীর মতো আরও যারা সিনেমা হাউসের ছবি দেখতে এসেছিল, তারাও চলে গিয়েছে। অতসী শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে যেন তার এই একাকিত্বের দীর্ঘশ্বাস শুনছে। সত্যিই অতসীর রঙীন ব্রেজারের ওভারকোটের পিঠটা তার দোলানো বেণীর ঘষা খেয়ে যেন একটা আর্ত নিঃশ্বাসের শব্দের মতো আক্ষেপ করে। অতসীর কালো মুখটা যেন ভয় পেয়ে আরো কালো

হয়ে গিয়েছে। পথের অন্ধকারে ভয় তো আছেই, কিন্তু বোধহয় সেজন্য নয়। অতসী যেন তার এই একলা জীবনের রূপটাকে দেখতে পেয়েছে। এই রূপের সঙ্গী হবার জন্য কাছে ছুটে আসবে, এমন মানুষ বোধহয় এই সংসারেই নেই।

কিন্তু এতদিন তো ছিল অনেক সঙ্গী। হেসে হেসে গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়ে কোন না কোন সঙ্গীর সঙ্গিনী হয়ে এই সিনেমা হাউসে কতবার ছবি দেখতে এসেছে আর চলে গিয়েছে অতসী। মিলের বাবু-কলোনির কে না জানে সেই কাহিনী? সকলেই জানে, প্রতুল বিশ্বাসের ঐ কুৎসিত চেহারার মেয়েটা নিজেই যেচে যেচে এক-একটা সঙ্গী ধরে। কিন্তু তারপর আর কতদিন? ওর ঐ ভয়ংকর কালো মুখ সেই সঙ্গীকে দশটা দিনও কাছে ধরে রাখতে পারে না। বিরক্ত হয়ে, ভয় পেয়ে আর সন্দেহ করে সরে যায় ক'দিনের সঙ্গী।

কেউ তো আর বাকি নেই। কিছুদিন দেখা গেল, লেবরেটরির শচীনকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমার ছবি দেখতে চলেছে অতসী। তারপর কিছুদিন ইলেকট্রিশিয়ান বীরেন। তারপর আর একজন। শেষ পর্যন্ত ছিল একজন। অতি নিরীহ মুখচোরা আর নিতান্ত ছেলেমানুষ, প্রিয়নাথ। অনেকেরই ভয় হয়েছিল ঘায়েল হলো বুঝি প্রিয়নাথ। প্রায় একটানা তিন মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা দিন অতসী বিশ্বাসের সঙ্গী হয়ে সিনেমার ছবি দেখতে গিয়েছে প্রিয়নাথ। অতসীর বাবা প্রতুল বিশ্বাসও এখানে-ওখানে অসাবধানে হঠাৎ বলে ফেলেছেন—ভাবছি, প্রিয়নাথের সঙ্গে অতসীর বিয়ে হলে কেমন হয়? মন্দ নয় ছেলেটি।

কিন্তু মুখচোরা প্রিয়নাথের মনের ভয় একদিন সতর্ক হয়ে উঠলো। আর কোন দিন অতসীর সঙ্গে প্রিয়নাথকে কোথাও দেখা যায়নি। মুখচোরা প্রিয়নাথ একদিন মুখ খুলে বলে না দিয়ে পারেনি—আমার সময় নেই মিস বিশ্বাস! সিনেমার ছবি দেখার রুচিও আমার নেই।

অতসীর মতো বয়সের মেয়েকে বিয়ে করার মতো বয়সের ছেলে এই ছোট একটা কলোনির সংসারে ক'জনই বা আছে? লেবরেটরির শচীন, ইলেকট্রিশিয়ান বীরেন, একাউন্ট্যান্ট প্রিয়নাথ, এবং আরও যাদের কথা মনে পড়ে প্রতুলবাবুর, এক-এক করে ঘটনার এক-একটি পরীক্ষায় বেশ ভালো করে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, অতসীর কালো মুখটা তাদের সবাইকে ভয় পাইয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। শুধু বেহায়া বলে দুর্নাম অর্জন করেছে অতসী। ক্লাবের আসরে প্রবীণ রতনবাবু প্রৌঢ় জীবনবাবুর কলপ লাগানো কালো চুলের দিকে তাকিয়ে বলেন—একটু সাবধানে থাকবেন জীবনবাবু। কলোনিতে ছেলেধরার উপদ্রব দেখা দিয়েছে।

যারা অতসীর কালো মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু সন্দেহ করে আর ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল, তাদেরই বা দোষ কি? কেউ গায়ে পড়ে অতসী বিশ্বাসের সিনেমা-যাত্রার সঙ্গী হতে আসেনি। যাকে দেখে মনে হয়েছে সঙ্গী হবার মতো মানুষ, তারই মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়েছে আর কি যেন ভেবেছে। তারপর, প্রায় গায়ে পড়ে আর অদ্ভুত ঢং করে অনুরোধ করেছে—আজ সন্ধ্যায় কষ্ট করে আমার একটু উপকার করতে হবে। সিনেমা হাউসে একটু পৌঁছে দিয়ে আসবেন আর নিয়ে আসবেন। প্লীজ, একা যেতে আসতে বড় ভয় করে, কি করব বলুন?

সেই অতসী বিশ্বাস আজ একা দাঁড়িয়ে আছে। কোন সঙ্গী নেই। চোখের সামনে শুধু পথের অন্ধকারের ভয়। সত্যিই অতসী বিশ্বাসের আজ বড় বেশি ভয় করছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে অতসী। চোখের সামনে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। অতসী কালো মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের মুখটা অতসীর অচেনা নয়। অনেকবার বাবু-কলোনির এ-পথে সে-পথে, আর এই স্টেশন ও বাজারে এই ভদ্রলোককে অনেক বার আসতে যেতে দেখেছে অতসী। শুধু কি তাই? মনে পড়ে অতসীর, হ্যাঁ, এই ভদ্রলোকই তো প্রতিদিন ঠিক বিকালবেলায়

অতসী বিশ্বাসের চোখের সম্মুখ দিয়ে চলে যান। প্রতিদিন বিকালে স্টোরবাবুর লতাজড়ানো কোয়ার্টারের বারান্দার উপর আরাম-চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে বই পড়ে অতসী। সামনে পথের উপর দিয়ে ঠিক সেই সময় চলে যান ঐ ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের মুখের দিকে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নেয় অতসী। তারপর আবার বই পড়তে থাকে।

—আপনি কি এখন বাড়ি ফিরবেন?

ভদ্রলোকের প্রশ্ন শুনে একটু আশ্চর্য হয় অতসী। অতসীর এই একাকী থাকা অসহায় অবস্থাটা কি সত্যিই আন্দাজ করতে পেরেছেন ভদ্রলোক? তাই সঙ্গী হতে চাইছেন?

উত্তর দিতে ভুলে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অতসী, যে-মুখের দিকে একবার মাত্র আনমনাভাবে ভ্রূক্ষেপ করে প্রায় প্রতিদিনই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অতসী। তাকিয়ে মুগ্ধ হবার মতো কিছুই নেই এই ভদ্রলোকের মুখের চেহারায়। একটি নিরেট কালো মুখ, কিন্তু চোখের দৃষ্টিটা বড় স্বচ্ছ ও সরল; আর বয়স? ত্রিশ বছরের বেশি হবে না বোধহয়। অতসীর মতো বয়সের মেয়ের সঙ্গী হবার মতো বয়স বৈকি।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে অতসী বলে—হ্যাঁ, বাড়ি ফিরব তো, কিন্তু...

—একা-একা অন্ধকারে এতটা পথ হেঁটে যেতে আপনি কোন অসুবিধা যদি বোধ করেন...

অতসী হাসে—অসুবিধা বোধ করছি বৈকি। রীতিমতো ভয় করছে।

—যদি বলেন, তবে আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

চমকে ওঠে অতসীর বিস্ময়। অতসীর এতক্ষণের এলোমেলো আর উদাস নিঃশ্বাসগুলির বেদনা যেন হঠাৎ এক সম্মান আর সান্ত্বনার ছোঁয়ায় প্রসন্ন হয়ে যায়। জীবনে এই প্রথম, একটি মানুষ নিজের থেকে যেচে অতসীর পথচলার সঙ্গী হতে চাইছে। ভদ্রলোক তেমনি অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে আছেন অতসীর মুখের দিকে। কে জানে, কি দেখতে পেয়েছেন ভদ্রলোক অতসীর ঐ কালো মুখের কুশ্রীতার মধ্যে।

প্রশ্ন করে অতসী—আপনি কি মিলের বাবু-কলোনিতে থাকেন?

ভদ্রলোক বললেন—কলোনির কাছেই থাকি।

অতসী—আপনি কি আমাকে চেনেন?

ভদ্রলোকের সরল চোখ দুটো অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে।—চিনি বৈকি, আপনি তো আমাদের প্রতুলবাবুর মেয়ে।

অতসী—আমারও নামটা জানেন না কি?

লজ্জিত হন ভদ্রলোক—জানি।

অতসী—আপনি?

ভদ্রলোক—আমি হলাম...

পরেশনাথ দত্তের মুখরতার উপর যেন প্রচণ্ড শব্দের আঘাত এসে লুটিয়ে পড়ে। পরেশনাথের কথা শেষ হবার আগেই দৈব আবির্ভাবের মতো একটা ঝকঝকে মোটরকার হঠাৎ ব্রেক কষে থেমে যায় সিনেমা হাউসের গেটের কাছে, আর কর্কশ হুংকারের মতো হর্নের আচমকা আওয়াজ শিউরে ওঠে।

—আপনি এখানে কি মনে করে দাঁড়িয়ে আছেন, মিস বিশ্বাস?

মোটরকারের ভিতর থেকে মুখ বের করে কথা বলে এক যুবক। সুন্দর সুশ্রী প্রসন্ন একটি মুখ। চিনতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না অতসীর। অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার মিস্টার চৌধুরীর ছেলে অভিলাষ চৌধুরী। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে পাটনাতে একটা সরকারী চাকরি পেয়েছে অভিলাষ। অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরছে সে। অতসী অনুমান করতে পারে, ওই রাত দশটার ট্রেনেই এসেছে অভিলাষ। তাই তো এতক্ষণ ধরে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের ঐ গাড়িটা স্টেশনের কাছে অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

বাবু-কলোনির কোন কোয়ার্টারের মানুষ নয় অভিলাষ। বাবু-কলোনির ছোঁয়া থেকে একটু দূরে আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অফিসারদের এক-একটি বাংলোবাড়ি। সবচেয়ে বড় বাংলো না হোক, সবচেয়ে সুন্দর করে সাজানো বাংলোটাই হলো অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার মিস্টার চৌধুরীর বাংলো। কতবার বড় দিনের সময় অভিলাষের বোন পারুল চৌধুরীর পিয়ানো শুনবার জন্য ঐ বাংলোতে গিয়েছে অতসী। দেখতে পেয়েছে অতসী, সেই বড়দিনের হাসি-খুশির আর মেলামেশার উৎসবের সন্ধ্যাতেও এক ঘরের ভিতরে বসে ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য বই পড়ছে অভিলাষ। সেই ঘরের দরজার কাছ থেকে যেতে যেতে কতবার থমকে দাঁড়িয়েছে অতসী। মুখ তুলে তাকিয়ে অতসীকে কতবার দেখেছে অভিলাষ। দেখা মাত্র শুধু একটি কথাই প্রতিদিন বলেছে—ভেতরে চলে যান মিস বিশ্বাস, পারু আছে বোধহয়।

তারপর মুখ ঘুরিয়ে শুধু বইয়ের দিকে তাকিয়েছে অভিলাষ। চুপ করে ভিতরে ঢুকে পারুলের কাছে এসে বসেছে আর গল্প করেছে অতসী। তারপর চুপচাপ চলে গিয়েছে। বাবু-কলোনির মেয়ে এক অফিসারের বাংলোবাড়ির ছেলের দিকে তাকিয়ে এর চেয়ে বেশি দুঃসাহসী হতে আর পারেনি। যেচে, শতবার গায়ে পড়ে অনুরোধ করলেও অভিলাষ কখনো অতসীর সিনেমাযাত্রার পথে সঙ্গী হবে না, এই কাণ্ডজ্ঞান অতসীর ছিল বলেই অতসী সেই অনুরোধের জাল এখানে ছড়াবার চেষ্টা করেনি কোনদিন। কিন্তু সাহস করে যদি অভিলাষকেও সেই অনুরোধ করে ফেলত অতসী?

হঠাৎ মনে হয় অতসীর, এতদিন অভিলাষকে সেই অনুরোধটা না করাই ভুল হয়েছে। অভিলাষের গাড়ির হর্নের শব্দ, আর অভিলাষের হাসিভরা মুখ যেন অতসীর সেই ভীরু মনটাকে হঠাৎ আশার চমক দিয়ে এক মুহূর্তে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। অতসীর ফুলজড়ানো বেণী হঠাৎ দুলে ওঠে। দু-চোখের দৃষ্টিতে যেন উল্লাসের বিদ্যুৎ ঝলকায়। হেসে ছটফট করে এগিয়ে যায় অতসী—আমাকে যদি আপনার গাড়িতে নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন তবে প্লীজ...কাইণ্ডলি...

অভিলাষ হাসে—আসুন।

হুংকারের মতো হর্ন বাজিয়ে ছুটে যায় অভিলাষ চৌধুরীর গাড়ি।

সেই মাত্র মাইল খানেক পথের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অভিলাষের পাশে বসে মোটরকারের তীব্র বেগের উল্লাসের মতো মনের উল্লাস নিয়ে ছুটে আসতে আসতে অতসী কি কথা বলেছিল অভিলাষের কানের কাছে, কে জানে? কিন্তু এরই মধ্যে বাবু-কলোনির অনেকেই জেনে ফেলেছে আর আশ্চর্য হয়েছে, মাত্র একটি রাতে সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার পথে এমন এক সঙ্গীকে ধরতে পেরেছে প্রতুল বিশ্বাসের মেয়ে, যে সঙ্গী অতসীর সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে যাবে বোধহয়। কলোনির ক্লাবের আসরেও চমকে ওঠে অনেকের মনের বিস্ময়—কি আশ্চর্য!

এই ধারণার জন্য দায়ী হলেন স্বয়ং প্রতুলবাবু। তিনিই কথা প্রসঙ্গে এখানে ওখানে অসাবধানে বলে ফেলেছেন—আশ্চর্য নয়, যদি অভিলাষের সঙ্গে অতসীর বিয়ে হয়ে যায়।

প্রতুল বিশ্বাসও তাঁর এই ধারণার জন্য দায়ী নন। অতসীর মুখ দেখে, অতসীর আবোল-তাবোল কথা থেকে অনেক কিছু বুঝতে পেরে, শেষ পর্যন্ত অতসীর ঘরের টেবিলের দেরাজ থেকে একটি চিঠি নিয়ে পড়ে ফেলতেই বুঝে ফেললেন প্রতুলবাবু, অভিলাষ চৌধুরীর কাছেই অতসীকে সঁপে দেবার জন্য এই বার তাঁকে প্রস্তুত হতে হবে।

পাটনা থেকে এসেছে অতসীর এই চিঠি, আরও চিঠি আগেই এসেছে মনে হয়, এবং এখনও আরও চিঠি বোধহয় আসতেই থাকবে।

অতসীও আজকাল ঘরের মধ্যে সারাক্ষণ কাটায়, আর আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেই নিজের ফুলজড়ানো বেণীর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়। সারাদিনের জীবনের মধ্যে কাজের মতো

শুধু একটিমাত্র কাজই খুঁজে পেয়েছে অতসী। অভিলাষের কাছে চিঠি লেখা।—তোমার মতো মানুষ আমার মতো একটা কালোমুখের মেয়েকে ভালোবেসেছে, এত বড় ভাগ্য আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তোমার দু'চোখ, নিশ্চয় দেবতার চোখ, নইলে এই কুৎসিত মেয়ের মুখ দেখে মুগ্ধ হবে কেন?

সেই রাতে অভিলাষের সঙ্গিনী হয়ে অভিলাষের পাশে বসে গাড়িতে চড়ে অন্ধকারের পথে ছুটে আসবার সময় সত্যিই অতসীর কানে কানে কোন কথা বলেনি অভিলাষ। অতসীও কোন কথা বলেনি। বলবার সুযোগই পায়নি অতসী। সারা পথ শুধু নতুন ব্রিজ তৈরির একটা গল্প বলে গেল অভিলাষ, শোণ ব্রিজের চেয়েও অনেক বড় একটা ব্রিজ তৈরি হবে মোকামা ঘাটের কাছে।

অভিলাষের সঙ্গে আর দেখা করবারও সুযোগ পায়নি অতসী। পরের সকালেই পাটনা চলে গেল অভিলাষ, কিন্তু তাই বলে ভরসা ছাড়েনি, সাহসও হারায়নি অতসী। গায়ে পড়ে কথা বলবার মতোই নিজের মনের আবেগে বেহায়া হয়ে অভিলাষকে একটি চিঠি লিখে ফেলেছিল অতসী। —একটি মেয়ের জীবনে একটি ভয়ের রাতে অন্ধকারের পথে যদি সঙ্গী হলেন, তবে তার কানের কাছে একটি ভালো কথাও কেন বলতে পারলেন না, অভিলাষবাবু? আমি যে অনেক আশা করেছিলাম।

অতসীর এই চিঠির উত্তর আসতে চারটে দিনও লাগেনি। তারপর থেকে চিঠি আসছেই। কী স্পষ্ট ভাষা! কোন আবরণ নেই, কোন কুণ্ঠা নেই। অভিলাষ চৌধুরী লিখেছে, চিরজীবনে অতসীর ভালবাসা পেয়ে সে সুখী হতে চায়।

শুধু চিঠি লিখে লিখে আর তৃপ্ত হয় না মন। কবে আসবে অভিলাষ? বড়দিনের ছুটি হতে আর কত দিন বাকি? অতসীর হাত দুটো ছটফট করে। ফুলজড়ানো বেণী টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মাথা পাতে অতসী। নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে, যেন এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে হারিয়ে যায় অতসীর কল্পনা।

বড়দিন আসে, কিন্তু বড়ই শীতার্ত বড়দিন। মিলের বাবু-কলোনির দক্ষিণে সেই শালবনের সবুজ এই শীতের বাতাসের ভয়ে চুপসে শুকিয়ে আর হলদে হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।

বড় দিনের ছুটিতে বাড়ি এসেছে অভিলাষ। সেদিন সন্ধ্যাবেলা চা খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতে অভিলাষের কাছে গিয়ে ফিরে এলেন প্রতুলবাবু।

প্রতুলবাবুকে কাছে পেয়েই মনের ঝাল মিটিয়ে অনেক শক্ত কথা বলে দিয়েছে অভিলাষ। —আপনার মেয়ের মাথা বোধহয় খারাপ হয়েছে। নইলে আমাকে ওসব কথা লিখল কেমন করে?

কোন দোষ নেই অভিলাষের। অতসীর প্রথম চিঠি পেয়েই স্পষ্ট করে যেকথা জানিয়ে দিয়েছিল অভিলাষ, তারপর অভিলাষকে ভালবাসা জানিয়ে আবার চিঠি লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, অভিলাষের এই শক্ত চিঠির উত্তরে আরও মুগ্ধ এবং আরও কৃতজ্ঞ মনের ভালোবাসার পরিচয় জানিয়েছে অতসী। কতবার অভিলাষ লিখেছে এবং অতি কঠোর ভাষাতেই লিখেছে যে, তোমার কথা আমার মনেও পড়ে না, তোমাকে আমি শুধু স্টোরবাবু মেয়ে বলে মনে করি। জীবনের কোন ভুলেও তোমার উপর আমার মনে ভালাবাসা-টাসা দেখা দেবে না, দিতে পারে না। তুমি পাগলামি করে আমাকে জ্বালিও না। কিন্তু উত্তরে অতসী শুধু লিখেছে, তুমি এত মহৎ, এত বড় প্রেমিকের মন তুমি কোথায় পেলে?

প্রতুলবাবু আশ্চর্য হন।—কিন্তু আমি যে আপনার লেখা চিঠি পড়েছি, অভিলাষবাবু।

—কি পড়েছেন? কি আছে তাতে?

—এই কথা যে, আপনি অতসীকে অর্থাৎ অতসীর জন্য আপনার মন...সত্যিই একটা আশার পথ চেয়ে...

—তাহলে আমার লেখা চিঠি দেখেননি, কোন্ জোচ্চরের লেখা যত সব ঠাট্টার চিঠি পড়েছেন! আমি বাংলাভাষায় চিঠি লিখি না, লিখতেও পারি না।

চুপ করে আর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন প্রতুলবাবু। অভিলাষ বলে—চিঠিগুলো পুলিশের হাতে দিয়ে দিন। পুলিশ খোঁজ করে বের করতে পারবে, এসব কার কীর্তি।

চলে যাচ্ছিলেন প্রতুলবাবু। অভিলাষই আর একবার ডাক দিয়ে বলে—বুঝতে পারছি, মিস বিশ্বাসেরও তেমন কোন দোষ নেই। আমার লেখা চিঠি পেলে উনি এতটা ভুল করতেন না। যাই হোক, ওঁর লেখা চিঠিগুলি ওঁরই হাতে দিয়ে দেবেন। এই নিন।

চিঠির বাণ্ডিল হাতে নিয়ে এই শীতের বিকালেই ঘর্মাক্ত হয়ে ঘরে ফিরেছেন প্রতুলবাবু।

—কাছে আয় অতসী! অতসীকে ডাকতে গিয়ে প্রতুলবাবুর গলার স্বরে যেন একটা ভয়ার্ত স্নেহের বেদনা কেঁপে ওঠে। কাছে ছুটে আসে অতসী। সব কথা বলেন প্রতুলবাবু এবং চুপ করে পাথরের মতো শুধু দুটো চোখ নিয়ে সব কথা শোনে অতসী, তারপর চোখ ঢাকা দেয়।

প্রতুলবাবুও তাঁর চোখ দুটোকে দুহাতে ভালো করে ঘষে নিয়ে বলেন—অভিলাষের কোন দোষ নেই অতসী! কেউ তোকে ঠাট্টা করার জন্য ঐসব মিথ্যে কথা চিঠিতে লিখেছে। আর, তুই সে-সব কথা বিশ্বাস করেছিস।

না, অভিলাষবাবুর দোষ হবে কেন? অতসীর কাছ্ থেকে হঠাৎ সেই গায়ে পড়ে লেখা প্রথম চিঠি পেয়ে ভদ্রলোককে ভয় পেয়েছিলেন, এবং বিরক্ত হয়ে তাঁর প্রতিবাদ স্পষ্ট করে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সে-চিঠি পায়নি অতসী, কিন্তু তার জন্য অভিলাষকে দোষী করা যায় না। এ সত্য বুঝতে আজ আর ভুল করে না অতসী। তার কালো মুখের ভয়ে সবাই যখন সরে যায়, তখন অভিলাষ চৌধুরীর মতো মানুষই বা সরে যাবে না কেন? বড়লোকের ছেলে একটা ভদ্রতার খেয়ালে বাবু-কলোনির একটি মেয়েকে একা দেখতে পেয়ে শুধু একটা প্রশ্ন করেছিল, এইমাত্র। অতসীই হঠাৎ এক লোভের ভুলে মাথা খারাপ করে অভিলাষের কাছে গিয়ে সঙ্গিনী হতে চেয়েছিল। অভিলাষ ডাকেনি অতসীকে। সেই রাতে পথের উপর একাকী দাঁড়িয়ে থাকা জীবনের সব ঘটনা মনে পড়ে অতসীর। কোন দোষ যদি হয়ে থাকে, সে-দোষ হলো একমাত্র অতসী নামে এই কালোমুখ মেয়েরই মনের লোভ।

কিন্তু এমন ঠাট্টা করল কে? পাটনা থেকে যে খামের চিঠিতে এত ধিক্কার আর গালাগালি ছুটে আসত, সেই খামের ভিতরে এত ভালবাসার ভাষা ছড়িয়ে দিয়েছে কে? এ যেন কাঁটা সরিয়ে ফুল ছড়িয়ে দেওয়া। অদ্ভুত ঠাট্টা! মিথ্যে করে এত সুন্দর ভালবাসার কথা লিখতে পারে কোন্ নিষ্ঠুর মানুষ? ভাবতে অদ্ভুতও লাগে, এমন ভালবাসার কথা এত মিথ্যে একটা মন দিয়ে তৈরি করা যায়?

অতসীও জানে, কেমন করে যেন শুনেই ফেলেছে অতসী, কলোনির ক্লাবের আসরে বুড়ো ভদ্রলোকেরাও কি ভাষায় তার নামে ঠাট্টা জমিয়ে আনন্দ পায়। যে বেহায়া কালোমুখের মেয়েকে অনায়াসে ছেলেধরা বলে ঠাট্টা করা যায়, তাকে ঠাট্টা করার জন্য স্তবের মতো অমন সুন্দর কথার মালা গাঁথবার দরকার হয় না।

ভাবতে গিয়ে মনটা যেন হাঁপাতে থাকে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অতসী। জীবনের বেহায়া লোভের সব চঞ্চলতা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর বেণীতে ফুল জড়াবার দরকার হবে না। পথের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেও কেউ আর এই কালোমুখের উপর মায়া দেখাতে আসবে না।

অতসীর ক্লান্ত মনের বেদনার ভার যেন হঠাৎ চমকে ওঠে। কি যেন মনে পড়েছে অতসীর। কিন্তু বিশ্বাস করতে লজ্জা পায় অতসী। তাও কি সম্ভব?

প্রতুলবাবু ডাক দিয়ে বলেন—পাটনার সেই চিঠিগুলি দে তো অতসী!

আতঙ্কিতের মতো তাকিয়ে অতসী বলে—কেন বাবা?

প্রতুলবাবু বলেন—পুলিশের হাতে চিঠিগুলি দিয়ে আসি। যে লোকটা ঠাট্টা করে এরকম একটা কাণ্ড বাধালো, তাকে ধরে ফেলা উচিত, আর তার শাস্তি হওয়াও উচিত।

অদ্ভুত রকমের চোখ করে চেঁচিয়ে ওঠে অতসী—কী সর্বনাশ!

প্রতুলবাবু আশ্চর্য হন—কি বলছিস?

যেন জীবনের পথের ধূলায় কুড়িয়ে কতগুলি হীরা-মানিক আর মুক্তাকে, যেন অজানা এক স্বপ্নলোক থেকে ঝরে-পড়া কতগুলি সুরভির ফুলকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় অতসী। অনুরোধ করে অতসী—ওসব চিঠি পুলিশের হাতে দেবার কোন দরকার নেই বাবা! আমার অপমান আমার কাছেই লুকিয়ে পড়ে থাকুক।

প্রতুলবাবু—তাহলে লোকটাকে ধরব কেমন করে?

অতসী কি যেন ভাবে, তারপর বলে—ধরা পড়বার হলে একদিন ধরা পড়েই যাবে।

বড়দিনের ছুটি ফুরিয়েছে। অভিলাষ আছে পাটনায়। কি আশ্চর্য, অতসী আবার চিঠি লেখে অভিলাষের কাছে। লিখতে গিয়ে হেসে ফেলে অতসী।—তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার পাব বলে আশা করিনি। তুমি আমাকে ভালোবাস না, এই দুঃখ সহ্য করে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মৃত্যু বরণ করাই ভালো। এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবার আগেই আমি এই জগৎ হতে বিদায় নেব! আজই সন্ধ্যায়, যখন কলোনির ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে, তখন আমি বরাকরের দহের গভীরে জলের কোলে চিরঘুমে ঘুমিয়ে পড়ব।

চিঠি নিজের হাতে ডাকের বাক্সে ফেলে দিয়ে আসে অতসী। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে অতসী। অতসী আজ যেন কিসের এক আশার উল্লাসে নিজের মনটাকে নিয়ে পাগলামির খেলা খেলছে। বিকাল শেষের আলোকে শালবনের মাথা রাঙিয়ে দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশও ধীরে ধীরে রঙ হারাতে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসে। বেণীতে ফুল জড়ায় অতসী।

পুলিশের দরকার নেই। অতসী আজ নিজেই তাকে ধরে ফেলতে চায়, যে মানুষ এতদিন ধরে তার সব চিঠির ভিতর থেকে কাঁটা সরিয়ে শুধু ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে। অতসীও ঠাট্টা করতে জানে। সেই গোপন রহস্যের বুকটাকে ব্যথিত আর উদ্বিগ্ন করে তুলতে হবে, তাই তো এতগুলি মিথ্যা কথার কাঁটা পাঠিয়ে দিল অতসী। উপায় নেই, অনেক ভেবে, আর একেবারে লজ্জার মাথা খেয়ে এই কারসাজি করতে বাধ্য হয়েছে অতসী। তাকে যে ধরতেই হবে। তাকে যে একবার দেখতে ইচ্ছা করে। সে কি অতসীর মিথ্যা কথার টানে অতসীকে মিথ্যা মৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্য সত্যিই ছুটে আসবে না?

হাসতে গিয়েও চোখ মোছে অতসী। শেষে এই কালোমুখের জীবনটাকে পাগলামিতে পেয়ে বসল বোধহয়।

কলোনির ঘরে ঘরে সন্ধ্যার আলো জ্বলে। আর বেশি দেরি করে না অতসী। শালবনের পাশে পাশে লাল কাঁকরের নতুন সড়ক ধরে বরাকরের সেই গভীর দহের কাছে পৌঁছে যেতেও দেরি হয় না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অতসী। এই সঙ্গীহীন একাকী জীবনের অভিমান যেন থমকে রয়েছে। হঠাৎ ভয় পায় অতসী। বড় বেশি ভয়। যেন নিজের মনের যত পাগলামি লোভ

বেহায়াপনা আর লজ্জাহীন দুঃসাহসগুলিকে দেখতে পেয়েছে। ছিঃ, নিজেকে নিয়ে এরকম খেলা করে মানুষ।

ফিরে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং দু পা এগিয়েও যায় অতসী। তারপর থমকে দাঁড়ায়। শিউরে উঠতে থাকে অতসী। সত্যিই যে একটা ছায়াময় মানুষের মূর্তি ছুটে আসছে তারই দিকে।

ব্যস্তভাবে হন-হন করে হেঁটে একেবারে অতসীর চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় সেই মূর্তি। নিঃশ্বাসের হাঁপ কোনমতে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করেন সেই ভদ্রলোক।—এ কি? আপনি এখানে একা দাঁড়িয়ে আছেন?

অতসীর কালোমুখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে একটা কালোমুখেরই মানুষ, যার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবার মতো কিছু নেই। শুধু দেখা যায়, ভদ্রলোকের চোখ দুটো বড় স্বচ্ছ আর সরল।

দু হাতে মুখ ঢাকে অতসী। পরেশনাথ বলে—আপনি তো আমাকে চেনেন। সেই যে সেই রাত্রিতে আমি আপনাকে একা দেখতে পেয়ে...

এত কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। বেশ ভাল করেই মনে পড়েছে অতসীর, এই পরেশনাথই সে-রাতে অতসীর একাকিত্বের ভয় দূর করবার জন্য অন্ধকারের পথে সঙ্গী হতে চেয়েছিল। এই মানুষটিই তো রোজ বিকেলে নিত্যদিনের ব্রতের মতো অতসীর বাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে চলে যেত। চেনা মানুষ বৈকি। কিন্তু আজ যে অতসীর কাছে একেবারে নতুন করে নিজেকে চিনিয়ে দিল পরেশনাথ। ধরা পড়ে গিয়েছে পরেশনাথ।

অতসী বলে—অন্য কথা বলবার আগে একটি কথা বলে নিন পরেশবাবু। কে আপনি? কি করেন আপনি?

পরেশনাথ—আমি আপনাদের কলোনির ডাকঘরের ক্লার্ক।

অতসী—এইবার বুঝলাম। কিন্তু আপনি কেন আমাকে ঠাট্টা করার জন্য মিছামিছি এতগুলি চিঠি লিখলেন?

পরেশনাথ কুণ্ঠিতভাবে বলে—ঠাট্টা করার জন্য নয়, বিশ্বাস করুন।

অতসী—তবে কিসের জন্য?

পরেশনাথ—পাটনার চিঠিগুলি পড়ে বড় খারাপ লাগত। সেই শক্ত চিঠিগুলি পড়লে আপনি কষ্ট পাবেন মনে করেই আমি...

অতসী—তাই বলে আপনি কতগুলি মিথ্যে ভালোবাসার কথা লিখবেন? আর কিছু লিখবার ছিল না?

পরেশনাথের কালোমুখ করুণ হয়ে ওঠে—কথাগুলি তো মিথ্যে নয়।

অতসী—ওগুলি তো আপনার মনের যত মিথ্যে কথা।

পরেশনাথ বলে—না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পরেশনাথ। অতসী চেঁচিয়ে ওঠে।—তবে কি? সত্যি কথা?

পরেশনাথ—হ্যাঁ।

চেঁচিয়ে হাঁপিয়ে আর ছটফট করে কথা বলে যেন একটা অবিশ্বাসের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়াই করতে চায় অতসী।—আপনি মুগ্ধ হয়েছেন আমার মুখ দেখে? আমাকে চিরকাল ভালবাসতে পারলে আপনি সুখী হবেন?

পরেশনাথ বলে—হ্যাঁ।

আবার দুহাতে মুখ ঢাকা দেয় অতসী। কালোমুখের জন্য জীবনে কোন দিন কারও চোখের সামনে দাঁড়াতে লজ্জা পায়নি যে অতসী, সেই অতসী আজ যেন লজ্জায় তার কালোমুখ লুকোতে চাইছে। যেন সত্যিই দেবতার চোখের সামনে পড়ে অসহায়ের মতো

ছটফট করছে অতসীর যত লোভের আর ভুলের জীবন। ভগবান যদি প্রসন্ন হয়ে এখন অতসীকে কোন বর দান করতে চান, তবে শুধু এই প্রার্থনা করবে অতসী, আজ অন্তত এক মুহূর্তের মতো এই মুখটাকে সুন্দর করে দাও, ভগবান! সে মুখ দেখে পরেশবাবুর চোখ আরও মুগ্ধ হয়ে যাক্।

অনেকক্ষণ দু হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অতসী বিশ্বাস। তারপর রুমাল দিয়ে চোখ মোছে। তারপর হেসে ফেলে—আপনি কি মনে করেছেন, আমি এখানে সত্যিই মরতে এসেছি?

সহসা উত্তর দিতে পারে না পরেশনাথ। কি যেন বলতে চায়।

অতসী—বলেই ফেলুন না, কিসের জন্য এখানে আমি মরতে এসেছি? অভিলাষ চৌধুরীর ভালবাসা পেলাম না ব'লে?

পরেশনাথের নীরব মুখের উপর সেই বেদনার্ত ছায়াটা হঠাৎ আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। অতসী আবার হেসে ফেলে—আমি কারও জন্য মরতে আসিনি পরেশবাবু, আমি বাঁচতে এসেছি।

খুশি হয়ে হেসে ওঠে পরেশনাথের কালো মুখের মধ্যে সেই দুটো স্বচ্ছ চোখ—তার মানে?

অতসী হাসে—আপনাকে ধরে ফেলবার জন্যই এসেছি। আমার আজকের একটা একেবারে মিথ্যে কথার চিঠিকে আপনি বড় বেশি বিশ্বাস করে ধরা দিয়ে ফেলেছেন!

পরেশনাথের স্বচ্ছ ও সরল চোখের দৃষ্টি হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়। লজ্জিত হয়েছে পরেশনাথের স্বচ্ছ চোখ, এবং সেই লজ্জায় যেন একটু বেদনাও আছে। অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে পরেশনাথ। এতক্ষণে যেন মনের একটা উদ্বেগের ভার ঘুচে গিয়েছে, কিন্তু আর-এক উদ্বেগের ভার সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে পরেশনাথের মন।

পরেশনাথ বলে—তাহলে এবার আমি যাই?

অতসীর গলার স্বর ছলছল করে—কেন? আমাকে বোধহয় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, কেমন?

উত্তর দেয় না পরেশনাথ।

অতসী—সে-রাতে আপনার চোখের কাছ থেকে ভুল করে একটা মিথ্যের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম বলে?

পরেশনাথের মনটাও যেন হঠাৎ ব্যথা পেয়ে ছটফট করে ওঠে—না না, আমাকে ওরকম মনের লোক বলে মনে করবেন না।

অতসী—সে ভুলের শাস্তি তো আমি পেয়েছি!

উত্তর দেয় না পরেশ। কলকল করে হেসে ঘাসের উপর বসে পড়ে অতসী—ভাগ্যিস সে ভুল করেছিলাম।

পরেশ বলে—তাহলে আজকের মতো আমাকে যেতে বলুন।

অতসী—আপনি যেতে পারবেন?

উত্তর দেয় না পরেশনাথ। অতসী বলে—একটু বসুন।

পরেশনাথ—কিন্তু বাড়ি ফিরতে আপনার অনেক দেরি হয়ে যাবে যে।

অতসী—হোক না দেরি, আজ আর পথের অন্ধকারকে ভয় করব না।

পরেশ—কেন?

অতসী—আপনি সঙ্গে আছেন, সঙ্গে থাকবেন।

দুঃসহধর্মিণী

সেদিন আর এদিন, মাঝখানে প্রায় বারো বছরের ব্যবধান. সে জায়গাটা ছিল নদে জেলার এক পাড়াগাঁ, এ জায়গাটা হলো বরাকরের ধারে একটা অভ্রখনি। সেদিন যে ঘরে দু'জনে প্রথম মুখোমুখি বসে কথা বলেছিল, সে ঘরটা ছিল মাটির তৈরি, পাশে একটা পানাঢাকা পুকুর, চারদিকে আলোকলতার ঝোপ। আর, আজ যেখানে বসে দু'জনে কথা বলছে, সেটা হলো কংক্রীটে তৈরি নতুন একটা বাংলো, সিমেন্ট-করা বারান্দা, তার ওপর চকচকে কালো পালিশ। পাশেই দুটো উদ্ধত ইউক্যালিপটাস, চারদিকে শালবন এবং তার ভেতরে অনেকগুলি ছোট-বড় অভ্রখনি। সেদিন কমলেশের বয়স ছিল তিরিশ, আর ধীরার বয়স ছিল আঠার। দু'জনের মধ্যে সেদিন যে সমস্যা ছিল, আজ আর সে সমস্যা একেবারেই নেই। আজ দু'জনে বর্ণে বর্ণে এবং ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে এক হয়ে গেছে।

সকালবেলায় রোদ এখনো তেমন কিছু তেতে ওঠেনি। তবু একটু ক্লান্ত হয়ে আর ঘামন্ত মুখ নিয়ে বসেছিল ধীরা। আগাবেগ ব্রাদার্সের জেনারেল ম্যানেজার রাওয়ের বাংলোতে গিয়ে একহাত টেনিস খেলে এই মাত্র ফিরেছে ধীরা।

কমলেশও ফিরেছে এই কিছুক্ষণ হলো। ঐ যে বাংলো থেকে সামান্য একটু দূরে শিশিরভেজা মাঠটা এখনো চিকচিক করছে, তারই এক কিনারায় দাঁড়িয়ে পোষা স্প্যানিয়েলকে কাঠবেড়ালির পিছনে ছুটিয়ে একটু ক্লান্ত করিয়ে নিয়ে, কিন্তু নিজে অক্লান্তভাবে এসে সোফার ওপর বসেছে এবং পাইপটা মাত্র ধরিয়েছে।

এই সকালবেলার মতো দুজনে বেশ রঙীন ও উজ্জ্বল। পার্থক্য শুধু, ধীরা একটু ক্লান্ত এবং কমলেশের কোন ক্লান্তি নেই। ধীরার হাসি সেতারের তারের মতো বেজে উঠেই যেন হঠাৎ ছিঁড়ে যায়, কোন রেশ থাকে না। কমলেশের হাসিতে এ রকম আকস্মিক ছন্দপতন নেই। হাসিটা তির্যকরেখার মতো দু'ঠোঁটের ওপর অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে থাকে।

কমলেশের দু'ঠোঁটে এই তির্যক হাসির রেখা যেদিন প্রথম দেখেছিল ধীরা, সেদিন আর এদিনে তফাৎ অনেক। সেদিনটা ঠিক দিন ছিল না, ছিল রাত্রি। ঠিক ঘর নয়, বাসরঘর। এরকম রোদের আলো নয়, পেতলের পিলসুজের ওপর তিল তেলের প্রদীপের ছোট শিখার আলো। নদে জেলার পাড়াগাঁয়ের স্কুল মাস্টারের মেয়ে ধীরা, দু'চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে শুনছিল, স্বামী কি বলছেন।

কমলেশ বলেছিল—তুমি তো আমার অচেনা নও, অজানা নও, অদেখা নও ধীরা। তুমি আমার চিরকালের। যুগ যুগ ধরে তোমাকেই চিনেছি, তোমাকেই খুঁজেছি আর তোমাকেই পেয়েছি।

বিস্ময়ে ভুরু টান করে ধীরা বলে—কিন্তু আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। আমি তো কখনো পাটনা যাইনি, আপনাকে আগে কখনো দেখিনি।

কালচার্ড কমলেশের চোখ দুটো যেন আকস্মিক একটা আঘাতে আরও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। ধীরার মুখের দিকে অপলক চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে কমলেশ। তারপর দু'ঠোঁটের ওপর তির্যক ভঙ্গীতে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে এবং নিঃশব্দে কাঁপতে থাকে।

নদে জেলার পাড়াগাঁয়ের স্কুল মাস্টারের মেয়ে সে হাসির অর্থ বোধহয় তখনি বুঝতে পারেনি। মাথা হেঁট করে ধীরা এবং তার নিজের মুখের হাসিটাকে সলজ্জভাবে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে।

কমলেশ বলে—একেই বলে দুঃসহধর্মিণী।

চমকে চোখ তুলে তাকায় ধীরা, মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে—কি বললেন?

কমলেশ—বুঝলাম, আমাকে অনেক দুঃখ ভুগতে হবে।

ধীরা—কেন মিছিমিছি এ-সব খারাপ কথা বলছেন? আমি থাকতে আপনি দুঃখু ভুগবেন কেন?

কমলেশ—তুমিই তো ভোগাবে।

ধীরা—আমি?

কমলেশ—হ্যাঁ।

আর একবার চমকে ওঠে ধীরা, আর শাস্তিভীরু সন্ত্রস্ত অপরাধীর মতো দু'চোখ সজল করে তাকিয়ে থাকে। বুঝে ফেলেছে ধীরা, কিছু একটা দোষ এরই মধ্যে তার ব্যবহারে হয়ে গেছে। শুধু বুঝতে পারে না, কোথায় দোষ হলো।

কমলেশ বলে—এ-রকম শিক্ষা-দীক্ষা, আর এই রকম গেঁয়ো কালচার নিয়ে তুমি জীবনে আমাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারবে?

এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল ধীরা ঠিক দুদিন পরে, এইরকম এক সন্ধ্যেবেলায় এই চেয়ারের ওপর বসে যখন গল্প করছিল ধীরা, কমলেশের সঙ্গে এক পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল এবং চিঠি খুলে হেসে ফেলে কমলেশ। মস্ত বড় এক মোটরকার কোম্পানির সেই বড়সাহেবের সই করা চিঠি। প্রধান সেলস্‌ম্যানের কাজ পেয়েছে কমলেশ। পাইয়ে দিয়েছেন বড়সাহেব। মাইনে পাঁচশো টাকা, তা ছাড়া কমিশন আছে। কাজ বলতে কিছুই নয়। শুধু শো-রুমে সুসজ্জিত হয়ে বসে থাকা, এবং খরিদ্দার এলে হাসি মুখে করমর্দন করে শুধু সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে একটু অভ্যর্থনা করা। বাকি যা কাজ, তা করার জন্য সাব-অর্ডিনেটরা আছে।

এইবার বুঝতে পারে ধীরা, কি লাভ হলো এবং কেমন করে হলো। ছবির মেয়ের মতো সাজ করে একটি সন্ধ্যায় পরীর মতো সুন্দর হওয়ার এই পুরস্কার। এমন যে হতে পারে সেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ধীরা।

কমলেশ বলে—পটলার মতো পঞ্চাশ টাকা মাইনের একটা গরু হয়ে খেটে খেটে জীবনপাত করব, এমন বুদ্ধি নিয়ে আমি পৃথিবীতে আসিনি ধীরা। বড়লোকের ছেলে হয়ে জন্মেছি, বড়লোকের ছেলের মতো সব খুইয়েছি। আবার দু-হাতে টাকা আনব আর দু-হাতে খরচ করব। এই তো মাত্র শুরু। কিন্তু...কিন্তু তোমাকে শুধু মনে প্রাণে আমার মনের মতো হয়ে...

ধীরা কৃতার্থভাবে বলে—বিশ্বাস কর, আমি প্রাণ দিয়েও তোমার...

কথা শেষ করে না ধীরা, হঠাৎ কি যেন আশা করে মুগ্ধ লোভীর মতো তাকিয়ে থাকে কমলেশের মুখের দিকে।

ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে ধীরার হাত ধরে বিলাতী ভঙ্গীতে ঝাঁকুনি দেয় কমলেশ—থ্যাঙ্ক ইউ।

মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরা, যেন হঠাৎ পায়ে একটা কাঁটা বিঁধেছে। নিজেরই ওপর রাগ হয় ধীরার।

পরের দিনই এ বাড়ি ছেড়ে দানাপুরে একটা দু'শো টাকার ভাড়া বাড়িতে উঠে যায় কমলেশ আর ধীরা। একজন বাবুর্চি আর দু'জন চাকর এসে কমলেশের নতুন গৃহস্থালীর কাজের ভার নেয়। নতুন ফার্নিচার কেনা হয়, চারটে বড় বড় ঘর চাররকম করে সাজানো হয়। মিস্ ডি-সিলভা আসেন ধীরার শিক্ষয়িত্রী হয়ে, মাসিক একশো টাকার মাইনেতে। লেখাপড়া শেখানো ছাড়া, কিছু টেনিস ও মিউজিক এবং কিছু কিছু পোলকা সুইং আর বুগি-উগিও তিনি শেখাবেন।

অফিস থেকে গাড়ি আসে, নিখুঁত ও পরিপাটি সাহেবী সাজে বের হয়ে যায় কমলেশ।

বড়জোর ঘণ্টা দুই মোটরকার কোম্পানির শো-রুমের অফিসে বসে থাকে, তারপর বাড়ি ফিরে আসে। ক্লান্ত হতে, হাঁপাতে অথবা এক মুহূর্তের জন্য ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতে পারে না, চায় না, জানেও না কমলেশ। একান্তভাবে বুদ্ধির মানুষ কমলেশ, খাটুনি নামে একটা দরিদ্রসুলভ বিকার তার আচরণে একেবারেই নেই। কারও কপালে ঘাম দেখলে মানুষটাকে কেমন ছোটলোক ছোটলোক মনে হয় কমলেশের।

বাড়ির চাকর ছুটোছুটি করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাটে। ধীরার খাটুনিও বা কম কি? মিস ডি-সিলভার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে এবং সে শিক্ষা ঝালিয়ে রাখতে সকাল-সন্ধ্যায় অন্তত সাতটা ঘণ্টা সময় কেটে যায়। শুধু কমলেশের হাত-পা এই জগৎব্যাপী কাজের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যেন সুস্থির হয়ে রয়েছে। ডিটেকটিভ নভেল হাতে নিয়ে বারান্দার সোফার ওপর অচঞ্চলভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দেয় কমলেশ।

বিকেল হলে সামনের মাঠে এক-একদিন মিস ডি-সিলভার সঙ্গে টেনিস খেলে ধীরা। ডিটেকটিভ নভেল বন্ধ করে কমলেশ এক-একবার তাকিয়ে দেখে, কিন্তু দেখেও তার হাত-পায়ের পেশী ও ধমনীতে কোন সাড়া জাগে না। এসব বিষয়ে যোগীসুলভ একটা বিরাট নিঃস্পৃহা ও ঔদাসীন্য আছে কমলেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই। শরীরটাকে অকারণে খাটিয়ে ক্লান্ত করার এই বিচিত্র ব্যাধির জন্য মনে কোন আগ্রহ হবে, এমন জিনিস দিয়ে তৈরিই নয় কমলেশের মন।

অথচ মনটা ছোট নয় কমলেশের। জীবনটাকে মস্ত বড় করে পাওয়ার জন্য বিরাট একটা তৃষ্ণা ছড়িয়ে আছে সে মনে। কিন্তু তৃষ্ণা মেটাবার জন্য চৈত্র মাসের পাহাড়ী ভেড়ার মতো রোদ্দুরে দু-ক্রোশ পথ হাঁটতে রাজি নয় কমলেশ, দু' চুমুক ঝর্ণার জল খেতে পাবে বলে। ওসব কি সুখের জীবন এবং ও-ধরনের জীবনে কি সুখ থাকে? অনেক ভেবে, দেখেছে কমলেশ, পৃথিবীর মতি-গতি ধরন-ধারণ রকম-সকম খুব ভালো করে বুঝে নিয়ে সে তার পথ ঠিক করে ফেলেছে। হাত বাড়িয়ে এই আলমারির কপাট খুলে ফেললেই হাতের কাছে সবচেয়ে দামী স্প্যানিশ মদের বোতল চলে আসবে চিরকাল, এমন সুখের জীবন কি সম্ভব নয়? কমলেশ বিশ্বাস করে, খুবই সম্ভব।

সন্ধ্যে হলে বড়সাহেব যখন আসেন, তখন ধীরা এসে আলমারীর কপাট খোলে এবং নিজের হাতে স্প্যানিশ মদে মদির দুটি কাচের গেলাস বড়সাহেব ও কমলেশের হাতে তুলে দেয়।

বিয়ের একবছর আগেও কমলেশের স্বর্গত পিতার একমাত্র জীবিত বন্ধু এটর্নি মজুমদারমশাই বলেছিলেন, কমল, আর কতদিন এভাবে বসে থাকবে? বরং আমি বলি...।

—বলুন।

—তুমি বছর দুই জাপানে থেকে সিল্ক রং-করার কাজটা শিখে এসো। যদি বেশ মন দিয়ে এবং খেটেখেটে কাজটা কোন মতে শিখে আসতে পার, তবে তোমার ভালো রোজগারের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কিরকমের ব্যবস্থা হবে?

—বেনারসে একটা নতুন সিল্ক ফ্যাক্টরী করেছে আমাদের কিষেণলাল। অন্তত শ'তিনেক টাকা মাইনেতে সেখানে তোমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারব।

—আমি রাজি আছি জেঠামশাই। কিন্তু জাপানে যাবার আর থাকবার খরচ?

—আমি দিচ্ছি। হিসেব করে দেখেছি, পাঁচ হাজার হলেই হয়ে যাবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একরকম হয়ে যাবে। আমি তাহলে এ মাসেই...।

মজুমদার মশাইয়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা সেদিনই নিয়ে চলে আসে কমলেশ।

দু-বছর খেটে কাজ শেখার পর কিষেণলালের সিল্ক ফ্যাক্টরীতে তিন শো টাকা মাইনের

রং-মাস্টারের চাকরি, একটা আস্ত গাধার জীবন। জাপানে যায়নি কমলেশ। মজুমদার জেঠামশাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একদিন এলেন এবং দাবি করলেন—তাহলে আমার টাকা ফেরত দাও।

কমলেশ ইংরেজী ভাষায় অতি শান্তভাবে যে কথা বলে, তার অর্থ হলো—আপনার কাছ থেকে জীবনে কখনো কোন টাকা-পয়সা আমি নিইনি, সুতরাং আপনাকে টাকা ফেরত দেবার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

মজুমদার জেঠামশাই আর একটি প্রশ্নও না উঠিয়ে সোজা চলে গেলেন। কমলেশ গেল দার্জিলিং।

চার মাস দার্জিলিং-এ কাটিয়ে আবার পাটনায় ফিরে এল কমলেশ। পাঁচ হাজার টাকার তখন অবশিষ্ট পাঁচ-ছয় আনা মাত্র ছিল। আবার টাকার স্বপ্ন মনের ভেতর ছটফট করতে থাকে, তৃষ্ণার্ত পাখি যেমন পাখা ঝাপটিয়ে ছটফট করে মরা নদীর বালু খুঁড়তে থাকে ঠোঁট দিয়ে।

শুনে খুশি হয় কমলেশ। পাইপ মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া টানে আর ছাড়ে, এবং আবার প্রশ্ন করে—কী রকমের ওয়াণ্ডারফুল?

ধীরা—মিউজিক অত্যন্ত ভালোবাসে। আর টেনিসে তো অসাধারণই বলা যায়। এত নিখুঁত আর পরিষ্কার লেফ্‌ট আমি অন্তত আজ পর্যন্ত দেখিনি।

কমলেশ—গিরিডির সেই ললিত দত্তের চেয়েও ভালো হাত?

ধীরা—পুওর ললিত! রাওয়ের কাছে ললিত ইজ এ বেবি!

কমলেশ—চুলোয় যাক ললিত। রাও কি বললেন তাই বলো।

ধীরা হাসে—বললাম তো, ভালোই বলেছেন।

কমলেশ—তার মানে?

ধীরা—ভালো কথা বলেছেন।

কমলেশ—আরে, কথাগুলি কি বললেন সেটা স্পষ্ট করে বলছ না কেন?

কমলেশের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরায় ধীরা সেই বাঁকা হাসি কাঁপছে কমলেশের দু ঠোঁটের ওপর, যে হাসির অফুরান প্রেরণা ধীরার চলা-বলা কথা-হাসি ভাষা-ভঙ্গী ও সাজ-পোশাক থেকে নদে জেলার পাড়াগাঁকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়েছে। সোসাইটির শোভন ও লোভন এক চমৎকারিণী ভদ্রা হয়ে উঠতে পেরেছে ধীরা, ঐ বাঁকা হাসিরই শাসনে ও শিক্ষায়। ধীরাও তার প্রথম প্রতিজ্ঞার সম্মান রক্ষা করেছে কমলেশের অনুরোধের বিরুদ্ধে কোন দিন কোন প্রশ্ন তোলেনি। যা বুঝিয়েছে কমলেশ, কোন দ্বিধা না করে বুঝে ফেলেছে ধীরা।

প্রথম প্রথম বুঝতে একটু দেরি অবশ্যই হতো। বিয়ের পর পাটনাতে আসার দু-দিন পরেই বুঝতে পেরেছিল ধীরা, অনেক কিছু বুঝতে হবে এবং শিখতেও একটু দেরি হবে কিন্তু মনের জোর থাকলে এবং কমলেশের মতো স্বামী সহায় থাকলে কতই বা দেরি হবে?

পাটনায় তখন খুব গরম, সন্ধ্যেবেলা বাইরে থেকে ঘুরে এসে ঘরে ঢুকলো কমলেশ একটা বিখ্যাত পোশাকের দোকানের জিনিস ও দামের ছবিওয়ালা ক্যাটালগ ধীরার সামনে এনে খুলে ধরে—একটা ছবির ওপর আস্তে আস্তে আঙুলের টোকা দিয়ে কমলেশ প্রশ্ন করে—ঠিক এ-রকম স্টাইলে সাজ করতে পারবে?

হঠাৎ প্রশ্নে একটু ঘাবড়ে যায় ধীরা। ক্যাটালগের পাতায় বিচিত্র ভঙ্গীতে শাড়ি-পরা তরুণীর সেই চিত্রিত মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর হেসে

ফেলে—পারব।

কমলেশ—তবে আর দেরি করো না।

ধীরা—এখুনি?

কমলেশ—হ্যাঁ, এখুনি একজন উঁচুদরের লোক আসবেন। নেমন্তন্ন করে এসেছি, এখানেই চা খাবেন।

ধীরা—সম্পর্কে গুরুজন হলে কিন্তু ও-রকম সাজ করে তাঁর সামনে আসতে আমার কেমন...

ঝিক্ করে বাঁকা হাসির একটি স্ফুলিঙ্গ ঝলসে ওঠে কমলেশের ঠোঁটে—গুরুজনের চেয়েও গুরুতর জন। কিন্তু তার জন্যে তোমার কেমন-কেমন করবার কোন দরকার নেই।

মুর্খের মতো চোখ করে ধীরা প্রশ্ন করে—গুরুতর জন?

কমলেশ—হ্যাঁ, এক মোটরকার কোম্পানির বড়সাহেব।

ধীরার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং তাকায়ও ফ্যাল ফ্যাল করে। এক বড়সাহেব চা খাবেন, কিন্তু তার জন্যে তাকে এমন একটা ছবির মেয়ের মতো সাজ করতে হবে কেন?

কমলেশ—ঘাবড়াচ্ছ কেন? আর ঘাবড়ালে তো চলবে না। পৃথিবীতে তোমার ঐ মটরমালার যুগ নেই।...যাও তাড়াতাড়ি সেজে এসো।

আর দ্বিধা করেনি ধীরা এবং ধীরার সাজ দেখে খুশি হয়েছিল কমলেশ। আরও খুশি হয়েছিল, যখন ধীরা হাসিমুখে বড় সাহেবের প্রসারিত হাতে হাত রেখে দিয়ে অতি শিক্ষিতা গৃহস্বামিনীর মতো অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাল। চা তৈরি করে নিজের হাতেই পরিবেশন করল। যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিল কমলেশ, অক্ষরে অক্ষরে ঠিক তেমনটি করে দেখাতে পারল ধীরা। এমন কি একটা ফুলের তোড়া নিজের হাতে বড়সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে হার্টফেল্ট রিগার্ড জানাবার সময় একটুও হাত কাঁপেনি ধীরার, মুখস্থ করা ইংরাজী শব্দগুলিও কাঁপেনি। বড়সাহেব বিদায় নেবার সময় মুগ্ধভাবে কমলেশকে বললেন—আপনার স্ত্রী পরীর মতো সুন্দর, অথচ কত লাজুক। একটা দুর্লভ জিনিস দেখবার সৌভাগ্য আজ আমার হলো।

গাড়িতে ওঠবার আগে বড়সাহেব আবার বলেন—আপনার চায়ে মাঝে মাঝে আসতে ইচ্ছে করি।

কমলেশ বলে—রোজ আসবেন, চিরকাল আসবেন।

বড়সাহেব চলে যাবার পর মনের খুশির আবেগে অনেকক্ষণ গল্প করে কমলেশ আর ধীরা। বাইরে থেকে কে যেন ডাকে—কমলেশ? কমলেশ আছিস?

কমলেশ উঠে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় এবং মাত্র দু-চারটা কথার মধ্যেই আলাপ শেষ করে আগন্তুক লোকটিকে বিদায় দিয়ে ফিরে আসে। ধীরা জিজ্ঞেস করে—কে ডাকছিল?

কমলেশ—পটল।

ধীরা—তিনি তোমার বন্ধু বোধহয়?

কমলেশ—কলেজে এক ক্লাসে এক সঙ্গে বসে পড়লেই যদি বন্ধু হয়, তবে পটলও আমার বন্ধু।

ধীরা হাসে—অদ্ভুত বন্ধু।

কমলেশ কৌতূহলী হয়—তুমি কী করে বুঝলে ধীরা?

উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট করে হাসতে থাকে ধীরা। উত্তর দিতে পারে, কিন্তু কেমন একটা লজ্জার বাধা এসে যেন মুখ চেপে দিচ্ছে ধীরার।

কমলেশ আবার প্রশ্ন করে—ওকে তোমারও কেন অদ্ভুত মনে হলো?

ধীরা-যাক গে।

কমলেশ—না, বলতেই হবে।

ধীরা বলে—বন্ধু বিয়ে করে ঘরে এসেছে একথা জেনেও যে একবার ভেতরে না এসে বাইরে থেকে দু-কথা বলে চলে যায়, সে আবার কেমন বন্ধু?

বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে কমলেশের ঠোঁটে—গুড গড! উল্টো বুঝলি রাম! তুমি ভয়ানক ভুল বুঝেছ ধীরা? পটল ভেতরে আসতে চেয়েছিল তোমাকে দেখবার জন্যে। আমিই আপত্তি করে বিদায় করে দিয়েছি।

ধীরা বিষণ্ণভাবে বলে—কি মনে করলেন ভদ্রলোক?

কমলেশ গম্ভীর হয়—পটল কিছু মনে করলেই বা কি এসে যায়?

বুঝতে পারে না, বুঝতে চেষ্টা করে, বুঝতে দেরি হয় ধীরার। বড়সাহেব যেখানে এসে চা খেয়ে যায়, বন্ধু সেখানে এসে চা খেলে কি এমন দোষ হবে?

কমলেশ বলে—পটলা পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরানীগিরি করে। ওকে এখানে বসিয়ে চা খাওয়ালে আমার কি লাভ?

ধীরা মুখ খুলে জিজ্ঞাসা করতে পারে না, কিন্তু মনটা নীরবে জিজ্ঞাসা করে ওঠে—এক বড়সাহেব এসে চা খেয়ে গেলেন, তাতেই বা কি লাভ হলো?

ধীরার মনে হয়, সারাদিনের এত শাঁখ আর উলুর প্রাণ-মাতানো শব্দগুলি এতক্ষণে মিথ্যে হয়ে গেল। আজ সকাল থেকে এই মাটির ঘর আর ঐ আলপনা-আঁকা আঙ্গিনা যে আনন্দ গায়ে মেখে একেবারে ধন্য হয়ে আছে, সে আনন্দের গায়ে যেন আগুন লাগল এতক্ষণে। কী সুন্দর বর হয়েছে! ধীরার ভাগ্যি দেখে হিংসে হয়। ইস্কুল মাস্টারের ওপর ভগবান খুব দয়া করেছেন, নইলে এত সস্তায় এত রূপের ও গুণের জামাই কি এমনিতে হয়। এই ধরনের কত কথার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি আজ সকাল থেকে এ পাড়াগাঁকে মুখর করে রেখেছে। মনে পড়ে, সবই এক মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে। দিদিমা আনন্দে কেঁদে ফেলেছেন। বাবার মুখটাকে কোন দিন এত খুশি হয়ে উঠতে দেখেনি ধীরা। ছোট-বোনের বর-ভাগ্যি দেখে মেজদি তো এরই মধ্যে গর্ব করতে করতে গাঁয়ের এ-বাড়ি সে-বাড়ি এবং অনেক-বাড়ির জামাইয়ের নিন্দে করে ফেলেছে। কিন্তু যাকে নিয়ে এবং যার জন্যে এত গর্ব ও আনন্দ, সে কি বলছে? এ সর্বনেশে কথা এখনো কারও কানে পৌঁছয়নি। কেউ জানে না, ধীরার বর এরই মধ্যে ধীরাকে ঘেন্না করতে আরম্ভ করেছে।

কেঁদে ফেলে ধীরা এবং কোন কথা না বলে সোজা একটা হাত এগিয়ে দিয়ে কমলেশের পায়ের পাতা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।

কমলেশ বলে—কি?

ধীরা বলে—দুঃখু করো না তুমি, আমার ওপর রাগ করো না। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি সে রকম হব না।

কমলেশ—কি রকম হবে না?

ধীরা—ঐ যা বললে...।

কমলেশ—কি?

ধীরা—দুঃসহধর্মিণী।

হেসে ফেলে কমলেশ—তাহলে কথার অর্থটা বুঝতে পেরেছ?

ধীরা—পেরেছি বৈকি। তুমি যা শেখাবে তাই শিখব। কখ্খনো অন্য রকম হব না।

কমলেশ—শিখতে পারবে তো?

ধীরা—বিশ্বাস করো, নিশ্চয় পারব।

কমলেশের দু'ঠোঁটে তির্যক হাসির রেখা এতক্ষণে শান্ত হয়। সান্ত্বনার সুরে কমলেশ বলে--কিছু মনে করো না ধীরা। তুমি দেখতে এত সুন্দর, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা ও কালচারেও সুন্দর হয়ে উঠবে, তবেই তো আমাদের দু'জনের জীবন এক সঙ্গে সুখী হয়ে উঠবে।

পেতলের পিলসুজে সারারাত ধরে বাতি জ্বলে। সারারাত ধরে কত গল্পই না বললো কমলেশ। বড় বড় বইয়ের ভাষার মতো সে-সব গল্পের ভাষা। তার মধ্যে ইংরিজী কথা আছে, কবিতার লাইন আছে, এক মস্ত উঁচু জীবনের কত আশা, কত ইচ্ছা, আর কত স্বপ্নের কথা আছে। জীবনে কত কি এখন করতে হবে, তারই নানা প্রতিজ্ঞার কথা। ছাত্রীর মতো এক গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে, উৎকর্ণ হয়ে এবং একমন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে ধীরা। বারো বছর আগের সেই ক্ষুদ্র বাসরঘরে ফুলছড়ানো বিছানায় বসে ধীরার শেখবার পালা শুরু হয়ে যায়।

রাত্রি ভোর হতে মাত্র ঘণ্টা দুই বাকি ছিল, কিন্তু তার মধ্যে অন্তত এইটুকু শিক্ষা পেয়ে গেল ধীরা যে, এ স্বামী যেমন-তেমন স্বামী নয়। এ মানুষ যে-সে মানুষ নয়। লোকের মুখে শুনে এবং প্রথম চোখে দেখে যত মহৎ মনে হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি মহৎ। অনেক বেশি বিদ্বান, অনেক বেশি উচ্চরুচি ও অনেক বড় সাধের মানুষ।

ভোর যখন প্রায় হয়ে এলো, পাড়াগাঁয়ের গাছের মাথায় জোনাকি নিবলো, আর পাখি জাগলো, তখন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ধীরা। কমলেশ তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। চোখের সব লোভ আর কৌতূহল ভালো করে মিটিয়ে নিয়ে কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ধীরা। কত উঁচু আকাঙ্ক্ষার একটা মানুষ এবং জীবনে অনেক বড় হয়ে উঠবার জন্যে কত বড় প্রতিজ্ঞার একটা মানুষ তারই স্বামী হয়ে, কেমন শান্ত ও সুন্দর হয়ে পাড়াগাঁয়ের এই বাসরঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে। দেখতে কি ভালোই না লাগছে। ধীরা মনের আশ মিটিয়ে তারই জীবনের স্বপ্নেরও অগোচর একটা সৌভাগ্যের শান্ত ও ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এখন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে না, ঐ ঠোঁটে অমন ভয়ানক একটা বাঁকা হাসি সত্যিই কিছুক্ষণ আগে ফুটে উঠেছিল।

বাসরঘর ছেড়ে একদৌড়ে আলপনা-আঁকা আঙ্গিনা পার হয়ে একটা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে ধীরা। ঘরে অন্ধকারে এবং মেঝের ওপর ঢালা বিছানার সুষুপ্ত বাচ্চা-কাচ্চাদের গাদা। তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে মেজদিকে খুঁজে বার করে ধীরা। মেজদির গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে। মেজদির ঘুম ভাঙে এবং ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে—কি লো, কমলেশকে বলে এসেছিস তো?

ধীরা—না।

মেজদি আরও ব্যস্তভাবে বলেন—যা যা, মুখ্যু মেয়ে। বরকে না জিজ্ঞেস করে বাসর ছেড়ে আসতে নেই।

ধীরা—কেন?

মেজদি—ভয়ানক রাগ করবে।

ধীরা—একটুও রাগ করবে না।

মেজদি একেবারে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেন এবং বোনের বর-ভাগ্যি দেখে আহ্লাদে চেঁচিয়ে ওঠেন—অ্যাঁ, এরই মধ্যে তাহলে বরকে বশ করে ফেলেছিস ধীরি, কি বলিস?

মেজদি যেন অন্ধকারের মধ্যেই ছোট বোনের হাসিভরা মুখটাকে দেখতে পেয়ে মনের খুশিতে গলা ছেড়ে হাসতে থাকেন। মেজদির চেঁচামেচি ও হাসির শব্দে বাচ্চাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং কান্না শুরু হয়। গোয়ালঘর থেকে গরুটাও যেন এই ঘুম-ভাঙানো সোরগোলের সাড়া শুনতে পেয়ে ডাক ছাড়তে থাকে। বাবার খড়মের শব্দ শোনা যায়। শোনা যায়, দিদিমা সুর করে কৃষ্ণনাম গাইতে আরম্ভ করেছেন। সারারাত্রির উৎসবটা যেন শেষরাত্রির দিকে কিছুক্ষণের মতো ঝিমিয়ে পড়েছিল শুধু। আবার সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। দেখা যায় আলোকলতার গায়ে পুব আকাশের আভা এসে লুটিয়ে পড়েছে।

এ-সব তো বারো বছর আগেকার কথা। আজ এই বাংলোর বারান্দায় সোফার ওপর বসে

মুখ তুলে দেখতে পায় ধীরা, পুবের আকাশ আলোয় ঝলসে উঠেছে। দেখতে পায়, কমলেশের ঠোঁটে তির্যক হাসির রেখা আবার কাঁপছে। ও হাসি একটা দুর্মর সংকল্পের সর্পিল ছায়ার মতো। দু-ঠোঁটের ওপর সামান্য একটা শিহর, কিন্তু তার পেছনে একটা কঠিন পর্বত রয়েছে। তারই আকাশস্পর্শী পিপাসা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে এইভাবে। ও হাসি একটা প্রচণ্ড নির্দেশ। তার মধ্যে শাণিত ছুরিকার মতো একটা ইঙ্গিত আছে।

যা শিখিয়েছে কমলেশ, তাই শিখেছে ধীরা। শেখবার চেষ্টায় একটুও ফাঁকি দেয়নি। শিখতে পেরেছেও। ধীরা আজ সত্যই কমলেশের মতো মানুষের সহধর্মিণী হতে পেরেছে। দু'জনে জীবনে একসঙ্গে সুখী হবার পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। শুধু এইটুকু এখনো বুঝে উঠতে পারে না ধীরা, আর কত দূর এগিয়ে যেতে হবে।

স্প্যানিয়েলের মাথায় হাত বুলিয়ে কমলেশ ধীরাকে জিজ্ঞাসা করে—কি বললেন রাও?

ধীরা উত্তর দেয়—ভালোই বলেছেন।

কমলেশ—রাও লোকটা কি রকম?

ধীরা—ওয়াণ্ডারফুল।

সেদিনই খবর পেল কমলেশ, সেই মোটরকার কোম্পানীর জন্য প্রধান সেলস্‌ম্যান চাই। মাইনে পাঁচশো এবং কমিশনও গড়ে মাসিক হাজার টাকার ওপরেই হয়ে থাকে। কাজটা কমলেশের মনের মতো কাজ, কারণ কাজ বলে কিছুই নেই। শুধু শো-রুমের অফিসে অত্যন্ত সৌখীন পোশাকে সেজে আর স্মার্ট হয়ে বসে থাকা। কোন্ এক গভর্ণরের ভাইপো এ কাজটা বাগাবার জন্যে ভয়ঙ্কর রকমের চেষ্টা করছে।

দরখাস্ত করে কমলেশ আর ভাবে। একদিন, দুদিন, তিন দিনের ভাবনার পর কমলেশ সিটিতে গিয়ে এক গলির মধ্যে একটা জীর্ণ বাড়ির জানালার মাথায় লটকানো সাইনবোর্ডটার দিকে তাকায়। তারপর ঘরের ভেতর ঢুকে ভাঙা তক্তপোষটার উপর উপবিষ্ট ঘটক ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলে—পাত্রী চাই, নিতান্ত গরীব ঘরের হলেই চলবে।

ঘটক—পাত্র?

কমলেশ—আমি।

ঘটক—আপনার পরিচয়?

কমলেশ—আমি লেট রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র রায় এটর্নির ছেলে।

ঘটকঠাকুর উৎসাহিত হয়ে এবং সশ্রদ্ধভাবে বলেন—আপনি মহৎ, আপনি মহৎ। আপনার পিতাও এই রকম মহৎ ছিলেন। তিনি আমার উপকারী এবং আমি তাঁর কাছে ঋণী।

কমলেশ—পাত্রী কিন্তু বেশ সুন্দরী হওয়া চাই। মুখ্‌খু হলেও চলবে। এমন পাত্রীর খোঁজ আছে?

ঘটক—আছে, অসামান্যা সুন্দরী পাত্রী আছে।

কমলেশ—কোথায়?

ঘটক—নদে জেলার এক পাড়াগাঁয়ের স্কুল মাস্টারের মেয়ে।

কমলেশ বলে—ব্যবস্থা করে ফেলুন।

এসবই তো সেই বারো বছর আগেকার ঘটনা। সে ঘটনাকে অনেক পেছনে ফেলে রেখে কমলেশ আজ এসে পৌঁছেছে বরাকরের কিনারায় এই সুন্দর বাংলোর পালিশ করা বারান্দায়। কিন্তু এখানে সে চিরকালের মতো থেকে যাবার জন্য আসেনি। জীবনটাকে যেমন করে পেলে সুখী হবে কমলেশ, তেমন করে এখনো পাওয়া হয়নি। বরং অনেক ধার হয়েছে, পাওনাদারেরা আশেপাশে ঘুরছে এবং কমলেশের এক কথাতে আজকাল আর তেমন করে নমস্কার জানিয়ে চলে যায় না। বরং বলে যায়, কাল আসব এবং সব পাওনা পাই-পাই মিটিয়ে দিতে হবে।

এভাবে আর কতদিন? রাও কি বলেছেন, সেটা স্পষ্ট করে জানতে পারলেই বুঝতে পারবে কমলেশ, এখানে আর কতদিন। কিন্তু ধীরাকে কেমন যেন আনমনা দেখাচ্ছে। সোজা সরল প্রশ্নটার উত্তর দিতে অকারণে কত দেরি করছে ধীরা!

সকালবেলার আকাশে অন্য দিনের তুলনায় কিছু অভিনব রঙ বা রূপের দৃশ্য ছিল না, তবু আকাশের দিকে তাকিয়েছিল ধীরা। চোখের উপর আকাশের আভা এসে পড়েছে, যেন চকচক করছে দুটি পাথরের চোখ। মনে হয়, প্লাস্টার দিয়ে তৈরি সুন্দর এক নারীমূর্তির মডেলকে ঘাসীরঙের সিল্কের শাড়ি দিয়ে আর দুটি হীরার কানফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে ধীরা। কমলেশ বলে—কি হলো?

ধীরা—রাও রান্নাতেও হাত পাকিয়েছেন ভালো। নিজের হাতে পনর মিনিটের মধ্যে পরিজ তৈরি করে এনে বললেন, খান মিসেস রায়।

কমলেশ—খেলেই পারতে!

ধীরা—খেয়েছি বৈকি।

কমলেশ—তারপর?

সেই প্রশ্ন, তার সঙ্গে দুর্মর সেই বাঁকা হাসি কমলেশের ঠোঁটে নিঃশব্দে কাঁপছে। আজ পর্যন্ত ঐ হাসি ধীরাকে কোন প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে দেয়নি। কোনরকমের অবাধ্য হতে দেয়নি। কোন কথা বুঝতে ও বিশ্বাস করতে দেরি হলে কমলেশের এই হাসির ইঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে সেকথা বুঝেছে ও বিশ্বাস করে ফেলেছে ধীরা। কিন্তু আজ যেন মনের সব শক্তি দিয়ে কমলেশের প্রশ্নকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে ধীরা। বোধহয় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না ধীরা, ইচ্ছেই করছে না।

ধীরা বলে—রাও একটি গুণের জাহাজ। গার্ডেনিং জানেন এক্সপার্ট মালীর চেয়েও ভালো। নিজের হাতে যত্ন করে সুন্দর সুন্দর কত ম্যাগ্নোলিয়া ফুটিয়েছেন। দেখে সত্যিই আশ্চর্য লাগল। সারাদিন ধরে খনি কারখানা আর অফিস করেও কেমন করে যে এতসব সখের কাজ করবার সময় পান এবং করতে পারেন আশ্চর্য।

কমলেশ—আমার কাজটার কি ব্যবস্থা করলেন? কিছু প্রমিস করলেন?

কমলেশের গলার স্বরে একটা তীব্রতার সুর ফুটে ওঠে, কারণ আশা-ভরসা ও কৌতূহলে তীব্র হয়ে রয়েছে কমলেশের মন। ধীরা সব বুঝেও অবুঝের মতো যত অবান্তর বিষয় নিয়ে গল্প জমাতে চাইছে। ধীরার গল্প, আর গল্পের এই উচ্ছল হাস্যতরল ভঙ্গী, দুই-ই দুঃসহ হয়ে উঠছে।

আগাবেগ ব্রাদার্সের প্রধান সেলিং-এজেন্ট হবার ইচ্ছা জানিয়ে দরখাস্ত করেছে কমলেশ। এ কাজটাও বসে থাকার কাজ। দেশবিদেশের অর্ডার আসে এবং আগাবেগ ব্রাদার্সের অভ্রের স্তূপ আপনা থেকেই নিঃশেষে বিক্রী হয়ে যায়। এর জন্যে সেলিং-এজেন্টের তেমন কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খবর পেয়েছে কমলেশ, মাত্র আড়াই পার্সেন্ট কমিশনে কোন্ এক মিনিস্টারের বোন-পো সেলিং-এজেন্ট হয়ে বসবার চেষ্টা করছে। মাত্র আড়াই পার্সেন্ট, কিন্তু তারই হিসাবের জোরে মাসে সাত আট হাজার টাকা কমিশন হবে মিনিস্টারের বোনপোর। সন্ধেবেলা শুধু অফিস ঘরে এসে একটি চালান বই ও একটি রেজিস্টার সই-করা, এছাড়া একাজে আর কোন খাটুনি হয়রানি নেই। কমলেশ তার দরখাস্তে দাবি করেছে, সাড়ে তিন পার্সেন্ট কমিশনে তাকে সেলিং-এজেন্ট নিযুক্ত করা হোক। সবই তো রাওয়ের হাত। ইচ্ছে করলে তিনি সবই করতে পারেন।

কিন্তু ইচ্ছে না করার সাধ্যি হবে কি রাওয়ের? এ বিশ্বাস আছে কমলেশের, ধীরা যখন ভার নিয়েছে, তখন রাওকে ইচ্ছে করিয়ে ছাড়বেই। সে শক্তি ধীরার আছে। কই, আজ

বারো বছরের মধ্যে কোন ঘটনা ধীরাকে তো কখনো হার মানতে ও ব্যর্থ হতে হয়নি।

পাটনার সেই মোটরকার কোম্পানীর শো-রুম উঠে যাবার পর, অর্থাৎ কমলেশের এত বড় অকেজো অথচ অর্থকর চাকরিটা চলে যাবার পর দানাপুরের সেই দু'শো টাকার ভাড়ার বাড়িতে আরও এক বছর দু'জনে এক রকমের সুখেই ছিল। চাকরি ছিল না কমলেশের, কিন্তু টাকার অভাব হয়নি। কারণ, এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার একদিন কমলেশের আমন্ত্রণে চা খেতে এলেন। প্রথম দিন ধীরার হাতের চা খেলেন এবং দ্বিতীয় দিন ধীরার হাতের পিয়ানো শুনলেন। তৃতীয় দিন কমলেশের ভাড়া-করা ট্যাক্সিতে চড়ে আনন্দ-ভ্রমণ করে এলেন নালন্দা পর্যন্ত। ট্যাক্সির সীটে একপাশে বসলেন ম্যানেজার, একপাশে কমলেশ, মধ্যে ধীরা।

তারপর একদিন দশ হাজার টাকার লোন চেয়ে একটি চিঠি দিল ধীরা, এবং ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পত্রপাঠ চেক পাঠিয়ে দিলেন! সে লোন হয়তো এখনো ব্যাঙ্কের অনর্থকের খাতায় মাত্র একটা লেখা হয়ে পড়ে আছে। কিংবা এতদিনে মুছেই গিয়েছে, কারণ এটাও তো প্রায় পাঁচ বছর আগেকার কথা।

জব্বলপুরের কাছে একটা সাহেবী হোটেলে প্রায় এক বছরের জীবন। সেও তো তিন বছর আগেকার কথা। হোটেলের বিল মাসের পর মাস শুধু জমে উঠতেই থাকে। শোধ করতে পারে না কমলেশ। হোটেলের মাতাল মালিক পাঁচহাজার টাকার একটা বিল এবং একটি নোটিশ নিয়ে এসে কমলেশ আর ধীরার ঘরে ঢুকলেন।—যতদূর সাধ্য আমরা ধৈর্য ধরে আপনাকে সহ্য করেছি মিস্টার রায়। কিন্তু এই শেষ। আজ পেমেন্ট চাই।

ধীরার মুখের দিকে তাকায় কমলেশ। ফোটা ফুলের মতো ফুল্লরুচি মুখের ওপর রঙীন হাসির পরাগ ছড়িয়ে ধীরা বলে—মিস্টার প্রোপাইটর!

প্রোপ্রাইটর—বলুন, কি বলবার আছে?

ধীরা—বিল শোধ করার ভার আমি নিলাম।

প্রোপ্রাইটর—নিন।

ধীরা—আজ নয়, মাত্র সাত দিন পরে। পুণা থেকে ঘুরে আসি, তার পর।

প্রোপ্রাইটর—কেন?

ধীরা—টাকা আনতে যাব আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে, আমারই পাওনা টাকা।

প্রোপ্রাইটর—আজ তাহলে আপনি একেবারে টাকাশূন্য?

ধীরা—হ্যাঁ মিস্টার প্রোপ্রাইটর, এখানে এসে জুয়েলারী কিনতে আমার পনর হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে।

যা শিখিয়ে দিয়েছে কমলেশ, তাই স্বচ্ছন্দে বলে গেল ধীরা। একটি কথার মধ্যে গলার স্বর আটকে গিয়ে কেঁপে উঠল না, যত মিথ্যে হোক না কেন সে-কথা। বরং ধীরার চোখ আর মুখের হাসির ছোঁয়া লেগে মিথ্যে কথাগুলি জীবন্ত সত্যের চেয়েও বিশ্বাস্য হয়ে বেজে ওঠে।

কিন্তু মাথা নাড়েন প্রোপ্রাইটর। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকেন, তারপর ধীরার মুখের দিকে অপলক চোখে তীব্রভাবে তাকিয়ে থাকেন। তারপরেই হো-হো করে হেসে উঠে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় আশ্বাস দিয়ে বলেন—তাতে চিন্তা করবার কি আছে? আপনিই তো একটি জুয়েল, ম্যাডাম!

ধীরা হাসে। প্রোপ্রাইটর উৎসাহিত হয়ে বলেন—বিল আর পেমেন্টের কথা এখন থাক। আসুন, নাচের ঘরে যাই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় প্রোপ্রাইটর এবং ধীরার হাতের দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে আহ্বান জানায়।

বুক কেঁপে ওঠে ধীরার। ফোটা ফুলের মতো সুন্দর মুখের ওপর আগুনের একটা হল্‌কা

এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে, রঙীন হাসির পরাগ মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে কালো হয়ে যায়। ভীরু আর অসহায়ের মতো বেদনাক্ত দৃষ্টি তুলে কমলেশের দিকে তাকায় ধীরা।

কমলেশ তাকায় ধীরার চোখের দিকে। ভ্রূকুটি নয়, দু'চোখ ব্যথিত পুরুষহিংসার বিদ্যুৎ নয়, কমলেশের দু'ঠোঁটে ধীরে ধীরে সেই তির্যক হাসির রেখা ফুটে উঠে নিঃশব্দে কাঁপতে থাকে। দ্বিধা করলে বা ভয় করলে চলবে না ধীরার। নির্ভীক কালচার্ড নারীর মতো ধীরাকে অগ্নিপরীক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে হবে, হাসতে হাসতে। ঐ বাঁকা হাসি হলো তারই অমোঘ নির্দেশ। মিস ডি-সিল্‌ভার কাছে নাচের এত ভালো ভালো স্টেপ আর সুইং এত কষ্ট করে শিখেছে ধীরা, সেগুলিকে কাজে লাগাবার এই সুযোগ বৃথা হতে দেওয়া চলবে না। ধীরার ঐ সুঠাম দেহের তুচ্ছ কয়েকটা হিন্দোলিত ভঙ্গীর স্পর্শসুখে অভীভূত হয়ে প্রোপাইটর যদি পাঁচ হাজার টাকার বিল কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তবে আর দ্বিধা করবার কি আছে ধীরার? এ সব দ্বিধা-কুণ্ঠার সংস্কারকে ধীরার মন থেকে কবেই তো নিঃশেষে দূর করে দিয়েছে কমলেশ।

আশ্চর্য হয় এবং মনে মনে বিরক্ত হয় কমলেশ। এত শেখাবার পরেও ধীরার মুখের ওপর যেন মাঝে মাঝে হঠাৎ এক মুর্খ পাড়াগাঁয়ের ছায়া ভেসে ওঠে। তখন এই নীরব বাঁকা হাসির শাসন ছাড়া ধীরাকে বোঝাবার আর কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায় ন'বছর পার হবার পরেও, আজ দেখতে পায় কমলেশ, ধীরার প্রাণের ভিতরে লুকিয়ে থেকে দুর্বল ও অসহায় একটা বিদ্রোহ যেন আবার মাথা তুলতে চাইছে। বাঁকা হাসির কাঁপুনি দেখেও যেন ভয় পাচ্ছে না ধীরা। প্রোপ্রাইটারের আহ্বান যেন শুনতে পাচ্ছে না।

মুখ ফিরিয়ে আলোর দিকে অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে থাকে ধীরা। চোখ দুটো পোখরাজ পাথরের মতো ঝকঝক করে। তার পরেই বলে—রসিদ দিন মিস্টার প্রোপ্রাইটার, বিল শোধ করে দিচ্ছি।

প্রোপ্রাইটার বিস্মিত হয়ে রসিদ বই বের করেন এবং রসীদ নিয়ে ধীরার হাতের কাছে এগিয়ে দেন।

গলা থেকে জড়োয়া নেকলেস খুলে নিয়ে প্রেপ্রাইটারের হাতের কাছে তুলে ধরে ধীরা—এই নিন, এর দাম পাঁচ হাজার টাকার কিছু বেশিই হবে।

প্রোপ্রাইটার চমকে উঠে বলেন—বুঝলাম। তারপর গম্ভীর হয়ে বলেন—আমি আপনাকে বিশ্বাস করলাম ম্যাডাম। যান, পুণা চলে যান, কিংবা যেখানে খুশি যান। যেদিন পারবেন টাকা পাঠিয়ে দেবেন। গুড বাই!

ধীরার জড়োয়া নেকলেসের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে চলে গেলেন প্রোপ্রাইটার। কমলেশের বাঁকা হাসির কাঁপুনি থামে এবং ধীরার কৃতিত্ব দেখে শেষ পর্যন্ত সুখীই হয় কমলেশ, যদিও সে জানে যে, এধরনের উদারতার অভিনয় সব সময় নিরাপদ নয়। টাকা আনবার ও বাঁচাবার ব্যাপারে এইধরনের চেষ্টার পর ঠিক পাকা সড়ক নয়, কাঁচা রাস্তা। তার মধ্যে গেঁয়ো কাদা মিশে রয়েছে, পিছলে যাবার ভয় আছে। যাই হোক...।

কিন্তু সারা রাত নিঃশব্দে বালিশের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকে ধীরা, ঘুমোতে পারে না। এ পথ কোন্ পথ? ধীরার ভাগ্য দেখে এবং ভাগ্যের নতুন নতুন উন্নতির সংবাদ শুনে সুখী হয়ে আছে নদে জেলার এক পাড়া-গাঁ। কিন্তু তারা কি জানে, ধীরার হৃৎপিণ্ড যে দিবারাত্রি পুড়ছে?

মাঝরাতে নিশির ডাকে জেগে-ওঠা মানুষের মতো বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে ধীরা। আলো জ্বেলে টেবিলের কাছে বসে। কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে থাকে।

মেজদি, জামাইবাবু তো বত্রিশ টাকা মাইনে পান শুনেছি। কিন্তু তোমাকে তো একদিনের জন্যও একটুও লজ্জা পেতে দেখলাম না।

এক গাদা ছেলে-পিলে নিয়ে ছেঁড়া তোষকের ওপর পড়ে থেকে আর কতগুলি চাল-ডাল সেদ্ধ করে দিন কাটাও কেমন করে? ধন্যি তোমাদের সুখ।

এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয় ধীরা।

নতুন করে একটা চিঠি লেখে।—কিছু মনে করো না মেজদি, একটা কথা জানতে চাই, সত্যি কি না? দিদিমার কাছে শুনেছি, তোমার বিয়ের এক মাস পরে জামাইবাবু নাকি তোমাকে চাবুক তুলে মারতে তাড়া করেছিলেন, কারণ তুমি নাকি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপর একটা ফেরিওয়ালার দিকে হাঁ-করে বেহায়ার মতো তাকিয়েছিলে? আমি জানতে চাই, তুমি কি সত্যি সত্যিই এরকম একটা লোককে ভদ্রলোক মনে করো? বত্রিশ টাকা মাইনের মন্থরী, সেই মানুষটাকে কি সত্যিই স্বামী বলে ভেবে সুখ পাও? ভালবাসতে পেরেছ কি? আমার সন্দেহ হয় মেজদি।

চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয় ধীরা। দু'হাতে কপাল চেপে বসে থাকে। কপালের শিরাগুলি দপ দপ করে, যতক্ষণ না হোটেলের রাত্রি ভোর হয়।

জব্বলপুরের পর কিছুদিন জামসেদপুর, তারপর গিরিডি। কত রাত্রিই তো ভোর হয়ে গেল। প্রতি সন্ধ্যায় ধনী ও কালচার্ডের সমাগমে গমগম করছে কমলেশের ভাড়া-করা বাংলোর লন আর বারান্দা। ধীরার শাড়ির আঁচলের বাতাসে, হাতের তৈরি চায়ের মিষ্টি উত্তাপে, ধীরার সুস্মিত ওষ্ঠের ভঙ্গীতে, পিয়ানোর স্বরতরঙ্গের মতো ধীরার উচ্ছল হাসির শব্দে—তার ওপর ধীরার ভাব-নিবিড় কণ্ঠস্বরে ইংরেজী বাংলা ও উর্দু কবিতার আবৃত্তিতে সান্ধ্যআসরের জনতা সংজ্ঞা না হারাক, সময়জ্ঞান হারিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ধীরা যখন ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত না করে আর পারে না, তখন গাড়ির ড্রাইভারদের ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বাড়ি ফিরেছে সবাই। যে সন্ধ্যায় যার পাশে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে সবচেয়ে বেশিক্ষণ গল্প করেছে ধীরা, পরের দিন তারই কাছে কমলেশের বেয়ারা গেছে চিঠি নিয়ে। অন্তত হাজার দুই টাকা, ইন ক্যাশ, এখুনি চাই।

এসেছে টাকা। কমলেশের চিঠির দাবি প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে, এমন কোন শক্তিমান কাউকে দেখা যায়নি। বরং দেখা গেছে, কেউ কেউ যেন একটা আশার উন্মাদনায় দু'হাজারের বদলে তিনহাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কমলেশের টাকার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

গিরিডি ছেড়ে চলে যাবার মাসখানেক আগে যেদিন কোলিয়ারী অঞ্চলের সেই নানা জাতের বড়লোকদের ক্লাবে টেনিস খেললো ধীরা, সেদিন ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে দর্শক হয়ে কমলেশও খেলা দেখেছিল বেতের চেয়ারে বসে। লীলাচঞ্চল লঘু হরিণীর মতো ধীরা যখন তার তনুশোভা আবর্তিত করে আকাশে বাহুবিক্ষেপ করে, মাথার ওপর দিয়ে পলাতক বলটাকে ব্যাটের সজোর আঘাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য, দর্শকের চোখে তখন পলক আর পড়ে না। একমাত্র কমলেশের চোখে কোন বিকার দেখা যায় না, বরং দৃষ্টি ঘুরিয়ে সে দেখতে থাকে, কার দৃষ্টি কতখানি পাগল হলো? দেখে খুশি হয় কমলেশ। পাগলের মতো ঐ এক-একটা দৃষ্টির কাছ থেকে কত টাকা আদায় করা যাবে, অনুমানে তার একটা হিসেবও করে ফেলে কমলেশ।

অনুমান মিথ্যে হয়নি, হিসেবও ভুল হয়নি কমলেশের। টাকা পেয়েছিল কমলেশ এবং গিরিডির জীবনটা একরকম ভালোই কেটেছিল।

কিন্তু সে ভালোর চেয়ে আরও ভালো কি হয় না? হয় বৈকি ; এবং ইচ্ছে করলে বুদ্ধি থাকলে আরও ভালোকে সব সময় বাগিয়ে ফেলা যায়। এই বিশ্বাস কমলেশের জীবনের আসল নেশা, দামী স্প্যানিশ মদ তো তার জিভের নেশা মাত্র। এবং ঐ আরও ভালো করে পাওয়ার নেশাটুকু আছে বলেই মনটা তার দিন দিন আরও শক্তি পেয়ে যাচ্ছে। গিরিডিতে থাকতেই বুঝতে পারে কমলেশ, আপাতত অন্তত একটা বাড়ি, দুটো গাড়ি এবং হাতের কাছে

অন্তত লাখ পাঁচেক নগদ টাকার ছোট্ট একটা স্তূপ না থাকলে এই জীবনটাই সব নেশা হারিয়ে কি যে হয়ে যাবে বলা যায় না, হয়তো পটলার মতো গরুর জীবন হয়ে যাবে।

কোলিয়ারীর ক্লাবে রাওয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা আলাপ ও পরিচয় হয়েছিল কমলেশের। তার কিছুদিন পরে গিরিডির কয়লাকে পিছনে ফেলে অভ্রছড়ানো এই টাকার দেশে চলে এসেছে কমলেশ আর ধীরা। এই ভাবেই ইচ্ছে থাকলে ও বুদ্ধি থাকলে এবং ধীরার মতো একটা...

কি বলা যায়? কমলেশের কে হয় ধীরা? কি সম্পর্ক? কালচার্ড কমলেশের মতো মানুষেরও চিন্তার ভাষা হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায়।

সবচেয়ে দামী স্প্যানিশ মদ কয়েক চুমুক পান করার পর কমলেশের মন আবার মত্ত হয়ে চলতে থাকে। বুঝতে পারে কমলেশ, ধীরা হলো একটা আত্মহীন মেয়েমানুষের সুন্দর মুখ মাত্র। বেশি কিছু নয়। দশ হাজার টাকার একটা চেক আনতে গিয়ে ঐ মুখে যদি একটা কালো দাগ পড়ে, কি তাতে এসে যায়? বিশ্বাস করে কমলেশ, এই রকম একটা বস্তু তার হাতের মুঠোয় থাকলে এই অভ্রছড়ানো দেশ ছেড়ে আরও এগিয়ে একদিন এক হীরাছড়ানো দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারা যাবে।

এ তো হলো ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এখন কি হবে? কতদূর কি হয়েছে? রাওয়ের কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পেরেছ কি ধীরা?

বরাকরের বুকের বাতাস হু হু করে ছুটে আসে। স্প্যানিয়েল আনন্দে মাথা নেড়ে কান বাজায় এবং কমলেশের পাইপের কালো ধোঁয়া চূর্ণ হয়ে সকালবেলার এই উজ্জ্বলতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু তার ঠোঁটের ওপর বাঁকা হাসির রেখা মিলিয়ে যায় না, বরং আরও কঠিন হয়ে আস্তে আস্তে কাঁপতে থাকে। ধীরার দিকে তাকিয়ে সন্দেহ হয়েছে কমলেশের, আত্মহীন মেয়েমানুষের সুন্দর মুখটা যেন থেকে থেকে ছটফট করছে। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফাঁকা হাসি আর বাজে কথার ঝঙ্কারে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে। কমলেশকে কি একটা আকাট গোখরো মনে করে ধীরা? নইলে, এসব ছলকলা আর মেকি হাসির বাঁশি বাজিয়ে কমলেশকে ভোলাবার চেষ্টা করে কেন? ভাবতে গিয়ে মনে মনে হেসে ফেলে কমলেশ। ছলনার বাঁশি বাজাবার আর্ট যে শিল্পীর কাছে ছাত্রী হয়ে শিখেছে ধীরা, সে শিল্পীরই তীব্র চক্ষু দুটোকে ধোঁকা দেবার সাহস দেখাচ্ছে ধীরা, আশ্চর্য!

মিথ্যে নয়, সত্যিই আজ সাহস দেখাচ্ছে ধীরা। কে জানে কোন্ সাহসে। হয়তো আজকের সকালবেলার রোদের আলো থেকে কিংবা বরাকরের বুকের বাতাস থেকে হঠাৎ সাহস পেয়ে ধীরা যেন কেমন হয়ে উঠেছে। তার আত্মাহীন জীবনে, মেকি হাসি দিয়ে গড়া এই মুখেও যে-কথা ভুলেও কখনো উচ্চারণ করেনি ধীরা, আজ সে অবাধে সে-কথা বলে চলেছে। এক পরপুরুষের প্রশংসা। রূপে গুণে কাজে ও শিক্ষায় রাও কত উঁচুদরের মানুষ। থেকে থেকে যেন ভক্তের উচ্ছ্বসিত আবেগে এক অত্যুচ্চ পৌরুষের উদ্দেশে স্তুতিধ্বনি করে উঠছে ধীরা।

একবর্ণও মিথ্যে কথা বলছে না ধীরা। রাওয়ের নামে যা যা বলেছে ধীরা, তারই সব সত্য। তবে হাসির ঝঙ্কারগুলি বেজে উঠেই হঠাৎ থেমে যায় কেন? কথা বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নেয় কেন ধীরা? চোখ দুটো হঠাৎ পাথরের চোখের মতো হয়ে যায় কেন? কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে ভুল করে চোখের পাতা মোছে কেন ধীরা?

তবু ধীরাকে আজ বেশ একটু কঠিন দেখাচ্ছে। এই তির্যক হাসির রেখাকে চিরকাল যে-ভয় করে এসেছে ধীরা, সে-ভয়কে তুচ্ছ করার জন্য যেন প্রস্তুত হয়েছে। এতদিন পরে এবং

এত হঠাৎ! আত্মাহীন মেয়েমানুষের আচরণ আজ বড় অস্বাভাবিক মনে হয়।

রাওয়ের নামে স্তুতিধ্বনি। বুকের ভেতর একটা জ্বালার কুণ্ড থেকে কথাগুলি যেন উঠে আসছে, এক-একটা উত্তপ্ত সূচীমুখ অঙ্কুশের মতো। এ অঙ্কুশ নিক্ষেপ করে ধীরা যেন পরীক্ষা করে দেখছে, সম্মুখের ঐ বজ্রপাষাণের হৃদয় কি বিদ্ধ হয় কি না। রাগ করে কি না, চিৎকার করে ওঠে কি না, হিংসার জ্বালা লাগে কি না মনে।

কিন্তু দু'চোখ তুলে তাকিয়ে স্পষ্ট করেই দেখতে পায় ধীরা, কমলেশের ঠোঁট দুটি নীরবে বাঁকা হাসি হাসছে।

সে হাসি দেখতে পেয়ে ধীরার মুখের হাসিও যেন দাউ দাউ করে জ্বলে জ্বলে কাঁপতে থাকে। ধীরা বলে—যাই বল, রাওয়ের চেহারাটা কিন্তু একেবারে নিখুঁত, যেমন গড়ন তেমনি স্বাস্থ্য। মিসেস রাওকে হিংসে না করে পারা যায় না।

কমলেশ জোরে শব্দ করে হেসে ওঠে—যত খুশি হিংসে কর। কথা হলো, রাও যদি আমার স্কীমটা মঞ্জুর করতে আর বেশি দেরি করে, তা হলে ব্যাপার বড় বিশ্রী রকমের দাঁড়াবে।

উঠে দাঁড়ায় ধীরা। কমলেশের এই কুৎসিত বাঁকা হাসির বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড ঘৃণার ঝড় যেন ধীরার বুক তোলপাড় করে ঠেলে উঠছে। ও হাসি আর সহ্য হয় না।

ধীরা বলে—মঞ্জুর করবেন বলেছেন।

আর কোন কথা না বলে বারান্দার নির্লজ্জ কালো পালিশকে জুতোর শব্দে মাড়িয়ে চলে যায় ধীরা। ঘরের ভেতর ঢুকেই চেয়ার টেনে টেবিলের কাছে বসে। হাতের কাছে কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখে ঃ

তোমার কাছেই গল্প শুনেছিলাম মেজদি। তোমার শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের কাছে কোন্ এক মস্ত জমিদার কোন্ এক বাঈজীর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিয়ে একেবারে ভিখিরী হয়ে গেছে। সারা গাঁয়ের লোক নাকি তাকে ঘেন্না করে? তোমাদের এই গেঁয়ো ঘেন্নার অর্থ আমি বুঝতে পারি না মেজদি। লোকটা তবু একটা মানুষ তো। লক্ষ টাকা পাওয়ার লোভে সে তো পরের কাছে নিজের...।

চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয় ধীরা। টেবিলের ওপর কপাল ঠেকিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

চাকর এসে কখন টেবিলের ওপর চা-খাবার রেখে গেছে, কিছুই জানে না ধীরা। জ্বালাক্রান্ত মনটা যেন এই উজ্জ্বল সকালবেলার বন্ধন কাটিয়ে নিবিড় এক অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছে। এ দেশটা বেশ ঠাণ্ডা। মাটিতে কাদা, বাতাসে গোবরের গন্ধ, আলোকলতার গায়ে জোনাকি জ্বলে, গরু ডাকে, খড়মের শব্দ শোনা যায়, মানুষের দিদিমার মুখে কৃষ্ণনামের গানের শব্দে শেষ রাত্রির ঘুম ভাঙে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল ধীরা। ঘুম ভাঙতেই চারিদিকে তাকায়, এবং দেখতে পায় ঘরের জানালাগুলি রঙীন কাচ দিয়ে আঁটা। বোধহয় দুপুর হয়ে এসেছে, এবং বিকেল হতেই বা কত দেরি? তারপর আসবে সন্ধ্যা। রাওয়ের গাড়ি এসে হর্ন বাজাবে গেটের কাছে, মরণপথে টেনে নিয়ে যাবার জন্য নির্মম গম্ভীর এক বাঁশির শব্দ। ভাবতে গিয়ে ধীরার সারা দেহ একটা বেদনায় মোচড় দিয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। দু হাতে কপাল টিপে টিপে আবার যন্ত্রণা চেপে রাখতে চেষ্টা করে, মাথা ঠুকে চূর্ণ করতে ইচ্ছে করে বদ্ধ জানলার রঙীন কাচ।

যে কথাগুলি মুখ খুলে কমলেশের কাছে বলতে পারেনি ধীরা, মনে পড়ছে সেই কথাগুলি। রাও যা বলেছে, সেই কথা। মানুষের কথা নয়, মানুষের ফুসফুসখেকো বাঘের মুখের কথা। সে কথার জ্বালা এখনো ধীরার কানের ভেতর যেন ফোসকা হয়ে জ্বলছে। রাওয়ের হাতের তৈরি পরিজ আজ হাসিমুখে খেয়ে এসেছে ধীরা। মনে হয়, সে আজ এক

পেয়ালা নর্দমার পাঁক হাসিমুখে খেয়ে নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

কমলেশের কাছে রাওয়ের কথার শুধু শেষটুকু বলেছে ধীরা, প্রথমটুকু বলেনি। অভ্ররাজ্যের জেনারেল ম্যানেজারের অনুগ্রহের সংবাদটুকু শুধু শুনিয়েছে, কিন্তু তার শর্তের সংবাদটা শোনায়নি। শোনাতে চায় না ধীরা, শোনাতে ভয় করে। কারণ, সে কথার সবটুকু শুনেও যদি কমলেশের ঠোঁটে সেই দুর্মর বাঁকা হাসির রেখা কেঁপে কেঁপে ধীরাকে মরণপথে যাবারই প্রেরণা দিয়ে নীরবে বলে ওঠে—যাও! তবে?

এই ভয়, এ ছাড়া আর কোন ভয় নেই ধীরার মনে। এই বারোটা বছর যখন এতগুলি বাধের দৃষ্টিকে দূরে দূরে রেখে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে ধীরা, আজও সে ইচ্ছে করলেই পারবে। কঠিন একটা গেঁয়ো প্রাণ যেন বুকের ভেতর লুকিয়ে থেকে এই মানহীন টাকার জীবনটাকে সন্দেহ করতে শিখিয়ে আসছে ধীরাকে, এই বারোটা বছর ধরে। কিন্তু নিজের এই শক্ত প্রাণটার দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্যও না হয়ে পারে না ধীরা। কোন্ আশায়, কোন্ লোভনীয়কে লাভের জন্য, কোন্ বরণীয়কে বরণ করার জন্য বারোটা বছরের মধ্যেও মরণপথে চলে না গিয়ে কিসের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনছে ধীরা?

মনে হয় ধীরার, তার মনের ভেতর যেন শাঁখা-সিঁদুর পরে এক মুর্খ বিশ্বাসের নারী ধৈর্য ধরে বসে আছে এখনো। সে নারীর স্বামী বিরাগী হয়ে কোথায় যেন চলে গেছে, গত বারো বছরের মধ্যেও তার কোন খবর নেই। তবু সিঁদুর না মুছে এখনও প্রতীক্ষায় বসে আছে, স্বামী ঘরে ফিরে আসবে, এই আশায়। কিন্তু এখন আর এই আশার কি কোন অর্থ হয়?

রাওয়ের ইচ্ছার সব কথা শোনার পরেও যদি পাথরের মানুষ চিৎকার করে না ওঠে? যদি সেই বাঁকা হাসির রেখাই কৃতার্থভাবে নিষ্ঠুর আনন্দে কাঁপতে থাকে, তবে? তবে এই সিঁথি হতে সিঁদুরের শীর্ণ রেখাটুকু মুছে ফেলতে হবে, রেখে আর লাভ নেই। সে হাসিতে চরম করেই জানা যাবে, ধীরার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। ফিরবে না আর, আর প্রতীক্ষার কোন অর্থ হবে না।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে ধীরা। ঘরে ঢোকে কমলেশ।

কমলেশ জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু রাও ঠিক কবে আমার স্কীমটা মঞ্জুর করবেন, সেই কথাটা, আদায় করে নিতে পারলে না?

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ধীরা। বুঝতে পারে, বারো বছরের প্রতীক্ষার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেতে আর দেরি নেই। পাথরের মানুষ একেবারে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে। উত্তর দিতে হবে।

ঝঙ্কার দিয়ে হেসে ওঠে ধীরা। ভুরু বাঁকিয়ে কমলেশের দিকে তাকায়। রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে ঠোঁট মুছে নিয়ে ধীরা বলে—আদায় করেছি।

—কবে সই করবেন?

—রাঁচি থেকে ফিরে আসার পর।

—কবে যাচ্ছেন রাঁচি, ফিরবেন কবে?

—আজই সন্ধ্যায় যাচ্ছেন। রাঁচিতে একদিন থেকে, তারপর হুডরু ঝর্ণা দেখতে যাবেন। সেখানে ডাকবাংলোতে দিন তিনেক থেকে আর পাখি শিকার করে, তারপর ফিরবেন।

—যাক্, এতক্ষণে একটা ভালো সংবাদ জানা গেল।

—আমিও যাচ্ছি।

—কোথায়?

—রাওয়ের সঙ্গে।

—এঃ, একটু আগে জানাতে পারনি?

—কেন বল তো?

—আমার গরম পোশাকগুলি এখুনি ধোপা এসে নিয়ে গেল ইস্তিরি করার জন্য।

—তাতে কী ক্ষতি হলো?

—ক্ষতি কিছু নয়, একটা অস্বস্তি। শীতের দিনে শুধু একটা শাল গায়ে দিয়ে মোটর জার্নিতে আরাম নেই।

খিল খিল করে হেসে ওঠে ধীরা—তুমি মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছ।

—মিছিমিছি কেন?

—তোমাকে যেতে হবে না। শুধু আমি যাব।

—কি রকম?

—রাও যে রকম বলেছেন, সেই রকম।

—ও, বুঝলাম!

ধীরার মুখের দিকে একবার তাকায় কমলেশ। তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

রুমাল দিয়ে চোখ চেপে চুপ করে বসে থাকে ধীরা। শুনতে পায়, দরজার বাইরে বারান্দার ওপর কমলেশের চটির শব্দ আনাগোনা করছে। আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে ধীরা। বারান্দার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত কমলেশের চটির শব্দ বারবার যাওয়া আসা করছে। অকারণে পরিশ্রম করছে কমলেশ। যেন হঠাৎ ভুলে গেছে কমলেশ, এত হাঁটাহাঁটি করলে এখনি পরিশ্রান্ত হতে হবে আর কপালে বিন্দু বিন্দু বিন্দু ঘামও ফুটে উঠবে।

ধীরাকে আবার চমকে দিয়ে ঘরে ঢোকে কমলেশ—ব্যবস্থা একটু কাঁচা রকমের হয়েছে ধীরা। উচিত ছিল, আগে রাওকে দিয়ে দরখাস্তটা সই করিয়ে নেওয়া! তারপর নেমন্তন্ন করে আসতে, সবাই মিলে একদিন সূর্যকুণ্ড গিয়ে বেশ একটা ভাল রকমের পিকনিক করে...

ধীরা হাসে—কি যে বলো! রাও যা বলবে তাই তো হবে।

কমলেশ—তা তো হবে, কিন্তু রাও যাতে অদ্ভুত একটা কিছু না বলে বসে, তার জন্যে তুমি তো একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করবে।

ধীরা আরও জোরে হাসে আর ভ্রূভঙ্গী করে—তা হয় না। শেষে রাও আমাকে একটা অসভ্য মনে করুক আর কি! ছিঃ!

ব্যস্তভাবে ঘর ছেড়ে চলে যায় কমলেশ। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে ধীরা, কমলেশের চটি যেন কাঁটা-বেঁধা পায়ের চলার মতো এলোমেলো শব্দ করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আর শোনা যায় না। কোথাও যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে কমলেশ।

নিঝুম হয়ে চেয়ারের ওপর যেন শ্বাসবায়ুর সব অস্থিরতা প্রাণপণে দমন করে বসে থাকে ধীরা। শুনতে পায়, আলমারি খুলছে কমলেশ। কাঁচের গেলাস ঠুং-ঠাং করে বেজে উঠছে। চোখ বন্ধ করে ধীরা। আরও উন্মাদ হবার জন্য তৈরি হচ্ছে একটা নিরেট বেদনাহীন পাথর। এ পাথরের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য ধীরা সব শক্তি দিয়ে নিজেকেও যেন পাথর করে নিয়ে তৈরি হয়।

চোখ খুলেই দেখতে পায় ধীরা, ঘরের দরজার কাছে এসে পর্দাটা খিমচে ধরে দাঁড়িয়ে আছে কমলেশ। ঠোঁট ভেজা, কান দুটো লালচে।

কমলেশ বলে—একটা কথা আমার মনে হচ্ছে ধীরা। যদি রাঁচি থেকে ফিরে আসার পরেও রাও আমার দরখাস্তটা সই না করে?

ধীরা—না করে, না করবে। যাদের অনুগ্রহে কাজ হবে তাদের অনুরোধের একটা রিস্ক তো নিতে হবে।

আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে ধীরার ঘরের ভেতর ঢোকে কমলেশ। এগিয়ে এসে খাটের ওপর একেবারে পা তুলে নিয়ে বসে। পাইপ ধরায়, মুখ ভরে ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর মেঝের

দিকে নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গম্ভীর স্বরে বলে—রিস্ক অবশ্য কিছুই নয়। কিন্তু রাওকে বিশ্বাস করতে খুব বেশি ভরসা পাচ্ছি না।

ধীরা—যার কাছ থেকে এত বড় উপকার চাইছ, তাকেই আবার অবিশ্বাস করছ। আশ্চর্য!

ধীরার মুখের দিকে তাকায় কমলেশ এবং তাকিয়ে থাকে। এরকম করে কোন দিন ধীরার মুখের দিকে তাকায়নি কমলেশ, দরকারও হয়নি। বোধ হয় একটু আশ্চর্যই হয়েছে কমলেশ। গেঁয়ো খড়-মাটি দিয়ে অনেক যত্নে নিজের হাতে যে রঙীন পুতুল তৈরি করেছে কমলেশ, সেই পুতুল আজ হঠাৎ একটা রঙীন পাথর হয়ে চেয়ারের ওপর বসে রয়েছে শক্ত হয়ে।

খাট থেকে নেমে আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় কমলেশ। পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। দেখা যায়, বিকেল ফুরিয়ে আসছে, মাঠের শেষ প্রান্তে সূর্য নামছে লাল হয়ে।

—আশ্চর্যই হচ্ছি, তোমাকে দেখে।

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে ঘর ছেড়ে চলে যায় কমলেশ।

সূর্য কখন ডুবে গেছে বুঝতে পারেনি ধীরা। যখন বুঝতে পারে, তখন ঘরের ভেতরটা অন্ধকারে ভরে গেছে। বাইরের বারান্দায় হঠাৎ একটা কাচের গেলাস ঝনঝন করে চূর্ণ হয়, আর স্প্যানিয়েল চিৎকার করে ওঠে।

ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ধীরা, আলো জ্বালে। মুখটা মোছার জন্য তোয়ালে হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে, যেন এই আলো দেখতে পেয়ে বাইরের বারান্দা কাঁপিয়ে একজোড়া সন্দেহক্ষিপ্ত পায়ের শব্দ ছুটে এসে ধীরার ঘরে ঢোকে।

কমলেশ ভ্রূকুটি করে বলে—ও কী? সত্যিই সাজতে আরম্ভ করলে নাকি?

আয়নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধীরা বলে—কী?

কমলেশের চোখ দুটো টকটকে লাল আর মুখটা যেন ভয়ানক একটা গ্রীষ্মের রোদে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে।

ধীরা বলে—দরকার নেই তো নিও না।

কমলেশ—নেব না চাই না। এবার আমার কথাটা বুঝতে পারছ নিশ্চয়?

ধীরা—না।

—রাওয়ের সঙ্গে তোমার রাঁচি যাবার কোন দরকার নেই, বুঝেছ?

উত্তর দেয় না ধীরা।

দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে কমলেশ বলে—বুঝেছ?

অনড় শিলামূর্তির মত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধীরা। কাঁপে না, উত্তর দেয় না।

আহত শ্বাপদের মতো পিছিয়ে আসে কমলেশ, তারপর ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়, আর যেন এক মুহূর্তের মধ্যে একটা চাবুক হাতে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে ধীরার পাথুরে মূর্তির সামনে দাঁড়ায়।

কমলেশ—বুঝেছ কি না বলো? উত্তর দাও ধীরা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ধীরা। ফুলের পাপড়ির মতো নরম ঠোঁট দুটিও যেন ভাষা হারিয়ে পাথর হয়ে গেছে।

হঠাৎ ধীরার মাথা লক্ষ্য করে চাবুক তোলে কমলেশ। ধীরার চোখের তারা চমকে ওঠে, কমলেশের মুখের দিকে তাকায়। দস্যুর মতো মূর্তি, একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ধীরার সম্মুখে। চোখে জ্বলছে পুরুষ-হিংসার বন্য আগুন। এক নারীকে ওর হৃৎপিণ্ডের গুহায় বন্দী করে রাখবার জন্য পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। দুই ঠোঁট স্পন্দিত করে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে ধীরার মুখে।

কমলেশের হাতের চাবুক মত্ত আক্রোশে থরথর করে কাঁপতে থাকে, তবু ধীরার মাথা

একটুও কাঁপে না। বোধ হয় পাথরের তৈরি মাথা, চাবুকের আঘাতেও কোন ব্যথা দেওয়া যাবে না।

চাবুক-তোলা হাত ধীরে ধীরে নামিয়ে ফেলে কমলেশ। ক্লান্ত অবসন্ন ও পরিশ্রান্তের মতো আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে। দেখতে পায় ধীরা, কমলেশের কপালে বিন্দু বিন্দু জল, লালচোখের দুই কোণে দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা।

হাসতে থাকে ধীরা।

চাবুকটা ধীরার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কমলেশ বলে—যাও।

পরমুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নেয় কমলেশ, আর টলতে টলতে ধীরার ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, আর প্রায় দৌড়ে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে সোফার ওপর শুয়ে পড়ে।

ধীরাও ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। চোখ মুখ ছাপিয়ে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। যেন বারো বছর ধরে বুকের ভেতরের এক আনাচে-কানাচে মুখ লুকিয়ে অপেক্ষায় বসেছিল এই হাসি, এত দিনে মুক্তি পেয়েছে। আজ এই সন্ধ্যার বাতাস আর অন্ধকারকে একেবারে নিজের ঘর বলে মনে হয়। এই বারান্দার ওপর মনের আনন্দে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। আজ স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া গেছে, পাথরের বুক ফুঁড়ে জল দেখা দিয়েছে। জ্বালা লেগেছে, তাই তো ওর চোখ লাল হয়েছে। ব্যথাও পেয়েছে নিশ্চয়, তাই মুখ কালো হয়ে গেছে। এতদিনে স্বপ্ন সত্য হলো ধীরার. এই তো কয়েক মুহূর্ত আগে তার বারো বছরের নিরুদ্দিষ্ট বিবাগী স্বামী এই দরজার কাছে এসেই দেখা দিয়ে গেছে। দূরে নয়, ঐ ঘরেই তো সে রয়েছে।

বারান্দার উপরে মেঝেতে আঁচল পেতে শরীর লুটিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার তারাগুলিকে তাকিয়ে দেখতে বড় লোভ হয় ধীরার। মনে হয়—স্বামী আছে, সংসার আছে, কত কাজ আছে। কাজে নামবার আগে একটু জিরিয়ে নিলে দোষ কি?

দেখতে পায় ধীরা, বাগানের কোণে মালীর ঘরের কাছে বসে চাকর বাবুর্চি ও মালী জটলা পাকিয়ে গল্প করছে। তিন মাসের মাইনে পায়নি ওরা তাই কাজে গরজ নেই। চাকর বাবুর্চি ও মালীকে ডাক দেয় ধীরা। হিসেব করে তিন মাসের মাইনে চুকিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ও করে দেয়—এখুনি চলে যাও সব, আর দরকার নেই।

মনে পড়ে ধীরার, কাল সকালে পাওনাদারের দল আসবে। আসুক, আসবাবপত্র যা কিছু আছে এবং দরকার পড়ে তো ছাইপাঁশ সোনা আর জড়োয়া যা আছে, সবই বিক্রি করে দিয়ে দেনা মিটিয়ে দিতে হবে। বারো বছরের আবর্জনা সরিয়ে তার জীবনের চাপা-পড়া ছোট্ট একটা সংসারকে এইবার খুঁজে বের করে নিতে হবে। কাজ আছে বৈকি। অনেক কাজ আছে।

নিজের ঘরে ঢুকে বাক্স খোলে ধীরা। স্তরে স্তরে সাজানো শাড়ির একেবারে সবচেয়ে নীচের স্তরে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে থাকে, বারো বছর আগেকার এক উৎসবদিনের আশীর্বাদগুলি মুখ লুকিয়ে যেখানে পড়ে আছে। একটা কল্লাপেড়ে মোটা সুতোর মিলের শাড়ি হাতে উঠে আসে। দেখা মাত্র মনে পড়ে, এটা মেজদির আশীর্বাদ।

স্নান সারার পর, কল্লাপেড়ে শাড়ি পরে, মোটা বিনুনি করে খোঁপা বেঁধে আর কপালে কাজলের ছোট টিপ দিয়ে আয়নার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে আসে ধীরা। তারপর ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের ভেতর গিয়ে ঢোকে।

সন্ধ্যে গভীর হয়েছে। বরাকরের বুকের বাতাস শীতে থমকে আছে। বাংলো বাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে, সাদা ইউকালিপটাসকেও আর দেখা যায় না। শুধু রান্নাঘরে একটুখানি আলো। শব্দ নেই কোথাও, শুধু রান্নাঘরে হলুদ-বাটা শিল নোড়ার শব্দ এই নিরেট স্তব্ধতাকে সজাগ করে রাখছে।

হঠাৎ গেটের কাছে রাস্তার ওপর মোটর গাড়ির হর্ন বেজে ওঠে, সুগম্ভীর প্রমত্ত হর্নের স্বর, একটানা ব্যাকুল ও অবিরাম আহ্বান।

রান্নাঘরের শিল-নোড়ার শব্দ থামে না। মোটর গাড়ির প্রমত্ত হর্নের শব্দ যেন ঘরের দেয়ালে ঠিকরে বাইরেই পড়ে থাকছে, ঘরের ভেতর এ শব্দ ঢুকতে পারছে না।

কিন্তু হঠাৎ আর একটা কি রকমের যেন শব্দ! শিল-নোড়া থামে। কান পেতে শুনতে থাকে ধীরা। মনে হয়, বারান্দার পাশের ঘরের ভেতরে যেন একটা গলাভাঙা চিৎকার বেজে উঠেছে, ভীত মানুষের আর্তনাদের মতো।

রান্নাঘর ছেড়ে ছুটে এসে কমলেশের ঘরে ঢোকে ধীরা। আলো জ্বালে। সোফায় শায়িত কমলেশের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে?

কমলেশ তাকিয়ে থাকে ধীরার দিকে। যেন বারো বছরের একটা রোগীর ঘুম হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্নে ভেঙে গেছে এবং চোখ খুলেও আতঙ্কিতের মতো নিজেই বুঝতে চেষ্টা করছে, কি হয়েছে।

হলুদমাখা হাত, কল্কাপেড়ে শাড়ি, কপালে কাজলের টিপ। নদে জেলার পাড়াগাঁয়ের স্কুল-মাস্টারের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলে কমলেশ—না, কিছু হয়নি। আমি মিছিমিছি ভয় পেয়েছিলাম।

কথামালা

কবে নীরব হবে কথামালা?

কবে একটু নীরব হবে এই মেয়ে, ধ্রুবজ্যোতির মেজবউদি যার নাম দিয়েছে কথামালা, যার সত্যি নাম হলো বিনীতা মল্লিক?

মুরলী প্রেসের ম্যানেজারের কাজ করেন যে রাইচরণ মল্লিক, তিনি এই পাড়াতেই, ধ্রুবজ্যোতিদের এই ঝকঝকে বাড়িটার পিছনে সরু রাস্তার ধারে একটি সেকেলে চেহারার পুরনো বাড়িতে থাকেন। তাঁরই মেয়ে বিনীতা।

ঝকঝকে চেহারার মেয়ে না হয়েও ধ্রুবজ্যোতিদের এই ঝকঝকে বাড়িতে রোজ আসে বিনীতা, আর কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে এই বাড়ির মানুষগুলির মনগুলিকে,...না, ঠিক ভিজিয়ে দিয়ে যেতে পারে না বিনীতা। বিনীতার কথা শুনে এই বাড়ির মানুষগুলির মন শুধু হাসে, ছটফট করে আর মজা পায়।

স্ট্যাটিসটিক্সের মোটা বই, যার মধ্যে শুধু রাশি রাশি অঙ্ক কিলবিল করে, সেই বই-এর পাতার উপর থেকে গভীর মনোযোগের চক্ষু তুলে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে আর হাসতে বাধ্য হয় ধ্রুবজ্যোতি। কথা বলতে আরম্ভ করেছে বিনীতা। পাঁচটা সেকেণ্ডও থামে না। হঠাৎ প্রশ্ন করে বাধা দিলেও উত্তর দিতে দু'সেকেণ্ডও দেরি করে না বিনীতা। ওর মুখের ভাষা যেন কোন ভাবনার অপেক্ষায় এক মুহূর্তও থমকে থাকে না।

ধ্রুব হাসে, ধ্রুবর বোন শোভা হাসে, আর মেজবউদিও হেসে হেসে আবার একটা প্রশ্ন করেন—শুনলাম, তুমি নাকি ঘরের ভেতরে একাই কথা বলো বিনীতা?

বিনীতা—তা বলি বৈকি।

শোভা—ঘুমের মধ্যেও কথা বলো বোধ হয়?

বিনীতা—হ্যাঁ, সেদিন বাবা হঠাৎ ঘরে ঢুকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বললেন, বিড়বিড় করে কি বকছিস্ বিনী?

ধ্রুব—স্বপ্নের মধ্যেও কথা বলো নিশ্চয়?

বিনীতা—হ্যাঁ, মা-কে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। একদিন স্বপ্নের মধ্যে আস্ত একটা গান গেয়ে ফেলেছিলাম।

মেজবউদি—কিন্তু তুমি একটু চুপ করবে কবে?

বিনীতা—কোনদিনও না। যেদিন সবাইকে চোখ বুঁজে চিরকালের মতো চুপ করে যেতে হয়, সেদিনও আমি বোধহয় চুপ করে থাকতে পারব না।

ধ্রুব—তার মানে?

বিনীতা—একেবারে চুপ হবার আগেও একটা কথা বলে নেব।

ধ্রুব—কি কথা?

বিনীতা—এইবার আমাকে চুপ করিয়ে দাও ভগবান।

ঘরসুদ্ধ মানুষ হাসে। ধ্রুব মেজবউদি আর শোভা। বিনীতা সত্যিই কথামালা। শুধু কথার জন্যই অনর্গল কথা বলে আর লোক হাসায় বিনীতা। বিনীতা চলে যাবার পরেও এই ঝকঝকে বাড়ির মানুষগুলির মুখে এই প্রশ্ন হাসতে থাকে, কবে নীরব হবে কথামলা?

কিন্তু শুধু এই একটি প্রশ্ন নয়, আরও একটি প্রশ্ন এই বাড়ির ভিতরে মুখর হয়ে হাসতে থাকে। বিনীতার মুখরতার কোন অর্থ নেই, না থাকুক, কিন্তু বাড়িতে আসে কেন বিনীতা? বিনীতার এই বাড়িতে রোজই একবার বেড়াতে আসার ব্যাপারটাও কি নিতান্ত অর্থহীন?

একজোড়া ময়লা মখমলের চটিতে চটপট শব্দ করে যেন দু'পায়ে বাজাতে বাজাতে পথ চলে বিনীতা। পথে যেতে মুখোমুখি দেখা হয় সুব্রতার জেঠামশাই মাধববাবুর সঙ্গে। মাধববাবু হেসে হেসে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—ভালো আছ তো বিনীতা?

বিনীতা—ভালো তো থাকবই জেঠামশাই। দু'বেলা ফুলকপির খিচুড়ি চালাচ্ছি, যা সস্তা হয়েছে ফুলকপি, ভালো না থেকে পারব কেমন করে বলুন?

চলে গেলেন সুব্রতার জেঠামশাই। বিনীতাও তার তড়বড়ে দুই পায়ে ময়লা মখমলের চটি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যায়। দেখা হয় শুভ্রার মাসীমার সঙ্গে। শুভ্রার মাসীমা প্রশ্ন করেন—কোথায় চললে বিনীতা, কি মনে করে?

বিনীতা বলে—কিছু মনে করে কোথাও যাচ্ছি না। মন থাকলে তো মনে করব, মাসীমা? শুভ্রার বর যে এসেছিল, আর শুভ্রা যে আমাকে একবার যেতে বলেছিল, সে কথা একটি বারও মনে পড়ল না। আমার মনই নেই মাসীমা, শুধু আমি আছি।

কেউ প্রশ্ন না করলেই বা কি? বিনীতা মল্লিক যেন শুনতে পায়, বাতাস জুড়ে প্রশ্ন ভাসছে। এবং কেউ কোন প্রশ্নের লজ্জায় চুপি-চুপি মুখ আড়াল করে সরে পড়বার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ, বিনীতাই প্রশ্ন করে তাকে পথের উপর থামিয়ে রাখে।

যেতে যেতে হঠাৎ পথের উপর দাঁড়ায় বিনীতা। দেখতে পেয়েছে বিনীতা, বেশ সেজে-গুজে স্বামীর সঙ্গে কোথায় যেন চলেছে অনুরাধা। মুখটা আড়াল করে বিনীতার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল অনুরাধা, কিন্তু খপ করে অনুরাধার একটা হাত ধরে ফেলে বিনীতা। স্বামী ভদ্রলোক দু'পা এগিয়ে এবং একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরান।

বিনীতা প্রশ্ন করে—শ্বশুরবাড়ি থেকে কবে ফিরলে অনু?

অনুরাধা বলে—কাল।

বিনীতা—এখন যাচ্ছ কোথায়?

অনুরাধা—বেড়াতে।

বিনীতা—কিন্তু শুধু দু'জনে কেন? তৃতীয় ব্যক্তিকে কার কাছে রেখে এলে?

অনুরাধা আশ্চর্য হয়—তার মানে?

বিনীতা চেঁচিয়ে ওঠে—তোমার বেবি কোথায়?

অনুরাধা—আঃ, পথের মাঝে চেঁচিয়ে পাগলামি করো না বিনীতা।

বিনীতা—পাগলামির কি দেখলে? চেঁচিয়ে কথা বলছি বলে?

অনুরাধা হাসে—বিয়ের পর ছ'মাস যেতে না যেতে বেবি কেমন করে পাওয়া যায়?

বিনীতা অনুরাধার হাত ছেড়ে দেয়—এক্সকিউজ মি ম্যাডাম! কিছু মনে করো না। ঘাড় ঝাঁকিয়ে এলোমেলো খোলা চুলের বোঝা পিঠের উপর তুলে দেয় বিনীতা। আঁচলটা হাওয়ার দোলায় বার বার কাঁধ থেকে খসে পড়ে যায়। আঁচলের একটা কোণ খপ করে ধরে গলার চারদিকে জড়িয়ে ফস্ করে একটা ফাঁস এঁটে দেয় বিনীতা। তারপর আবার সেই রকমই ভঙ্গীতে দু'টি তড়বড়ে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর ময়লা মখমলের চটির শব্দ বাজাতে বাজাতে চলে যায়।

একটু সাজলে নিশ্চয়ই ভালো দেখাবে বিনীতাকে। কিন্তু সাজের নামে দিব্যি। শুভ্রার বিয়ের দিনে, একটা উৎসবের বাড়িতে কত রঙীন একটা ভিড়ের মধ্যে যেতে হয়েছিল বিনীতাকে ; সেদিনও দেখা গেল, ভালো করে চুল পর্যন্ত আঁচড়ায়নি বিনীতা। বোধ হয় রান্না করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল যে, শুভ্রার বিয়েতে যেতে হবে। শাড়ির গায়ে এখানে ওখানে হলুদের দাগ লেগে রয়েছে, কিন্তু তার জন্য বিনীতার চোখে কোন দুশ্চিন্তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কিন্তু বিনীতা কখনও রাগ করেছেন বলে শোনা যায়নি। কথার চালচুলো নেই, রাইচরণ মল্লিকের ঐ আধ-পাগলা মেয়েটার মুখরতার জন্য পাড়ার কোন ঘটনার মন গম্ভীর হয়ে যায় না। ওর কথা ধরতে নেই, ওর কথার কোন অর্থ হয় না। ওর কথার কোন মূল্য নেই।

—আবার এস বিনীতা। শুভ্রা হোক, সুব্রতা হোক, কিংবা অনুরাধা, সকলেই বিনীতাকে হেসে হেসে বিদায় দিতে পারে। ওরা খুশি হয়ে বিনীতাকে আর একবার আসবার জন্য অনুরোধ করে। এ ছাড়া ওদের হাসির মধ্যেও আর কোন অর্থ নেই।

কিন্তু ঐ একটি বাড়ির হাসি, ধ্রুবজ্যোতিদের ঝকঝকে বাড়ির হাসিটার মধ্যে যেন কঠিন একটি অর্থ লুকিয়ে আছে। ধ্রুব হাসে, মেজবউদি হাসেন, আর হাসে শোভা। ঝকঝকে বাড়িটা বিনীতার মুখরতায় হো হো করে হেসে যেন বলে দিতে চায় —যাও বিনীতা।

কিন্তু বিনীতা তবু হাসে। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই বাড়িতে বিনীতা প্রায় রোজই আসে। এত আনমনা বিনীতা, মনই নেই যে বিনীতার, সেই বিনীতার বোধহয় ঠিক মনে পড়ে যায়, সায়েন্স কংগ্রেস থেকে আজ ফিরে এসেছে এই ঝকঝকে বাড়ির ধ্রুবজ্যোতি সেন। নইলে ঠিক এই পনর দিন বাদ দিয়ে আজ এই সময় হঠাৎ কেমন করে আর কেন এসে দেখা দেয় বিনীতা?

এই বাড়ির মনগুলিকে নিয়ে যেন মনের মতো খেলা করবার একটা লোভে পেয়ে বসেছে বিনীতাকে! এই বাড়ির মনগুলি অবশ্য সেজন্য একটুও দুশ্চিন্তা করে না। ঝকঝকে বাড়ির চকচকে মনগুলি বেশ সাবধানেই থাকে। বিনীতা একটা খেলা খেলতে আসে, ওরাও বিনীতাকে যেন অবাধভাবে খেলতে দিয়ে আর খেলিয়ে খেলিয়ে ক্লান্ত করে দেয়। না ধ্রুব, না মেজবউদি, না শোভা, কারও মুখের হাসি ক্লান্ত হয় না। বরং শেষে দেখা যায়, বিনীতারই মুখরতা যেন একটু হাঁপিয়ে আর ক্লান্ত হয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। আবার এসো বিনীতা, তখন আর একথা হেসে হেসে বলতে পারে না এই ঝকঝকে বাড়ির চকচকে মনগুলি। ওরা জানে, না বললেও আসবে বিনীতা। তা ছাড়া মুরলী প্রেসের ম্যানেজার রাইচরণ মল্লিকের মেয়েকে মৌখিক ভদ্রতার ঐ ক'টি কথা না বললেও তো চলে।

ধ্রুবজ্যোতি সেনের এখনও বিয়ে হয়নি। মেজদা এইবার তাই খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, মেজবউদিরও মনের ব্যস্ততার অন্ত নেই। খুব তাড়াতাড়ি, এক মাসে না হয় বড়জোর দু'মাসের মধ্যে ধ্রুবর বিয়ে দিতেই হবে। ধ্রুবর লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে প্ল্যানিং কমিশন খুশি হয়ে ধ্রুবকে একটা সার্ভিস নেবার জন্য দিল্লীতে ডেকেছেন। বোধহয় দিল্লীতেই

থাকতে হবে। আর দেরি করা যায় না।

নানা জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি আসছে। মেয়ের ফটো আসছে। সেই সব চিঠির স্তূপ থেকে একটা চিঠি পড়ে, আর সব ফটোর স্তূপ থেকে একটি ফটো বের করে মেজবউদি বলেন—ব্যস, এই মেয়ে, এই মেয়েকেই চাই!

শোভা বলে—হ্যাঁ, এর চেয়ে ভালো মেয়ে খুঁজতে হলে পরীর দেশে যেতে হয়। মেজদাকে বলো, আর একটুও দেরি না করে এই মেয়ের সঙ্গে রাঙাদার বিয়ে ঠিক করে ফেলতে।

ধ্রুব এসে বলে—দেখি ফটো।

ফটো দেখবার পর ধ্রুব বলে—মেয়ের অন্য সব খবর একটু শোনাও মেজবউদি!

মেজবউদি বলেন—গ্র্যাজুয়েট, খেয়াল আর ঠুংরির কম্পিটিশনে পাঁচবার মেডেল পেয়েছে।

ধ্রুব হাসে—তবে আর কি?

ধ্রুবর মুখ দেখে বোঝা যায়, ফটো দেখে ধ্রুবর চোখ দুটো হঠাৎ বড় বেশি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই রকম একটি সুন্দর মুখ বোধহয় কল্পনাতেও আশা করেনি ধ্রুব।

ঠিক এই সময়ে ঘরের ভিতরে এসে দেখা দেয় কথামলা বিনীতা। এবং কারও কোন প্রশ্নের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই প্রশ্ন করে—ধ্রুবদার বিয়ের কি করলে মেজবউদি?

মেজবউদি বলেন—সবই করছি।

বিনীতা—তার মানে?

শোভা বলে—মেয়ে পছন্দ করা হয়ে গিয়েছে।

বিনীতা—মেয়ের ফটো আছে?

মেজবউদি—আছে বৈকি।

বিনীতা—কোথায়? দেখি একবার।

শোভা—ঐ যে রাঙাদার হাতে।

বিনীতা এগিয়ে যায়, প্রায় ছোঁ মেরে ধ্রুবর হাত থেকে ফটো তুলে নিয়ে আর দু'চোখের কৌতূহল ঢেলে দেখতে থাকে। তাই বোধ হয় দেখতে পায় না বিনীতা, মেজবৌদি মুখ টিপে টিপে হেসে শোভার হাতে একটা চিমটি কেটে ফেললেন, আর ধ্রুব মৃদু হেসে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

—বাঃ, বেশ মেয়ে, বড় সুন্দর মেয়ে। ধ্রুবর হাতে ফটো ফিরিয়ে দিয়ে বিনীতা তার কথার ফোয়ারা ছড়াতে আরম্ভ করে। চুপ করে, এবং মাঝে মাঝে যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে ধ্রুব। আর, শোভা ও মেজবৌদি ভুরু টান করে শুনতে থাকেন। বিনীতা যেন আপন মনের আবেগে একটা থিয়েটারের আসরে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে চলেছে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলে না বিনীতা। ছটফটে প্রজাপতির মতো ঘরের বাতাসে এদিকে আর ওদিকে যেন উড়ে উড়ে বসছে বিনীতা। আবার উঠে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। কারও মুখের দিকে তাকিয়ে নয় ; বিনীতা যেন কোন এক দূরের আকাশের দিকে অচঞ্চল দু'চোখের লক্ষ্য রেখে কথা বলে চলেছে। বলতে বলতে নিজেই মাঝে মাঝে ঝংকার দিয়ে হেসে উঠছে।—বেশ মেয়ে, বেশ সুন্দর মেয়ে, কিন্তু এই মেয়েকে দেখে তো সেই মেয়ে মনে হয় না, যে-মেয়ে চুপি চুপি আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে, চোরের মতো পিছন থেকে এসে ধ্রুবদার কানে ফুঁ দিয়ে পালিয়ে যাবে। না মেজবউদি, এরকম মেয়ে হলে চলবে না।

মেজবউদি—কেমন মেয়ে হলে চলবে?

বিনীতা—তবে শোন, এত ফর্সা হলেও চলবে না। একটু শ্যামল বরণ হবে ধ্রুবদার বউ।

চোখ দুটো একটু বোকা বোকা। ধ্রুবদাকে চা দিতে এসে যেন চা দিতে ভুলেই যায়, আর ধ্রুবদার মুখের দিকে যেন ডগমগ হয়ে তাকিয়ে থাকে সে মেয়ের চোখ। তার কপালে ছোট একটি খয়েরের টিপ। ধ্রুবদা হেসে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিতেই চমকে উঠবে আর হেসে ফেলবে সেই মেয়ে। আঁচল তুলে মুখের হাসি ঢাকতে গিয়ে এলোমেলো হয়ে যাবে হাতটা, খয়েরের টিপ একটু ধেবড়ে যাবে, তারপর...।

শোভা বলে—বলে যাও, থামলে কেন বিনীতা?

বিনীতা—তারপর একটি পাট-ভাঙ্গা তাঁতের শাড়ি পরে ধ্রুবদার একেবারে কাছে না এসে একটু দূরে এসে দাঁড়াবে সেই মেয়ে। ধ্রুবদার হাতের বই-এর উপর সেন্ট-মাখানো রুমাল ছুঁড়ে দিয়ে আর চোখের দুই ভুরুতে একটু রাগন্ত কাঁপুনি কাঁপিয়ে গম্ভীর হয়ে বলবে, আজ তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারব না।

বিনীতার চোখের অপলক উজ্জ্বল হাসিটা হঠাৎ যেন একটু নিবু নিবু হয়ে আসে। মেজবউদি হেসে হেসে বলেন—তারপর কি হবে বিনীতা? বলে যাও, আরও বলো, থামলে চলবে না।

বিনীতা বলে—তারপর ঐ পার্কের একটি কোণে, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকবে সেই মেয়ের চোখ, কিন্তু হাত দিয়ে ধ্রুবদার একটা হাত ধরেই থাকবে।

বলতে বলতে যেন এলিয়ে পড়তে চায় বিনীতা। যেন ক্লান্ত হয়ে আসছে কথামালার মুখরতা। শোভা বলে—থামলে কেন বিনীতা?

বিনীতা বলে—কত লোক তাকাতে তাকাতে চলে যাবে, কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। তাঁতের শাড়ির আঁচলটাকে এমন কায়দা করে ছড়িয়ে দেবে সেই মেয়ে যে, একেবারে ঢাকা পড়ে থাকবে সে মেয়ের মিষ্টি হাতের ঐ খেলা। এইরকম একটি দস্তুরমত চালাক-বোকা মেয়ে চাই, তা না হলে ধ্রুবদার মতো মানুষের সঙ্গে একটুও মানাবে না।

শোভা বলে—কথা ফুরিয়ে গেল নাকি বিনীতা?

বিনীতা ব্যস্তভাবে বলে—আজ আসি।

বিনীতার ক্লান্ত মুখরতার সেই প্রতিধ্বনি শুনে হাসির উচ্ছ্বাস একেবারে কলরোল তুলে বেজে উঠতে থাকে মেজবৌদি আর শোভার মুখে। ধ্রুবও চোখ ফিরিয়ে তাকায় আর হাসি হাসি চোখ নিয়ে দেখতে থাকে, রাইচরণবাবুর মেয়ে বিনীতা তার ময়লা মখমলের চটির শব্দ বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে। যেন বিনীতার মুখরতার আত্মাটাই জব্দ হয়ে আর ক্লান্ত হয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

অনেকদিন আগেই সন্দেহ করতে পেরেছিলেন বলে মেজবৌদি আজ খুব সহজেই বুঝতে পারেন। বিনীতার এই কথাগুলিকে শুনলে যতটা আবোলতাবোল বলে মনে হবে, ভেবে দেখলে ততটা আবোলতাবোল বলে মনে হবে না। মেজবউদির অনেকদিন আগেই মনে হয়েছে, শোভার মনে হয়েছে কিছুদিন আগে, আর ধ্রুব এই সেদিন থেকে মনে করতে আরম্ভ করেছে, কেন বিনীতা এই বাড়িতে বার বার আসে। যে আশা করা উচিত নয়, যে আশা বিনীতার মতো মেয়ের পক্ষে ধারণ করাই উচিত নয়, সেই আশাই যে বিনীতার মনের মধ্যে খেলা করে। সেটা বিনীতার চোখ দেখেই বুঝে ফেলতে পারেন মেজবউদি। ধ্রুব বাড়িতে না থাকলে কোনদিন এই বাড়িতে বিনীতা এসেছে বলে মনে পড়ে না। যদিও বা কোনদিন ভুল করে এসে পড়েছে, তবে তখুনি চলে গিয়েছে, আর যাবার আগে শুধু জেনে গিয়েছে, ধ্রুব কবে ফিরবে।

আজ আরও স্পষ্ট করে জানা গেল যে, বিনীতার ঐ সব আবোল-তাবোল মুখরতার মধ্যে বড় বেশি দুঃসাহস আর আশা।

মেজবউদি বলেন—শুনলেন তো ভাই, নিজের কানে শুনে এইবার বিশ্বাস করুন।

ধ্রুব হাসে—ওর কথায় কি আসে যায়? ওর কথাতেই কি ভাল মেয়ে মন্দ মেয়ে হয়ে যায়? আমি ওর কোন কথা বিশ্বাস করি না।

ধ্রুব শুধু বিশ্বাস করে, সুন্দর কথার জাল ছড়িয়ে এই ঝকঝকে বাড়ির মনের উপর একটা মায়া ছড়াবার চেষ্টা করে চলে গেল বিনীতা। যেন ঐ সব কথার মায়ায় পড়ে মেয়ে পছন্দ করতে না পারে এই বাড়ির চক্ষু আর মন। ধ্রুবর দুই চক্ষুর পছন্দকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিতে পারলে নিজের মনের একটা স্বপ্ন সত্য হতে পারবে, কত বড় দুরাশা দিয়ে বৃথাই নিজের মনটাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে বিনীতা!

শোভা বলে—সত্যিই বিনীতার জন্য দুঃখ হয়। বুদ্ধি থাকলে এরকম ভুল করত না।

মেজবউদি বলেন—ওর বুদ্ধির কোন অভাব দেখছি না। কিন্তু ভুল বুদ্ধি।

শোভা—শুনছিলাম, বিনীতার বিয়ের জন্য রাইবাবু খুব চেষ্টা করছেন।

মেজবউদি—করছেন তো, কিন্তু সেই একই সমস্যা, টাকার অভাবের জন্য এক একটা ভাল সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

ধ্রুব হঠাৎ বলে ওঠে—আমরা কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করলেই তো পারি।

মেজবউদি—তা রাইবাবু যদি এসে ওঁকে ধরেন, তবে কিছু সাহায্য তো করবেনই উনি।

কথা শেষ করে ধ্রুবর মুখের দিকে তাকিয়ে মেজবউদি বলেন—বিনীতার ওপর তোমার হঠাৎ এরকম সিমপ্যাথি তো ভালো নয়, ভাই।

কী আশ্চর্য, প্ল্যানিং কমিশনের দপ্তরে বসে বসে যিনি একেবারে অঙ্কে অঙ্কে মিল ঘটিয়ে আর হিসেব করে বুঝিয়ে দেবেন, কি ভাবে আর কোন্ হারে কারখানায় কাজ বাড়িয়ে তুলতে পারলে বিশ লক্ষ সাড়ে এগার হাজার টন অমুক সামগ্রী অমুক বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে, তিনিই তাঁর বিয়ের দিনক্ষণ আর ব্যবস্থার প্ল্যানিং নিয়ে বেশ একটু হিসাবের গোলমালে পড়ে গেলেন। মেজবউদিকে ডাক দিয়ে বলেই ফেললো ধ্রুব—এখনই বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেল না মেজবউদি। খুব তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই।

মেজবউদি—ওই মেয়েকে পছন্দ হয়েছে তো?

ধ্রুব—হয়েছে বৈকি।

মেজবউদি—আরও মেয়ের খোঁজ করব নাকি বলো?

ধ্রুব হাসে—তা খোঁজ করতে দোষ কি? ভালোর চেয়েও ভালো কি আর হয় না?

ভালো মেয়ের খোঁজ হয়, খোঁজ পাওয়া যায় এবং মেজবউদি আবার মেয়ের ফটোর ভিড়ের মধ্যে পড়ে ভালো মেয়ের আর সুন্দর মেয়ের মুখ বাছতে বাছতে দিশেহারা হয়ে যান।

শোভা বলে—এই তো একটি আরও ভালো মেয়ে, বউদি। কী সুন্দর টানা টানা চোখ আর ঢল ঢল মুখটি!

ঠিকই বলেছে শোভা। আগের মেয়েটির চেয়ে অনেক সুন্দর এই মেয়েটির মুখ। মেয়েটি যদিও গ্র্যাজুয়েট নয়, কিন্তু শিক্ষিত মেয়ে বৈকি, বি-এ পরীক্ষাটা শুধু দিয়ে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া, কী সুন্দর ছবি আঁকতে পারে এলাহাবাদের অধ্যাপক বিনয়বাবুর এই মেয়েটি! বিনয়বাবু চিঠিতে লিখেছেন, তাঁর মেয়ের হাতের আঁকা তিব্বতী স্টাইলের অনেকগুলি ছবি এই বছর বিদেশের ট্যুরিস্টরা কিনে নিয়ে গিয়েছে।

এলাহাবাদের মেয়ের ফটো ধ্রুবর চোখের সামনে তুলে ধরেন মেজবউদি, এবং বিনয়বাবুর চিঠি পড়ে শোনাতেও থাকেন। ধ্রুব বলে—এই জন্যই তো তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেছিলাম। ভালো মেয়ে পেতে হলে একটু দেরি করতে হয়।

মেজবউদি—শেষে এর চেয়েও ভালো মেয়ে দরকার হবে না তো?

ধ্রুব—আরে না মশাই, না।

মেজবউদি—তাহলে বিনয়বাবুকে পাকা কথা জানিয়ে দিই, কেমন?

ধ্রুব বলে—জানিয়ে দাও।

হঠাৎ বিনীতার আবির্ভাব। ঘরে ঢুকেই বিনীতা মেজবউদির হাত থেকে ফটো তুলে নিয়ে বলে—এইবার নিশ্চয় আরও ভালো মেয়ের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

মেজবউদি—হ্যাঁ, খোঁজ করলে নিশ্চয় পাওয়া যায়?

ফটোর উপর চোখ রেখে চেঁচিয়ে ওঠে বিনীতা—এই মেয়ে বাস্তবিক ভালো মেয়ে! দিব্যি মেয়ে, কিন্তু...।

ধ্রুব তার চোখের বিরক্তি আড়াল করার জন্য চোখের কাছে বই তুলে পড়তে থাকে। মেজবউদি আস্তে একবার শোভার হাতে চিমটি কাটেন।

বিনীতা বলে—কিন্তু এই মেয়ে তো ধ্রুবদার মতো মানুষের চোখের কাছে আর মনের কাছে মানাবে না। না না না, এই মেয়ে চলবে না মেজবউদি। এই মেয়ের চোখ বড় বেশি টানা টানা, এই মেয়ের মুখ বড় বেশি ঢল ঢল। আমার খুব সন্দেহ হয় শোভা, এই মেয়ে ধ্রুবদার চোখের সামনে বসে শুধু আকাশের মেঘের ছবি আঁকবে, আর দেখতেও পাবে না যে, হঠাৎ বাতাসের ফুরফুরানিতে বেচারা ধ্রুবদার কপালের উপর ঢেউ খেলানো চুলগুলি নেমে পড়েছে।

শোভা একটু শক্ত করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—তাতে হয়েছে কি?

বিনীতা হেসে হেসে লুটিয়ে পড়তে চায়।—না; এই মেয়ে নয়। ধ্রুবদার জন্য এমন মেয়ে চাই, যে দূরের ঐ ঘরের ভিতর থেকেই ঠিক দেখতে পাবে তার বরের কপালের উপর ঢেউ-খেলানো চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ফুরফুর করছে। সঙ্গে সঙ্গে সুড়সুড় করে উঠবে সেই মেয়ের হাত। আর এক মুহূর্তও চুপ করে বসে থাকতে পারবে না সেই মেয়ে ; এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর ছুটে এসে ঘরের ভিতর ঢুকেই বেশ মিষ্টি করে হাত দুলিয়ে আর আঙুল বুলিয়ে সেই ঢেউখেলানো চুল সরিয়ে দিয়ে বরের কপালের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

বিরক্ত হয়ে খটখটে শুকনো স্বরে মেজবউদি বলে ওঠেন—তারপর কি করবে? বরের সামনে ধেই-ধেই করে নাচবে?

বিনীতা—নাচবে বৈকি, কিন্তু কখন নাচবে জান? তোমাদের চোখের সামনে নয়। শ্রাবণ মাসের রাতে, যখন সারারাত ধরে বৃষ্টি পড়বে আর ঝড়ের শব্দ ছুটোছুটি করবে, সেই সময় ওপরতলার ঐ ঘরে, দু'পায়ে ছোট্ট দু'টি ঘুঙুর পরে রজনীগন্ধার শিষের মতো আস্তে আস্তে শরীর দুলিয়ে একলাটি বরের সামনে নেচে নেচে সারা হবে সেই মেয়ে। তুমি ঘরের ভেতর খাটের উপর শুয়ে শুয়ে ঝড়ের শব্দ শুনবে মেজবউদি ; বরের মন-দোলানো সেই ঘুঙুরের শব্দ তুমি ছাই কিছুই শুনতে পাবে না।

শোভা বলে—থামলে কেন, হাঁপাচ্ছ কেন বিনীতা?

মেজবউদি—এমন মজার কথা বলতে গিয়ে আবার গম্ভীর হয়ে পড়ছ কেন বিনীতা?

ধ্রুব বলে—আর বলতে পারবে না বিনীতা, ওর কথার স্টক ফুরিয়ে গেছে।

বিনীতা ছটফট করে হেসে উঠে—অনেক রাতে চাঁদ উঠবে আকাশে, সে মেয়ে কিছুতেই ধ্রুবদাকে ঘরের ভেতরে থাকতে দেবে না। জোর করে হাত ধরে টেনে ছাদের ওপর নিয়ে যাবে। তারপর, যেই না ধ্রুবদা চাঁদের দিকে তাকাবার জন্য চোখ তুলতে যাবে, অমনি সেই মেয়ে ধ্রুবদার...।

মেজবউদি বলেন—ধ্রুবদার গলা টিপে ধরবে বোধ হয়?

বিনীতা—না, না, না, মাই ডিয়ার মেজবউদি। অমনি সেই মেয়ে ধ্রুবদার গলা এক হাতে

টেনে ধরে বলবে, আগে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নাও, তারপর চাঁদের দিকে তাকাবে।

শোভা—বসে পড়লে কেন বিনীতা? বলে যাও, বেশ তো জমিয়ে কথা বলতে পারছ। এরই মধ্যে ফুরিয়ে যেও না।

ঠিকই, বসে পড়েছে বিনীতা। এত উচ্ছল মুখরতার স্রোতে যেন একগাদা এলোমেলো শক্ত পাথরের বাধায় ফাঁপরে পড়েছে। উঠে দাঁড়ায় বিনীতা। চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। আচমকা এক ঝলক কৌতুকের ফোয়ারার মতো হেসে ওঠেন মেজবউদি আর শোভা। এবং সেই হাসি যেন তাড়া দিয়ে বিনীতাকে ঘরের ভিতর থেকে বাইরের বারান্দায়, তারপরে সিঁড়িতে, তারপর একেবারে বাইরের পথের উপর নামিয়ে দেয়। চলে যায় বিনীতা।

এই রকমই একটা খেলা প্রায় রোজই জমে ওঠে ঝকঝকে এই বাড়ির সুন্দর করে সাজানো একটি ঘরের নিভৃতে। কখনো সকালে, কখনো বা সন্ধ্যায়। বিনীতা মল্লিকের মুখরতা এই ঘরের মুখখোলা হাসির ঠাট্টায় আর কৌতুকে, অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি তীক্ষ্ণ এক একটি তুচ্ছতার তাড়ায় এই ভাবেই ক্লান্ত হয়ে চলে যায়। কি সাধ্যি আছে বিনীতার, এই বাড়ির মনের ইচ্ছাকে তার এইসব আবোল-তাবোল রং-মাখানো কথার মোহ দিয়ে মিথ্যা করে দিতে পারে? বরং মেজবউদি শোভা আর ধ্রুবজ্যোতির রং-মাখানো বিদ্রূপগুলি যেন বিনীতাকে খেলিয়ে খেলিয়ে হাঁপ ধরিয়ে জব্দ করে ছেড়ে দেয়। এ বড় কঠিন ঠাঁই।

ধ্রুবজ্যোতি আবার একদিন মেজবউদিকে ডেকে প্রশ্ন করে হঠাৎ—এলাহাবাদের বিনয়বাবুকে কি পাকাপাকি কিছু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে?

মেজবউদি—না, এখনো হয়নি।

ধ্রুব—একটু ভেবে নিও বউদি, ঝট করে নয়, একটু দেরি করে চিঠির উত্তর দিও।

মেজবউদি—কেন? আবার কি হলো!

ধ্রুব—কি হবে আবার? সবই ঠিক আছে।

মেজবউদি—ঠিক করে বলো ভাই, যদি বিনয়বাবুর মেয়েকে তেমন পছন্দ না হয়ে থাকে, তবে আর একটি মেয়ের ফটো দেখতে পার।

ধ্রুব—দেখাও তাহলে।

আর একটি ফটো নিয়ে এসে মেজবউদি বলেন—এই ফটোটি কাল এসেছে। এই মেয়ে প্রায় তোমার মতোই স্কলার। হিস্ট্রিতে রিসার্চ করছে। মেয়ের বাবা লিখেছেন, ডক্টরেট পাবেই পাবে তাঁর এই একমাত্র মেয়ে। আমি আর শোভা এতক্ষণ এই কথাই বলাবলি করছিলাম।

ধ্রুব—কি কথা?

মেজবউদি—এই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে ভালো হয়।

ফটোর দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে ওঠে ধ্রুবজ্যোতির চোখ। এবং হঠাৎ একটু লজ্জিত হয়ে বলে—চেহারাও তো বেশ ভালোই দেখছি। কিন্তু এই মেয়ে কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?

শোভা রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে—হঠাৎ তোমার মনে এত তৃণাদপি বিনয় দেখা দিল কেন রাঙাদা?

ধ্রুব হাসে—একটু বেশি পছন্দ হয়ে গেলে মনে একটু বিনয়-টিনয় না হয়ে তো পারে না।

হঠাৎ দরজার পর্দা সরে যায়। এক টুকরো ঝড়ো হাওয়ার মতো দাপাদাপি করতে করতে ঘরের ভিতর ঢুকেই বিনীতা মল্লিক বলে—নতুন ফটো এসেছে বুঝি?

আবার এসেছে বিনীতা। মেজবউদি আর শোভা সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারে না। ওর এই দুঃসাহস বোধহয় সেইদিন ফুরিয়ে যাবে, যেদিন সত্যিই ধ্রুবজ্যোতির বিয়ে হয়ে যাবে।

ততদিন পর্যন্ত এই বাড়ির ভিতরে এসে কথার মালা দুলিয়ে মায়া ছড়াবার খেলা বন্ধ করতে পারবে না বিনীতা। বোধহয় সত্যিই বিশ্বাস করেছে বিনীতা, ওর ঐ সব রংমাখানো কথার শব্দ শুনে ধ্রুবজ্যোতি সেনের মতো মানুষের মনের পছন্দও রং বদল করে ফেলছে। মনে মনে বোধহয় খুশি হয়েছে বিনীতা, ধ্রুবর বিয়ের জন্য এই বাড়ির এক একটি পাকাপাকি ইচ্ছার অদৃষ্ট বার বার ভেঙ্গে যাচ্ছে, ওরই ঐ রং-মাখানো কথাগুলির জন্য। বেশ তো, এই বিশ্বাস নিয়ে রাইবাবুর মেয়ে বিনীতার মনের আশা দুঃসাহসী হয়ে থাকুক। এই বাড়িও ওকে শুধু খেলিয়ে খেলিয়ে আর হাঁপ ধরিয়ে ছেড়ে দেবে, যতদিন না এই বাড়িতে ঐ আশা নিয়ে আসবার সাহস ছেড়ে দেয়।

আবার জমে উঠুক খেলা। মনে মনে শক্ত হাসি হেসে প্রস্তুত হন মেজবউদি আর শোভা। অপলক চোখ নিয়ে ফটো দেখছে বিনীতা। দেখুক, এই বাড়ির চোখগুলিও দেখবে, বিনীতা আজ কোন্ রঙের আর কোন্ গন্ধের ফুল দিয়ে তার কথার মালা রচনা করে।

খেলা দেখবার জন্য তৈরি হয় বাড়ির তিনটি মানুষের কৌতুক-সুখী চক্ষু। হাততালি দিয়ে নীরবে পাগলা ঘোড়াকে আরও জোরে ছুটিয়ে দেবার মতো একটা কৌতুকের হাততালি নীরবে বাজতে থাকে এই ঝকঝকে বাড়ির মনের ইচ্ছার গভীরে।

—বেশ মেয়ে, খুব ভালো মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। ফটোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বিড় বিড় করে বলতে থাকে বিনীতা। তারপর ধ্রুবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে ফেলে বিনীতা—এই মেয়েকে ধ্রুবদার সঙ্গে খুব ভালো মানাবে। কোন সন্দেহ নেই, মেজবউদি।

একি! ঝকঝকে বাড়ির প্রাণের এত প্রিয় কৌতুকের আশাগুলিকে যেন হঠাৎ ঠকিয়ে দিল বিনীতা। মেজবউদি আর শোভার গলার ভিতর তৈরি হাসিগুলি হঠাৎ ফাঁপরে পড়ে। বিনীতার চোখের চঞ্চলতায় সেই দুঃসাহসের ছায়া কই? বিনীতার মুখরতা সেই দুরাশার কলরব হয়ে রং-মাখানো কথার ফোয়ার ছড়ায় না কেন? তা না হলে খেলা জমবে কেমন করে?

কথামালা কিন্তু ঠিকই কথা বলে যায়।—এবার পূজোর সময় বেড়াতে যাব বলে মনের আহ্লাদে অনেক স্বপ্ন দেখছি, মেজবউদি। বাবা বলেছেন, পুরী গেলে ভালো হয়, দু'বেলা সমুদ্রে স্নান করা যাবে। আমি বলেছি, রাখ তোমার সমুদ্র। সমুদ্রের চেয়ে হিমালয় ঢের ঢের ভালো, পুরীর চেয়ে দার্জিলিং ভালো।

সবচেয়ে বেশি অদ্ভুত দেখায় ধ্রুবজ্যোতির চোখ দুটোকে। যেন হঠাৎ দীপ নিবে গিয়েছে, তাই হঠাৎ জ্যোতি হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ধ্রুবজ্যোতির দু' চোখের দৃষ্টি।

ইতিহাসের স্কলার, শীগগিরই ডক্টরেট পাবে, বেশ ভালো ও দেখতে সুন্দর একটি মেয়েকে যেন হঠাৎ হাত ধরে একটান দিয়ে ধ্রুবর চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে হাল্কা হয়ে আর মুক্ত হয়ে আলগোছে দূরে সরে গিয়েছে বিনীতা।

কিন্তু কি দরকার ছিল? এইসব অনধিকার-চর্চার মধ্যে আসে কেন বিনীতা? এই মেয়ে ওর মনের দুরাশার ভুলে ধ্রুবরও চোখের পছন্দকে শুধু বার বার বাধা দেবে, মেয়ের ফটো দেখে মনে মনে হিংসে করবে, আর কথার রং ছড়িয়ে যাবে। এই তো নিয়ম।

কথা বলছে বিনীতা, কিন্তু কী বাজে কথা! কথার মালা নয়, কথার ধুলো যেন। এসব কথা শোনাবার জন্য কোন লাভ নেই ধ্রুবজ্যোতির কানে।

জোর করে হাসতে চেষ্টা করে ধ্রুব।—তুমি যে একেবারে ভূগোলের পড়া পড়তে আরম্ভ করে দিলে বিনীতা, যত সব পাহাড় সমুদ্দুর আর...।

ভূগোল ছেড়ে দিয়ে সেলাই-এর তত্ত্ব নিয়ে মুখরতা করে বিনীতা।—হাত বটে সুব্রতার। আপনি বোধহয় দেখেননি মেজবউদি, একটা কাঁথা তৈরি করেছে সুব্রতা, কিন্তু কে বলবে

ওটা একটা কাঁথা? দেখে মনে হয় একটা কাশ্মীরী শাল।

না, বিনীতাকে যেন সত্যি একটা বধিরতার ভুলে পেয়েছে। নইলে শুনতে পেত বিনীতা, ধ্রুবজ্যোতির ঐ অভিযোগের মধ্যে যেন একটা দুরন্ত আগ্রহ হঠাৎ আশাভঙ্গের বেদনায় আর্তনাদ করে উঠেছে। ঐ রং-মাখানো আবোল-তাবোল কথাগুলি, যে কথাগুলিকে এত সহজে আর এত সস্তা করে এই বাড়ির প্রাণের উপর এতদিন ধরে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে বিনীতা, সেই কথাগুলি হঠাৎ এমন দুর্লভ হয়ে যাবে কেন?

বিনীতার মুখরতা হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার জন্য কেন একটা শূন্যতার মধ্যে পড়ে ছটফট করে ধ্রুবজ্যোতির মন? বুকে জড়িয়ে ধরে রাখা জিনিস হঠাৎ সরিয়ে নিলে যেমন চমকে উঠতে হয়, বিনীতার মুখরতা যেন ঠিক তেমনি হঠাৎ এক নিষ্ঠুরতার খেয়ালে আলগা করে ছেড়ে দিয়েছে ধ্রুবজ্যোতির মনটাকেই। নইলে...নইলে একরকম অস্বস্তি বোধ করবে কেন ধ্রুব?

বিকেলের কাক কলরব করে ঝকঝকে বাড়ির বাগান পামের মাথার উপর বসে। মেজবউদি বলেন—আমি এখন চা খাব।

শোভা বলে—আমিও।

বিনীতা বলে—আমিও যাই, অনুরাধাকে একটু জ্বালিয়ে আসি।

চলে যান মেজবউদি. চলে যায় শোভা। বিনীতা চলে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। শুনতে পেয়েছে বিনীতা, হঠাৎ কি যেন বলে উঠছে ধ্রুব।

বিনীতা—কি বললেন, ধ্রুবদা?

মুখ বড় বেশি গম্ভীর করেও ধ্রুব যেন হাসতে চেষ্টা করে।—এতক্ষণ এখানেই তো বেশ জ্বালাচ্ছিলে, হঠাৎ অনুরাধাকে জ্বালাবার শখ হলো কেন?

কলকল করে হেসে দুলতে থাকে বিনীতা—কিন্তু আর জ্বালাব কেমন করে? মেজবউদি পালিয়ে গেলেন, শোভাও সরে পড়ল।

ধ্রুব বলে—আমি তো আছি, সরেও পড়িনি।

বিনীতার মুখরতা হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে যায়।—আপনাকে কিন্তু আমি সত্যিই কোনদিন জ্বালাতে চেষ্টা করিনি।

ধ্রুব হাসে—তাহলে বসো, এখুনি চলে যেও না।

—সে কি! কথাটা বলেই ফেলেছে বিনীতা। দু'চোখে চমকে উঠেছে অদ্ভুত এক ভীরু ভীরু বিস্ময়। ঝকঝকে বাড়ির হাসিভরা মুখে কোনদিন যে অনুরোধ ধ্বনিত হয়নি, সেই অনুরোধ আজ হঠাৎ এইভাবে, এই বিকেলের আলোতে, এই একা ঘরের নিভৃতে বিনীতাকে প্রথম বাধা দিয়ে এ কি কথা বলছে? এখুনি চলে যেও না!

ধ্রুব বলে—আশ্চর্য হয়ে গেলে কেন? কি এমন অদ্ভুত কথা বলেছি?

বিনীতা হাসে—আশ্চর্য হইনি, খুব সন্দেহ করছি ধ্রুবদা, আপনি নিশ্চয় আমাকে একটা অদ্ভুত কথা জিজ্ঞাসা করবেন। আপনি নিশ্চয়ই কিছু শুনতে পেয়েছেন।

ধ্রুব বিব্রতভাবে তাকায়—কি শুনতে পেয়েছি?

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে যেন একটা নতুন হাসির কল্লোল চাপা দিতে চেষ্টা করে বিনীতা। ধ্রুব বলে—কি হলো?

বিনীতা—আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, আমি আর আপনাদের জ্বালাতে আসতে পারব না।

ধ্রুব—না, আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারিনি যে তুমি আসবে না।

বিনীতা—রাইচরণ মল্লিকের মেয়ের যে বিয়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত...।

ধ্রুবজ্যোতি সেনের চক্ষু হঠাৎ আবার জ্যোতি হারিয়ে যেন অন্ধের মতো তাকিয়ে থাকে।

বিনীতা—আজই সন্ধ্যায় আশীর্বাদ করতে আসবে।

ধ্রুবজ্যোতি জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে আর হাসে—তাই বলো!

চেয়ারের উপর চুপ করে বসে হাতের বই-এর পাতার দিকে তাকিয়ে রাশি রাশি অঙ্কের ভিড় দেখতে থাকে ধ্রুব। বিনীতা আর-এক চেয়ারের উপর বসে নিজের মুখরতার আবেগে কত কথা ছড়াচ্ছে, তার একটা শব্দও কানে শুনতে পাচ্ছে না ধ্রুব। কি হবে শুনে? ওসব কথা কোন কথাই নয় ; যেন শুকনো ধুলোর মতো কতগুলি বাজে কথার একটা আঁধি মাতামাতি করছে। বিনীতার রঙীন কথার মালা এখন ওর স্বপ্নের মধ্যে দুলছে, পৃথিবীর একটি মানুষের গলা জড়িয়ে ধরবার জন্য। আজই সন্ধ্যায় একটা আশীর্বাদ এসে, এই বাড়ির পিছনের ঐ সদর রাস্তার কিনারায় একটি পুরনো বাড়ির বুক হাতড়ে, এক আবোল-তাবোল মনের মেয়েকে লুফে নেবে। আজই সন্ধ্যায় তাঁতের শাড়ি পরবে আর কপালে খয়েরের টিপ আঁকবে বিনীতা।

কি হবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে? বিনীতার মুখের দিকে তাকাতে পারে না ধ্রুব। অনেক রাতে যখন চাঁদ উঠবে আকাশে, তখন ঐ মুখই তো একটি মানুষের চাঁদ দেখার বাধা হয়ে উঠবে। যেমন মেজবৌদির, তেমনি শোভার, আর তেমনি ধ্রুবর নিজেরও চোখ দুটো এতদিন ধরে মূর্খের মতো শুধু ভুল বুঝেছে বিনীতাকে। এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করতে পারেনি যে, ঐ মেয়ে প্ল্যান করে এই বাড়ির সব হাসির অহংকারকে ঠকিয়ে দেবার জন্যই এতদিন এখানে এসেছে।

সহ্য করতে কষ্ট হয়, তাই বোধহয় হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ধ্রুব।—এবার তাহলে ছোট ছোট ঘুঙুর যোগাড় করে ফেল, বিনীতা।

বিনীতা আশ্চর্য হয়ে আসে—ঘুঙুর? ঘুঙুর দিয়ে আমি কি করব ধ্রুবদা? বরের সামনে ধেই ধেই করে নাচব?

ধ্রুব—কেন, শ্রাবণ মাসে কোন ঝড়ের রাত কি পাওয়া যাবে না? একলাটি বরের চোখের সামনে রজনীগন্ধার শিষের মতো দুলে দুলে...।

হাসিমুখর বিনীতার দু'চোখে হঠাৎ একটা ব্যথার্ত বিস্ময় চমকে ওঠে।—আপনি আমাকে বুঝতে খুবই ভুল করছেন ধ্রুবদা। আমার ওসব কোন গুণ নেই, কোন সাধ্যিই নেই।

ধ্রুবর দু'চোখ হঠাৎ দপ দপ করে ওঠে—তবে তুমি এতদিন ধরে এত কথার রং ছড়িয়ে আমাকে কি বোঝাতে চেয়েছিলে?

ভয় পায় বিনীতা—আমি আপনাকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করিনি ধ্রুবদা, বিশ্বাস করুন। ইচ্ছা করে, কোন ইচ্ছা নিয়ে আমি ওসব কথা বলিনি। ওসব কথা আমার স্বপ্নের আবোল-তাবোল গানের মতো কতগুলি আবোল-তাবোল সাধের চিৎকার মাত্র। বলতে ভালো লাগে, সেই জন্যেই বলি।

ধ্রুব—তাহলে তুমি কি?

বিনীতার মনের ভয়টাও যেন চেঁচিয়ে উঠতে চায়।—আমি একটা অচল সিকি ছাড়া আর কিছু নই। আনি ওসব কিছুই করতে জানি না।

ধ্রুব—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বিনীতা—বিশ্বাস করুন, আর আমাকে এইবার যেতে বলুন।

চুপ করে বিনীতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ধ্রুব। এই মেয়েকে অবিশ্বাস করতেই ভালো লাগছে আজ। ওর একটি কথা বিশ্বাস করে ওকে চলে যেতে দিলে যেন চিরকালের মতো ঠকে যাবে ধ্রুবজ্যোতি সেনের জীবন। ধ্রুবর মনটা যেন তাই কঠিন প্রতিজ্ঞার দুই বাহু বিস্তার করে পথ আটক করে রাখতে চাইছে সেই মেয়েকে, যে মেয়ে শুধু একটা ফটোকে তার চোখের সামনে ঠেলে দিয়ে আর কল্পলোকের মধুরতাগুলিকে নিজের আঁচলে বেঁধে সরে

পড়বার চেষ্টা করছে।

ধ্রুব হাসতে হাসতে বলে—অনেক রাতে চাঁদ উঠবে যখন আকাশে, তখন ছাদের ওপর একলা বরের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তুমিই তো অনায়াসে সেই রং-মাখানো কথা বলতে পারো...।

বিনীতা দুই হাতে চোখ ঢাকতে চায়। মাথা হেঁট করে মুখ লুকিয়ে যেন ফুঁপিয়ে ওঠে রাইচরণ মল্লিকের মেয়ে।—না না না, আমি ওকথা বলতে পারি না। আমি তাকে শুধু বলতে পারি, কখ্খনো ভুল করে আমার মুখের দিকে তাকিও না, তা হলেই ঠকবে। শুধু চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাক।

চেয়ার থেকে উঠে আস্তে আস্তে হেঁটে বিনীতার সামনে এসে দাঁড়ায় ধ্রুব। হেসে হেসে বলে—এ তো আরও বেশি রং-মাখানো কথা হয়ে গেল।

ঝকঝকে বাড়ির বাগান পামের উপর বসে আর কলরব করে না কোন কাক। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চেয়ার ছেড়ে ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় বিনীতা। আর, এই বাড়ির হাসির কৌতুকটাকে শেষবারের মতো ভয় করে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিনীতার মন। চলে যাবার জন্যই পা বাড়িয়ে এগিয়ে যায় বিনীতা।

ধ্রুব—একটা কথা জেনে যাও বিনীতা।

বিনীতা—বলুন।

ধ্রুব—তুমি অনেকবার আমার বিয়ে ভেঙ্গেছ, কিন্তু আমিও তোমার বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারি।

বিনীতা—তাতে আপনার লাভ?

ধ্রুব—তাহলে শোনো।

বিনীতার একেবারে চোখের কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় ধ্রুবজ্যোতি সেন।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাইরের ঘরের দরজার পর্দা ঠেলবার আগে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন মেজবউদি। একি! কথামালা যে এখনও আছে, এখনও এই ঘরের ভিতর বসে আবোল-তাবোল কথা ছড়াচ্ছে।

—না না না, আপনি সত্যিই ঠকবেন। পৃথিবীর এত ভালো মেয়ে থাকতে আপনি কেন ভুল করে...মিছিমিছি...আপনার মতো মানুষ কেন...আঃ।

নীরব হয়ে গেল কেন কথামালা? কথা বলে না কেন বিনীতা? দরজার পর্দা আস্তে সরিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিতেই চমকে ওঠেন আর সরে আসেন মেজবউদি।

ঠিকই তো! কথা বলবে কেমন করে মেয়েটা? ওভাবে মুখ বন্ধ করে দিলে কোন মেয়েই কথা বলতে পারে না।

যাযাবর

দূর বুদ্ধগয়ার মন্দিরটা উত্তরে দিগ্‌বলয়ে জ্যামিতিক আঁচড়ের মতো দাগা। সেখান থেকে জঙ্গলের বুকে বুকে একটানা সড়কটা এখানে এসে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে। প্রথমে পরিখার মতো আখ আর তিন ক্ষেতের প্রসার ; তারপর শহরতলির মেটে বাড়ি—তারপর খাস শহর। মোড়ের কাছে এসে উদ্ভিদরাজ্য তার সীমা হারিয়েছে ; শেষ হয়েছে তার বন্যগৌরব। এখানে আরম্ভ—পুকুর, বাগান, চষাক্ষেত ; মানুষের গৃহস্থালী, জনতা।

মোড়ের দুপাশে ছড়ানো কয়েকটা দোকান আর বাংলো বাড়ি ; মাঝে মাঝে শুধু ঘাসফুলে ছাওয়া মেঠো জমির টুকরো টুকরো ব্যবধান। কাছেই পাহাড়ের পায়ের কাছে পলটনের ছাউনির মতো একটা বস্তি। সবই রাজেনবাবুদের জমিদারী। তাঁরা থাকেন সিমলায়।

আমাদের বাড়ির দুপাশে দুটো বাড়ি। পূবের বাড়িটা, ছোট, ন'টাকা ভাড়া। আগে গালার গুদাম ছিল। পশ্চিমের বাড়িটা বড়, ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। আগে ত্রিহুতের এক জমিদারের পোষা বাঈজী থাকত। প্রায় সব বাড়ি কটাই খালি পড়ে আছে।

সন্ধ্যায় একটি আলোও জ্বলে না, ফাঁকা বাড়িগুলো সমাধির মতো ঝিমোয়। বড় নির্জন এ নির্জনতার চাপ ভিড়ের চেয়েও কঠোর ; হাঁপিয়ে উঠতে হয়। আজ দেড় মাসের মধ্যে একবারও কেউ আসেনি।

মাঝে মাঝে শুধু দূরাগত মোটরবাসের উচ্ছ্বসিত বিলাপ জঙ্গলের বুকে গুমরে উঠে। টেলিগ্রাফের তারগুলো শিউরে বাজতে থাকে। ভরসা হয়, এইবার বুঝি কোন প্রতিবেশী আসছেন।

বই পড়া বন্ধ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট বাড়িটার দিকে তাকালাম। কারা যেন এসেছে।

পিলপিল করে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এসে জামতলায় দড়িবাঁধা ছাগলটাকে ঘিড়ে দাঁড়াল। সব কটিরই আদুড় গা, লাল শালুর এক একটা হাফপ্যান্ট পরানো। আট থেকে এক বছর বয়সের ছটি হৃষ্টপুষ্ট ফরসা মানুষ।

কারা এরা? কোন্ ধৃতরাষ্ট্র আবার এলেন আমার প্রতিবেশী হয়ে? কৌতূহল হলো।

সাইকেল থেকে নামলেন নরেনবাবু ওভারসিয়ার, সবে ডিউটি থেকে ফিরছেন। শোলার হ্যাট মাথায়, পরিধানে ঢিলে হাফপ্যান্ট, পায়ে বুট, বিবর্ণ আলপাকার গলাবন্ধ কোট ; তাতে বড় থলির মতো দুটো পকেট—ফুটবল, ফিতে আর কাগজপত্রে বোঝাই। কাঁধে বলরামের লাঙ্গলের মতো জমি-জরীপের একটা যন্ত্র ঝুলছে।

নরেনবাবু বললেন—আসুন ভাই আমাদের বাড়িতে। ধড়াচূড়ো ছেড়ে আলাপটা সেরে নিই।

নরেনবাবুর ছেলেমেয়েরা সামনে এসে দাঁড়াল—মণ্টু, বাঁশী, বটা, নোনা, তিনু। সব যেন অর্ডার দিয়ে তৈরি, নিখুঁত ছাঁচের স্প্রিং বসানো পুতুলের মতো।

নরেনবাবু সাজ বদল করে এলেন। বুঝলাম, নরেনবাবু যুবকই, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। শুধু মুখের ওপর রোদে ঝলসানো একটা তামাটে প্রবীণতার ছাপ পড়েছে, নইলে তিনি গৌরবর্ণ সুপুরুষ।

বললাম—নরেনদা, এই বুঝি আপনার বংশধরবাহিনী?

—এই সব নয়, আরও আছে। কোলেরটি এখন ঘুমিয়ে আছেন। নইলে ওকেও দেখিয়ে দিতাম।

—করেছেন কি নরেনদা।

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন—তোমাদের এই জায়গাটা বেশ জায়গা হে। শহর থেকে দূরে বলেই, বেশ। যেমন জলবাতাস তেমনি জিনিসপত্র। যেমন সরেস তেমনি সস্তা। ধরো—খাঁটি দুধ, শহরে থাকলে আর টাকায় সাত সের করে পেতে হতো না। না, বেশ জায়গা ভাই।

নরেনদার মুখেই সব শুনলাম। ক'বছর ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, তায় আবার কড়া ডিউটি পড়েছে। সকাল নটায় খেয়েদেয়ে আর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চার মাইল একটানা প্যাডেল চালিয়ে প্রথমে যেতে হয় চন্দ্রপুরের ক্যাম্পে, সেখানে রাস্তা মেটাল করা হচ্ছে। সেখানে তদ্বির শেষ করে শালবনের পথে পথে দু'মাইল দক্ষিণে গিয়ে ডাকবাংলোর মেরামত কাজটা দেখতে হয়। সেখান থেকেও দু'মাইল পুবে গিয়ে লালবালু নদী। এখানে

এখন জরিপ চলেছে শুধু, শীগগির পুল তৈরি আরম্ভ হবে। কাজেই বাড়ি ফিরতে কখনও সন্ধ্যা, কখনও বা রাত হয়ে যায়।

দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নরেনদা হাঁকলেন—সামনে এসেই দিয়ে যাও না! লজ্জা করার কিছু নেই। এ হলো ভবানী, আমার এক ক্লাসের বন্ধু মানিকের ছোট ভাই।

দরজার আড়াল ছেড়ে নরেনদার স্ত্রী সামনে বেরিয়ে এলেন। চা-রুটি দিয়ে গেলেন।

বউদিকে দেখে বিস্মিত হলাম সবচেয়ে বেশি। বহু সন্তানবতী বাঙালী মেয়ের তো এমন চেহারা থাকা উচিত নয়। ছবিতে রুশিয়ার মেয়ে-পাইলটদের চেহারার ভেতর যে নিটোল স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, বউদি যেন তারই প্রতিচ্ছবি।

—যুদ্ধের দরুণ জিনিসপত্র কি খুবই মাগ্‌গি হচ্ছে, ভবানী? কিছু খবর-টবর রাখ? নরেনদা প্রশ্ন করলেন।

সে খবর আমি রাখি না, আমার দরকারও নেই। নরেনদার কিন্তু শয়নে স্বপনে এই চিন্তা, বিশ্বভুবনে কোথায় কোন্ জিনিস সস্তা। গদ্‌গদ ভাষায় বর্ণনা করলেন—জাহানাবাদের গুড়, ডালটনগঞ্জের বেগুন, মধুপুরের মুর্গি।—কুকুরে ছোঁয় না হে, এত সস্তা।

নরেনদার বর্ণনা শুনছি. কল্পনায় তিনি সেই খণ্ডস্বর্গগুলিকে জড়ো করে এক মহামহিম সস্তারাজ্যের ছবি দেখছেন, যেখানে তাঁর এক মাসের মাইনে বাহান্নটি মুদ্রার বিনিময়ে একটা তালুকদারি কেনা অসম্ভব নয়।

যুদ্ধের জন্য জিনিসপত্র মাগ্‌গি হচ্ছে, নরেনদা সে খবর রাখেন। নরেনদা তাই যুদ্ধের ওপর বড় চটা, সঙ্গে সঙ্গে জার্মানদের ওপরও বড় চটে গেছেন।

বললেন—এই জার্মানগুলো বাড়িয়ালাদের চেয়েও পাজি।

কথাটা কানে বাধল।

ক্রমে আলাপে আলাপে আরও অনেক কিছু জানলাম। গত তিন বছরে নরেনদা নিদেন দশবার বাসাবদল করেছেন। প্রত্যেক নতুন বাসাতে প্রথম এসে কটা দিন থাকেন ভাল। অল্প দিনেই উন্মনা হয়ে পড়েন। তার পর হঠাৎ একদিন তাড়াহুড়ো করে তল্পিতল্পা নিয়ে নতুন একটা বাসায় চলে যান। বছরে তিন-চারবার করে গেরস্থালী গোছাতে গিয়ে বউদির প্রাণ হাঁপাতে থাকে।

নরেনদা নিজ মুখেই বললেন—শহরে আর কেউ আমাকে ভাড়া দিতে চায় না।

—কেন বলুন তো?

—কেন? সেটা কি করে বলি।

—আপনিই বা এত ঘনঘন বাসা ছাড়েন কেন?

—অসুবিধে হয়, তাই ছাড়ি।

—এর আগের বাসাটায় কি অসুবিধে ছিল আপনার?

—সে আর বলো না! পাশের বাড়িটা থেকে দিবারাত্র বিশ্রী পোলাও-এর গন্ধ আসত।

অবাক হয়ে বললাম—তাহলে এ বাসাটাও হয়তো মাসখানেক পরে ছেড়ে যাবেন, ওই রকম গন্ধ-টন্ধর জন্য।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে নরেনদা প্রতিবাদ জানালেন—না, না, এ বাসাটা বেশ। এ জায়গা ছাড়া চলবে না। এইবার খুব খাঁটি জায়গাতে এসেছি।

একটু চুপ করে থেকে নরেনদা যেন স্বগত বলে উঠলেন—বাড়ি ভাড়াটাড়া কি মানুষে দেয়!

—কথাটা বুঝলাম না নরেনদা। তবে কি ভাড়া না দিয়ে থাকাটাই ভদ্রলোকের পক্ষে...।

নরেনদার যেন হুঁস হলো। অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—আহা, ভুল শুনছ কেন? বলছি, বাড়ি ভাড়া কি মানুষে নেয়!

মন্টুরা সামনের ছোট মাঠটায় জামতলায় খেলছে। ডাকলাম—এই মন্টু অ্যাণ্ড কোম্পানি! কাম্ আপ।

যে যার বয়স আর সামর্থ্য মতো সবেগে দৌড়ে এলো। বললাম—সব সার বেঁধে দাঁড়াও। ক্যাঙ্গারু ড্রিল শেখাব।

ছেলেমেয়েগুলো অত্যন্ত চটপটে আর ফূর্তিবাজ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ড্রিলটা বেশ সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করে নিল।

—ওয়ান, টু, থ্রী! ড্রিল চলেছে। পরিশ্রমে ঘেমে ওঠা মুখগুলো জলেভেজা সাদা ফুলের মতো দেখাচ্ছে। পেশীহীন শরীরের কোমল মাংসল আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠেছে রক্তের আভা। শেষে অর্ডার দিলাম--ডিসপার্স!

মন্টু বলল--আবার কখন ড্রিল হবে কাকা?

—হবে এখন। এবার বাড়ি যাও।

এক ঝাঁক রাজহাঁসের মতো মিঠে আওয়াজ করে মন্টু-কোম্পানি চলে গেল। উড়ে গেল মনে হলো।

বারান্দায় বসে বই পড়ি। পড়া শেষ হলে আর কোনও কাজ থাকে না। অস্বস্তি বোধ করি। চারদিকে কত নয়নাভিরাম দৃশ্য বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে। দেখলেই তো হলো।

বসে বসে দেখি রাজেনবাবুদের বাগানটা। দেশী-বিদেশী ফুল, পাতাবাহারের কুঞ্জ, রঙের রূপোল্লাস। হেকার সাহেবের কেনেলটা চোখে পড়ে, চামড়ার পেনি পরানো তাজা তাজা আলসেসিয়ান টেরিয়ার আর স্প্যানিয়েল। বাবুলালের মেঠাই-এর দোকান, স্তূপীকৃত বালুশাই বরফি আর শোনপাপড়ি। বেলজিয়ান ক্যাথলিক গির্জাটার হলের ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যায় ; বিচিত্র রূপোর পুলপিট মূর্তি প্রদীপ আর কার্পেট-পাতা গ্যালারি। লাল ফুলের বোঝা মাথায় কৃষ্ণচূড়াটার তলায় বুড়ো স্মিথের পোলট্রি। পেঁজা তুলোর মতো পালকে ভরা পুচ্ছ, ঝকঝকে পুষ্ট পুষ্ট মোরগ আর মুরগী। রোড-আইল্যাণ্ড আর লেগহর্নের রঙিন ঝুঁটির শিহর, সুঠাম গ্রীবাবিলাস আর রক্তজবার মতো কানের ঝুমকোর দোলা। এই সবই তো দেখবার আর উপভোগ করবার মতো দৃশ্য।

কিন্তু এসব ছাড়িয়ে সবচেয়ে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে পাই তখন, নরেনবাবুর ছেলেমেয়েরা যখন জামতলায় খেলে বেড়ায়, পলায়নপর গোসাপের পেছনে দল বেঁধে তাড়া করে, বুড়ো টাট্টু ঘোড়ার কান ধরে নির্ভীক আনন্দে বাবুই পাখির মতো ঝুলতে থাকে। তাদেরই দেখি বেশি করে।

প্রবল বর্ষা নেমেছে ক'দিন। নরেনদা বড় দেরি করে বাড়ি ফেরেন। মাঝে মাঝে দেখি, লণ্ঠন নিয়ে মন্টু আর বউদি বৃষ্টি ও অন্ধকারে অস্পষ্ট সড়কের দিকে তাকিয়ে নরেনদার জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

আজ এখন রাত্রি বারোটা। তবুও মন্টুরা দাঁড়িয়ে আছে। নরেনদা ফেরেননি নিশ্চয়। উঠে যেতে হলো মন্টুদের বাড়ি।

বললাম—তাইতো বউদি, রোজ যদি এমন সাংঘাতিক বর্ষা গায়ে মেখে দৌড়োদৌড়ি করেন তাহলে—

বউদি বললেন--তা হলে কি?

—একটা অসুখ বিসুখ হয়তো...

--সেদিকে ভদ্রলোক ঠিক আছেন। একটা হাঁচি-কাশিও হবে না।

বললাম--তা ছাড়া এত রাত্রে জংলী পথে...

কথার মাঝখানে বৌদি বললেন—ওই শুনুন, দয়া হয়েছে এতক্ষণে।

বৃষ্টির শব্দের মধ্যেই একটা লক্কড় সাইকেলের ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ শোনা গেল। নরেনদা অকস্মাৎ পৌঁছে গিয়ে সকলকে উদ্বেগের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিলেন।

বৃষ্টিতে ভেজা শোলার হ্যাট দু'ইঞ্চি ফুলে গেছে। সাইকেলের কেরিয়ারে বাঁধা একবোঝা কুমড়োর ডাঁটা আর একটা লাউ। বললেন—ছোট নদীটায় আটকে গেলাম। যা জলের তোড়! তা ছাড়া লাউটার জন্য চন্দ্রপুর হয়ে একবার আসতে হলো।

অনুযোগ করে বললাম—বর্ষার রাত্রে জংলী রাস্তায় অত বেপরোয়া ঘুরে বেড়াবেন না, নরেনদা।

সাইকেলের রডে গামছা দিয়ে বাঁধা বন্দুকটাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে নরেনদা বললেন—আমার এই কালো লাঠিটি যতক্ষণ সঙ্গে আছে, ততক্ষণ সত্যিই কিস্‌সু পরোয়া করি না, ভবানী।

আমাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে প্রশ্ন করলেন—লাউটা কত হলো বলো দেখি, ভবানীচন্দর?

রাত নিশুতি, স্বপ্ন দেখবার সময় ; তখন আর লাউয়ের দাম আলোচনা করবার উৎসাহ আমার নেই। চলে আসতে আসতে শুনলাম, নরেনদা নিজেই বলে যাচ্ছেন—মাত্র দু'পয়সা, যাকে বলে আধ আনা।

মন্টু-কোম্পানিকে ক্যাঙ্গারু ড্রিল শেখানো হয়ে যাবার পর শেখালাম ডনকি-জাম্প। এতে পিন্টু হলো ফার্স্ট। চার বছরের এই ছেলেটা পাঁচ ফুট উঁচু বারান্দা থেকে সোনাচিতার বাচ্চার মতো অকুতোভয়ে লাফিয়ে পড়ে সত্যিই তাক্ লাগিয়ে দিল।

শেখালাম হরিণ দৌড়। এতে বাঁশী মেয়েটা ফার্স্ট হলো।

দেখে শুনে নরেনদা একদিন বললেন—বেশ জুটেছে যা হোক। একে তো ত্যাঁদর, তারপর তুমি আবার ট্রেনিং দিয়ে ঘাগী করে তুলছ।

—ভাবছেন কি? একদিন গ্রেট বেঙ্গল কলোনি বসবে এখানে। এইতো সবে কাজ আরম্ভ করেছি। যা করছি পরে বুঝবেন।

—পরে কেন? এখুনি খুব বুঝেছি। দু'সের মাংস আনলাম, চেটেপুটে সব মেরে দিলে তোমার এই মন্টু কোম্পানি।

বললাম—তা, কি এমন পাপ করেছে?

—না, পাপ করেনি ঠিকই। তবে...বোঝ না তো ভায়া!

মন্টুদের নতুন ধরনের একটা স্যালুট শেখাচ্ছি। নরেনদা চেঁচিয়ে ডাক দিলেন—ওদের একবার ছেড়ে দাও তো ভবানী, দরজী এসে বসে আছে।

মন্টুদের সঙ্গে নিয়েই গেলাম। নরেনদা বললেন—দেখছ?

দেখলাম। ভালুকের না কিসের রোঁয়ার একটা লম্বা চওড়া পুরু কম্বল। যেমন খসখসে তেমনি ভারী।

—কি হবে এটা? জিজ্ঞাসা করলাম।

—এটা থেকে সব হবে। মন্টুদের ছটি ওভারকোট হবে। তা ছাড়া আমারও ফতুয়ার মতো একটা কিছু হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

বললাম—কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড করছেন, নরেনদা। ছেলেগুলোর গায়ের ছাল আর থাকবে না।

—খুব থাকবে। বোঝ না তো ভায়া!

নরেনদা দরজীকে কাজের নির্দেশ দিতে লেগে গেলেন।

শীত এসে পড়েছে। পশ্চিমের বড় বাড়িটাতে কারা এসেছে।

আলাপ হলো। হাওয়া বদলের জন্য এসেছেন বৃন্দাবনবাবু, তাঁর মা আর তার ছেলে পেঁচো, মিন্টুদের বয়সী। বৃন্দাবনবাবুর ডিসপেপসিয়া, পেঁচোর রিকেট। বৃন্দাবনবাবুর মা বিপুলাঙ্গী, মেদভারে মন্থর।

বৃন্দাবনবাবু বললেন—তুমি মানিকের ভাই? তাই আগে বলতে হয়। তোমাকে তো আত্মীয় বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। যাক্...তেলটা আর ঘিটা, এ যেন খাঁটি হয় ভবানী। এই বন্দোবস্তটা করে দাও। পয়সা লাগুক, কিন্তু জিনিস ভাল হওয়া চাই।

মাসীমা অর্থাৎ বৃন্দাবনবাবুর মা বললেন—একটা ভাল গয়লা ঠিক করে দাও বাবা। বাড়িতে দুয়ে দিয়ে যাবে। এবেলা পাঁচসের ওবেলা তিনসের। একাদশীর দিন আরও দু'সের।

—পয়সার জন্য ভাবি না ভবানী। বাজিয়ে টাকা দেব, বাজিয়ে জিনিস নেব। তোমার বাবা তো শুনেছি বেশ কিছু রেখে গেছেন। হ্যাঁ, তোমার কাকা বোধহয় একবার আমার কাছে ধার চাইতে এসেছিলেন। আর...।

বৃন্দাবনদা তুবড়ির মতো কথা ছড়িয়ে চললেন ; তার মধ্যে মাত্রার বালাই নেই। উত্তরের জন্য মুহূর্তেকও অপেক্ষা না করে আরম্ভ করলেন—যাক্, দুটো ভালো চাকর, একটা ভালো ধোপা, এ যেন কালকের মধ্যেই যোগাড় হয়ে যায় ভবানী।

মাসীমা বললেন—একটা ভালো ডাক্তারও ঠিক করে দিতে হয় বাবা, পেঁচোর জন্যে। রোজ একবার এসে দেখে যাবে।

বড় বাড়ির মর্জি মতো ফরমাস খেটে চলেছি। মন্টুদের সঙ্গে ক'দিন দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে না। নরেনদার দেখা পাওয়া তো আরও দুষ্কর। কিন্তু জানি, ওরা সব ভালো আছে। ভালো থাকাটাই ওদের নিয়ম।

বৌদির কোলের ছেলেটার এতদিনে ঠ্যাঙে জোর হয়েছে ; টলে টলে হাঁটে, জোরে হামাও দেয়। মন্টুরা ওর নাম দিয়েছে—টাইগার।

মাঝে মাঝে রাত্রে দেখতে পাই, মন্টুরা প্রদীপ জ্বেলে বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে পড়তে বসে। টাইগার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পড়ার ব্যাঘাত করে, প্রদীপ উল্‌টে দেয়। নরেনদা বসে বসে টাইগারকে সকল নষ্টামিতে উৎসাহ দেন। বউদি এসে প্রতিবাদ করেন।

তবু সুখের কথা। ভদ্রলোক বছর খানেকের ওপর এখানে টিকে গেছেন। শোনা যায়, জায়গার গুণে ক্ষ্যাপাহাতি ঘুমিয়ে পড়ে। এ তো মানুষ।

বড় বাড়ির চাকর রামদুলালকে আড়ালে পেয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁরে, আটসের দুধ রোজ কে খায় বল্ তো? সবাই তো রুগী।

—বুড়ীমা খায়।

—বাজে বকিস না, ঠিক ঠিক বল্।

—ঝুট কেন বলব বাবু?' আমি নিজে দেখিয়েছে, একাদশীকা রোজ এক কড়াহি রস্‌গুল্লা বুড়ীমা একা খেয়ে ফেলিয়েছেন।

মন্টুদের পুরো দলটি নিয়ে একদিন চড়াও করলাম মাসীমার বাড়ি।

মাসীমা ছাঁচ থেকে থালায় সন্দেশ সাজাচ্ছেন, একটা কড়াতে রসগোল্লা ভাসছে, আর একটা জামবাটিতে কানায়কানায় ভরা ক্ষীর।

—এরা আবার কারা? মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন।

—এরা? এরা পৃথিবীর ছেলে। এদের সন্দেশ দিন।

মাসীমা খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন—আহা, বাপ-মা নেই বুঝি?

—খাসা বাপ-মা রয়েছে, বলেন কি? সন্দেশ দিন।

—কী যে ছেলেমানুষি কর ভবানী! কোন্ ঢঙে কথা বলো, বুঝতে পারি না বাবা। বলি, কাদের ছেলে এরা?

—নরেনবাবুর। ওই পুবের বাড়িতে যাঁরা থাকেন।

—তা, বউটির তো বড় কষ্ট।

—কষ্ট আবার কিসের?

—কষ্ট নয়? এতগুলো কুচোকাচা সামলানো, মানুষ করা!

—মানুষকে আবার মানুষ কি করবে?

—যা বোঝো না, তা নিয়ে কাব্যি করো না বাবা। এক পেঁচোকে নিয়েই বুঝেছি, কত বড় দায় ভগবান ঠেলে দেছেন মাথার ওপর।

পেঁচোর কথা উঠতেই নজরে পড়ল, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে পেঁচো।

মানুষের চেহারার এরকম করুণ দশা সহজে চোখে পড়ে না। জিরজিরে হাত-পা, বুড়ো বাদুড়ের মতো কেশবিরল মাথাটা। চার বছরের একরত্তি এই ছেলেটার ধড়ে কে যেন একটা ঝুনো সংসারীর মুখোশ বসিয়ে দিয়েছে। মায়া হলো দেখে। আহা, রোগেই ছেলেটার এহেন দশা করে ছেড়েছে!

কিন্তু পেঁচো এগিয়ে আসছে। হাতে একটা বাঁশের লাঠি। তার উদ্দেশ্যটা খুবই স্পষ্ট ; মন্টুদের খানিকটা খোঁচাতে হবে, এই তার মনের বাসনা।

মন্টুরা সকলে সভয়ে সরে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বললে—কাকা, মারছে।

মাসীমা কটুকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—কি মিথ্যুক রে বাবা, এই ছেলেগুলো! মারছে? কোথায় মেরেছে?

তারপর সুপ্রচুর আদার-রসে গলা ভিজিয়ে নিয়ে পেঁচোর উদ্দেশ্যে বললেন—যাও, কাগ মেরে এসো দাদু। যাও, এদের মারতে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। পেঁচোর করোগেটেড পাঁজরগুলো কেঁপে উঠল দু'তিন বার। তারপরেই পেঁচো একটা চিৎকার ছেড়ে লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে কেশবিরল মাথাটা নির্মমভাবে অবিশ্রান্ত মেঝের উপর ঠুকে যেতে লাগল।

—যা ভেবেছিলাম তাই। তোমরা একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়লে না। এখন সামলাতে গিয়ে প্রাণটা আমার যাক্। মাসীমা রাগ করে বলে উঠলেন।

কান্না শুনে বৃন্দাবনদা এলেন। পেঁচোকে বিস্তর আদর অনুনয় করে সুস্থ করে তুললেন। বাঁশের লাঠিটা তুলে নিয়ে একবার মন্টুর একবার বাঁশির পেটে ঠেকিয়ে পেঁচোকে বোঝালেন — হেই মেরেছি, খুব মেরেছি। এইবার চুপ! হ্যাঁ, এই যে পাঁচুবাবু চুপ করেছে। পাঁচু বড় ভালো!

পেঁচো শান্ত হলো।

—কাদের ছেলেপিলে হে ভবানী? বৃন্দাবনদা জিজ্ঞাসা করলেন।

নরেনবাবু ওভারসিয়ারের।

—এতগুলো! কত মাইনে পায় ভদ্রলোক? বৃন্দাবনদা মাত্রাতিরিক্ত বিস্ময়ে কপাল কুঁচকে ফেললে। তাঁর কথাবার্তার রূঢ়তায় সত্যিই হচ্ছিল। বললাম—মাইনে কমই পায়। বাহান্ন টাকা, তাতে হয়েছে কি?

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বৃন্দাবনদা বললেন—গুলি করা উচিত।

—কাকে?

একটু থতমত খেয়ে বৃন্দাবনদা উত্তর দিলেন—আহা, এদের নয়, এদের নয়। ওই নির্বোধ লোকগুলোকে, প্রকৃত অপরাধী যারা।

আবার খানিকক্ষণ চিন্তাক্লিষ্ট থেকে হঠাৎ মন্টুদের দিকে সঙ্গিনের মতো ছুঁচলো তর্জনী তুলে বললেন—এই যে কটা জীব...।

মন্টুরা সকলেই চমকে উঠল।

—জানি এরা নির্দোষ, এরা পবিত্র। কিন্তু তবু, ছি ছি, সমাজকে এভাবে ট্যাক্স করা...।

কোমর-ভাঙা সাপের শাণিত দৃষ্টির মতো বৃন্দাবনদার চোখ একবার চিকচিক করে উঠল। বললেন—এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় কি জান? এই লোকগুলোর বাড়াবাড়ি, এত বাপ হবার সখ, অস্ত্রোপচারে একেবারে নির্মূল করে দেওয়া।

বৃন্দাবনদা থামতেই পুরোনো প্রসঙ্গ আবার উত্থাপন করলাম—এইবার ছেলেদের একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিন মাসীমা।

—থাম বাবা, ভবানী। পেঁচোর কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। কাল না হয় আর-এক সময় এদের নিয়ে এসো।

মন্টুরা অনেকক্ষণ থেকে বাড়ি যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। বললাম—দাঁড়াও, দাঁড়াও, লজ্জা কেন? দিদিমার বাড়ি, সন্দেশ-টন্দেশ খাও, তারপর যেয়ো।

মাসীমা বললেন—হাঁ, অনেকক্ষণ তো হলো। ওদের মা হয়তো ভাবছে।

—না, না, ভাববে কেন? ভাবনার কি আছে।

—কেমন মা রে বাপু! মাসীমা যেমন বিরক্ত তেমনি হতাশ হয়ে পড়লেন।

বৃন্দাবনদাকে ইংরাজীতে বললাম—পেঁচোকে একটু স্থানান্তরে নিয়ে যান। মাসীমা ছেলেদের মিষ্টিমুখ করাবেন।

এতখানি অধ্যাত্মসাধনার পর মাসীমা অগত্যা বিচলিত হলেন। ভাঁড়ার থেকে শালপাতার ঠোঙায় গোটাকয়েক বাতাসা নিয়ে এসে বললেন—কই গো খোকাখুকীরা, হাত পাত দেখি সব।

দেখলাম, ওদের প্রত্যেকের হাত কাঁপছে। শঙ্কিত চোখে বার বার তাকাচ্ছে আমার দিকে। তিনু কেঁদেই ফেললো—বাড়ি চলো কাকা।

মাসীমা তেতে উঠলেন—বড় বেয়াড়া নরেনবাবু না কার এই ছেলেগুলো। নেবে কি না বলে দাও ভবানী, আমি আর তপিস্যে করতে পারব না বাবা।

হঠাৎ বাতাসার ঠোঙা হাতে মাসীমা তাঁর বিপুল দেহভার নিয়ে থপ থপ করে যেন চোরের মতো দৌড়ে সরে গেলেন। চমকে ফিরে দেখলাম—অদূরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পেঁচো। এই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ। পেঁচোর চোখ থেকে বিষের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে যেন। আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। ব্যস্ত হয়ে মন্টুদের বললাম—আর নয়, চল এবার যাই।

সমস্ত রাত্রিটা ঘুমোবার সময় পাইনি একরকম। নরেনদার সঙ্গে ধাই ডাকতে বস্তি বস্তি ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কাল রাত্রে মন্টু-ব্রাদারহুডের একটি নতুন সভ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

নরেনদা নিজেই রান্নাবান্না করে আজকের সকালে বেরিয়ে গেলেন সাইকেল নিয়ে, ডিউটি দিতে। মন্টুরা অন্য দিনের মতো ড্রিল করতে এবেলা আর এলো না। ওদের উৎসবে পেয়েছে আজ। কেউ বাসন মাজছে, কেউ দিচ্ছে ঘর ঝাঁট, কেউ বা উনুন জ্বেলে জল গরম করতে ব্যস্ত।

আহার শেষে একটা আরাম-নিদ্রার উদ্যোগ করছি। রামদুলার এসে জানাল—মাসীমা ডাকছেন, এখুনি যেতে হবে। একটুও দেরি করলে চলবে না। পেঁচোর শরীর খুব খারাপ।

হন্তদন্ত হয়ে পৌঁছলাম বড়বাড়ি। মাসীমা অবসন্নভাবে একটা পাখা হাতে নিয়ে বসে আছেন। প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন—বাবা ভবানী, একবার উঠোনে এসো আমার সঙ্গে।

আশঙ্কায় বুকটা হুমহুম করে উঠল। নিদারুণ কিছু ঘটে যায়নি তো?

—উঠোনে? কেন মাসীমা?

—পেঁচোর অবস্থা, কী সাংঘাতিক, দেখবে এসো। সবুজ সবুজ ফেনা আর কালো ছিবড়ের মতো মল। এখুনি ডাক্তারকে খবর দিতে হয়, ভবানী।

একটা বমির তোড় যেন গলা ঠেলে উগরে পড়তে চাইছে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললাম—মাপ করবেন মাসীমা। রামদুলারকে পাঠিয়ে দিন। আজ আর আমার সামর্থ্যে কুলোবে না কোন কাজ।

চলে এলাম। এখানেই বড়বাড়ির সঙ্গে সকল সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। আর ডাক পড়েনি কখনও।

সড়ক ধরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর গিয়েছি। সাইকেলের আওয়াজে পথের নিশ্চিন্ত কাঠবিড়ালীকে সচকিত করে নরেনদা আসছেন।

—থামুন নরেনদা, কোথায় থাকেন আজকাল?

নরেনদা থামলেন। কেরিয়ারে বাঁধা একটা পুঁটলি আর হ্যাণ্ডেলে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা পেতলের ঘটি, তার মুখটা শালপাতা দিয়ে মোড়া।

—কেরিয়ারে কি নরেনদা?

—আতপ চাল। তের পয়সায় দু'সের।

—ঘটিতে?

—দুধ।

—খুব রাবড়ি-টাবড়ি চালাচ্ছেন বুঝি আজকাল?

—না হে না। রাবড়ি না দুঃস্বপ্ন! গয়লা ব্যাটা দুধের দর চড়িয়েছে। বলে, টাকায় চার সেরের বেশি দেবে না। আমিও তেমনি, স্রেফ বন্ধ করে দিয়েছি। মাঝে মাঝে গাঁয়ে দেহাতে সস্তায় এক-আধ সের এইরকম পেয়ে যাই, ব্যস্।

এ উত্তরের জন্য তৈরি ছিলাম না। এত অকপটে, অক্লেশে যে সোজা কথাগুলো বলে গেলেন নরেনদা, তার প্রত্যুত্তর দেওয়া আর সম্ভব হলো না।

—যা যুদ্ধের বাজার পড়েছে। বিড় বিড় করে নিজের মনে বকতে বকতে নরেনদা চলে গেলেন।

এমন কিছু ঘটেনি। তবু মনের মধ্যে সর্বদা একটা মেঘলা গুমোটের ভাব অনুভব করি। সাইকেলে দুধের ঘটি ঝোলানো নরেনদার ঘর্মাক্ত চেহারাটা থেকে থেকে মনে পড়ে। মনে পড়ে, বউদির কোলে ঘুমন্ত পায়রার মতো পুচকে খোকাটার কথা। মনে পড়ে, স্বাস্থ্যে গড়া লাটিমের মতো মন্টু-কোম্পানির কথা।

নরেনদা একটা চটের ছালাকে পাট করে সাইকেলের কেরিয়ারে বাঁধছেন, ডিউটিতে বের হবার উদ্যোগ করছেন। বললেন—চন্দ্রপুরের সাঁওতালদের কাছে মণ খানেক সরু চাল আছে। আজ বাগাতে হবে সস্তায়। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখনও গিয়েছ কি ভবানী, চন্দ্রপুরে?

—না।

—যেয়ো একবার, ভারী সুন্দর জায়গাটা।

যেন একটা নতুন জগতের বার্তা শোনাচ্ছেন, এমনিভাবে বলে চললেন—সুন্দর জায়গা। পাশের দেহাতে কী না পাওয়া যায়! আর কত সস্তা! ছাগলের দুধই পাওয়া যায় সের পাঁচেক আর তাও মাত্র পাঁচ আনায়। কাছেই একটা বড় বিল, পানিফলে ঠাসা। বাঘা বাঘা মাগুর সব কিলবিল করছে। ধরে আনলেই হলো।...অড়হরের তো জঙ্গলই পড়ে রয়েছে। ওর আর চাষ করতে হয় না। এক ডাল খেতে খেতেই পরমায়ু ফুরিয়ে যায়।

নরেনদা চলে গেলেন।

প্রায়ই আজকাল দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু প্রথম দিনের দেখা সেই উৎফুল্ল মানুষটিকে আর পাই না। সেই উদ্দাম শ্রমোৎসাহ যেন একটু ঢিমে হয়ে এসেছে।

মন্টু-কোম্পানিকে নিয়েও আজকাল অতটা হুটোপাটি করতে মন চায় না। বড়জোর একটা আবৃত্তি, একটা শেলাইয়ের স্কুল বা এইরকম কোনও একটা কুঁড়ে খেলার মহড়া দিয়ে ছেড়ে দিই।

হয় আমার চোখের ভুল, নয় ব্যাপারটা সত্যি। মন্টুদের বেশ রোগা রোগা দেখছি।

একদিন সন্ধ্যায় খবর পেলাম, নোনার জ্বর হয়েছে।

বসে বসে অনেক কিছু ভাবলাম। ঘটনাগুলো সব কেমন যেন একে একে ছন্দ হারিয়ে চলেছে। আমার গ্রেট বেঙ্গল কলোনির মাথার ওপর ক্রমেই জমে উঠেছে বড় নোংরা অভিশাপের ঝড়।

নরেনদার ঘরে ঢুকতেই কানে এলো—মালিশ, স্রেফ মালিশ করে যাও।

বুকে কফ ঘড় ঘড় করছে, জ্বরে চোখ মুখ লালচে ; নোনা চুপ করে শুয়ে আছে। বউদি নোনার বুকে কি একটা তেল মালিশ করছেন।

মাঝখানে পড়ে আপত্তি করলাম—ডাক্তার ডাকা উচিত।

নরেনদা বললেন—শোন কথা! হয়েছে তো সর্দিজ্বর, এইবার ডাক্তার এসে নিউমোনিয়া করে দিক।

বললাম—ডাক্তার ডাকছি, পয়সা লাগবে না।

নরেনদার চোখ দুটো জ্বলে উঠল দপ করে। কঠোর শ্লেষাক্ত স্বরে মুখ বাঁকিয়ে বললেন—তুমি কাঁচা নিমপাতা খাবে? পয়সা লাগবে না।

দমে গিয়ে বললাম—আচ্ছা, আসি এবার।

নরেনদা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ভাষায় সমীহ করে বললেন—হ্যাঁ এসো। তবে রাগ করো না। জানই তো, লোকে সারে নিজের গায়ের জোরে আর নাম হয় ডাক্তারের।

ক'দিনের মধ্যেই বুঝলাম, নরেনদার কথাটাই সত্য হয়েছে। নোনা সেরে উঠেছে। নরেনদা মাঝে মাঝে গান গাইছেন।

মনটা খুশি ছিল সেদিন। মন্টুদের নিয়ে হৈ-হৈ করার উৎসাহটা আবার পেয়ে বসল।

হাঁক দিলাম—এই মন্টু, স্ট্যান্ড আপ। রেলিং-এর ওপর দাঁড়াও। জাম্প।

মন্টু একবার হাঁটু মুড়ে লাফাতে গিয়ে আবার তাড়াতাড়ি সামলে নিল।

হাঁকলাম—জাম্প ডংকি, জাম্প।

মন্টু আবার দম টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ পাঁয়তারা করল।

হাঁটু দুটো বেতালা কেঁপে উঠল বার কয়েক। তারপর লজ্জিত হয়ে অপ্রস্তুতভাবে চুপ করে দোষীর মতো তাকিয়ে রইল।

রাগ চড়ে গেল মাথায়—একি হচ্ছে মন্টু! কাওয়ার্ড!—জাম্প!

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মন্টু। বুকটা ওর টিপ টিপ করে উঠছে পড়ছে ; ছোট ভুরু দুটোর উপর ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শান্ত হয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বললাম—আচ্ছা, নেমে এসো। লাফাতে হবে না। বাড়ি যাও সব।

মনে পড়েছে। আমাদের সাঁওতাল চাকরটা কাঁদতে কাঁদতে যা বলেছিল—ক'দিনের জ্বরে মরে গেছে ওর ছোট্ট একটি ছেলে। ডাইনী আছে ওদের গাঁয়ে। তাকে চিনেও ফেলেছে সে ; একদিন এর শোধ তুলবে।

আরণ্য বর্বরতায় লালিত সাঁওতাল ছেলের সংশয় বিকার আজ আমারও যুক্তি রুচি শিক্ষা সব কিছুকে অন্ধকারের মতো জড়িয়ে ধরছে পাকে পাকে। কে জানে, কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়।

বড়বাড়ির খবর অনেকদিন রাখিনি। আমার প্রয়োজন সেখানে অনেক দিন হলো মিটে গেছে। তবে বৃন্দাবনবাবুরা এখন আর একা নন। একজনের বদলে আজ একটা শহরই তাঁর প্রতিবেশিত্ব করছে। রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বৈঠকখানায় দস্তুরমতো জনসমাগম হয়। শহরের সম্ভ্রান্তরাই আসেন, বাইরে দাঁড়ানো গাড়িগুলি দেখে তার পরিচয় পাই। প্রায়ই নিমন্ত্রিতদের

ভূরি-ভোজনের আনন্দ কোলাহল কানে ভেসে আসে।

—দাঁড়া রামদুলার। কথা আছে।

রামদুলার ঘাড় থেকে চিনির বস্তাটা নামিয়ে দাঁড়াল।

—কবে যাচ্ছে তোর বাবুরা?

—এখন এক বছর থাকবেন।

—এক বছর! কেন, কি হলো আবার?

—এখন যাবেন কেন? বাবুর তনদুরুস্তি হচ্ছে, আজকাল আণ্ডা হজম করছেন। পেঞ্চোভি মোটায় যাচ্ছে দিনকে দিন।

একটা চিঠি পেলাম। বাড়িওয়ালা রাজেনবাবু সিমলা থেকে আমাকে লিখেছেন—আমাদের বড়বাড়ির ভাড়াটে বৃন্দাবনকে আমার নমস্কার জানাবে। যথাসাধ্য ওদের সুখ-সুবিধার দিকে একটু নজর রাখবে। হাজার হোক, প্রতিবেশী।

...আমাদের ছোট বাড়ির ভাড়াটে নরেন ওভারসিয়ার নামে লোকটা সাত মাস ভাড়া বাকী ফেলেছে। চিঠি দিয়ে কোনও উওর পাই না মুরারী উকিলকে দিয়ে যথাশীঘ্র একটা রেন্ট-সুট্‌ ফাইল করে দিও। বেশি বদমাইশি করে তো ইজেকশনের চেষ্টা করো। তোমার ওপর সব ভার দিলাম।

অনেক দিন পরে আবার পুরনো নির্জনতাকে খুঁজছি সাধ করে। পাশের এই দুটো বাড়িই খালি হয়ে যাক এই মুহূর্তে, এই ধূমায়িত আবহাওয়া একটু পরিচ্ছন্ন হোক।

মনের যত চাপা অভিমান আর ভাবওয়ালা ভাষা ঢেলে দিয়ে ডায়েরিতে লিখে রাখলাম—একটা সাংঘাতিক হারানোর দিন বোধহয় ঘনিয়ে আসছে। একদিনের পাওয়া, এত দিনের পাওনা, গ্রেট বেঙ্গল কলোনির স্বপ্ন, সবই শুধু একটা ফাঁকি রেখে সরে পড়বে, ভাদ্র মেঘের চুটল ছায়ার মতো।

সেদিন কেমন একটা সন্দেহ হলো, পুবের বাতাসে শব্দস্পন্দন যেন থেমে গেছে—নিরেট একটা স্তব্ধতা। ধড়ফড় করে উঠে জানালা খুলে তাকালাম।

হাঁ সত্যি। কার্নিভালের ত্যক্ত আসরের মতো পড়ে আছে জনশূন্য ছোট বাড়িটা। কোন মমতার চিহ্ন বালাই নেই সেখানে। দুটো গরু এরই মধ্যে বারান্দায় চড়ে জাবর কাটছে। একটা কুকুর কুলুপ লাগানো দরজার অপরিসর ফাঁকটা দিয়ে মাথা গলিয়ে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

—পালিয়েছে লোকটা। বুনো, বেদে, চোর...।

লাঠিটা নয়, টেবিলের উপর থেকে রাজেনবাবুর চিঠিটা ছোঁ মেরে তুলে নিলাম। ওদের আটক করতেই হবে, পালাতে দেওয়া চলবে না। দৌড়ে এসে দাঁড়ালাম সড়কের ওপর। কতদূর গেছে ওরা?

বেশি দূর নয়, কদমের সারিটা পর্যন্ত। চন্দ্রপুরের সড়ক ধরে মালপত্র বোঝাই গরুর গাড়িটা চলেছে আগে আগে। পেছনের গাড়িতে বউদি আর মন্টুরা। গাড়ির পাশে পাশে আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে, মাথায় শোলার হ্যাট চাপিয়ে নরেনদা চলেছেন।

মনে পড়ছে, বেশ ভাবওয়ালা ভাষা দিয়ে পুরনো কালের ইতিহাসের যে-সব কথা লিখেছেন নির্মলদা, তাঁর নতুন বইটাতে—নতুন তৃণ-ভূমির স্বপ্ন দু'চোখে, শস্যকণাপ্রলুব্ধ যাযাবর মানুষের দল দিকে দিকে ছুটে-হেঁটে চলে যাচ্ছে। পেছনের যত পরিচয় দুহাতে মুছে ফেলে, যত বন্ধ্যা মাটির ঢেলা অবহেলায় মাড়িয়ে ওরা একদিন চলে যায়। ওরা বাঁধা পড়ে না কোথাও।

রুরু ও প্রমদ্বরা

মহাতেজা প্রমতির পুত্র রুরু এসেছিলেন মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে এবং মহর্ষির সাক্ষাৎ না পেয়ে ফিরে চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বিস্মিত হয়ে থেমে রইলেন কিছুক্ষণ। দেখলেন, ছায়াপাণ্ডুর সন্ধ্যাকাশের ক্রোড়ে নয়, অজস্র সৌরভ্যরম্য এই আশ্রম-প্রাঙ্গণেরই লতাপ্রাচীরের ছায়াচ্ছন্ন অন্তরালে যেন পূর্ণিমার কোরক লুকিয়ে রয়েছে।

নিকটে এগিয়ে গেলেন রুরু এবং বুঝলেন, মিথ্যা নয় তাঁর অনুমান। রূপাভিরামা এক কুমারী, যেন রাকারজনীর আকাশলোক হতে কৌমুদীকণিকা আহরণ ক'রে এক শিল্পী এই তরুণীর দেহকান্তি রচনা করেছেন। ভুল হবে না, যদি জ্যোৎস্নাপিপাসী চকোর এই মুহূর্তে এসে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমনিভৃতের এই লতাপ্রাচীরের উপর লুটিয়ে পড়ে। ভুল হবে না, যদি দক্ষিণ সমীর তার চন্দনগন্ধভার নিয়ে এখনি ছুটে আসে। এই স্মিতাননের সিতরশ্মির স্পর্শ পেয়ে আরও শীতল হয়ে যাবে দক্ষিণ সমীর।

প্রশ্ন করেন রুরু—তোমার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি শুচিস্মিতা।

কুমারী বলে—আমি মহর্ষি স্থূলকেশের কন্যা প্রমদ্বরা। আপনি কে?

—আমি ভার্গবগৌরব প্রমতির পুত্র রুরু।

পূর্ণিমার কোরকের মত সুযৌবনা কুমারীর রূপরুচির তনুভঙ্গিমার দিকে বিস্ময়বিচলিত বক্ষের তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকেন রুরু। তাঁর দুই চক্ষুর কৌতূহল যেন সুদুঃসহ এক আগ্রহে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঋষির কন্যা, আশ্রমচারিণী কুমারী, কিন্তু তপস্বিনী নয়। মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন রুরু, যেন নিদ্রিতা কেতকীর নিশীথের বাসনার মত সুস্বপ্নবিহসিত এক কামনার শিহর এই নারীর অধরপুটে ঘুমিয়ে রয়েছে। পরাগচিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে নারীর চম্পকগৌর গ্রীবার উপর, বোধ হয়, অপরাহ্ণের পুষ্পরেণুমেদুর ভ্রমরের মদামোদিত চুম্বনের স্মৃতি। বরবর্ণিনী প্রমদ্বরার কপালে কিসের রেণু বর্ণমনোহর তিলকের মত অঙ্কিত রয়েছে? দেখে বুঝতে পারেন রুরু, লুব্ধ প্রজাপতি তার পক্ষধূলির চিহ্ন রেখে দিয়ে চলে গিয়েছে। বিশ্বাস হয়, এই রূপরম্যারই পীনবক্ষের আলিঙ্গন লাভ ক'রে ফুটে উঠেছে ঐ রক্তকুরুবকের কুট্‌মল।

রুরু বলেন—সার্থক তোমার নাম।

প্রমদ্বরা বলে—কেন, আমার নামের মধ্যে কি অর্থ দেখলেন?

রুরু—তুমি প্রমদ্বরা, তুমি এই পৃথিবীর সকল প্রমদার মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তোমার তনুশোভা উপভোগ করবার জন্য, তোমারই প্রস্ফুট যৌবনের সঙ্গ লাভের জন্য আকুল হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সকল পুষ্পকুঞ্জের ভ্রমর আর প্রজাপতি। ধন্য তোমার রূপ।

অপাঙ্গে রুরুর মুখের দিকে একবার নিরীক্ষণ ক'রে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে প্রমদ্বরা, যেন তার মনের স্বপ্ন একটি হঠাৎ আঘাতে আহত হয়েছে। এ হেন প্রগল্‌ভ প্রশংসা আশা করেনি প্রমদ্বরা এবং এই প্রশংসা যে প্রশংসাই নয়। অধন্য এই রূপ, যদি এই রূপ শুধু এক প্রমোদসঙ্গিনী প্রমদার রূপ মাত্র হয়। কি আনন্দ আছে সে-নারীর জীবনে, যে-নারীর জীবন শুধু দিনরজনীর প্রমদার জীবন?

রুরু ডাকেন—বিম্বোষ্ঠী প্রমদ্বরা!

চমকে এবং মুখ তুলে ব্যথিত নেত্রে রুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রমদ্বরা বলে—ঋষির কুমারী কন্যার প্রতি এই সম্ভাষণ উচিত নয়।

রুরু বলেন—আমি আমার আকাঙ্ক্ষিতা নারীকেই আহ্বান করেছি।

প্রমদ্বরা—ক্ষমা করুন প্রমতিতনয়, আমি আপনার আকাঙক্ষার পরিচয় কিছুই জানি না।

রুরু—আমার এই মুগ্ধ চক্ষুর দিকে তাকিয়েও কি কিছুই বুঝতে পার না?

প্রমদ্বরা—হ্যাঁ, বুঝতে পারি, আপনার ঐ সুন্দর চক্ষু দুটি শুধু মুগ্ধ হয়েছে।

রুরু—মুগ্ধ হয়েছে আমার এই দেহের সকল শোণিতকণিকা, সন্ধ্যারুণের রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে যেমন মুগ্ধ হয়ে ওঠে সুশ্বেত শারদ মেঘের বক্ষের পরমাণু। শালীননয়না বনহরিণীর মত অয়ি নিবিড়েক্ষণা নারী, তোমার নেত্রবিচ্ছুরিত রশ্মি বহ্নি হয়ে আমার অন্তরে প্রবেশ করেছে। ক্ষীণকটিমধুরাআয়ি শোভনাঙ্গী, তোমার ঐ অনুপম অঙ্গহিল্লোল পান করবার জন্য প্রমতিতনয়ের এই আলিঙ্গনসমুৎসুক দুটি বাহু বাসনায় বিহুল হয়ে উঠেছে। এস, এই শুভক্ষণে ক্ষণপ্রণয়ের মহোৎসবে জীবন ধন্য কর শুভাননা।

আর্তনাদ ক'রে পিছনে সরে যায় প্রমদ্বরা, যেন এক বিষধরের গরলময় নিঃশ্বাসের বায়ু তার অঙ্গে এসে লেগেছে। কি ভয়ংকর এক আকাঙক্ষার প্রাণী ভার্গবগৌরব প্রমতির পুত্রের মূর্তি ধ'রে তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে!

রুরু—তবে কেন এই কঠোর কুণ্ঠা?

প্রমদ্বরা—আমি সাধারণী, আমি ঋষি পিতার স্নেহে পালিত কন্যা, আমি কুমারী, এই কুণ্ঠাই যে আমার জীবনের ধর্ম।

রুরু বলেন—এমন ধর্মের কোন অর্থ হয় না নারী।

প্রমদ্বরা কুপিত স্বরে বলে—বুঝেছি, আপনার পৌরুষ ধর্মহীন হয়েছে প্রমতিতনয়। আপনি প্রস্থান করুন, আপনার সান্নিধ্য আমি সহ্য করতে পারছি না।

অপলক নেত্রে বিস্ময়াবিষ্টের মত ঋষিকুমারী প্রমদ্বরার মুখের দিকে তাকিয়ে এই নিষ্ঠুর ধিক্কারবাণীর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেন রুরু ; কিন্তু বুঝতে পারেন না। কোপকঠোর স্বরে ধিক্কারবাণী শুনিয়ে দিয়েছে প্রমদ্বরা, কিন্তু কেন? বসন্তের কুঞ্জবনের পুষ্প কি পিকনাদ শুনে বিমর্ষ হয়? কলহংসের কণ্ঠস্বর শুনে কি জলনলিনী কুপিতা হয়? নীলাঞ্জনের ছায়া দেখে কি দুঃখিতা হয় সুনিবিড়া নীপবনলেখা?

অভিমানকাতর কণ্ঠে রুরু বলেন—তোমার এই ধিক্কারবাণীরও অর্থ বুঝতে পারছি না কুমারী।

প্রমদ্বরা বলে—আমি অপ্সরী নই প্রমতিতনয়, ক্ষণপ্রণয়ের ঘৃণ্য আনন্দে আত্মসমর্পণ করতে পারে না কোন ঋষিকুমারী।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন রুরু। তারপর শান্তভাবে বলেন—শোন ঋষিকুমারী, আমি আমার পিতার ও মাতার ক্ষণপ্রণয়ের সন্তান।

চমকে ওঠে প্রমদ্বরা—আপনার এই কথার অর্থ কি প্রমতিতনয়?

রুরু—অপ্সরী ঘৃতাচী আমার মাতা।

প্রমদ্বরা নিষ্পলক নয়নে প্রমতিতনয় রুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রুরু বলেন—বিস্মিত হয়ে কি দেখছ নারী? ক্ষণপ্রণয়ের সন্তান কি দেখতে মানুষের মত নয়?

প্রমদ্বরার দুই চক্ষু অকস্মাৎ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। রুরু বলেন—অকারণে বেদনার্ত হও কেন নারী?

প্রমদ্বরা বলে—আমিও সত্যই ঋষিকুমারী নই প্রমতিতনয়।

রুরু—তবে কে তুমি?

প্রমদ্বরা—আমি মহর্ষি স্থূলকেশের পালিতা কন্যা। আমার পিতা গন্ধর্ব বিশ্বাবসু, মাতা অপ্সরা মেনকা। আমিও ক্ষণপ্রণয়ের সন্তান।

প্রসন্নচিত্তে আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে রুরুর মুখ। হাস্যতরলিত কণ্ঠস্বরে রুরু বলেন—কিন্তু তার জন্য দুঃখ কেন প্রমদ্বরা?

প্রমদ্বারার—তার জন্য নয় ; আমার রূঢ় সম্ভাষণে আপনি ব্যথিত হয়েছেন।

রুরু—ব্যথিত হইনি নারী, তোমার কঠোর কুণ্ঠার নিষ্ঠুরতায় বিস্মিত হয়েছিলাম। অপ্সরীতনয়া প্রিয়হাসিনী প্রমদ্বরা, গন্ধর্বতনয়া মঞ্জুভাষিণী প্রমদ্বরা, এস, সকল কুণ্ঠা পরিহার ক'রে এক অপ্সরীতনয়ের ক্ষণপ্রণয়ের অনুরাগে রঞ্জিত কণ্ঠমাল্য গ্রহণ কর। এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যার আশীর্বাদে ধন্য হোক আমাদের মিলন, আর কারও আশীর্বাদ চাই না।

প্রমদ্বরা—কিন্তু...।

রুরু—মিথ্যা দ্বিধা বর্জন কর প্রমদ্বরা। তুমি ঋষিকন্যা নও।

প্রমদ্বরার সুন্দর আনন তাপিতা কেতকীর মত যেন নীরবে বেদনার জ্বালা সহ্য করতে থাকে। উত্তর দেয় না প্রমদ্বরা। অশ্রুপ্লুত হয়ে ওঠে দুই চক্ষু।

অকস্মাৎ আশাহত স্বরে আক্ষেপ ক'রে ওঠেন রুরু।—বুঝেছি প্রমদ্বরা।

প্রমদ্বরা—কি বুঝেছেন?

রুরু—তুমি অন্য কোন প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষিতা নারী, তাই প্রমতিতনয়ের আহ্বান এত সহজে তুচ্ছ করতে পারছ।

আর্তনাদ ক'রে ওঠে প্রমদ্বরা—অকারণে নিষ্ঠুর হবেন না প্রমতিতনয়। আপনিই আমার জীবনের একমাত্র বাঞ্ছিত পুরুষ। আপনি আছেন আমার স্বপ্নে, আপনিই আছেন আমার প্রতীক্ষায়, আপনিই আমার অন্তরমন্দিরের একমাত্র বিগ্রহ।

রুরু—বিশ্বাস করতে পারছি না প্রমদ্বরা।

প্রমদ্বরা—বিশ্বাস করুন প্রমতিতনয়। উপবনপথে দাঁড়িয়ে দূর হতে দেখেছি আপনাকে, কিন্তু আপনি দেখতে পাননি, ঋষিপিতার পালিতা এক আশ্রমচারিণী কুমারীর চক্ষু তখন কোন্ বেদনায় সজল হয়ে উঠেছিল। পথের উপর নবমুকুলের স্তবক ফেলে রেখে ছায়াতরুর অন্তরালে লুকিয়েছি। আপনারই চরণস্পর্শে আহত সেই মুকুলস্তবক তুলে নিয়ে এই আশ্রমের কুটীরে ফিরে এসেছি। কেউ দেখতে পায়নি, কেউ সাক্ষী নেই, শুধু আকাশ হতে দেখেছে প্রতিপদের চন্দ্রলেখা, কুমারী প্রমদ্বরা কি শ্রদ্ধায় আর কত আগ্রহে সেই নবমুকুলের স্তবকে তার কবরী শোভিত করেছে। আপনাকে প্রণাম করবার সৌভাগ্য কোনদিন হয়নি এই প্রণয়ভীরু কুমারীর, কিন্তু আপনার পদস্পর্শপূত পথধূলি তুলে নিয়ে এই কুমারী নিজের হাতেই তার শূন্য সীমন্তসরণি লিপ্ত করেছে। আপনি পূজ্য, আপনি প্রিয়, আপনিই এই আশ্রমচারিণীর চিরকালের প্রেমের আস্পদ।

রুরু ডাকেন—প্রিয়া প্রমদ্বরা।

প্রমদ্বরা বলে—এই সম্ভাষণই চিরন্তন হোক প্রিয় প্রমতিতনয়।

রুরু বিব্রতভাবে প্রশ্ন করেন—চিরন্তন? চিরন্তন হবে কেমন ক'রে?

প্রমদ্বরা—চিরপ্রণয়ে।

রুরু—বিবাহের বন্ধনে?

প্রমদ্বরা—হ্যাঁ।

উচ্চহাস্যে প্রমদ্বরার চিরপ্রণয়ের অভিলাশ যেন বিদ্রূপে ছিন্ন করবার জন্যই বলে ওঠেন রুরু—চিরপ্রণয়ের বন্ধন স্বীকার করতে চাও ক্ষণপ্রণয়িনী অপ্সরার কন্যা?

প্রমদ্বরা বলে—হ্যাঁ প্রমতিতনয়, আমি তোমারই জীবনের চিরসঙ্গিনী হতে চাই।

রুরু—কেন?

প্রমদ্বরা—নারীর জীবন ক্ষণপ্রণয়িনী প্রমদার জীবন নয়।

রুরু—তবে কিসের জীবন।

প্রমদ্বরা—দয়িতার জীবন?

রুরু—সে কেমন জীবন?

প্রমদ্বরা—যে জীবনে সর্বক্ষণ শুনতে পাব তোমার প্রাণের আহ্বান। তোমার শ্রান্তিতে তুমি খুঁজবে আমার সেবা, তোমার সংকল্পে তুমি খুঁজবে আমার সাহায্য, তোমার শান্তিতে তুমি খুঁজবে আমার সান্নিধ্য।

প্রমতিতনয় রুরুর মনে হয়, যেন চতুরা এক বাচালিকা নারী কতগুলি সুন্দর কথার ছলনা দিয়ে তার আজিকার কঠোর হৃদয়ের অপরাধ আর প্রত্যাখ্যানের নিষ্ঠুরতাকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। যার জীবনের দয়িতা হতে চায় এই নারী, তারই বক্ষের এই মুহূর্তের ব্যাকুলতা উপেক্ষা ক'রে কি আনন্দ লাভ করছে এই বিচিত্রহৃদয়া প্রেমিকা?

যেন শেষবারের মত প্রমদ্বরার হৃদয় পরীক্ষার জন্য ব্যগ্রভাবে হস্ত প্রসারিত ক'রে রুরু বলেন—প্রিয়া প্রমদ্বরা, তোমার ঐ স্নিগ্ধ করপল্লব তোমারই দয়িতের হস্তে সমর্পণ কর। সাক্ষী থাকুক সন্ধ্যাকাশের তারকা, দয়িতের সাকাঙ্ক্ষ চুম্বনে সিক্ত হোক প্রেমিকা প্রমদ্বরার করপল্লব।

দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে সিক্ত নেত্রে এবং সাগ্রহ স্বরে প্রমদ্বরা বলে—আজ আমাকে ক্ষমা কর। আর, আমার একটি অনুরোধের বাণী শোন প্রমতিতনয়।

রুরু—বল।

প্রমদ্বরা—মহর্ষি স্থূলকেশের কাছে গিয়ে আমার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন কর।

চিৎকার ক'রে ওঠেন রুরু—বিবাহের প্রস্তাব?

প্রমদ্বরা—হ্যাঁ। এস এক শুভক্ষণে, এস আমার ঋষিপিতার আশীর্বাদে পূত এই ভবনে, এস এক মাঙ্গল্য উৎসবের অঙ্গনে, তোমার প্রেমিকা প্রমদ্বরার আজিকার এই ভীরু পাণি সেইদিন নির্ভয় আনন্দে তোমারই পাণিতে আত্মসমর্পণ করবে।

নিষ্পলক নেত্রে প্রমদ্বরার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন তাঁর অপমানিত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা সহ্য করতে চেষ্টা করেন রুরু। সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রকেও অপমানিত করল এই নারী। প্রণয় নয়, প্রণয়ের রীতিই পূজ্য হয়ে উঠেছে এই নারীর কঠিন ও অদ্ভুত এক লোকবিধিশাসিত হৃদয়ে!

তবু প্রতিবাদ করতে পারেন না প্রমতিতনয় রুরু ; এই নারীর প্রস্ফুট অধরের দ্যুতি তুচ্ছ ক'রে চলে যেতে ইচ্ছা করে না। বুঝতে পারেন রুরু, ধিক্কার আর অভিশাপ দিয়ে এখনি চলে যেতে পারতেন, যদি এই মুহূর্তেও তাঁরই চিরপ্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী এই নারীকে ঘৃণা করতে পারতেন। কিন্তু সে যে অসম্ভব! ধন্য এই নারীর সুরম্য যৌবন, ঘৃণ্য শুধু এই নারীর প্রণয়ের রীতি। কিন্তু, জানে না এই আশ্রমচারিণী নারী, কত সহজে এই রীতিকেও ছলনা করা যায়। সংকল্প করেন রুরু, সুন্দর কথার ছলনা দিয়েই এই কঠোর মাঙ্গল্য উৎসবের শাসন আর চিরপ্রণয়ের রীতি ব্যর্থ ক'রে দিতে হবে।

রুরু বলেন—তাই হবে, তোমার অনুরোধের জয় হোক প্রমদ্বরা।

প্রমদ্বরা—জয়ী হোক তোমার হৃদয়ের প্রেম।

মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রম পিছনে রেখে ফিরে চললেন প্রমতিতনয় রুরু। পিছনে মুখ ফিরে আর তাকালেন না, তাই দেখতে পেলেন না রুরু, পূর্ণিমার কোরকের মত সেই রূপাভিরামা নারী, পূজার্থিনীর মত সশ্রদ্ধ আগ্রহে তাঁরই পদপীড়িত তৃণ চয়ন ক'রে তার চেলাঞ্চলের প্রান্তে তুলে রাখছে।

জয়ী হয়েছে প্রমদ্বরার অনুরোধ। আশ্রমের লতাপ্রাচীরের অন্তরালে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছে প্রমদ্বরা, ভার্গবগৌরব প্রমতি স্বয়ং এসে মহর্ষি স্থূলকেশের পালিতা কন্যা প্রমদ্বরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন মহর্ষি। সানন্দে এবং সাশ্রুনয়নে পিতা স্থূলকেশ তাঁর কন্যাকে প্রমতিতনয় রুরুর হস্তে সম্প্রদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা ক'রে মন্ত্রপাঠ করেছেন। সেদিন আসন্ন, যেদিন ঐ আকাশেই একটি সন্ধ্যায়

হীরকবিন্দুর মত তারকা উত্তরফল্গুনী ফুটে উঠবে। সেই সন্ধ্যায় প্রমদ্বরার প্রেমের পুরুষ প্রমতিতনয় রুরু শুভবিবাহের মাঙ্গল্য উৎসবের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে প্রমদ্বরার পাণি গ্রহণ করবে। আশ্রমচারিণী নারীর এই পুষ্পচয়নব্রত হস্ত প্রেমিকের পাণিস্পর্শে ধন্য হবে।

আশ্রমতড়াগের সলিলশোভার দিকে নয়, অপর প্রান্তে উপবনবীথিকার দিকে তৃষ্ণাতুরার মত দৃষ্টি তুলে সেদিন দাঁড়িয়ে ছিল প্রমদ্বরা। নবীনার্ক কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে উপবনস্থলী। বিহগের কাকলী আর মধুপের গুঞ্জনে যেন এক উৎসবের আনন্দ নিঃস্বনিত হয়ে উঠেছে। প্রভাতপ্রসূনের সৌরভে বায়ু বিহ্বল হয়েছে।

পুষ্প চয়নের জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে উপবনস্থলীর প্রান্তে এসে দাঁড়ায় প্রমদ্বরা। কিন্তু অদূরের তৃণাঞ্চিত পথরেখার দিকেই আবার তৃষ্ণাতুরার মত তাকিয়ে থাকে। এই তো সেই পথ, যে-পথের প্রান্তে প্রতি প্রভাতে তার হৃদয়রেণ্য প্রেমিকের মূর্তিকে অভ্যুদিত হতে দেখেছে প্রমদ্বরা।

—প্রিয় প্রমদ্বরা!

আহ্বান শুনে চমকিত হয়ে পিছনে তাকায় প্রমদ্বরা এবং দেখতে পায়, দাঁড়িয়ে আছেন তারই প্রেমাস্পদ প্রমতিতনয় রুরু।

—বাগ্‌দত্তা প্রমদ্বরা!

সম্ভাষণ শুনে ব্রীড়াভঙ্গে কুণ্ঠিত হয়ে যেন দুই অধরের সুস্মিত আনন্দ গোপন করতে চেষ্টা করে প্রমদ্বরা।

রুরু বলেন—আমি এক স্বপ্ন দেখেছি প্রমদ্বরা। তারকা উত্তরফল্গুনী আকাশে হাসছে, এবং প্রেমব্যাকুলা এক নারী বিবাহের মাঙ্গল্য উৎসবের পর এই উপবনের নিভৃতে এসে তার পরিণেতার সঙ্গ লাভ করেছে।

প্রমদ্বরার অধর সুস্মিত হয়।—তারপর?

রুরু—তারপর সেই শুভরজনীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মিলনোৎসবের আনন্দ বক্ষোলগ্ন ক'রে তৃপ্ত হলো দু'জনের জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

প্রমদ্বরা—তারপর?

রুরু—তারপর প্রভাত হতেই শূন্য হয়ে গেল উপবন।

প্রমদ্বরা—তারপর কোথায় গেল তারা দু'জন?

রুরু—দুই দিকে, ভিন্ন দিকে, কেউ কারও জীবনের বন্ধন হয়ে উঠল না।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তুলে এবং ব্যথিত স্বরে প্রমদ্বরা বলে—এ কি সত্যই আপনার স্বপ্ন, অথবা কল্পনা?

রুরু বলেন—আমার সংকল্প।

—সংকল্প? বাণবিদ্ধা হরিণীর মত যন্ত্রণাক্ত প্রমদ্বরার দুই চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। প্রমদ্বরা বলে—আমার স্বপ্নের কথা শুনবেন কি প্রমতিতনয়?

রুরু—বল।

প্রমদ্বরা—আমার স্বপ্ন জানে, মিথ্যা হবে প্রমতিতনয়ের সংকল্প। ক্ষণপ্রণয়াভিভ প্রমতিতনয় দেখতে পাবেন, তাঁর পরিণীতা নারী ছলনায় মুগ্ধ হয়নি, একরাত্রির কামনার লীলাকুরঙ্গীর মত এই উপবনে সে আসেনি। প্রমদ্বরা ভুলেও কখনও সে ভুল করবে না প্রমতিতনয়, যে-ভুলের পরিণাম নারীর শূন্য বক্ষের ব্যথিত পীযূষের চিরক্রন্দন!

শুষ্ক ও কঠোর অথচ ব্যথিত দৃষ্টি তুলে রুরু বলেন—তবে চিরকালের মত বিদায় দাও প্রমদ্বরা।

চলে গেলেন প্রমতিতনয় রুরু। যেন এক ভুজঙ্গীর নির্বোধ হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা ভাঙ্গতে গিয়ে নিজেই পরাহত হয়ে আর চূর্ণ হয়ে গিয়েছেন। ভালই হয়েছে, মিথ্যা হয়ে যাক আকাশের

উত্তরফাল্গুনী। এক নারীর চিরপ্রণয়ের বন্ধন তাঁর জীবনের অভিশাপ হয়ে উঠবার জন্য স্বপ্ন দেখছে। চূর্ণ হয়ে যাক সেই নারীর অভিসন্ধির স্বপ্ন।

নিজভবনে ফিরে এলেন প্রমতিতনয় রুরু, কিন্তু অনুভব করেন, তাঁরই মনের গভীরে বিষণ্ণ একখণ্ড মেঘের মত একটি স্তব্ধ দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে যেন এক দুরন্ত বিদ্যুতের জ্বালা অশান্ত হয়ে রয়েছে। কেন, কিসের জন্য এই বেদনা, বুঝতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বুঝতে পারেন না প্রমতিতনয় রুরু।

অপ্সরী-জীবনকে ঘৃণা করে অপ্সরীতনয়া প্রমদ্বরা। কিন্তু কেন? কোন্ সুখের আশায় নিজের জীবনকে চিরপ্রণয়ের বন্ধনে বদ্ধ ক'রে এক দয়িত পুরুষের পায়ে সমর্পণ করতে চায় প্রমদ্বরা? কোন্ লাভের লোভে? বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু মনে পড়ে প্রমতিতনয়ের, আশ্রমচারিণী সেই প্রেমিকার কাছে এই প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছেন তিনি।

অনেকক্ষণ, মধ্যাহ্নের খরতাপিত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন প্রমতিতনয় রুরু। তাঁর মনের ভাবনা যেন ঐ তপ্তপ্রান্তরের মত এক ছায়াহীন জগতের পথে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। যেন তাঁর কল্পনায় তৃষ্ণার্ত এক অসহায় শিশুর ক্রন্দনধ্বনির করুণতা বেজে উঠেছে।

চমকে উঠলেন প্রমতিতনয় রুরু এবং বুঝলেন, তাঁর জীবনের এক বিস্মৃত অতীত যেন তাঁর চেতনার নিভৃতে কেঁদে উঠেছে। পরভৃতিকার মত আপনবক্ষের সন্তান অপরের স্নেহনীড়চ্ছায়ার নিকটে ফেলে রেখে চলে গেলেন এক অপ্সরী মাতা, কিন্তু পরিত্যক্ত শিশুর ক্রন্দনস্বর শুনেও কি সেই মাতার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দেয়নি সেদিন? দুই চক্ষুর উদ্‌গত অশ্রুবিন্দু মুছে ফেলে বক্ষের দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করেন প্রমতিতনয়।

শূন্যবক্ষের চিরক্রন্দন সহ্য করতে পারবে না প্রমদ্বরা, এ কি কথা বলে ফেলল প্রমদ্বরা? কি বলতে চায় প্রমদ্বরা? মনে পড়তেই আবার চমকে ওঠেন, যেন ছিন্নমেঘ আকাশের শশিলেখার মত এক সত্যের রূপ হঠাৎ দেখতে পেয়েছেন রুরু।

এতক্ষণে যেন প্রেমিকা প্রমদ্বরার স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারছেন প্রমতিতনয় রুরু। তবে কি অমাতা হবার অভিশাপ হতে বাঁচতে চায় ; সন্তানের পালয়িত্রী আর প্রেমিকের গৃহিণী হতে চায় প্রমদ্বরা? অপ্সরী-জীবনের সেই ভয় হতে রক্ষা পেতে চায় প্রমদ্বরা?

নিজের মনের এই প্রশ্নের আঘাতে প্রমতিতনয়ের ক্ষণপ্রণয়লুব্ধ হৃদয়ের মূঢ়তা অকস্মাৎ চূর্ণ হয়ে যায়। এবং মনে পড়ে যায়, আজই তো আকাশে উত্তরফল্গুনী ফুটে উঠবার তিথি।

ব্যথিত অপরাধীর মত জীবনের এক ভয়ংকর মূঢ়তা হতে পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উপবনস্থলীর দিকে ছুটে চলে যান প্রমতিতনয়। স্নিগ্ধ উত্তরফল্গুনীর মত দ্যুতিময় যার নিবিড়ায়ত নয়নের কনীনিকা, সেই চিরপ্রেমের উপাসিকা প্রমদ্বরা, প্রমতিতনয়ের জীবনোপবনের প্রেমবাপীমরালী প্রমদ্বরা, সে কি এখনও তার চিরদয়িতের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে?

উপবনস্থলীর নিভৃতে এসে দাঁড়ালেন রুরু এবং দেখলেন, যে পুষ্পতরুতলের তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর দাঁড়িয়েছিল প্রমদ্বরা, সেইখানে এক কৃষ্ণসর্প ক্রীড়া করছে। পল্লবিত উপবনতরুর শ্যামশোভার উপর অপরাহ্ণের আলোক ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রমদ্বরা নেই।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমের লতাপ্রাচীরের নিকটে এসে দাঁড়ালেন প্রমতিতনয় রুরু। শুনলেন, আশ্রমের এক কুটীরের অভ্যন্তরে যেন বেদনাহত সঙ্গীতের মত করুণ বিলাপের রোল বেজে উঠছে। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মহর্ষি স্থূলকেশর উচ্চারিত মন্ত্রস্বরও শুনতে পেলেন রুরু। এবং আরও এগিয়ে এসে কুটীরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখলেন, কিশলয়াস্তীর্ণ ভূমিশয্যার উপর ঘুমিয়ে আছে সেই পূর্ণিমার কোরক। প্রমতিতনয় রুরুকে দেখতে পেয়েই অধোবদনা আশ্রমসখীদের বিলাপের রোল আরও করুণ হয়ে ওঠে। সকলে

অনুরোধ করে—আসুন প্রমতিতনয়, আপনার প্রমদ্বরাকে আপনিই মৃত্যু হতে রক্ষা করুন।

—মৃত্যু হতে?

—হ্যাঁ, কৃষ্ণসর্পের দংশনে বিষজ্বালায় মূর্ছিতা হয়েছে আপনার প্রিয়া প্রমদ্বরা। এই মূর্ছাই মৃত্যু হয়ে উঠবে প্রমতিতনয় ; কৃষ্ণভুজঙ্গের গরলে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনারই প্রেমাভিষিক্ত পুষ্পের প্রাণ।

প্রিয়া প্রমদ্বরা! আর্তনাদ ক'রে প্রমদ্বরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন প্রমতিতনয় রুরু। কিন্তু সেই প্রিয়সম্ভাষণে প্রণয়িনীর নয়নকমল অক্ষিপল্লব বিকশিত ক'রে আর হেসে ওঠে না। অধরের রক্তরাগ বিষজ্বালায় নীল হয়ে গিয়েছে, কুন্তলভার চূর্ণ মেঘস্তবকের মত লুটিয়ে পড়ে আছে। কোকনদোপম পদতলে ফুটে রয়েছে একটি রক্তবিন্দু, হিংস্র কৃষ্ণসর্পের দংশনের চিহ্ন।

মহর্ষি স্থূলকেশ এসে সম্মুখে দাঁড়াতেই অশ্রুসিক্ত নেত্রে ও ব্যাকুলস্বরে প্রশ্ন করেন প্রমতিতনয় রুরু—বলুন মহর্ষি, আপনার কন্যার এই ঘুম কি আর ভাঙ্গবে না?

মহর্ষি বলেন—ভাঙ্গবে, যদি তোমার জীবনে কোন পূর্ণ থেকে থাকে।

অশ্রুরুদ্ধস্বরে মন্ত্র পাঠ করেন বৃদ্ধ মহর্ষি এবং মন্ত্রপূত বারি নিয়ে কন্যার ললাটে সস্নেহে সিঞ্চন করেন।

কক্ষান্তরে চলে গেলেন মহর্ষি, চলে গেল আশ্রমসখীর দল। আর, নীরব কুটীরের নিভৃতে প্রমদ্বরার নিদ্রিত মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন রুরু। দেখতে থাকেন রুরু, যেন মৃত্যুময় অথচ মধুর এক স্বপ্নেরস্নেহে ডুবে রয়েছে তাঁরই জীবনের উত্তরফল্গুনী। মনে হয়, কৃষ্ণসর্পের দংশনে নয় ; তাঁরই ছলনার বিষ সহ্য করতে না পেরে উপবনের সেই কৃষ্ণসর্পের দংশন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে প্রমদ্বরা।

কিন্তু কি বলে গেলেন মহর্ষি? কোন পুণ্য আছে কি রুরুর জীবনে? যদি থাকে কোন পুণ্য, তবে হে নিখিল প্রাণের বিধাতা, ঐ দুটি সুরুচির অধর হতে অপসারিত কর এই মৃত্যুময় নীলচ্ছায়া। প্রার্থনা করেন রুরু।

তারপরেই যেন উন্মত্ত পিপাসুর মত দুই ব্যগ্র হস্তের বিপুল আগ্রহে প্রমদ্বরার কোকনদোপম পদতল বুকের উপর তুলে নিলেন প্রমতিতনয় রুরু। কৃষ্ণসর্পের দংষ্ট্রাঘাতের চিহ্ন প্রেমিকের চুম্বনে চিহ্নিত হয়ে বিষবেদনার রক্তবিন্দু মুছে নিল। ওষ্ঠপুটে আহৃত গরলের জ্বালায় প্রমতিতনয় রুরু মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

যেন এক স্বপ্নের জগতে দাঁড়িয়ে এক সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন রুরু। দেখছেন, সে আকাশে ফুটে ওঠে কিনা তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষিত উত্তরফল্গুনী। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না, শুধু শোনা যায়, আকাশের বক্ষ স্পন্দিত ক'রে যেন কা'র বাণী প্রণাদিত হচ্ছে।

প্রশ্ন করেন রুরু—কা'র বাণী তুমি, হে আকাশবাণী?

—আমি এক বাণীময় দেবদূত।

—কোন্ দেবতার দূত?

—জীবনের দেবতার দূত।

—আমাকে শান্তি দান করুন দেবদূত।

দেবদূত বলেন—ভুল ভেঙ্গেছে কি ক্ষণপ্রণয়াভিলাষী মূঢ়?

রুরু বলেন—ভেঙ্গেছে।

—আশ্রমচারিণী প্রমদ্বরাকে চিনতে পেরেছ কি?

—চিনেছি।

—কি চিনেছ? তোমার জীবনের প্রমদা অথবা দয়িতা?

—জীবনের দয়িতা।

—তবে তাকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।

—কেমন ক'রে?

—তোমার জীবনের পুণ্য দিয়ে?

—কি পুণ্য আছে জানি না।

—তোমার প্রিয়াকে তোমার আয়ুর অর্ধ দান কর।

—বলুন আকাশচারী দেবদূত, কেমন ক'রে আমার প্রাণহীনা প্রিয়াকে আমার আয়ুর অর্ধেক দান করি?

দেবদূত বলেন—সে দান সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। তোমার প্রাণের অর্ধ তোমারই প্রিয়া প্রমদ্বরার দেহে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে।

রুরু—বুঝতে পারছি না দেবদূত।

দেবদূত—তোমার প্রমদ্বরার পদতলক্ষত হতে বিষবেদনা নিজ অধরপুটে আহরণ ক'রে তুমি তোমার আয়ুর অর্ধ হারিয়েছে প্রমতিতনয রুরু, কিন্তু প্রাণ লাভ করেছে তোমার প্রিয়া। শুনে সুখী হলে কি প্রমতিতনয়?

বিপুল হর্ষে উদ্বেল হয় রুরুর কণ্ঠস্বর—শুনে ধন্য হলাম দেবদূত।

—কেন প্রমতিতনয়?

—প্রিয়াহীন অনন্ত আয়ুর চেয়ে প্রিয়ার প্রণয়ে বিলীন মিলনের একটি মুহূর্তের জীবনকেও যে প্রিয়তর বলে মনে হয় দেবদূত।

—ধন্য তোমার প্রেম! সুহাস্য বর্ষণ করে আকাশের বাণী। চলে গেলেন আকাশচারী দেবদূত এবং সেই স্বপ্নময় মূর্ছা হতে জেগে উঠলেন রুরু। দেখলেন, তেমনি ঘুমিয়ে আছে প্রমদ্বরা।

—জাগো চিরদয়িতা প্রমদ্বরা। ব্যাকুল আগ্রহে আহ্বান করেন প্রমতিতনয় রুরু। নিভে আসছে অপরাহ্ণের আলোক, দক্ষিণ সমীর হঠাৎ ছুটে এসে প্রমদ্বরার চূর্ণকুন্তলের স্তবক লীলাভরে চঞ্চলিত ক'রে যায়। দেখতে পান রুরু, তিরোহিত হয়েছে মৃত্যুময় গরলের নীলচ্ছায়া, ফুটে উঠেছে প্রমদ্বরার প্রভাময় অধরের কৌমুদীকণিকা।

আহ্বান করেন প্রমতিতনয় রুরু।—চিরপ্রণয়ীর প্রাণের অর্ধ উপহার নিয়ে জেগে ওঠো প্রমদ্বরা। প্রমতিতনয় রুরুর জীবন প্রাণ গৃহ ও সন্তানবাসনা তোমারই জন্য প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। প্রণয়ী প্রমতিতনয়ের প্রাণার্ধা প্রমদ্বরা, মিথ্যা হতে দিও না তোমার জীবনের উত্তরফল্গুনী।

যেন বিকশিত হয় মুদ্রিত কমলকলিকা। চোখ মেলে তাকায় প্রমদ্বরা। এই জগতেরই এক প্রেমের সঙ্গীত যেন তার অন্তর স্পর্শ ক'রে তার মৃত্যুময় নিদ্রা ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু প্রাণের অর্ধ উপহার দিয়ে চিরজীবনের সঙ্গিনীকে এমন ক'রে কে আহ্বান করছে?

বিস্মিত হয়ে প্রমতিতনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে প্রমদ্বরা।—কে ডাকছে আমাকে?

রুরু বলেন—আমি?

প্রমদ্বরা—প্রাণের অর্ধ উপহার দিয়ে কা'কে ডাকলে তুমি?

রুরু—আমার জীবনের চিরদয়িতাকে।

অপলক নয়নে প্রমতিতনয় রুরুর মুখের দিকে স্নিগ্ধ ও স্মিতপুলকিত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে প্রমদ্বরা। রুরু বলেন—কি দেখছ প্রিয়া প্রমদ্বরা?

প্রমদ্বরা—দেখছি, স্বপ্নও কি সত্য হয়!

রুরু বলেন—সত্য হয়েছে। ঐ সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ।

বিস্ময়াকুল দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে প্রমদ্বরা বলে—কি?

রুরু বলেন—ঐ দেখ উত্তরফল্গুনী।

সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন এবং কত সহস্র প্রার্থীকে গো ভূমি কাঞ্চন ও শস্য দান করেছেন রাজা যযাতি! তাঁর কাছে দানই হলো মানলাভের একমাত্র ব্রত এবং মানই হলো মানবজীবনের একমাত্র পুণ্য।

পুণ্যের প্রয়োজন হয়েছে রাজা যযাতির ; কারণ তিনি সেই সব রাজর্ষির মধ্যে স্থানলাভ করতে চান, যাঁরা পুণ্যবলে স্বর্লোকে অধিষ্ঠান লাভ করেছেন। এই আকাঙক্ষাই তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। কিন্তু কবে এই স্বপ্ন সফল হবে?

বৈভব ক্ষয় হয়ে গিয়েছে অনেক, কিন্তু ক্ষয় হয়নি তাঁর আরও দান করবার স্পৃহা। রত্নাগার শূন্য হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও শূন্য হয়নি তাঁর আরও মান লাভের আকাঙক্ষা। কারণ, দানের গর্বে ও গৌরবে তিনি সব রাজর্ষির মহিমা খর্ব ক'রে দিতে চান। স্বর্লোকের রাজর্ষিদের মধ্যে একজন সাধারণ হয়ে নয় ; অসাধারণ হয়ে, প্রধান হয়ে এবং সর্বোচ্চ হয়েই তিনি আসন লাভ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। তাই সব চেয়ে বেশি পুণ্যবল সঞ্চয়ের প্রতীক্ষায় রয়েছেন রাজা যযাতি।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সভাকক্ষে বসেছিলেন রাজা যযাতি। তখনও প্রার্থীর সমাগম আরম্ভ হয়নি।

সভাকক্ষের চারিদিকে তাকালেই বোঝা যায়, যযাতির মনে দান করবার আকাঙক্ষা যত বড়, দান করবার মত রাজৈশ্বর্য তত বড় নয়। রাজচ্ছত্র মৌক্তিকে খচিত নয়। রাজদণ্ড মণিবিচিত্রিত নয়। সিংহাসনে রত্নধাতুপ্রভা নেই। স্তম্ভে ও বেদিকায় বিদ্রুমশোভা নেই। নেই কোন চারণসুন্দরীর কণ্ঠোৎসারিত চিত্তহারী গীতস্বর ; নেই কোন চঞ্চরীকনয়না চামরগ্রাহিণীর চারুকটাক্ষ। সিংহাসনের পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র অগুরুগর্ভিত বর্তিকার শিখা হতে বিচ্ছুরিত রশ্মি যযাতির মুকুট স্পর্শ করে, কিন্তু রত্নহীন সে মুকুট উদ্ভাসিত হয় না।

সভাকক্ষে প্রথম প্রবেশ করলেন এক তপস্বী। রাজা যযাতি কয়েকটি তাম্রমুদ্রা হাতে তুলে নিয়ে তপস্বীকে দান করবার জন্য বলেন--দান গ্রহণ করুন যোগিবর।

তপস্বী মৃদুহাস্যে বলেন--আমি বিষয়ী নই রাজা যযাতি, তাম্রমুদ্রায় আমার কোন প্রয়োজন নেই।

রাজা যযাতি পরক্ষণে ভূর্জপত্র ও লেখনী হাতে নিয়ে বলেন তবে আপনাকে একখণ্ড ভূমি দান করি । দানপত্র লিখে দিই ।

তপস্বী আবার আপত্তি করেন আমি গৃহী নই রাজা যযাতি, আমার কোন ভূমিখণ্ডের প্রয়োজন নেই।

এক মুষ্টি যবকণা তুলে নিয়ে রাজা যযাতি বলেন-তবে এগিয়ে আসুন যোগিবর, আপনার ঐ চীরবস্ত্রের অঞ্চল বিস্তারিত করুন। আপনাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ শস্য দান করি।

তপস্বী বলেন--শস্যকণায় আমার প্রয়োজন নেই।

যযতি--তবে কি চান আপনি? বলুন আপনাকে কি বস্তু দান করব?

তপস্বী--যদি নিতান্তই দান করতে চান, তবে আমাকে আপনার সভায় কিছুক্ষন উপবেশন করতে অনুমতি দান করুন।

যযাতি বিস্মিত হয়ে বলেন--আসন গ্রহন করুন, কিন্তু আমার কাছ থেকে মাত্র এইটুকু দানেই কি আপনি পরিতুষ্ট হবেন যোগিবর? আমার কাছ থেকে কি আর কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করবার নেই?

আসন গ্রহণ করবার পর তপস্বী বলেন-আমি আপনাকে একটি দিব্য লোকনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি রাজা যযাতি। যদি শ্রবণ করেন, তবেই আমার প্রতি অনেক

অনুগ্রহ করা হবে।

যযাতি—বলুন যোগিবর।

তপস্বী—পুণ্যার্জন লোকজীবনের একটি লক্ষ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু স্মরণে রাখবেন, পুণ্যার্জনের পথটিও পুণ্যময় হওয়া চাই।

যযাতি—আপনার উপদেশের তাৎপর্য বুঝলাম না যোগিবর।

তপস্বী—মহৎ পন্থা ছাড়া মহদভীষ্ট লাভ হয় না রাজা যযাতি। সদাচরণে সদ্‌বস্তু, সম্মানের পথে সম্মান লাভ হয়, অন্যথায় হয় না।

যযাতি—কেন হয় না?

তপস্বী—যেমন মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পুষ্পদ্রুম মঞ্জরিত হয় না, হয় বসন্তানিলের মৃদুল স্পর্শে। নিষাদের করধৃত কাষ্ঠাগ্নির প্রজ্বলন্ত আলোকে নিদ্রিত বিহঙ্গ জাগে না রাজা যযাতি, জাগে প্রাচীপটে অভ্যুদিত নবার্কের আলোকাপ্লুত ইঙ্গিতে। শোণিতজলা বৈতরণীর তরঙ্গে স্বর্গমরাল কেলি করে না, তার জন্য চাই মানসহ্রদের স্বচ্ছোদক।

যযাতি—শুনলাম যোগিবর।

তপস্বী—স্মরণে রাখবেন নৃপতি।

যযাতি—বনবাসীর লোকনীতি বনের জীবনেই সত্য হতে পারে যোগিবর, নৃপোত্তম যযাতির পক্ষে এমন নীতি স্মরণ ক'রে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। সংকল্প যে-কোন পন্থায় সিদ্ধ করাই রাজসিক ধর্ম। যদি একটি বিষদিগ্ধ শরের আঘাতে হত্যা করে মাতঙ্গের মস্তক-মৌক্তিক লাভ করা যায়, তবে কোন্ মূর্খ শতবর্ষ প্রতীক্ষায় থাকে, কবে কোন্ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রের পুলকিত জ্যোতির আবেদনে সে গজমৌক্তিক আপনি স্খলিত হবে বলে? এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ ক'রে পাতালভুজঙ্গের চক্ষু এক মুহূর্তে অন্ধ ক'রে দিয়ে যদি ফণামণি লাভ করা যায়, তবে শতবর্ষ ধ'রে নাগপূজা করবার কি সার্থকতা?

তপস্বী আর প্রত্যুত্তর দিলেন না। গাত্রোত্থান করলেন এবং রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। রাজা যযাতি লক্ষ্য করলেন, সভাপ্রান্তে আর একজন প্রার্থী এসে বসে আছেন, কান্তিমান এক ঋষিযুবা।

যযাতি আহ্বান করেন—আপনার প্রার্থনা নিবেদন করুন ঋষি।

ঋষিযুবা বলেন—আমি অর্থের প্রার্থী।

রাজা যযাতি এক শত তাম্রমুদ্রা হাতে তুলে নিয়ে বলেন—গ্রহণ করুন ঋষি।

ঋষিযুবা হেসে ফেলেন—ঐ যৎসামান্য অর্থের প্রার্থী আমি নই রাজা যযাতি।

যযাতি—আপনার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন?

ঋষিযুবা—নিশাকরসদৃশ শুভ্রদেহ এবং শ্যামৈককর্ণ অষ্ট শত অশ্ব সংগ্রহ করতে হলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাই আমাকে দান করুন।

ঋষিযুবার কথা শুনে রাজা যযাতির হর্ষোৎফুল্ল বদন মুহূর্তের মধ্যে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। বৈভবহীন যযাতির রত্নাগার শূন্য ক'রে দিলেও নিশাকরসদৃশ শুভ্রদেহ ও শ্যামৈককর্ণ অষ্ট শত দুর্লভ অশ্ব ক্রয় করবার মত অর্থ হবে না। ঋষি হয়েও এমন অপরিমেয় অর্থ প্রার্থনা করেন, কে এই ঋষি?

রাজা যযাতি সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করেন—আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি ঋষি।

ঋষিযুবা—আমি বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব।

রাজা যযাতি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান এবং আগ্রহাকুল স্বরে বলেন—আপনি বিশ্বামিত্র-আশ্রমের বিখ্যাত জ্ঞানী গালব?

গালব—আমাকে জ্ঞানী গালব বলে সংবর্ধনা করবেন না রাজা যযাতি। এত বড় সম্মান-সম্ভাষণ লাভের অধিকার আমার এখনও হয়নি। আমি এখনও ঋণমুক্ত হতে পারিনি।

যযাতি--কিসের ঋণ?

গালব--গুরুঋণ। গুরুকে এখনও দক্ষিণা দান করতে পারিনি। জ্ঞানী গালব নামে মর্ত্যলোকে খ্যাত হবার মত গৌরবের অধিকারী হতে পারব না, যতদিন না গুরুকে দক্ষিণা দান ক'রে মুক্ত হতে পারি।

যযাতি--শুনেছি, বিশ্বামিত্রের মত উদারস্বভাব তপোধন শিষ্যের একটি মাত্র প্রণামে তুষ্ট হয়ে থাকেন, তার চেয়ে বেশি বা অন্য কোন দক্ষিণা তিনি গ্রহণ করেন না।

গালব--গুরু বিশ্বামিত্র আমার কাছে কোন দক্ষিণা চাননি রাজা যযাতি। আমিই তাঁকে দক্ষিণা দিতে চেয়েছি, কারণ আমি কারও কাছে ঋণী হয়ে থাকতে চাই না। গুরু আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, আমি যথোচিত দক্ষিণাদানে তাঁর গুরুত্বের মূল্য শোধ ক'রে দেব। আমারই নির্বন্ধাতিশয়ে গুরু আমার কাছ থেকে দক্ষিণা গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন।

যযাতি--কি দক্ষিণা চেয়েছেন আপনার গুরু?

গালব--পূর্বেই বলেছি নৃপতি, শশিসদৃশ সিতদেহ এবং এক কর্ণ শ্যামবর্ণ, এইরূপ অষ্টশত অশ্ব।

যযাতি--কি দারুণ দক্ষিণা! গুরু আপনার উপর অদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন ঋষি।

গালব--হ্যাঁ রাজা যযাতি, আমার নির্বন্ধাতিশয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আমার মানগর্ব খর্ব করবার জন্যই এই দুঃসংগ্রহণীয় দক্ষিণা চেয়েছেন।

কুণ্ঠিত স্বরে যযাতি বলেন--ঋষি গালব, ধনপতি কুবের ছাড়া বোধ হয় এমন ঐশ্বর্যশালী আর কেউ নেই, যাঁর পক্ষে এইরূপ অষ্টশত অতিদুর্লভ সুজাত অশ্ব সংগ্রহের মত উপযুক্ত পরিমাণের সম্পদ দান করা সহজসাধ্য। আমার পক্ষে তো অসাধ্য।

গালব--শুনেছিলাম, আপনি দানের গৌরবে গরীয়ান হয়ে স্বর্লোকের সকল রাজর্ষির মধ্যে মানিশ্রেষ্ঠ হবার সংকল্প করেছেন।

যযাতি--হ্যাঁ ঋষি, এই সংকল্পই আমার জীবনের স্বপ্ন।

গালব--আপনার এই স্বপ্ন সফল করবার সুযোগ আমি এনেছি রাজা যযাতি। বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালবের প্রার্থনা আপনি পূর্ণ করতে যদি পারেন, তবে আপনার খ্যাতি সকল দানীর খ্যাতি ম্লান ক'রে দেবে। আপনি মানিশ্রেষ্ঠ হতে পারবেন, আপনি স্বর্লোকের সকল রাজর্ষির মধ্যে সর্বোচ্চ আসন লাভ করতে পারবেন।

যযাতি--আপনি ঠিকই বলেছেন ঋষি।

গালব--তা হলে অবিলম্বে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করুন।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন রাজা যযাতি। ঋষি গালবের প্রার্থনা পূর্ণ করতেই হবে। মানিশ্রেষ্ঠ হবার সুযোগ এসেছে এতদিনে, এই সুযোগ বিনষ্ট হতে দিতে পারবেন না যযাতি। প্রার্থী ঋষি গালব যদি আজ বিমুখ হয়ে চলে যান, দানশক্তিহীন যযাতির অপবাদ ত্রিভুবনে রটিত হয়ে যাবে। স্বর্গে যাবার পথ অবরুদ্ধ হবে চিরকালের মত। মানহীন সে জীবনের চেয়ে বেশি অভিশপ্ত জীবন আর কি পারে?

কিন্তু উপায়? উপায় চিন্তা করেন রাজা যযাতি। সঙ্গত বা অসঙ্গত, সৎ বা অসৎ, কূট কিংবা সরল, করুণ অথবা নির্মম, যে কোন উপায়ে তাঁকে আজ তাঁর দানশীল জীবনের গর্ব ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর যযাতি বলেন--আমার রত্নাগার যদিও শূন্য, কিন্তু আমার প্রাসাদে একটি দুর্লভ ও অনুপম রত্ন আছে ঋষিবর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আশা করি, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারব।

সভাগৃহ ছেড়ে ব্যস্তভাবে রাজা যযাতি প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন

রাজা যযাতির কাছ থেকে প্রার্থিত অর্থের প্রতিশ্রুতি পেয়ে আশ্বস্ত মনে শূন্য সভাগৃহের একপ্রান্তে বসে গালব। এতদিনে গুরুমন থেকে রইলেন মুক্ত হয়ে জ্ঞানী গালব নামে যশস্বী হতে পারবেন, কল্পনা করতেও তাঁর অন্তর উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল। ত্রিভুবন জানবে, ঋষি গালব এক অতিকঠিন ও অসাধ্যপ্রায় দক্ষিণা দান ক'রে গুরুদত্ত জ্ঞানের মূল্য শোধ ক'রে দিয়েছেন। গালবের কীর্তিকথা প্রতি জনপদের চারণের মুখে সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হবে। গালবও বিশ্বাস করেন, ত্রিলোকের জনসমাজে মানী হওয়াই একমাত্র পুণ্যকর্ম এবং মানবলই একমাত্র পুণ্যবল।

নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবেও মনে মনে ধন্য হচ্ছিলেন গালব। নৃপতি যযাতির কাছ থেকে প্রার্থিত অর্থের প্রতিশ্রুতি পেয়ে গিয়েছেন। এই বৈভবহীন রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি দুর্লভ ও অনুপম রত্ন আছে, সেই রত্ন দান করবেন যযাতি। দুর্লভ রত্নের বিনিময়ে অষ্টশত দুর্লভ অশ্ব সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। সভাগৃহের প্রান্তে বসে অধীর আগ্রহে রাজা যযাতির জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন ঋষি গালব।

চমকে উঠলেন গালব। শূন্য সভাগৃহের বক্ষ যেন হঠাৎ পরিমলবিধুর সমীরের স্পর্শে মদির হয়ে উঠেছে। সভাগৃহে প্রবেশ করেছেন রাজা যযাতি, তাঁর সঙ্গে পুষ্পাভরণে ভূষিতা এক কুমারী। মঞ্জুলগতি সে নারীর পায়ে নূপুর আছে, কিন্তু কি আশ্চর্য, তার পদচ্ছন্দে নূপুর নিক্কণিত হয় না। সৌরভ্যে রমিতা ও সৌবর্ণ্যে বন্দিতা, পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত এক নারীর মূর্তি রাজা যযাতির সঙ্গে সভাগৃহে এসে ব্রীড়াকুণ্ঠিত হয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা যযাতি বলেন—ঋষি গালব, আমার এই একটিমাত্র রত্ন আছে, আমার কন্যা মাধবী। এই রত্ন ছাড়া আপনাকে দান করবার মত আর কোন রত্ন নেই।

রত্ন? ঋষি গালব তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে সুতীব্র কৌতূহল নিয়ে কুমারী মাধবীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু কোথায় রত্ন?

রত্নের চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলেন না গালব। যযাতিনন্দিনী মাধবীর কুন্তলস্তবক থেকে পদনখ পর্যন্ত দেহের কোথাও কোন রত্নভূষণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। স্বর্ণনূপুরও নয়, শুধু কতগুলি স্বর্ণযূথিকার কোরক সেই রূপমতী তরুণীর কিশলয়কোমল চরণের স্পর্শপ্রণয়ে যেন মূর্ছিত হয়ে আছে।

যযাতি বলেন—আমার এই রত্নকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম ঋষি। আপনি তৃপ্ত ও তুষ্ট হোন। আমার দান সিদ্ধ হোক এবং আমার দানবলে অর্জিত পুণ্যের বলে আমি স্বর্গে গিয়ে ত্রিলোকবিশ্রুত রাজর্ষিদের মধ্যে আমার কাঙ্ক্ষিত স্থান গ্রহণ করি।

যযাতিনন্দিনী মাধবী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এবং গালবকে প্রণাম করে। কিন্তু গালব বিব্রত ও বিচলিতভাবে যযাতিকে লক্ষ্য ক'রে বলেন—আপনি আমাকে অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কেন বঞ্চিত করছেন রাজা যযাতি? আমি অর্থ প্রার্থনা করেছি, আমাকে অর্থ দান করুন। পুষ্পান্বিতা বনলতিকার মত সুন্দর অথচ মূল্যহীন এই কুমারীকে দানস্বরূপ গ্রহণ ক'রে কি লাভ হবে আমার?

যযাতি দুঃখিতভাবে বলেন—চন্দ্রমণিরও অধিক রূপপ্রভাশালিনী এই কন্যাকে মূল্যহীন কেন মনে করছেন ঋষি? এই ভুবনের যে-কোন দিক্‌পাল নরপতি তাঁর রত্নাগারের বিনিময়ে আমার এই কন্যাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না।

—পিতা!

অনবতমুখিনী মাধবী হঠাৎ মুখ তুলে পিতা যযাতির মুখের দিকে তাকায়। মাধবীর কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক, অসিতনয়নে যেন চকিত বিদ্যুতের জ্বালা, এবং ভীরু ভ্রূলতায় যেন খর গ্রীষ্মবায়ুর আঘাত এসে লেগেছে।

পিতা যযাতির কথার অর্থ এতক্ষণে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পেরেছে কুমারী মাধবী। ঐ

সুন্দরতনু তরুণ ঋষির কাছে তাঁর স্নেহের কন্যাকে সম্প্রদান করছেন না পিতা যযাতি। এক মুষ্টি তাম্রমুদ্রা অথবা যবশস্যকণা হাতে তুলে নিয়ে প্রার্থীকে যেমন অকাতরচিত্তে দান করেন দাতা যযাতি, এই দানও তেমনই দান। এই দানের অনুষ্ঠান যযাতিনন্দিনী মাধবীর পতিলাভের আয়োজন নয় ; ঋষি গালব শুধু দাতা যযাতির কাছ থেকে মূল্যবান একটি বস্তু লাভ করছেন, যে বস্তুর বিনিময়ে রত্ন ও অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

—কিসের জন্য, কার কাছে এবং কি সম্বন্ধে আমাকে দান করছেন পিতা?

প্রশ্ন করতে গিয়ে কুমারী মাধবীর চক্ষু বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। এই তো মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত আগে তার কুমারী-জীবনের সকল আগ্রহ নিয়ে যেন এক পরিণয়োৎসবের আলিম্পিত অঙ্গনভূমিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাধবী, গালব নামে কুবলয়নয়ন ঐ পুরুষপ্রবরের বরতনু বরণ করবার জন্য। কিন্তু বৃথা, সে কল্পনা এক ক্ষণিকা মরীচিকার চিত্র মাত্র।

শান্তস্বরে এবং অবিচলিতভাবে রাজা যযাতি প্রত্যুত্তর দেন—প্রার্থীকে বিমুখ করতে পারি না কন্যা। নৃপতি যযাতির কাছ থেকে দান চেয়েও প্রার্থী ফিরে যাবে দান না পেয়ে, এই অপযশের চেয়ে আমার কাছে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতিও কম ক্লেশকর। রাজা যযাতি যদি সবচেয়ে বড় দানবলে সবচেয়ে বেশি মানবান ও পুণ্যবান হয়ে স্বর্গলোকের রাজর্ষিদের মধ্যে উচ্চাসন লাভ না করতে পারে, তবে যযাতির জীবনে শত ধিক্। সারা জীবন ধ'রে, প্রতি মুহূর্তের নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে লালিত আমার আকাঙ্ক্ষাকে আজ বিফল করতে পারি না তনয়া। গুরুদক্ষিণার দায় হতে মুক্ত হবার জন্য ঋষি গালব আমার কাছে অর্থ প্রার্থনা করেছেন, আমিও অর্থের পরিবর্তে তোমাকে ঋষি গালবের হস্তে প্রদান ক'রে দায়মুক্ত হতে ও আমার দানগৌরব রক্ষা করতে চাই। বৈভবহীন এই যযাতিকে বাৎসল্যহীন পিতা বলে মনে করো না কন্যা। এই পিতৃহৃদয়কে কুলিশবৎ কঠোর ক'রে, আমার সকল মমতার মণিস্বরূপিণী তোমাকে আজ প্রার্থীর হস্তে পণ্যবস্তুর মত প্রদান করতে হচ্ছে। কল্পনা করতে পার কন্যা, আমার এই ত্যাগের চেয়ে বড় ত্যাগ, আমার এই দানের চেয়ে বেশি দুঃসাধ্য দান আর কি হতে পারে?

মাথা হেঁট করে মাধবী। বাষ্পায়িত চক্ষু আবার শুষ্ক হয়ে ওঠে। আর কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছা হয় না। পিতা যযাতির হৃদয় কুলিশ না হোক, কিন্তু তাঁর সংকল্প যে সত্যই কুলিশবৎ কঠোর।

অন্য কথা ভাবছিল মাধবী। সূর্যালোকস্নাত নব দেবদারুর মত যৌবনসিঞ্চিত দেহশোভা নিয়ে যে ঋষির মূর্তি নিকটে দাঁড়িয়ে আছে, তার সংকল্পও কি কুলিশবৎ কঠোর? ঐ বিস্তৃত বক্ষঃপটের অন্তরালে কি অনুরাগ নেই? ঐ ফুল্ল কুবলয়সদৃশ চক্ষু দুটি কি অকারণে নীলিম হয়ে রয়েছে? যযাতি-তনয়া মাধবীর প্রণামের অর্থ বুঝতে পারবে না, সে কি এমনই অবুঝ? যে নারীকে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত সুন্দর মনে হয়েছে, তাকে কি সত্যই মূল্যহীন বলে মনে করতে পারে এই মনসিজগঞ্জন সুন্দর ঋষি?

কিন্তু, নিজেরই মনের মোহে বৃথা এক মরীচিকার চিত্র দেখছে মাধবী। এবং পরক্ষণেই সে চিত্র যেন এক ধূলিবাত্যার তাড়নায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, যখন কথা বললেন ঋষি গালব।

—চন্দ্রমণিসমা রূপশালিনী নারী আমি চাই না নৃপতি যযাতি, আমি চাই চন্দ্রমণি। আমি গুরুদক্ষিণার দায় হতে মুক্ত হতে চাই, তার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ চাই। এ ছাড়া অন্য কোন দানে আমি তৃপ্ত হতে পারব না নৃপতি যযাতি। যদি আপনার কন্যা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে আপনার দানের মর্যাদা রক্ষা করবে, এই ভুবনের যে কোন দিক্‌পাল নরপতির কাছ থেকে আমার আকাঙ্ক্ষিত গুরুদক্ষিণীর সামগ্রী অথবা মূল্য সংগ্রহের প্রযত্নে সহায়িকা হবে, তবেই আমি আপনার কন্যাকে সমুচিত মূল্যযুক্ত দান বলে গ্রহণ করতে পারি, নচেৎ পারি না।

—ঋষিবর!

মৃদুভাষিণী কুমারী মাধবীর দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে চমকিত ঋষি গালব ক্ষণিকের মত অপ্রস্তুত হয়ে মাধবীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মুখ তুলে ঋষি গালবের দিকে তাকিয়ে মাধবী বলে—আপনার গুরুদক্ষিণার সামগ্রী অথবা মূল্য সংগ্রহের প্রযত্নে সহায়িকা হব আমি, প্রতিশ্রুতি দিলাম ঋষি।

গালব বলেন—শুনে সুখী হলাম কুমারী।

কৃতার্থচিত্তে রাজা যযাতির দিকে তাকিয়ে গালব বলেন—আমি আপনার এই কন্যাকে আপনার দানস্বরূপ গ্রহণ করলাম রাজা যযাতি।

পিতা যযাতিকে প্রণাম করে মাধবী। তারপর বিদায় গ্রহণ ক'রে, কুণ্ঠাহীন ও স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে সভাগৃহ ছেড়ে ঋষি গালবের সঙ্গিনী হয়ে চলে যায়।

কাশীশ্বর দিবোদাসের প্রাসাদ। স্ফটিক শিলায় নির্মিত চূড়া দূর থেকে পথিকের নয়নে সূর্যাংশুগঠিত দণ্ডের মত প্রতিভাত হয়। মরকতে মণ্ডিত স্তম্ভ ও প্রবলে খচিত সোপান। রত্নাঢ্য রাজা দিবোদাস কুবেরের ঈর্ষা সমুৎপন্ন ক'রে রাজসিক ঐশ্বর্যে সমাসীন হয়ে আছেন।

দিবোদাসের স্ফটিকশিলার প্রাসাদ হতে কিঞ্চিৎ দূরে সীধুগন্ধ বকুলে আকীর্ণ একটি উদ্যান, মাঝে মাঝে নীলাঙ্গী অতসীর কুঞ্জ। তারই মধ্যে প্রিয়ঙ্গুলতিকায় মণ্ডিত এক অতিথিবাটিকায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন ঋষি গালব ও তাঁর সাথে যযাতিনন্দিনী মাধবী।

গালব ও মাধবী, একজনের হৃদয় শুধু অর্থের প্রার্থনা এবং আর একজনের জীবন অর্থসংগ্রহে সহায়তার প্রতিশ্রুতি মাত্র। এ ছাড়া দু'জনের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই।

এই মাত্র পরস্পরের বন্ধন। তবু যখন গালব ও মাধবী, এক তরুণ ঋষি আর এক সুযৌবনা কুমারী, অতিথিবাটিকার অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন উদ্যানের বকুলসৌরভ অকস্মাৎ মদিরতর হয়ে ওঠে ; প্রিয়ঙ্গুলতিকা হঠাৎ আন্দোলিত এবং অলিচুম্বিত অতসী হঠাৎ শিহরিত হয়। ভুল করে উদ্যানের প্রণয়-প্রগল্‌ভ লতা কিশলয় ও পুষ্পের দল, কিন্তু ভুল করে না গালব ও মাধবী।

গালব বলেন—শোন যযাতিতনয়া।

মাধবী—বলুন।

গালব—আমার গুরুদক্ষিণার জন্য প্রয়োজন সেই শ্যামৈককর্ণ শুক্লাশ্ব এই ভুবনের কোথায় কার কাছে কত সংখ্যক আছে, তার সন্ধান পেয়েছি।

মাধবী—কোথায় আছে?

গালব—এই কাশীশ্বর দিবোদাসের ভবনে এইরূপ দুই শত শুক্লাশ্ব আছে। অথচ আমার গুরুদক্ষিণার জন্য প্রয়োজন এইরূপ অষ্টশত শুক্লাশ্ব।

মাধবী—আর ছয় শত?

গালব—দুই শত আছে অযোধ্যাধিপতি হর্যশ্বের ভবনে।

মাধবী—আর চারি শত?

গালব—ভোজরাজ উশীনরের ভবনে দুই শত আছে।

মাধবী—আর দুই শত?

গালব—ত্রিভুবনে কোথাও নেই। দুঃসংবাদ পেয়েছি, বিতস্তার সলিলে নিমজ্জিত হয়েছে আর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এই দুর্লভ শুক্লাশ্বের শেষ যূথ। এইবার তোমার কর্তব্য অনুমান ক'রে নাও কুমারী।

মাধবী ব্যথিতভাবে তাকায়—অনুমান করতে পারছি না ঋষি।

গালব—নৃপতি দিবোদাস হর্যশ্ব আর উশীনরের তুষ্টি সম্পাদন ক'রে আমার গুরুদক্ষিণার সামগ্রীস্বরূপ এই ছয় শত শুক্লাশ্ব তুমি উপহার-স্বরূপ অর্জন কর।

মাধবী—অর্জন করব ঋষি, আপনার নির্দেশের অমান্য করব না। কিন্তু তবুও যে আপনার গুরুদক্ষিণার পরিমাণ পূর্ণ হয় না ঋষি। এই খণ্ডিত পরিমাণের দক্ষিণায় কেমন ক'রে তুষ্ট হবেন আপনার গুরু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র?

গালব—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রেরও তুষ্টি সম্পাদন ক'রে দক্ষিণার এই অদত্ত অংশের মূল্য পূর্ণ ক'রে দেবার দায় তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে, এবং পালন করতেও হবে মাধবী।

মাধবী—বুঝতে পেরেছি ঋষি।

বুঝতে পেরেছে যযাতিদুহিতা মাধবী, পর পর চারিটি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখে গিয়ে ভিক্ষার্থিনীর মত দাঁড়াতে হবে। বিশ্বাস করে মাধবী, বিফল হবে না সেই ভিক্ষার্থনা। তার অশ্রুসিক্ত চক্ষুর আবেদনের দিকে তাকিয়ে গালবানুরাগিনী যযাতিতনয়ার হৃদয়ের অনুরোধ কি দেখতে পাবেন না রাজা দিবোদাস হর্যশ্ব ও উশীনর, এবং রাজর্ষি বিশ্বামিত্র? বুঝতে পারবেন না কি পৃথিবীর এই তিন ঐশ্বর্যবান ও এক পুণ্যবান মহানুভব, পৃথিবীর এক দীনা রত্নলেশবিহীনা প্রেমিকা তার বাঞ্ছিতের মুক্তিপণ প্রার্থনা করবার জন্য তাঁদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে? জাগবে না কি অনুকম্পা, আর্দ্র হবে না কি চক্ষু?

সংশয়াপন্ন স্বরে পুনরায় প্রশ্ন করেন গালব—সত্যই কি বুঝতে পেরেছে যযাতিতনয়া?

মাধবী—কি?

গালব—পৃথিবীর এই তিন ঐশ্বর্যবান ও এক পুণ্যবান যদি তুষ্ট হন, তবেই তাঁরা তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

মাধবী—আমি বুঝেছি ঋষি ; তাঁরা আমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে তুষ্ট হবেন।

—বুঝতে পারনি যযাতিতনয়া। অপ্রসন্ন স্বরে প্রতিবাদ করেন গালব, এবং মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হন। কি-এক মিথ্যা আশ্বাসে ও বিশ্বাসে যেন মুগ্ধ হয়ে এই লতাবাটিকার ছায়াচ্ছন্ন শান্তির মধ্যে শান্ত হয়ে রয়েছে রূপবতী এই কুমারী। ভুলে গিয়েছে মাধবী, পিতা যযাতির নির্দেশে এক প্রতিশ্রুতির কাছে বিক্রীত হয়ে গিয়েছে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত যযাতিতনয়ার যৌবনকমনীয় দেহ।

লক্ষ্য করেন গালব, জীবনের একমাত্র প্রতিশ্রুত কর্তব্যের জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ না ক'রে মাধবী যেন দিন দিন আরও অন্যমনা ও উদাসীনা হয়ে উঠছে। কখনও বা লক্ষ্য করেছেন, কুঞ্জের অন্তরালে শীতভীরু মল্লিকার মত যেন মুখ লুকিয়ে বসে থাকে মাধবী। সুপ্তির মাঝখানে হঠাৎ জাগরিত হয়ে অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করেছেন গালব, তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে কে যেন তার পরাগবাসিত চেলাঞ্চল আন্দোলিত ক'রে এতক্ষণ তাঁকে ব্যজন করছিল, হঠাৎ অন্তর্হিত হলো। উদ্যানের তৃণভূমিতে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাকাশের চন্দ্রের দিকে যখন তাকিয়েছেন গালব, তখনও অনুভব করেছেন, যযাতিনন্দিনী মাধবী তার অসিত নয়নের নিবিড়দৃষ্টি তাঁরই দিকে নিবদ্ধ ক'রে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভীত বিরক্ত এবং আরও অস্থির হয়ে উঠেছেন গালব। কি চায় মাধবী? কৈতবিনী এই নারী কি বিশ্বামিত্রাশিষ্য গালবকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করতে চায়? পিতা যযাতির দানগৌরব বিনষ্ট করতে চায়? নিজ মুখে উচ্চারিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চায়? নইলে, নিঃসম্পর্কিতা এই নারী ঋষি গালবের সঙ্গে প্রিয়াসুলভ লীলাকলাপের প্রয়াস করে কেন?

গালব বলেন—আমি আর অপেক্ষায় থাকতে পারি না মাধবী। প্রতিশ্রুতি পালন কর কুমারী। তারপর তুমি দায়মুক্ত হয়ে তোমার পিতার কাছে ফিরে যাও, আমিও গুরুদক্ষিণা দান ক'রে আমার গৃহে ফিরে যাই।

মাধবী—কেন গালব?

চমকে উঠলেন গালব। আর সন্দেহ নেই, সকল কুণ্ঠা ও লজ্জা বর্জন ক'রে যযাতিকন্যা আজ প্রণয়াভিলাষিণী প্রিয়ার মতই মধুর সম্ভাষণে গালবকে ডাকছে।

গালব বলেন—ভুল করো না মাধবী। অঙ্গীকার পালন করা ছাড়া আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করো না। নারীর প্রেমের চেয়ে লোকসম্মান আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।

মাধবী—এমন নির্মম কথা বলো না গালব। তোমার প্রেমিকা মাধবীর দিকে একটি মুহূর্তের জন্যও মুগ্ধ হয়ে তাকালে তোমার সম্মান বিনষ্ট হবে না।

গালব—তা হয় না মাধবী।

মাধবী—তোমার শুভার্থিনী ও কল্যাণকামিকা, তোমার চরণের স্পর্শের জন্য প্রণামনমিতা এই মাধবীর জন্য একটুও মমতা আর একটুও লোভ হয় না গালব?

গালব—ক্ষমা কর কুমারী মাধবী, এমন লোভে আমার প্রয়োজন নেই।

পুরুষস্পর্শে আহত বীণাতন্ত্রীর মত বেজে ওঠে মাধবীর কণ্ঠস্বর—দুঃসাহসী ঋষি, সন্ধ্যাকাশের ঐ সুন্দর শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বল দেখি, কোন প্রয়োজন নেই?

গালব—প্রয়োজন নেই যযাতিনন্দিনী মাধবী।

শান্ত স্বরে মাধবী বলে—তবে আজ্ঞা করুন ঋষি।

গালব—আর অকারণ এই লতাকুঞ্জের জ্যোৎস্নায় নিভৃতে কালক্ষেপ না ক'রে নৃপতি দিবোদাসের সন্নিধানে গমন কর যযাতিতনয়া। তিনি তোমারই প্রতীক্ষায় কালযাপন করছেন। আমি যথাবিহিত সংস্কারে ও মন্ত্রবচনে তাঁর কাছে তোমাকে প্রদান ক'রে এসেছি।

মাধবীর দুই নয়নে দুরন্ত বিস্ময় অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।—আমাকে প্রদান করেছেন?

গালব—হ্যাঁ, প্রদান করবার অধিকার আমার আছে। তোমার পিতা আমাকে সেই অধিকার দিয়েছেন।

মাধবী—এইভাবেই কি একে একে আরও দুই ঐশ্বর্যবান নৃপতি ও এক পুণ্যবান রাজর্ষির কাছে আমাকে প্রদান করবেন আপনি?

গালব—হ্যাঁ কুমারী।

মাধবী—আমি কি বিক্রেয়া পণ্যা এবং সত্তাবিহীনা এক যৌবনা সামগ্রী?

গালব—তুমি প্রতিশ্রুতি।

যন্ত্রণাক্ত ধিক্কারধ্বনির মত সুতীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে মাধবী—হীনা বারযোষার মত এক হতে অন্য জনের, বহু হতে বহুতরে, এক একজন প্রবলকাম রাজা ও রাজর্ষির মদোৎসবের নায়িকা হবার প্রতিশ্রুতি আমি নই ঋষি। নারীধর্মাপহ আচরণে আমাকে কখনই প্রবৃত্ত করতে পারেন না আপনি। অবিধিবশ হবার কোন অধিকার আপনার নেই।

গালব—আমি একান্তই বিধিবশ, এবং তোমাকে এক প্রথানুকূল জীবনের আনন্দ বরণ করবার জন্য প্রস্তুত ও প্রবৃত্ত হতে বলেছি।

বিস্মিত হয় মাধবী—প্রথানুকূল জীবন?

গালব—হ্যাঁ কুমারী।

মাধবী—তোমার প্রদত্তা এক কুমারী নারীকে কোন্ অভীষ্টলাভের জন্য গ্রহণ করবেন পৃথিবীর তিন ঐশ্বর্যবান ও এক পুণ্যবান?

গালব—বিবাহের জন্য।

মাধবী—এ কেমন বিবাহ?

গালব—অস্থেয় বিবাহ। এই বিবাহ এক নর ও এক নারীর জীবনে অচিরমিলনের অঙ্গীকার, যে অঙ্গীকার ব্রতাচারের মতই উদ্‌যাপিত হয়ে নির্দিষ্ট কালের অন্তে শেষ হয়ে যায়। পরিসীম পরিণয়ের এই রীতিও জগতে প্রচলিত আছে যযাতিতনয়া। যথানির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হলে পরিণীতা নারী পুনরায় কন্যাকাদশা লাভ ক'রে সমাজে কুমারীরূপে স্বীকৃতা ও পরিচিতা হয়ে থাকে।

মাধবী—কবে সমাপ্ত হবে আমার এই অস্থেয় বিবাহের জীবন?

গালব—পরিণেতাকে যেদিন তুমি এক পুত্রসন্তান উপহার দিতে পারবে, সেইদিনই পত্নীত্বের সকল দায় হতে মুক্ত হয়ে যাবে তুমি।

মাধবীর ওষ্ঠপ্রান্তে যেন এক মূঢ় বিস্ময়ের হাসি বেদনায় পুড়তে থাকে।—সুন্দর এক বৈধ ব্যভিচারের কথা বলছেন ঋষি!

গালব—আমার বক্তব্য বলেছি, আর কিছু বলবার নেই। এইবার তুমি তোমার কর্তব্য বুঝে দেখ কুমারী।

শান্তভাবে দুই চক্ষুর উদ্গত অশ্রুবারি হস্তাবলেপে মোচন ক'রে মাধবী বলে—বুঝেছি ঋষি, আমার জীবনের এক একটি দশ মাস ও দশ দিনের যাতনাসঞ্জাত পুষ্প আমারই বক্ষ হতে ছিন্ন ক'রে নিয়ে, আমার বক্ষের উচ্ছ্বসিত পীযূষকে অধন্য ক'রে দিয়ে, পৃথিবীর তিন ঐশ্বর্যবান ও এক পুণ্যবান আমাকে আমারই শূন্য সংসারের কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দেবেন।

গালব—হ্যাঁ কুমারী।

মাধবী—তারপর?

গালব—তারপর তুমি মুক্ত।

মাধবী—আর তুমি?

গালব—আমিও গুরুঋণ হতে মুক্ত হব।

মাধবী—তারপর?

ক্রূরবায়ুবিমর্দিতা ব্রততী যেন তার আশাভঙ্গে ভগ্ন দেহভারের বেদনা সহ্য ক'রে তবু এক আশ্বাসের স্বপ্ন দেখতে চাইছে। দুই হাতে সিক্ত চক্ষু আবৃত ক'রে ব্যাকুল স্বরে মাধবী প্রশ্ন করে।—বল ঋষি, তারপর কি হবে?

নীরব হয় মাধবী। জ্যোৎস্নালিপ্ত লতাকুঞ্জও যেন হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

মাধবী আবার বলে—বল ঋষি, যেদিন স্বাধীন হবে আমার হৃদয় ও আমার হাতের বরমাল্য, সেদিন কোথায় থাকবে তুমি?

মাধবীর প্রশ্নের কোন উত্তর লতাকুঞ্জের নিভৃতের বক্ষে আর ধ্বনিত হয় না। অনেকক্ষণের স্তব্ধতার পর, যেন হঠাৎ মূর্ছা হতে জেগে ওঠে মাধবী, চমকে চোখ মেলে তাকায়। দেখতে পায় মাধবী, কেউ নেই, তার নিকটে দাঁড়িয়ে এই ব্যাকুল প্রশ্ন কেউ শুনছে না। চলে গিয়েছেন গালব। দেখা যায়, দূরের লতাবাটিকার এক কক্ষের বাতায়নের কাছে সন্ধ্যাপ্রদীপের নিকটে ঋষি গালবের মূর্তি শান্ত আনন্দের ছায়ার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নৃপতি দিবোদাসের স্ফটিকভবনের দিকে তাকায় মাধবী।

মধ্য রাত্রি, নিশাবসানের এখনও অনেক বাকি। উদ্যানের কোকিল কূজন বন্ধ করেছে। অতিথিবাটিকার নিভৃতে একাকী বসেছিলেন গালব ; গন্ধতৈলের প্রদীপে আলোকশিখার চাঞ্চল্য ছাড়া আর কোন চাঞ্চল্য কোথাও ছিল না। প্রতিশ্রুতির নারী মাধবী রাজা দিবোদাসের স্ফটিকশিলার প্রাসাদে চলে গিয়েছে।

অকস্মাৎ রত্ননূপুরের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে অতিথিবাটিকার নিভৃত। দেখে বিস্মিত হন গালব, কুমারী মাধবী এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মূর্তি নয়, যেন অমরেশ্বর ইন্দ্রের অমরাপুরীর শতরত্নভূষিতা এক প্রমদার মূর্তি।

অট্টহাস্যনাদে বিস্মিত গালবকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে মাধবী প্রশ্ন করে—চিনতে পারেন কি ঋষি?

গালব—চিনেছি।

মাধবী—পুষ্পাভরণে ভূষিতা সেই মাধবীকে এখন এই রত্নভূষণে বেশি সুন্দর মনে হয় কি?

গালব—না।

মাধবী—বেশি মূল্যবতী মনে হয় কি?

গালব—মনে হয়।

মাধবী—আপনারই পায়ে প্রণামাবনতা সেই মাধবীকে এখন আরও বেশি সম্মানিনী বলে মনে হয় কি ঋষি?

দৃষ্টি নত করেন নিরুত্তর গালব। মাধবী যেন তার নারীজীবনের এক সুগভীর বেদনাকে বিদ্রূপে ছিন্নভিন্ন করবার জন্য আরও তীক্ষ্ণ অট্টহাস্যে বলে ওঠে—চোখ তুলে তাকান ঋষি, বলুন দেখি, এই নারীকে দেখে লোভ হয় কি না?

তবু নিরুত্তর থাকেন ঋষি গালব। মাধবী বলে—আপনার লোভ না হোক, রাজা দিবোদাস লুব্ধ হয়েছেন। তিনি আজ আমাকে তাঁর রাজ্যশ্রীরূপে গ্রহণ করবেন। এই রত্নভূষণ তাঁরই উপহার ; আজ আমার আশ্রয় হবে রাজা দিবোদাসের বৈদূর্যখচিত শয়নপর্যঙ্ক।

যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে চমকে উঠলেন ঋষি গালব এবং মাধবীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

অট্টহাসিনী প্রগল্‌ভা মাধবী হঠাৎ বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর মত যন্ত্রণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, উদ্‌গত অশ্রুধারা নিরোধের জন্য দু'হাতে চক্ষু আবরিত করে। পরমুহূর্তে দুর্বলা লতিকার মত ঋষি গালবের পায়ে লুটিয়ে পড়ে।—একবার লুব্ধ হও ঋষি, মুগ্ধ হও নিমেষের মত। পিতা যযাতির দান এই কুমারীর অনুরাগ প্রতিদানে সম্মানিত কর ঋষি সুকুমার। এখনও সময় আছে, কথা দাও তুমি, তাহ'লে এই মুহূর্তে এই রাজ্যশ্রীর রত্নাভরণ দিবোদাসের সম্মুখে অবহেলাভরে নিক্ষেপ ক'রে চলে আসি।

গালব—তারপর?

মাধবী—তারপর এই ভুবনে শুধু আমরা দু'জন।

গালব—তা হয় না মাধবী। জ্ঞানী গালব তার প্রখ্যাতি ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। গুরুদক্ষিণাদানে অপারগ গালব জীবনব্যাপী অপবাদ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। বেঁচে থাকলেও সে অপবাদের জ্বালা যযাতিকন্যার বিম্বাধরের চুম্বনে শান্ত হবে না।

ধীরে ধীরে গালবের পদপ্রান্ত হতে লুণ্ঠিত দেহভার তুলে উঠে দাঁড়ায় মাধবী। শান্ত দৃষ্টি তুলে তাকায়। অবসন্ন দীর্ঘশ্বাসের ধ্বনির মত ক্লান্ত স্বরে বলে—ঠিকই বলেছেন ঋষি। আপনার জীবনের শান্তি ও সম্মান নষ্ট করতে পারি না। দীয়তের সুখের জন্য প্রণয়িনী নারী মৃত্যুবরণও করে। দুর্ভাগিনী যযাতিনন্দিনী না হয় কয়েকটি রাত্রির মত মৃত্যুবরণ করবে। আপনি প্রসন্ন হোন ঋষি।

অতিক্রান্ত হয়েছে বৎসরের পর বৎসর। আনন্দহীন বনবাসব্রতের মত অস্থেয় বিবাহের বন্ধন বরণ ক'রে তিন ঐশ্বর্যবান ও এক পুণ্যবানের অভিলাষের সহচরী হয়েছে মাধবী। তিন রাজা ও এক রাজর্ষির সংসারে তার সুন্দর তনুর স্নেহনির্যাসের মত এক একটি পুত্রসন্তান উপহার দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছে মাধবী।

গুরুঋণ হতে মুক্ত হয়ে সসম্মানে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন গালব। জ্ঞানী গালবের সুকীর্তিকথা দেশে দেশে প্রচারিত হয়ে গিয়েছে।

দায়মুক্ত হয়েছেন যযাতি। জ্ঞানী গালবের মত ঋষির প্রার্থনা যিনি পূর্ণ করতে পেরেছেন, তাঁর দানের গৌরববার্তা স্বর্লোকের রাজর্ষিসমাজেও পৌঁছে গিয়েছে।

আর মাধবী? বৈভবহীন রাজা যযাতির আলয়ে ফিরে এসেছে।

ব্যস্ হয়ে উঠেছেন রাজা যযাতি। আর বিলম্ব করতে পারেন না। দানিশ্রেষ্ঠ নামে সর্বখ্যাত যযাতি স্বর্লোকে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

রাজা যযাতির বৈভবহীন এই মর্ত্য-প্রাসাদের জীবনে একটি মাত্র কর্তব্য যা বাকি আছে, তাই পালন করবার জন্য আয়োজন করলেন যযাতি, স্বর্গধামে যাবার আগে। কন্যা মাধবীকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদানের জন্য স্বয়ংবরসভা আহ্বান করলেন।

মাধবীর স্বয়ংবরসভা! সংবাদ শুনে ও আয়োজন দেখে মাধবী তার কক্ষের নিভৃতে অশ্রুসিক্ত চক্ষু মুছতে গিয়েও হাস্য সংবরণ করতে পারে না। কোথায় তার স্বয়ং এবং কোথায়ই বা তার বর? যার জীবনের কোন ইচ্ছার সম্মান কেউ দিল না, যার কামনার বরমাল্য অবাধ অবহেলায় তুচ্ছ ক'রে চলে গিয়েছে জীবনের একমাত্র বাঞ্ছিত, তার জন্য প্রয়োজন স্বয়ংবরসভা নয়, প্রয়োজন বধ্যমঞ্চ।

মনে পড়ে মাধবীর, ঋণমুক্ত হয়ে গালব তাঁর গৃহাশ্রমে চলে গিয়েছেন। সে ঋষির জীবনে সম্মান ও শান্তি এসেছে। ভালই হয়েছে। কিন্তু একবারও কি সেই কুবলয়নয়ন তরুণ জ্ঞানিবরের মনে এই প্রশ্ন জাগে, পৃথিবীর আর কারও কাছে তাঁর কোন ঋণ রয়ে গেল কি না?

নৃপতির স্ফটিকপ্রাসাদের এবং রাজর্ষির আশ্রমভবনের এক একটি নিশীথের ঘটনা মনে পড়ে মাধবীর। এই স্মৃতি সহ্য করতে পারে না মাধবী ; গৃহের নিভৃত হতে ছুটে এসে প্রাসাদের বাহিরের উপবনবীথিকার কাছে দাঁড়ায়। চোখে পড়ে, তারই স্বহস্তে রোপিত সেই শিশু রক্তাশোক কত বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু অযত্নে শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বারিপূর্ণ ভৃঙ্গারক নিয়ে এসে রক্তাশোকমূলে জলসেক দান করে মাধবী।

তবু বুঝতে পারে মাধবী, তার নয়ন-ভৃঙ্গারকের বারিধারা থামছে না। কা'কে প্রশ্ন করবে মাধবী, যযাতিনন্দিনী তার প্রেমাস্পদের শান্তি আর সম্মান রক্ষার মোহে যে দুঃসহ ব্রত পালন করেছে, তার কি কোন মূল্য নেই? এই রক্তাশোকের মুখে যে ভাষা নেই, নইলে জিজ্ঞাসা করা যেত, সত্যই কি ঘৃণ্য হয়ে গিয়েছে মাধবী, স্ফটিকপ্রাসাদের আর আশ্রমভবনের কামনার কক্ষে ধনাঢ্য রাজা ও রাজর্ষির আলিঙ্গনে তার দেহ উপঢৌকন দিয়েছে বলে? নইলে মাধবীর এই নয়নের আবেদন বিস্মৃত হয়ে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত চিত্তে দিনযাপন করছে মাধবীর প্রেমের আস্পদ সেই তরুণ ঋষি গালব?

জগৎ ঘৃণা করুক মাধবীকে, কিন্তু জগতের মধ্যে একজন তো ঘৃণা করতে পারে না। কারণ, আর কেউ না জানুক, সে-ই তো জানে, কেন ও কিসের জন্য অদ্ভুত এক অস্থেয় বিবাহের রীতি বরণ ক'রে মাধবী তার রূপ ও যৌবনকে রাজা ও রাজর্ষির আসঙ্গবাসনার কাছে নিবেদন করতে বাধ্য হয়েছে। যযাতিকন্যার সেই ভয়ংকর আত্মাহুতির বিনিময়ে ঋণমুক্ত হয়েছে যে জ্ঞানী গালব, সেই জ্ঞানী কি আজ যযাতিকন্যাকেই ঘৃণা ক'রে দূরে সরে থাকবে? মাধবীর স্বয়ংবরসভার সংবাদ কি সে এখনও শুনতে পায়নি?

কোথায় তুমি গালব। আজ তুমি মুক্ত, আমিও মুক্ত। এস তোমার কুবলয়সদৃশ নীলনয়নের দ্যুতি নিয়ে ; তোমারই জন্য সমর্পিত তনুমনপ্রাণ, তোমারই জন্য পণ্যায়িতা হয়ে অনেক বেদনা সহ্য করেছে যার যৌবন, সেই যযাতিকন্যা মাধবীর স্বাধীন হৃদয়ের বরমাল্য কণ্ঠে গ্রহণ ক'রে তাকে তোমার জীবনসহচরী ক'রে নিয়ে চলে যাও। তুমি তো এখন ঋণমুক্ত, শান্ত সম্মানিত ও সুখী, তবে এখন এই বৈভবহীন প্রাসাদ থেকে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত মূল্যহীনাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে তোমার প্রেমের স্পর্শে অমূল্য ক'রে তুলতে বাধা কই তোমার?

উপবনবীথিকার কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় মাধবী, প্রাসাদের দূর দক্ষিণে কলস্বরা এক স্রোতস্বতীর কূলে শ্যামদূর্বাদলে আকীর্ণ প্রান্তরে স্বয়ংবরসভার হর্ষ জেগে উঠেছে। চন্দ্রাতপের বর্ণাশোভা দেখা যায়। শোনা যায়, রূপবতী যযাতিকন্যার পাণিগ্রহণের আশায় সমাগত বহু প্রিয়দর্শন রাজপুত্র ও বীরোত্তমের বিশ্রান্ত অশ্বের হ্রেষাধ্বনি।

অপরাহ্ণের রক্তাভ সূর্য অস্তাচলের পথে ধাবমান। বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মাধবীর অসিতনয়নশ্রী। তবু যেন এক ক্ষীণাশার গুঞ্জরণ ক্লান্ত নূপুরের মত মাধবীর মনের নেপথ্যে বাজে—সে কি আজও না এসে থাকতে পারবে? যযাতিকন্যার সেই প্রণমিত আত্মনিবেদনের কথা কি সে ভুলে গিয়েছে? অঋণী মানী ও জ্ঞানী গালব কি অকৃতজ্ঞ হতে পারে?

কিন্তু আর এই উপবনবীথিকার নিভৃতে রক্তাশোকের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবনা করবার সময় ছিল না। পিতা যযাতি এলে আহ্বান করলেন এবং স্বচ্ছন্দ পদক্লেশ ধংসের হয়ে রাজা যযাতির সঙ্গে স্বয়ংবর সভায় এসে দাঁড়াল মাধবী।

বরমাল্য হাতে তুলে নিয়ে সভার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অসিতক্ষণা মাধবীর দৃষ্টি কিছুক্ষণের মত কা'কে যেন অন্বেষণ করে। কিন্তু কুবলনয়ন কোন স্নিগ্ধ দর্শন তরুণ ঋষির মূর্তি কোথাও দেখা যায় না। নবীনকুসুমে গ্রথিত বরমাল্য কঠোরভাবে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে পাণিপ্রার্থী রাজপুত্রদের পংক্তি পরিক্রম করে মাধবী। কোন দিকে এবং কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। শুধু এগিয়ে যেতে থাকে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত সুচারুদেহা এক যৌবনবতীর অন্যমনা ও উদাসিনী মূর্তি। রাজা যযাতি কন্যার অনুসরণ ক'রে চলতে থাকেন। দুন্দুভির উল্লাসে বিশ্বায়ু প্রকম্পিত হয়।

অগ্রসর হতে হতে সভার শেষপ্রান্তে গিয়ে একবার ক্ষণিকের মত দাঁড়াল মাধবী। কারণ, আর এগিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না। কারণ, তার পরেই স্রোতস্বতীর সুতরল জলরেখা, ওপারে তৃণপ্রান্তর এবং তার পর বনভূমির আরম্ভ।

সুহরিৎ বনশীর্ষে অস্তোন্মুখ সূর্যের লোহিতাভ বেদনার ছায়া পড়েছে। অকস্মাৎ, যেন দুই হস্তের চকিতক্ষিপ্ত আগ্রহের একটি কঠোর টানে বরমাল্য ছিন্ন ক'রে ভূতলে নিক্ষেপ করে মাধবী। মত্তা পলাতকার মত ত্বরিত পদে ছুটে চলে যায়, এবং স্বয়ংবরসভার শেষ প্রান্তও পার হয়ে স্রোতস্বতীর কূলে এসে দাঁড়ায়।

যযাতি চিৎকার ক'রে ডাকেন—কোথায় যাও মাধবী?

মাধবী—অরণ্যের ক্রোড়ে।

যযাতি—রাজপ্রাসাদের মেয়ের অরণ্যে কি প্রয়োজন?

মাধবী—আমাকে ক্ষমা কর পিতা, ক্ষমা করুক তোমার রাজপ্রাসাদ আর রাজ্যজনপদ। অরণ্যই আমার যথার্থ আশ্রয়।

স্রোতস্বতীর ক্ষীণ জলরেখা পার হয়ে শরাহত হরিণীর ত্রস্তগতি ছায়ার মত, যেন পিছনের যত করাল দান-মান-পুণ্যের ভয়ে অরণ্যের দিকে চলে গেল মাধবী। সন্ধ্যা নামে, অন্ধকারে মাধবীকে আর দেখা যায় না।

যযাতির প্রাসাদ শূন্য। দাতা যযাতি স্বর্লোকে গিয়ে পুণ্যশীল রাজর্ষি সমাজে উচ্চাসন অধিকার করেছেন। আর, বনবাসিনী হয়েছে পুণ্যহীনা মাধবী।

এই বনে দাবানল নেই। মাসান্তের পর মাস, তারপর বৎসরান্ত, বৈশাখী রক্ত-পুনর্নবার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বৎসর দেখা দেয়। কিন্তু বরবর্ণিনী যেই যযাতিনন্দিনী মাধবীর কর্ণ ও কবরী নবকুসুমের স্তবকে আর শোভিত হয় না। সেই স্নিগ্ধ চিকুরনিকুর আজ কঠিন জটাভার, কণ্ঠাভরণ শুধু একটি রুদ্রাক্ষের মালিকা। উপবাস বল্কলবাস এবং অধোশয্যা, রূপযৌবনের সকল অভিমান ক্লিষ্ট ক'রে স্নান ব্রত পূজা ও তপস্যায় দাবানলহীন এই বনের দিনযামিনীর প্রতি মুহূর্ত উদ্‌যাপন করেছে মাধবী এবং তার অন্তরের নিভৃতে এক পরম শান্ত সত্তার সাক্ষাৎ লাভ করেছে। রাজপ্রাসাদের পুণ্যতত্ত্ব কোনদিন বুঝে উঠতে পারেনি যে মাধবী, সেই মাধবী আজ তার বনবাসিনী তপস্বিনীর জীবনে উপলব্ধি করেছে—কামনাহীন চিত্তের এই আনন্দই তো পুণ্য। অতীতের সকল ঘটনার কথা আজও মনে পড়ে ; আজও বিস্মৃত হয়নি

মাধবী সেই পরিচিত মুখগুলি—সুন্দর ও অসুন্দর, রূঢ় ও কোমল। সেই আঘাত ও অপমানের সকল ইতিহাস আজও স্মরণ করতে পারা যায়। কিন্তু স্মরণ করলেও মাধবীর মনে অভিমানের কোন সাড়া জাগে না। সিদ্ধসাধিকা মাধবীর ভাবনা আজ বেদনাহীন হয়েছে, কারণ ক্ষয় হয়ে গিয়েছে সকল কামনা।

এই বনে দাবানল নেই, মাধবীর মনেও কোন মোহানল নেই। বিশাল শাল শাল্মলী মুচুকুন্দ ও কোবিদারের ছায়াঘন গহনে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নীরাজন-দীপিকার একটি পুণ্যশিখার মত ভাস্বর হয়ে উঠেছে তপস্বিনী মাধবীর জীবন।

সেদিন দিবাবসানের পর বনসরসীর জলে স্নান সমাপন ক'রে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজার জন্য যখন প্রস্তুত হয় মাধবী, তখন দেখতে পায়, উর্ধ্বাকাশ হতে যেন একটি নক্ষত্র স্খলিত হয়ে ভূপতিত হলো। দেখে দুঃখিত হয় মাধবী। কে জানে, কোন্ মহাজনের পুণ্য ক্ষয় হয়েছে, তারই লক্ষণ। পরক্ষণে শুনতে পায় মাধবী, দূর জনপদে অদ্ভুত এক কোলাহল জেগেছে।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবতে থাকে মাধবী। তারপরেই বনাধিষ্ঠাত্রীর পূজা সমাপন করে এবং ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ বনপথ ধ'রে অগ্রসর হয়ে বনের উপান্তে এসে দাঁড়ায়। তখন রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে এবং জনপদের সকল কোলাহলও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে।

অকস্মাৎ সেই অদ্ভুত কোলাহলের উচ্চরোল শুনতে পায় আর বিস্মিত হয় মাধবী।—ধিক্ পুণ্যহীন রাজা যযাতি। ধিক্ মানহীন রাজা যযাতি! রাজা যযাতির নামে প্রবল অপযশ নিন্দা ও ধিক্কারের ধ্বনি সহস্র কণ্ঠ হতে উৎসারিত হয়ে ক্ষুব্ধ ঝটিকানিনাদের মত জনপদের প্রত্যুষসমীরের শান্তি মথিত করছে।

ধীরে হর্ষারুণ উদিত আদিত্যের রশ্মিপাতে প্রাচীপট আলোকিত হয়ে ওঠে। অরণ্যের প্রান্ত অতিক্রম ক'রে আরও অগ্রসর হয় মাধবী। তারপর, স্রোতস্বতীর ক্ষীণ জলরেখা পার হয়ে সুশ্যাম তৃণপ্রান্তরের পথরেখার উপর এসে দাঁড়ায় তপস্বিনীর মূর্তি। শান্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে যযাতির প্রাসাদের অভিমুখে এগিয়ে যেতে থাকে।

স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়েছেন যযাতি। পুণ্যক্ষয়ে আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত স্বর্গ হতে স্থানচ্যুত হয়েছেন রাজা যযাতি। স্বর্লোকাশিত দেব মানব ও রাজর্ষির কেউ যযাতিকে পুণ্যবান বলে স্বীকার করেননি। যযাতির দান যথার্থ দান নয়, যযাতির পুণ্য যথার্থ পুণ্য নয়। যযাতির সকল প্রখ্যাতি বিনষ্ট হয়েছে, কারণ স্বর্লোকের রাজর্ষি সমাজ এতদিনে জানতে পেরেছেন, কি উপায়ে রাজা যযাতি জ্ঞানী গালবের প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। ধিক্কৃত নিন্দিত ও অপমানিত রাজা যযাতি স্বর্গ হতে ফিরে এসে বিষণ্ণ বদনে সভাগৃহে একাকী বসেছিলেন। তাঁর মানের গৌরব অপহৃত হয়েছে, তাঁর দানের গর্ব চূর্ণ হয়েছে।

সভাগৃহে প্রবেশ করলেন চীরধারী এক তপস্বী। রাজা যযাতি বিস্মিত হয়ে দেখলেন, সেই তপস্বী।

তপস্বী মৃদুহাস্যে বলেন—আজ আমি আবার আপনাকে সেই লোকনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি নৃপতি।

যযাতি আর্তস্বরে নিবেদন করেন—বলুন যোগিবর। আমার এই মানহীন ও পুণ্যহীন দগ্ধমরুবৎ জীবনের শান্তির জন্য আপনার সান্ত্বনাদ দান করুন।

তপস্বী—সর্বলোকনীতির সারভূত এই সত্যবাদে আজ বিশ্বাস করুন রাজা যযাতি, পুণ্যার্জনের পথটিও পুণ্যময় হওয়া চাই। আপনি কর্মব্রতের এই নীতি অস্বীকার করেছেন, তাই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি।

যযাতি—আপনার বাণীর সত্যতা আজ বিশ্বাস করি তপস্বী। কিন্তু পুণ্যভ্রষ্ট ও মানহীন

জীবনের গ্লানি নিয়ে আর বেঁচে থাকতে চাই না যোগিবর।

তপস্বী করুণামিশ্রিত স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে বলেন—কিন্তু আর একটি কথা বিশ্বাস করবেন কি নৃপতি?

যযাতি—অবশ্যই বিশ্বাস করব তপস্বী।

তপস্বী—আজ আপনার এক প্রখ্যাতি ত্রিভুবনে রটিত হয়েছে।

যযাতি—আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না যোগিবর।

তপস্বী—জনপদের কোলাহল কি শুনতে পাননি নৃপতি?

যযাতি—শুনেছি যোগিবর। তুষানলের জ্বালা বরণ ক'রে বরং মৃত্যুও সহ্য করা যায়, কিন্তু ঐ ধিক্কার-কোলাহলের জ্বালা বরণ ক'রে জীবন সহ্য করা যায় না।

তপস্বী বলেন—আর একবার ঐ কোলাহল শ্রবণ করুন নৃপতি।

উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকেন নৃপতি যযাতি। অকস্মাৎ যযাতির বিষণ্ণ দুই নেত্রে প্রবল বিস্ময় চমকিত হয়। সহস্র কণ্ঠ হতে উৎসারিত উল্লাস হর্ষ ও আনন্দনাদ জনপদের বায়ু শিহরিত করছে।—ধন্য পুণ্যবতী তাপসিকা মাধবী। ধন্য মাধবীপিতা রাজা যযাতি!

তপস্বী বলেন—যে সিদ্ধসাধিকা পুণ্যবতী মাধবী আজ জনপদে আবির্ভূতা হয়ে আপনার এই রাজ্য ও জনপদ ধন্য করেছে, আপনি যে তারই পিতা। সে পুণ্যবতী যদি আপনাকে প্রণাম করে, তবেই সম্মানে ও গৌরবে ধন্য হবেন আপনি, স্বর্গলোকের রাজর্ষি সমাজ আপনাকে সাগ্রহে ও সানন্দে স্থান দান করবেন।

রাজা যযাতি চিৎকার ক'রে ওঠেন—আমার বনবাসিনী কন্যা মাধবী! সে কি বেঁচে আছে?

কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে প্রস্থান করেন অভ্যাগত তপস্বী। যযাতি ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে দ্বারপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, মূর্তিমতী পুণ্যশিখার মত তপস্বিনী মাধবী দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাকুল পদক্ষেপে পিতা যযাতি ছুটে গিয়ে কন্যা মাধবীকে বক্ষোলগ্ন করলেন। কন্যার শির চুম্বন ক'রে অশ্রুসিক্ত নয়নের আবেদন আরও করুণ ক'রে যযাতি বলেন—ক্ষমা কর কন্যা। যে অপমান ও তুচ্ছতার জ্বালা নিয়ে প্রাসাদ বর্জন ক'রে অরণ্যের আশ্রয় নিয়েছিলে, সে জ্বালা আজ আমাকে দান কর। চাই না পুণ্য, চাই না স্বর্গ।

পিতা যযাতিকে প্রণাম ক'রে মাধবী বলে—আমার তপশ্চর্যার পুণ্য গ্রহণ করুন পিতা।

বেদনা বিস্ময় ও আনন্দ যেন একই সঙ্গে চিৎকার ক'রে ওঠে। যযাতি ডাকেন—কন্যা!

মাধবী—বিচলিত হবেন না পিতা। আমার অনুরোধ, আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে স্বর্লোকে গমন করুন।

বিদায় নেয় মাধবী। সভাগৃহের দ্বারপ্রান্তে এসে রাজা যযাতি কন্যা মাধবীর শির চুম্বন ক'রে বিদায় দান করেন।

স্বর্গধামে প্রস্থানের পূর্বে শূন্য সভাগৃহে প্রসন্ন অন্তরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন রাজা যযাতি। তাঁর শিক্ষা আজ সম্পূর্ণ হয়েছে। দিব্য লোকনীতির সারভূত সত্য আজ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

রাজা যযাতিকে আর একটু বিলম্ব করতে হলো। সুন্দরদর্শন এক তরুণ ঋষিযুবা অকস্মাৎ সভাগৃহে প্রবেশ করেন। রাজা যযাতি সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, জ্ঞানী গালব এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন।

উদ্ভ্রান্ত অশান্ত দাবানলতাড়িত প্রাণীর মত বেদনার্ত দৃষ্টি, জ্ঞানী গালব বলেন—জ্ঞানী গালবের সকল মান ও পুণ্য আপনি গ্রহণ করুন রাজা যযাতি, আমি পুণ্যহীন হতে চাই।

যযাতি—কেন ঋষি গালব?

গালব—জ্ঞানী গালবের সকল মান ও পুণ্য তার জীবনের অভিশাপ হয়েছে রাজা যযাতি। শান্তি পাই না নৃপতি, পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত শুচিস্মিতা এক নারীর মুখচ্ছবি ভুলতে পারছি না। তার দুই অসিতনয়নের শোভা আমারই মূঢ়তার আঘাতে অশ্রুসিক্ত হয়েছে। চাই না মান, চাই না পুণ্য, আজ আমি এক প্রেমিকা নারীর বরমাল্য লাভ ক'রে ধন্য হতে চাই।

যযাতি—কার কথা বলছেন জ্ঞানী গালব?

গালব—যযাতিকন্যা মাধবীর কথা।

সস্নেহ স্বরে যযাতি বলেন—তার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আপনার কোন লাভ হবে না জ্ঞানী গালব। আমার আমন্ত্রণের বার্তা পেয়েও আপনি সেদিন যে স্বয়ংবরসভায় আসেননি, সেই স্বয়ংবরসভায় কুমারী মাধবীর বরমাল্যের পরিণাম সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে।

গালব—অসম্ভব, সে যে আমারই দয়িতা!

যযাতি—বড় বিলম্ব করেছেন জ্ঞানী গালব।

গালব আর্তনাদ ক'রে ওঠেন—এমন নির্মম কথা বলবেন না, বিশ্বাস করতে পারি না রাজা যযাতি। বলুন, গালবের হৃদয়হীন জীবনের সকল স্বপ্ন তৃষ্ণার্ত ক'রে দিয়ে কোথায় গিয়েছে সেই সুধাময়ী নারী, কার কণ্ঠে বরমাল্য দান করেছে মাধবী?

যযাতি—তপস্বিনী হয়েছে মাধবী।

পাষাণবৎ স্তব্ধীভূত গালব তাঁর কুবলয়নয়নের অসহায় হতাশ ও বেদনাভিভূত স্বপ্ন অশ্রুসলিলে ভাসিয়ে দিয়ে শুধু নীরবে তাকিয়ে থাকেন।

যযাতি বলেন—ঐ যে তৃণাঞ্চিত প্রান্তর দেখতে পাচ্ছেন জ্ঞানী গালব, তারই শেষ প্রান্তে এক বিষণ্ণ অপরাহ্ণের আলোকে ক্ষণিকের মত দাঁড়িয়ে স্বয়ংবরসভায় হর্ষ স্তব্ধ ক'রে দিয়ে, নিজের হাতে বরমাল্য ছিন্ন ক'রে এবং ভূতলে নিক্ষেপ ক'রে চলে গিয়েছে মাধবী।

সভাগৃহ ছেড়ে ধূলিলিপ্ত পথের উপর এসে দাঁড়ান গালব। তারপর অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন ; তৃণাঞ্চিত প্রান্তরের শেষ প্রান্তে স্রোতস্বতীর কিনারায় এসে দাঁড়ান। দিগ্‌ভ্রান্তের মত কি যেন অন্বেষণ করতে থাকেন গালব।

বোধ হয় ছিন্ন বরমাল্যের একটুকু অবশেষে খুঁজছিলেন গালব। অনেক অন্বেষণের পর দেখতে পেলেন গালব, স্রোতস্বতীর তটলগ্ন দূর্বাদলের উপর খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে আছে জগতের এক স্থিরপ্রেমা নারীর অভিমানদগ্ধ বরমাল্যের স্বর্ণসূত্র।

স্বর্ণসূত্রের মলিন ও তপ্ত খণ্ডগুলির দিকে তাঁর শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন গালব ; প্রেমিকার চিতাবশেষ অঙ্গারখণ্ডের দিকে প্রেমিক যেমন স্তব্ধ দৃষ্টি তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটি স্বপ্নের আহ্বান

আজ থেকে চার শত বছরেরও আগের কথা। হুগলি জেলার দামোদর নদের তীরে এক গ্রামের এক অভিমানী ছোটছেলে মায়ের উপর রাগ ক'রে একদিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে গিয়ে বসেছিল ঐ দামোদরেরই তটভূমির জনহীন একটি স্থানে স্থাপিত এক চণ্ডী-দেউলের দুয়ারের কাছে।

দেউলের দুয়ার খোলা। ছোটছেলের দুই চোখ বিস্মিত হয়ে দেখেছিল কষ্টিপাথরের গড়া দেবীর মূর্তি। লোকে ভয় করে ঐ দেবীকে। মায়ের কাছেই গল্প শুনেছিল সেই ছোটছেলে, অমাবস্যার রাতে লোকে যখন পূজো দেবার জন্য দেবীর কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন প্রদীপের আলোকে দেখতে পায়, রক্তবিন্দু লেগে রয়েছে দেবীর হাতের কৃপাণের মুখে। আরও আশ্চর্য হয়ে লোকে দেখতে পায়, অদ্ভুত এক হাসি ফুটে উঠেছে এই ভীমা ও ভয়ংকরী দেবীমূর্তির মুখে।

ভয় ভেঙে যায়, ঘরপালানো অভিমানী ছোটছেলের মনের যত ভয়। অমাবস্যা নয়, রাত্রি নয়, অন্ধকারও নয় ; দিনের আলোকে খেলা করছে দামোদরের জল। নদের বুকের উপর থেকে হু হু করে ছুটে আসছে বাতাস, দেউল-দ্বারের শিকল বেজে ওঠে টুং-টুং মিষ্টি শব্দ ক'রে। ছোটছেলের মনে হয়, হাসছেন দেবী চণ্ডিকা। যেন পৃথিবীরত একাকী শিশুর মনের ভয় ভেঙে দেবার জন্য দামোদরের এই নির্জন কিনারায় বসে রয়েছেন দেবী।

বেলা বাড়ে, মধ্যাহ্নসূর্যের তাপে শালবনের ছায়াও তপ্ত হয়ে ওঠে। চণ্ডী-দেউলের দুয়ারের ছায়াটি শুধু শীতল হয়ে থাকে। তারই মধ্যে চুপ ক'রে বসে থাকে সেই ঘরপালানো বালক। দামোদরের জল শিউরে দিয়ে যে-বাতাস ছুটে আসে, সে-বাতাসে জুড়িয়ে আসে ছোটছেলের মনের অভিমান। ঘুম নেমে আসে চোখে। চণ্ডী-দেউলের দুয়ারের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে বালক।

—রাজু, ঘরে ফিরে আয়। স্বপ্নের মধ্যেই এক আকুল কণ্ঠের এই আহ্বান শুনতে পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল বালকের। ঘুম ভেঙেই বুঝতে পারে, মিথ্যা নয় এই স্বপ্ন। সত্যই একটা ব্যাকুল মায়ার স্বর যেন চণ্ডী-দেউলের চারদিকে ছুটোছুটি ক'রে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।—রাজু, ঘরে ফিরে আয়।

ডাকছেন সেই মা, যার উপর রাগ ক'রে পালিয়ে এসে এই নির্জন দেউলের দুয়ারের ছায়ায় লুকিয়ে রয়েছে বালক। সেই ডাক তুচ্ছ ক'রে আর অভিমান ক'রে থাকতে পারেনি বালক। যে মা তার ছেলেকে এমন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছে, ঘরে ফিরে যাবার জন্য এমন ক'রে ডাকছে, সেই মায়ের উপর আর অভিমান ক'রে থাকা যায় না। দেউলের দুয়ার হতে ছুটে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরেছিল সেই বালক। তার নাম রাজু, চার শত বছর আগের হুগলি জেলার ভুরসুটের এক ব্রাহ্মণকুমার—রাজীবলোচন রায়।

কে জানে, কেমন ক'রে সেই রাজীবলোচনই আবার একদিন কোন্ দুঃস্বপ্নের অভিশাপে, কার উপর রাগ ক'রে আর কিসের অভিমানে 'কালাপাহাড়' হয়ে গেল। মন্দিরের শিখর ভূপাতিত ক'রে দেউল-দ্বারের কপাট চূর্ণ ক'রে, দেবশিলা দীর্ণ ক'রে আর নীলাচলের দারুব্রহ্ম দগ্ধ ক'রে উড়িষ্যা থেকে আসাম পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছিল যে ধ্বংসোন্মাদ কালাপাহাড়, সে-ই তো ছিল দামোদর-তটের এক গ্রামের এক হিন্দুমাতার আঁচলধরা অভিমানী ছেলে রাজু। নবাবদুহিতার প্রেমে মুসলমান হয়েছিলেন, আর সুলেমান কররানির

সেনাপতি হয়েছিলেন যে ব্রাহ্মণ রাজীবলোচন, সেই ব্রাহ্মণই কেন কালাপাহাড়ে পরিণত হলেন, এ প্রশ্নের রহস্য ভেঙে দিতে পারে, এমন কোন ঘটনার সমাধিচিহ্নও আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কালাপাহাড়ের সমাধির মত তাঁর ধ্বংসোন্মাদ মনের সে ইতিহাসও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। রয়ে গিয়েছে শুধু তার আঘাতের চিহ্নগুলি।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, সে কালাপাহাড়ের মনের বিচিত্র রহস্যের সাক্ষী হয়ে ইতিহাসের মাটিতে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মন্দির, যে মন্দিরের বিগ্রহ চূর্ণ করার জন্য হাত তুলেও হাত নামিয়ে নিয়েছিলেন কালাপাহাড়।

আজ থেকে চার শত বছর আগে, সেদিন অভিযানে চলেছেন সুলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়, উড়িষ্যার অভিমুখে। পথে পথে দেউলের দুয়ার আর দেবশিলা চূর্ণ ক'রে এগিয়ে চলেছেন কালাপাহাড়। এইভাবেই এক সন্ধ্যায় রূপনারায়ণের তটে যে স্থানে এসে শিবির স্থাপন করলেন কালাপাহাড়, সেই স্থানের নাম তমলুক। ভোর হতেই শিবির-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে সেই ধ্বংসোন্মাদের চক্ষে যে মন্দিরের চূড়া প্রথম দেখা দিলো, সেই মন্দিরই হলো তমলুকের বর্গভীমার মন্দির।

দেখলেন কালাপাহাড়, অতি উদ্ধত মন্দিরচূড়ায় অরুণোদয়ের আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে। তমলুকের দেবী বর্গভীমার মন্দিরের চূড়া।

এই তমলুকই কি সেই তাম্রলিপ্ত, যে তাম্রলিপ্তের নৃপতি তাম্রধ্বজ একদিন পাণ্ডবের অশ্বমেধ যজ্ঞের গৌরব ক্ষুণ্ণ করার জন্য যজ্ঞাশ্বের অভিযান প্রতিহত করেছিলেন? কোথায় গেল সম্রাট অশোকের সেই ধর্মরাজিকা, চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাং তাম্রলিপ্ত জনপদে এসে যার দ্বারভাগের স্তম্ভে উৎকীর্ণ অনুশাসন শ্রদ্ধাপ্লুত চক্ষে পাঠ করেছিলেন? ষষ্ঠ শতকেও যে তাম্রলিপ্ত হতে আচার্য বোধিধর্ম শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে চীনদেশের উদ্দেশ্যে অর্ণবপোতে যাত্রা করেছিলেন, সে তাম্রলিপ্তের সকল ঐতিহাসিক মহিমার নিদর্শন ধুয়ে-মুছে দিয়ে দূরে সরে গিয়েছে মহার্ণবের তরঙ্গমালা।

বর্গভীমা মন্দিরের দিকে তাকালে আজও মনে হয়, সেই বৌদ্ধ তমলুকের স্মৃতি যেন রূপ পরিবর্তন ক'রে এই মন্দিরনিকেতনের ভিত্তি ও গঠনের মধ্যে মিশে রয়েছে। যে উচ্চ স্তূপাকৃতি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, সে কি সেই বৌদ্ধ তমলুকেরই এক প্রাচীন স্তূপের অবশেষ? রূপনারায়ণ জানে, কত শত বছর ধ'রে এই মন্দিরচূড়ার ছায়া ভেসে রয়েছে তার জলে।

কালাপাহাড়ের শিবির জেগে উঠেছে রূপনারায়ণের তটে। মন্দিরচূড়ার দিকে তাকিয়ে আছেন কালাপাহাড়। আর কতক্ষণ? রূপনারায়ণের বুকের জলে বহু শতাব্দীর শ্রদ্ধায় লালিত মন্দিরচূড়ার সে ছায়ার জীবন আর কতক্ষণ?

একাকী এগিয়ে চললেন কালাপাহাড়। বর্গভীমা মন্দিরের বিগ্রহকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে রূপনারায়ণের জলে নিক্ষেপ করতে হবে। আর যদি চূর্ণ করতে হয়, তবে নিজের হাতেই সে বিগ্রহ চূর্ণ করতে হবে। মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন ধ্বংসোন্মাদ কালাপাহাড়।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম ক'রে মন্দিরের দেবীগৃহের দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন কালাপাহাড়। তাকিয়ে রইলেন দেবীর মূর্তির দিকে। কঠিন শিলায় গঠিত দেবীর দু'চোখে যেন এক উগ্রতারার দৃষ্টি ফুটে রয়েছে। বেদিকার নিম্নে ভৈরব ভূতনাথ।

নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকেন কালাপাহাড়। নীরব নিস্তব্ধ ও নির্জন মন্দিরের শিলাময়ী ভীমার সম্মুখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন কালাপাহাড়। পূজারী নেই, পূজক নেই, কালাপাহাড়ের আগমনে আতংকিত জনপদের মানুষ দূরে সরে গিয়েছে। ধ্বংসোন্মাদের হাতের লৌহ-লগুড়ের দিকে শুধু নীরবে আর অবিচলিত নেত্রে একাকী তাকিয়ে রয়েছে এক খণ্ড শিলা।

কালাপাহাড়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে না কেউ। শুধু একটি শান্ত শিলার চক্ষু যেন

তাকিয়ে রয়েছে কালাপাহাড়ের মনের দিকে। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে কালাপাহাড়ের চোখের দৃষ্টি। মনে হয়ে, তাঁর বুকেরই ভিতরে অনেক দিনের নির্বাসিত এক বন্দী নিঃশ্বাসের বাতাস যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন নিজেকে শাসন করার জন্যই ভ্রূকুটি করেন কালাপাহাড়। জানতে ইচ্ছা করে, স্বচক্ষে দেখতে ইচ্ছা করে অমাবস্যার রাতে এই পাষাণী ভীমার আয়ুধেও কি রক্তবিন্দু ফুটে ওঠে, আর সুস্মিত হয়ে ওঠে দেবীর ওষ্ঠ?

দুর্বলতা, নিতান্তই ক্ষণিকের মোহগ্রস্ত মনের দুর্বলতা। সে দুর্বলতা পরিহার করার জন্যই মন্দিরের প্রদক্ষিণপথে ছটছট ক'রে ঘুরে বেড়াতে থাকেন কালাপাহাড়। ফিরে এসে আবার দুয়ারের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

বেলা বাড়ে। মধ্যাহ্নসূর্যের তাপে তপ্ত হয়ে ওঠে চতুর্দিক। রূপনারায়ণের বুক থেকে হু হু ক'রে ছুটে আসে শীতল বাতাস। দেবীগৃহের দুয়ারে শীতল ছায়ার মধ্যে নীরবে ও শান্ত হয়ে বসে থাকেন কালাপাহাড়। যেন এক উদ্দাম ও দুরন্ত জীবন ক্লান্ত হয়ে আর হঠাৎ এক শীতল ছায়া পেয়ে বিশ্রাম লাভের জন্য শান্ত হয়ে বসে আছে।

চোখের পাতায় ঘুম টেনে আনে রূপনারায়ণের বুকের বাতাস। তারপর? তারপর সেদিনের তমলুকের পাঠান সৈন্যের শিবির তখন কল্পনাও করতে পারে না যে দেবী বর্গভীমার সম্মুখে এক শীতল সুচ্ছার আশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন কালাপাহাড়।

সুলেমান কররানির মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড়ও কল্পনা করতে পারেননি যে, দামোদরতটের গ্রাম্যবালক রাজুর মতই ঘরপালানো অভিমানী এক বালকের মন নিয়ে দেবী বর্গভীমার চোখের সম্মুখে এইভাবে তাঁকে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

কে জানে, কি স্বপ্ন দেখে অমন ক'রে চমকে উঠেছিলেন কালাপাহাড়? ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। উৎকর্ণ হয়ে আর চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন কালাপাহাড়। মনে হয়, যেন অতি পুরাতন একটি আকুল কণ্ঠস্বরের আহ্বান তাঁকে আজও খুঁজে বেড়াচ্ছে চারদিকে ছুটোছুটি ক'রে।—রাজু ফিরে আয়! দামোদর-তটের এক দ্বিপ্রহরে চণ্ডী-দেউলের দুয়ারে ঘুমন্ত ছেলেকে কাছে ফিরে পাওয়ার জন্য খুঁজে বেড়িয়েছিল উদ্বিগ্না মাতার যে কণ্ঠস্বর, সেই কণ্ঠস্বরই কি অতীতের সমাধি থেকে জেগে উঠেছে এই মুহূর্তে?

হ্যাঁ, মনেরই দুর্বলতা, আর স্মৃতির একটা আলোড়ন মাত্র! সে আহ্বান মিথ্যা হয়ে গিয়েছে চিরকালের মত। গ্রাম্য-বালক রাজুকে ঘরে ফিরে পাওয়ার জন্য কোন আকুল স্বরের আহ্বান আর ধ্বনিত হয় না এই পৃথিবীর বাতাসে।

দুর্বলতা, কিন্তু সে দুর্বলতার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না কালাপাহাড়। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে একবার দেবী বর্গভীমার দিকে তাকালেন। মনে হয়, হাসছেন দেবী বর্গভীমা। সেদিন সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য ধ্বংসোন্মাদ কালাপাহাড় গ্রাম্য-বালক রাজু হয়েই গিয়েছিলেন।

দূরে নিক্ষেপ করলেন লৌহ-লগুড়। কাগজের উপর নিজের পাঞ্জার ছাপ এঁকে দিয়ে দেবী বর্গভীমার উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রদ্ধার বাণী লিখলেন। দেবী বর্গভীমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সুলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়।

কালাপাহাড়ের সেই শ্রদ্ধার দলিল আজও দেখিয়ে দিতে পারেন দেবী বর্গভীমার মন্দিরের পুরোহিত। মূর্তিনাশক কালাপাহাড় জীবনে প্রথম ও একমাত্র যে মূর্তিকে ধ্বংস করতে এসেও ধ্বংস করতে পারেননি, সেই মূর্তি আজও তমলুকের মন্দিরে আরতির আলোকে প্রতি সন্ধ্যায় দীপ্ত হয়ে ওঠে।

এই মূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন মূর্তিনাশক কালাপাহাড়, কিন্তু কেন মুগ্ধ হয়েছিলেন?

বর্গভীমা মন্দিরের সোপান দিয়ে নেমে চলে যাবার সময় যে চোখের জল মুছেছিলেন কালাপাহাড়, সেই চোখই আবার মূর্তিনাশের উন্মাদ আগ্রহে উগ্র হয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল পুরীধামের দিকে। দেবী বর্গভীমাই জানেন, কেন মুগ্ধ হয়েছিলেন কালাপাহাড়।

মধুমঞ্জরীর চোখের জল

কত যুগের কত ঘটনার কথা নীরব হয়ে নারায়ণগড়ের এই মাটি আর বাতাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে। খড়গপুর থেকে মাত্র চৌদ্দ মাইল দূর। প্রাচীন এক রাজবৈভবের শ্মশানভূমির মত প'ড়ে রয়েছে এক প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। দামামার ধ্বনি নয়, ধাতুময় ঘণ্টার উচ্চনাদও নয়, আজ এখানের নৈশ প্রহরের পরিচয় ঘোষণা করে রাত্রিচর ফেরুপালের রব। প্রহরীর হাতের সুশানিত অসিফলক নয়, দৌবারিকের হাতের সুতীক্ষ্ণ বর্শার ফলকও নয়, আজ এখানে রাত্রির জ্যোৎস্নায় ও অন্ধকারে আনাগানো করে তীক্ষ্ণচক্ষু ও ফণায়িত বিষধর। মৃত এক ঐশ্বর্যের কংকালের মত প'ড়ে রয়েছে শুধু ইটপাথরের স্তূপ। আর বন্যগুল্ম ও লতার ভার যেন হৃতশ্রী এক রাজশক্তির অন্তিম বেদনাকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে।

এই তো সেই পথ, এই বিধ্বস্ত দুর্গনিকেতনের পশ্চিম পাশ ছুঁয়ে যে পথ চলে গিয়েছে উড়িষ্যার দিকে। সেই ধলেশ্বর শিবের মন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে, যে মন্দিরের প্রাঙ্গণ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হরিনাম কীর্তনের সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ধনী ভূস্বামী কেশব সামন্ত একদিন এখানেই তো মহাপ্রভুর চরণে প্রণত হয়ে ভক্তিসুধার উপহার গ্রহণ করেছিলেন। হরি ও হরে ভেদ নেই, এই তত্ত্বই কি সেদিন নারায়ণগড়ের এই শিবালয়ের প্রাঙ্গণে ভক্তকণ্ঠের হরিনামগানে ও মৃদঙ্গের ধ্বনিতে প্রচারিত হয়েছিল?

ইতিহাস তার নানা ঘটনার নানা চিহ্ন এঁকে রেখে গিয়েছে এই নারায়ণগড়ের মাটিতে, নিকটে ও দূরে। বিদ্রোহী শাহজাদা খুররম একদিন তাঁর পিতা দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের রোষ হতে আত্মরক্ষার জন্য দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যাবার পথ সন্ধান করতে গিয়ে এই নারায়ণগড়েরই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বাদশাহী ফৌজের সওয়ার-দল শাহজাদা খুররমের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে ছুটে আসছে। নারায়ণগড়ের এক প্রান্তরে স্থাপিত নৈশ শিবিরে ভবিষ্যতের দিল্লীশ্বর শাজাহান তাঁর দুঃস্বপ্নের মধ্যে চিরবন্দীজীবনের নিষ্ঠুর শৃঙ্খলধ্বনি শুনতে পেয়ে বিচলতি হয়ে উঠেছেন। সম্মুখে আর পথ নেই, ঘন অরণ্যে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে চারদিক। রাত্রি প্রভাত হতেই বাদশাহী ফৌজ পৌঁছে যাবে। বাদশাহী সওয়ার ফৌজের পাঁচ হাজার অশ্বের পায়ে পায়ে একটা ধুলোর ঝড় প্রমত্ত হয়ে ছুটে আসছে শাহজাদা খুররমকে বন্দী করার জন্য। কিন্তু এক রাত্রির এই আতংক এক রাত্রির মধ্যেই দূর হয়ে গেল। নারায়ণগড়ের রাজা শ্যামবল্লভ এক রাত্রির মধ্যেই জঙ্গল কেটে এক রাস্তা তৈরি ক'রে দিলেন।

—আপনি মাড়-ই-সুলতান, আপনি পথের রাজা! রাজা শ্যামবল্লভকে এই উপাধিতে ভূষিত ক'রে এক ফার্মানের উপর রক্তচন্দনে লিপ্ত পাঁচ আঙুলের ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন শাহজাদা খুররম। নারায়ণগড়ের কাছেই কসবা গ্রাম, সেখানে বাদশাহ শাজাহানেরই পুত্র শাহ সুজার স্থাপিত তিন-গম্বুজ মসজিদ মোগল ইতিহাসের সাক্ষীর মত আজও আছে।

মোগল যুগেরও দীপ জ্বলছে নারায়ণগড়ের এই দুর্গের তোরণ দ্বারে। কিন্তু সেই দ্বীপের আলোক ছিল নিতান্তই এক সামন্ত রাজন্যের খণ্ডিত শক্তির ক্ষীণ আলোক। স্বাধীন নারায়ণগড়ের দীপ নিভে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই।

নারায়ণগড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গন্ধর্বপাল। এক স্বাধীন রাজশক্তির সম্মান ও গৌরবের স্পর্শ লেগে আছে এই দুর্গের ভগ্ন-প্রাচীরের প্রাচীনতম ইষ্টকের দেহে। দুর্গা পুরীর অভ্যন্তর এক মন্দিরে ব্রহ্মাণী দেবীর মূর্তি স্থাপিত করেছিলেন রাজা গন্ধর্বপাল। দেবীর প্রতিষ্ঠাদিবসে যে ঘৃতপ্রদীপ জ্বেলেছিলেন গন্ধর্বপাল, সেই দীপ ছয় শত বৎসর ধ'রে অনির্বাণ শিখা বিস্তারিত ক'রে জেগেছিল আর জ্বলেছিল। আজ থেকে প্রায় সাত শত বছর আগে সেই দীপ একদিন নিভে গেল, কে জানে কোন্ অপমানভরা এক ঝড়ের ফুৎকারে! নারায়ণগড়

দুর্গের প্রবেশদ্বারে আগন্তুক এক পরাক্রান্ত রাজশক্তি জয়ডংকা বাজিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তারই জন্য কি?

এই সেই নারায়ণগড়, দেবী ব্রহ্মাণীর করুণায় বৈভবান্বিত এক রাজশক্তির স্মৃতি গায়ে জড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে যার দুর্গের ভগ্নস্তূপ। কেলেঘাই নদীর প্লাবনে এর অনেক পাথর ভেসে গিয়েছে। কিন্তু ভেসে যায়নি এর বিচিত্র এক চোখের জলের ইতিহাস। ঐশ্বর্যেলালিতা, বিলাসবতী ও সুখিনী এক নারী একদিন এই নারায়ণগড়েরই প্রান্তরে প্রান্তরে সেই বেদনা সন্ধান ক'রে ঘুরেছিলেন, যে বেদনা চোখে জল এনে দেয়। সত্যই সে এক বিস্ময়কর সত্যের বিচিত্র স্বীকৃতির ঘটনা। অতি সুখে দুঃখিনী হয়েছিলেন তিনি, আর দুঃখেরই অভাবে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের সুখ। দুঃখ না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি লাভ করতে পারেননি। তাঁর নাম মধুমঞ্জরী, তিনি ছিলেন রাজা গন্ধর্বপালের মহিষী।

দুর্গপুরীর ভিতরে যেন এক সর্বসুখের নিকেতনে বাস করতেন সুন্দরী মধুমঞ্জরী। প্রাসাদ-উদ্যানের সরোবরে ফুল্ল কমলও দিবাবসানে ঈষৎ মলিন হয়ে ওঠে, কিন্তু মধুমঞ্জরীর সুন্দর মুখের হাসি এক মুহূর্তের জন্যও নিষ্প্রভ হতো না। স্বামীর প্রেমে শত দাসীর সেবায়, রূপে লাবণ্যে, আর রত্নভূষণের ঔজ্জ্বল্যে মূর্তিমতী প্রসন্নতার মতই রাজপুরীকে ধন্য ক'রে রেখেছিলেন মধুমঞ্জরী। নিত্য সন্ধ্যায় ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দিরে এসে প্রণাম ক'রে, আর ঘৃতপ্রদীপের সৌরভে নিঃশ্বাস পবিত্র ক'রে নিয়ে আপন কক্ষে ফিরে যেতেন মধুমঞ্জরী। স্বপ্ন দেখতেন এবং সেই স্বপ্নেও কোনদিন কোন দুঃখের ছবি তাঁর সুখনিদ্রাকে বেদনা দিতো না। ঘুমন্ত মধুমঞ্জরীর মুখেও হাসি ফুটে থাকতো। দুঃখ আবার কি জিনিস? জানতেন না তিনি। কল্পনাও করতে পারতেন না, বেদনা কা'কে বলে!

দুঃখ বোধ ক'রে নয়, একদিন ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে জেগে উঠলেন মধুমঞ্জরী। স্বপ্নে দেখলেন মধুমঞ্জরী, দেবী ব্রহ্মাণী বিষণ্ণ ও বেদনামলিন মুখ নিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে বলছেন--জল দাও, জল দাও, আমি বড় তৃষ্ণার্ত।

দেবী তৃষ্ণার্ত। রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মাণী পিপাসায় ছটফট করছেন, এ কি দুঃস্বপ্ন! রাত্রি অবসান হতেই, স্বামীকে তাঁর স্বপ্নের এই বৃত্তান্ত সভয়ে বর্ণনা করলেন মধুমঞ্জরী এবং সেই দিনের মধ্যেই দেবীমন্দিরের সম্মুখে নতুন এক সরোবর তৈরি করে দেবার জন্য স্বামী গন্ধর্বপালকে অনুরোধ করলেন।

হাজার হাজার শ্রমিক প্রজার পরিশ্রমে একদিনের মধ্যেই সেই রাজভবনের দেবীমন্দিরের সম্মুখে নতুন সরোবর খনিত হলো। সুশীতল ও কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জলে ভরে উঠলো নতুন সরোবর। স্বর্ণপাত্রে সেই জল তুলে নিয়ে দেবীমূর্তির সম্মুখে রাখলেন মধুমঞ্জরী।

কিন্তু সেই রাত্রেই, আবার স্বপ্ন দেখে আতংকিত হলেন মধুমঞ্জরী। দেবীর পিপাসা শান্ত হয়নি। সেই রকম তৃষ্ণাতুর ও ব্যথিত মূর্তি নিয়ে দেবী ব্রহ্মাণী বলেছেন—জল দাও, আমি তৃষ্ণার্ত।

উদ্বিগ্ন মধুমঞ্জরীর মন আরও দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলো। বুঝতে পারেন না, কল্পনাও করতে পারেন না, কেন দেবী তৃষ্ণার্ত? এই সংকটে পরামর্শ লাভের জন্য কুলগুরুকে আহ্বান করলেন রাণী মধুমঞ্জরী।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে কুলগুরু চমকে উঠলেন, ভয় পেলেন, আর বিষণ্ণমুখে বসে রইলেন। রাণী মধুমঞ্জরীর এত শ্রদ্ধা ও আগ্রহের উপহারে, স্বর্ণপাত্র পূর্ণ ক'রে নিবেদিত নব-সরোবরের জলেও তৃপ্ত হচ্ছেন না দেবী, এ কি অঘটন! কোন উপায় কল্পনা করতে পারলেন না কুলগুরু এবং চিন্তা করার জন্য সময় চাইলেন।

সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখলেন কুলগুরু, দেবী ব্রহ্মাণী বলছেন—ঐ সর্বসুখিনী বিলাসবতী মেয়ে মধুমঞ্জরীর চোখের জলে আমার তৃষ্ণা দূর হবে। সন্ত্রস্তের মত ছুটে এসে কুলগুরু

পরদিন সকালেই মধুমঞ্জরীর কাছে তাঁর স্বপ্নে-দেখা দেবীর এই ভয়ংকর পিপাসার কথা বললেন।

—আমার চোখের জল? প্রশ্ন করেন মধুমঞ্জরী।

কুলগুরু বলেন—হ্যাঁ, দেবী বলেছেন, সুখিনী মধুমঞ্জরীর চোখের জল না পেয়ে তাঁর তৃষ্ণা মিটবে না।

মধুমঞ্জরী—তবে বলুন, কোথায় পাবো চোখের জল? কেমন ক'রে পাওয়া যায় চোখের জল?

কুলগুরু বলেন—বলতে পারি না মা, সর্বসুখে সুখিনী তুমি কোথা থেকে আর কেমন ক'রে চোখের জল পাবে? শুধু জানি, মানুষ দুঃখ পেলেই চোখের জল পায়।

কিন্তু দুঃখ কই? দুঃখহীন ও বেদনাহীন জীবনই এক সমস্যা হয়ে দেখা দিলো মধুমঞ্জরীর কাছে। দুঃখের স্পর্শ এসে ব্যথিত করুক এই বক্ষের পঞ্জর। একটি দীর্ঘশ্বাস সঞ্চারিত হোক এই সুখী হৃদয়ের গভীরে। দুঃখ পাওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে মধুমঞ্জরীর মন। কিন্তু, সুখিনী নারীর সখের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোন দুঃখ দেখা দেয় না মধুমঞ্জরীর জীবনে। প্রতি রাত্রেই ঘুমের মধ্যে হাসিমুখ আর শুষ্ক চক্ষু নিয়ে স্বপ্ন দেখেন মধুমঞ্জরী, তৃষ্ণার্ত ব্রহ্মাণী দেবী জল চাইছেন।

দুঃখ চাই, সে দুঃখে যেন বেদনা থাকে এবং সে বেদনায় যেন চোখে জল দেখা দেয়। স্বামীর কাছে এসে প্রশ্ন করলেন মধুমঞ্জরী।

—ভালোবাসা ভুলে গিয়ে তোমার মঞ্জরীকে কি কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও ঘৃণা করেছো?

স্বামী বলেন—কোনদিনও না।

স্বামীর অনুরাগে কোন ত্রুটি নেই। থাকলে দুঃখ পেতেন মধুমঞ্জরী এবং সেই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে হয়তো অশ্রুসজল হয়ে উঠতো তাঁর চোখ। কিন্তু বৃথা এই কল্পনা, স্বামীর প্রেমে বন্দিতা মধুমঞ্জরীর কোন দুঃখের সন্ধান পান না।

দাসীদের কাছে এসে প্রশ্ন করেন মধুমঞ্জরী—তোমাদের মধ্যে কেউ কি কোনদিন এক মুহূর্তের জন্য মনে মনে আমাকে অবজ্ঞা করেছো?

দাসীরা বলে—কোনওদিন না, এক মুহূর্তের জন্যও না।

—তবে? প্রশ্ন ক'রে অসহায়ের মত তাঁর উদ্বেগের ভার যেন মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন মধুমঞ্জরী।

জনৈকা দাসী বলে—আমি এক স্বপ্ন দেখেছি রাণী।

মধুমঞ্জরী—কিসের স্বপ্ন?

দাসী—রাজপুরীর বাইরে মাঠে মাঠে আর গ্রামের পথে তুমি কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছো। ধুলোয় মলিন হয়ে গিয়েছে তোমার সাজ, কাঁটা বিঁধেছে তোমার পায়ে, রোদের জ্বালায় ঝলসে যাচ্ছে তোমার সুন্দর মুখ।

মধুমঞ্জরী চমকে উঠলেন। বললেন—চলো দাসী। রাজপুরীর বাইরে একবার ঘুরে আসি।

মধ্যাহ্নসূর্যের খরতাপে তখন গ্রামের মাঠ পুড়ছে। ঝলসে রয়েছে গ্রীষ্মের আকাশ। মাঠের পর মাঠ পার হতে থাকেন মধুমঞ্জরী। তপ্ত ধূলির স্পর্শে পা পুড়ে যায়। কষ্ট হয়, কিন্তু তবু চোখে জল আসে না। আশ্চর্য, কি দুর্লভ বস্তু এই চোখের জল!

চলতে চলতে এক গ্রামের নিকটে এসে দাঁড়ালেন মধুমঞ্জরী। দেখলেন, সমস্ত গ্রামের প্রাণ যেন তৃষ্ণায় ধুকপুক করছে। দেখা যায়, জলশূন্য কূপ ও শুষ্ক তড়াগ, কতগুলি দাবদগ্ধ অতিকায় সরীসৃপের শূন্য বিবর। পিপাসাতুর গোবৎস মাতা গাভীর সজল চক্ষু লেহন করছে। ঘরে ঘরে মানুষের শিশু তৃষ্ণায় কাঁদছে। ভেজা মাটি মনে ক'রে এক টুকরো কালো মাটির

উপর তৃষ্ণার্ত পাখির ঝাঁক এসে ঠোঁট ঘষছে। নরনারীর দল ছোট ছোট মৃৎপাত্র হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে দূরান্তরের কোন্ এক জলাশয়ের দিকে, জল সংগ্রহের আশায়।

এ কি করুণ দৃশ্য! বুঝতে পারেননি মধুমঞ্জরী, কখন কোন্ মমতাময় এক বেদনার স্পর্শে জলে ভরে উঠেছে তাঁর কাজল-আঁকা কালো চোখ। এতদিনে আর এতক্ষণে দুঃখের সন্ধান পেয়েছেন মধুমঞ্জরী!—ক্ষমা করো দেবী, হে তৃষ্ণার্ত মানুষের দুঃখে দুঃখিনী মহামাতা! বুঝেছি, কেন স্বর্ণপাত্রে নিবেদিত আমার সুখসরোবরের জলে তোমার তৃষ্ণা মেটেনি।

বেদনাভিভূতা মধুমঞ্জরী ফিরে গেলেন রাজপ্রাসাদে। স্বামীর কাছে এসে বললেন—বুঝেছি, কেন দেবী তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছেন।

রাজা বলেন—কেন?

মধুমঞ্জরী—আমার চোখের জলের জন্য।

রাজা বিস্মিত হন—তোমার চোখের জল? সে কি ক'রে সম্ভব?

আরও বিস্মিত হলেন রাজা গন্ধর্বপাল। দেখলেন, সত্যই যে মধুমঞ্জরীর দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে।

মধুমঞ্জরী বলেন—আর একটি নতুন সরোবর তৈরি ক'রে দাও।

রাজা—কোথায়?

মধুমঞ্জরী—ঐ মাঠে, গ্রামের কাছে।

রাজা—কেন?

মধুমঞ্জরী—ঐ সরোবরের জলেই আমি আমার জীবনের প্রথম দুঃখের লাভ এই চোখের জল ধুয়ে ফেলতে চাই।

রাজা গন্ধর্বপাল বললেন—তাই হবে।

তাই হলো। আজও রয়েছে সেই সরোবর। আজ নারায়ণগড়ের যে 'রাণীসাগরে' জল টলমল করে, সেই রাণীসাগরই হলো রাণী মধুমঞ্জরীর ইচ্ছায় রচিত তৃষ্ণাপহারী সেই ঐতিহাসিক জলাশয়। সেই সরোবর, দেবী ব্রহ্মাণীর তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়েছিল যে সরোবরের জল। সুখিনী এক নারী জীবনে প্রথম দুঃখের আবির্ভাবকে সানন্দে বন্দনা ক'রে তাঁর চোখের জল এই রাণীসাগরের জলে যখন ধুয়ে ফেলেছিলেন, তখন একটি সুস্মিত ও সুন্দর মুখের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছিল এই রাণীসাগরেরই জলে। মধুমঞ্জরীর মুখের হাসির ছায়া পড়েছিল যেখানে, আজ সেখানে তার আর কোন স্মৃতিচিহ্ন না থাকুক, অন্তত একটি লাল শালুক ঠিক ফুটে থাকে।

পতিঘাতিনী সতী

বিষ্ণুপুরের গড়ভবনের এক কক্ষে রাজঅভর্থনার নানা আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। জ্বেলেছেন মঙ্গল প্রদীপ, আর থালার উপর সাজিয়ে রেখেছেন একটি পুষ্পমাল্য। কর্পূরবাসিত জল রেখেছেন একটি পাত্রে, আর একটি পাত্রে চন্দনপঙ্ক। মাঝে মাঝে কক্ষের দুয়ারের কাছে এসে সুস্মিতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। উদ্যানপথের ছায়ার দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠতে থাকে তাঁর চোখের দৃষ্টি। শঙ্খ বাজিয়ে আর হুলুধ্বনি তুলে সেই অভ্যর্থনার আয়োজনকে আরও ব্যাকুল ও মুখর ক'রে তোলে দাসীরা।

হুগলীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে আজ এই প্রভাতেই ফিরে এসেছেন রাজা রঘুনাথ সিংহ, সে সংবাদ শুনেছেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। দামামা বেজেছে গড়ের দুয়ারে। বিষ্ণুপুর-দুর্গের সেই গর্বের উল্লাসও শুনতে পেয়েছেন চন্দ্রপ্রভা। যে দুর্দান্ত শোভাসিংহের তরবারির আঘাতে বর্ধমানরাজ

রামকৃষ্ণ পরাজিত ও নিহত হয়েছেন আর সন্ত্রস্ত বর্ধমানরাজপুত্র জগৎরাম নারীর বেশ ধারণ ক'রে বর্ধমান হতে পালিয়ে গিয়েছেন, যে শোভাসিংহের আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী শুনে বিচলিত হয়ে উঠেছেন দিল্লী ও ঢাকা, সেই শোভাসিংহকেই হুগলির দুর্গ হতে উচ্ছেদ ক'রে বিষ্ণুপুর ফিরে এসেছেন মল্লরাজ রঘুনাথ।

মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা পরগনার এক ক্ষুদ্র ভূস্বামী শোভাসিংহ অবাধ দুঃসাহসে দিল্লীর মোগলকে তুচ্ছ করবার শক্তি লাভ করেছে। বিচলিত হয়েছেন দিল্লীর বৃদ্ধ আওরংজেব, বিচলিত হয়েছেন বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ এবং বিচলিত হয়েছেন হুগলির ভীরু ফৌজদার নুরুল্লা খাঁ।

বিদ্রোহী শোভসিংহের সহযোগী হয়েছেন বিদ্রোহী পাঠান রহিম খাঁ। মোগলের অনুগত সকল ভূস্বামীকে পরাভূত ক'রে সমগ্র মেদিনীপুর আর বর্ধমানের আধিপত্য লাভ করেছেন স্বাধীন শোভাসিংহ। দিল্লীর প্রাসাদকূটে আজ দুঃস্বপ্নে ও আতঙ্কে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে আলমগীর আওরংজেবের নিদ্রা। হিন্দুস্থানের সকল প্রান্ত হতে দুঃসংবাদ এসে দিল্লীর বাদশাহী মসনদকে আঘাতে জর্জরিত ক'রে তুলেছে। দিকে দিকে বিদ্রোহের দুঃসাহসে অহংকারে ও অস্ত্রাঘাতে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে মোগলের আধিপত্য। বাংলার বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য নতুন বাদশাহী ফৌজ নিয়ে আর বাংলার নতুন সুবেদার হয়ে আসছেন বাদশাহ আওরংজেবেরই পৌত্র আজিম-উস-সান।

আজিম-উস-সানের ফৌজ তখন মুঙ্গের পর্যন্ত এসে বিশ্রামের জন্য থেমেছে। এদিকে বর্ধমান অধিকার ক'রে নেবার পর দুর্দান্ত শোভাসিংহ হুগলির ভীরু ফৌজদার নুরুল্লাকে একটি ভ্রূকুটির জোরেই পরাভূত ক'রে হুগলি দুর্গ অধিকার ক'রে ফেললেন। মোগলের পক্ষ হতে বাধা দেবার কর্তব্য ছিল যাঁদের, তাঁরাও সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে ও আড়ালে সরে রইলেন। শুধু এগিয়ে এলেন মোগলের বন্ধু দুটি শক্তি, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ রঘুনাথ আর হুগলির ওলন্দাজ। ওলন্দাজের কামান আর রঘুনাথের সওয়ার ফৌজ হুগলি দুর্গের শোভাসিংহকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললো। নিশীথের অন্ধকারে দুর্গের গুপ্তদুয়ার দিয়ে সসৈন্য বের হয়ে পালিয়ে গেলেন রাজা শোভাসিংহ। কিন্তু মল্লরাজ রঘুনাথ তাঁর সওয়ার দল নিয়ে শোভাসিংহের এই পলায়নের পর্বও আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন করলেন। বহু সামগ্রী, বহুসম্ভার এবং বহু অর্থের সিন্দুক পথের উপর ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন বিপর্যস্ত শোভাসিংহ।

জয়ী রঘুনাথের সঙ্গে সঙ্গে একটি শকটশ্রেণীও এসে পৌঁছে গিয়েছে বিষ্ণুপুর দুর্গের দুয়ারে। পরাভূত ও পলায়িত শোভাসিংহের সামগ্রীসম্ভার আর অর্থের বোঝা নিয়ে এক একটি শকট দুর্গের দুয়ারে প্রবেশ করে, আর বেজে ওঠে দুর্গদ্বারের দামামা। সে ধ্বনি শুনে আরও সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে রাণী চন্দ্রপ্রভার মুখের হাসি।

যুদ্ধে যাবার আগে রাণী চন্দ্রপ্রভার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাজা রঘুনাথ—বল, তোমার জন্য কি উপহার নিয়ে আসবো?

চন্দ্রপ্রভা বলেছিলেন—তুমি ফিরে এসো, আর কোন উপহার চাই না।

রঘুনাথ—তবু বল, যুদ্ধজয়ী স্বামীর কাছ থেকে কি উপহার পেলে তুমি সুখী হবে?

চুপ ক'রে কিছুক্ষণ ভাবলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। তার পরেই ক্ষুদ্র একটি মৃৎপাত্র স্বামীর হাতের কাছে তুলে দিয়ে বললেন—গঙ্গার জল নিয়ে এসো আমার জন্য।

শুনে খুশি হয়েছিলেন রাজা রঘুনাথ, আর বিদায় নেবার আগে রাণী চন্দ্রপ্রভার সেই ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র নিজের হাতে তুলে নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—ভুলবো না চন্দ্রপ্রভা, তোমার জন্য পুণ্যতোয়া গঙ্গার জল নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো।

ফিরে এসেছেন যুদ্ধজয়ী স্বামী। অনেকক্ষণ হলো ফিরে এসেছেন। দুর্গদ্বারের দামামাও আর বাজে না। রাণী চন্দ্রপ্রভা দাঁড়িয়ে থাকেন ভবনকক্ষের দুয়ারে। আশা করেন, উদ্যানপথের

ঐ ছায়ার মধ্যেই এখনি দেখা দেবেন রাজা রঘুনাথ, হাতে একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র ঘোর যুদ্ধের ব্যস্ততার মধ্যেও জীবনসঙ্গিনীর একটি ক্ষুদ্র অনুরোধ বিস্মৃত হননি যে স্বামী। মণিমাণিক্য নয়, রত্নালঙ্কার নয়, শুধু একটু গঙ্গার জল। স্বামীর মনের প্রীতি মেশানো ঐ গঙ্গার জল মাথায় দিয়ে পারলেই ধন্য হবে রাণী চন্দ্রপ্রভার সীমন্তিনী জীবনের সুখ। এর চেয়ে বেশি সুখ তিনি চান না। এর চেয়ে বড় উপহারও আর হয় না।

প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত সহ্য ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। প্রভাতের সূর্য মধ্য আকাশে এসে ঠাঁই নিয়েছে। নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সমস্ত গড়-ভবন। গঙ্গাজলের উপহার হাতে নিয়ে যুদ্ধজয়ী স্বামীর মূর্তি আর দেখা দিলো না সেই উদ্যানের ছায়াপথে। উদ্বিগ্নচিত্তে গড়ের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। তারপর আরও উদ্বিগ্ন হয়ে গড়ের দুয়ার পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন, রঙীন রেশমী ঝালর দিয়ে ঢাকা একটি শকট সেই গড়ভবনে প্রবেশ না ক'রে ধীরে ধীরে চলে গেল অন্যপথে।

নানা অলংকারে সুশোভিত একটি কোমল বাহু, আর ফুলের মালা দিয়ে জড়ানো একটি বেণী যেন লুকিয়ে রয়েছে ঐ শকটের রেশমী ঝালরের আড়ালে। দেখতে পেয়েছেন চন্দ্রপ্রভা, কিন্তু বুঝতে পারেন না, এ কোন্ উপহার কা'র জন্য নিয়ে এলেন তাঁর যুদ্ধজয়ী স্বামী?

চন্দ্রপ্রভার চোখের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল সেই রহস্যময় শকট। দেখতে পেলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা, দূরের সেই কৃষ্ণচূড়ার পাশে নবনির্মিত এক ভবনের দিকে চলেছে সেই শকট।

ব্যস্তভাবে দাসীর দল ছুটে এসে চন্দ্রপ্রভার নিকটে দাঁড়ায়। দুর্গভৃত্যের দল হাঁকডাক দিয়ে পালকি নিয়ে আসে। চন্দ্রপ্রভা বলেন—চলো, ঐ কৃষ্ণচূড়ার কাছে একবার চলো।

পালকি কিছুদূর এগিয়ে যেতেই অকস্মাৎ যন্ত্রণাক্তের মত চমকে ওঠেন চন্দ্রপ্রভা, যেন সুতীক্ষ্ণ একটি শর ছুটে এসে বিদ্ধ করেছে তাঁর চক্ষু। আর এগিয়ে যেতে পারলেন না। পালকি থামিয়ে যন্ত্রণাক্ত চক্ষু নিয়ে দেখতে থাকেন, শকটের ভিতর থেকে নামছেন তাঁরই স্বামী রাজা রঘুনাথ এবং সঙ্গে এক রূপসী নারী। ফুলে জড়ানো চঞ্চল কৃষ্ণসর্পীর মত একটি বেণী দুলছে নারীর গ্রীবার উপর। সাগ্রহে নারীর হাত ধ'রে ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন রাজা রঘুনাথ।

মাঝপথ থেকেই পালকি ফিরিয়ে আবার গড়ভবনে ফিরে গেলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা।

গঙ্গাজল নয় এবং রাণী চন্দ্রপ্রভার জন্য কোন উপহার নয় ; নিজেরই জন্য ঐ উপহার নিয়ে এসেছেন রাজা রঘুনাথ। রাজা শোভাসিংহের প্রগল্ভ জীবনের বিলাসরাত্রির সঙ্গিনী অতিরূপসী লালবাঈ। হুগলির দুর্গ হতে পলায়নপর রাজা শোভাসিংহের সামগ্রী ও সম্ভার লুণ্ঠন করতে গিয়ে সেই নিশীথের অন্ধকারে একটি পালকির ভিতরে ঐ ফুলে জড়ানো বেণীকে মশালের আলোকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলেন রাজা রঘুনাথ। এই সেই সুন্দরী লালবাঈ, তুর্ক-তরুণী যে লালবাঈ-এর সুকণ্ঠের সঙ্গীতে, নৃত্যনিপুণ পায়ের ঘুঙুরের বোলে আর চোখের কটাক্ষে রাতের চাঁদও অভিভূত হয়ে অস্ত যেতে দেরি করে। শোভাসিংহের প্রমোদসহচরী সেই লালবাঈকেই লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে এসেছেন রাজা রঘুনাথ। কে জানে এখন কোথায় পড়ে আছে রাণী চন্দ্রপ্রভার সেই ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র। রাজা রঘুনাথ ভুলে গিয়েছেন তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। তুর্ক-তরুণীর ঐ ফুলে জড়ানো বেণীই ভুলিয়ে দিয়েছে সব।

মঙ্গল প্রদীপের শিখা বৃথাই পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। শুকিয়ে গেল রাণী চন্দ্রপ্রভার নিজের হাতে সাজানো থালায় ফুলের মালা। অপরাহ্নের আলো এসে লুটিয়ে পড়লো দূরের কৃষ্ণচূড়ার মাথায়। তারপর নামলো সন্ধ্যা। রাণী চন্দ্রপ্রভার কক্ষে আর কোন প্রদীপ জ্বলে না।

যন্ত্রণাক্ত দুই চক্ষুর জল গোপন ক'রে সন্ধ্যাপূজার ফুল সংগ্রহের জন্য উদ্যানে প্রবেশ করেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। পূজা শেষ ক'রে ভবনের উপর অলিন্দের এক নিভৃতে উঠে এসে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। শুধু দেখতে পান, দূরের কৃষ্ণচূড়ার মাথার উপর নিকটের

ভবন-বাতায়ন হতে যেন প্রখর দীপালোকের ঝলক এসে লুটিয়ে পড়েছে। বাতাসে ভেসে আসছে দূরের গান আর চঞ্চল ঘুঙুরের ক্ষীণ শব্দের কম্পন।

বুঝতে পারেন রাণী চন্দ্রপ্রভা, বন্দিনী লালবাঈ-এর ঐ ফুলে জড়ানো বেণীতে বন্দী হয়ে গিয়েছেন তাঁর স্বামী রঘুনাথ। স্বামীর হাত থেকে গঙ্গাজলের উপহার নেবার ভাগ্য এমন ক'রে পুড়ে গেল, কে জানে জীবনের কোন্ অভিশাপে? সহ্য করা যায় না, তবু সহ্য করবেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। তাঁর চোখের দৃষ্টিকে আর এমন ক'রে জ্বলে উঠতে দেবেন না। এই মঙ্গল প্রদীপ নিভিয়ে রাখা উচিত হবে না। ভুলে গেলে চলবে না, আজ থেকে এক মাস ধ'রে যে এক ব্রত পালনের মানত করেছেন তিনি। যুদ্ধযাত্রী স্বামীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনা ক'রে যে ব্রত পালনের অঙ্গীকার করেছিলেন মনে মনে, সেই ব্রত হাসিমুখেই তিনি পালন করবেন। স্বামীর অকল্যাণ হতে পারে, কোন দুঃখের যন্ত্রণায় এমন ভুল করতে পারবেন না রাণী চন্দ্রপ্রভা।

নিজের ব্রত নিয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। দিন যায়, রাত্রি অবসান হয়, দূরের কৃষ্ণচূড়ার মাথার দিকে তাকিয়ে থেকে চন্দ্রপ্রভার জীবনের বিষণ্ণ মুহূর্তগুলি প্রত্যহ ক্ষয় হয়ে যায়। একদিনের জন্যও স্বামীর দেখা পাননি, শুনতে পাননি স্বামীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু যেন সারাজীবন ধ'রে অতি কঠোর এক সহ্যের ব্রত পালন করবার প্রতিজ্ঞা করেছেন চন্দ্রপ্রভা। প্রতিবাদ করেন না, কোন বাধা দেন না, কোন দিন কোন দাসীকে পাঠিয়েও রাজা রঘুনাথকে অন্তঃপুরে আসবার জন্য অনুরোধ করেন না।

দাসীরা বলে—ভুল করছেন রাণীমাতা। এভাবে নিজের সর্বনাশ সহ্য করতে নেই।

রাণীমাতা বলেন—আমার নিজের সর্বনাশই হোক, আর কারও যেন কোন ক্ষতি না হয়।

কিন্তু গড়-বিষ্ণুপুরের যে সর্বনাশের আশংকা সত্য হতে চলেছে, সেই সর্বনাশের ইঙ্গিত পেয়ে একদিন চমকে উঠলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। মঙ্গল প্রদীপ জ্বালবার সময় কেঁপে উঠলো তাঁর হাত। সারা দিন ধ'রে পুজো ক'রেও মনে শান্তি পেলেন না। সন্ধ্যা হতেই ভবনের উপর অলিন্দে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে রইলেন সেই কৃষ্ণচূড়ার মাথায় পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে। দেখলেন, প্রতি সন্ধ্যার মত আজও সেই ভবনের বাতায়নে ফুটে উঠলো সেই নিষ্ঠুর আভা। নীরব কৃষ্ণচূড়া নিঃশব্দে সহ্য করছে এই বিদ্রূপ। কিন্তু আজ বিচলিত হয়েছেন রাণী চন্দ্রপ্রভা, কঠোর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছেন ঐ দূর বাতায়নের ক্ষীণ আলোকের দিকে এবং বুঝতে পারছেন, এইবার বোধ হয় আর সহ্য করতে পারবেন না।

আজই শুনতে পেয়েছেন রাণী চন্দ্রপ্রভা, গড়ভবনের মন্দিরে পূজা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন রঘুনাথ। বুঝতে পারেন চন্দ্রপ্রভা, ফুলে জড়ানো ঐ বেণীর কৃষ্ণসর্পীর মত রাজা রঘুনাথের ধর্মবুদ্ধিকে দংশন করেছে। রূপসী তুর্কিণীর প্রণয়ের মান রক্ষা করার জন্য ইসলাম গ্রহণের সংকল্প করেছেন রাজা রঘুনাথ।

এ কি সত্য? এ কি সম্ভব? এক রূপাজীবা কটাক্ষবতী নারীর কাছে এমন ক'রে নিজের জীবনের সব গৌরব বিসর্জন দিতে পারেন বীর হাম্বীরের বংশধর দ্বিতীয় রঘুনাথ? মদনগোপালের মন্দিরে আর আরতির দীপ জ্বলবে না, কালাচাঁদের মন্দিরের আঙিনায় মৃদঙ্গ নীরব হয়ে যাবে? গড়-বিষ্ণুপুরের ইতিহাস কি এক বারনারীর ইচ্ছার আঘাতে এমন ক'রে চূর্ণ হয়ে যাবে?

দাসীকে সঙ্গে নিয়ে পাল্কিতে আরোহণ করলেন, তারপর ভবনদ্বার হতে অগ্রসর হয়ে একেবারে দুর্গদ্বার পার হয়ে এগিয়ে চললো রাণী চন্দ্রপ্রভার পালকি। রাজা রঘুনাথের প্রমোদভবনের দুয়ারে এসে থেমে গেল পালকি। হঠাৎ দেখতে পেলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা, প্রমোদভবনের নিকটে উদ্যানের অভ্যন্তরে এক নবখনিত সরোবরের কিনারায় বেদিকার উপর বসে রয়েছেন স্বামী রঘুনাথ এবং স্বামীর চোখের সম্মুখে সেই ফুলে জড়ানো বেণীর নারী।

দাসীকে পাল্কির কাছে রেখে একাকিনী পায়ে হেঁটেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন রাণী চন্দ্রপ্রভা, কিন্তু আর বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারলেন না। রূপসী তুর্কিণীর রঞ্জিত অধরের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে তখন যে প্রতিজ্ঞার কথা উচ্চারণ করছেন রাজা রঘুনাথ, সেই কথা রাণী চন্দ্রপ্রভার কানে এসে বেজেছে। শুনতে পেয়ে তরুবীথিকার আড়ালে থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা।

রাজা রঘুনাথ তখন লালবাঈ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দবিগলিত স্বরে এক সর্বনাশের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করছিলেন।—কথা দিলাম লালবাঈ, আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। শুধু আমি নই, আমার পরিবার, আমার মন্ত্রী, আমার কর্মচারী এবং আমার প্রজারাও ইসলাম গ্রহণ করবে। তোমাকে এ-জীবনে আমি অসুখী করতে পারবো না লালবাঈ।

খুশির হাসিতে আকুল হয়ে লালবাঈ বলেন—এতদিনে বুঝলাম, আপনি এই ফুলে জড়ানো বেণীকে সত্যিই ভালোবেসেছেন। আমার মনে আর কোন দুঃখ রইল না রাজা, আমি আপনারই জীবনের চিরসঙ্গিনী হয়ে থাকবো।

ফিরে এলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। আজ তাঁর ব্রতের শেষ দিন। জ্বাললেন মঙ্গল প্রদীপ, সারা রাত ধ'রে পূজা করলেন। শেষ রাতে উদ্যানের গাছের পাতার আড়ালে যখন ঘুমভাঙা পাখি প্রথম ডেকে উঠলো, তখন পূজার আসন থেকে উঠে আর দীপ নিভিয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন চন্দ্রপ্রভা। গড়ের পুষ্করিণীর জলে স্নান ক'রে এসে যখন আবার কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন আকাশের শেষ তারাও নিভে গিয়েছে।

রক্তপট্টের শাড়ি পরলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সীমন্তে লেপন করলেন অজস্র সিন্দুর। টুকটুকে লাল আলতা দিয়ে রাঙিয়ে নিলেন দুই পা, যেন ভুল ক'রে সেই নববধূর বেশে নিজেকে আজ সাজিয়ে তুললেন চন্দ্রপ্রভা, যে বেশে একদিন মল্লরাজের এই দুর্গভবনের এই কক্ষেই এসে প্রথম মঙ্গলঘট স্পর্শ করেছিলেন।

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেদিন অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য জেগে উঠলো গড়-বিষ্ণুপুরের চারদিকে। আজ ধর্মান্তরিত হবেন রাজা রঘুনাথ। রাজা রঘুনাথের নির্দেশে কিছুসংখ্যক প্রজাও ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তুর্কিণী লালবাঈ-এর নির্দেশে এক স্থানে ধর্মান্তরিতদের ভোজনে আপ্যায়িত করবার জন্য বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। গড়ের সৈনিক বিমূঢ়, কর্মচারী বিভ্রান্ত এবং মন্ত্রী বিষণ্ণ।

কক্ষের নিভৃতে মঙ্গলঘট স্পর্শ ক'রে প্রস্তুত হলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। ডেকে পাঠালেন মন্ত্রীকে।

—গড়-বিষ্ণুপুরের এই অপমান আর দুর্ভাগ্য কি চুপ ক'রে দেখবেন আপনারা? মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা।

বিব্রতভাবে মন্ত্রী বলেন—শুধু আপনার জন্যই চুপ ক'রে সহ্য করছি।

চন্দ্রপ্রভা—এর অর্থ?

মন্ত্রী—আপনি অশ্রুপাত করবেন, এমন কাজ করবার মত কঠোর হতে পারছি না বলেই ব্যবস্থা করতে পারছি না।

চন্দ্রপ্রভা—কি ব্যবস্থা করতে পারছেন না?

মন্ত্রী ক্ষুব্ধভাবে বলেন—চরম ব্যবস্থা।

চন্দ্রপ্রভা—ব্যবস্থা করুন, আমার চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখা দেবে না।

বোধ হয় বিশ্বাস করতে না পেরে কিংবা বিস্মিত হয়ে রাণী চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মন্ত্রী। এ কি ভয়ংকর অনুরোধ করছেন রাণীমাতা নিজের মুখে? এখনো যে সিন্দূর জ্বলজ্বল করছে এই নারীর সীমন্তে! নিজেরই মুখেব ঐ কথাগুলির অর্থ বুঝতে পারছেন কি রাজা রঘুনাথের ধর্মপত্নী চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা বলেন—বিস্মিত হবেন না মন্ত্রী, সন্দেহও করবেন না, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতে হয়, তাও ভালো, গড়-বিষ্ণুপুরের সম্মান এভাবে মুছে যেতে দেবো না।

নববধূবেশিনী চন্দ্রপ্রভার চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ছায়া। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন মন্ত্রী। তার পরেই মাথা হেঁট ক'রে বলেন—তাহ'লে আপনি আজ্ঞা দিন রাণীমাতা।

চন্দ্রপ্রভা—আজ্ঞা দিলাম।

এক দল সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে দুর্গদুয়ার পার হয়ে দূরের কৃষ্ণচূড়ার দিকে ছুটে চলে গেলেন মন্ত্রী। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করে গড়ভবনের বাতাস। রাণী চন্দ্রপ্রভা তাঁর ভবনের উপর অলিন্দে দাঁড়িয়েই দেখলেন, কতগুলি ছোট ছোট ক্ষিপ্ত অপচ্ছায়া দূরের প্রমোদভবনের ভিতর প্রবেশ করছে।

ঘাতকের তরবারি দেখতে পেয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠেন রাজা রঘুনাথ ও রূপসী তুর্কিণী লালবাঈ, সে আর্তনাদ শুনতে পায় নীরব কৃষ্ণচূড়া। রাণী চন্দ্রপ্রভার বধির কর্ণে সে আর্তনাদ যেন পৌঁছতে পারছে না, যদিও তাঁর দুই চক্ষু অপলক হয়ে কল্পনায় সবই দেখছে আর বুঝতে পারছে। দেখতে পেয়েছিল কৃষ্ণচূড়া, গড়-বিষ্ণুপুরের বিপর্যয়ের নায়িকা সেই রূপসী লালবাঈ-এর আহত দেহকে ঘাতকেরা লোষ্ট্রখণ্ডের মত নিক্ষেপ করলো নতুন সরোবরের জলে। লালবাঈ-এর শেষ নিঃশ্বাস সেই সলিলসমাধির গভীর হতে শুধু কতগুলি বুদ্বুদ হয়ে ভেসে ওঠে মিলিয়ে গেল চিরকালের মত।

আর, নিহত রাজা রঘুনাথের দেহ প্রমোদভবনের ভিতর থেকে বহন ক'রে নিয়ে এসে রাখা হলো গড়ভবনেরই মন্দিরদ্বারের সম্মুখে। তারপর রাজবাটির অভ্যন্তরে গৃহদেবতার সম্মুখে। রাজপুরোহিত চন্দনের তিলক এঁকে দিলেন নিহত রাজা রঘুনাথের কপালে। দূরে নিজের ভবনকক্ষের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা, রাজা রঘুনাথের শবযাত্রা বাতাসে হরিধ্বনি ছড়িয়ে আর দুর্গদুয়ার পার হয়ে আবার চলে যাচ্ছে দূরের কৃষ্ণচূড়ার দিকে। এ দৃশ্য দেখেও দূরের নীরব কৃষ্ণচূড়ার মতই একটুও বিচলিত হলেন না রাণী চন্দ্রপ্রভা।

সৎকারের আয়োজন করলেন মন্ত্রী। সজ্জিত হলো চন্দন কাঠের চিতা। রাজপুরোহিত এসে চিতার নিকটে দাঁড়ালেন। গড়ের সৈনিকেরা এসে গম্ভীরমুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। দুঃখ আছে, কিন্তু অনুতাপ নেই কারও মনে। বিষ্ণুপুরের সম্মান রক্ষার জন্য এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। চিতা মঞ্চে শায়িত নিষ্প্রাণ রাজা রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাতকের মনে কষ্ট হয়, কিন্তু অনুশোচনা হয় না। কারণ, স্বয়ং রাণীমাতাই শান্তস্বরে এই হত্যার নির্দেশ দান করেছেন। কত শান্ত অথচ কী কঠোর ঐ রাণীমাতা চন্দ্রপ্রভার হৃদয়!

চিতায় অগ্নিদান করার জন্য নির্দেশ দিতে গিয়েই চমকে ওঠেন রাজপুরোহিত। নববধূবেশিনী রাণীমাতা চন্দ্রপ্রভা এসে দাঁড়িয়েছেন চিতার কাছে।

মন্ত্রী আপত্তি করেন—আপনি এখানে কেন রাণীমাতা?

চন্দ্রপ্রভা হাসেন—এখানে না এসে কোথায় যাবো আমি?

বুঝতে পারেন মন্ত্রী। স্বামীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে যে কঠোরহৃদয়া নারী স্বেচ্ছায় বৈধব্য আহ্বান ক'রে এনেছে জীবনে, সে নারী এইবার বৈধব্যের ব্রত গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হোক। মুছে ফেলুক সীমন্তের ঐ সিন্দূর, আর পায়ের রঙীন-করা আলতার রেখা। এখানে আসে কেন সে নারী, যে নারীর চোখে জল নেই?

চন্দ্রপ্রভা বলেন—স্বামিঘাতিনী হতে পারি, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সহমরণ বরণের অধিকার তো আমার আছে।

পুরোহিত বিস্মিত হয়ে বলেন—হ্যাঁ, আছে।

রাজা রঘুনাথের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করেন চন্দ্রপ্রভা। তার পরেই বলেন—আপনারা বিদায় দিন এই পতিঘাতিনী নারীকে।

চিতামঞ্চে আরোহণ ক'রে স্বামীর পাশে শয্যা গ্রহণ করলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। জ্বলন্ত চিতার শিখার জ্বালায় আর ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেল নীরব কৃষ্ণচূড়া।

সন্ধ্যা হয়ে আবার যখন তারা উঠলো আকাশে, তখন কৃষ্ণচূড়ার তলায় ভস্মস্তূপের দিকে কিছুক্ষণ শুধু তাকিয়ে ছিল একটি প্রদীপ। সে প্রদীপ নিভলো তখন, যখন দুর্গদ্বারের দামামা আর একবার বেজে উঠলো। বিষ্ণুপুরের নতুন রাজা গোপাল সিংহের রাজাসন গ্রহণের উৎসবে আনন্দ করার জন্য প্রস্তুত হলো বিষ্ণুপুর।

সেই কৃষ্ণচূড়া আজ আর নেই। কিন্তু রূপসী তুর্কিণী লালবাঈকে যে সরোবরের জলে ডুবিয়ে প্রাণ হরণ করা হয়েছিল, সে সরোবরের জল আজও শুকিয়ে যায়নি। বিষ্ণুপুরের 'লালবাঁধে'র জলে সেই ঘটনার স্মৃতি আজও বাতাসের কাঁপুনি লেগে থর থর করে, আর রোদে ও জ্যোৎস্নায় ঝিক্ ঝিক্ করে। ধর্মান্তরিতদের ভোজনে আপ্যায়িত করবার জন্য যেখানে আয়োজন করেছিলেন লালবাঈ, সেই ঘটনার স্মৃতি বহন ক'রে চলেছে বিষ্ণুপুরের 'ভোজনতলা'।

বিষ্ণুপুরের মন্দিরে আজও যখন আরতির দীপ জ্বলে, তখন একথা মনে না হয়ে পারে না যে, একদিন এই দীপের আলোকটুকুই বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ভয়ংকর এক ব্রতের আগুন জ্বেলেছিলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। তাঁরই নাম পতিঘাতিনী সতী, নিন্দা আর শ্রদ্ধা এক সঙ্গে মিশে সে নারীর স্মৃতি আজও জাগিয়ে রেখেছে।

দুর্গাকমল

মন সন্ন্যাসী হতে পারেনি, দেহটা শুধু সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ ক'রে রয়েছে, অথচ এই ভয়ানক ভুল চিনতে আর বুঝতে পারা যাচ্ছে না, এমন সমস্যায় বিব্রত হয়েছে সংসারে মায়া হতে পলাতক অনেক বিরাগীর জীবন। বিষয় ও বাসনার কোলাহল থেকে অতি দূরে, বনময় নিভৃতে সরে এসেও তার মনের কোলাহল শান্ত হয় না। জটাজুট আর চীরবাসে তার দেহ শুধু বন্দী হয়ে চুপ ক'রে থাকে, কিন্তু তার মনের স্বপ্নে আনাগোনা করে পৃথিবীর পিপাসা। এমন যোগীর জীবন তার রুক্ষ বৈরাগ্যের পীড়নে আর্তনাদ করে, কিন্তু সে আর্তনাদ শুনতে পান না যোগী। এই রকমই ভুল হয়েছিল বিরাগী কমলাকান্ত গোস্বামীর জীবনে এবং সেই ভুল বুঝতেও তাঁর অনেক দেরি হয়েছিল।

নদীয়া জেলার আলমডাঙার উত্তরে, আজ যেখানে ভোরের আলো জেগে উঠলেই রাধারমণের মন্দিরের কপাট খুলে যায়, কার্তিকী পূর্ণিমায় যেখানে হাজার হাজার মানুষের মেলায় সকালসন্ধ্যা মুখর হয়ে ওঠে, ঠিক সেখানেই ছিল গভীর এক অরণ্য আর জনহীন স্তব্ধতা। এখান থেকে বারো ক্রোশ দূরে রাজা মুকুট রায়ের সেই জয়দিয়া গ্রাম আজও আছে। সেই অতীতের অবিরল গঙ্গাপ্রবাহের সরস স্পর্শ পেয়ে এই অঞ্চলের যে মাটির তৃণ সবুজ হয়ে উঠতো আজ সে মাটির তৃষ্ণা মেটায় মাথাভাঙা আর কুমারের জলধারা। নদীর বুকের যে কুয়াশা একদিন এখানে জ্যোৎস্নামাখা হয়ে অরণ্যের তন্দ্রা স্নিগ্ধ ক'রে তুলতো, সে কুয়াশায় আজ ঘনিয়ে ওঠে ধানক্ষেতের সুখের ঘুম।

সেই অরণ্যেরই নিভৃতে এক পর্ণকুটীরে থাকতেন এক তরুণ সন্ন্যাসী ; তাঁর নাম ছিল কমলাকান্ত গোস্বামী। কখনো ধ্যানে এবং কখনো জপে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন কমালাকান্ত। কঠোর উপবাসব্রত এবং ভূতলশয্যা গ্রহণ ক'রে এই দেহের সকল সুখতৃষ্ণাকে পরাভূত করবার জন্য তাঁর আগ্রহ ও প্রয়াসের কোন ত্রুটি ছিল না। অতি গভীর এই অরণ্য, সর্প ও শ্বাপদের আশ্রয়। এখানে বাইরের মায়াময় জীবনের কোন কামনা বেদনা ও তৃষ্ণা পৌঁছতে

পারে না। সন্ন্যাসী কমলাকান্ত তাই মনে করেন, এখানেই তিনি সবচেয়ে বেশি নিরাপদ হয়ে তাঁর সাধনার জীবন যাপন করতে পারবেন।

কিন্তু উপবাসখিন্ন শরীর নিয়ে যখন এই বনেরই এক জলকুণ্ডে স্নান সমাপন ক'রে জপমালা হাতে তুলে নেন কমলাকান্ত, তখন ক্ষণিকের মত তাঁর নিজেরই সংকল্পের কঠিন বন্ধন থেকে যেন স্খলিত হয়ে পড়ে তাঁর মন। জলপুষ্পের অর্ধস্ফুট কলিকার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকেন। চমকে ওঠেন কমলাকান্ত, যেন তাঁর মনেরই অগোচরের গভীরে স্তিমিত এক স্বপ্নের কলিকা হঠাৎ-বাতাসে আহত হয়েছে। চোখে পড়ে, এই তরুলতা ও গুল্মের সবুজ মাথার অনেক উপরে অবারিত আকাশপট নীলিমায় অভিভূত হয়ে রয়েছে। পর্ণকুটীরে ফিরে আসেন কমলাকান্ত এবং দেখতে পেয়ে আরও বিব্রত বোধ করেন, তাঁর গৈরিকের জীর্ণ উত্তরীয়ের উপর মনোলোভা বর্ণশোভা নিয়ে বসে রয়েছে পুষ্পরেণুমেদুর প্রজাপতি।

বিরাগীর জীবনে আবার এই সব রূপ ও সৌরভের উৎপাত কেন? বিরক্তি বোধ করেন কমলাকান্ত। ইচ্ছা করে তাঁর, এখনি নেমে আসুক সন্ধ্যার অন্ধকার, আলোকপ্রগল্ভ এই অরণ্যলোকের সব রূপ আর বর্ণ ঢাকা পড়ে যাক। দৃষ্টি বিচলিত ক'রে তোলে, চিত্তের বিক্ষেপ ঘটায়, এমন কোন চটুল বর্ণশোভাকে তাঁর জীবনে আর প্রশ্রয় দিতে চান না কমলাকান্ত। পর্ণকুটীরের দ্বার বন্ধ করেন। দুই চোখ বন্ধ ক'রে তাঁর মনের সকল ভাবনাকে এক দিব্য বিভূতি লাভের আশায় ব্যাকুল ক'রে তোলবার চেষ্টা করেন।

সন্ধ্যা নামে ধীরে, অন্ধকারও দেখা দেয়। কিন্তু বনবিহগের সান্ধ্য কাকলি বড় বেশি মধুর শব্দ ছড়ায়। কমলাকান্তের ধ্যানের আবেশ হঠাৎ ভেঙে যায়। পর্ণকুটীরের দ্বার খুলে বাইরে এসে দাঁড়ান। দেখতে পান, আকাশের নীলিমা মুছে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাতের উৎসবে জাগবার জন্য ফুটে উঠেছে একে একে তারকার দীপ।

তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে ঐ তারকাপুলকিত আকাশের দিকে। তাকিয়ে থাকেন কমলাকান্ত। এত সতর্কতা সত্ত্বেও এবং কৃচ্ছ্রকঠোর মনের সকল শাসনকে আড়াল ক'রে যেন একটা সুন্দর কৌতুক তাঁর মনের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। আর, এইভাবেই তাঁর অনুভবের বদ্ধ কপাট যেন সেই কৌতুকের হঠাৎ করাঘাতে মাঝে মাঝে খুলে যায়। তৃষ্ণার্তের মত রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন কমলাকান্ত।

কিন্তু আবার ভুল করেন। তারকাখচিত ঐ আকাশকেই অপরাধী ব'লে মনে হয়। যেন এক প্রণয়াবাসরভীরু নায়িকার মৃদুহাস্যজ্যোতির কণিকা কুড়িয়ে নিয়ে রাতের আকাশ তারার মালা গাঁথছে। ঐ দৃশ্য দেখা উচিত নয়। চোখ নামিয়ে আবার ক্ষুদ্র কুটীরের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন কমলাকান্ত।

এই ঘন বনের নিভৃতে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা আর পাখির সান্ধ্য কাকলির অপরাধগুলিই শুধু দেখতে চিনতে আর বুঝতে পারেন কমলাকান্ত ; কিন্তু দেখতে পান না যে, তাঁরই চিন্তার একান্তে আর অনুভবের নেপথ্যে কোন্ অশান্ত এক স্পৃহার কৌতুকে তাঁর কঠিন বৈরাগ্য হতমান হয়ে রয়েছে। বুঝতে পারেন না, তারার মালা গাঁথছে তাঁর নিজেরই মন। কল্পনাও করতে পারেন না, সংসারবাসনার একটি অর্ধস্ফুট কলিকা লুকিয়ে রয়েছে তাঁর মনের গহনে। বিশ্বাসও করতে পারেন না, তাঁর এই বনবাসী জীবন তপস্বী-জীবনের কঠিন অভিনয় মাত্র, তপস্যার জীবন নয়।

গভীর নিশীথে অকস্মাৎ কমলাকান্তের ক্লান্ত করের জপমালা। যেন চমকে উঠলো। নিকটে কতগুলি আহতের আর্তনাদ যেন বনের নীরবতা ব্যথিত ক'রে থেকে থেকে বেজে উঠছে। পর্ণকুটীর থেকে বের হলেন কমলাকান্ত এবং কিছুদূর অগ্রসর হতেই দেখতে পেলেন, অন্ধকারের সঙ্গে দেহ মিশিয়ে দিয়ে কতগুলি মরণোন্মুখ মানুষ দুঃসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ

করছে। জল চাইছে এক দল পিপাসার্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দস্যু। কোন্ দূর জনপদের কোন্ গৃহস্বামীর সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে এই বনপথ দিয়ে চলে যাচ্ছিল দস্যুর দল। পথশ্রান্ত ও পিপাসার্ত দস্যুর দল অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই অরণ্যের কোথাও কোন জলকুণ্ডের সন্ধান পায়নি।

কমলাকান্ত ত্বরিত পদে ফিরে গেলেন তাঁর পর্ণকুটীরে এবং শীতল জলে পরিপূর্ণ তাঁর ক্ষুদ্র কমণ্ডলু নিয়ে গেলেন। দস্যুদের জল দান করলেন কমলাকান্ত। কি আশ্চর্য, ঐ ক্ষুদ্র কমণ্ডলুর জলেই সকল দস্যুর তৃষ্ণা মিটে গেল।

কৃতজ্ঞ দস্যুদলপতি বলে—আপনি নিশ্চয়ই কোন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, নইলে আপনার ঐ ক্ষুদ্র কমণ্ডলুর জলে এতগুলি মানুষের পিপাসা শান্ত হয় কি ক'রে?

চমকে ওঠেন কমলাকান্ত। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ! এ কি বলে দস্যুদলপতি! তবে কি এতদিনে সত্যই সেই অলৌকিক বিভূতি সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর জীবনে, যার বলে তাঁর স্পর্শপূত ক্ষুদ্র কমণ্ডলুর জল এই অন্ধকারে বিলাপরত এতগুলি দানবীয় পিপাসাকে শান্ত ক'রে দিতে পেরেছে?

দস্যুদলপতি বলে—আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন। অতএব, আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একটি উপহার গ্রহণ করুন যোগিবর।

লুণ্ঠিত দ্রব্যের পেটিকা হতে একটি বস্তু হাতে তুলে নিয়ে কমলাকান্তের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় দস্যুদলপতি। কি বস্তু, অন্ধকারে দেখতে পান না, কল্পনাও করতে পারেন না। কমলাকান্ত। সসংকোচে কয়েক পদ পিছনে সরে গিয়ে বলেন—আমি ধনরত্ন স্পর্শ করি না দস্যুদলপতি।

—ধনরত্ন নয়, একটি দেবমূর্তি! গ্রহণ করুন যোগিবর।

কমলাকান্তের হাতে কঠিন একটি বস্তু তুলে দিয়ে পরমুহূর্তে দস্যুদলপতি সদলে সেই বনপথেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

দেবমূর্তি? এ কেমন ও কিসের দেবমূর্তি? সে মূর্তির সুকঠিন স্পর্শটুকুই শুধু দুই হাতে অনুভব করেন কমলাকান্ত। অন্ধকারে দেখতে পান না, কোন্ দেবতাকে এইভাবে এক দুরন্ত দস্যুর দল তাঁর হাতের মধ্যে ফেলে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পর্ণকুটীরে ফিরে এসে দেবমূর্তিকে মাথার কাছে রেখে ভূতলে শয়ন করলেন কমলাকান্ত। ঘুম ভাঙলো যখন, তখন ভোর হয়ে গিয়েছে, আর জাগ্রত আকাশের সুনন্দিত হৃদয়ের অর্ঘ্যের মত দিবসের আলোর একটি স্তবক এসে লুটিয়ে পড়েছে পর্ণকুটীরের দ্বারে।

চমক লাগে কমলাকান্তের দুই চোখে। তাঁর নিষ্পলক দৃষ্টি যেন বিপুল এক বিস্ময়ের ভারে মন্থর হয়ে থাকে। দেবমূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কমলাকান্ত। রাধারমণ কৃষ্ণের মূর্তি।

হায় রে মূঢ় দস্যু, কি ভয়ানক ভুল ক'রে অখিলরসানন্দ লীলাময় রূপেশ্বরের বিগ্রহ তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেল! ঐ মূর্তির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে কমলাকান্তের অন্তর যে মুগ্ধ হয়ে উঠছে, আর অন্তরের সেই মুগ্ধতাকে প্রতিরোধ করবার শক্তিও যে পাচ্ছেন না। যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে কাতর আবেদনের মত স্বরে ব'লে ওঠেন কমলাকান্ত—প্রেমবিনোদিনী রাধিকার হৃদয়বাঞ্ছা, এখানে এই বনবাসী সাধকের পর্ণকুটীরে কেন তোমার আগমন? কে যোগাবে তোমার বনমালা? তমালের ছায়া কই এখানে? শ্বাপদসংকুল এই অরণ্যে কোনদিনও জেগে উঠবে না কোন ভক্তিমতীর হৃদিরসরাসের পূর্ণিমা! কে করবে তোমার সেবা? যোগীর কমণ্ডলুর জলে তুমি তৃপ্ত হতে পারবে কি রাধারমণ?

—আপনি কি যোগী?

যেন কমলাকান্তকে বিদ্রূপ ক'রে কঠিন একটা প্রশ্ন অকস্মাৎ ধ্বনিত হয়েছে। ভয় পেয়ে চমকে ওঠেন কমলাকান্ত। কিন্তু তখনো বুঝতে পারেননি কমলাকান্ত, তাঁর যোগিত্বের সকল

গর্ব চূর্ণ করার জন্য একটা পরীক্ষা তাঁর অদৃষ্টের নেপথ্যে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছে।

—যোগী নই আমি, তবে কি আমি? বলে দাও, হে মুরলীধারী মনোহর।

অসহায়ের মত যেন আত্মসমর্পণ ক'রে রাধারমণের বিগ্রহের সম্মুখে মাটিতে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করেন কমলাকান্ত।

—বনবাসী মহাশয়, আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি।

দৈববাণী নয়, এ যে মানুষেরই কণ্ঠস্বর। প্রশ্ন শুনে এবার আর চমকে ওঠেন না কমলাকান্ত। কিন্তু পর্ণকুটীরের দ্বারের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় রোধ করতে পারেন না। রাজার মত বেশভূষা এক ব্যক্তি এবং তাঁর সঙ্গে রূপাভিরামা এক অনূঢ়া তরুণী।

রাজসদৃশ মূর্তি সেই ব্যক্তি তাঁর পরিচয় নিজেই ব্যক্ত করেন। —আমি জয়দিয়ার রাজা মুকুট রায়, আর এই আমার কন্যা দুর্গাবতী।

কন্যা দুর্গাবতীকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যে মৃগয়ার জন্য প্রবেশ করছিলেন জয়দিয়ার রাজা মুকুট রায়। নিকটেই এক শিবির রচনা ক'রে অবস্থান করেছিলেন তিনি। সঙ্গে আছে অস্ত্রধারী অনুচরের দল। মৃগ ও ময়ূর ধরবার জন্য অরণ্যের নানা স্থানে জাল পাতা হয়েছে।

লাবণ্যে কল্লোলিত তনু রায়-দুহিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কমলাকান্ত। যেন এতদিনে ঐ আকাশিক নীলিমারই এক খণ্ড স্নিগ্ধতা নেমে এসে এই অরণ্যের বুকে এবং তাঁরই চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। মঞ্জীর নেই দুর্গাবতীর দুই পায়ে। কিন্তু মঞ্জীরের নিক্কণ যেন শুনতে পাচ্ছেন কমলাকান্ত তাঁরই হৃদয়ের গভীরে। অকস্মাৎ সন্ত্রস্তের মত চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন কমলাকান্ত। যেন এতদিনে স্পষ্ট ক'রে নিজেকেই দেখতে পেয়েছেন। রূপ দেখে মুগ্ধ হয়, সেই তৃষ্ণার্ত একটা মন যে লুকিয়ে রয়েছে জীর্ণ গৈরিকের বন্ধনে বন্দী তাঁর এই জীবনেরই এক নিভৃতে।

কৃশ চন্দ্রমার কান্তি দেখে মুগ্ধ হয়েও সঙ্গে সঙ্গে যে বেদনা জাগে মনে, তরুণ সন্ন্যাসী কমলাকান্তের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সেই বেদনাই ফুটে উঠলো রায়-দুহিতা দুর্গাবতীর চোখে। ঐ গলায় রুক্ষ রুদ্রাক্ষের মালা সাজে না, সাজে জুঁই-টগরের মালা। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ ভুল ঐ মূর্তিকে বরণমালা না পরিয়ে এমন ক'রে ছেড়ে দিয়েছে, এই কাঁটার দেশের নির্বাসনে?

বোধ হয় জীবনের প্রথম বেদনামধুর চোখের-জল গোপন করার জন্য মাথা হেঁট করেন দুর্গাবতী। তার পরেই চোখ তুলে পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরের দিকে তাকান। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে রাধারমণের মূর্তিকে প্রণাম করেন। কবরী হ'তে ভোরের-ফুল তুলে নিয়ে রাধারমণের পায়ে ছুঁইয়ে আবার সেই ফুল কবরীতে পরিধান করেন দুর্গাবতী।

পিতা মুকুট রায় ডাকেন—চল।

পিতার সঙ্গে প্রস্থান করেন কন্যা দুর্গাবতী।

পরদিনের প্রাতঃকাল। সেদিন নিজের হাতেই বর্ণলতার কুঞ্জ হতে পুষ্প চয়ন ক'রে নিয়ে এসে রাধারমণের পূজা করলেন কমলাকান্ত।

—এই আমার শেষ পূজা গ্রহণ কর রসেশ্বর। বিদায় নিলাম আমি। তোমার যোগ্য সেবিকা এসে গিয়েছে।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর এই সংকল্প নিবেদন করার সময় বুঝতে পারেননি কমালাকান্ত, পর্ণকুটীরের দ্বারে এসে পূজার নৈবেদ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুর্গাবতী।

—দেবতার কাছে কি সংকল্প নিবেদন করলেন সন্ন্যাসী?

দুর্গাবতীর প্রশ্নে বিব্রত বোধ করেন কমলাকান্ত, যেন তাঁর বিদায়ের পথ অবরুদ্ধ ক'রে এই সংসারের এক সুন্দর মায়া মূর্তিমতী হয়ে পর্ণকুটীরের দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনুরোধ করেন কমলাকান্ত—এ বিগ্রহের সেবার ভার লও তুমি।

—আর আপনি?

—বিদায় চাই।

—কা'র কাছে?

দুর্গাবতীর কঠিন প্রশ্নের সম্মুখে ক্ষণিকের মত নীরব হয়ে থাকেন কমলাকান্ত। কমলাকান্তের কাছ থেকে একটি সত্য কথার ঘোষণা শুনতে চাইছে এই নারীর দুই চোখের কৌতূহল।

কমলাকান্ত বলেন—বিদায় চাই তোমারই কাছে।

দুর্গাবতী বলেন—বিদায় দিতে পারবো না।

কমলাকান্ত—তবে?

দুর্গাবতী—আপনি থাকবেন, আর আমিও থাকবো, দুজনেই এক সঙ্গে প্রতিদিন এই বিগ্রহের পূজা করবো।

কমলাকান্ত বিচলিত স্বরে প্রশ্ন করেন—কতদিন?

দুর্গাবতী বলেন—চিরদিন।

আর কোন প্রশ্ন করেননি কমলাকান্ত। সেদিন সেই প্রভাতে, সেই পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরেই দু'জনে এক সঙ্গে রাধারমণকে প্রণাম করেছিলেন।

কমলাকান্ত আর দুর্গাবতীর বিবাহোৎসবের প্রদীপে এই বনভূমি একদিন আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এই অরণ্যের মধ্যেই এক বিশাল গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা মুকুট রায়। আর, যেখানে ছিল ঐ পর্ণকুটীর, সেখানেই নির্মিত হয়েছিল রাধারমণের মন্দির।

আজও আছে সেই রাধারমণের মন্দির। প্রথম স্থাপিত সেই মন্দিরকে সুসংস্কৃত ক'রে দিয়েছিলেন মুকুট রায়ের পুত্র কৃষ্ণ রায়, ১৫৯৬ শকাব্দের শিলালিপিতে সেই ঘটনার পরিচয় আজও উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে। কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রে মেলার ভিড় যখন শান্ত হয়, তখন মন্দিরের দিকে তাকালে এই প্রশ্নই জাগে মনে, চিরদিনের মিলনের প্রতিজ্ঞায় যে দুটি হৃদয় একদিন এই রাধারমণের সম্মুখে প্রণাম করেছিল আজ কোথায় আছে সেই দুটি হৃদয়?

হ্যাঁ, তারা আছে। বিনি সুতোর মালায় দুটি নামের ফুল হয়ে তারা আজও এক সঙ্গেই আছে। আলমডাঙার উত্তরে যে গ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে আছে রাধারমণের মন্দির, সেই গ্রামের নাম গোস্বামী-দুর্গাপুর।

শুধু অদৃশ্য নামের ফুল হয়ে নয়, সত্যই তারা দু'জন আজও গোস্বামী-দুর্গাপুরের মাঠের মাটিতে পাশাপাশি দুটি ফুল হয়ে দেখা দেয়। সেই ফুলেই গ্রামের মেয়ে আজও পুতুলের বিয়ের উৎসব করে। ছোট ছোট তারার মত আকারের নীল রঙের দুটি ফুল শরৎকালের দুর্বার পায়ের কাছে একই বৃন্তে ফুটে থাকে। তার নাম দুর্গা-কমল।

বাংলার ওমর খৈয়াম

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, যিনি স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস নামেই বেশী সুপরিচিত, তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন আজও রয়েছে।

আমরা জানি কবি গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন। তাঁর জীবন বহু ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা ও বেদনার একটা আখ্যায়িকা। সহস্র সহস্র দেশের মানুষ তাঁর মত মন্দভাগ্য ও নির্যাতন বরণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। এর মধ্যে স্মরণ করার মত কিছু নেই। বর্তমান সমাজের এই স্বভাব, যুগের এই বিকার আজও নিরাময় হয় নি। বহু গোবিন্দ দাসের কণ্ঠরোধ করে রেখেছে আমাদের রাষ্ট্র সমাজ সম্পদ ও নীতির মূঢ়তা ও অনাচার।

মানুষ হিসাবে তিনি অসাধারণ কিছু ছিলেন না। তিনি নগণ্য সাধারণের একজন ছিলেন। কিন্তু প্রতিভা হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন। তাঁর এই প্রতিভার কাছে আমরা ঋণী। তিনি কবি ছিলেন। তাঁর সময়ে কবি আরও অনেকে ছিলেন। কিন্তু কবি হিসাবেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ।

কি কারণে তাঁকে অনন্যসাধারণ বলা যেতে পারে? তিনি তো কোন বড় ছান্দসিক ছিলেন না। ভাষাকে কোন নূতন অলঙ্কারে ঐশ্বর্যবান তিনি করেন নি। তিনি মহাকাব্য লেখেন নি। তিনি ডজন ডজন বই লেখেন নি। তিনি বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিত ছিলেন না। তবে কোন্ বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল যার জন্যে আজও আমরা তাঁকে স্মরণ করতে উদ্যোগী?

সত্যি কথা, তিনি এসব কিছুই ছিলেন না। তিনি কবি ছিলেন—একেবারে ষোল আনা কবি—নিরঙ্কুশ কবি। কাব্যের প্রাণবস্তু, যা ভাবের সহস্র বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যঞ্জনা—যা আমাদের মনের প্রান্তরে প্রান্তরে মেঘরৌদ্রের মায়াজাল সৃষ্টি করে, সম্মোহিত করে, সহজ হবার অবকাশ দেয়, তিনি তারই পরিবেষক ছিলেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভার উৎস, তাঁর বিচার দৃষ্টি ছিল অনিরুদ্ধ ও অনাবিল। তত্ত্ব বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের ভীড় সেখানে ছিল না। আবেগ দিয়েই তিনি যাচাই করে গেছেন সৎ ও অসৎ। নীতিতত্ত্বের লৌকিকতার কোন অনুশাসনের ক্রীতদাস তিনি ছিলেন না।

এই কারণে সেকালের অভিজাত সাহিত্যিকের আসরে তাঁকে অপাংক্তেয় করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কালের কষ্টি পাথরে অনেক সত্যি মিথ্যে, খাঁটি আর ভুয়ো যাচাই হয়ে যায়। আজ ঠিক ঐ কারণেই কবি গোবিন্দচন্দ্রকে আমরা সাহিত্যের আসরে শুধু পাংক্তেয় করে নিয়েছি তা নয়—তাঁকে উচ্চাসনে স্থান দিচ্ছি।

* * * *

এর কারণ আর কিছুই নয়। আধুনিক কাব্যসাধনায় আমরা আজ যে লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি, সে সাধনায় কবি গোবিন্দ দাসকে আমরা পাচ্ছি সতীর্থ সহযোগীর মতন। সেকালের গোবিন্দচন্দ্র আজকের দিনের কাব্যিক সাধনায় পুরশ্চরণ করে গেছেন। এ সাধনায় আমরা তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ অনুভব করছি।

গোবিন্দচন্দ্রের কাব্য, উপমা দিয়ে বলতে গেলে বনশ্রীর মত। একটু স্থূল একটু কর্কশ—লতা গুল্ম ফল ফুল কণ্টকবন—এলোমেলো ঝড় বাতাস, পাখীর ডাক—কিন্তু সব মিলিয়ে একটা স্বভাবজ শব্দে বর্ণে গন্ধে ও শ্যামল প্রাচুর্যে নিষিক্ত তাঁর কাব্য। কিন্তু যা আছে সবটাই খাঁটি। কলমচারা দিয়ে সাজানো বাগানের যত্নকৃত সৌকর্য এর মধ্যে নেই। এই জন্যেই বোধ হয় তাঁকে স্বভাব কবি বলা হয়।

তাঁর 'ফুলরেণু' নামে কবিতা পুস্তক থেকে কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করা হলো। এ কবিতাগুলি সবই আজ থেকে প্রায় ৫২/৫৩ বৎসর পূর্বে লেখা। টেকনিকের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্যের' কবিতাগুলির সঙ্গে এ কবিতাগুলি সমতুল্য। তবে নৈবেদ্যের ভাষা 'ফুলরেণুর' চেয়ে কিছুটা বেশী শালীনতাসম্পন্ন। অপরদিকে 'ফুলরেণুর' কবিত্ব 'নৈবেদ্যের' কবিত্ব থেকে অনেকটা অগ্রসর এবং ভাষার মধ্যে লিরিক সৌন্দর্য অনেক বেশী।

'তুমি আর আমি দেবি তুমি আর আমি
আবার ভাসিয়া গেছি দুরে দুইজন,
তুমি আর আমি দেবি তুমি আর আমি
তরঙ্গে ভাসিয়া ফিরি দুইটি স্বপন।

* * *

'বচনে অমৃত তব, অমৃত অধরে
স্বর্গীয় অমৃতগন্ধে দেহ সুবাসিত
সকল ইন্দ্রিয় আজ একত্রিত করে
নয়নে করিব ভোগ 'কর না বঞ্চিত।'

* * *

আমি এ পুরুষ আর সরলা এ নারী
পাপে পুণ্যে আছি পথে দেখা দুজনারি।'

* * *

ভুলিয়াছ তুমি বটে, তুমি গিরি নদী,
নিত্য বহ নবস্রোতে নব স্থান দিয়া
বালুতে আঁকিয়া তব তরঙ্গ অবধি,
আমি শুষ্ক স্রোতচিহ্ন রয়েছি পড়িয়া।

* * *

তাহারি মমতামাখা মিঠামিঠি চাওয়া
নিশির শিশির ভরা তাহারি নয়ন
তাহারি সলাজ আঁখি দিনে নিভে যাওয়া
তারি মান নব ঘন চুরি করা মন

* * *

যাদেরে দেবতা বলি দিয়াছিনু স্থান
তারা তো দেবতা নহে করিয়াছি ভুল।

সেকালের বায়ুমার্গচারী অতিনৈতিক সমালোচক প্রবরেরা গোবিন্দ দাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন। কবি গোবিন্দ দাসও তাদের শ্লেষবাণে বিদ্ধ করতে ছাড়েনি। শ্লেষালঙ্কারে তাঁর Irony-পটুত্বের নমুনা দেওয়া হলো ঃ—

'কুরুচি-আতঙ্কে ক্ষিপ্ত সুরুচির শ্বান
দংশিবারে সদা তারে করে আস্ফালন
গর্জনে কাঁপায় বঙ্গকাব্যের উদ্যান
সশঙ্কে কবিতাবালা সঙ্কুচিত মন।
কবি কহে কবিতা গো ভয় কর দুর
রুচি ফোবিয়ায় আমি ফরাসী পাস্তুর।

* * *

ইরাণের কবি ওমর খৈয়ামের কথা সকলেই জানেন। ইংরেজীতে তাঁর রুবাইগুলে

অনূদিত হবার পর বিশ্বময় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। এ এক নূতন প্রেমদর্শন (love's philosophy) ; আবেগপ্রধান ও ইন্দ্রিয়ামোদী। কিন্তু বিশ্ববাসী অমৃতবচনের মত ওমর খৈয়ামের রুবাই পান করে আনন্দ পেয়েছে। তার কারণ এর মধ্যে তাত্ত্বিক মস্তিষ্কদর্প--সুরচিশুষ্ক নীতিশ্লোক নেই। প্রাত্যহিক জীবনের ধূলিধূসরতার মধ্যে ওমর খৈয়ামের কাব্য পাঠকের চোখে ক্ষণিকের জন্য তুলে ধরে গোলাপ বাগিচার ছায়াগন্ধ, বুলবুলের গানে ভরা এক টুকরো আনন্দের জগৎ। মানুষ মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। আবেগ এখানে বাধাহীন--অন্তর পেয়েছে মর্যাদা। আশ্চর্যের বিষয় ওমর খৈয়াম যখন আমাদের কাছে এত আদর পেয়েছে--গোবিন্দ দাসের ফুলরেণু কেন পেল না? ফিটজারাল্ড ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করলেন--তাকেই আবার আধুনিক বাঙলা ভাষার চটুল শব্দের ঘুঙুর পরিয়ে আমরা বিমুগ্ধ হয়ে শুনছি। কিন্তু যাঁরা পড়েছেন তাঁরা দেখবেন 'ফুলরেণুর' ঐশ্বর্য, এর love's philosophy বাঙলা সাহিত্যে অভিনব এবং অদ্বিতীয়। এর শব্দ ভাব ভাষা, এ একেবারে বাঙলার মাটীর সুরে মাজা। গাঙ্গেয় জোয়ারের মত এর আবেগ। ইরাণের পক্ষে ওমর খৈয়াম যা--বাঙলার পক্ষে গোবিন্দ দাসও তাই। আজ যদি কেউ কবির নামটি না উল্লেখ ক'রে তাঁর 'ফুলরেণুর' কবিতাগুলিকে আধুনিক প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় অনুদিত করতো, তা হলো সাহিত্যরসিক মহলে নিশ্চয়ই একটা খোঁজ খোঁজ রব পড়তো।

আবেগপ্রধান ও ইন্দ্রিয়ামোদী গুণবিশিষ্ট কবিতা অনেক কবি লিখেছেন। গোবিন্দ দাসের 'ফুলরেণু'ও তাই। তবে এটী সম্পূর্ণ বিশিষ্ট। এ প্রেমের আদর্শে অতীন্দ্রিয় মার্মিকতার স্থান নেই--সুফী বা বৈষ্ণব পরকীয়া, অথবা ভারত-দাশরথি-ঈশ্বর গুপ্ত কাব্যের স্থুল sensuous উল্লাস এর মধ্যে নেই। কবি গোবিন্দ দাসের নর ও নারী সম্পূর্ণ তাঁর নিজের প্রতিভার সৃষ্টি। এ Love's philosophy অপ্রতিম ও অদ্বিতীয়। এ কথাটাই আমাদের আজ নূতন করে জানতে হয়েছে। 'ফুলরেণুর' যে কয়েকটি পংক্তি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তারই মধ্যে কবি গোবিন্দ দাসের 'প্রেম' সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টি ও ব্যাখ্যার আভাষ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ থেকে এ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

* * * *

এখন প্রয়োজন গোবিন্দ দাসকে আজ সাহিত্যের আসরে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়ে আবার প্রতিষ্ঠিত করা।

এ সম্বন্ধে সত্যিকার কাজের দুটি প্রস্তাব করা যেতে পারে। প্রথম--গোবিন্দ দাসের 'ফুলরেণু' জাতীয় নূতন 'প্রেমদর্শন' মূলক কবিতাগুলিকে একত্র ক'রে যদি একটি পুস্তক কেউ প্রকাশিত করেন, তবে আশা হয় গোবিন্দ দাসের মর্যাদা আর তার সঙ্গে সৎসাহিত্যের মর্যাদা এবং বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব--কবি গোবিন্দ দাসের এমন অনেক কবিতা আছে যাকে আমরা সংগীতে স্থান দিতে পারি। প্রকৃত গুণী ও সুরকার যদি তাতে সুরযোজনা করেন, তবে আমাদের বিশ্বাস তা এতই উপভোগ্য ও মনবিমোহন হবে, যাতে গোবিন্দ দাসের আসন আবার সাহিত্যের দরবারে যথাসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবে। যে অনুদার রুচিবাতিক আভিজাত্যের ষড়যন্ত্র তাঁকে একদিন নগণ্যতায় ডুবিয়ে দেবার মতলব করেছিল', সেই অপরাধের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত সাধন হবে। কবির 'ছুঁয়োনা' নামে একটি কবিতার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো। এ কবিতায় সুর সংযোগ করলে তা কতটা রূপপ্রবণ হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়।

ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন
লাগিলে গায় গায়
সহজে ভেঙে যায়
রাখ হে ভালবাসা বাসনা হীন

ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন।

থাকিলে দূরে দূরে
পাবে ভুবন জুড়ে
দেখিবে সদা তারে নিতি নবীন
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন।

কিছুই চেয়ো নাকো
কেবলি দিতে থাক
শোধিতে বাড়িবে সে মধুর ঋণ
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন।

পরশে হয় কালা
দরশে বাড়ে জ্বালা
মানসে ফোটে শুধু প্রেমনলিন
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন।

* * *

যে বিখ্যাত ইরাণী কবি ওমর খৈয়ামের সঙ্গে কবি গোবিন্দ্রচন্দ্রের তুলনা করা হয়েছে তা কতদূর সঙ্গত ও সত্য তার প্রমাণে কবির একটি কবিতার পদ উপসংহারে উদ্ধৃত করা হোল। তাঁর কাব্যদর্শনের Keynote এরই মধ্যে সংক্ষেপে নিহিত।

বৈজয়ন্তী কাব্যে—'মাঘে' কবি বলেছেন,—

স্মরণে অনন্ত পুণ্য মরণে উল্লাস
আমি পাপী—আমি আর কিছুই না জানি
দগ্ধবুকে শত মুখে বহে বার মাস
তোমরা বৈকুণ্ঠ লহ, আমি পাদুখানি।

দিব্যানুভূতি

দিব্যানুভূতি নামে একটা কথা আছে। এ অনুভূতি শুধু নাকি যোগীজনসুলভ। ধ্যানে বসে যোগীদের দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। যা সাধারণতঃ ধরাছোঁয়ার বাইরে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত, তাই তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। অজস্র 'অকথিত বাণী, অগীত গান ও অযুত বাসনা রাশি' রূপে রূপে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। পরম তত্ত্বের হিরণ্ময় অবয়বটি আপনা থেকেই সরে যায়। একটি কল্পরাজ্যের সিংহদ্বার যোগীর চোখের সামনে যেন অবারিত হয়ে ওঠে। যাঁরা মিষ্টিক বা মরমী সাধক, তাঁরাও ঠিক এভাবেই নিত্য রসের সন্ধানে তৎপর। তবে তাঁদের সাধনায় সাধনায় যোগীদের মত কৃচ্ছ্রতার আদর নেই।

'ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু'—শরীর শুকিয়ে যাক্, ত্বক অস্থি মাংস ক্ষয়ে যাক্—সিদ্ধার্থ এই সঙ্কল্প নিয়ে নিদারুণ কৃচ্ছ্র তপস্যায় ডুবলেন সত্যোপলব্ধির জন্য। কিন্তু তাঁকে ব্যর্থ হতে হলো। তিনি দেখলেন শুধু শরীর নিগ্রহই সার হয়েছে, সারতত্ত্বের কোন নাগাল পাওয়া গেল না। পরে অন্যভাবে তিনি সাধনায় মনোনিবেশ করলেন।

বলতে গেলে একটু আকস্মিকভাবেই একদিন তাঁর কাছে জ্ঞানের জ্যোতির্লোক প্রকাশিত হয়ে পড়লো (Enlightenment) ; তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন।

যোগী সাধকেরা চেষ্টা করে, বহু সাধনার প্রসাদে এই রকম দিব্যানুভূতি লাভ করে থাকেন। আপাততঃ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এখন থাক্। কিন্তু প্রশ্ন এই অদ্ভুত অনুভূতির (Strange experience) অধিকারী কি শুধু যোগী মুনিরা। দিব্যজ্ঞান কাকে বলে তা জানি না ; সেটা সম্ভবতঃ একান্তভাবে সাধকদেরই সাধ্যায়ত্ত। তবে সাধারণ মানুষও দিব্যানুভূতির অধিকারী, এ কথাটা বিশ্বাস করি। অধ্যাত্মতত্ত্বের জটিলতার ভেতর না গিয়েও মাত্র মনোবিজ্ঞানের আলোকে বিচার করে একথা প্রমাণ করা যায়। হেন লোক নেই যিনি এক-আধবার বা মাঝে মাঝে 'অদ্ভুত অনুভূতির' আস্বাদ পান নি। এই ধরনের অভিজ্ঞতা চেষ্টা করে লাভ করা যায়, চেষ্টা না করেও লাভ করা যায়। সাধারণ মানুষও মাঝে মাঝে নেহাৎ অভাবিতভাবে এক একটি পরম তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করে বসে। যে তত্ত্ব এতদিন তার বুদ্ধির অগম্য ছিল, তাই হঠাৎ তার অনুভবের মধ্যে এসে ধরা দেয়।

* * * *

সাধারণ মানুষের এই দিব্যানুভূতির পেছনে কোন প্রচ্ছন্ন পরাশক্তির লীলা নেই। এসব নিছক ঘটনাসাপেক্ষ। নিষাদের শরাঘাতে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটির নিধনের ট্রাজেডিতে মুনি বাল্মীকির খেদ তাঁর কবিত্ব শক্তিকে উৎসারিত করেছিল। 'বেলা যে যায়' ডাক শুনে লালাবাবুর চোখে সমস্ত ইহসুখের নশ্বরতা ধরা পড়ে গেল ; তিনি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেলেন। নগণ্য আপেল পতনের ব্যাপার নিউটনের সমস্ত চিন্তাকে বিজ্ঞানসাধনায় অস্থির করে তুললো। তুচ্ছ এইরকম এক একটি ঘটনা অন্তর্লোকে হঠাৎ এমন আবেদনের মত পৌঁছয়, অনুভূতি এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, সমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া অলৌকিক বলে মনে হয়।

নিত্য দিনের জীবনে আমরা পথে ঘাটে অনেক কিছু দেখি। তার মধ্যে কোনটা মনে সাড়া জাগায়, কোনটা চুপচাপ বিস্মৃতিতে মিলিয়ে যায়। তিনটি ঘটনা মনে আছে।

* * * *

—পথ হেঁটে আর ফুরোয় না। সাসারামের ধর্মশালা আর কত দূরে? রাত্রিও গভীর হয়ে এসেছে। একটু দূরে মস্ত বড় একটা পাথর—প্রায় একতলা বাড়ীর সমান। কাছেই একটা পেয়ারা বাগান। উল্কামুখী শেয়ালের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশলাই জ্বেলে পাথরটা একটু দেখে নিয়ে, গা বেয়ে ধরে ধরে ওপরে উঠে শুয়ে পড়লাম। আজ এখানেই নিশিযাপন।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। বাতাসের মাতামাতি একটু বেশী, কৃষ্ণাতিথির ফালিচাঁদ উঠেছে। অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা, অদ্ভুত সব শব্দ। প্রার্থনাধ্বনির মত একটা শব্দ গুমরে গুমরে উঠছে। তারপর ঘণ্টাধ্বনি—সমস্বরে স্তোত্রগান। জ্যোৎস্নাতে দেখা যায় মাঠের বুকে এঁকে বেঁকে চলে গেছে সড়ক—খুব সম্ভব পাটলিপুত্রের দিকে। পথ ধরে চলেছে এক একটা জনতা—Surrealist ছবির মত অস্পষ্ট অবাস্তব, মুণ্ডিতশীর্ষ মানুষের দল। তাদের পরিধানে কাষায় বস্ত্র। যেন একটা বড় সভায় যোগদানের জন্য মিছিল করে চলেছে তারা। স্তোত্রগানের শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে শোনা যাচ্ছে—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। এই পাথরটার মধ্যে কোন যাদু লুকিয়ে নেই তো। গল্পে পড়েছি, 'ক্ষুধিত পাষাণের' বাদসাহী প্রাসাদে এই রকম একটা ঐতিহাসিক ইন্দ্রজাল লুকানো ছিল। দেশলাই জ্বেলে পাথরটাকে ভাল করে দেখলাম।

না, অনুমান মিথ্যে নয়। পাথরের গায়ে খোদাই করে লেখা—দেবানাং পিয় পিয়দশী অশোকের অনুশাসন। মানুষ সুখী হবে, দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবে ; তারই আবেদন রেখে গেছেন মহারাজা অশোক শতাব্দীর প্রস্তর ফলকে।

ঘটনাটা শুনতে খানিকটা অলৌকিক বলেই মনে হবে। শান্ত মনে, মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরে

পরীক্ষা করলেই ব্যাপারটার খুব সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঐ যে ইতিহাসের একটা মোহ এসে হঠাৎ মন ও ইন্দ্রিয় অভিভূত করে বসলো এর মধ্যে বাস্তবিক কোন দৈবী শক্তির কাজ আছে কি? কিছুই নেই। পাথরটার ওপর উঠবার সময় দেশলাই জ্বেলে অন্যমনস্কভাবেই উৎকীর্ণ লিপিগুলি চোখে পড়েছিল। সেইটাই আবার মনের মধ্যে ইতিহাস-পড়া বৌদ্ধযুগের ধারণাটিকে অজ্ঞাতসারে আলোড়িত করে তোলে। তার ফলেই এই Phantasy বা খোয়াব।

* * * *

কোডারমা-গিরিডি বাস সার্ভিস এই পথে যাওয়া আসা করে। বাসের অপেক্ষায় বসে আছি গাছতলায়। এখানে জঙ্গল নেই, শুধু নেড়া নেড়া উঁচু, নীচু মাঠ, পাথরের টিলা, চ্যাপ্টা পাহাড়। দারুণ বৈশাখী প্রদাহে মাঠের ঘাস পুড়ে গেছে। উত্তর দিক হতে এক একটা লু'য়ের হল্কা আসছে থেকে থেকে। রামখড়ির ঢিবিগুলোর ওপর সাদা পাউডারের ঝড় দাপাদাপি করছে। ডাঙ্গাগুলোর দিকে বেশীক্ষণ তাকান যায় না। গুঁড়ো গুঁড়ো অভ্রের কুচি অগণ্যকোটি সূর্য্যের মত জ্বলছে সমস্ত মাঠ ছড়িয়ে। সুন্দরী ধরণীর একী নিদারুণ শ্রীহীনতা। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চক্ষুও বোধ হয় পুড়ে যাবে।

হঠাৎ একটা টুকরো মেঘ ছায়াময় চাঁদোয়ার মত শূন্যে এসে ঝুলে রইল। সামনের হাতীর মত কালো পাথরটার গায়ে ধূপের মত আঠাল কষ ফুটে উঠেছে—পাথরের ঘাম।

না পাথরের ঘাম নয়। সেই মুহূর্ত্তে অনুভব করলাম ওটা পাথরের চোখের জল। আজ নয়, দু'শ কোটি বছর ধরে সৃষ্টির বেদনায় পাথর এইভাবে কাঁদছে। কবে এই প্রথম পুরাকল্পে, জ্বলন্ত ক্ষুব্ধ ম্যাগমা পুঞ্জকে শান্ত করে, সমস্ত অন্তর্ভৌম জ্বালাকে নিজের বুক দিয়ে ঢেকে পাথর এই পৃথিবীর ভূমি সৃষ্টি করেছে। নিজে বিদীর্ণ বিচূর্ণিত হয়ে কোমল পলি মৃত্তিকায় কমনীয় করেছে ধরিত্রীকে।

আমি আর কোডারমার সড়কে বসে নেই। অর্বাচীন বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমি নই। এই সেই গণ্ডোয়ানা ভূমি। যেখানে গলিত প্রস্তরের নিঃশ্বাস শূন্যে মিলিয়েছে একদিন। পরমাণুর যজ্ঞে সৃষ্টি হলো হীরা, পোখরাজ নীলা পদ্মরাগ। কী ঐশ্বর্যে ভরা এই পাথরের প্রান্তর। কী প্রাচীন ইতিহাস রূপকথার মত লুকিয়ে আছে এখানে। এই বরাকরের গড়খ'ই, চূণা পাথরের ধস্ নেমে গেছে—কোটি কীটের চূর্ণাস্থি। পৃথিবীর আদিমতম অধিবাসীর গোরস্থান এই চূণাপাথর। এরই নীচে এখনও নিঝুম হয়ে রয়েছে পৃথিবীর আদিম অরণ্যের সমাধি—কয়লার স্তর। সড়কের পাশে কুলি মেয়েরা ভেঙে রেখেছে চূর্ণ ফেলস্পার আর কোয়ার্টসের স্তূপ। নিরেট গ্রাণিটের স্তর নেমে গেছে নদীর বালিয়াড়ীর দিকে। ঠিক এইখানে একদিন ছিল অতিকায় গোধিকার সংসার। এই পাষাণে পাষাণে এখনো আঁকা আছে কত মরণাহত ডাইনোসরের চুম্বন।

* * * *

তোপচাঁচি লেক ছাড়িয়ে পরেশনাথের গা ঘেঁসে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে যাত্রীবোঝাই বাস চলছে হু হু করে। কনকনে মাঘী শীতের সন্ধ্যা, তার ওপর ঝড় আর শিলাবৃষ্টি। মেঘের জন্য অন্ধকারটা আরও ঘোরাল হয়ে উঠেছে। হেড লাইটের আলোকে দেখা গেল অদ্ভুত মানুষের মত কী একটি জীব গাড়ীর বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে। কৌতূহলী যাত্রীদের চোখ বিস্ময়ে আশঙ্কায় নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে রইল। গাড়ী বেগ কমিয়ে আস্তে আস্তে সেই জীবটির পাশে এসে দাঁড়ালো।

একটি সাঁওতাল তরুণী, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাথায় জঙ্গল-ভাঙা জ্বালানী কাঠের বোঝা। একহাতে কাঠের বোঝা চেপে রেখেছে। আর এক হাতে বুকের ওপর চেপেধরা ক'মাসের একটি শিশু। নিজের পরিধানের ছোট ছিন্ন কাপড়টা খুলে শিশুটিকে আপাদ মস্তক জড়িয়ে নিয়ে, বুকে চেপে সাঁওতাল মেয়েটি হন্‌হন্ করে হেঁটে চলেছে। অঝোরে শিলা আর বৃষ্টির

জল ঝরে পড়ছে তার অনাবৃত অলজ্জ, নিটোল ও স্বাস্থ্যোচ্ছল অবয়বের ওপর। বাসযাত্রীদের বিস্মিত চাহনীর দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে হন্ হন্ করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

শিল্পী নই, তবু ছবি দেখে সুখ পাই। কিন্তু এ ছবির প্রসাদে পেলাম ক্ষণিকের জন্য সেই দিব্যানুভূতি। সৃষ্টির পিছনে মাতৃরূপের সংস্থিতা দুর্দম্যা প্রকৃতির স্বরূপ। শুধু প্রাণের প্রসূতি নয়, প্রাণের ধাত্রী—the biological mother।

অতিরঞ্জন

অতিরঞ্জন বা বাড়িয়ে বলার মধ্যেও একটা আর্ট আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'অতিশয়োক্তি' একটা অলঙ্কার-বিশেষ। অবশ্য বাড়িয়ে বললেই সেটা আর্ট বা অলঙ্কার হয় না। এর মধ্যে রসের সমাবেশ হওয়া চাই—শ্রুতিমধুর ও মনোজ্ঞ হওয়া চাই। ঠিক ঠিক এই অতিরঞ্জন আর্ট প্রয়োগ করতে পারলে, কথা সেখানে সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। বলার ঢং যদি স্থূল হয়, তবে রস মাঠে মারা যায়, রূঢ় মিথ্যার দিকটাই প্রকট হ'য়ে ওঠে। শ্রোতা বিরক্ত হ'য়ে মন্তব্য করেন—গাঁজাখুরী!

আমাদের পুরাণের অখ্যায়িকাগুলি এই অতিরঞ্জনের আদর্শ দৃষ্টান্ত। মহাবীর হনুমান যখন একলাফে সাগর ডিঙিয়ে যায়, গন্ধমাদন মাথায় ক'রে আনে, তখন পড়তে গিয়ে এডভেঞ্চারবিলাসী মানুষের মন অকুতোভয়ে অতিকল্পনার সাগর ডিঙিয়ে যেতে থাকে। মিথ্যা হ'লেও এর মধ্যে মোহ আছে, আকাঙক্ষার আবেগ আছে। এই ধরনের সত্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে কেন যে মানুষ পরিতৃপ্তি পায়, তা বোঝা দুষ্কর। এর কারণ বোধ হয়, বাস্তবতার ওপর বিরূপতা। তার ওপর মানুষের জীবনের বাস্তব দিকটা তো সুখের নয়। কাজেই অতিরঞ্জন চাই-ই—পুরাণ, উপকথা, রূপকথা, ছেলে ভুলানো ছড়া, অতি রোমান্টিক উপন্যাস। চাই, এমন সব গল্প, যাতে রাজার মেয়ে চাষার ছেলের প্রেমে পড়ে, কাঠুরিয়া মাণিক কুড়িয়ে পায়—অভিশপ্ত রাজপুত্র সোনার পালঙ্কে হাজার বছর ধ'রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। আরও আছে—কল্পতরুর কাছে চাইলেই সব পাওয়া যায়। কাম্‌ধেনু সকল কামনা মিটিয়ে দেয়। এক গণ্ডুষ সুধা পান, আর সঙ্গে সঙ্গে চিরযৌবন আর অনন্ত আয়ু। আলাদীনের প্রদীপের মত এই অতিরঞ্জন সমস্ত যুক্তিবুদ্ধিকে পুড়িয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সুন্দর একটি মিথ্যার রাজ্যের মনতে উধাও ক'রে নিয়ে যায়।

* * * *

অলৌকিক কথাসাহিত্যেরও গোড়ার কথা এই। এর মধ্যেও মানুষের আশ্চর্য কমপ্লেক্সের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূত, প্রেত, নিশাচ, ডাইন, দানব ও রাক্ষসেরা সব সাংঘাতিক জীব। তারা প্রায়ই মন্দ ছাড়া মানুষের ভাল কিছু করে না। অথচ এদের বিশ্বাস করতে দ্বিধা নেই। এই কমপ্লেক্সকেই বলা যায়—'ভয় করতেই ভালবাসি'।

আর এক ধরনের অতিশয়োক্তি আর্ট আছে যার মূলে সবটাই মিথ্যে নয়। অতি সূক্ষ্ম পরিহাসরসে ভরা এই গল্পগুলি। আধুনিক যুগে মানুষ কল্পনাকে সংযত করে যে বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও অন্তর্মুখী ভাবদৃষ্টি লাভ করেছে, তারই নমুনা এসব চুট্‌কি গল্প। এ গল্পগুলিকে আজগুবি বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না, অথচ বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে বাধে—বিশ্বাস করলেও মনে একটা খট্‌কা থেকে যায়।

স্বপ্ন ব্যাপারটা অলীক। বায়রনের একটা লাইন আছে—I had a dream which was not all a dream! ঠিক এই ধরনের অজস্র গল্প আছে, যার অলীকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কিছু কিন্তু সবটাই ঠিক অলীক নয়। একে 'নাতিশয়োক্তি' অলঙ্কার বলা যেতে পারে।

তিনটি গল্প মনে পড়ে, যেগুলি বিশ্বাস করতে বড় ভাল লাগে। ইচ্ছে ক'রেই বিশ্বাস করি।

*   *   *   *

গজভূক্ত কপিত্থের কথা শুনেছিলাম ; হাতী বেল গিলে খায়, আর বিষ্ঠার সঙ্গে বেলটি নাকি একেবারে আস্ত আকারে বার হয়, অথচ ভেতরে শাঁস থাকে না—একেবারেই ফাঁপা। এ গল্প বিশ্বাস করতাম না, কারণ হাতীর বেল খাওয়া দেখেছি।

দুধ আর জল মিশিয়ে খেতে দিলে হাঁস নাকি জলটুকু রেখে দুধটুকু খেয়ে নেয়। এ গল্পও বিশ্বাস করিনি, কারণ হাঁসের জল খাওয়া ব্যাপার দেখেছি।

কিন্তু এক বুড়ো খানসামার মুখে রন্ধনকলার অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠার এক গল্প শুনেছি, যেটা আমি বিশ্বাস করি। প্রায় নব্বই বৎসর বয়স হেদায়েৎ খানসামা—নবাবের বাড়ীতে রান্না করতো। মিউটিনিতে নবাব মারা যাবার পর থেকে হেদায়েৎ মিঞা চাকুরীছাড়া। কারণ তার গুণগরিমার উপযুক্ত মাইনে দিয়ে কাজ দেওয়ার মত ভারতে দ্বিতীয় কোন নবাব ওমরাহ্ নেই।

এই হেদায়েৎ বড় বড় রোহিত, মিরগেল, কাৎলা, কালবোশ আস্ত আস্ত ভাজতো। ছুরি বঁটি মাছের গায়েও ছোঁয়াত না। কিন্তু অদ্ভুত তার মাছ ভাজার কায়দা—অলৌকিক বলে মনে হয়। সেই আস্ত ভাজা মাছটির ভেতরে কোথাও এক কুচি কাঁটা থাকতো না।

কি ক'রে সম্ভব? এ প্রশ্নে হেদায়েৎ শুধু হেসেছিল। বলেছিল—একদিন মাছ ভেজে খাইয়ে দেব, তা'হলেই প্রমাণ পাবেন। কিন্তু হেদায়েৎ প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে নি ; হঠাৎ একদিন মারা গেল। তাই হেদায়েতের গল্পটা আজও অবিশ্বাস করতে পারা যাচ্ছে না।

*   *   *   *

শুকুলজী পালোয়ান—মির্জাপুরে বাড়ী। বাইশজন চেলা কড়া সরষের তেল দিয়ে তাঁর পাহাড়প্রমাণ শরীর প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত দলাই মলাই করে। শুকুলজীর চৌদ্দপুরুষ পালোয়ান। পালোয়ানী ক'রেই তাঁরা জমিদারী ক'রে গেছেন।

কথা প্রসঙ্গে একদিন প্রশ্ন করলেন—বিলাতে নাকি বোক সিং নামে মস্ত এক পালোয়ান বেরিয়েছে?

বললাম—বোক সিং নয়—বক্সিং, ওটা কোন পালোয়ানের নাম নয়। ওটা একরকমের পালোয়নী।

শুকুলজী বললেন—তা হোক্, কিন্তু আমার ঠাকুর্দার নাম হয়তো আপনারা শোনেন নি। আমি মনে করি দুনিয়াতে তাঁর চেয়ে বড় পালোয়ান আজ পর্য্যন্ত জন্মায় নি। দিগ্বিজয়ী পালোয়ান ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। তিনি মারা যাবার পর আমরা আরও ভাল ক'রে বুঝলাম তাঁর মহিমা। চিতার ওপর ঠাকুর্দাকে চিৎ ক'রে শোয়ানো হ'ল ; কিন্তু আশ্চর্য, দেখা গেল ঠাকুর্দার শবটি আস্তে আস্তে কাৎ হ'য়ে শেষে উপুড় হ'য়ে রইল। এ দৃশ্যে প্রথমে অবাক হই নি ; কিন্তু একবার, দু'বার, তিনবার। চিৎ ক'রে দিলেই শব উপুড় হ'য়ে যায়। ভয়ে, আশঙ্কায় আমরা বোকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় দৈববাণী হ'ল—ওরে মূর্খ, জীবনে যে কখনো চিৎ হয়নি, কারও হাতে পরাজিত হয়নি, মরে গেলেও কি তাকে চিৎ করতে পারবি?

—অগত্যা ঠাকুর্দাকে উপুড় ক'রে শুইয়েই সৎকার করা হলো।

*   *   *   *

কে না জানে, বাংলার সিল্ক পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঢাকাই মসলিনের কথা কে না শুনেছেন—একটি খালি দেশলাইয়ের বাক্সে এক থান মসলিন ভাঁজ ক'রে রাখা যায়! হ্যান্স এণ্ডারসনের অদৃশ্য রাজপোশাকের গল্প কল্পনার দৌড়ে ঢাকাই মসলিনকেও বেশী টেক্কা দিতে পারে নি।

মুর্শিদাবাদের সিল্কের খ্যাতিও সর্বজনবিদিত। কিন্তু শিল্পপ্রতিভায় মুর্শিদাবাদের তাঁতীদের চেয়ে সেখানকার রংরেজদেরই বড় বলে মনে করি। সে রংরেজ সমাজ আজ বোধ হয় আর নেই। তাদের শেষ প্রতিভা হোসেন রংরেজ মারা যায় ১৮৮১ সালে। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি শিল্পের মৃত্যু হলো, যা ফিরে পাবার জন্যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে বহু দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

হোসেন রংরেজের গল্প শুনেছি। রেশমের কাপড়ে রং ফলাতে তার চেয়ে বড় ওস্তাদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেউ ছিল না। লোকটা বোধ হয় রংয়ের ইন্দ্রজাল জানতো।

একটা বড় কাঠের গামলায় কি সব মালমসলা গুলে একটা কালির মত জিনিস তৈরী ক'রে রাখতো হোসেন। একটী রেশমের কাপড় একবার মাত্র চুবিয়ে নিয়ে দু'বার ঝাড়া দিত শুধু। মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হতো কালির ছাপ। রেশমের কাপড়ে ফুটে উঠত ইন্দ্রধনুর ছটার মত সপ্তবর্ণের সুষমা। এইভাবে একই সল্যুশন (Solution) থেকে হোসেন কচি কলাপাতা রং, আসমানী নীল, ধানী রং, জরদ, বেগুনী ও চাঁপা সব রকম রংয়ের অদ্ভুত সব খাঁটি ও মিশাল জলুস বার করতো।

কিন্তু হোসেন আর নেই—'রং লক্ষ্মী নীরবে রোদন করিতেছে।'

সাম্য ও একাকার

'বৈচিত্র্য থিওরী' নামে একটি বিচিত্র থিওরী আছে। যখনই সাম্যমূলক কোন বিষয়ের প্রস্তাব করা হয়, শিক্ষায়, শিল্পে, সম্পদে বা ক্ষমতায়, তখনই বৈচিত্র্যবাদীদের পক্ষে আপত্তি ওঠে।— সব সমান করে ফেললে বৈচিত্র্য নষ্ট হবে ; বৈচিত্র্যই সৃজনী প্রতিভার মূল ; বৈচিত্র্যই আনন্দের উপভোগ্যতা বৃদ্ধি করে ইত্যাদি ; এমন যুক্তিও দেখান হয় যে, পৃথিবীর মাটি উঁচু নীচু ব'লেই নদীপ্রবাহের সুমঙ্গল ধারা সম্ভব। নইলে সবই ডোবা কিম্বা মরুভূমি হ'য়ে যেত। কাজেই ছোট বড় একটা ভেদ থাকবেই, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয়। বার্ট্রাণ্ড রাসেল আর একটু সূক্ষ্ম যুক্তি তুলেছেন, তবে সেটিও সাধারণ-কথিত এই বৈচিত্র্য থিওরীরই একটি লজিকাল রূপ। তাঁর আপত্তি হলো—সমানাধিকার বা সাম্যবাদের নামে মানুষের কালচারে dead uniformity সৃষ্টি হবার আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ সবই একাকার হ'লে বৈচিত্র্য হবে না, সৃষ্টিশীলতাও ব্যাহত হবে।

* * * *

এই ধরনের বৈচিত্র্যবাদীদের যুক্তি মেনে নিলে মনে হয়, কেশচর্চার উন্নতি করতে হ'লে টাকের প্রয়োজনও অপরিহার্য। কারও মাথায় টাক না দেখলে সুকেশের আনন্দ ও মর্যাদা উপভোগ করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবিক তো একথাটা সত্য নয়। সমস্ত মানুষ সুকেশ হ'লেও কেশচর্চার উন্নতি সম্ভব—এখানে কালচারের উৎসাহের অভাব হবার কোন কারণ নেই। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দুটি ক'রে হাত আছে, এই সাম্যের জন্য হাত থাকার আনন্দ উপভোগ করতে কোন বাধা হয় না। বৈচিত্র্যবাদীরা চান সমস্ত ব্যাপারেই বিরোধ (contradiction) বজায় রাখতে। এও এক ধরনের নিগ্রহধর্মী আমোদ। সুতরাং সমানাধিকারের মধ্যে dead uniformity বা একেঘেয়েমির কোন আশঙ্কা নেই। বরং এতে কালচারের ভিত্তি দৃঢ়তরই হ'য়ে থাকে। বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য এক জিনিস নয়। সাম্যবাদীরাও বৈচিত্র্য চায়—বরং তারা আরও সুস্থ ও সৃষ্টিশীল বৈচিত্র্য চায়। তাদের কাছে 'বৈপরীত্যই' শুধু একমাত্র পরিহার্য।

শিল্পী ইঞ্জিনিয়ার

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) তাঁর লিখিত একটি পুস্তকে মানব সভ্যতার গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, সভ্যতা ক্রমোর্দ্ধ্বগামী নয়। একটানা সংস্কৃতির উৎকর্ষ কোন জাতির বা কোন দেশের হয়নি। আরও বলেছেন যে, শিল্পের বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তিনি দেখিয়েছেন যে, আধুনিক মানুষ কোন কোন বিজ্ঞানে ও শিল্পে অতীত যুগকে পিছনে ফেলে উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু কোন কোন শিল্পে অবনতি ঘটেছে। যেমন, স্থপতি শিল্প।

এ আপসোস অনেকের মুখে শোনা যায় যে তাজমহল আর গড়ে উঠবে না। সেই বাবিলনের শূন্যোদান, মিশরের মহামহিম পিরামিড, হেলেনিক গ্রীসের সেই অ্যাম্ফিথিয়েটার (Amphitheatre) ও পার্থেনন (Parthenon), গথিক (Gothic) প্রাসাদের কারুময় বিরাটত্ব, চীনের প্রাচীর, বরবুদুর, কোনারক বা তাঞ্জোর মন্দিরের প্রশান্ত পাষাণে সুগঠিত স্থপতি কীর্তিকে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানে পুষ্ট মানুষের প্রতিভা অতিক্রম করে বেশী মহনীয় কিছু সৃষ্টি করতে পারছে না।

রাসেল সাহেবের এ অভিযোগ সত্য কি না?

* * * *

আধুনিক কালে, বিশেষতঃ গত মহাযুদ্ধের পর থেকে স্থপতি বিদ্যায় বলতে গেলে নবযুগের আবির্ভাব ঘটেছে। একটু প্রণিধান করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, রাসেল সাহেবের ঐ অভিযোগ সত্য নয়। আধুনিক একটি অভ্রংলিহ sky-scraper। মিশরের পিরামিডের চেয়ে গুণে গৌরবে কিসে যেন ন্যূন, তা বোঝা দায়। অতীতে একটি দুটি পিরামিড লক্ষ দাস শ্রমিক ও শিল্পীর অহোরাত্র শত বৎসরের পরিশ্রমেই সম্ভব হয়েছিল। মানুষের আনন্দ বা স্বাচ্ছন্দ্য তাতে কতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। Art for Art's sake এর মত সে সব ছিল এক একটি শক্তিমদ নরপতির ব্যসন মাত্র। এ হেন স্থপতি কলার অধঃপতন হবে, তাতে সন্দেহ কি?

অট্টালিকা রচনায় যে আধুনিক রীতির পত্তন হয়েছে, সেটা কোন দেশবিশেষের একচেটিয়া নয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত—মরু, দ্বীপ, উপকূল, উপত্যকা, শৈলসানু, সর্বত্র যেখানে যেখানে আজ নূতন জনপদ পড়ে উঠেছে, সেখানকার স্থপতিসমাজ নির্বিচারে আধুনিক রীতিকে বরণ করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিকতা প্রচারে আধুনিক স্থপতি রীতি যতখানি কাজ করেছে, কোন শিল্প সেই দিক দিয়ে মানবসমাজের এতটা উপকার করতে পারেনি। সুদুর্গম আরণ্য কঙ্গোর অভ্যন্তরেই হোক বা দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়া উপকূলের মেলবোর্ণ হোক, সর্ব্বত্র সৌধ রচনার একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কংক্রীটের রোমান্সে মুগ্ধ দেশবিদেশের মানুষ প্রথম আন্তর্জাতিকতার আস্বাদ লাভ করেছে। পোশাক পরিচ্ছদ, চিত্র, ভাস্কর্য বা সঙ্গীত, কোন শিল্পই এতখানি আন্তর্জাতিকতা লাভ করতে পারে নি।

দুঃখের বিষয়, আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদের সহজে কেউ শিল্পী বলে সম্মান দিতে কুণ্ঠিত। প্রতি রাজধানী, বন্দর ও শহরে আধুনিক সৌধ রচনার ভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য করলে এ সন্দেহ দুর হয়ে যায়। সৌধ রচনায়, এমন কি অতি সাধারণ একটি আস্তাবল রচনায় আধুনিক ইঞ্জিনিয়ার যতখানি রুচি, সৌন্দর্য্য জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রমাণ দিয়ে থাকেন, তাতে তাঁদের অশিল্পী বলা অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। বিংশ শতাব্দীর নূতন শিল্পী হলেন আধুনিক ইঞ্জিনিয়ার।

আধুনিক স্থপতিবিদ্যায় ব্রিটিশ ও আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারের প্রতিভার দান সবচেয়ে বেশী।

এদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হলেন গ্লাসগোর চার্লস্‌ রেনি ম্যাকিন্‌টস (Charles Rennie Mackintosh)। এর পরে যে সব বিশ্ববিখ্যাত স্থাপত্যবিশারদের নাম করতে পারা যায়, তাঁরা হলেন—রাইট (আমেরিকা), ডুডোক (হল্যাণ্ড), কর্বুসিয়ে (সুইজারল্যাণ্ড), স্টীভান্স্‌ (ফ্রান্স), আণ্টো (ফিনল্যাণ্ড), আসপ্লুন্দ (সুইডেন), মেণ্ডেলসোন (জার্ম্মাণী), লুবেটকিন (রুশিয়া) এবং ম্যাকগ্রাথ (অস্ট্রেলিয়া)। এঁদেরই সম্মিলিত সাধনায় স্থপতি বিদ্যায় নবযুগের সূচনা করেছে।

* * * *

অতীতের স্থাপত্যের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়--সে সময়ে স্থপতি কার্যে বৈচিত্র্যের কত অভাব ছিল। মধ্যযুগেও এই রকম বৈচিত্র্যের অভাব ছিল। দুর্গ, রাজপ্রাসাদ আর দেবমন্দির--এই তিনটি বস্তু রচনার মধ্যে মোটামুটি তিনটি রীতি অবলম্বন করা হতো। সাধারণ মানুষের গৃহাবাস যতদূর সম্ভব নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু আজ প্রতি জনপদের স্থাপত্য সৌন্দর্যে এতদূর উন্নত হয়েছে যে, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর' বলবার মত উৎসাহ আর কারও নেই। সেটা মধ্যযুগে বা আরও আগে বরং বলা যেতে পারতো।

যুদ্ধোত্তর কালে অট্টালিকা রচনার রীতিতে কত যে বৈচিত্র্যের পরিবেশন করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেই সঙ্গে অজস্র নূতন নূতন সব উপকরণের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে, যা আগে কখনও কল্পনা করা হয়নি। ক্লাব, হোটেল, স্কুল, ব্যাঙ্ক, অফিস, প্রমোদাগার ও হাসপাতাল—প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যবসায়, শিক্ষা বা সেবাসদনের জন্য বিভিন্ন রকমের ডিজাইন উদ্ভাবিত হয়েছে।

আধুনিক স্থপতি রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অনাড়ম্বরতা। এই কারণে আগেকার প্রচলিত অনেক উপকরণকে পরিহার করে নূতন নূতন উপকরণ আমদানী করা হলো। স্থপতি শিল্পে প্রথম বিপ্লবের সূচনা করলো রিইনফোর্সড কংক্রীট (Reinforced Concrete)। তারপরে বিজ্ঞানের সৌজন্যে এল লিফ্‌ট, শৈত্য নিয়ন্ত্রণ, বায়ু চলাচল (air conditioning, ventilating) ও উত্তাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা।

দেয়াল গড়ার উপকরণে প্রথমে বস্তুর রাসায়নিক ও পদার্থ ধর্মের বিচার করে দেখা হয়। তারপব বিচার্য্য বস্তুর বর্ণ। আধুনিক সৌধে বর্ণের যে বিস্ময়কর সমারোহ সৃষ্টি করা হয়, তা অভূতপূর্ব। দেয়ালের বহির্গাত্রে কাল কাঁচ ও নিকেলের আস্তরণ ব্যবহারে সৌধের রূপ কত খুলে যায়, তা আগে কল্পনার বাইরে ছিল। ঝকঝকে নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত, ধাতুর পাত, টেরাকোটা, বেলোয়াড়ী, ক্রোম-স্টীল, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রঞ্জ ও মার্বেলের টালি এবং রঙীন পাথরের সুমসৃণ পাতলা পাতলা চাপ দিয়ে গড়া হর্ম্যগোত্র আজ পুরাণকল্পিত ময়দানবের স্থপতি কীর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে।

* * * *

গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন রৌদ্রদগ্ধ উদ্যানের গাছের ফলের অভ্যন্তরে সঞ্চিত রস এত স্নিগ্ধ শীতলতা পায় কেমন করে? শিল্পী ইঞ্জিনিয়ার এর রহস্য উদ্ঘাটন করে তাকে আপন স্থপতি সৃষ্টির কাজে লাগাল। ইঞ্জিনিয়ার লক্ষ্য করলে কমলা লেবুর খোসাটির গঠনরীতি। খোসার ওপরে প্রথমে একটি শীততাপ প্রতিষেধক আবরণ, তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র সমন্বিত একটি শ্বেতাবরণ, সর্বশেষে একটি চিমড়ে আচ্ছাদন। ইঞ্জিনিয়ার কমলা লেবুর খোসার এই গঠনরীতিকে হুবহু অনুসরণ করে অট্টালিকার দেয়াল রচনা করলো। পালেস্তারা ও ছিদ্রবহুল ইষ্টক দিয়ে রচিত এই রকম দেয়ালঘেরা ভবনে শীতাতপের প্রকোপ স্বাচ্ছন্দ্যের কোনই ব্যাঘাত করতে পারে না।

আধুনিক অট্টালিকা রচনায় ইঞ্জিনীয়ারদের আর একটি বাহাদুরী হলো কম্পননিরোধ ব্যবস্থা। পথের ট্রাম বাসের অবিরাম গড়ানি দুপাশের সৌধভবনগুলিকে যেভাবে প্রতিনিয়ত

ঝাঁকানি দিয়ে যায়, সাবেকী অট্টালিকা সে উপদ্রব বিশ বছরেও সইতে পারবে না। কিন্তু ইস্পাতের ফ্রেমের অদ্ভুত স্পন্দনসহ প্রকৃতি আধুনিক স্থাপত্যকে সে আশঙ্কা থেকে মুক্ত করেছে।

তারপর আসে শ্রুতিকটু শব্দ বা হট্টগোল নিবারণের ব্যবস্থা। এই দিক দিয়েও আধুনিক ইঞ্জিনিয়ার তার কুশলতার প্রমাণ দিয়েছে। শব্দ-নিরোধক (Sound-proof) বস্তুবিশেষ দিয়ে দেয়াল, সিলিং ও ছাতের পালেস্তারা প্রতি সৌধের আভ্যন্তরীণ প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে।

আধুনিক স্থপতি বিদ্যায় ভবনের বায়ু চলাচল ব্যবস্থা এতটা সুসম্পাদিত হয়ে থাকে যা ইতিপূর্ব্বে কোন যুগে সম্ভব হয়নি। দশ হাজার বাসিন্দা ভরা একটি বিরাট হর্ম্যের দশতলা পর্যন্ত প্রত্যেকটি জানালা কপাট, ধূলো, মাছি-মশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিশ্ছিদ্র করে আঁটা থাকে, কিন্তু যান্ত্রিক উপায়ে এমনই সুন্দর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা,—যে ভবনবাসীরা কোন সুইস স্বাস্থ্যনিবাসের মত প্রফুল্ল ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন থেকে বঞ্চিত হয় না।

বাসভবনের উত্তাপ সংরক্ষণেও এই রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্ভব।

* * * *

নূতন সৌধ শিল্পে ইঞ্জিনিয়ারকে খুব বেশী যত্ন ও নজর দিতে হয়েছে আলোক ব্যবস্থার দিকে। আলোক বিন্যাসের মধ্যে সৌধের রূপ অনেকখানি নির্ভর করে। তা ছাড়া বাসিন্দাদের সুবিধা ও প্রয়োজনের কথা তো আছেই। আলোক ব্যবস্থা প্রকরণের যে কত নূতন রীতির উদ্ভব হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রখর রৌদ্রের মত উজ্জ্বল আলোক থেকে শুরু করে কৌশলে আজ ভবনে ভবনে উপভোগ সম্ভব হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর নূতন শিল্পী, আধুনিক সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই ইঞ্জিনিয়ার শ্রেণী ; তাঁদের প্রতিভা আজ স্থপতি বিদ্যাকে যে-ভাবে প্রগতিশীল করে তুলেছে, তাতে বিংশ শতাব্দীর মানুষ নূতন এক শিল্পানন্দের অধিকারী হবে।

প্রবন্ধ

চিত্রশিল্পী যামিনী রায়

শিল্প হলো শিল্পীর মনের পরিচয়। সুতরাং যে-শিল্প যত সহজবোধ্য ও সহজে উপভোগ্য, সেই শিল্পের পেছনে তার মূলাধার শিল্পী-মনটীকেও তত সহজে বুঝতে পারা যায়। বি এমন শিল্পও আছে যার ভেতর সহজ সরল ও ঋজু আবেদন নেই। এখানেই শিল্পরসিকের সঙ্কট। এক্ষেত্রে সে দুটো পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথমে সে বুঝবার চেষ্টা করে শিল্পীকে অথবা শিল্পীর মনকে। শিল্পীর মনের পরিচয় পেয়ে নিয়ে তারপর সে অগ্রসর হয় শিল্পের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচারে। এ ব্যাপারটি অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতে দেওয়ার মত উদ্ভট অপসাধনা। যেখানে কোনো শিল্পকে বুঝতে হলে আগে শিল্পীর মনকে বুঝে নিতে হয়, সেখানে স্বভাবতই এ ধারণা জন্মে যে, এ শিল্পের প্রমাদগুণ নেই, ব্যঞ্জনা নেই এবং সবচেয়ে যা বড় ঐশ্বর্য, সেই শিল্পরসও নেই। কাজেই আমরা বিচার করব শিল্পকেই এবং শিল্পের ভেতর দিয়ে যে জীবনবেদ রঙে ও রেখায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে—তার মহিমা ঐশ্বর্য্য ও অনন্যসাধারণত্বকে।

শিল্প বিচারের এই প্রাথমিক নিয়মতন্ত্র মেনে নিয়েই আমরা যামিনীবাবুর শিল্পের বিচার করব। এ বিচারে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, হিন্দু রীতিনীতির সনাতন ধারা, সোনার বাঙ্গলার রূপসাধনার পদ্ধতি ইত্যাদি লৌকিক বা ভৌগোলিক কোনো কনভেনশনের আমল দেওয় চলবে না। নির্মোহ রসানুগা প্রীতিদৃষ্টি নিয়ে শিল্পের বিচার করলে তার প্রকৃত মূল্য যাচাই সম্ভব হয়। যামিনীবাবুর শিল্পও সে হিসাবে কতটা শিল্পরসোত্তীর্ণ তা এইভাবে যাচাই হবে।

প্রথম দেখতে হবে যামিনীবাবুর টেকনিক এবং উপকরণ। যামিনীবাবুর চিত্রশিল্পের প্রাণবস্তু হলো অনাড়ম্বরতা। টেকনিকেও যেমন কৃচ্ছ্র আড়ম্বরের প্রয়াস কোথাও নেই, তেমনি তাঁর শিল্পোপকরণের সুচারু প্রাঞ্জলতা। অনাড়ম্বর বলেই যে তাঁর চিত্র অলঙ্কারবিহীন তা নয় সুসংযত ঐশ্বর্যে অলঙ্কৃত তাঁর চিত্রশিল্প। প্রত্যেকটি আঁচড়, প্রত্যেকটি রেখাপাত এবং বর্ণাবলেপ নিখুঁতভাবে মাত্রাহীন। এখানে তুলিকাবিলাসের অবকাশ কোথাও নেই। তপশ্চর্যার মত নিরন্তর সাধনা ও অপরিসীম নিষ্ঠার বলে তিনি এই শৈল্পিক শ্রীকুশলতা লাভ করেছেন।

প্রায়ই একটা অভিমত লোকের মুখে মুখে শোনা যায়—যামিনীবাবু নাকি খাঁটি বাঙালী পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ইউরোপীয় টেকনিকে নিঃসংশয় নিপুণতা থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি দেশী পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন। তিনি নাকি বাংলার পটুয়া প্রীতির উপাসক—নিজের প্রতিভার সংযোগে তিনি এই রীতির অভ্যুত্থান সাধন করেছেন। অর্থাৎ তিনি পুনরুজ্জীবনবাদী (revivalist)। আমরা এ ধারণা পোষণ করি না। আমাদের মতে তিনি কোনো রীতির উপাসক নন। দিনের পর দিন তিনি সাধনা করে এসেছেন ; শিল্পের প্রত্যেক পথ ও মত তিনি অতিক্রম করে এসেছেন। তিনি কোনো রীতিকে এড়িয়ে যাননি। সবশেষে তিনি পৌঁছেছেন এই সরল রূপসৃষ্টির স্থিতিতে। একে যামিনীবাবুরই পদ্ধতি বলা চলে। আরও স্পষ্ট করে বলতে পারা যায়, শিল্পের ঐতিহাসিক পদ্ধতি।

ইউরোপীয় চিত্রশিল্পে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে তার কারণ অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কেউ কেউ বলেন যে, এই অস্থিরতা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক পরিণতি, কেন না ইউরোপীয় শিল্পে যে আন্তরিক দৈন্য এতদিন ওপরের জলুসে চাপা পড়েছিল, তাই এই ভাঙনের উপদ্রবে আজ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইউরোপেও অল্পদিনের মধ্যে অনেক পদ্ধতি গড়ে উঠলো। আবার অল্পদিনের মধ্যে সেসব বাতিল হতে চলেছে। কিন্তু সবারই ভেতর একটা সাধারণ একলক্ষ্যাভিমুখী গতি দেখা যাচ্ছে। সেটা হলো এই আড়ম্বরতার বিলোপ সাধন। অলঙ্কার আড়ম্বর ঘোচাতে গিয়ে অনেকে আবার তাঁদের চিত্রকে হেতুহীন বা abstract করে ফেলেছেন ; কেউ বা করে ফেলেছেন নিতান্ত লঘু ও চটুল বর্ণসজ্জা

এখানেই আসে প্রকৃত শিল্পীর পরীক্ষা। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে যে শিল্প রসপীঠে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম, তাকেই সজীব ঐতিহাসিক শিল্প বলা যায়।

যামিনীবাবুর চিত্রশিল্পে আমরা এই ঐতিহাসিকতার আভাস পাই। কেউ বলতে পারবেন না যে এ শিল্পে কিউবিজ্‌মের প্রাধান্য আছে, ফিউচারিস্ট স্ফূর্তি বা ঐরকম কোন কাটাছাঁটা পদ্ধতির অনুসরণের প্রয়াস আছে। সব কিছুই থাকতে পারে। কিন্তু সেটা শুধু এই শিল্পের রূপ ও সৌষ্ঠবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনের জন্য।

সদৃশ রূপ বা exactness বর্জন করে রূপসৃষ্টির প্রয়াস শিল্পক্ষেত্রে নূতন কিছু নয়। স্পেনের প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের ভেতর সুপ্রাচীনকালের বর্বরশিল্পী যেভাবে তার মনোচ্ছবি উৎকীর্ণ করে গেছে, তার ভেতর শিল্পরসের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের টেকনিকে আড়ম্বরের বাহুল্য ছিল না, exactness ছিল না। কিন্তু সেই কারণেই গুহাচিত্র সত্যিকার শিল্প হিসাবে আখ্যাত হচ্ছে। তারপর মানুষের সামাজিক রুচি যেমন ঈজ্‌ম-পীড়িত হয়ে উঠতে লাগল, শিল্পক্ষেত্রেও দেখা দিল সেই অবান্তর আড়ম্বর বা ইজ্‌মের উপদ্রব। কিন্তু সে মোহ ভেঙে গেছে। শিল্পী আবার খুঁজছে সরল রূপসৃষ্টির পথ। Exactness বাদ দিয়ে, প্রকৃতির প্রসাদে একান্তনির্ভর না থেকে, প্রতিচ্ছবির বদলে মনোচ্ছবি সৃষ্টি করার সাধনায়।

যামিনীবাবুর চিত্রশিল্পে প্রতিচ্ছবিতার কোনো বালাই নেই। এমন কি অ্যানাটোমির ব্যাপারেও তিনি এ অনুশাসন মেনে চলেননি। কিন্তু তবুও যে তাঁর চিত্র এত জীবন্ত—সে শুধু তাঁর শিল্পপ্রাণতার পরাকাষ্ঠার জন্য। নইলে কোনো চিত্রশিল্প এতটা নিরাভরণ থেকেও এই শ্রীমণ্ডিত রূপ লাভ করতে পারতো না।

আর একটি কথা। যামিনীবাবু কোন বিশিষ্ট একটি টেকনিকে চিত্র বা আলেখ্য রচনা করেন, তা নয়। বলতে গেলে তাঁর রচনাভঙ্গী নির্বিশেষ। তাঁর প্রদর্শনীতে প্রবেশ করা মাত্র দর্শককে প্রথমে এই বিষয়ে ধাঁধায় পড়তে হয়—এত বিচিত্র পদ্ধতি ও কারুমিতির সমারোহ! কোনো বৈষাকরণিক সূত্রনিষ্ঠা নিয়ে তিনি রচনার সৌষ্ঠব বিধান করেন না। এ বিষয়ে তাঁর যা কর্তব্য তার প্রেরণা পান তিনি নিজের মন হাতড়ে। তাঁর শিল্পীমনই তাঁকে বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যায়—যার ফলে তিনি রূপের ফসল সৃষ্টি করেছেন। প্রথম শ্রেণীর শিল্পপ্রতিভা ও সত্যিকারের গুণীর এই একমাত্র পরিচয়।

কয়েকটি বিশিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(১) ভীল ঃ ভারতের তিনটি প্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্যতম গোষ্ঠী হলো ভীলেরা, আর দুটি প্রধান গোষ্ঠী হলো সাঁওতাল ও গন্দ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও রাজপুতনার দেশীয় রাজ্য অঞ্চলে ভীল সমাজের প্রধান বসতি। ঠক্কর বাপার উদ্যোগে ১৯২১ সাল থেকে ভীল সেবামণ্ডল নামে একটি সমিতি এদের মধ্যে সেবা, শিক্ষা ও সংস্কারমূলক কাজ করে আসছে। অনেকগুলি বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে।

ভীল সমাজে সম্প্রতি এক ভীল কর্মবীরের প্রেরণায় বিরাট সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই ভীল কর্মবীরের নাম গুলা মহারাজ। গুলা মহারাজের প্রেরণায় হাজার হাজার ভীল মাদক বর্জন করে এবং স্নান, শৌচ প্রভৃতি নিত্যাচার উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে। তা ছাড়া ভীলেরা স্বয়ং স্বসমাজে শিক্ষাপ্রচারের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

(২) ভুঁইয়া ঃ ভুঁইয়ারা অধিকাংশ ওড়িশার করদ রাজ্যগুলিতে বাস করে। সংস্কৃতির দিক দিয়ে সমস্ত ভুঁইয়াসমাজ এক স্তরে নেই, কোন কোন উপগোষ্ঠী একেবারে আদিম সভ্যতার স্তরে আছে, যেমন কেওনঝড়ের পাহাড়ী ভুঁইয়ারা। আবার দেখা যায় গাঙ্গপুর প্রভৃতি

কয়েকটি স্টেটের ভুঁইয়া জমিদার সমাজ একেবারে আধুনিক হিন্দুর মতো সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন।

(৩) চাকমা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী চাকমা আদিবাসী সমাজ। এঁরা কৃষিপ্রধান সভ্যতা গ্রহণ করেছে। ১৫/২০ বৎসর পূর্বে পর্যন্ত এরা হলকর্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। 'ঝুম' প্রথায় চাষের প্রচলন ছিল। বর্তমানে এরা অধিকাংশই 'হলধরের' আদর্শে দীক্ষিত, লাঙল দিয়েই কৃষিকার্য করে।

(৪) গড়াবা ঃ ওড়িশার কোরাপুট এবং মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টম জেলায় এদের বসতি। মেয়েদের মধ্যে পরিচ্ছদের আড়ম্বর খুব বেশি। তুলো ও অন্যান্য উদ্ভিজ আঁশের তৈরি সুতোয় এরা স্বহস্তে বস্ত্র তৈরি করে নেয়। বস্ত্র বয়ন ও রন্ধনের কাজ এদের গৃহশিল্প, মিলের তৈরি বস্ত্র এরা সহজে ব্যবহার করে না। গড়াবা মেয়েদের কর্ণাভরণ দেখবার মতো ; পেতলের তার দিয়ে তৈরি ৮ ইঞ্চি ব্যাসের গোলাকার মাকড়ী দুকান থেকে লম্ববান হয়ে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে থাকে।

(৫) গারো ঃ আসামের গারো আদিবাসীরা সমাজব্যবস্থায় খুবই উন্নত। আদর্শ গণতন্ত্রবাদের দৃষ্টান্ত গারোসমাজ। নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদা সমানভাবে স্বীকৃত। গ্রামসভায় বিচার ও বিপদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই আলোচনায় যোগদান করে।

(৬) গন্দ ঃ গন্দেরা সংখ্যায় প্রায় ২৫ লক্ষ এবং মধ্যপ্রদেশেই ১০ লক্ষ গন্দ বাস করে। প্রাচীনকালে কতগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত গন্দ রাজ্য (state) ছিল এবং বর্তমানেও গন্দ গোষ্ঠীর কয়েকজন দেশীয় রাজন্য (Native Chief) আছেন। গন্দ রানী দুর্গাবতী মোগল বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন। গন্দওয়ানা (Gondwana) নামে যে বিশিষ্ট শিলাময় ভূখণ্ডের কথা ভূতাত্ত্বিকের (Geologist) পরিভাষায় পাওয়া যায় তার নামকরণ এই গন্দভূমি থেকেই হয়েছে। গন্দভূমির পাষাণের বেল্ট আফ্রিকা মহাদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। মারিয়া গন্দ, মুরিয়া গন্দ প্রভৃতি কয়েকটি গন্দ উপগোষ্ঠী আছে, যারা নৃতাত্ত্বিকের (Anthropologist) বিচারে পৃথিবীর আদিমতম নরগোষ্ঠীর অন্যতম নমুনা বলে স্বীকৃত হয়েছে।

(৭) কাছাড়ী ঃ জনসংখ্যার দিক দিয়ে কাছাড়ীরা আসামের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী সমাজ, প্রায় ৩½ লক্ষ। কিংবদন্তী বলে—কাছাড়ীরা ভীম, হিড়িম্বার পরিণয়জাত পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর। হরিজন সেবক সঙ্ঘ কাছাড়ীদের মধ্যে কিছু কাজ করেছে। আসাম গভর্নমেন্টের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম কাছাড়ীসমাজের মানুষ।

(৮) বৈগা ঃ এরা মধ্যপ্রদেশের গন্দসমাজের একটি প্রতিবেশী গোষ্ঠী। কিন্তু গন্দদের তুলনায় অনেক অগ্রসর। 'ঝুম' চাষের দিকে এদের ঝোঁক বেশি ; লাঙল গ্রহণে আগ্রহ নেই। যাদুতন্ত্রে খুবই বিশ্বাসী। ভেরিয়ার এলুইন (Verier Elwin) নামক ইংরাজ নৃতাত্ত্বিক বৈগ্য সমাজে থেকে অনেক গবেষণা করেছেন। ভারতের আদিবাসীদের দাবি নিয়ে মিঃ এলুইন তাঁর নানা লেখার মধ্য দিয়ে আন্দোলন করে থাকেন। আদিবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে মিঃ এলুইনের বক্তব্য, অভিমত ও ব্যাখ্যা কতদূর যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(৯) কত্কারি ঃ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে এদের বসতি। কত্ বা কথ্ অর্থ হিন্দীতে খয়ের। এই আদিবাসী গোষ্ঠী পূর্বে খয়ের তৈরি করেই জীবিকা নির্বাহ করতো, এদের নামকরণ থেকেই তা বোঝা যায়। এখনও কেউ কেউ এই পেশা রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ কত্কারি কাঠকয়লা এবং জ্বালানি কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। ১৯৪০ সালে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী থানা জেলায় আদিবাসী সেবামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় কত্কারি, বর্লি ও ঠাকুর প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর উন্নতির জন্য উদ্যোগ নেন।

(১০) খাসি বা খাসিয়া ঃ কিংবদন্তী বলে খাসি গোষ্ঠীর আদিবাসীরা অর্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর। খাসি সমাজের খৃস্টধর্ম প্রচার খুব বেশি রকমের হয়েছে এবং খৃস্টান খাসি সমাজের নরনারী ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পর্যন্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। খৃস্টান খাসি সমাজে শিক্ষার প্রসারও মোটের ওপর ভালো। আসামের প্রাক্তন মন্ত্রিসভায় মিস্ ডান (Miss Dumn) নামে জনৈকা খাসি মহিলা অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। খাসিয়া অঞ্চলের বহু বিদ্যালয়ে রোমান অক্ষরে খাসি ভাষা লেখা, ছাপা ও পড়ানো হয়, অসমীয়া অক্ষর গ্রহণ করা হয়নি। খাসি দেশীয় রাজ্যগুলিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু রাজার ক্ষমতা কিছুটা গণতন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ দরবার বা মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

(১১) খন্দ ঃ প্রধান বসতি ওড়িশায়, সংখ্যায় প্রায় ৭½ লক্ষ। খঁন্দদের মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আইন করে এই প্রথার উচ্ছেদ করেছেন। যে ব্যক্তিকে বলি দেবার জন্য নির্দিষ্ট করা হতো, তাকে 'মারিয়া' বা উৎসর্গ বলা হতো। ১৯০১ সালের আদমসুমারিতে ২৫ জন খন্দ নিজেদের 'মারিয়া' শ্রেণী বলে পরিচয় দেয়, অর্থাৎ তারা মারিয়াদের বংশধর। বলি দেবার জন্য নির্বাচিত ২৫ জন মারিয়াকে গভর্ণমেণ্টের লোক উদ্ধার করেছিল, এরা তাদেরই বংশধর। খন্দেরা এর পর থেকে নরবলির বদলে মহিষ বলির প্রথা গ্রহণ করেছে। মারিয়া অনুষ্ঠান বা নরবলির প্রথা আইন করে উচ্ছেদ করা হলেও মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে এমন এক একটা গোপন হত্যাকাণ্ড হয়, যাকে বস্তুত মারিয়া অনুষ্ঠান বলিয়া সন্দেহ করবার কারণ থাকে। ১৯০২ সালে খন্দ সমাজের পক্ষ থেকে গঞ্জামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মর্মে এক আবেদনপত্র পেশ করা হয়েছিল যে, আবার তাদের নরবলি বা মারিয়া অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হোক। সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি খন্দসমাজের জন্য কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেছেন এবং অন্যান্য সেবা বা শিক্ষামূলক কাজের জন্য একটা আশ্রমও করেছেন। গঞ্জাম পাহাড়ী অঞ্চলের খন্দেরা গভর্ণমেণ্টকে কোন ভূমিকর (Land Tax) দেয় না। মারিয়া অনুষ্ঠান বর্জন করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গভর্ণমেণ্ট নাকি প্রায় একশ' বছর আগে খন্দদের প্রতি শুভেচ্ছা ও পুরস্কারস্বরূপ এই অনুগ্রহ দেখিয়েছেন।

(১২) কোণ্ডা-ডোরা ঃ পূর্ব গোদাবরী জেলায় এদের বসতি, বর্তমানে বহুল পরিমাণে তেলেগু-সংস্কৃতি এরা গ্রহণ করেছে। এরা পাহাড়ের ওপরেই চাষবাস করে। এরা সম্ভবত খন্দ গোষ্ঠীর একটি শাখা।

(১৩) কোইয়া ঃ এরাও তেলেগু-সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। এরা সম্ভবত খন্দ গোষ্ঠীরই একটি শাখা।

(১৪) কুকি ঃ আসামের একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। পার্বত্য ত্রিপুরাতেও এরা আছে। নাগা গোষ্ঠীর মতো এদের এক শ্রেণীর মধ্যে মুণ্ড-শিকার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাবেক কুকি সমাজে বিবাহেচ্ছুক কুকি যুবককে আগে কোন শত্রুকে হত্যা করে তার মুণ্ড নিয়ে আসতে হতো, তবে তার বিবাহ সম্ভব হতো। গ্রামের মধ্যে উঁচু বাঁশের চূড়ায় শত্রুর মুণ্ড ঝুলিয়ে রাখার প্রথা ছিল।

(১৫) লুসাই ঃ দক্ষিণ-পূর্ব আসামে প্রায় বর্মার গাঁ ঘেঁষে লুসাই পাহাড় অঞ্চলে এদের বাস। অঞ্চলটি পথহীন দুর্গমতার জন্য প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলে যাতায়াতের একটি বৈশিষ্ট্য দোল্না-পথ। এদের মধ্যেও মুণ্ডশিকার প্রথা প্রচলিত ছিল।

(১৬) মিকির ঃ একটি অহিফেনবিলাসী সমাজ। মিকির (এবং খাসিয়ারা) মৃৎশিল্পে পারদর্শী, অলাতচক্র বা কুমোরের চাকা ব্যবহারের কৌশল এরা জানে। তুলো এবং ধানের চাষও এরা জানে, কিন্তু চাষের পদ্ধতি সেই অতি-পুরাতন 'ঝুম' প্রথা।

(১৭) নাগা ঃ আসামে এদের বাস এবং সংখ্যায় ২¾ লক্ষ। মুণ্ডশিকারের পদ্ধতি এদের মধ্যে প্রবলভাবে ছিল এবং এখনও আছে।

গুইডালো নামে এক নাগা রমণী সম্বন্ধে আধুনিক রাজনীতি-উৎসাহী ভারতীয় সমাজ কিছু কিছু খবর রাখেন। পণ্ডিত নেহরু এঁর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে উল্লেখ করায় গুইডালোর কাহিনী বহু প্রচারিত হয়। তরুণী গুইডালো এবং আর একজন নাগা তরুণ, উভয়ে এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে। বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ-ভারতীয় পুলিস ও সৈনিকের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পলিটিক্যাল অফিসারের আবাস আক্রমণ করে। উভয়েই—তরুণী গুইডালো এবং তার সহকর্মী তরুণ নাগা পরাজিত হয়ে বন্দী হয়। তরুণটির ফাঁসি হয় এবং গুইডালোর হয় নির্বাসন। সম্প্রতি এ বিদ্রোহিনী নাগারমণী মুক্তিলাভ করেছেন।

(১৮) ওরাওঁ ঃ ছোটনাগপুরের একটি প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠী। ওরাওঁদের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। রাঁচী শহরে ও জেলায় ওরাওঁ এবং মুণ্ডাদের কয়েকটি স্কুল আছে। বহু ওরাওঁ ছোটনাগপুরের খৃস্টান মিশনারিদের সুদীর্ঘ প্রচার-সাধনার ফলে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। অখৃস্টান ওরাওঁদের মধ্যে রায় সাহেব বন্দিরাম জনৈক বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং তিনি বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য।

ছোটনাগপুরের ওরাওঁ এবং মুণ্ডাসমাজে ইংরেজি শিক্ষার কিছু প্রসার হওয়ায় অন্যান্য প্রত্যেক প্রদেশের আধুনিক ভারতীয়ের মতো একটা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক (Middle class) শ্রেণী গড়ে উঠেছে। খৃস্টান এবং অ-খৃস্টান ওরাওঁ ও মুণ্ডাদের দুই সমাজেই 'ভদ্রলোক' শ্রেণী দেখা দিয়েছে। কিন্তু খৃস্টান খাসিয়া সমাজের মতো এরা বেশভূষায় ফিরিঙ্গিয়ানা গ্রহণ করেনি।

(১৯) পরাজ ঃ কিছু কিছু কৃষিকাজ এবং গরু ও শূকর পালন পরাজদের জীবিকা। পরাজ মেয়েদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য আছে। পরিচ্ছদ মাত্র একটি দশ আঙুল চওড়া কাপড় কোমরে জড়ানো। অলঙ্কারের মধ্যে বুকভরা অজস্র পুঁতির মালা। মেয়েরা মাথা নেড়া করে তার ওপর একটি টায়রা এঁটে দেয়।

(২০) সাঁওতাল ঃ সংখ্যায় প্রায় ৩০ লক্ষ ; সাঁওতাল পরগণাতেই এদের সংখ্যাধিক্য। এরা কৃষিতে অভ্যস্ত, গৃহ, সমাজ ও গ্রামের প্রতি অনুরাগী। কিন্তু ভারতবর্ষের সকল আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র সাঁওতালরাই সবচেয়ে দ্রুত মজুর-জীবন গ্রহণ করেছে। এরা দলে দলে চা-বাগানের শ্রমিক হয়ে দেশান্তরে গেছে, কোলিয়ারী বা কয়লার খনিতে মালকাটার কাজ নিয়েছে এবং বহু কারখানাতে দৈনিক বাঁধা পরিশ্রমের প্রথায় মজুরবৃত্তি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন নতুন অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে এরা নিজেকে খাপ খাইয়ে চলবার মতো গুণ ও শক্তি রাখে। বাঙলাদেশেও এরা কৃষক হয়ে জীবিকা অর্জন করে থাকে। পতিত ও জংলী জমিতে আবাদের পত্তন করতে এদের সমকক্ষ কেউ নেই।

(২১) শবর ঃ দক্ষিণ ওড়িশায় বসতি। রামায়ণের শবরীর উপাখ্যান আধুনিক ভারতীয়দের চিত্তে করুণ-মধুর সমবেদনা সৃষ্টি করে। রামায়ণের শবরী এই শবর জাতির মানুষ—ইতি জনশ্রুতি। রামচন্দ্রের জন্য পথের দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে শবরীর, তবু প্রতীক্ষায় ক্ষান্তি নেই। সে শুধু দৃষ্টি মেলে পথের দিকে চেয়ে আছে। ঈপ্সিতের জন্য প্রতীক্ষায় এই বুকভরা জীবনপণ আকুলতা, শবরী যেন স্বয়ং একটি আগ্রহের মহাকাব্য।

শবরেরা, পাহাড়ের গায়ে ধাপে আঁলবাঁধা খেত তৈরি করে এবং তার সঙ্গে অতি সুন্দর কৌশলে সেচব্যবস্থাও করে থাকে। এই ধাপ-বাঁধা কৃষি ('Terraced cultivation') যাদের আয়ত্ত তারা কৃষিকলা যথেষ্ট উন্নত সন্দেহ নেই।

(২২) টিপ্‌রা ঃ পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের এদের বসতি। এদের অনেকখানি প্রাপ্তি ঘটেছে, অর্থাৎ এরা অনেকখানি বাঙলাসংস্কৃতি গ্রহণ করেছে।

'বিশেষ রক্ষামূলক' (Special Protection) ব্যবস্থা করেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাস্তব ক্ষেত্রে আদিবাসীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পারেনি। কালাহাণ্ডি রাজ্যের খন্দসমাজ ১৮৮২ সালে কোল্টাদের (মহাজন) হত্যা করতে আরম্ভ করে, কারণ খন্দদের জমি একে একে কোল্টাদের হাতে চলে গিয়েছিল। গঞ্জামের খন্দদের জমি একে একে ওড়িয়াদের হাতে চলে যেতে থাকে। বিশেষ রক্ষামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও আদিবাসীর জমি সুরক্ষিত থাকতে পারেনি। কেন এরকম হলো? এ বিষয়ে শুধু মহাজন ও সাধুকারের লোভ এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই প্রশ্নের উত্তর হয় না। আদিবাসীর এই অর্থনৈতিক অধঃপতনের ব্যাপারে স্বয়ং আদিবাসীরও দোষ রয়েছে এবং 'বিশেষ রক্ষামূলক' ব্যবস্থাগুলির মধ্যেও ত্রুটি আছে।

১৯১৭ সালে ১নং মাদ্রাজ আইন (Madras Act I) পাশ হয়। এই আইনের অপর নাম—'এজেন্সি অঞ্চলের সুদ ও ভূমি হস্তান্তর আইন' (Agency Tracts Interest & Land Transfer Act).

আইনের নির্দেশ ছিল—গভর্নরের এজেন্টের অনুমতি ছাড়া আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন লোক জমি হস্তান্তর করতে পারবে না। আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন লোকের বিরুদ্ধে যদি কারও কোন মামলা করতে হয়, তবে এজেন্সি অঞ্চলের আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে ; ডিক্রি পেলেও কেউ আদিবাসীর অস্থাবর সম্পত্তিকে ক্রোক করতে পারবে না। শতকরা ২৮ টাকার বেশি হারে সুদ আদায় করা নিষিদ্ধ হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই ধরনের রক্ষামূলক আইন কার্যক্ষেত্রে সার্থক হয়নি, কারণ কর্তৃপক্ষই এই আইনের নির্দেশগুলির মর্যাদা রক্ষা করেননি। খন্দসমাজ মহাজনের কাছে চড়া সুদে দেনা করেছে, জমি বন্ধক দিয়েছে আর দরিদ্র হয়েছে। আদিবাসী অঞ্চলে বিশেষ রক্ষামূলক আইনের সাহায্যে আদিবাসীকে রক্ষা করার কাজে গভর্নমেণ্ট তাঁর অফিসারদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অফিসারদের আচরণ ছিল রক্ষামূলক নীতির বিপরীত। সরকারী অট্টালিকা নির্মাণে বা মেরামতের কাজে, সড়ক তৈয়ারির কাজে এবং অফিসারদের মালপত্র বহনের কাজে মজুরকে কোন পারিশ্রমিক দেওয়ার নীতি সরকারী অফিসারেরা পালন করতেন না। 'বেগার' প্রথারে (বিনা মজুরিতে লোক খাটাবার) একটা চল্তি ও সঙ্গত প্রথা হিসাবে সরকারী অফিসারেরা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সরকারী অফিসারের কাছে আন্তরিকভাবে রক্ষামূলক ব্যবস্থার ভরসা করা আদিবাসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আদিবাসীরা লক্ষ্য করেছিল, প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার ব্যবসায়ে সরকারী অফিসারেরাও কম যান না। সুতরাং অফিসার পরিচালিত রক্ষামূলক ব্যবস্থার ওপর আদিবাসীর পক্ষে কতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করা সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়। রক্ষামূলক ব্যবস্থার অথবা তফসিলভুক্ত অঞ্চলে অনুসৃত সরকারী নীতির ব্যর্থতার মূল কারণ এইখানে। ব্যবস্থার নীতি হয়তো ভালো ছিল, কিন্তু ব্যবস্থা প্রয়োগের ব্যাপারে দুর্নীতি ছিল। ১৯২৪ সালে গভর্নমেণ্ট এই কুপ্রথার উচ্ছেদের জন্য একটা সার্কুলার জারি করেন— সরকারী অফিসারেরা কাউকে বেগার খাটাতে পারবে না, খাটালে ন্যায্য মজুরি মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সার্কুলারের দ্বারা অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি এবং এই কু-প্রথা আজও রয়ে গেছে।[১]

ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে সব সরকারী ব্যবস্থা ও আইন করা হয়েছিল, তার কিছু পরিচয় এর আগে বিবৃত করা হয়েছে। কিন্তু এত করেও আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার আদর্শটা বাস্তবক্ষেত্রে কেমন যেন কাগজে-কলমেই রয়ে গেল। আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থার সত্যিকারের উন্নতি বলে কোন ব্যাপার সম্ভব হলো না। ১৯০৩ সালে আবার

১. Report of the partially Excluded Areas Committee (Orissa).

একটা আইন পাশ করা হয়—ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন (Chotonagpur Tenancy Act)। মালভূমি ছাড়া ছোটনাগপুরে বিভাগের সর্বত্র এই আইনকে কার্যকরী করা হয়। পাঁচ বছরের বেশি মেয়াদে ভূমি বন্ধক দেওয়া বা নেওয়া বেআইনী করা হয়। প্রজার স্বার্থ ও স্বত্বকে জমিদারের অধিকার থেকে আরও বেশি সংরক্ষিত করে ১৯০৮ সালের ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়।

ভীল সমাজের প্রতি গভর্নমেন্ট একই শাসন-নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমে ভীলদের শান্ত করার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট 'ভীল এজেন্সি' স্থাপন করেন, এবং রাজমহলের পাহাড়িয়াদের সম্পর্কে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা ছিল, ভীল সমাজের সম্পর্কেও সেই ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ী চাষী হিসাবে ভীলদের বসতি পত্তন করাবার চেষ্টা হয় এবং ভীলদেরও বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হতে থাকে।[১] ভীলেরা অল্পদিনের মধ্যে ভূমিপ্রিয় চাষী হিসাবে স্থায়ীভাবে বসতি করে ফেলে। এর পরেই ভীল এজেন্সি বাতিল করে দেওয়া হয়, এবং অন্যান্য প্রদেশের সাধারণ আইনব্যবস্থা ও নীতির দ্বারাই ভীল সমাজও শাসিত হতে থাকে। আদিবাসী গোষ্ঠী হলেও, ভীলদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়নি, এবং এদের বসতি অঞ্চলকে তফসিলভুক্ত অঞ্চল বলেও ঘোষণা করা হয়নি। মাত্র মেওয়াস উপগোষ্ঠী অধ্যুষিত পশ্চিম খান্দেশকে ১৮৮৭ সালে তফসিলভুক্ত অঞ্চল করা হয়। তফসিলভুক্ত হলেও মেওয়াসি অঞ্চলের জন্য খুব বড় রকমের কোন 'বিশেষ ব্যবস্থা' করা হয়নি। ১৮৪৬ সাল থেকেই এই অঞ্চলে কতগুলি বিশেষ বিশেষ ফৌজদারী আইন ছিল, ১৯২০ সালের এই বিশেষত্ব বাতিল করে দিয়ে সমস্ত অঞ্চলকে সাধারণ ফৌজদারী আইন ও পুলিসী কর্তৃত্বের অধীন করা হয়। কতগুলি বিশেষ দেওয়ানী আইন মাত্র প্রচলিত থাকে। ১৯১৮ সালে গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, মেওয়াসি অঞ্চলে আবগারী আয় বাবদ যে টাকা উঠবে, তা সবই মেওয়াসিদের উপকারের জন্য ব্যয় করা হবে, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।

গন্দ কোরকু এবং বৈগা গোষ্ঠীকে 'বিশেষভাবে রক্ষা' করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, মাত্র মধ্যপ্রদেশের তিনটি জমিদারী অঞ্চলে করা হয়েছে। মিঃ উইলস্ (Mr. C. U Wills) বলেন—ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর বিলাসপুর জমিদারী অঞ্চল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েই ছিল। আদিবাসীরা 'ঝুম' প্রথায় চাষ-আবাদ করতো কারণ জমির প্রাচুর্য ছিল এবং কোন প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু ১৮৯০ সাল থেকেই অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়, ব্যবসায়ী, মহাজন ও জমিদারের শুভাগমন হতে থাকে। গোষ্ঠীর সর্দার অথবা গ্রামের মোড়লকে কিছু পরিমাণ বিশেষ সুবিধা ও ক্ষমতা দিয়ে পর পর কতগুলি আইন জারি করা হয়। কিন্তু মাত্র এইটুকু বিশেষত্ব দিয়ে জমিদারী অঞ্চলের আদিবাসীর কোন উন্নতি হয়নি।

এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে আদিবাসী গোষ্ঠীরা বহুসংখ্যায় বাস করে, কিন্তু এই সব অঞ্চলকে তফসিলভুক্ত অঞ্চল করা হয়নি। তবুও এইসব সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসী সমাজেরও কতগুলি বিশেষ সমস্যা যে আছে, সরকারী কর্তৃপক্ষ সে তথ্য জানতেন। ১৮৬৩ সালেই স্যার রিচার্ড টেম্পল আদিবাসীদের সম্পর্কে গভর্নমেন্টের নীতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। অর্থাৎ "—পাহাড় ও অরণ্য অঞ্চলে যে স্বাভাবিক বা সহজ সম্পদ আছে, (natural economy of hills & forests) সেটা সার্থকভাবে আহরণ করার কাজে আদিবাসীরাই প্রধান সহায়।" আদিবাসীদের 'ঝুম' চাষের অভ্যাসকে উচ্ছেদ করা নীতি গৃহীত হয়, কিন্তু এ বিষয়ে জবরদস্তি করা উচিত হবে না বলেই কর্তৃপক্ষ মনে করেন। কারণ, হঠাৎ একটা প্রাচীন উপজাতীয় অভ্যাসকে বন্ধ করে দিলে আদিবাসীরা তাড়াতাড়ি লাঙ্গল প্রথা গ্রহণ করবে, এরকম আশা করা যায় না। বরং জবরদস্তি করলে ঝুম-চাষী আদিবাসীরা হয়তো

১. Brief Historical Sketches of the Bhil Tribes—Capt. D. C. Graham.

জীবিকাহীন হয়ে লুঠতরাজ ও গরু চুরির বৃত্তি গ্রহণ করে বসবে।[১]

পূর্বে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আদিবাসীর জন্য 'বিশেষ রক্ষামূলক' ব্যবস্থা হিসাবে কতগুলি আইন করেছিলেন, যার সাহায্যে আদিবাসীদের জমি হাতছাড়া হবার পথ বন্ধ করা হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইসব আইন ব্যর্থ হয়েছে। ফরসাইথ (Forsyth) স্বীকার করেছেন—"আইন করে কখনো কোন অবনত জাতিকে উন্নত জাতির প্রতিপত্তি থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। বরং এইসব আইন প্রতিষ্ঠাভিলাষী ('aggressor') উন্নত সমাজের হাতেই একটা নতুন অস্ত্র হয়ে উঠেছে। আইন না করলে বরং আক্রান্ত সমাজ মুখোমুখি লড়াই করে তাদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে পারতো। জমির দখলীস্বত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রবর্তিত আইনগুলির মধ্যেই ত্রুটি আছে। আদিবাসীদের প্রতি 'দায়িত্ব' পালনের জন্য যে ভাবে আইনের প্রয়োগ হয়ে থাকে, তার মধ্যেও ত্রুটি আছে। আইনগতভাবে যা কিছুই করা হয়, দেখা গেছে যে শেষ পর্যন্ত হিন্দুরাই আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সুবিধা পেয়েছে। বর্তমান অবস্থায় পুঁজিওয়ালা ধনী ব্যক্তি ছাড়া কারও সামর্থ্য নেই যে, পতিত জমিগুলি অধিকার করতে পারে। আদিবাসীদের এমন আর্থিক শক্তি নেই যে, তার দ্বারা পতিত জমি অধিকার সম্ভব হবে।...আর একটা কথা, দেওয়ানী মামলা বিচার করার আদর্শ (Civil Justice) যে পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হচ্ছে, সাধারণ প্রদেশগুলিতে হয়তো তার সার্থকতা আছে, কিন্তু অরণ্যের আদিবাসীর কাছে সেটা ন্যায়বিচারের পদ্ধতি তো নয়ই, বরং তার বিপরীত।"

এপর্যন্ত যে সব ভূমি আইনের উল্লেখ করা গেল সেগুলি সবই প্রজার (আদিবাসী অথবা সাধারণ সমতলবাসী) স্বার্থ ও স্বত্বের জন্য করা হয়েছিল অর্থাৎ জমিদার বা মহাজন যেন আদিবাসীর জমি সহজে গ্রাস না করতে পারে। এইসব আইনই ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কারণ, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এমন একটা ভূমিব্যবস্থা করেছিলেন, যার দ্বারা জমিদার ও প্রজার স্বার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। জমিদারের স্বার্থ দেখলে প্রজার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এবং প্রজার স্বার্থ দেখলে জমিদারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট শুধু প্রজাদরদী বা আদিবাসী-দরদী আইন প্রবর্তন করেননি, জমিদার-দরদী আইনও সঙ্গে সঙ্গে চালু করে এসেছেন। হয়তো একেই বলে 'ব্রিটিশ-নীতি'। পরস্পরবিরোধী দুই বিপরীত স্বার্থকেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আইনের সাহায্য দিয়ে এসেছেন। মধ্যপ্রদেশের ভূমিস্বত্ব আইনে (১৮৯৮) প্রজার স্বার্থ ও জমিদারের স্বার্থ উভয়ই বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোটনাগপুর অক্ষম জমিদারী আইন (Chotanagpur Encumbered States Act, ১৮৭৬) স্থানীয় জমিদারের স্বার্থ রক্ষার জন্যই প্রণীত হয়। ১৯১৬ সালে মধ্যপ্রদেশের ভূমি হস্তান্তর আইন (Land Alienation Act) পাশ করে ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা হয়। তফসিলভুক্ত অঞ্চলেও এই আইন বলবৎ হয়, জমিদারের স্বার্থের জন্যই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতির মধ্যে এই বিচিত্র ভেজাল থাকায় আদিবাসীদের সম্বন্ধে রক্ষামূলক আইনগুলির উদ্দেশ্য বাস্তবক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

১. Aboriginal Tribes of the Central Provinces–Hislop.

অনগ্রসর অঞ্চল

মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালে ভারতের শাসন পদ্ধতিকে এক দফা সংস্কার করা হয়। উক্ত রিপোর্টে আদিবাসী সমাজ সম্বন্ধে 'বিশেষ ব্যবস্থার' নীতি পূর্ববৎ বহাল থাকে। রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল যে—"আদিবাসী সমাজে এমন কোন উপাদান নেই যার ওপর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করান যেতে পারে।" ১৯১৯ সালের নতুন ভারত গভর্নমেণ্ট আইনে বড়লাটের হাতেই আদিবাসী অঞ্চলকে ইচ্ছামতো অর্থাৎ বিশেষভাবে শাসন করার খাস ক্ষমতা দেওয়া হয়। পুরাতন তপশিলভুক্ত জেলা আইনে উল্লিখিত অঞ্চলের তালিকাটি পুনর্বিবেচনা করে একটা নতুন 'অনগ্রসর' (Backward Tracts) অঞ্চলের তালিকা তৈরি হয়।

নতুন অনগ্রসর অঞ্চলের তালিকা এই দাঁড়ায় ঃ (১) লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম, (৩) স্পিতি, (৪) অঙ্গুল জেলা, (৫) দার্জিলিং জেলা, (৬) লাহৌল, (৭) গঞ্জাম এজেন্সি, (৮) ভিজাগাপট্টম এজেন্সি, (৯) গোদাবরী এজেন্সি, (১০) ছোটনাগপুর বিভাগ, (১১) সম্বলপুর জেলা, (১২) সাঁওতাল পরগণা জেলা, (১৩) গারো পাহাড় জেলা (১৪) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ব্রিটিশ অংশ (শিলং মিউনিসিপ্যালিটি ও ক্যাণ্টনমেণ্ট বাদে), (১৫) মিকির পাহাড়, (১৬) উত্তর কাছাড় পাহাড়, (১৭) নাগা পাহাড়, (১৮) লুসাই পাহাড়, (১৯) সদিয়া বলিপাড়া ও লখিমপুর সীমান্ত অঞ্চল।

অনগ্রসর অঞ্চলের তালিকা দেখে বুঝতে পারা যায়, তফসিলভুক্ত অঞ্চলের তালিকা থেকে সমস্ত অঞ্চলকেই এর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়নি। কিছু বাদ পড়ে প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের মধ্যে চলে গেছে। কিন্তু সাধারণ অঞ্চলের গণ্ডীর মধ্যে পড়লেও কার্যত সে-সব অঞ্চলে ১৯১৯ সালের সংস্কার চালু করা হয়নি।

প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে অনগ্রসর অঞ্চলগুলি কতটুকু অধিকার লাভ করলো?

এ বিষয়ে অনগ্রসর অঞ্চলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ (১) কতগুলি অঞ্চল একেবারেই কোন প্রতিনিধিত্ব লাভ করেনি, যথা ঃ লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, স্পিতি ও অঙ্গুল। (২) কতকগুলি অঞ্চলে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়, যথা, দার্জিলিং, লাহোল এবং আসামের সমগ্র অনগ্রসর অঞ্চল (৩) কতকগুলি অঞ্চলে নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়, উপরন্তু কয়েকটি সরকার মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থাও থাকে, যথা ঃ ছোটনাগপুর বিভাগ, সম্বলপুর জেলা, সাঁওতাল পরগণা, গঞ্জাম এজেন্সি ভিজাগাপট্টম এজেন্সি ও গোদাবরী এজেন্সি।

অনগ্রসর অঞ্চলের ওপর প্রাদেশিক আইনসভার অধিকার কতটুকু, তা এই শ্রেণী-বিভাগ থেকেই বোঝা যায়। প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত ৪টি অঞ্চলে আইনসভার কোন অধিকার নেই, কারণ ঐ অঞ্চলের কোন প্রতিনিধিত্ব আইনসভার নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি আইনসভায় আছে, সুতরাং এই দুই শ্রেণীর অঞ্চলের ওপর প্রযোজ্য আইন রচনার ক্ষমতা আইনসভার থাকা উচিত এবং আছেও। কিন্তু এ বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা সপরিষদ বড়লাট অথবা সপরিষদ গভর্ণরের ওপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে। আইনসভায় গৃহীত আইনকে বড়লাট অথবা গভর্নর ইচ্ছে করলে প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন অনগ্রসর অঞ্চলে প্রয়োগ না-ও করতে পারেন, অথবা কিছু রদবদল করে নিয়ে প্রয়োগ করতে পারেন।

তৃতীয় শ্রেণীর অনগ্রসর অঞ্চলকে যে ভাবে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, তাতে এই অঞ্চলে প্রাদেশিক আইনসভা অথবা মন্ত্রিমণ্ডলের অধিকার থাকার কথা। বিহার ও ওড়িশার অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে বস্তুত মন্ত্রিমণ্ডলের অধিকার কার্যকরী হয়ে থাকে। সমস্ত

প্রদেশের ক্ষেত্রে মন্ত্রিমণ্ডলী যে সব ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন, অনগ্রসর অঞ্চলেও তাই করে থাকেন—কাজের বেলায় বিশেষ কোন বাধা নেই। কিন্তু আসামের ক্ষেত্রে আবার একটা ব্যতিক্রম করা হয়েছে। বিহার-ওড়িশার মন্ত্রিমণ্ডল অনগ্রসর অঞ্চল শাসনে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিচালনা করে থাকেন, আসামের মন্ত্রিমণ্ডলীকে ততটা সুযোগ কার্যক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি। গভর্ণর নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এমন সব নির্দেশ বলবৎ করেছেন, যার ফলে অনগ্রসর অঞ্চলে মন্ত্রিমণ্ডলের ক্ষমতা খুবই সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায়, অনগ্রসর অঞ্চলের ওপর আইনসভার ক্ষমতাকে খর্ব করেই রাখা হয়েছে। দেখা যায় যে, অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য একটা সোজা সরল শাসনপদ্ধতি ১৯১৯ সালে এসেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পরিকল্পনা করতে পারেননি। কোথাও ডায়ার্কি (যেমন বিহার ও ওড়িশার অনগ্রসর অঞ্চলে), কোথাও আংশিক ডায়ার্কি (যেমন আসামের অনগ্রসর অঞ্চলে) এবং কোথাও একেবারে খাস গভর্নরী শাসন (তালিকায় উল্লিখিত ১নং থেকে ৪নং অঞ্চল)।

১৯১৯ সালে ভারতবর্ষের জন্য একদফা শাসন সংস্কার করা হয়। এর পর ১৯৩৫ সালে আর এক দফা শাসন সংস্কার হয়। এই দুই শাসন সংস্কারের মধ্যবর্তী সময়ে আদিবাসীদের উন্নতির জন্য বলতে গেলে আর কোন নতুন ব্যবস্থা বা আইন করা হয়নি। ১৯১৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত আদিবাসীদের জন্য প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে কতগুলি বিশেষ রক্ষামূলক ব্যবস্থার আইন করা হচ্ছিল, এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। রক্ষামূলক ব্যবস্থার মধ্যে প্রধানত এবং একমাত্র আদিবাসীদের জমি রক্ষার চেষ্টাই হয়েছিল। কিন্তু জমির ব্যাপার ছাড়া আদিবাসীদের যে আর কোন সমস্যা বা প্রয়োজন আছে এবং জমি রক্ষার পদ্ধতি ছাড়া আদিবাসীকে উন্নত করার আর কোন পদ্ধতি আছে, তা গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনার মধ্যে আসেনি। সম্ভবত এদিক দিয়ে কোন চিন্তাই করা হয়নি।

প্রায় প্রত্যেক আদিবাসী অঞ্চলে রেগুলেশন বা বিশেষ আইনের সাহায্যে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দফায় দফায় জমি রক্ষার জন্য বা আদিবাসীদের আর্থিক উন্নতির জন্য যে চেষ্টা হলো, তার ভালো-মন্দ পরিণামের পরিচয় সরকারী রিপোর্টের মধ্যেই পাওয়া যায়। ১৯১৭ সালে খন্দদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে আইন হলো, ১৯৩৮ সালের উক্ত আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তদন্ত করে এক সরকারী রিপোর্টে বলা হলো যে, "সরকারী অফিসারেরা ঐ আইনকে ভালোভাবে কার্যকরী করেনি। প্রত্যেকটি জরিপ ও বন্দোবস্তের সময় তদন্তের ফলে পূর্ব প্রচলিত রক্ষামূলক ব্যবস্থার ব্যর্থতা অথবা আংশিক সাফল্যের কথা স্বীকৃত হয়েছে। একটা আইন করে কিছুদিন পরেই সে আইনকে হয় সংশোধন করতে হয়েছে অথবা নতুন আইন করে আবার ভিন্নভাবে রক্ষামূলক ব্যবস্থা করতে হয়েছে। একই অঞ্চলে বার বা রক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন এই ইঙ্গিত করে যে, ব্যবস্থাগুলি ঠিক প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি করতে পারেনি।"

কোন ক্ষেত্রেই রক্ষামলক ব্যবস্থা বা বিধান না আইন আদিবাসীর উপকার করেনি, একথা অবশ্য সত্য নয়। দু'-এক ক্ষেত্রে এর ফল ভালো হয়েছে। কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করলেই জানা যায় যে, নিছক সরকারী রক্ষামূলক বিশেষ আইনগুলির জন্যেই এ উন্নতি হয়নি, বে-সরকারীভাবেই এমন কতগুলি সামাজিক, আর্থিক বা শিক্ষার সুযোগ আদিবাসীরা এক্ষেত্রে পেয়েছিল, যার ফলে কিছু উন্নতি সম্ভব হয়।

সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীর অবস্থা

এইবার দেখা যাক, প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলে যে সব আদিবাসী বসবাস করে, তাদের অবস্থার কতটুকু উন্নতি না অবনতি হয়েছে? আরও দেখতে হবে, সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীরা কি তফসিলভুক্ত বা অনগ্রসর অঞ্চলের আদিবাসীদের তুলনায় বেশি দুর্দশা লাভ

করেছে? আইনের দিকে তাকালে, সরকারী নীতির দিকে তাকালে, এবং ইংরেজ নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ মহাশয়দের মতবাদের দিকে তাকালে এই তত্ত্বই আমাদের মেনে নিতে হবে যে, সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীর পক্ষে রক্ষিত (Protected) অনগ্রসর অঞ্চলের আদিবাসীর তুলনায় অবনত হওয়া উচিত। কারণ, সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসী সকলের মত সাধারণ আইনের দ্বারা পরিচালিত, বিশেষ রক্ষামূলক আইনের স্নেহ এখানে নেই। দ্বিতীয় কথা, সাধারণ অঞ্চলে হিন্দু-সংস্পর্শও খুবই বেশি রয়েছে।

বাঙলা প্রদেশে সাধারণ অঞ্চলের অধিবাসী সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনকে সংশোধিত করা হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের সাঁওতালদের প্রজাস্বত্ব রক্ষার জন্য এই আইনের সংশোধিত নির্দেশগুলি প্রথম প্রয়োগ করা হয় ; পরে সুন্দরবন অঞ্চলেও চালু করা হয়। মধ্যপ্রদেশের ভূমি হস্তান্তর আইন (১৯১৬) বিশেষ আইন নয়। এই সাধারণ প্রাদেশিক আইন মান্দলা জেলার আদিবাসী এবং মেলাঘাট ও অমরাবতী জেলার আদিবাসীকে উপকৃত করেছে। মান্দলা, মেলাঘাট ও অমরাবতী কোনটাই 'রক্ষিত' অঞ্চল নয়। মধ্যপ্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের লোকেরা রক্ষিত লোকদের চেয়ে আর্থিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বেশি উন্নত। বলাঘাটের লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাদনদাতা মহাজনদের 'বয়কট' করে সায়েস্তা করতে সমর্থ হয়। ১৯২০-২১ সালে নাগপুরের পতাকা সত্যাগ্রহে এবং ১৯২৩ সালের জঙ্গল সত্যাগ্রহে খন্দসমাজ বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করে। দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ প্রাদেশিক আইনের সাহায্যে আদিবাসীদের উন্নতি করা সম্ভব হয়েছিল, এর জন্য তফসিলভুক্ত জেলা বা অনগ্রসর অঞ্চল সৃষ্টি করে সাধারণ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার গণ্ডীর বাইরে তাদের নিয়ে যাবার কোন অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল না। প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীরা সকল সাধারণ নাগরিকের মতো সমান সুখেদুঃখে ও সুযোগে জীবিকা নির্বাহ করেছে এবং তারা 'রক্ষিত' অঞ্চলের জাতভাইদের চেয়ে অবনত হয়নি।

তফসিলভুক্ত রক্ষিত অঞ্চল হয়ে সিংভূম ও সাঁওতাল পরগনার আদিবাসীর জমি রক্ষার সমস্যাকে অল্পবিস্তর সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ছোটনাগপুর বিভাগের মানভূম, হাজারীবাগ ও পালামৌয়ের আদিবাসীরা বস্তুত ভূমিহীন দাসশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। এটা গভর্নমেন্টেরই স্বীকৃতি। "ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা তাদের জমি যখন হাতছাড়া করে ফেলেছে, তখন তাদের জমি বাঁচাবার জন্য বিশেষ আইন চালু করা হয়"[১]। এ থেকেই ধারণা হয়, রক্ষিত অঞ্চলে গভর্ণমেন্ট আদিবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য কি পরিমাণ তৎপরতা ও সত্বরতা দেখিয়েছেন।

গভর্নমেন্টের রক্ষিত অঞ্চলেই ঘন ঘন প্রজা-বিদ্রোহ রয়েছে। এর অর্থ, রক্ষিত অঞ্চলের প্রজাদের অর্থাৎ আদিবাসীদের মধ্যে বার বার অসন্তোষের কারণ ঘটেছিল। এটা রক্ষিত অঞ্চলের 'বিশেষ শাসনের' ব্যর্থতার প্রমাণ। রক্ষিত অঞ্চলে গভর্নমেন্ট যে শাসন-নীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেটাকে মূলত নেতিমূলক বা নেগেটিভ নীতিই বলা চলে। গঠনমূলক কোন নীতি তার মধ্যে ছিল না। শুধু নিষেধ করা, বন্ধ করা, বাতিল করা, রহিত করা ইত্যাদি। কিন্তু কোন সমাজের শুধু খারাপ প্রথাগুলিকে নিষেধ, বন্ধ বা বাতিল করলেই সুফল হয় না। সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা প্রচলন করা, গঠন করা এবং সৃষ্টি করাও চাই। কোন কোন বিষয়ে গভর্নমেন্ট আবার নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছেন, ফলে যে অবস্থা সেই অবস্থা রয়ে গেছে। খন্দসমাজের ঝুম-চাষ প্রথাকে গভর্নমেন্ট বন্ধ করলেন না। এটা উদার নীতি নয়। ঝুম-চাষ বন্ধ করলে সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল পদ্ধতিতে খন্দসমাজকে শিক্ষিত করার যে পরিশ্রম,

১. Oraons of Chotanagpur—S.C.Roy.

দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাট ছিল, গভর্নমেণ্ট সেটা এড়িয়ে গেলেন। ছোটনাগপুরের কোরোয়া ও বিরহোর আজও ভ্রাম্যমাণ বর্বরদশায় রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভূমি বা এলাকা সংরক্ষিত করে চাষী হিসাবে বসতি করিয়ে দেবার চেষ্টা গভর্নমেণ্ট আজও করে উঠতে পারেননি। অপরদিকে তুলনা করে দেখা যায় যে, মধ্যপ্রদেশের বৈগাদের পক্ষে 'রক্ষিত অঞ্চলে' পড়বার অদৃষ্ট হয়নি। মধ্যপ্রদেশের গভর্নমেণ্ট তাদের নানাভাবে উন্নত হবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পেরেছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ভীলসমাজের পক্ষেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য, তারা 'রক্ষিত অঞ্চলে' পড়েনি বলে সাধারণভাবেই শাসিত হয়েছে এবং 'রক্ষিত অঞ্চলের' আদিবাসীদের চেয়ে তাদের অবস্থা উন্নত।

রাজমহলের পাহাড়িয়ারা প্রায় দেড়শত বছর হলো 'রক্ষিত অঞ্চলে' থেকে অফিসারী শাসনের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যে দশায় আগে ছিল, আজও প্রায় সেই দশা। 'রক্ষিত অঞ্চলের' আদিবাসী খন্দসমাজও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মর্জির দ্বারা দীর্ঘকাল শাসিত হয়ে আসছে এবং কৃষি বা শিল্পে কোন কুশলতা আজও তারা লাভ করতে পারেনি। ১৯৩০ সালে বিহার-ওড়িশা গভর্নমেন্টর রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে—"গত ৭০ বৎসরের মধ্যে সমগ্রভাবে আদিবাসী সমাজের চরিত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। আদিবাসীকে শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য কোন গঠনমূলক কাজ ভালো করে আরম্ভও হয়নি।[১]

ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া

ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রথম রাজমহলের পাহাড়িয়া গোষ্ঠী বৃটিশ শাসনের আওতায় আসে। তথাকথিত আদিম অধিবাসী অথবা উপজাতিদের প্রতি ব্রিটিশ শাসক যে নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তার প্রথম পরীক্ষা পাহাড়িয়া গোষ্ঠীর ওপরেই আরম্ভ হয়।

প্রথম ব্রিটিশ শাসকের দল (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) আদিবাসীদের প্রতি যে নীতি গ্রহণ করলেন তাকে বলা যেতে পারে 'শান্ত করার' নীতি (Pacification)। আদিবাসীরা যেন উপদ্রবপ্রবণ হয়ে না ওঠে এবং ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে এসে শান্তিভঙ্গ বা উৎপাত না করে, তারই জন্য এই নীতি। প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থা না চাপিয়ে, আদিবাসীকে নিজের ঘরে নিজের আইন নিয়ে থাকবার সুযোগ ইংরাজ সরকার দিয়েছিলেন।

রাজমহলের পাহাড়িয়া সর্দারদের 'সনদ' দেওয়া হয়। পাহাড়িয়া অঞ্চলের কোন হাঙ্গামা হলে গভর্নমেন্টের কাছে সে সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করা ও সংবাদ দেওয়া এইসব সনদধারী সর্দারের কর্তব্য ছিল। ইংরাজের সরকারী সড়ক দিয়ে ডাকের যাতায়াত যাতে নিরাপদ হয় এবং ডাকবাহকদের ওপর আক্রমণ না হয়, সে সম্বন্ধে পাহারা রাখা সর্দারদের অন্যতম কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্যের বিনিময়ে সর্দারেরা ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে বাৎসরিক বৃত্তি লাভ করতো। এই বৃত্তি বস্তুত উৎকোচ ছাড়া আর কিছু নয়। মুসলমান শাসনকালেও উপজাতিদের এইভাবে ঘুষ দিয়ে শান্ত করে দূরে সরিয়ে রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

রাজমহলের পাহাড়িয়াদের প্রতি ইংরাজ সরকার যেমন একদিকে উৎকোচপুষ্ট তোষণনীতি গ্রহণ করলেন, অপরদিকে আর একরকমের কূটনৈতিক সতর্কতাও গ্রহণ করলেন। অবসরপ্রাপ্ত সিপাহীদের জমি দিয়ে রাজমহল পাহাড়ের চারদিকে বসতি করিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন। আক্রমণপ্রবণ পাহাড়িয়াদের যাতে বাধা দিতে পারে, এমনই যুদ্ধ-

১. Report of the Indian Statutory Commission.

শিক্ষিত এক শ্রেণীর সাহায্যে রাজমহল পাহাড়কে যেন একটা সামরিক বৃত্ত দিয়ে অবরোধ করে রাখাব ব্যবস্থা হলো।

আদিবাসীদের প্রতি সব বৃটিশ রাজনৈতিক নানারকম নীতির আবিষ্কার, পরীক্ষা ও প্রবর্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে অগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের (Augustus Cleveland) নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। রাজমহলের পাহাড়িয়া অঞ্চলের শাসন তদারকের ভার পেয়েই ক্লীভল্যাণ্ড নানা নতুন পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। পাহাড়িয়া সর্দার, নেতা ও উপ-নেতাদের জন্য ক্লীভল্যাণ্ড পেন্সনের ব্যবস্থা করলেন (বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা) এবং সর্দারদের কর্তব্যের তালিকা আরও বাড়িয়ে দিলেন। পাহাড়িয়া এলাকার প্রত্যেকটি অপরাধের খবর সরকারী দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া, হাঙ্গামায় নিজেদের প্রভাবে শান্তি স্থাপন করা এবং শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করা—এইসব কর্তব্যে সর্দারেরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

এইভাবে পাহাড়িয়া অঞ্চলে ইংরাজ সরকারের অনুগত একটি সর্দারদল তৈরি হয়। এইবার ক্লীভল্যাণ্ড এদের দিয়ে একটা 'আদালত' কায়েম করেন। রাজমহল অঞ্চলকে সাধারণ আদালতের বিচারক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য ক্লীভল্যাণ্ড গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করলেন এবং ১৭৮২ সালে রাজমহল সাধারণ আদালতের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ক্লীভল্যাণ্ড পাহাড়িয়াদের গোষ্ঠীগত সর্দারদের নিয়ে একটি দায়রা আদালত স্থাপন করেন। নিয়ম ছিল, বছরে মাত্র দুবার আদালত বসবে এবং সব রকম অপরাধের বিচার করবে। 'সর্দার পরিষদ' রূপে গঠিত এই আদালতই সরকারী পরিভাষায় 'পাহাড়িয়া পরিষদ' (Hill Assembly) নাম গ্রহণ করে। বিচারে প্রাণদণ্ড ঘোষণার অথবা প্রাণদণ্ডের নির্দেশ বাতিল করবার অধিকার পাহাড়িয়া পরিষদের ছিল। পাহাড়িয়া মহলকে এইভাবে নিরুপদ্রব ও শান্ত করার ব্যবস্থা শেষ করে ক্লীভল্যাণ্ড এর পর পাহাড়িয়া মহলের ভূমি সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার চেষ্টা করলেন। ব্যবস্থা হলো—পাহাড়িয়ারা যে সব জমি ভোগদখল করছিল, তা সবই গভর্নমেণ্টের জমি হিসাবে ঘোষণা করা হলো এবং পাহাড়িয়ারা খাস গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে এইসব জমি বিনা খাজনায় ভোগ করার ব্যবস্থা লাভ করলো। যে সব পাহাড়িয়া সর্দার এ পর্যন্ত পাহাড়িয়া পরিষদ প্রভৃতি ব্রিটিশ ব্যবস্থাকে স্বীকার না করে পৃথক হয়েছিল, তারাও ভূমিগত এই সুবিধার আকর্ষণে উৎসাহিত হয়ে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিল। এইভাবে সমস্ত পাহাড়িয়া মহলকে 'বিশেষ ব্যবস্থার' অধীনে আনা হলো এবং ব্রিটিশ কর্তৃক এই বিশেষভাবে ব্যবস্থিত ও শাসিত অঞ্চলই 'দামনি কো' নামে আখ্যাত হয় (সাঁওতাল ভাষায় 'কো অর্থ পাহাড় এবং 'দামনি' অর্থ অঞ্চল)।

ক্লীভল্যাণ্ডের ধারণা ছিল যে, পাহাড়িয়া আদিবাসীকে যদি উন্নত অগ্রসরশীল সমাজের সংস্পর্শে না আনা হয়, তবে তাদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি স্তব্ধ হয়ে থাকে। ক্লীভল্যাণ্ড বহুদিন পূর্বেই এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী এবং আধুনিক অনেক ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক এবং রাজনীতিবিদ্ ক্লীভল্যাণ্ডের ধারণার ঠিক বিপরীত মনোভাব পোষণ ও প্রচার করে থাকেন। ১৭৮৪ সালে ক্লীভল্যাণ্ড মারা যান, সেই জন্য তিনি তাঁর পরিকল্পনার অনেকখানিই পরীক্ষা করে দেখে যেতে পারেননি।

'নন-রেগুলেশন' শাসন পদ্ধতির উদ্ভব

পাহাড়িয়া পরিষদের (Hill Assembly) কাজ অবাধভাবে চলতে থাকে। পরিষদের কাজ সম্বন্ধে ক্লীভল্যাণ্ড যে সব নিয়ম তৈরি করেছিলেন, সেইসব নিয়মগুলিকে ১৭৯৬ সালে আইনে পরিণত করা হয়। এই আইন ১৭৯৬ সালের ১নং রেগুলেশন (Regulation I of 1796)

নামে পরিচিত। ক্লীভল্যাণ্ডের পর থেকে আরম্ভ করে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত বলা যেতে পারে পাহাড়িয়া মহলের ইতিহাসে রেগুলেশন-বহির্ভূত শাসনের (Non-Regulation) অধ্যায়। এই অধ্যায়ে পাহাড়িয়া অঞ্চলের শাসনের জন্য কালেক্টর সাধারণ বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ না করে নিজের ইচ্ছামতো আইন তৈরি করতেন। ১৭৯৬ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত 'দামনি কো' এইভাবে বিশেষ শাসনব্যবস্থার (Specially Administered) দ্বারা শাসিত হয়। ১৮২৭ সালে নতুনভাবে আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন চালু হয় এবং পুরাতন ১৭৯৬ সালের ১নং রেগুলেশন বাতিল হয়ে যায়।

দেখা যাচ্ছে যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটা বিধিবদ্ধ শাসনে (ফোর্ট উইলিয়ামের রেগুলেশন) ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত সাধারণত প্রচলিত থাকলেও ১৭৮২ সাল থেকেই রাজমহলের পাহাড়িয়া অঞ্চলকে কোম্পানির সাধারণ রেগুলেশনের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। কোম্পানির সাধারণ আদালতের কোন অধিকার পাহাড়িয়া অঞ্চলের ওপর রইল না। কালেক্টর স্বয়ং তাঁর বিচার ও বিবেচনা অনুযায়ী নিয়ম রচনা করে উক্ত অঞ্চল শাসন আরম্ভ করেন। নন-রেগুলেশন শাসন প্রথার এই প্রথম আভাষ বা পূর্ব সূচনা বলা যেতে পারে। ১৭৯৬ সালে ক্লীভল্যাণ্ডের নিয়মগুলিকে একটা বিশেষ রেগুলেশনে পরিণত করে পাহাড়িয়া অঞ্চলের শাসন আরম্ভ হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, এইভাবে এবং এই প্রথম বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীন একটা অঞ্চল ('Specially administered area') দেখা দিল। পরবর্তী কালের 'তফসিলী অঞ্চল', 'নন-রেগুলেশন অঞ্চল', 'অনগ্রসর অঞ্চল' অথবা 'বহির্ভূত অঞ্চল', ইত্যাদি অঞ্চলের উদ্ভবের ইতিহাস এখান থেকেই সূচিত হয়।

১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন পাহাড়িয়া পরিষদের স্বতন্ত্র ক্ষমতা রদ করে দেয়। 'দামনি কো'র পাহাড়িয়া অধিবাসীর বিবাদ বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে সাধারণ আদালতের অধীনে আসে। পাহাড়িয়াদের ওপরে সাধারণ আদালতের অধিকার প্রযুক্ত হয়েও কতকগুলি বিষয়ে পাহাড়িয়া সমাজের হাতে বিশেষ কতগুলি ক্ষমতার সুবিধা দেওয়া হয়। এর ফলে নিজেদেব ব্যাপার নিয়ে বিচার মীমাংসার ক্ষমতা পাহাড়িয়া সমাজেরই হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে পঞ্চাশ বছর চলে। এর মধ্যে পাহাড়িয়াদের মতো ভারতবর্ষের আরও অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী ভারত গভর্নমেণ্টের পরিচালনার মধ্যে এসে পড়ে।

'পাহাড়িয়া পরিষদ' প্রতিষ্ঠাকল্পে ক্লীভল্যাণ্ড যে ব্যবস্থা চালু করে গিয়েছিলেন, পরবর্তী কালেক্টরেরা এবং অন্যান্য অফিসারেরা সে ব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিযোগ করেন। একে তো পাহাড়িয়ারা খাজনা দেয় না, তারপর উল্টো তাদের বাৎসরিক বৃত্তি ও সর্দারদের পেন্সন দেওয়া হচ্ছিল। তা ছাড়া পাহাড়িয়া পরিষদের আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসন কিভাবে চলছে, তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা কালেক্টরদের পক্ষে একটা কষ্টকর পরিশ্রমসাধ্য ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল এবং কালেক্টরেরা এবিষয়ে মনোযোগ দিয়েও উঠতে পারতেন না। কাজেই পাহাড়ী পরিষদের মতো একটা অপ্রবীণ সংঘ সরকারী কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য এবং সহানুভূতিপূর্ণ তদারকের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে। ১৮১৯ সালে গভর্নমেণ্ট জেমস সাদারল্যাণ্ডকে 'দামনি কো'র ব্যবস্থা ও অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করতে পাঠান। সাদারল্যাণ্ড পাহাড়ী পরিষদের নিয়ম-কানুন ও কর্মপ্রণালীর তীব্র নিন্দা করে রিপোর্ট দেন। ১৮২৩ সালে জে. পি. ওয়ার্ড (J. P. Ward) 'দামনি কো'র সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করার জন্য প্রেরিত হন। তিনিও 'পাহাড়িয়াদের দাবি'কে অত্যন্ত গর্হিত বলে মত প্রকাশ করেন। গভর্নমেণ্ট ১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন অনুসারে পাহাড়িয়া সমাজকে সাধারণ আদালতের আওতায় এনেও পাহাড়িয়াদের গোষ্ঠীগত এবং সর্দার পরিচালিত ও আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসনের সুবিধাটুকু বাতিল করতে চাইলেন না।[১]

১. District Gazetteer of Santal Paraganas.

১৮৩১ সালে কোল বিদ্রোহ দমিত হবার পর গভর্নমেণ্ট সিংভূমের 'হো' সমাজের সম্বন্ধে এক নতুন পলিসি গ্রহণ করেন। এর আগে থেকে স্থানীয় 'হিন্দু রাজারা' (অর্থাৎ জমিদারগণ) 'হো'দের কাছ থেকে লাঙ্গল প্রতি আট আনা বাৎসরিক খাজনা নিত। হিন্দুরাজাদের ওপর 'হো'দের খুবই বিদ্বেষভাব ছিল। তাই, এর পর থেকে এই খাজনা সোজাসুজি গভর্নমেণ্টের ট্রেজারিতে জমা দেবার জন্য 'হো' সমাজের ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশ বছরের মধ্যে খাজনা দ্বিগুণ করা হয় এবং 'হো' সমাজ কোনই আপত্তি করেনি। ১৮৬৬ সালে গভর্নমেণ্ট 'হো' অঞ্চলের জমি জরিপের উদ্যোগ করেন। 'হো' সমাজের একটি প্রকাশ্য সম্মেলন আহ্বান করে এবিষয়ে 'হো' সর্দারদের সম্মতি গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৬৭ সালে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকর প্রথা অর্থাৎ জমির পরিমাণ হিসাবে খাজনা দেবার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

হিন্দু জমিদারদের জমি গ্রাসের ফলে কোল বিদ্রোহের (১৮৩১ সালের) পর সমস্ত ছোটনাগপুর সম্বন্ধেই একটা নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ছোটনাগপুরের শাসন পরিচালনার জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত হয় তাঁর পদবী ছিল 'গভর্নর জেনারেলের এজেণ্ট' (Agent to the Governor General)। গভর্নর জেনারেল এই অঞ্চলের জন্য একটা বিশেষ ফৌজদারী দণ্ডবিধি তৈরি করেন। ১৮৬১ সালে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি (Criminal Procedure Code) তৈরি হবার পর, ছোটনাগপুরের জন্য এই বিশেষ দণ্ডবিধি বাতিল হয়ে যায়। এজেণ্ট সাহেব আদিবাসীদের জমি সম্বন্ধে একটা রক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেন। এজেণ্টের বিনা অনুমতিতে আদিবাসীর জমি বিক্রয়, হস্তান্তর বা বন্ধক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। ছোটনাগপুরের এজেন্ট শাসন প্রত্যাহৃত হয়, ছোটনাগপুরকে নন-রেগুলেশন অঞ্চল হিসাবে বাঙলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পরিচালনাধীন করা হয়। ছোটনাগপুরই প্রথম নন-রেগুলেশন অঞ্চল।[২] বিশেষভাবে শাসিত এবং সাধারণ শাসন আইনের অধিকার থেকে স্বতন্ত্র হলেও ছোটনাগপুরে ধীরে ধীরে সাধারণ আইনগুলি বলবৎ করা হতে থাকে।

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পর 'দামিন কো' অঞ্চলসহ সমস্ত সাঁওতাল পরগনাকে একটি জেলা হিসাবে নন-রেগুলেশন অঞ্চলে পরিণত করা হয়। একজন ডেপুটি কমিশনার জেলার উচ্চতম কর্তা হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তাঁর অধীনে চারজন সহকারী কমিশনার জেলার চারটি বিভাগের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সাঁওতাল পরগণা সাধারণ বিধিবদ্ধ আইন ও ব্যবস্থার বাইরে থাকে। যা করেন ডেপুটি কমিশনার—তিনিই একাধারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী ব্যবস্থার কর্তা এবং তিনিই আদালত। বাদী বিবাদী বা ফরিয়াদী আসামী, সকলে ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনারদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মৌখিকভাবে অভিযোগ পেশ করে, উকিল মোক্তারের দরকার নেই। কোন পুলিসও নেই, সাঁওতাল সর্দারের দ্বারাই পুলিসী কর্তব্য সম্পন্ন হয়। নন-রেগুলেশন অঞ্চল সাঁওতাল পরগনায় এইভাবে শাসন্ চলতে থাকে। সাঁওতাল পরগনার তৃতীয় ডেপুটি কমিশনার স্যার উইলিয়ম ফ্লেমিং রবিনসনের (Sir William Fleming Robinson) নাম একটি কারণে বিখ্যাত হয়ে থাকবে। তিনি সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলের 'ক্রীতদাস প্রথা'র উচ্ছেদ করেন।

প্রথাটা এই ঃ কোন গরিব লোক অর্থাভাবে পড়ে কোন পয়সাওয়ালা লোকের কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ হিসাবে নিয়ে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হতো যে, উত্তমর্ণ যখনই তাকে ডাকবে তখন সে এসে কাজ করে দিয়ে যাবে। খাটবার সময় সে উত্তমর্ণের কাছ থেকে ভিন্ন কোন মজুরি পাবে না, মাত্র খোরাক পাবে। বেশি হলে হয়তো আর এক টুকরো কাপড়। মজুরি হিসাবে যেটা প্রাপ্য হতো সেটা ঋণ-শোধ হিসাবে উত্তমর্ণের খাতায় জমা হতো। কিন্তু

২. Chotanagpur–Bradley Birt.

বাস্তবক্ষেত্রে উত্তমর্ণের রহস্যময় হিসাবের কৌশলে ঋণের পরিমাণ বিশেষ কিছু কম্‌তির দিকে যেত না। সারাজীবন এভাবে খাটুনি দিয়েও হতভাগ্য কামিয়া ঋণ শোধ করতে পারতো না। মরবার সময় এই ঋণের দায়িত্ব কামিয়ীর স্ত্রী-পুত্রকন্যা অথবা নিকট সম্পর্কের আত্মীয়ের ওপর গিয়ে চাপতো এবং তারাও সারাজীবন খেটে এই ঋণ শোধের চেষ্টা করতো। সরকারী আদালত এই কামিয়োতি প্রথাকে অবৈধ মনে করতেন না। এইভাবে সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে এবং ছোটনাগপুরের অন্য অঞ্চলেও একটা বিরাট ক্রীতদাস শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। স্যার উইলিয়াম রবিনসন তাঁর শাসনকালে সাঁওতাল পরগনায় কামিয়ৌতি প্রথার উচ্ছেদ করেন। ১৮৬৩ সালে অ্যাডভোকেট জেনারেলের কতগুলি রুলিং নন-রেগুলেশন অঞ্চলের অফিসারদের ক্ষমতার স্বাধীনতাকে কিছু কিছু খর্ব করে এবং লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার সিসিল বীডনও (Sir Cecil Beadon) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সাঁওতাল পরগনা জেলার শাসনব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব বাঙলার অন্যান্য জেলার শাসনব্যবস্থার মতো করা উচিত। এর ফলে জমিদার ও মহাজন সম্প্রদায় আবার সুযোগ পায় এবং ব্রিটিশ আইনের পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস পেছনে থাকায় সাঁওতাল চাষীদের ওপর প্রবল মহাজনী আরম্ভ করে। এর পরিণামে ১৮৭১ সালে সাঁওতালদের মধ্যে আবার ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্বেল "সাঁওতাল পরগনার শান্তি ও সুশাসনের" জন্য এক আইন পাশ করিয়ে নেন (Regulation III of 1872)। মহাজনেরা শতকরা ২৪ টাকার বেশি সুদ নিতে পারবে না, রায়তেরা জমি হস্তান্তর করতে পারবে না ইত্যাদি কতগুলি বিধিনিষেধ এই রেগুলেশনের দ্বারা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৭৯ সালে সাঁওতাল পরগনার ভূমি নতুনভাবে জরিপ ও বন্দোবস্ত (Survey & Settlement) করে সাঁওতাল সমাজের গ্রাম্য পঞ্চায়েত শাসনের পদ্ধতিকেও অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। ব্রাড্‌লে বার্ট এই সরকারী ব্যবস্থার প্রশংসা করেও বলেছেন : "দুরবস্থাপীড়িত সাঁওতাল সমাজের আর্থিক উন্নতি ফিরে এল।...সাঁওতালের ওপর বিশ্বাস করে আত্ম-শাসনের যে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হলো, তার ফলে সাঁওতালেরা খুবই খুশি হয়। অপরাধমূলক কাজ (crime) গোপন করার উদাহরণ ক্রমেই কমে আসতে থাকে। তবুও এই আর্থিক উন্নতি সাঁওতালদের জীবনে খুব কমই পরিবর্তন আনতে পেরেছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা সভ্যতার ক্ষেত্রে তারা চিন্তায়, প্রবৃত্তিতে ও জীবনযাত্রায় কিছু ওপরে উঠ্‌তে পেরেছে, এমন প্রমাণ খুব কমই চোখে পড়ে। যেমন জীবন চলছে, তাইতেই তারা সুখী। কাজেই উন্নত হবার কোন চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই।"

ব্রাড্‌লে বার্টের মন্তব্যের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শুধু জমির ব্যাপারের কতগুলি সুবিধা দিলেই এবং "গোষ্ঠীগত রীতিনীতির স্বাধীনতা" অক্ষুণ্ণ রাখলেই আদিবাসীর জীবন উন্নত হয় না। আদিবাসীদের জন্য গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্রের হাজার প্রশংসা করে আধুনিক কালের যে সব স্বাতন্ত্র্যবাদী (Isolationist) সমালোচক আদিবাসী-দরদ প্রচার করে থাকেন, তাঁরা ব্রাড্‌লে বার্টের পুরাতন মন্তব্য দিয়ে নিজেদের অভিমতের সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন।

ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ কোম্পানির শাসনের সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম (কলিকাতা), ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (মাদ্রাজ) এবং বোম্বাইয়ের শাসনকার্য পরিষদগুলি (Executive Councils) যে সব 'রেগুলেশন' জারি করতেন, তার দ্বারাই ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসন চলতে থাকে। নতুন নতুন অঞ্চল শাসনভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি বুঝতে পেরেছিল যে, সব অঞ্চল বা প্রদেশকে এইসব রেগুলেশনের সাহায্যে শাসন করার অসুবিধা আছে। যে সব অঞ্চলকে অনগ্রসর বলে মনে হতো, সেগুলিকে রেগুলেশন-বহির্ভূত (Non-Regulated) প্রদেশ বলে পৃথক করে বুঝে নিয়ে ভিন্ন ব্যবস্থায় শাসন করা হতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রেগুলেশন-বহির্ভূত অঞ্চলের জন্য

ভিন্ন ভিন্ন বিধান (Code) রচিত হয়। এই বিধানগুলি মূল রেগুলেশনগুলির তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করেই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরস্পর থেকে কিছুটা ভিন্নতরভাবে করা হয়। এইভাবে কোম্পানির শাসনকাল থেকেই 'রেগুলেশন' প্রদেশ ও 'রেগুলেশন-বহির্ভূত' প্রদেশ নামে দুই শ্রেণীর অঞ্চল সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে সব 'প্রদেশের' শাসনব্যবস্থাকে একই রকম করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা চলতে থাকে।

তফসিলভুক্ত জেলা

১৮৬১ সালে পার্লামেণ্টে ভারতীয় কাউন্সিল আইন (Indian Council Act) পাশ হয়। রেগুলেশন-বহির্ভূত অঞ্চলের জন্য গভর্নর-জেনারেল অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে সব বিধি-নির্দেশ তৈরি করেছিলেন, এই আইনে সেগুলি সমর্থিত হয়। ১৮৭০ সালে পার্লামেণ্ট ভারত গভর্নমেণ্ট আইন (Government of India Act) পাশ করেন। স্থানীয় গভর্নমেণ্ট কতগুলি বিশেষ অঞ্চলের শাসনের জন্য যে সব বিধি-নির্দেশ তৈরি করবেন সেগুলিকে অনুমোদন করবার জন্য সপারিষদ গভর্নর-জেনারেলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই আইন অনুসারে ন্যস্ত ক্ষমতা অনুযায়ী গভর্নর-জেনারেল বহু নতুন বিধান প্রবর্তন করেন। ১৮৭৪ সালে ভারতীয় আইনসভা 'তফসিলভুক্ত জেলা আইন' (Scheduled Districts Act, XXIV of 1874) পাশ করেন। এই আইনের বলে স্থানীয় গভর্নমেণ্টকে কতগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয় বিশেষ অঞ্চলগুলিকে নির্দিষ্ট করে একটা তালিকাও এই আইনের সঙ্গে করা হয়। স্থানীয় গভর্নমেণ্ট নিজে বিবেচনা করে বুঝবেন, কোন্ বিশেষ অঞ্চলে কোন্ ব্যবস্থা প্রয়োজন, কোথায় সাধারণ আইন প্রয়োগ করা উচিত এবং কোথায় নয়।[১]

নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলি তফসিলভুক্ত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হয় :

আসাম, আজমীর, মাড়ওয়ার, কুর্গ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর বিভাগ, আঙ্গুল মহল, এডেন, সিন্ধু প্রদেশ, পাঁচ মহল, পশ্চিম খান্দেশের মেওয়াসি সর্দারদের তালুকসমূহ, চান্দা জমিদারী অঞ্চল, ছত্রিশগড় জমিদারী অঞ্চল, চিন্দোয়ারা জায়গীরদারী অঞ্চল, গঞ্জামের ১৪টি মালিয়া, ভিজাগাপট্টনমে ৯টি মালিয়া গোদাবরী জেলাা কতগুলি অংশ, লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, হাজারা, পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ, ডেরা গাজী খাঁ, লাহৌল ও স্পিতি, ঝাঁসি বিভাগ, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল, তরাই পরগনা, মির্জাপুর জেলার চারটি পরগনা, বারাণসী মহারাজার পারিবারিক বসতি অঞ্চলসমূহ, দেরাদুন জেলার জৌনসার-বাওয়ার এবং মণিপুর পরগনা (মধ্য ভারত এজেন্সি)।

উল্লিখিত তালিকা থেকে পাঁচ মহল জেলা, ঝাঁসি ডিভিসন এবং গঞ্জামের একটি মালিয়া পরে বাদ দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালে মণিপুর পরগনাকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

খন্দসমাজে নরবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই প্রথা রহিত করবার চেষ্টা করেন এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ খন্দেরা ১৮৪৬ সালে 'বিদ্রোহ' করে। আঙ্গুলের রাজাও এই বিদ্রোহের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। বিদ্রোহ দমন করে ১৮৪৮ সালে আঙ্গুলকে ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করা হয়। শুধু আঙ্গুল নয়, খন্দ অধ্যুষিত সমস্ত মালিয়াগুলিকে ১৮৩৯ সালের

১. Constitutional History of India—B. Keith.

আইনের (Indian Act XXIV of 1839) ব্যবস্থা অনুসারে শাসন করা আরম্ভ হয়। ১৮৭৭ সালে আঙ্গুলকে তফসিলভুক্ত জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

তফসিলভুক্ত জেলার আইন পাশ হবার পর এইভাবে ক্রমে ক্রমে প্রয়োজন বুঝে তালিকায় উল্লিখিত অঞ্চলগুলি তফসিল জেলা হিসাবে ঘোষিত হতে থাকে। গোদাবরী এজেন্সি ১৮৯১ সালে সম্পূর্ণভাবে তফসিলভুক্ত হয়।

১৮৬২ সালে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি (London Missionary Society) দক্ষিণ মির্জাপুরে দুধি-পরগনায় জমিদারী স্বত্ব নিয়ে মিশন স্থাপনের পরিকল্পনা করেন, এতে ধর্মপ্রচারের সুবিধা হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। কিন্তু মিশনের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ধর্মপ্রচারের সঙ্গ জমিদারিগিরি ঠিক খাপ খাবে না মনে করে পথ ছেড়ে দেন। ১৮৬৪ সালে দক্ষিণ নির্মাপুর রেগুলেশন-বহির্ভূত অঞ্চল ছিল, কিন্তু ১৮৭৪ সালে তফসিল জেলায় পরিণত হয়। ১৮৯১ সালে 'বোর্ড অব রেভিনিউ' দক্ষিণ মির্জাপুর অঞ্চলের (রবার্টগঞ্জ তহশীল) শাসনের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা ও বিধিনির্দেশ প্রণয়ন করেন। রাজস্ব এবং দেওয়ানী ব্যাপারে প্রচলিত সাধারণ আইনের অধিকার থেকে এই অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। দেওয়ানী মামলার ব্যাপারেও সাধারণ আদালতের অধিকার খারিজ করে দিয়ে কালেক্টরকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়। আপীলের সর্বোচ্চ দরবার হলো কমিশনার। শুধু সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে আপীলের সর্বোচ্চ অধিকার এলাহাবাদ হাইকোর্টের হাতে রইল। ফৌজদারী মামলার বিচারের ভারও জেলার কোন পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে দেওয়া হয়।[১]

কয়েকটি আদিবাসী অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের রীতিনীতি এবং শাসনব্যবস্থার পলিসি ও প্রক্রিয়ার যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো তা থেকে কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব। প্রথম, এটা খুবই স্পষ্ট যে, সত্যি সত্যি আদিবাসী অঞ্চলে গোষ্ঠীগত স্বায়ত্তশাসনের কোন সুযোগ ইংরাজ গভর্নমেণ্ট দেননি। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট নিজেদের পলিসি সার্থক করার জন্য যখন যেমন ইচ্ছা বিধান ও ব্যবস্থা তৈরি করে নিয়ে আদিবাসী অঞ্চলে প্রয়োগ করেছেন। মাঝে মাঝ আদিবাসী সর্দারদের দিয়ে রেগুলেশন বা আধারেগুলেশনের ব্যবস্থাকে অথবা কালেক্টর, কমিশনার এবং এজেন্ট সাহেবের মর্জিমাফিক রচিত ব্যবস্থাকে চালু করবার কাজে লাগান হয়েছে। এটা সর্দারতন্ত্র ছিল না, বরং বলা যায়—সর্দারদের সাহায্যে ইংরাজ কোম্পানিতন্ত্র। রেগুলেশন বহির্ভূত অঞ্চল অথবা পরবর্তীকালে তফসিলভুক্ত নামে ঘোষিত অঞ্চলগুলিই বিশেষভাবে আদিবাসী গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল। এই সব অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা রীতিনীতি ও ইতিহাস লক্ষ্য করলেই প্রথমে চোখে পড়ে এর জটিলতা। খানিকটা সাধারণ আইন, খানিকটা বিশেষ আইন এবং তার সঙ্গে কিছুটা অফিসারী স্বেচ্ছাতন্ত্র মিশিয়ে এবং তার মধ্যে আবার দুর্বল গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের ভেজাল দিয়ে এক উদ্ভট শাসনব্যবস্থা আদিবাসীর অদৃষ্টের ওপর চাপান হয়। আংশিক আধুনিক প্রথা আংশিক প্রাগৈতিহাসিক প্রথা এবং সবার ওপর কমিশনারী যথেচ্ছাতন্ত্র—এই হলো রেগুলেশনবহির্ভূত অথবা তফসিলভুক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক গঠন। দেওয়ানী ব্যাপার হয়তো সাধারণ আদালতের অধীন, এবং ফৌজদারী ব্যাপারে কমিশনার সাহেবই একমাত্র ন্যায়াধীশ।

সমস্ত ব্যাপার দেখে এই ধারণা হয় যে, আদিবাসী অঞ্চলে কোনমতে একটা শান্তিরক্ষার জন্যই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রধানত উৎসাহী হয়েছিলেন। জমির সমস্যা নিয়েই আদিবাসীরা বেশি বিচলিত হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ ভূমি-ব্যবস্থা রীতি অনুসারে বেশির ভাগ জমি হিন্দু জমিদারও মহাজনের হাতে চলে যাচ্ছিল। বিক্ষুব্ধ আদিবাসীকে এই জমির শোক বহু বিদ্রোহে

১. District Gazetteer of Mirzapur.

প্ররোচিত করেছে। সুতরাং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট জমির সম্বন্ধে আদিবাসীদের প্রতি কিছু কিছু সহানুভূতি দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বিদ্রোহের পর প্রথম প্রথম কতগুলি আইন করে আদিবাসীদের জমি রক্ষার আনুকুল্য করেন। এইভাবে একটা শান্ত অবস্থা সৃষ্টি করেই, তারপর ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে ব্যাপক জরিপ ও নতুন বন্দোবস্ত করে দস্তুরমতো ভূমিকর প্রথা প্রবর্তন করেন। আদিবাসীকে আধুনিক যুগোপযোগী অবস্থা ও প্রয়োজনের জন্য যোগ্যতার সঙ্গে উন্নতি করার পথে অগ্রসর করিয়ে দেবার কোন নীতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করেননি। রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে আদিবাসীর জীবনযাত্রাকে পুরাতন বৃত্তের মধ্যেই অচল করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। সত্যি সত্যি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সাঁওতাল পরগনার দামিন অঞ্চলকে 'তালগাছের বৃত্ত' দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থা আদিবাসীদের কাছে যতই নতুন ও অদ্ভুত লাগুক না কেন, এই একটি ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রবল অধ্যবসায়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত প্রাচীন আদিবাসীদের ঘাড়ে চাপিয়ে ছেড়েছেন।

কিন্তু সমস্ত আদিবাসী অঞ্চলে এই নীতি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। তবে এটাই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতি। প্রথমে দমননীতি, তারপর তোষণনীতি এবং তারপর আদিবাসীকে ধীরে ধীরে খাজনাদাতা বাধ্য প্রজারূপে পরিণত করার নীতি। সর্বত্র এই নীতির প্রক্রিয়া চলছে ; কোন কোন ক্ষেত্রে এই নীতি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধ-সার্থক হয়েছে।

দৃষ্টান্ত ঃ খন্দমাল ও গঞ্জামের খন্দেরা ১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে কয়েকবার বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের পেছনে কতগুলি কারণ ছিল—খন্দ অঞ্চলে পুলিসপ্রথার প্রবর্তন, ধরাবাঁধা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সড়ক তৈরির জন্য বেগার খাটতে বাধ্য হওয়া, এই তিন কারণে খন্দেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। খন্দমাল এলাকায় পাহাড়ী ওড়িয়ারা (এরা কোন আদিবাসী গোষ্ঠী নয়) জমির খাজনা দিয়ে থাকে, কিন্তু খন্দদের কাছ থেকে শুধু লাঙলকর (লাঙল প্রতি বারো আনা) আদায় করা হয়। গঞ্জামের খন্দদের লাঙলকরও দিতে হয় না। অধিকাংশ ভূমিই এখনো জরিপ বা বন্দোবস্ত করা হয়নি। কোরাপুট বা ভিজাগাপট্টম এজেন্সির জমিও এখনো ভালোভাবে জরিপ ও বন্দোবস্ত করা হয়নি। এখানকার আদিবাসী গোষ্ঠী 'ঝুম' প্রথায় চাষ করে। জঙ্গলের ওপর তাদের বিশেষ কতগুলি অধিকার গভর্নমেণ্ট স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তারা নিজেদের প্রয়োজনের মতো মদ ঘরেই তৈরি করার অধিকার পেয়েছে।

হিন্দু সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের পরিণাম

১৯১২ সালে বিলাসপুরে জমিদারী অঞ্চলের জরিপ রিপোর্টে মিঃ উইলস্ (Mr. C. U. Wills) এই মন্তব্য করেছেন ঃ "বিলাসপুরের জমিদারেরা বংশের দিক দিয়ে কাওয়ার গোষ্ঠীর আদিবাসী। ব্রিটিশ যুগে বৈষয়িক অবস্থায় উন্নত হয়ে আজকাল তারা নিজেদের কানোয়ার ক্ষত্রি বলে পরিচয় দেয়, উপবীত ধারণ করে এবং মোটামুটি হিন্দুধর্মের রীতিনীতি মেনে চলে।...পাইকরা কানোয়ার নামক গোষ্ঠী, জমিদারী অঞ্চলের উত্তর ভাগে বহু সংখ্যায় রয়েছে এবং এদের অবস্থা বেশ ভালো হিন্দুধর্ম আদিম অধিবাসীকে কতখানি সামাজিক সুরুচি, আত্মমর্যাদাবোধ, সংযম, মিতব্যয়িতা ও শ্রমকুশলতার শিক্ষা দিতে পারে. তার দৃষ্টান্ত পাইকরা কানোয়ার।"

নৃতত্ত্ববিদ্ রায় বাহাদুর শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, যিনি আদিবাসী অঞ্চলে হিন্দু জমিদারী পত্তনের কুফল সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, তিনি মন্তব্য করেছেন যে—রাঁচী জেলায় পূর্ব

পরগনাগুলিতে হিন্দুদের সংস্পর্শে আসায় মুণ্ডারা সভ্যতর অবস্থায় উন্নীত হতে পেরেছে।"[১]

জমিদারী প্রথা আদিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে এবং জমিদারেরা প্রধানত হিন্দু। এই কারণে আদিবাসীদের দুঃখের কারণটাকে সোজাসুজি 'হিন্দু-আক্রমণ' বলে যাঁরা মন্তব্য করেন, তাঁদের বিচর ঠিক করা হয় না। হিন্দু সান্নিধ্যের ফলে আদিবাসী সমাজের অন্য যে সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়েছে, তার মর্যাদাও অনেক সমালোচক উপলব্ধি করতে পারেন না।

কোল্‌হানের হো সমাজ সম্বন্ধে ১৯১০ সালে ও' ম্যালি (O' Malley) লিখেছেন ঃ "হো সমাজ নিজেদের গোষ্ঠীগত ধর্মমত নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়িয়ে আছে এবং খুব কম সংখ্যক হো খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে।...অপরদিকে হিন্দুধর্মের দিকে একটা আগ্রহের ভাব এদের মধ্যে দেখা যায়, বিশেষ করে 'জাত' প্রথার (Caste) প্রতি। একদল হো ব্রাহ্মণকে উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলে সম্মান দিয়ে থাকে।... বিগত সেন্সাসে অনেক হো নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। হিন্দু দেবদেবীর প্রতি এরা বিশ্বাস পোষণ করে এবং অনেকে উপবীত ধারণ করতে আরম্ভ করেছে।"[২]

আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে যারা হিন্দুত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু রীতিনীতি গ্রহণ করে, তার মধ্যে একটা ব্যাপার খুব সহজভাবেই চোখ পড়ে। হিন্দু ভালো প্রথা গ্রহণ করার সঙ্গে হিন্দুর মন্দ প্রথাগুলিও আদিবাসীরা গ্রহণ করে থাকে। ডাঃ ডি এন মজুমদার হো সমাজের সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে জানা যায় যে--'হো সমাজ এক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে মেয়েদের পক্ষে বাজারে কাজ করতে যাওয়া নিষিদ্ধ করে।' এই প্রস্তাবকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, এটা বুঝি 'নারীর অধিকার সঙ্কোচ'র জন্য একটা কুসংস্কারাপন্ন গোঁড়া মনোভাব। এলুইন সাহেবের মতো সমালোচকেরা এই সব ঘটনাকেই হিন্দু সংস্পর্শের কুফল বলে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু যখন খোঁজ করে জানা যায় যে, হো সমাজে পুরুষেরা আলস্যপরায়ণ এবং মেয়েদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, তখন মেয়েদের পক্ষে ঘরে থাকা এবং পুরুষদের পক্ষে বাইরে খাটতে যাওয়া হোদের সামাজিক পরিণামের দিক দিয়ে প্রগতিশীল পরিবর্তন বলে অবশ্যই স্বীকৃত হবে। এই উদাহরণটি বাদ দিয়েও একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে, আদিবাসী সমাজ হিন্দু সমাজের দেখাদেখি অনেক কুপ্রথাও গ্রহণ করেছে। 'হো' সমাজে অনেক 'কাজোমেসিন' বা জাতিচ্যুত পতিত পরিবার ছিল। সম্প্রতি আদিবাসী সমিতির নির্দেশে পতিত পরিবারগুলিকে সমাজভুক্ত করা হচ্ছে।[৩]

মদ্যপানের অভ্যাস আদিবাসী সমাজের আর্থিক দুর্গতির একটা বড় কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আদিবাসীদের অনেক গোষ্ঠী সুরা বর্জনের আন্দোলন করে সমাজকে দোষমুক্ত করার চেষ্টা করেছে। ১৮৭১ সাল থেকেই ওড়িশার খন্দ সমাজ লেখাপড়া শেখবার জন্য এবং সুরাপান প্রথা দমনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ১৯০৮ সালে তারা সকলে সুরাপান বর্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কবে এবং মদের দোকানগুলি বন্ধ করে দেবার জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করে। গভর্নমেণ্ট এই অনুরোধ অবশ্য উপেক্ষা করেননি।[৪]

হিন্দুর সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের মোটামুটি অধঃপতন হয়েছে, না উন্নতি হয়েছে, অনেকে এই প্রশ্ন করেছেন এবং অনেকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এলুইন প্রমুখ কয়েকজন

১. Mundas and their country...S.C.Roy.

২. District Gazetteer of Singbhum.

৩. Dr. D.N. Majumder, Hindusthan Quarterly,Jan. Mar, 1944.

৪. Aborigines & Their Future–G.S. Ghurye.

প্রচারক-নৃতাত্ত্বিক আছেন যাঁরা সোজাসুজি প্রচার করে থাকেন যে, হিন্দু সংস্পর্শের ফলেই আদিবাসীরা রসাতলে যেতে বসেছে। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে এবং এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে হিন্দু সংস্পর্শের জন্য আদিবাসীদের উন্নতিই হয়েছে। হিন্দু সংস্পর্শে যেসব আদিবাসী গোষ্ঠী আসেনি, তারা কোনো স্বর্গীয় অবস্থায় বাস করে না। এ বিষয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতামত যাচাই করে দেখতে পারি, তাঁরা কি বলেন?

ও' ম্যালি (O' Malley) লিখেছেন—"হিন্দুত্ব গ্রহণ করে আদিবাসীরা মিত ও সংযত জীবনের প্রথম ধাপ খুঁজে পায়, কারণ হিন্দুধর্মীয় নীতির প্রভাবে মদ্য পানের আসক্তি খর্ব হয়, কারণ হিন্দুদের মধ্যে সভ্য নীতিসঙ্গত জীবনের একটা আদর্শ রয়েছে।"[৫]

এক মুখে হিন্দু সংস্পর্শের এই কুফল স্বীকার করেও ও' ম্যালি আর এক মুখে একগাদা কুফলের বর্ণনা করেছেন। 'হিন্দুর সংস্পর্শে এসেই আদিবাসীদের ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ লোপ পায় এবং তারা বাল্যবিবাহ ইত্যাদির কুপ্রথা গ্রহণ করে অবনত শ্রেণী হয়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা ছোট জাত হিসাবে স্থান গ্রহণ করে।'

এই বিষয়ে অন্যান্য সমালোচক কয়েকজনের অভিমত দেখা যাক্। মিঃ সিমিংটন (Mr. Symington) যে মন্তব্য করেছেন, সেটাও দু'মুখো ভাষা হয়ে উঠেছে। তিনি একবার বলেছেন—"বাইরের পৃথিবীর সংস্পর্শ থেকে যে সব আদিবাসী গোষ্ঠী দূরে সরে আছে, তারাই সুখী ও স্বাধীন। যেখানে তারা উচ্চতর শিক্ষিত মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, সেখানেই তারা ভীরু ও অবনত হয়েছে এবং শোধিত হয়েছে।' কিন্তু এ হেন সিমিংটনও বলেন—"চোপড়া অঞ্চলে ভীলেরা রাজপুর কুন্‌বিদের (চাষীদের) সংস্পর্শে এসে তাদের কৃষিকাজের পদ্ধতি ও অন্যান্য অনেক সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রণালীতে উন্নতিলাভ করেছে।"[৬]

কিন্তু কর্ণেল ডাল্টন (Col. Dalton) বলেন—"খেড়িয়া গোষ্ঠীর মধ্যে যারা ছোটনাগপুরের জমিদারী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে তারা অন্যান্য দূরবিচ্ছিন্ন খেড়িয়াদের চেয়ে সভ্যতায় অনের বেশি উন্নত।'[৭]

খেড়িয়াদের মধ্যে দুধখেড়িয়া নামে একটি শাখা আছে। এরা রায়ত হয়ে চাষবাস করে এবং হিন্দুর সংস্পর্শে ব্যবসায়িক লেনদেন করে হিন্দুদের সঙ্গে একই স্কুলে শিক্ষালাভ করে থাকে। এই সংস্পর্শের ফলে দুধখেড়িয়াদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। 'হিন্দু প্রতিবেশীর কাছ থেকে অনেক সাংস্কৃতিক বিষয় আহরণ করে খেড়িয়ারা নিজ সমাজে আত্মস্থ করেছে।"[৮]

হিন্দুর সংস্পর্শ আদিবাসী সমাজের ওপর মোটামুটি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, এই সমস্ত বিবরণ থেকে সংক্ষেপে এইভাবে তার একটি পরিচয় বিবৃত করা যেতে পারে ঃ

'হিন্দুর সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজ যতটুকু প্রভাবিত হয়েছে তার ফলে তারা মোটামুটিভাবে উন্নত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে সমাজ সংস্কার, শিক্ষার প্রসার ও ধর্মীয় মতবাদের সংস্কারের চেষ্টা করছে। পানোন্মাত্ততার অভ্যাসকে খর্ব করেছে। উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করেছ। হিন্দু সমাজের মধ্যে এসে জাত-প্রথা গ্রহণ করেও তারা উপরে উঠবার চেষ্টা করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও বয়েছে।...শুধু যদি হিন্দুর দ্বারা জমি গ্রাসের ব্যাপারটা না থাকত (যেটা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থারই পরিণাম) তাহলে হিন্দুর সংস্পর্শ লাভ করে আদিবাসীরা

৫. Modern India and the West.

৬. Report on the Aboriginal & Hill Tribes of the Partially excluded Area in the Province of Bombay, 1939.

৭. Census of India–1930. Bihar & Orissa.

৮. Kharia–S.C. Roy & R.C.Roy.

সম্পূর্ণ মঙ্গলকর উন্নতিলাভ করত।[৯]

আদিবাসীরা নিজেদের সম্বন্ধে 'হিন্দু' আখ্যা দিতে কতখানি উৎসাহী তার কারণগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

(ক) খাড়িয়াদের মধ্যে শতকরা ৩৬ জন 'হিন্দু' হিসাবে পরিচয় দেয়, শতকরা ৪৪ জন খৃস্টান হিসাবে। (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(খ) ওড়িশার খন্দদের মধ্যে শতকরা ৪৫ জন 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয় (১৯১১ সালের সেন্সাস)। 'বিহার ও ওড়িশার খন্দদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন 'হিন্দু' হিসাবে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(গ) ওরাওঁ আদিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৪১ জন 'হিন্দু' বলে এবং শতকরা ২০ জন খৃস্টান বলে নিজেদের পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(ঘ) সাঁওতালদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয়। শতকরা .০১-এর চেয়েও কমসংখ্যক খৃস্টান হিসাবে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(ঙ) যুক্তপ্রদেশ ও বিহার-ওড়িশার সমস্ত খন্দ নিজেদের 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয়। মধ্য ভারতে শতকরা ৭৪ জন খন্দ 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয় এবং মধ্য প্রদেশের শতকরা ৪৬ জন। মোট কথা ভারতের সমগ্র খন্দ সমাজের শতকরা ৫৩ জন 'হিন্দুত্বের' দাবি করে। সমগ্র খন্দ সমাজের মধ্যে মাত্র ৩৫ জন 'খৃস্টান' বলে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, খৃস্টান মিশনারিদের উদ্যোগের ব্যর্থতা, কারণ ১৮৪০ সাল থেকেই খৃস্টান মিশনারিরা খন্দদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করে আসছে।

(চ) কাওয়ার গোষ্ঠীর আদিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৬ জন 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(ছ) ভীলদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন 'হিন্দু' হিসাবে পরিচয় দেয়। সমস্ত ভীল সমাজের মধ্যে মাত্র ১৩ জন খৃস্টান পাওয়া যায় (১৯৩৯ সালের সেন্সাস)।

মানভূমের ভূমিজ কোলেরা হিন্দু হয়ে গেছে। তাদের ভাষা বাঙলা এবং তাদের সমাজপতিরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। তারা দ্রুত অধিকাংশ হিন্দু উৎসবগুলিকে গ্রহণ করে ফেলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গোষ্ঠীগত নৃত্যগীতের অনুশীলনও বজায় রেখেছে। নৃত্যগীতের প্রতি তাদের 'কোলসুলভ' অনুরাগের কোন হ্রাস হয়নি।[১০]

ভুঁইয়ারা নিজেদের 'হিন্দু' বলে মনে করে। ভুঁইয়া সমাজের বিশিষ্ট জমিদার ও সর্দারেরা নিজেদের রাজপুত বলে পরিচয় দেয় এবং রাজপুত মর্যাদাও দাবি করে।[১১]

ও' ম্যাসি বলেন ঃ খন্দমলের খন্দেরা সবদিক দিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম উপজাতি হয়েই রয়েছে। কিন্তু পুরীর খন্দেরা এমন হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে গেছে যে, তাদের দেখে নিম্নজাতের ওড়িয়া বলেই মনে হবে। তারা যে শুধু নিজেকে সৎ হিন্দু বলে মনে করে তা নয়, গোঁড়া হিন্দু প্রতিবেশীরাও তাদের হিন্দু বলে মনে করে। গোঁড়া হিন্দুরা এই খন্দদের গ্রামে বা গৃহে অবস্থান করতে আপত্তি করে না।[১২]

বিলাসপুর জেলায় হিন্দুর হোলি উৎসবে আগুন জ্বালাবার ভার সাধারণত বৈগা, খন্দ প্রভৃতি আদিবাসী লোকের ওপর দেওয়া হয়। খেরমাতা, হনুমান প্রভৃতি পল্লী দেবতার পূজো করবার পুরোহিতকে ভূমকা, ভূমিয়া অথবা ঝানকার বলা হয়ে থাকে। এই পুরোহিত বা

৯. The Aboriginals & Their Future–G. S. Ghurye.

১০. Chotanagpur–Risley.

১১. The Story of an Indian Upland–Bradley-Birt.

১২. Modern India & The West–O' Malley.

ঝানকার আদিবাসী গোষ্ঠীর লোক। সম্বলপুর জেলায় সাধারণত বিঁঝোয়ার গোষ্ঠীর লোকেরা ঝানকার হয়ে থাকে। মান্দলা ও বলাঘাট জেলায় বৈগারাই ঝানকার হয়ে থাকে ; 'ঝানকার' পুরোহিতেরা গ্রামের হিন্দু সমাজে মোটামুটি ভালো রকমেই মর্যাদা লাভ করেছে। এই প্রথা অবশ্য এখন দিন দিন কমে আসছে। ঝানকার পুরোহিতেরা প্রত্যেক হিন্দু এবং আদিবাসী গেরস্থের কাছ থেকে বার্ষিক বৃত্তি (শস্য) লাভ করে।

দেখা যাচ্ছে, যে সব অঞ্চলে সাধারণ ভারতীয় ও আদিবাসী উভয় সমাজকে নিয়ে মিশ্র বসতি আছে, সেখানে পারস্পরিক একটা যোগাযোগের ফলে উভয়ের পূজ্য নতুন নতুন দেবতাও তৈরি করা হয়েছে এবং উভয়েই আদিবাসী 'ঝানকার' পুরোহিতের যজমান হয়ে উঠেছে। মিঃ শুবার্ট (Shootbert) ১৯৩১ সালের মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের সেন্সাসের রিপোর্টে মন্তব্য করে গেছেন যে, অনেক প্রথা এবং বিশেষ করে জন্ম ও মৃত্যুর ব্যাপারে যে সব সংস্কার, কৃত্য ও আচার আছে, সেগুলি মধ্যপ্রদেশের এক একটা অঞ্চলে এক এক রকম। এই বিষয়ে জাতি হিসাবে বেশি পার্থক্য নেই, অঞ্চল হিসাবেই পার্থক্য। একই অঞ্চলের হিন্দু ও আদিবাসী এ বিষয়ে মোটামুটি একই রকমের প্রথা পালন করে।

কোরকুরা হোলি উৎসব পালন করে এবং আখাতিজ বা অক্ষয় তৃতীয়া থেকে তাদের কৃষি বৎসর আরম্ভ হয়। কোরকুরা হিন্দুর ছুৎমার্গও গ্রহণ করেছে, চামার, তেলি ও মুসলমানের ছোঁয়া জল তারা পান করে না। কোরকুদের মধ্যে এই সংস্কার প্রচলিত আছে যে, মহাদেব পাহাড়ে বসতি করবার জন্যে রাবণের অনুরোধে মহাদেব কোরকুদের সৃষ্টি করেছিল। ভীল লমাজের মধ্যে অনেকে এত বেশি হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে যে, তারা রাজপুত জাত বলে দাবি করে।

বর্তমান হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেছে—জাত-পাত-তোড়ক মনোভাব। হিন্দু সমাজে যাকে নিম্ন জাত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, তারা আর চুপ করে এই নিম্নত্ব মেনে নিতে রাজী নয়। তারা ওপরে উঠতে চাইছে। লক্ষ্য করার বিষয়, এই ওপরে ওঠবার পদ্ধতি হিন্দুর সামাজিক কাঠামোর প্রণালীসঙ্গত। এক স্তর থেকে আর এক স্তরে যাওয়া—কিন্তু স্তরচ্যুত হওয়া কখনই নয়। নিম্ন জাতের হিন্দুরা শ্রেণী-মর্যাদা উন্নীত করার জন্যে উচ্চ শ্রেণীর জনসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি গ্রহণ করে। আদিবাসীরাও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করে থাকে এবং প্রবেশ করার পর এক স্তর থেকে ওপরের এক স্তরে উন্নীত হবার চেষ্টা করে। উপবীত গ্রহণ করে, হিন্দু সমাজের বিশেষ দেবতা বা উৎসব গ্রহণ করে, হিন্দুর জন্ম-মৃত্যু-বিবাহঘটিত সংস্কার ও প্রথা গ্রহণ করে, কোন মুনি, ঋষি বা ভক্ত সাধকের সঙ্গে গোত্রত্ব দাবি করে—শিখাধারণ, নিরামিষ ভক্ষণ ইত্যাদি কোন না কোন বিশিষ্ট হিন্দু পদ্ধতির সাহায্য নিয়েই এই জাতগত উন্নয়ন সম্ভব হয়ে থাকে। মিঃ শুবার্ট মধ্যপ্রদেশের সেন্সাস রিপোর্টে (১৯৩১) মন্তব্য করেছেন যে, নিম্নজাতের হিন্দুরা যারা পূর্বে উপজাতীয় ধর্ম অনুসরণ করত তারা হিন্দু সমাজে আর নিচু হয়ে থাকতে চায় না। যে সব সামাজিক অধিকার তারা পূর্বে লাভ করতে পারেনি, বর্তমানে নিজের উদ্যোগে সে সব অধিকার আদায় করার জন্য এদের মধ্যে একটা উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

ছোট একটি ঘটনার বিবরণ এই প্রসঙ্গের উপসংহারে উদ্ধৃত করা গেল। এই ঘটনা বস্তুত অনুরূপ শত ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আদিবাসী জাতির মধ্যে হিন্দুসমাজভুক্তির যে বিরাট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলেছে, এই ঘটনা সেই বৃহত্তর পরিণামেরই একটি ছোট প্রতিবিম্ব।—"গত ১৮ই বৈশাখ মানভুমের জানবাজার থানার কয়েকটি গ্রামে আদিম শবর হিন্দুগণ সমবেত হইয়া ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণান্তে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া সভাস্থ সকল সম্প্রদায়ের নিকট পরিচয় দেয় ও তাহা সভাস্থ সকলেই মানিয়া লয়।"—(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪।)